Machine Translated by Google

অ্যাডলফ হিটলার

আমার সংগ্রাম

Machine Translated by Google

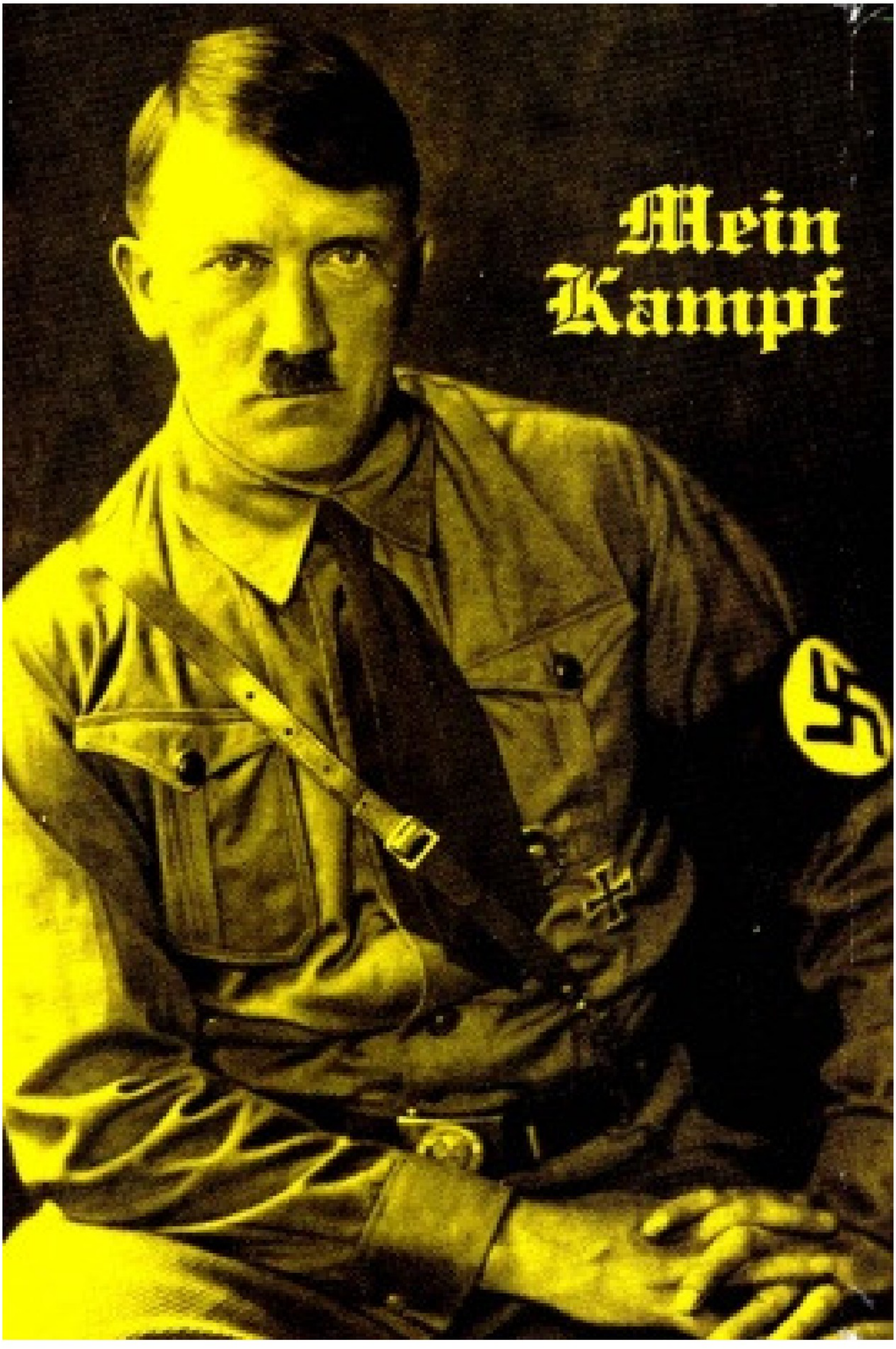

Machine Translated by Google

বিষয়বস্তু

ভূমিকা ৪

ভূমিকা ৭

প্রথম খণ্ড - গণনা

প্রথম অধ্যায় – আমার বাবা-মায়ের বাড়িতে.. ১০ দ্বিতীয় অধ্যায় – ভিয়েনায় অধ্যয়ন ও দুর্ভোগের

বছরগুলো... ১৯ তৃতীয় অধ্যায় – ভিয়েনায় কাটানো সময়ের রাজনৈতিক ভাবনা... ৪৫ চতুর্থ

অধ্যায় – মিউনিখ... ৮০ পঞ্চম অধ্যায় – বিশ্বযুদ্ধ.. ৯৭ ষষ্ঠ

অধ্যায় – যুদ্ধকালীন প্রচারণা.. ১০৬

অধ্যায় ৭ – বিপ্লব.. ১১২

অধ্যায় ৮ – আমার রাজনৈতিক জীবনের সূচনা ১২২

অধ্যায় ৯ – জার্মান শ্রমিক দল ১২৭

অধ্যায় ১০ – দ্বিতীয় রাইখের পতন কেন হয়েছিল?.. ১৩২

একাদশ অধ্যায় – জাতি ও রাষ্ট্র.. ১৬২

অধ্যায় ১২ – এনএসডিএপি-র বিকাশের প্রথম পর্যায় ১৮৮

খণ্ড ২ – জাতীয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন অধ্যায় ১ –

বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি ও দল ২১২

অধ্যায় ২ – রাষ্ট্র ২২০

অধ্যায় ৩ – রাষ্ট্রের নাগরিক ও প্রজাবৃন্দ ২৪৮

অধ্যায় ৪ – ব্যক্তিত্ব এবং জাতি-রাষ্ট্রের আদর্শ ২৫০

অধ্যায় ৫ – বিশ্বদৃষ্টি ও সংগঠন... ২৫৬

অধ্যায় ৬ – আমাদের সংগ্রামের প্রথম পর্ব ২৬২

অধ্যায় ৭ – লাল বাহিনীর সাথে সংঘাত ২৭১

অধ্যায় ৮ – একজন শক্তিশালী মানুষ একা থাকলেই সবচেয়ে শক্তিশালী হয়.. ২৮৫

অধ্যায় ৯ – এসএ-এর প্রকৃতি ও সংগঠন সম্পর্কিত মৌলিক ধারণা ২৯০

অধ্যায় ১০ – যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মুখোশ.. ৩০৯

অধ্যায় ১১ – প্রচার ও সংগঠন.. ৩২৩

অধ্যায় ১২ – ট্রেড ইউনিয়নের সমস্যা ৩৩২

অধ্যায় XIII – জার্মানির যুদ্ধোত্তর জোট নীতি.. ৩৩৯

অধ্যায় ১৪ – পূর্ব ইউরোপে জার্মান নীতি.................................. ৩৫৮

অধ্যায় ১৫ – আত্মরক্ষার অধিকার... ৩৭৩

সমাপ্তি ৩৮৪

উপসংহার ৩৮৫

Machine Translated by Google

ভূমিকা

অ্যাডলফ হিটলারের বই 'মাইন কাম্ফ'-এর এই সম্পূর্ণ অনুবাদটি পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করতে গিয়ে , আমি কিছু ঐতিহাসিক তথ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য বোধ করছি, যা এই অসাধারণ গ্রন্থে যা লেখা হয়েছে তার একটি সুষ্ঠু বিচার করার জন্য অবশ্যই মনে রাখতে হবে ।

মাইন কাম্ফ-এর প্রথম খণ্ডটি লেখক বাভারিয়ার একটি দুর্গে বন্দী থাকাকালীন লিখেছিলেন। তিনি সেখানে কীভাবে এবং কেন পৌঁছেছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তরটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ...

বইটি সেই ঘটনাগুলো নিয়ে লেখা, যা তার ওপর এই পরিণতি ডেকে এনেছিল, এবং কারণ তিনি তৎকালীন ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের কারণে সৃষ্ট মানসিক উত্তেজনার মধ্যে থেকেই লেখেন।

এটি ছিল জার্মানির চরমতম অপমানের এক সময়, যা কিছু দিক থেকে একশ বছরেরও বেশি সময় আগের সেই সময়ের অনুরূপ ছিল, যখন নেপোলিয়ন পুরোনো জার্মান রাইখকে বিভক্ত করেছিলেন এবং ফরাসি সৈন্যরা জার্মানির প্রায় পুরোটাই দখল করে নিয়েছিল।

১৯২৩ সালের প্রথম দিকে ফ্রান্স জার্মানি আক্রমণ করে, রুহর অঞ্চল দখল করে এবং রাইনল্যান্ডের বেশ কয়েকটি জার্মান শহর দখল করে নেয়। এটি ছিল আন্তর্জাতিক আইনের এক চরম লঙ্ঘন , যার বিরুদ্ধে তৎকালীন সমগ্র ব্রিটিশ জনগণ প্রতিবাদ করেছিল। ভার্সাই চুক্তির শর্তানুযায়ী নিরস্ত্র থাকায় জার্মানি কার্যকরভাবে আত্মরক্ষা করতে পারেনি । জার্মানির জন্য পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ ছিল কারণ ফ্রান্স জার্মান প্রজাতন্ত্র থেকে রাইনল্যান্ডের বিচ্ছিন্নতা এবং একটি স্বাধীন রাইনল্যান্ড প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপক প্রচারণা চালাচ্ছিল । এই কাজটি পরিচালনাকারী আন্দোলনকারীদের জন্য কোনো খরচেই কার্পণ্য করা হয়নি এবং কিছু কুচক্রী জার্মান আক্রমণকারীদের পক্ষে কাজ করতে শুরু করে। একই সময়ে, বাভারিয়ায় একটি জোরালো আন্দোলন চলছিল যার লক্ষ্য ছিল দেশটির বিচ্ছিন্নতা এবং ফ্রান্সের অধীনস্থ একটি স্বাধীন ক্যাথলিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, যেমনটি নেপোলিয়ন ১৮০৫ সালে ম্যাক্সিমিলিয়ানকে বাভারিয়ার প্রথম রাজা বানিয়ে করেছিলেন।

রাইনল্যান্ডের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন এতটাই অগ্রসর হয়েছিল যে কিছু শীর্ষস্থানীয় জার্মান রাজনীতিবিদ এর পক্ষ নিয়েছিলেন এবং প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, যদি রাইনল্যান্ড ছেড়ে দেওয়া হয় , তবে জার্মান প্রজাতন্ত্র ফ্রান্সের সাথে একটি ক্ষতিপূরণ চুক্তি করতে পারবে । কিন্তু বাভারিয়ার আন্দোলন আরও এগিয়ে গিয়েছিল। এবং এর প্রভাব ছিল আরও অনেক বেশি সুদূরপ্রসারী; কারণ বাভারিয়ায় যদি একটি স্বাধীন ক্যাথলিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতো , তবে পরবর্তী পদক্ষেপ হতো জার্মান অস্ট্রিয়ার সাথে একীভূত হওয়া , সম্ভবত একজন হ্যাবসবার্গ রাজার নেতৃত্বে। এর ফলে বাভারিয়া ও অস্ট্রিয়া থেকে দানিউব উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত একটি ক্যাথলিক জোট তৈরি হতো, যা সরাসরি রাজনৈতিক আধিপত্য না থাকলেও অন্তত নৈতিক ও সামরিক আধিপত্যের অধীনে থাকত ।

ফ্রান্স। আজ এটিকে চমৎকার মনে হলেও, সেই চমৎকার সময়ে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়েছিল। এই ধরনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বাস্তব ফল হবে একটি সম্পূর্ণ বিভাজন।

জার্মানি; এবং ফরাসি কূটনীতি এই লক্ষ্যেই সচেষ্ট ছিল। অবশ্যই, এমন কোনো লক্ষ্যের এখন আর অস্তিত্ব নেই। আর আধুনিক প্রজন্মের কাছে যা 'পুরোনো, দুঃখজনক , দূরবর্তী বিষয়' বলে মনে হতে পারে, আমি সেগুলোর উল্লেখ করতাম না , যদি না 'মাইন কাম্ফ' লেখার সময়ে সেগুলো খুব কাছের ও বর্তমান হতো, এবং আমরা এখন যা কল্পনা করতে পারি তার চেয়েও বেশি দুর্ভাগ্যজনক হতো।

১৯২৩ সালের শরৎকালের মধ্যে বাভারিয়ার বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন একটি অমোঘ বাস্তবতায় পরিণত হতে চলেছিল । বাভারিয়ায় রাইখসভেয়ারের কমান্ডার জেনারেল ফন লোসো বার্লিন থেকে আর কোনো আদেশ মানছিলেন না । জার্মান প্রজাতন্ত্রের পতাকা দেখা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল । অবশেষে , বাভারিয়ার প্রধানমন্ত্রী একটি স্বাধীন বাভারিয়া ঘোষণা করার এবং জার্মান প্রজাতন্ত্র থেকে এর বিচ্ছিন্নতার সিদ্ধান্ত নেন। এই ঘটনাটি জার্মান প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পঞ্চম বার্ষিকীতে (৯ নভেম্বর, ১৯১৮) ঘটার কথা ছিল।

হিটলার একটি পাল্টা আক্রমণের আয়োজন করলেন। বেশ কয়েকদিন ধরে তিনি মিউনিখের চারপাশে তার আক্রমণকারী সৈন্যদের জড়ো করেন, একটি জাতীয় বিক্ষোভের পরিকল্পনা করেন এবং আশা করছিলেন যে রাইখসভেয়ার তার পক্ষ নেবে ও বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রতিরোধ করবে। লুডেনডর্ফ তার সাথে ছিলেন। এবং তিনি ভেবেছিলেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে একজন মহান জার্মান সেনাপতির মর্যাদাই পেশাদার সেনাবাহিনীর আনুগত্য নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট হবে ।

Machine Translated by Google

ঘোষণা করা হয়েছিল যে ৮ই নভেম্বর রাতে বুর্গারব্রাউ কেলারে একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে বাভারিয়ার দেশপ্রেমিক সমিতিগুলো সমবেত হয়েছিল এবং প্রধানমন্ত্রী ডঃ ফন কার পড়া শুরু করেছিলেন।
তার আনুষ্ঠানিক বিবৃতিটি ছিল কার্যত প্রজাতন্ত্র থেকে বাভারিয়ার স্বাধীনতা ও বিচ্ছিন্নতার ঘোষণাপত্রের সমতুল্য । ফন কারের বক্তৃতা চলাকালে হিটলার লুডেনডর্ফকে সঙ্গে নিয়ে সভাকক্ষে প্রবেশ করেন। সভা মুলতবি করা হলো।

পরদিন, জাতীয় জোটের সমর্থনে এক গণবিক্ষোভের জন্য নাৎসি বাহিনীগুলো রাস্তা দখল করে নেয় । হিটলার ও লুডেনডর্ফের নেতৃত্বে তারা দলে দলে মিছিল করে। যখন তারা শহরের একটি প্রধান চত্বরে পৌঁছায়, সেনাবাহিনী তাদের ওপর গুলি বর্ষণ শুরু করে। মিছিলকারী ষোলজন ঘটনাস্থলেই নিহত হয়, দুজন রাইখসভেয়ার ব্যারাকে আহত হয়ে মারা যায়। আরও বেশ কয়েকজন আহত হয়। হিটলার ফুটপাতে পড়ে যান এবং তার কলারবোন ভেঙে যায়। লুডেনডর্ফ ব্যারিকেডের পেছন থেকে গুলি চালানো সৈন্যদের দিকে সোজা হেঁটে যান , কিন্তু তাদের প্রাক্তন সেনাপতির দিকে গুলি করার সাহস কারও ছিল না।

হিটলারকে তাঁর বেশ কয়েকজন কমরেডের সাথে গ্রেপ্তার করে লেক নদীর তীরে অবস্থিত ল্যান্ডসবার্গ দুর্গে বন্দী করা হয়েছিল। ১৯২৪ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি, মিউনিখের গণ আদালতে তাঁর বিচার শুরু হয়। তাঁকে দুর্গে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত বেশ কয়েকজন কমরেডের সাথে তিনি লেক নদীর তীরে অবস্থিত ল্যান্ডসবার্গে ফিরে আসেন এবং ২০শে ডিসেম্বর মুক্তি পাওয়ার আগ পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন। তিনি প্রায় তেরো মাস কারাগারে কাটান । এই সময়ে তিনি 'মাইন কাম্ফ'-এর প্রথম খণ্ডটি রচনা করেন।

এই সবকিছু বিবেচনা করলে আমরা বুঝতে পারি , কী ধরনের মানসিক চাপের মধ্যে এই বইটি লেখা হয়েছিল। হিটলার স্বাভাবিকভাবেই বাভারিয়ার কর্তৃপক্ষের ওপর, ফ্রান্সের খেলার ঘুঁটির মতো ব্যবহৃত হাস্যকর দেশপ্রেমিক সমিতিগুলোর ওপর (যদিও প্রায়শই অচেতনভাবে) , এবং অবশ্যই ফ্রান্সের ওপর ক্ষুব্ধ ছিলেন। সেই পরিস্থিতিতে তিনি যে ফ্রান্স সম্পর্কে কঠোরভাবে লিখবেন, তা ছিল সুস্পষ্ট। সেই সময়ে ফ্রান্সকে জার্মানির অদম্য ও মারাত্মক শত্রু বলাটা কোনো অত্যুক্তি ছিল না। শুধু জার্মানিতেই নয়, বিদেশেও শান্তিবাদীরা এমনটাই বলতেন। এবং যদিও 'মাইন কাম্ফ'-এর দ্বিতীয় খণ্ডটি হিটলারের জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর লেখা হয়েছিল এবং রুহর থেকে ফরাসিদের প্রত্যাহারের পর প্রকাশিত হয়েছিল , তবুও আক্রমণকারী সেনাবাহিনীর অগ্রযাত্রার শব্দ তখনও জার্মানদের কানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল, এবং ফরাসি আক্রমণের ফলে জার্মানির শিল্প ও আর্থিক জীবনে যে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ নেমে এসেছিল, তা দেশটিকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে নিমজ্জিত করেছিল । এমনকি ফ্রান্সেও ফ্রাঁর মূল্য অর্ধেক হয়ে গিয়েছিল। রুহর ও রাইনল্যান্ডে ফরাসি আক্রমণের ফলে কার্যত সমগ্র ইউরোপ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছিল ।

কিন্তু এখন, যখন এই বিষয়গুলো এমন এক মৃত অতীতের অংশ যা কেউ মনে করতে চায় না, তখন প্রায়শই প্রশ্ন ওঠে : হিটলার কেন 'মাইন কাম্ফ' সংশোধন করেননি? আমার মনে হয়, একজন নিরপেক্ষ সমালোচকের মনে যে উত্তরটি সঙ্গে সঙ্গে আসে তা হলো: 'মাইন কাম্ফ' একটি ঐতিহাসিক দলিল যা তার সময়ের ছাপ বহন করে। এর কোনো সংশোধন একে তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। অধিকন্তু , হিটলার ঘোষণা করেছিলেন যে তার কার্যকলাপ এবং প্রকাশ্য বিবৃতিগুলো তার বইয়ের একটি আংশিক সংশোধন এবং সেভাবেই সেগুলোকে বিবেচনা করা উচিত । এটি বিশেষ করে 'মাইন কাম্ফ'-এ ফ্রান্স এবং সেইসব জার্মানদের সম্পর্কে করা বিবৃতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যারা তখনও রাইখের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। জার্মানির পক্ষ থেকে, তিনি শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেছিলেন যে জার্মান অংশটি

উত্তর টাইরল ইতালির অন্তর্ভুক্ত, এবং ফ্রান্সের প্রসঙ্গে তিনি একাধিকবার ঘোষণা করেছেন যে বর্তমানে জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যে রাজনৈতিক স্বার্থের সংঘাতের কোনো ভিত্তি নেই এবং ফ্রান্সের উপর জার্মানির কোনো ভূখণ্ডগত দাবি নেই । পরিশেষে , আমি এখানে উল্লেখ করতে পারি যে হিটলার এও ঘোষণা করেছিলেন যে, যখন তিনি এই বইটি লিখেছিলেন , তখন তিনি কেবল একজন রাজনৈতিক নেতা ছিলেন , কোনো দাপ্তরিক দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন না , তাই 'মাইন কাম্ফ'-এ তিনি যা লিখেছেন তা রাইখ চ্যান্সেলর হিসেবে তাকে কোনো বাধ্যবাধকতা দেয় না।

আমি এখন লেখাটিতে প্রায়শই পুনরাবৃত্ত কিছু প্রসঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত করব , যা হয়তো সব পাঠকের কাছে সবসময় স্পষ্ট নাও হতে পারে । উদাহরণস্বরূপ, হিটলার বিভিন্ন সময়ে জার্মান রাইখের কথা বলেছেন। কখনও তিনি প্রথম রাইখ বা সাম্রাজ্যের কথা উল্লেখ করেন, আবার কখনও ১৮৭১ সালে প্রথম ভিলহেলম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জার্মান সাম্রাজ্যের কথা বলেন। কাকতালীয়ভাবে, তাঁর শাসনকাল, যা ১৯৩৩ সালে শুরু হয়েছিল, সাধারণত তৃতীয় রাইখ নামেই পরিচিত, যদিও এই কথাটি প্রকাশ করা হয়

Machine Translated by Google

মাইন কাম্ফ-এ এর ব্যবহার নেই। হিটলার অস্ট্রিয়ান রাইখ এবং ইস্টার্ন মার্চের কথাও বলেন, এবং হ্যাবসবার্গ সাম্রাজ্য ও মূল অস্ট্রিয়ার মধ্যে সবসময় স্পষ্টভাবে পার্থক্য করেন না। পাঠক যদি নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক রূপরেখাটি মনে রাখেন , তবে তিনি পাঠ্যটিতে ব্যবহৃত প্রসঙ্গগুলো বুঝতে পারবেন।

ল্যাটিন শব্দ Regnum- এর জার্মান রূপ Reich শব্দটির অর্থ রাজ্য, সাম্রাজ্য বা প্রজাতন্ত্র নয়। এটি এমন একটি শব্দ যা যেকোনো ধরনের সংবিধানকে নির্দেশ করতে পারে।
প্রথম জার্মান সাম্রাজ্যের পূর্বসূরী ছিল পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য, যা ৮০০ খ্রিস্টাব্দে শার্লমেইন প্রতিষ্ঠা করেন। শার্লমেইন ছিলেন ফ্রাঙ্কদের রাজা, যারা ছিল জার্মান উপজাতি এবং পরবর্তীতে রোমান সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত হয়। দশম শতাব্দীতে, শার্লমেইনের সাম্রাজ্য জার্মানদের হাতে চলে যায় যখন প্রথম অটো (৯৩৬-৯৭৩) সম্রাট হন। জার্মান জাতির পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য (এটিই ছিল এর আনুষ্ঠানিক নাম) হিসেবে, এটি জার্মান সম্রাটদের শাসনাধীনে ছিল, যতক্ষণ না ১৮০০-এর দশকের প্রথম দশকে নেপোলিয়ন জার্মানিকে বিভক্ত করেন। ১৮০৬ সালের ৬ই আগস্ট, সর্বশেষ সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রান্সিস আনুষ্ঠানিকভাবে জার্মান রাজমুকুট ত্যাগ করেন।

অক্টোবরে জেনার যুদ্ধের পর নেপোলিয়ন বিজয়ী বেশে বার্লিনে প্রবেশ করেন।

নেপোলিয়নের পতনের পর, জার্মান রাজ্যগুলোকে একত্রিত করে একটি একক সাম্রাজ্য গঠনের জন্য একটি আন্দোলন শুরু হয়। এই লক্ষ্যের দিকে প্রথম নির্ণায়ক পদক্ষেপ ছিল ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধের পর ১৮৭১ সালে দ্বিতীয় জার্মান রাইখের সৃষ্টি। তবে, এই সাম্রাজ্যে হ্যাবসবার্গ শাসনের অধীনে থাকা জার্মান অঞ্চলগুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এগুলোকে জার্মান অস্ট্রিয়া বলা হতো। বিসমার্কের স্বপ্ন ছিল জার্মান অস্ট্রিয়াকে জার্মান রাইখের সাথে একীভূত করা ; কিন্তু এটি কেবল একটি স্বপ্নই থেকে যায়, যা ১৯৩৮ সালে হিটলারের হাত ধরে বাস্তবায়িত হয়।

এই বিষয়টি অবশ্যই মনে রাখতে হবে , কারণ সমস্ত জার্মান রাজ্যকে এক রাইখে একীভূত করার এই স্বপ্নটি এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে জার্মান দেশপ্রেমের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এবং এটি হিটলারের শৈশবকাল থেকেই তাঁর অন্যতম আদর্শ ছিল।

মাইন কাম্ফ-এ হিটলার প্রায়শই পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্ত অঞ্চলের কথা উল্লেখ করেন। এই পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্ত অঞ্চলটি—বা পূর্ব সীমান্ত এলাকা—শার্লমেইন সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলীয় প্রতিরক্ষা দুর্গ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রধানত বাজুভারি নামক জার্মানিক-কেল্টিক উপজাতিদের দ্বারা অধ্যুষিত এই অঞ্চলটি বহু শতাব্দী ধরে পূর্ব দিক থেকে, বিশেষ করে তুর্কিদের আক্রমণের বিরুদ্ধে পশ্চিমা খ্রিস্টধর্মের এক শক্তিশালী দুর্গ হিসেবে দাঁড়িয়েছিল। ভৌগোলিকভাবে, এটি প্রায় জার্মান অস্ট্রিয়ার অনুরূপ ছিল।

"বিশ্বদৃষ্টি" (মূল: Weltanschhauung) শব্দটি লক্ষ্য করাও গুরুত্বপূর্ণ। এই জার্মান শব্দটি এর মৌলিক অর্থ অনুসারে মানব জীবন, মানবিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি সম্পর্কিত একটি সম্পূর্ণ ধারণা ব্যবস্থাকে বোঝায়। বাস্তবে , এটি মানব জীবনের একটি ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি। সুতরাং , "Weltanschhauung" শব্দটি খ্রিস্টধর্ম, ইসলাম এবং এমনকি সমাজতন্ত্রকে বর্ণনা করতেও ব্যবহৃত হতে পারে , বিশেষত যেভাবে এটি রাশিয়ায় শেখানো হতো। জাতীয় সমাজতন্ত্রকে স্পষ্টভাবে একটি Weltanschhauung হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

পরিশেষে, আমি উল্লেখ করতে চাই যে 'সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র' শব্দটি বিভ্রান্তিকর হতে পারে , কারণ গণতন্ত্রের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এই শব্দটি জার্মানিতে সমাজতান্ত্রিক দলকে বর্ণনা করার জন্য ব্যবহৃত হতো। এই দলটি ছিল পুরোপুরি মার্ক্সবাদী, কিন্তু জার্মান জাতির গণতান্ত্রিক অংশের কাছে আবেদন জানানোর জন্য এটি সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র নামটি গ্রহণ করেছিল।

জেমস মারফি

Abbots Langley, luty 1939 r.

Machine Translated by Google

ভূমিকা

১৯২৪ সালের ১লা এপ্রিল, মিউনিখের গণআদালত কর্তৃক দণ্ডিত হয়ে আমি লেক নদীর তীরে অবস্থিত লান্সবার্গের দুর্গে আমার সাজা ভোগ করা শুরু করি ।

বহু বছর নিরবচ্ছিন্ন কাজের পর, প্রথমবারের মতো এমন একটি কাজ শুরু করা সম্ভব হলো , যেটির বিষয়ে অনেকেই জানতে চেয়েছিলেন এবং যেটিকে আমি নিজেও আন্দোলনের জন্য উপকারী বলে মনে করতাম । তাই আমি আমাদের আন্দোলনের লক্ষ্যগুলো বর্ণনা করার পাশাপাশি এর বিকাশ বর্ণনা করার জন্যও দুটি খণ্ড উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নিলাম । যেকোনো নিছক মতবাদমূলক গ্রন্থের চেয়ে এই খণ্ডগুলো থেকে বেশি কিছু শেখা সম্ভব ।

এটি আমাকে আমার এযাবৎকালের আত্মবিকাশ বর্ণনা করার সুযোগও করে দিয়েছে, কারণ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড বোঝার জন্য এবং ইহুদি সংবাদমাধ্যম কর্তৃক আমার সম্পর্কে উদ্ভাবিত কিংবদন্তিগুলো খণ্ডন করার জন্য এই ধরনের বর্ণনা অপরিহার্য।

এই রচনায় আমি অপরিচিতদের নয়, বরং এই আন্দোলনের সেইসব অনুসারীদের সম্বোধন করছি, যাঁদের হৃদয় এর সঙ্গে জড়িত এবং যাঁরা একে আরও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়ন করতে ইচ্ছুক। আমি জানি যে , লিখিত কথার চেয়ে কথিত কথার মাধ্যমে কম মানুষকে জয় করা যায় এবং বিশ্বের প্রতিটি মহান আন্দোলনের বিকাশ মহান বক্তাদের কারণেই সম্ভব হয়েছে , মহান লেখকদের কারণে নয়।

তথাপি, যেকোনো মতবাদের ভিত্তি একীভূত করার জন্য তার মৌলিক নীতিগুলো লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক। অতএব, এই দুটি খণ্ড আমাদের অভিন্ন কাঠামোর ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে কাজ করুক।

লেক নদীর তীরে ল্যান্ডসবার্গের দুর্গ।

Machine Translated by Google

১৯২৩ সালের ৯ই নভেম্বর, রাত ১২:৩০ মিনিটে, নিম্নে তালিকাভুক্ত নামধারী ব্যক্তিরা নিজেদের জাতির পুনরুত্থানে বিশ্বাস রেখে মিউনিখের ফেল্ডহেরেনহলের সামনে এবং প্রাক্তন যুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের সামনের চত্বরে লুটিয়ে পড়েছিলেন:

আলফার্থ ফেলিক্স, বণিক, জন্ম ৫ জুলাই, ১৯০১
বাউরিডল আন্দ্রেয়াস, টুপি প্রস্তুতকারক, ৪ মে, ১৮৭৯
কাসেলা থিওডর, ব্যাংক কেরানি, জন্ম ৮ আগস্ট, ১৯০০
এরলিখ ভিলহেলম, ব্যাংক কেরানি, জন্ম ১৯ আগস্ট, ১৮৯৪।
ফাউস্ট মার্টিন, ব্যাংক কেরানি, জন্ম ২৭শে জানুয়ারী, ১৯০১
হেচেনবার্গার আন্তন, তালা-চাবি নির্মাতা, জন্ম ২৮শে সেপ্টেম্বর , ১৯০২
কোয়ের্নার অস্কার, বণিক, জন্ম ৪ জানুয়ারী, ১৮৭৫
কুন কার্ল, প্রধান ওয়েটার, জন্ম ২৫শে জুলাই, ১৮৯৭
লাফোর্স কার্ল, প্রকৌশলবিদ্যার ছাত্র, জন্ম ২৮ অক্টোবর, ১৯০৪।
নিউবাউয়ার কার্ট, ওয়েটার, জন্ম ২৭ মার্চ, ১৮৯৯
পাপে ক্লাউস ফন, বণিক, জন্ম ১৬ আগস্ট, ১৯০৪
ফোর্ডটেন থিওডর ভন ডার, প্রাদেশিক উচ্চ আদালতের পরামর্শক, জন্ম ১৪ মে, ১৮৭৩।
রিকমার্স জোহান, অবসরপ্রাপ্ত অশ্বারোহী বাহিনীর ক্যাপ্টেন, জন্ম ৭ই মে, ১৮৮১।
শেউবনার-রিখটার ম্যাক্স এরভিন ফন, প্রকৌশলবিদ্যায় ডক্টরেট, জন্ম ৯ জানুয়ারী, ১৮৮৪
স্ট্র্যানস্কি লরেঞ্জ রিটার ভন, প্রকৌশলী, জন্ম 14 মার্চ, 1899
ওলফ উইলহেলম, বণিক, জন্ম ১৯ অক্টোবর, ১৮৯৮

তথাকথিত জাতীয় কর্মকর্তারা আমাদের প্রয়াত বীরদের একটি যৌথ সমাধি দিতে অস্বীকার করেছেন। তাই , আমি এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি তাঁদের প্রতি একটি যৌথ স্মৃতিস্তম্ভ হিসেবে উৎসর্গ করছি। তাঁদের স্মৃতি আমাদের আন্দোলনের সমর্থকদের জন্য আলোর এক অবিচল উৎস হয়ে থাকতে পারে ।

অ্যাডলফ হিটলার

দুর্গ, ল্যান্ডসবার্গ, লেক নদীর তীরে, ১৬
অক্টোবর, ১৯২৪

Machine Translated by Google

টম আই

গণনা

Machine Translated by Google

অধ্যায় ১

আমার বাবা-মায়ের বাড়িতে

আজ বোঝা গেল , ভাগ্য আমার জন্য কতটা সৌভাগ্যজনক ছিল যে সে ব্রাউনাউকেই বেছে নিয়েছিল। আমার জন্মস্থানের আরেকটি জায়গা। এই ছোট শহরটি ঠিক দুটি রাষ্ট্রের সীমান্তে অবস্থিত , যাদের পুনর্মিলন— অন্তত আমাদের মতো তরুণ প্রজন্মের কাছে—এমন একটি কাজ বলে মনে হয় , যার জন্য আমাদের জীবন উৎসর্গ করা উচিত এবং যার সাধনায় আমাদের সকল উপলব্ধ উপায় ব্যবহার করা উচিত ।

জার্মান অস্ট্রিয়াকে অবশ্যই মহান জার্মান পিতৃভূমিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এবং এই কোনো অর্থনৈতিক হিসাবের ভিত্তিতে নয়। না, না। এই মিলন যদি অর্থনৈতিকভাবে নগণ্য বা অসুবিধাজনকও হতো, তবুও তা হওয়া উচিত । একই রক্তের মানুষেরা একই রাইখের অন্তর্ভুক্ত হবে। জার্মান জনগণের ঔপনিবেশিক নীতিতে লিপ্ত হওয়ার কোনো অধিকার থাকবে না , যতক্ষণ না তারা তাদের সকল সন্তানকে এক রাষ্ট্রে একত্রিত করছে । কেবল তখনই বিদেশি ভূখণ্ড জয় করার প্রয়োজন থেকে একটি নৈতিক অধিকার জন্মাবে, যখন রাইখের ভূখণ্ড সমস্ত জার্মানকে অন্তর্ভুক্ত করবে এবং তাদের জীবনধারণের উপকরণ জোগাতে অক্ষম হয়ে পড়বে । তখন লাঙলই হবে তরবারি; এবং যুদ্ধের অশ্রু ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রুটি উৎপাদন করবে।

আর তাই এই ছোট্ট সীমান্ত শহরটি আমার কাছে এক মহান কর্তব্যের প্রতীক বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু অন্যভাবে এটি এমন এক শিক্ষার দিকেও ইঙ্গিত করে যা আমাদের বর্তমান সময়েও প্রযোজ্য। একশ বছরেরও বেশি আগে, এই বিচ্ছিন্ন স্থানটি এক মর্মান্তিক বিপর্যয়ের সাক্ষী ছিল, যা সমগ্র জার্মান জাতিকে প্রভাবিত করেছিল এবং যা অন্তত জার্মান ইতিহাসের পাতায় চিরকালের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমাদের মাতৃভূমির চরম অবমাননার সময়ে , বই বিক্রেতা ইয়োহানেস পাম, একজন আপোষহীন জাতীয়তাবাদী এবং ফরাসিদের শত্রু, এখানে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, কারণ তাঁর দুর্ভাগ্য ছিল গভীরভাবে ভালোবাসার ।
জার্মানি। তিনি তার সহযোগীদের, বা বলা ভালো, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নাম প্রকাশ করতে একগুঁয়েভাবে অস্বীকার করেছিলেন , যারা এই ঘটনার জন্য প্রধানত দায়ী ছিলেন। লিও শ্লাগেটারের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছিল। শ্লাগেটারের মতোই, একজন সরকারি চর তাকেও ফরাসিদের কাছে ধরিয়ে দিয়েছিল । এই ঘটনায় অগসবার্গের পুলিশ প্রধানই কুখ্যাতি অর্জন করেন এবং এমন একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন যা পরবর্তীতে হের সেভারিং-এর শাসনামলে নবগঠিত জার্মান রাইখের কর্মকর্তারা অনুকরণ করেছিলেন ।

ইন নদীর তীরে অবস্থিত এই ছোট্ট শহরে , এক জার্মান শহীদের স্মৃতিতে ঘেরা , বাভারিয়ান রক্তের শহর হলেও অস্ট্রিয়ান রাষ্ট্রের শাসনাধীন এই শহরে, আমার বাবা-মা গত শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বাস করতেন। আমার বাবা একজন সরকারি কর্মচারী ছিলেন যিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তাঁর দায়িত্ব পালন করতেন । আমার মা সংসারের দেখাশোনা করতেন এবং ভালোবাসা ও যত্ন দিয়ে তাঁর সন্তানদের প্রতি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন । এই সময়ের কথা আমার খুব কমই মনে আছে , কারণ কয়েক বছর পরেই বাবাকে চলে যেতে হয়েছিল।

এই সীমান্ত শহরটিকে আমি খুব ভালোবাসতাম এবং ইন উপত্যকার আরও দক্ষিণে, অর্থাৎ জার্মানিরই পাসাউতে, একটি নতুন চাকরি নিয়েছিলাম।

সেই দিনগুলিতে, একজন সরকারি কর্মচারীর জন্য এটাই ছিল সাধারণ নিয়তি — পর্যায়ক্রমে এক পদ থেকে অন্য পদে বদলি হওয়া। পাসাউতে আসার অল্প কিছুদিন পরেই আমার বাবাকে লিনৎসে বদলি করা হয়, যেখানে তিনি অবশেষে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, এই প্রবীণ ভদ্রলোক কাজ থেকে বিরতি নিতে পারতেন ।

তিনি ছিলেন এক দরিদ্র কৃষকের ছেলে , এবং ছেলেবেলাতেই তিনি অস্থির হয়ে ওঠেন ও বাড়ি ছেড়ে চলে যান । মাত্র তেরো বছর বয়সে , তিনি তাঁর থলে গুছিয়ে নিজ বনভূমিবেষ্টিত এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। গ্রামবাসীদের বারণ সত্ত্বেও , যাঁরা 'অভিজ্ঞতা' থেকেই বলতে পারতেন, তিনি একটি পেশা শিখতে ভিয়েনায় চলে যান । এটা ছিল গত শতাব্দীর পঞ্চাশতম বছর। বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং মুখোমুখি হওয়াটা ছিল এক নির্মম অগ্নিপরীক্ষা।

এক অপরিচিত ব্যক্তির পকেটে তিন গিল্ডার নিয়ে। যখন তেরো বছর বয়সী ছেলেটি সতেরো বছর বয়সে পৌঁছালো এবং কারিগর হিসেবে তার শিক্ষানবিশি শেষ করলো , তখনও সে সন্তুষ্ট ছিলো না। আসলে,

Machine Translated by Google

বরং উল্টো। সেই সময়ের অবিরাম অর্থনৈতিক সংকট এবং নিত্যনৈমিত্তিক দারিদ্র্য ও কষ্ট তার পেশা ছেড়ে দিয়ে " আরও উচ্চতর কিছুর" জন্য চেষ্টা করার সংকল্পকে আরও দৃঢ় করেছিল। ছেলেবেলায় , তার নিজ গ্রামের ধর্মযাজকের পদটি তার কাছে মানবীয় সাফল্যের মাপকাঠিতে সর্বোচ্চ বলে মনে হয়েছিল; কিন্তু এখন বড় শহর তার সম্ভাবনাকে প্রসারিত করেছিল—যুবকটি একজন সরকারি কর্মচারীর মর্যাদাকেই সবকিছুর মধ্যে সর্বোচ্চ বলে মনে করত । এমন একজন মানুষের দৃঢ়তা নিয়ে, যার কষ্ট ও প্রতিকূলতা তাকে যৌবনের মাঝেই বয়স্ক করে তুলেছিল, সতেরো বছর বয়সী যুবকটি তার পরিকল্পনায় অবিচলভাবে লেগে রইল যতক্ষণ না সে জয়ী হলো। সে একজন সরকারি কর্মচারী হলো । প্রায় তেইশ বছর বয়সে সে সাফল্য অর্জন করে এবং যা হতে চেয়েছিল, তা-ই হয়ে ওঠে। এইভাবে, সে সেই প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছিল যা সে গরিব ছেলেবেলায় করেছিল— যতক্ষণ না সে "কিছু একটা" হচ্ছে, ততক্ষণ নিজ গ্রামে ফিরে না যাওয়ার প্রতিজ্ঞা।

সে তার লক্ষ্যে পৌঁছেছিল। কিন্তু গ্রামে এমন কেউ ছিল না যে তাকে ছোটবেলার কথা মনে রেখেছিল, এবং গ্রামটাই তার কাছে অচেনা হয়ে গিয়েছিল ।

অবশেষে , ছাপ্পান্ন বছর বয়সে তিনি কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়েছিলেন ; কিন্তু একদিনও অলস থাকতে পারতেন না । আপার অস্ট্রিয়ার ল্যামবাখ নামক ছোট বাণিজ্য শহরের উপকণ্ঠে তিনি একটি খামার কিনে নিজেই তার চাষাবাদ শুরু করলেন। এইভাবে, এক দীর্ঘ কর্মজীবনের শেষে , তিনি তাঁর বাবার জীবনে ফিরে এলেন।

এই সময়ে আমার নিজস্ব আদর্শ গড়ে উঠতে শুরু করে । আমি স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার দীর্ঘ পথে খোলা বাতাসে প্রচুর সময় কাটাতাম এবং সবচেয়ে দুরন্ত ছেলেদের সাথে মিশতাম, যা আমার মাকে অনেকবার দুশ্চিন্তায় ফেলেছিল। এই সবকিছুর ফলে আমি ঘরকুনো স্বভাবের ঠিক বিপরীত হয়ে উঠলাম। পেশা বেছে নেওয়ার ব্যাপারে আমি তেমন কোনো গুরুত্বই দিইনি ; কিন্তু আমার বাবা যে ধরনের পেশা বেছে নিয়েছিলেন, তা সমর্থন করার থেকে আমি নিশ্চিতভাবেই অনেক দূরে ছিলাম। আমার মনে হয়, কথা বলার একটি সহজাত প্রতিভা আমার মধ্যে বিকশিত হতে শুরু করে এবং সঙ্গীদের সাথে আমার কমবেশি জোরালো আলোচনার মধ্য দিয়ে তা আকার লাভ করে। আমি এক কিশোর দলনেতা হয়ে উঠি, যে স্কুলে খুব ভালোভাবে ও সহজে শিখত কিন্তু যাকে সামলানো বেশ কঠিন ছিল। অবসর সময়ে আমি ল্যামবাখ মঠের গির্জার গায়কদলে গান গাওয়ার অনুশীলন করতাম, এবং এভাবেই আমি নিজেকে এমন এক অনুকূল অবস্থানে খুঁজে পাই যেখান থেকে বারবার আনুষ্ঠানিক যাজক সম্প্রদায়ের জাঁকজমকপূর্ণ আড়ম্বরে আবেগগতভাবে মুগ্ধ হওয়া যায় । একজন সাধারণ যাজকের পদকে যেমন সর্বোচ্চ মানবিক আদর্শের প্রতিনিধি বলে মনে হতো, ঠিক তেমনই মঠাধ্যক্ষকে সর্বোচ্চ মানবিক আদর্শের প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচনা করার চেয়ে স্বাভাবিক আর কী হতে পারত!

আমার বাবা তাঁর নিজের ছেলেবেলায় ? আসলে , এই ভাবনাটা তো কিছুদিন আমারই ছিল।
সেই সময়। কিন্তু বাবার সাথে আমার কৈশোরের তর্কাতর্কিগুলো তাঁর ছেলের বাগ্মিতাকে এমনভাবে মূল্যায়ন করতে শেখায়নি যা এই ধরনের পেশার জন্য অনুকূল সম্ভাবনা দেখায়, এবং স্বাভাবিকভাবেই সেই সময়ে আমার মনে থাকা ছেলেমানুষি ধারণাগুলো তিনি বুঝতে পারেননি। আমার চরিত্রের এই বৈপরীত্য তাঁকে কিছুটা অস্বস্তিতে ফেলেছিল।

প্রকৃতপক্ষে, পেশার প্রতি এই ক্ষণস্থায়ী আকাঙ্ক্ষা শীঘ্রই আমার স্বভাবের সাথে আরও মানানসই আশার জন্ম দিল। বাবার বইয়ের পাতা ওল্টাতে গিয়ে আমার চোখে পড়ল সামরিক বিষয়ের ওপর লেখা কিছু প্রকাশনা । এই প্রকাশনাগুলোর মধ্যে একটি ছিল ১৮৭০-৭১ সালের ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধের একটি জনপ্রিয় ইতিহাস। এটি ছিল সেই সময়ের একটি সচিত্র সাময়িকীর দুটি খণ্ডের সংকলন। এটি আমার প্রিয় পাঠ্য হয়ে উঠল। অল্প সময়ের মধ্যেই, এই মহান ও বীরত্বপূর্ণ সংঘাতটি আমার মনে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে শুরু করল। এবং সেই সময় থেকে , যুদ্ধ বা সামরিক বিষয়ের সাথে কোনোভাবে সম্পর্কিত যেকোনো কিছুর প্রতি আমার উৎসাহ ক্রমশ বাড়তে লাগল।

কিন্তু ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধের এই ইতিহাসটি আমার কাছে অন্যান্য দিক থেকেও একটি বিশেষ অর্থ বহন করত। প্রথমবারের মতো, এবং সেই সময়ে কেবল সাধারণভাবেই ,
প্রশ্নটি হলো: এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী জার্মান এবং অন্যান্য জার্মানদের মধ্যে কি কোনো পার্থক্য আছে—এবং যদি থাকে, তবে সেই পার্থক্যটা কী ? অস্ট্রিয়া কেন অংশ নেয়নি ? আমার বাবা এবং বাকি সবাই কেন এই সংগ্রামে অংশ নেননি? আমরা কি অন্যান্য জার্মানদের মতোই নই ? আমরা সবাই কি জার্মানির অন্তর্ভুক্ত নই ?

তখন, প্রথমবারের মতো, এই সমস্যাটা আমার ছোট্ট মাথায় নাড়া দিতে শুরু করল । আর খুব ইতস্তত করে করা আমার প্রশ্নগুলোর যে উত্তর পেলাম, তা মেনে নিতে আমি বাধ্য হলাম।

Machine Translated by Google

যদিও প্রচ্ছন্ন ঈর্ষার সাথে, এই সত্যটি যে সকল জার্মান বিসমার্কের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মতো সৌভাগ্যবান ছিল না। এই ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারতাম না।

সিদ্ধান্ত হলো যে আমি পড়াশোনা করব। আমার সামগ্রিক চরিত্র , বিশেষ করে আমার স্বভাব বিবেচনা করে , বাবা সিদ্ধান্ত নিলেন যে উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ানো চিরাচরিত বিষয়গুলো আমার সহজাত প্রতিভার সঙ্গে মানানসই নয় । তিনি ভেবেছিলেন যে একটি সত্যিকারের স্কুল [Realschule2) আমার জন্য আরও উপযুক্ত হবে। ছবি আঁকায় আমার সুস্পষ্ট প্রতিভা তাঁর বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করেছিল; তাঁর মতে, অস্ট্রিয়ার গ্রামার স্কুলগুলোতে ছবি আঁকা একটি অত্যন্ত অবহেলিত বিষয় ছিল। সম্ভবত তাঁর নিজের কঠিন পথচলার স্মৃতিও এর একটি কারণ ছিল।

এর ফলেই তিনি ধ্রুপদী অধ্যয়নকে অবাস্তব এবং সেই কারণে নিজের কাছে মূল্যহীন বলে মনে করতেন । মনের গভীরে তিনি ভাবতেন যে তাঁর ছেলেরও হওয়া উচিত
সরকারি কর্মচারী । প্রকৃতপক্ষে, তিনি আমার জন্য এমনই একটি পেশা বেছে নিয়েছিলেন। নিজের কর্মজীবনে যে সমস্ত প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল , তা তাঁকে তাঁর কৃতিত্বকে অতিমূল্যায়ন করতে প্ররোচিত করেছিল , কারণ সেগুলি ছিল কেবল তাঁর অক্লান্ত শক্তি এবং অধ্যবসায়ের ফল। যে মানুষটি সবকিছুর জন্য নিজের কাছে ঋণী, তাঁর সেই স্বভাবগত গর্ব তাঁকে এই ধারণার দিকে ঠেলে দিয়েছিল যে তাঁর ছেলেরও একই পেশা অনুসরণ করা উচিত এবং সম্ভব হলে আরও উচ্চ পদে উন্নীত হওয়া উচিত ।

তার চেয়ে ভালো অবস্থানে । অধিকন্তু , এই ধারণাটি এই বক্তব্যের দ্বারা আরও জোরদার হয়েছিল যে, তার জীবনের অধ্যবসায়ের ফলে তিনি এমন একটি অবস্থানে পৌঁছেছেন যার মাধ্যমে তিনি তার ছেলের একই পেশায় অগ্রগতি সহজতর করতে পারেন।

তিনি ভাবতেই পারেননি যে আমি তাঁর পুরো জীবনটাকেই ছুড়ে ফেলে দেব । আমার বাবার সিদ্ধান্ত ছিল সহজ, চূড়ান্ত, স্পষ্ট, এবং তাঁর চোখে এটা ছিল এক বিশেষ কিছু।
যা একটি উপহার হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। তাঁর মতো স্বভাবের একজন মানুষের পক্ষে, যিনি জীবনের কঠিন সংগ্রামের কারণে স্বৈরাচারী হয়ে উঠেছিলেন, 'অনভিজ্ঞ ' ও দায়িত্বজ্ঞানহীন তরুণদের নিজেদের পেশা বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া ছিল অকল্পনীয় । এই ধরনের একটি কাজ, যা তাঁর নিজের ছেলের ভবিষ্যৎকে অনিশ্চিত করে দিত, তা হতো পিতৃত্বের কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব পালনে এক গুরুতর এবং নিন্দনীয় দুর্বলতা, যা তাঁর স্বভাবগত কর্তব্যবোধের সঙ্গে সম্পূর্ণ বেমানান ।

তবুও এটাকে ভিন্ন হতে হতো।

আমার জীবনে প্রথমবারের মতো — তখন আমার বয়স এগারো বছর—আমি প্রকাশ্যে দ্বিমত পোষণ করতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমার বাবা তাঁর পরিকল্পনা ও মতামতকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টায় যতই কঠোর ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হোন না কেন, তাঁর ছেলেও মূল্যহীন বা গুরুত্বহীন বলে মনে হওয়া ধারণাগুলো গ্রহণ করতে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে কোনো অংশে কম একগুঁয়ে ছিল না।

আমি সরকারি চাকরিজীবী হব না । কোনো রকম

বোঝানো বা কঠোর সতর্কবাণী দিয়েও এই বিরোধিতা দূর করা যায়নি । আমি কোনো অবস্থাতেই সরকারি চাকরিজীবী হব না। নিজের কর্মজীবনের ছবি দেখিয়ে বাবা আমাকে এই পেশার প্রতি আগ্রহী করার যতবারই চেষ্টা করেছেন , তার ফল হয়েছে ঠিক উল্টো। এটা ভেবেই আমার গা গুলিয়ে উঠত যে, একদিন আমার নিজের সময়ের ওপর আর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না , বরং আমাকে সারা জীবন ফর্ম পূরণ করেই কাটাতে হবে ।

আপনি কল্পনা করতে পারেন, এমন একটি সম্ভাবনা এমন একজন যুবকের মনে কী ধরনের চিন্তার উদ্রেক করেছিল, যে কিনা তৎকালীন অর্থে কোনোভাবেই 'ভালো ছেলে' ছিল না। আমাদের দেওয়া হাস্যকরভাবে সহজ স্কুলের কাজগুলো আমাকে সুযোগ করে দিয়েছিল
ঘরের ভেতরের চেয়ে বাইরে অনেক বেশি সময় কাটাতাম । আজ, যখন আমার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা আমার জীবনকে খুঁটিয়ে দেখছে , সযত্নে বিশ্লেষণ করছে, অবশেষে প্রমাণ করার জন্য আমার ছেলেবেলায় ফিরে যাচ্ছে যে এই হিটলার তার যৌবনে কী লজ্জাজনক কৌশল অবলম্বন করেছিল, তখন আমি সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জানাই যে আমি সেই সুখের দিনগুলোর দিকে ফিরে তাকাতে পারি এবং সেগুলোকে সহায়ক হিসেবে স্মরণ করতে পারি । মাঠ আর জঙ্গলই ছিল তখনকার সেই স্থান, যেখানে সমস্ত বিবাদের নিষ্পত্তি হতো।

স্কুলে যাওয়া সত্ত্বেও আমার সময় কাটানোর ধরণ বদলাতে পারেনি । কিন্তু আমাকে আরও একটি যুদ্ধে জিততে হতো।

Machine Translated by Google

যতদিন আমাকে সরকারি চাকরিজীবী বানানোর বাবার পরিকল্পনাটি আমার নিজের পছন্দের সঙ্গে কেবল তাত্ত্বিকভাবেই সাংঘর্ষিক ছিল , ততদিন এই দ্বন্দ্বটা সহ্য করা সহজ ছিল। আমি হতে পারতাম
আমি আমার ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশে সংযত ছিলাম এবং এভাবেই বারবার চলতে থাকা আলোচনাগুলো এড়িয়ে চলতাম। সরকারি চাকরিজীবী না হওয়ার আমার নিজের সংকল্পই আমার মনকে শান্ত রাখার জন্য যথেষ্ট ছিল। আমি এই সংকল্পকে অদম্যভাবে আঁকড়ে ধরেছিলাম। কিন্তু পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে উঠল যখন আমার নিজের জন্য একটি ইতিবাচক পরিকল্পনা তৈরি হলো, যা আমি বাবাকে একটি পাল্টা প্রস্তাব হিসেবে পেশ করতে পারতাম। এটা ঘটেছিল যখন আমার বয়স বারো । কীভাবে এটা হয়েছিল, তা এখন আমি ঠিক বলতে পারব না; কিন্তু একদিন আমার কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে আমি একজন চিত্রকর হব —অর্থাৎ, একজন শিল্পী। আমার যে আঁকার প্রতি ঝোঁক ছিল, তা একটি জানা কথাই ছিল। এমনকি এই কারণেই বাবা আমাকে রিয়েলস্কুলে পাঠিয়েছিলেন; কিন্তু তিনি কখনও এই প্রতিভাকে এমনভাবে বিকশিত করার কথা ভাবেননি যা আমাকে একজন পেশাদার চিত্রকর হতে সাহায্য করবে। বরং ঠিক তার উল্টো। যখন আমি তার পছন্দের পরিকল্পনাটি বারবার প্রত্যাখ্যান করার ফলে তিনি আমাকে প্রথমবারের মতো জিজ্ঞাসা করলেন যে আমি আসলে কী হতে চাই, তখন আমার মনে আগে থেকে তৈরি করা সংকল্পটি প্রায় স্বয়ংক্রিয়ভাবেই প্রকাশ হয়ে গেল । এক মুহূর্তের জন্য আমার বাবা বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন । "চিত্রকর? শিল্পী চিত্রকর?" তিনি বিস্ময়ে বলে উঠলেন।

তিনি ভাবছিলেন আমি মানসিকভাবে সুস্থ কিনা । তিনি ভেবেছিলেন, হয়তো তিনি আমার কথাগুলো ঠিকমতো শোনেননি , কিংবা ভুল বুঝেছেন । কিন্তু যখন আমি তাকে আমার ধারণাগুলো ব্যাখ্যা করলাম এবং তিনি দেখলেন আমি সেগুলোকে কতটা গুরুত্বের সাথে নিচ্ছি, তখন তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ চরম দৃঢ়তার সাথে সেগুলোর বিরোধিতা করলেন। তাঁর সিদ্ধান্তটি ছিল অত্যন্ত সরল, এবং আমার প্রকৃত স্বাভাবিক যোগ্যতা বিবেচনা করেও তা পরিবর্তন করা যেত না ।

শিল্পী! যতদিন আমি বেঁচে থাকব, কখনোই না। যেহেতু ছেলেটি তার নিজের গুণাবলীর পাশাপাশি বাবার কিছুটা অনমনীয়তাও উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল, আমার উত্তরটাও ছিল সমান জোরালো। কিন্তু সেটা ছিল অন্যরকম।
একদম উল্টো।

আমরা এক অচলাবস্থায় এসে পড়লাম। আমার বাবা তাঁর 'কখনোই না!' মনোভাব বদলাতে রাজি ছিলেন না, আর আমিও ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়ছিলাম । আমার "তবুও!" কথাটির ব্যাপারে আমি ক্রমশ আরও বেশি নিশ্চিত হয়ে উঠলাম ।

স্বাভাবিকভাবেই, যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো তা ছিল অপ্রীতিকর। বৃদ্ধ ভদ্রলোক ভীষণভাবে বিরক্ত হলেন; এবং অবশ্যই, আমিও তাই , যদিও আমি তাঁকে মন থেকে ভালোবাসতাম। আমার বাবা আমাকে পেশা হিসেবে ছবি আঁকার কোনো আশাই পোষণ করতে বারণ করে দিলেন। আমি আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে ঘোষণা করলাম যে, অন্য কিছু পড়ারও আমার কোনো ইচ্ছা নেই । এই ধরনের ঘোষণার ফলে পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠল, এবং বৃদ্ধ ভদ্রলোক যেকোনো মূল্যে তাঁর পিতৃত্বের কর্তৃত্ব রক্ষা করার জন্য অটলভাবে সংকল্পবদ্ধ হলেন। এর ফলে আমি সতর্ক নীরবতার মনোভাব গ্রহণ করলাম , কিন্তু আমার হুমকি তখনও কার্যকর ছিল। আমি ভেবেছিলাম যে, যখন বাবার কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে আমি রিয়ালস্কুলে কোনো উন্নতি করতে পারছি না , তখন অনুরোধে বা হুমকিতে, তিনি আমাকে আমার স্বপ্নের সফল কর্মজীবন অনুসরণ করার অনুমতি দিতে বাধ্য হবেন।

আমি ঠিকভাবে হিসাব করেছিলাম কি না, জানি না। স্কুলে আমার অগ্রগতির অভাবটা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল । আমি সেইসব বিষয় নিয়ে পড়তাম যেগুলো আমার ভালো লাগত, বিশেষ করে যেগুলো আমি পরে একজন চিত্রশিল্পী হিসেবে কাজে লাগাতে পারতাম । যে বিষয়গুলো সেই দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে হতো না , বা অন্য কোনো কারণে আমার ভালো লাগত না, সেগুলোকে আমি পুরোপুরি নষ্ট করে দিয়েছিলাম ।
সেই সময় থেকে আমার স্কুলের ফলাফল বিষয় এবং সেটির প্রতি আমার আগ্রহের ওপর নির্ভর করে সবসময়ই খুব ভালো বা খুব খারাপ হতো। এক কলামে আমার যোগ্যতা থাকতো "খুব ভালো" বা "চমৎকার"। অন্যটিতে, "সন্তোষজনক" বা এমনকি " সন্তোষজনকের চেয়েও খারাপ"। নিঃসন্দেহে, আমার সেরা বিষয় ছিল ভূগোল, এবং সম্ভবত তার চেয়েও বেশি, বিশ্ব ইতিহাস।

এই দুটি ছিল আমার প্রিয় বিষয় এবং এগুলোতে আমি ক্লাসের সেরা ছিলাম।

যখন আমি এতগুলো বছর পেছনে ফিরে তাকাই এবং এই অভিজ্ঞতাগুলোর ফলাফল বিচার করার চেষ্টা করি , আমার মনে দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভেসে ওঠে ।

প্রথমে, আমি জাতীয়তাবাদী হয়েছিলাম।

দ্বিতীয়ত, আমি ইতিহাসের প্রকৃত অর্থ বুঝতে ও উপলব্ধি করতে শিখলাম।

প্রাচীন অস্ট্রিয়া ছিল একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র। অন্তত সেই দিনগুলিতে, জার্মান রাইখের নাগরিকরা মোটেই বুঝতে পারতেন না যে, এই ধরনের একটি রাষ্ট্রের ব্যক্তিদের দৈনন্দিন জীবনে এই বাস্তবতার কী অর্থ দাঁড়ায় । বিজয়ের সেই জাঁকজমকপূর্ণ শোভাযাত্রার পর,

Machine Translated by Google

ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধে, রাইখের অভ্যন্তরের জার্মানরা তাদের সীমান্তের বাইরের জার্মানদের থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল, যার আংশিক কারণ ছিল এই যে , তারা এই অন্য জার্মানদের প্রকৃত মূল্য অনুধাবন করতে অনিচ্ছুক ছিল , অথবা সহজভাবে বললে , তারা তা করতে অক্ষম ছিল।

রাইখের জার্মানরা বুঝতে পারেনি যে, অস্ট্রিয়ার জার্মানরা যদি সর্বোত্তম জাতিগত বংশোদ্ভূত না হয়, তবে তারা কখনোই ৫২-এর উপর তাদের চরিত্রের ছাপ ফেলতে পারবে না।
দশ লক্ষ মানুষের সাম্রাজ্য এতটাই সুনিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে জার্মানিতে এই ধারণা জন্মায়—যদিও তা ছিল সম্পূর্ণ ভ্রান্ত— যে অস্ট্রিয়া একটি জার্মান রাষ্ট্র। এটি ছিল এমন এক ভুল যার পরিণতি হয়েছিল ভয়াবহ; কিন্তু একই সাথে এটি ছিল এই পূর্বাঞ্চলীয় অভিযানে থাকা এক কোটি জার্মানের চরিত্রের এক মহান সাক্ষ্য । ৩) রাইখের খুব কম সংখ্যক জার্মানই এ ব্যাপারে ধারণা রাখত যে, এই পূর্ব জার্মানদের তাদের জার্মান ভাষা, জার্মান বিদ্যালয় এবং জার্মান চরিত্র রক্ষার জন্য প্রতিদিন কী তিক্ত সংগ্রাম করতে হতো । কেবল আজ, যখন মর্মান্তিক নিয়তি আমাদের কয়েক মিলিয়ন স্বদেশবাসীকে রাইখ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এক বিদেশী শাসনের অধীনে থাকতে বাধ্য করেছে, যখন তারা এক অভিন্ন মাতৃভূমির স্বপ্ন দেখে যার প্রতি তারা তাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা নিবদ্ধ করে এবং অন্তত তাদের মাতৃভাষা ব্যবহারের পবিত্র অধিকারকে সমুন্নত রাখার জন্য লড়াই করে —কেবল তখনই জার্মান জনগণের বৃহত্তর অংশ বুঝতে পেরেছে যে নিজের ভাষার ঐতিহ্যের জন্য লড়াই করতে বাধ্য হওয়ার অর্থ কী।

এবং পরিশেষে, হয়তো এখানে-সেখানে এমন কিছু মানুষ আছেন যারা সেই জার্মান চেতনার মহত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারেন, যা সুদূর পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্তকে উজ্জীবিত করেছিল এবং এই জাতিকে সম্পূর্ণ নিজেদের চেষ্টায় কয়েক শতাব্দী ধরে প্রাচ্যের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যকে রক্ষা করতে এবং তারপর এক ক্ষয়িষ্ণু গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে জার্মান ভাষার সীমানা দৃঢ়ভাবে বজায় রাখতে সক্ষম করেছিল; এমন এক সময়ে যখন জার্মান সাম্রাজ্য উপনিবেশ নিয়ে অত্যন্ত আগ্রহী ছিল, কিন্তু তার দোরগোড়ায় থাকা আপন রক্ত-মাংসের মানুষদের নিয়ে নয় ।

প্রাচীন অস্ট্রিয়ায় সংঘটিত ভাষাগত সংগ্রামেও ঠিক তাই ঘটেছিল, যা সর্বদা ও সর্বত্র, সব ধরনের সংগ্রামে ঘটে থাকে। সেখানে তিনটি দল ছিল—যোদ্ধা, দখলদার এবং বিশ্বাসঘাতক। এমনকি বিদ্যালয়গুলোতেও এই ধরনের বাছাই পর্ব শুরু হয়েছিল । এবং এটি লক্ষণীয় যে , ভাষার জন্য এই সংগ্রাম সম্ভবত বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেই তার সবচেয়ে তিক্ত রূপ ধারণ করেছিল ; কারণ এটিই ছিল সেই চারাগাছ, যেখানে বীজগুলোকে জল দিয়ে বড় করে পরবর্তী প্রজন্ম গঠন করতে হতো। এই সংগ্রামের কৌশলগত লক্ষ্য ছিল শিশুদের আকৃষ্ট করা , এবং তাদের উদ্দেশ্যেই প্রথম জোরালো আহ্বান জানানো হয়েছিল: "জার্মান যুবক, ভুলে যেও না যে তুমি জার্মান" এবং "মনে রেখো, ছোট্ট মেয়ে, একদিন তোমাকে একজন জার্মান মা হতে হবে।"

যারা তারুণ্যের চেতনা সম্পর্কে কিছু জানেন , তারা বুঝবেন যে তরুণরা সবসময়ই এই ধরনের জয়ধ্বনি শুনতে আগ্রহী থাকে । নানা দিক থেকে , তরুণরাই এই লড়াইয়ের নেতৃত্ব দিয়েছিল, নিজেদের মতো করে এবং নিজেদের অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করেছিল। তারা অ-জার্মান গান গাইতে অস্বীকার করেছিল। জার্মানির প্রতি তাদের আনুগত্য থেকে তাদের বিচ্যুত করার প্রচেষ্টা যতই বাড়ত , তারা ততই তাদের জার্মান বীরদের মহিমা কীর্তন করত। তারা খাবার কেনা সীমিত রাখত , যাতে যুদ্ধের প্রচেষ্টায় তাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের সাহায্য করার জন্য কিছু পয়সা বাঁচাতে পারে । তাদের অ-জার্মান শিক্ষকরা যা বলতেন তা বোঝার ব্যাপারে তারা ছিল অবিশ্বাস্যভাবে সজাগ, এবং তারা সর্বসম্মতিক্রমে তাদের বিরোধিতা করত। তারা নিজেদের দেশের নিষিদ্ধ প্রতীকগুলো পরিধান করত এবং এর জন্য শাস্তি পেতেও খুশি ছিল, এমনকি যদি তার অর্থ শারীরিক শাস্তিও হয়। ক্ষুদ্রাকারে, তারা ছিল আনুগত্যের এমন প্রতিচ্ছবি, যা থেকে বয়স্করা শিক্ষা নিতে পারত।

সুতরাং , তুলনামূলকভাবে অল্প বয়সেই আমি পুরোনো অস্ট্রিয়ায় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর নিজেদের মধ্যেকার সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে শুরু করি । জার্মান ইস্ট মার্ক লীগ এবং স্কুল লীগের সভাগুলোতে আমরা আমাদের আনুগত্য প্রকাশ করার জন্য কালো, লাল ও সোনালি রঙের পোশাক পরতাম এবং ফুল মাথায় দিতাম। আমরা একে অপরকে "হাইল!" বলে অভিবাদন জানাতাম এবং অস্ট্রিয়ার জাতীয় সঙ্গীতের পরিবর্তে, সতর্কবাণী ও শাস্তি সত্ত্বেও আমাদের নিজেদের গান "ডয়েচলান্ড উবার আলেস" গাইতাম । এইভাবে তরুণদের রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করা হতো এমন এক সময়ে, যখন তথাকথিত জাতি-রাষ্ট্রের নাগরিকরা ভাষা ছাড়া তাদের জাতীয়তা সম্পর্কে মূলত কিছুই জানত না।

অবশ্যই, আমি তাদের মধ্যে ছিলাম না যারা আড়ালে থাকত। অল্প সময়ের মধ্যেই আমি একজন কট্টর 'জার্মান জাতীয়তাবাদী' হয়ে উঠলাম, যার অর্থ আজকের দিনে এই শব্দটির সাথে যুক্ত দলীয় পরিচয়ের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল ।

Machine Translated by Google

খুব দ্রুতই আমার মধ্যে জাতীয়তাবাদী প্রবণতা গড়ে ওঠে এবং পনেরো বছর বয়সের মধ্যেই আমি বংশীয় দেশপ্রেম ও কোনো জাতি বা জনগোষ্ঠীর ধারণার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা জাতীয়তাবাদের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে সক্ষম হয়েছিলাম – আমি পুরোপুরি দ্বিতীয়টির পক্ষেই ঝুঁকেছিলাম।

যারা হ্যাবসবার্গ রাজতন্ত্রে বিরাজমান অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি অধ্যয়নের কষ্ট স্বীকার করেননি, তাদের কাছে এই ধরনের পছন্দ স্পষ্টভাবে বোধগম্য নাও হতে পারে ।

অস্ট্রিয়ার বিদ্যালয়গুলোতে পড়ানো সাধারণ ইতিহাসের মধ্যে প্রকৃত অস্ট্রিয়ান ইতিহাস সম্পর্কে খুব কমই আলোচনা করা হতো। এই রাষ্ট্রের ভাগ্য সমগ্র জার্মানির অস্তিত্ব ও বিকাশের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল; ইতিহাসকে জার্মান ও অস্ট্রিয়ান ইতিহাসে বিভক্ত করা কার্যত দুর্বোধ্য হতো। প্রকৃতপক্ষে, জার্মানি যখন এই দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে বিভক্ত হতে শুরু করে, কেবল তখনই জার্মান ইতিহাসের এই ধরনের বিভাজন ঘটতে শুরু করে ।

প্রতীকচিহ্ন [৪)] ভিয়েনায় এখনও সংরক্ষিত প্রাক্তন সাম্রাজ্যিক সার্বভৌমত্বকে, ঐক্যের চিরন্তন বন্ধনের দৃশ্যমান নিশ্চয়তার চেয়ে বরং এক জাদুকরী ধ্বংসাবশেষ হিসেবেই বেশি মনে হতো।

১৯১৮ সালে হ্যাবসবার্গ রাষ্ট্রের পতন ঘটলে , অস্ট্রিয়ান জার্মানরা সহজাতভাবেই তাদের জার্মান মাতৃভূমির সাথে একীভূত হওয়ার জন্য আর্তনাদ করে ওঠে। এটি ছিল তাদের পূর্বপুরুষদের সেই অবিস্মরণীয় গৃহে ফিরে যাওয়ার জন্য সমগ্র জাতির হৃদয়ের এক সর্বসম্মত আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি। কিন্তু এই সাধারণ আকাঙ্ক্ষার কারণ হিসেবে শুধুমাত্র অস্ট্রিয়ান জার্মানদের ব্যক্তিগত ঐতিহাসিক শিক্ষাকে দায়ী করে ব্যাখ্যা করা যায় না । এখানে এমন এক ঝর্ণা রয়েছে যা কখনো শুকিয়ে যায় না। বিশেষ করে উন্মাদনা ও বিস্মৃতির সময়ে , এর শান্ত স্বর অতীতের কথা মনে করিয়ে দিত, যা মানুষকে ক্ষণিকের সমৃদ্ধির ঊর্ধ্বে এক নতুন ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে উদ্বুদ্ধ করত ।

তথাকথিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে বিশ্ব ইতিহাসের পাঠদান এখনও অত্যন্ত অসন্তোষজনক। খুব কম শিক্ষকই উপলব্ধি করেন যে, ইতিহাস শেখানোর উদ্দেশ্য তারিখ ও তথ্য মুখস্থ করা নয়; এবং শিক্ষার্থীরাও এসব জানতে আগ্রহী নয়।

কোনো যুদ্ধের সঠিক তারিখ বা অমুক সেনাপতির জন্মতারিখ নিয়ে তার কোনো আগ্রহ নেই, এবং তার পূর্বপুরুষদের মুকুট কখন কোনো সম্রাটের কপালে পরানো হয়েছিল , তা জানার ব্যাপারে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই —কিংবা থাকলেও তা খুবই নগণ্য। এটাকে নিশ্চিতভাবেই কোনো গুরুতর বিষয় বলে মনে হয় না ।

ইতিহাস সম্পর্কে জানার অর্থ হলো সেই শক্তিগুলোকে খুঁজে বের করা ও আবিষ্কার করা, যা আমাদের চোখের সামনে ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে আবির্ভূত হওয়া ফলাফলসমূহ সৃষ্টি করে । পড়া ও অধ্যয়নের শিল্প হলো অপরিহার্য বিষয়গুলো মনে রাখা এবং বাকিটা ভুলে যাওয়া।

আমার পুরো ভবিষ্যৎ জীবন সম্ভবত এই কারণেই নির্ধারিত হয়েছিল যে, আমার এমন একজন ইতিহাস অধ্যাপক ছিলেন যিনি হাতেগোনা কয়েকজনের মধ্যে একজন, যিনি শিক্ষাদান ও পরীক্ষার ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গিটিকে প্রতিষ্ঠা করতে জানতেন । এই শিক্ষক ছিলেন লিনৎস রিয়ালস্কুলের ডক্টর লিওপোল্ড পোয়েটস। উপরে উল্লিখিত অর্থে একজন ইতিহাস শিক্ষকের জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যবোধের তিনি ছিলেন এক নিখুঁত প্রতিমূর্তি । দৃঢ় স্বভাবের কিন্তু দয়ালু হৃদয়ের এই বয়স্ক ভদ্রলোক অত্যন্ত আকর্ষণীয় বক্তা ছিলেন এবং নিজের উৎসাহ দিয়ে আমাদের অনুপ্রাণিত করতে পারতেন ।

আজও আমি আবেগাপ্লুত না হয়ে পারি না সেই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বকে, যাঁর ইতিহাসের উৎসাহব্যঞ্জক ব্যাখ্যা প্রায়শই আমাদের বর্তমানকে পুরোপুরি ভুলিয়ে দিত এবং যেন জাদুবলে অতীতে নিয়ে যেত।

হাজার হাজার বছরের কুয়াশার মধ্য দিয়ে মৃত অতীতের ঐতিহাসিক স্মৃতিকে জীবন্ত স্মৃতিতে রূপান্তরিত করেছে।
বাস্তবতা। যখন আমরা তা শুনতাম , আমরা উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতাম এবং কখনও কখনও চোখে জলও চলে আসত।

তাছাড়া , অধ্যাপকের শুধু বর্তমানের উদাহরণ দিয়ে অতীতকে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতাই ছিল না , বরং অতীত থেকে বর্তমানের জন্য শিক্ষা গ্রহণ করারও ক্ষমতা ছিল । আমাদের মনে ঘুরপাক খাওয়া দৈনন্দিন সমস্যাগুলো তিনি অন্য সবার চেয়ে ভালো বুঝতেন । আমাদের মধ্যে যে জাতীয় আবেগ ছিল, তিনি সেটিকে আমাদের শিক্ষার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতেন , কারণ তিনি প্রায়শই আমাদের জাতীয় সম্মানবোধকে নাড়া দিতেন; এভাবে তিনি অন্য যেকোনো উপায়ের চেয়ে অনেক সহজে শৃঙ্খলা বজায় রাখতেন এবং আমাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতেন । এমন একজন অধ্যাপক পাওয়ার কারণেই ইতিহাস আমার প্রিয় বিষয় হয়ে উঠেছিল।

Machine Translated by Google

স্বাভাবিকভাবেই, কিন্তু আমার অধ্যাপকের সচেতন সম্মতি ছাড়াই, আমি ঠিক তখনই একজন তরুণ বিদ্রোহী হয়ে উঠলাম। কিন্তু এমন একজন শিক্ষকের অধীনে জার্মান ইতিহাস অধ্যয়ন করে কে-ই বা এমন একটি রাষ্ট্রের শত্রু না হয়ে থাকতে পারে , যার শাসকেরা জার্মান জাতির ভাগ্যের উপর এমন বিধ্বংসী প্রভাব বিস্তার করেছিল? সর্বোপরি , হ্যাবসবার্গ রাজবংশের প্রতি অনুগত প্রজা হয়ে থাকাই বা কী করে সম্ভব , যাদের অতীত ইতিহাস এবং বর্তমান আচরণ প্রমাণ করেছে যে তারা হীন ব্যক্তিগত স্বার্থের নামে জার্মান জনগণের স্বার্থের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে সর্বদা এবং সর্বত্র প্রস্তুত ? আমরা তরুণ বয়সে কি পুরোপুরি উপলব্ধি করিনি যে, হ্যাবসবার্গ রাজবংশের আমাদের জার্মানদের প্রতি কোনো ভালোবাসা ছিল না, এবং থাকতেও পারত না?

হ্যাবসবার্গ রাজবংশের নীতি সম্পর্কে ইতিহাস আমাদের যা শিখিয়েছে, তা আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার দ্বারাই প্রমাণিত হয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণে, বহিরাগত জাতিদের বিষ আমাদের জাতির শরীরকে ক্ষয় করে দিচ্ছিল, এমনকি ভিয়েনাও ক্রমশ অ-জার্মান হয়ে উঠছিল । 'রাজকীয় রাজবংশ' প্রতিটি সুযোগেই চেকদের পছন্দ করত ।

অবশেষে, চিরন্তন ন্যায়বিচার ও অমোঘ প্রতিশোধের দেবীর হস্ত মৃত্যু ডেকে আনল।
অস্ট্রিয়ায় জার্মানবাদের সবচেয়ে জঘন্য শত্রু ছিলেন আর্চডিউক ফ্রানৎস ফার্দিনান্দ। তিনি নিজেই যে গুলি চালাতে সাহায্য করেছিলেন, সেই গুলিতেই তিনি নিহত হন । সর্বোপরি, অস্ট্রিয়াকে একটি স্লাভিক রাষ্ট্রে পরিণত করার আন্দোলনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তিনিই ।

জার্মান জনগণের কাঁধে চাপানো বোঝা ছিল বিশাল এবং অর্থ ও রক্তের যে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল তা ছিল অবিশ্বাস্যরকম ভারী।

কিন্তু যিনি পুরোপুরি অন্ধ ছিলেন না, তিনি দেখতে পেতেন যে এ সবই বৃথা ছিল। সবচেয়ে তিক্ত বিষয় হলো, আমরা জানতাম যে জার্মানির সঙ্গে মৈত্রীর দ্বারা সমগ্র ব্যবস্থাটি নৈতিকভাবে সুরক্ষিত ছিল, যার ফলে পুরোনো অস্ট্রিয়ান রাজতন্ত্রে জার্মানবাদের ধীর বিলুপ্তি যেন স্বয়ং জার্মানি দ্বারাই অনুমোদিত বলে মনে হচ্ছিল। হ্যাবসবার্গদের ভণ্ডামি—যারা প্রকাশ্যে জনগণকে বোঝানোর চেষ্টা করত যে অস্ট্রিয়া এখনও একটি জার্মান রাষ্ট্র— রাজপরিবারের বিরুদ্ধে ঘৃণার অনুভূতিকে তীব্রতর করেছিল এবং একই সাথে বিদ্রোহ ও অবজ্ঞার মনোভাবকে উস্কে দিয়েছিল।

কিন্তু জার্মান রাইখে, যারা এর শাসক ছিল, তারা এসবের অর্থ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। যেন অন্ধত্বে আক্রান্ত হয়ে , তারা মৃতদেহটির পাশে দাঁড়িয়ে এর পচনকে নবজীবনের লক্ষণ হিসেবে ব্যাখ্যা করছিল। নবীন জার্মান সাম্রাজ্য এবং অলীক অস্ট্রিয়ান রাষ্ট্রের মধ্যকার এই দুর্ভাগ্যজনক মৈত্রীর মধ্যেই নিহিত ছিল বিশ্বযুদ্ধের সূচনা এবং এর চূড়ান্ত পতন।

এই বইয়ের পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে আমি সমস্যার মূলে যাব । এটুকু বলাই যথেষ্ট যে
এই যে, আমার যৌবনের একেবারে প্রথম দিকেই আমি কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম যা আমি কখনও পরিত্যাগ করিনি। অধিকন্তু , বছর গড়ানোর সাথে সাথে আমি সেগুলোর সত্যতা সম্পর্কে আরও বেশি করে নিশ্চিত হয়েছিলাম । সেগুলো ছিল: জার্মানির প্রতিরক্ষার জন্য অস্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি একটি পূর্বশর্ত ছিল; আরও, জাতীয়তাবাদী অনুভূতি কোনোভাবেই রাজবংশীয় দেশপ্রেমের সমতুল্য নয়; পরিশেষে এবং সর্বোপরি, হ্যাবসবার্গ বংশ জার্মান জাতির উপর দুর্ভাগ্য বয়ে আনতে নিয়তি নির্ধারিত ছিল।

এই উপসংহারগুলোর যৌক্তিক পরিণতিস্বরূপ আমার অন্তরে আমার জার্মান অস্ট্রিয়ার প্রতি এক জ্বলন্ত ভালোবাসা এবং অস্ট্রীয় রাষ্ট্রের প্রতি এক গভীর ঘৃণা জন্মালো ।

স্কুলে ইতিহাস পড়ার সময় আমার মধ্যে যে ধরনের ঐতিহাসিক চিন্তাভাবনা গড়ে উঠেছিল, তা আমাকে কখনো ছেড়ে যায়নি। বিশ্ব ইতিহাস সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনা, অর্থাৎ রাজনীতি বোঝার এক ক্রমবর্ধমান অফুরন্ত উৎস হয়ে উঠেছিল । তাই আমি রাজনীতি 'শিখিনি ' , বরং রাজনীতিকেই আমাকে শেখানোর সুযোগ দিয়েছি।

শিল্পকলায় আমি যেমন একজন অপরিণত বিপ্লবী ছিলাম , রাজনীতিতেও ঠিক তেমনই ছিলাম । সেই সময় আপার অস্ট্রিয়ার প্রাদেশিক রাজধানীতে একটি থিয়েটার ছিল, যা তুলনামূলকভাবে বেশ ভালো ছিল। সেখানে প্রায় সবকিছুই মঞ্চস্থ হতো। বারো বছর বয়সে আমি 'উইলিয়াম টেল'-এর মঞ্চায়ন দেখেছিলাম। সেটাই ছিল থিয়েটারের সাথে আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। এর কয়েক মাস পর , আমি 'লোহেনগ্রিন' দেখতে যাই— আমার শোনা প্রথম অপেরা । বায়রয়েথের এই মহান শিল্পীর প্রতি আমার তরুণ বয়সের উচ্ছ্বাসের কোনো সীমা ছিল না। আমি তাঁর অপেরাগুলো বারবার শুনতাম; এবং আজ আমি এটিকে একটি বড় আশীর্বাদ হিসেবে দেখি যে একটি ছোট প্রাদেশিক শহরে এই সাদামাটা প্রযোজনাগুলো মঞ্চস্থ হয়েছিল।

Machine Translated by Google

স্থানীয় শহরটি আমার জন্য পথ প্রস্তুত করেছিল এবং পরবর্তীতে আমাকে আরও ভালো সৃষ্টি উপলব্ধি করতে সক্ষম করেছিল ।

কিন্তু এই সবকিছু আমার বাবার বেছে নেওয়া পেশার প্রতি আমার গভীর বিতৃষ্ণাকে আরও তীব্র করে তুলেছিল; এবং এই বিতৃষ্ণা বিশেষভাবে প্রবল হয়ে ওঠে যখন যৌবনের রুক্ষতার ধারগুলো ভোঁতা হতে শুরু করে —যে প্রক্রিয়াটি আমার ক্ষেত্রে আমাকে অনেক যন্ত্রণা দিয়েছিল।
আমি ক্রমশই নিশ্চিত হয়ে যাচ্ছিলাম যে, সরকারি কর্মচারী হিসেবে আমি কখনোই সুখী হতে পারব না । আর এখন, যখন রিয়েলস্কুলে আমার আঁকার প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিল, আমার সংকল্প আরও দৃঢ় হলো। অপমান আর হুমকির আর তা বদলানোর কোনো সুযোগ ছিল না । আমি একজন চিত্রশিল্পী হতে চেয়েছিলাম, এবং পৃথিবীর কোনো শক্তিই আমাকে জোর করতে পারত না।

সরকারি কর্মচারী হওয়া । আমার বর্তমান পরিস্থিতির একমাত্র বিশেষত্ব ছিল এই যে , বয়স বাড়ার সাথে সাথে স্থাপত্যের প্রতি আমার আগ্রহ ক্রমশ বাড়তে থাকে। আমি এটাকে একজন চিত্রশিল্পী হিসেবে আমার প্রতিভার একটি স্বাভাবিক সম্প্রসারণ বলে মনে করতাম এবং আমার শৈল্পিক আগ্রহের পরিধি এভাবে প্রসারিত হওয়ায় আমি আনন্দিত ছিলাম। আমার কোনো ধারণাই ছিল না যে একদিন সবকিছু অন্যরকম হতে হবে ।

আমার কর্মজীবনের বিষয়টি আমার প্রত্যাশার চেয়ে অনেক দ্রুত স্পষ্ট হয়ে উঠল ।
যখন আমার বয়স তেরো, বাবা হঠাৎ আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। তিনি তখনও সুস্থ ও সবল ছিলেন, যখন একটি স্ট্রোক যন্ত্রণাহীনভাবে তাঁর পার্থিব যাত্রার অবসান ঘটায় এবং তিনি মারা যান, আমাদের সবাইকে গভীর অনাথ করে রেখে। তাঁর সবচেয়ে বড় ইচ্ছা ছিল ছেলেকে কর্মজীবনে উন্নতি করতে সাহায্য করা এবং এর মাধ্যমে আমাকে সেই কঠিন পরিস্থিতি থেকে বাঁচানো যা তিনি নিজে সহ্য করেছিলেন। তখন তাঁর মনে হয়েছিল যে তাঁর সমস্ত ইচ্ছাই বৃথা গেছে। এবং যদিও তিনি তা জানতেন না , তিনি এমন এক ভবিষ্যতের বীজ বপন করছিলেন যা আমরা কেউই তখন কল্পনা করতে পারিনি।

প্রথমে , বাহ্যিকভাবে কোনো পরিবর্তন হয়নি ।
আমার মা বাবার ইচ্ছানুযায়ী আমার পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়াকে নিজের কর্তব্য বলে মনে করতেন , যার অর্থ ছিল তিনি আমাকে একজন সরকারি কর্মচারী হিসেবে গড়ে তোলার প্রশিক্ষণ চালিয়ে যাবেন । অন্যদিকে, আমি আগের চেয়েও বেশি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম যে কোনো অবস্থাতেই আমি সরকারি কর্মচারী হব না । উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি আমার আদর্শ থেকে এতটাই বিচ্যুত ছিল যে আমি সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ , অসুস্থতা আমার সহায় হলো। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই , এটি আমার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে দিল এবং একটি পুরনো পারিবারিক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাল । আমার ফুসফুস এতটাই গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল যে ডাক্তার আমার মাকে জোরালোভাবে পরামর্শ দিয়েছিলেন যেন কোনো অবস্থাতেই আমাকে অফিসের কাজ করতে না দেওয়া হয় । তিনি আমাকে রিয়েলস্কুলে অন্তত এক বছরের জন্য পড়াশোনা স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন। যা আমি এতদিন ধরে গোপনে চেয়েছিলাম এবং যার জন্য এত জেদ ধরে লড়াই করেছিলাম, তা প্রায় এক ঝটকায় বাস্তবে পরিণত হলো।

আমার অসুস্থতার কারণে মা আমাকে রিয়েলস্কুল ছেড়ে একাডেমিতে ভর্তি হতে দিতে রাজি হয়েছিলেন ।

সেই দিনগুলো ছিল সুখের , প্রায় স্বপ্নের মতো; দুর্ভাগ্যবশত, তা কেবল স্বপ্নই থেকে গেল। দুই বছর পর , আমার মায়ের মৃত্যু আমার সমস্ত সুন্দর পরিকল্পনাগুলোর নির্মম পরিসমাপ্তি ঘটায় । তিনি এক দীর্ঘ ও যন্ত্রণাদায়ক রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন, যে রোগ থেকে সেরে ওঠার আশা শুরু থেকেই প্রায় ছিলই না। প্রত্যাশিত হলেও , তাঁর মৃত্যু ছিল এক ভয়াবহ আঘাত। আমি বাবাকে শ্রদ্ধা করতাম, কিন্তু মাকে ভালোবাসতাম।

দারিদ্র্য ও কঠোর বাস্তবতা আমাকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছিল।
আমার মায়ের গুরুতর অসুস্থতার কারণে পরিবারের সামান্য সম্পদ প্রায় পুরোপুরি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল । অনাথ হিসেবে আমি যে হাতখরচ পেতাম, তা জীবনের কঠিন চাহিদা মেটানোর জন্য যথেষ্ট ছিল না। যেভাবেই হোক, আমাকে নিজের রুটি-রোজগার নিজেকেই করতে হতো।
স্যুটকেসে জামাকাপড় ও অন্যান্য জিনিসপত্র গুছিয়ে, আর হৃদয়ে অদম্য সংকল্প নিয়ে আমি ভিয়েনার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। পঞ্চাশ বছর আগে আমার বাবা যেমনটা করেছিলেন, আমিও ভাগ্যকে রুখে দিতে চেয়েছিলাম। আমি ‘কেউ একজন’ হওয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম —কিন্তু কোনোভাবেই সরকারি কর্মচারী নয় ।

Machine Translated by Google

পাদটীকা:

১) মাইন কাম্ফ-এর এই উল্লেখ এবং পরবর্তী অংশগুলিতে থাকা অনুরূপ উল্লেখগুলি বোঝার জন্য , নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে :

১৭৯২ থেকে ১৮১৪ সালের মধ্যে ফরাসি বিপ্লবী বাহিনী জার্মানি দখল করে। ১৮০০ সালে, হোহেনলিন্ডেনের যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার পরাজয়ে বাভারিয়াও অংশীদার হয় এবং ফরাসিরা মিউনিখ দখল করে। ১৮০৫ সালে, নেপোলিয়ন বাভারিয়ার ইলেক্টরকে বাভারিয়ার রাজা হিসেবে নিযুক্ত করেন এবং তাকে ৩০,০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী দিয়ে নেপোলিয়নের সমস্ত যুদ্ধে তাকে সমর্থন করতে বাধ্য করেন।
এইভাবে , বাভারিয়া ফ্রান্সের একচ্ছত্র করদ রাজ্যে পরিণত হলো । এটি ছিল " জার্মানির গভীরতম অপমানের সময় ," যে ঘটনাটির কথা হিটলার বারবার উল্লেখ করেন।
১৮০৬ সালে দক্ষিণ জার্মানিতে "জার্মানির গভীরতম অপমান" শিরোনামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল। যারা এই পুস্তিকাটি বিতরণে সহায়তা করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন...
তিনি ছিলেন নুরেমবার্গের একজন বই বিক্রেতা, ইয়োহানেস ফিলিপ পাম। বাভারিয়ার একজন পুলিশ এজেন্ট তাকে ফরাসিদের কাছে ধরিয়ে দেয় । বিচারের সময় তিনি লেখকের নাম প্রকাশ করতে অস্বীকার করেন। নেপোলিয়নের আদেশে, ১৮০৬ সালের ২৬শে আগস্ট ব্রাউনাউ আম ইন-এ তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের স্থানে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভটি ছিল প্রথম বস্তুগুলোর মধ্যে একটি যা ছোটবেলায় হিটলারকে মুগ্ধ করেছিল।

লিও শ্লাগেটারের ঘটনাটি অনেক দিক থেকে ইয়োহানেস পামের ঘটনার অনুরূপ ছিল। শ্লাগেটার ছিলেন একজন জার্মান ধর্মতত্ত্বের ছাত্র, যিনি ১৯১৪ সালে স্বেচ্ছায় সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। তিনি একজন গোলন্দাজ কর্মকর্তা হন এবং উভয় শ্রেণিতেই আয়রন ক্রস লাভ করেন । ১৯২৩ সালে ফরাসিরা যখন রুহর দখল করে , তখন শ্লাগেটার জার্মানদের মধ্যে অহিংস প্রতিরোধ সংগঠিত করতে সাহায্য করেন। তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা ফ্রান্সে কয়লা পরিবহন বাধাগ্রস্ত করার জন্য একটি রেলসেতু উড়িয়ে দেন ।

একজন জার্মান গুপ্তচর জড়িতদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন । শ্লাগেটার সম্পূর্ণ দায়ভার গ্রহণ করেন এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, অন্যদিকে একটি ফরাসি আদালত তার সঙ্গীদের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড ও কঠোর শ্রমের শাস্তি দেয় । শ্লাগেটার সেতুটি উড়িয়ে দেওয়ার আদেশদাতার নাম প্রকাশ করতে অস্বীকার করেন এবং আদালতে কোনো করুণা ভিক্ষা করেননি । ১৯২৩ সালের ২৬শে মে একটি ফরাসি ফায়ারিং স্কোয়াড তাকে গুলি করে হত্যা করে । সে সময় সেভেরিং ছিলেন জার্মানির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী । তিনি শ্লাগেটারের মামলায় হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করেন।

রুহর অঞ্চলে ফরাসি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে জার্মান প্রতিরোধের এক প্রধান শহীদ এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়ক হয়ে ওঠেন শ্লাগেটার । তিনি আন্দোলনের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে যোগদান করেন, তার সদস্যপদ কার্ড নম্বর ছিল ৬১।

২) অ-শাস্ত্রীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়। উচ্চ বিদ্যালয় এবং নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় শাস্ত্রীয় বা অর্ধ-শাস্ত্রীয় ছিল। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো ।

৩) ভূমিকা দেখুন।

৪) নেপোলিয়নের নির্দেশে দ্বিতীয় ফ্রান্সিস যখন জার্মান জাতির পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাটের উপাধি ত্যাগ করেন , তখন রাজকীয় প্রতীক হিসেবে মুকুট ও রাজদণ্ড ভিয়েনায় জমা রাখা হয়েছিল । ১৮৭১ সালে প্রথম ভিলহেলম কর্তৃক জার্মান রাইখ পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর, প্রতীকগুলো বার্লিনে স্থানান্তরের দাবি জানানো হয়েছিল, কিন্তু সেই দাবিগুলোর কোনো উত্তর দেওয়া হয়নি। অস্ট্রিয়ার সংযুক্তির পর হিটলার সেগুলো জার্মানিতে নিয়ে আসেন এবং ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বরে নুরেমবার্গে পার্টি কংগ্রেসে প্রদর্শন করেন ।

Machine Translated by Google

অধ্যায় ২

ভিয়েনায় বছরের পর বছর পড়াশোনা ও দুর্ভোগ

যখন আমার মা মারা গেলেন, একটা ব্যাপারে আমার ভাগ্য আগেই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। তাঁর অসুস্থতার শেষ মাসগুলোতে আমি চারুকলা একাডেমির প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে ভিয়েনায় গিয়েছিলাম । স্কেচের এক বিশাল প্যাকেট সঙ্গে নিয়ে আমি আত্মবিশ্বাসী ছিলাম যে আমি পাশ করব।

আমি বেশ সহজেই পরীক্ষায় পাশ করেছিলাম। রিয়েলস্কুলে আমি আমার ক্লাসের সেরা অঙ্কন শিক্ষার্থী ছিলাম , এবং তখন থেকে অঙ্কনে আমি সাধারণের চেয়েও বেশি উন্নতি করেছি । তাই নিশ্চিত সাফল্যের সম্ভাবনায় আমি আত্মতৃপ্ত, গর্বিত এবং আনন্দিত ছিলাম।

কিন্তু একটা উদ্বেগ ছিল: মনে হচ্ছিল, চিত্রকলার চেয়ে অঙ্কনে আমার ঝোঁক বেশি , বিশেষ করে স্থাপত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। একই সাথে , স্থাপত্যের প্রতি আমার আগ্রহও ক্রমাগত বাড়ছিল। ভিয়েনায় আমার প্রথম দুই সপ্তাহের সফরের পর এই দিকে আমার অগ্রগতি আরও দ্রুতগতিতে হয়েছিল। আমার বয়স তখনো ষোলো হয়নি। আমি হফ মিউজিয়ামের আর্ট গ্যালারিতে ছবি দেখতে গিয়েছিলাম ; কিন্তু ভবনটিই আমার প্রায় সমস্ত মনোযোগ কেড়ে নিয়েছিল; ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত আমি বিভিন্ন সরকারি ভবন ঘুরে আমার সমস্ত সময় কাটিয়েছি। আমি অপেরা এবং সংসদের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতাম। পুরো রিংস্ট্রাস আমার উপর এক জাদুকরী প্রভাব ফেলেছিল, যেন তা আরব্য রজনীর কোনো দৃশ্য ।

আর এখন আমি দ্বিতীয়বারের মতো এই সুন্দর শহরে এসেছিলাম , অধীর আগ্রহে প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছিলাম , কিন্তু গর্বের সাথে নিশ্চিত ছিলাম যে আমি পাশ করেছি। আমি সাফল্য নিয়ে এতটাই নিশ্চিত ছিলাম যে আমার প্রত্যাখানের খবরটা আমার কাছে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো এসে লাগলো। কিন্তু আসল ঘটনা ছিল, আমি ফেল করেছিলাম । আমি রেক্টরের কাছে গেলাম এবং চিত্রকলা বিদ্যালয়ে আমাকে ছাত্র হিসেবে ভর্তি না করার কারণ জানতে চাইলাম, যেটি ছিল সেখানকারই একটি অংশ।

একাডেমি। তিনি আমাকে বললেন যে, আমি সাথে যে স্কেচগুলো এনেছিলাম, তা থেকে এটা স্পষ্ট যে ছবি আঁকা আমার জন্য উপযুক্ত নয়, কিন্তু সেই একই স্কেচগুলো আমার স্থাপত্য দক্ষতারও স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছিল। তাই, ছবি আঁকার স্কুলের প্রশ্নই ওঠে না , বরং স্থাপত্যের স্কুলই ভরসা, যা একাডেমিরই একটি অংশ ছিল । প্রথমে এটা বোঝা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল , কারণ আমি কখনো কোনো স্থাপত্য স্কুলে যাইনি এবং স্থাপত্য নকশার ওপর কোনো নির্দেশনাও পাইনি ।

শিলার স্কোয়ারের হ্যানসেন প্যালেস থেকে বেরিয়ে এসে আমি পুরোপুরি হতাশ হয়েছিলাম। আমার এই সংক্ষিপ্ত জীবনে প্রথমবারের মতো আমি নিজের প্রতি অসন্তুষ্ট বোধ করলাম। আমার সামর্থ্য সম্পর্কে যা শুনলাম, তা যেন ছিল বিদ্যুৎ চমকের মতো , যা আমার সেই দ্বৈত সত্তাকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দিল, যে সত্তায় আমি দীর্ঘকাল ধরে ভুগছিলাম, কিন্তু যার কারণ সম্পর্কে আমার কাছে তখন পর্যন্ত কোনো ব্যাখ্যা ছিল না।

কিছুদিন পরেই আমি বুঝে গিয়েছিলাম যে আমার স্থপতি হওয়া উচিত। কিন্তু পথটা ছিল অবশ্যই খুব কঠিন। রিয়েলস্কুলে কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি আমার অবহেলা ও তাচ্ছিল্যের জন্য আমাকে তীব্রভাবে অনুশোচনা করতে হয়েছিল। স্থাপত্য বিদ্যালয়ে প্রবেশের আগে একটি নির্মাণ কারিগরি বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করা আবশ্যক ছিল ; কিন্তু এই বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য উচ্চ মাধ্যমিকের ডিপ্লোমা প্রয়োজন ছিল । আর সেটা আমার কাছে ছিল না। মানবিক মানদণ্ডে , শৈল্পিক পেশা বেছে নেওয়ার আমার স্বপ্নটা অকল্পনীয় বলে মনে হচ্ছিল ।

আমার মায়ের মৃত্যুর পর , আমি তৃতীয়বারের মতো ভিয়েনায় গিয়েছিলাম। এই সফরটিই শেষ হওয়ার কথা ছিল। বেশ কয়েক বছর। যেহেতু আমি আগেও এখানে এসেছিলাম , তাই আমি আমার আগের স্থিরতা ও দৃঢ়সংকল্প ফিরে পেলাম। আমার পুরোনো আত্মবিশ্বাস ফিরে এল, এবং আমার দৃষ্টি আমার লক্ষ্যের দিকে নিবদ্ধ হলো । আমি একজন স্থপতি হব । জীবনের পথে বাধা আসে পরাজিত করার জন্য নয় , বরং অতিক্রম করার জন্য। আর আমি এই বাধাগুলো অতিক্রম করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম, সর্বদা আমার বাবার কথা মনে রাখতাম , যিনি গ্রামের এক গরিব মুচির ছেলে হয়েও নিজের চেষ্টায় একজন সরকারি কর্মকর্তার পদে উন্নীত হয়েছিলেন। আমার শুরুটা আরও ভালো ছিল এবং সুযোগও ছিল ...

Machine Translated by Google

ভাগ্যের সাথে সংগ্রামও ছিল আরও তীব্র। তখন আমার ভাগ্য আমার কাছে কঠিন মনে হয়েছিল; কিন্তু আজ আমি দেখি এর মধ্যেই রয়েছে বিধাতার প্রজ্ঞা । নিয়তি আমাকে তার হাতে তুলে নিয়েছিল এবং প্রায়শই পরাজয়ের হুমকি দিত; কিন্তু বাধা বাড়ার সাথে সাথে আমার ইচ্ছাশক্তিও দৃঢ়তর হয়েছিল , এবং অবশেষে সেই ইচ্ছাশক্তিরই জয় হয়েছিল।

আমি আমার জীবনের সেই সময়টার জন্য কৃতজ্ঞ , কারণ তা আমাকে শক্তি যুগিয়েছে এবং আজকের মতো শক্তিশালী হতে সক্ষম করেছে। আমি আরও বেশি কৃতজ্ঞ, কারণ আমি এই বিষয়টি উপলব্ধি করি যে, তা আমাকে এক সহজ জীবনের শূন্যতা থেকে বাঁচিয়েছিল । যদিও আমি সেই সময়ে বিদ্রোহ করেছিলাম
এই নিয়তিকে অত্যন্ত কঠিন বলে মনে না করে, আমি কৃতজ্ঞ যে আমাকে দুঃখ-কষ্ট ও দারিদ্র্যের জগতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল এবং এর ফলেই আমি সেই মানুষগুলোর সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম, যাদের জন্য আমি পরবর্তীকালে লড়াই করেছিলাম।

* * *

এই সময়ে আমার চোখ খুলে গিয়েছিল এমন দুটি বিপদের প্রতি , যাদের নাম আমি তার আগে প্রায় জানতামই না, এবং জার্মান জাতির অস্তিত্বের জন্য যাদের ভয়াবহ তাৎপর্য সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই ছিল না । এই দুটি বিপদ ছিল মার্কসবাদ এবং ইহুদিবাদ।

অনেকের কাছে ভিয়েনা নিষ্পাপ আনন্দের প্রতীক , সুখী মানুষদের জন্য এক আনন্দময় স্থান । দুর্ভাগ্যবশত, আমার কাছে এটি আমার জীবনের সবচেয়ে দুঃখের সময়ের এক জীবন্ত স্মৃতি। এই শহরে দারিদ্র্যের পাঁচ বছর । যে পাঁচ বছর ধরে, প্রথমে দিনমজুর হিসেবে, এবং পরে তুচ্ছ জিনিসের চিত্রকর হিসেবে আমাকে আমার জীবিকা নির্বাহ করতে হয়েছিল।

আর সেই পরিমাণটা ছিল সত্যিই খুব সামান্য, আমার সারাক্ষণের ক্ষুধা মেটানোর জন্যও যথেষ্ট ছিল না। এই ক্ষুধা ছিল এক বিশ্বস্ত অভিভাবক, যে আমাকে কখনো ছেড়ে যেত না, বরং আমার প্রতিটি কাজে অংশ নিত। আমার কেনা প্রতিটি বইয়ের অর্থ ছিল ক্ষুধার নতুন করে জেগে ওঠা, আর অপেরায় প্রতিটি সফরের অর্থ ছিল পরবর্তী দিনগুলোতে এই অবিচ্ছেদ্য সঙ্গীর অনুপ্রবেশ। আমি আমার এই সহানুভূতিহীন বন্ধুর সাথে সবসময় যুদ্ধরত ছিলাম। সেই সময়ে , আমি আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি শিখেছিলাম । আমার স্থাপত্যবিদ্যার পড়াশোনা এবং অপেরায় সেই বিরল সফরগুলো ছাড়া, যার জন্য আমাকে খাবার ত্যাগ করতে হতো, বই ছাড়া আমার জীবনে আর কোনো আনন্দ ছিল না।

তখন আমি প্রচুর পড়াশোনা করতাম এবং যা পড়তাম তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতাম । কাজের পর আমার সমস্ত অবসর সময় আমি শুধু পড়াশোনাতেই ব্যয় করতাম। এইভাবে, বেশ কয়েক বছর ধরে আমি এমন এক জ্ঞানভাণ্ডার অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলাম, যা আমি আজও দরকারি বলে মনে করি।

কিন্তু শুধু এটুকুই নয়। সেই বছরগুলোতে, পৃথিবী ও জীবনকে দেখার একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি আমার মনে গড়ে উঠেছিল । এটাই আমার আচরণের ইস্পাত-কঠিন ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়। তারপর থেকে, আমি এই ভিত্তিকে খুব সামান্যই প্রসারিত করেছি এবং এর কোনো কিছুই পরিবর্তন করিনি।

বরং আমি আজ গভীরভাবে বিশ্বাস করি যে, সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন ব্যক্তির সৃজনশীল চিন্তার ভিত্তি তার যৌবনেই নিহিত থাকে , এই সৃজনশীল চিন্তা যেখানেই থাকুক না কেন।
আমি বার্ধক্যের প্রজ্ঞা —যা কেবল দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে অর্জিত গভীরতা ও দূরদর্শিতা থেকেই আসতে পারে —এবং যৌবনের সৃজনশীল প্রতিভার মধ্যে একটি পার্থক্য করেছি ; যৌবনের সৃজনশীল প্রতিভা ধারণার এক অসাধারণ ভাণ্ডার নিয়ে পরিপূর্ণ, যা তার প্রাচুর্যের কারণে তাৎক্ষণিকভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে না। এগুলোই ভবিষ্যতের নির্মাণ সামগ্রী ও পরিকল্পনা গঠন করে ; বয়স এগুলো থেকে পাথর নিয়ে অট্টালিকা নির্মাণ করে, যতক্ষণ না বার্ধক্যের তথাকথিত প্রজ্ঞা যৌবনের সৃজনশীল প্রতিভাকে শ্বাসরুদ্ধ করে দেয়।

* * *

বাবা-মায়ের সাথে বাড়িতে আমি যে জীবন কাটাচ্ছিলাম, তা এর থেকে ভিন্ন ছিল না।
অন্য সবার কাছ থেকে প্রায় কিছুই না। আমি নির্ভয়ে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়েছিলাম এবং আমাকে দুশ্চিন্তা করতে হয়নি।
সামাজিক সমস্যার মতো বিষয়গুলির সাথে মোকাবিলা করতে । যাদের মধ্যে আমি আমার যৌবনের দিনগুলি কাটিয়েছি, তারা ক্ষুদ্র বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল । তাই, এটি এমন একটি জগৎ ছিল যার প্রকৃত কায়িক শ্রমিকদের জগতের সাথে খুব কমই যোগাযোগ ছিল । যদিও প্রথমে এটি অদ্ভুত মনে হতে পারে , এই শ্রেণীটিকে পৃথককারী ব্যবধান , যা কোনোভাবেই পরিবেশগতভাবে-

Machine Translated by Google

কায়িক শ্রমিক শ্রেণি থেকে আসা নামমাত্র সচ্ছল হওয়ার বিষয়টি প্রায়শই মানুষের ধারণার চেয়েও গভীর হয়।

এই বিভাজনের কারণ, যাকে আমরা প্রায় শত্রুতা বলতে পারি , তা হলো সেই সামাজিক গোষ্ঠীর ভয় যারা কায়িক শ্রমিকের স্তর থেকে সবেমাত্র উপরে উঠেছে—তাদের পুরোনো অবস্থানে ফিরে যাওয়ার বা শ্রমিকদের শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ভয়। অধিকন্তু, এই নিম্নবর্গের সাংস্কৃতিক দারিদ্র্য এবং তাদের অমার্জিত আচরণের কথা স্মরণ করাটাও বেশ বিরক্তিকর ; যারা সামাজিক সিঁড়ির প্রথম ধাপে উঠে এসেছেন , তারা যে সাংস্কৃতিক স্তর ও জীবনযাত্রার মান থেকে উঠে এসেছেন, তার সংস্পর্শে আসতে বাধ্য হওয়াটা অসহনীয় মনে করেন ।

প্রায়শই দেখা যায় যে, যারা সত্যিই তথাকথিত উচ্চবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত , তাদের পক্ষে নব্য ধনীদের চেয়ে সর্বনিম্ন সামাজিক স্তরে নেমে এসে তাদের সমকক্ষদের সাথে মিশে যাওয়া অনেক সহজ হয় । ' নব্য ধনী ' বলতে আমি এমন ব্যক্তিকে বোঝাই, যিনি নিজের প্রচেষ্টায় তার পূর্বের সামাজিক স্তরের চেয়ে উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়েছেন । এই ধরনের ব্যক্তির ক্ষেত্রে, তার কঠিন সংগ্রাম প্রায়শই তার স্বাভাবিক মানবিক সহানুভূতিকে ধ্বংস করে দেয় । তার নিজের অস্তিত্বের সংগ্রাম পেছনে ফেলে আসা মানুষদের দুর্ভাগ্যের প্রতি তার সংবেদনশীলতাকে মেরে ফেলে।

সেই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, ভাগ্য আমার প্রতি সদয় ছিল। পরিস্থিতি আমাকে দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার সেই জগতে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল , যেখান থেকে আমার বাবা উঠে এসেছিলেন।
আমার জীবনের শুরুর দিনগুলোতে; এবং এখান থেকেই আমার সংকীর্ণ, ক্ষুদ্র-বুর্জোয়া শিক্ষার ঠুলি আমার চোখ থেকে ছিঁড়ে গিয়েছিল। এখন, প্রথমবারের মতো, আমি মানুষকে চিনতে শিখছিলাম, যাদের বাহ্যিক রূপ অন্তঃসারশূন্য বা পাশবিক আচরণ এবং তাদের প্রকৃত অন্তরের স্বরূপের মধ্যে পার্থক্য করতে শিখছিলাম ।

* * *

শতাব্দীর শুরুতেই ভিয়েনা এমন শহরগুলোর মধ্যে নিজের স্থান করে নিয়েছিল , যেখানে সামাজিক অবস্থা ছিল চরম অন্যায্য। চোখ ধাঁধানো ঐশ্বর্য এবং জঘন্য দারিদ্র্য এক সুস্পষ্ট বৈপরীত্যে মিশে গিয়েছিল । শহরের কেন্দ্রস্থলে এবং শহরের অভ্যন্তরে বায়ান্ন মিলিয়ন জনসংখ্যার এক সাম্রাজ্যের স্পন্দন অনুভব করা যেত , যা ছিল বহু জাতিগোষ্ঠী দ্বারা গঠিত একটি রাষ্ট্রের সমস্ত বিপজ্জনক আকর্ষণে পরিপূর্ণ। রাজসভার চোখ ধাঁধানো জাঁকজমক সমগ্র সাম্রাজ্যের সম্পদ ও বুদ্ধিমত্তার জন্য চুম্বকের মতো কাজ করত। এবং এই আকর্ষণ রাজবংশীয় ব্যবস্থার দ্বারা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল।

হ্যাবসবার্গ রাজতন্ত্রের সবকিছু নিজের মধ্যে এবং নিজের জন্য কেন্দ্রীভূত করার নীতি ।
ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর এই মিশ্রণকে একত্রিত রাখার জন্য এই কেন্দ্রীভূত নীতিটি প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু এর ফলে এমন একটি শহরে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের এক অস্বাভাবিক সমাবেশ ঘটে , যা একই সাথে একটি মহানগর এবং রাজকীয় বাসস্থান ছিল।

কিন্তু ভিয়েনা কেবল রাজতন্ত্রের রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কেন্দ্রই ছিল না; এটি বাণিজ্যেরও একটি কেন্দ্র ছিল। উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা, সরকারি কর্মচারী , শিল্পী এবং বিজ্ঞানীদের ভিড়ের পাশাপাশি সেখানে শ্রমিকদের আরও বিশাল এক ভিড় ছিল। অভিজাত এবং বণিক শ্রেণীর সম্পদের বিপরীতে ছিল চরম দারিদ্র্য । রিংস্ট্রাসের প্রাসাদগুলোর সামনে হাজার হাজার বেকার অলসভাবে ঘুরে বেড়াত ; এবং পুরোনো অস্ট্রিয়ার এই বিজয়-পথের নিচে, গৃহহীনরা খালের অন্ধকার ও নোংরা পরিবেশে গাদাগাদি করে থাকত।

সম্ভবত ভিয়েনা ছাড়া জার্মানির অন্য কোনো শহরে সামাজিক সমস্যাগুলো এত ভালোভাবে বোঝা যেত না। কিন্তু এখানে আমি এই ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে চাই যে, এই সমস্যাটিকে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত 'অধ্যয়ন' করা সম্ভব ।
যে ব্যক্তি এই বিধ্বংসী বিষধর সাপের কবলে কখনো পড়েনি, সে কখনোই জানতে পারবে না এর বিষ কী।

এই সমস্যাটিকে অন্য কোনোভাবে বোঝার চেষ্টা করলে তা কেবল অগভীর কথাবার্তা এবং ভাবালুতার বিভ্রমের জন্ম দেবে। উভয় পদ্ধতিই ক্ষতিকর । প্রথমটি, কারণ
সমস্যার মূলে কখনোই পৌঁছানো যায় না, দ্বিতীয়টি কারণ এটি সমস্যাটিকে পুরোপুরি এড়িয়ে যায় । আমি জানি না কোনটি বেশি ঘৃণ্য: সামাজিক কষ্টকে উপেক্ষা করা, যেমনটা ভাগ্যের কৃপায় পাওয়া বেশিরভাগ মানুষ করে থাকে , নাকি যারা নিজেদের পরিশ্রমে সামাজিক মর্যাদায় উপরে উঠেছে।

Machine Translated by Google

অথবা সেইসব মানুষের দেখানো সমান উদ্ধত এবং প্রায়শই কৌশলীহীন, কিন্তু সর্বদা মহৎ, নম্রতা, যাদের দয়ালু হওয়ার একটি ক্ষণস্থায়ী শখ আছে এবং যারা 'মানুষকে বোঝে' বলে নিজেদের গর্ব করে । অবশ্যই, এই ধরনের ব্যক্তিরা তাদের সহজাত বোধশক্তির অভাবে কল্পনার চেয়েও বেশি পাপ করে। আর তাই তারা এটা দেখে অবাক হয় যে তাদের 'সামাজিক সংবেদনশীলতা ', যা নিয়ে তারা গর্ব করে, তা কখনোই কোনো ফল দেয় না, বরং প্রায়শই তাদের সদিচ্ছা প্রত্যাখ্যাত হয়; আর তখন তারা মানুষের অকৃতজ্ঞতার কথা বলে ।

এই ধরনের মানুষেরা ধীরে ধীরে শেখে যে, কেবলমাত্র সামাজিক কার্যকলাপের কোনো স্থান নেই এবং কৃতজ্ঞতা আশা করা উচিত নয় ; সুতরাং, এখানে সম্পদ বণ্টনের কোনো সমস্যা নেই , বরং প্রশ্নটি হলো প্রতিশোধমূলক ন্যায়বিচারের। এইমাত্র উল্লিখিত উপায়ে সামাজিক সমস্যাটি অধ্যয়ন করার প্রলোভন থেকে আমি সুরক্ষিত ছিলাম , তার সহজ কারণ হলো আমি দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের মধ্যে বাস করতে বাধ্য হয়েছিলাম। সুতরাং , বিষয়টি বস্তুনিষ্ঠভাবে সমস্যাটি অধ্যয়ন করার ছিল না, বরং এর পরিণতিগুলো নিজে পরীক্ষা করে দেখার ছিল। যদিও

খরগোশটি পরীক্ষাটির কঠিন পরীক্ষা থেকে বেঁচে গেলেও, এটি তার নিরীহতার প্রমাণ হতে পারে না।

* * *

তখনকার স্মৃতিগুলো আজ স্মরণ করার চেষ্টা করলে আমি উপলব্ধি করি...
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, আমি কেবল আনুমানিকভাবেই এটি করতে পারব। এখানে আমি কেবল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছাপগুলো এবং যারা আমাকে ব্যক্তিগতভাবে প্রভাবিত করেছে ও প্রায়শই হতবাক করে দিয়েছে, তাদের কথাই বর্ণনা করব । এই অভিজ্ঞতা থেকে শেখা কয়েকটি পাঠের কথাও আমাকে উল্লেখ করতে হবে।

* * *

সেই সময়ে কাজ খুঁজে পাওয়া কঠিন ছিল না, কারণ আমাকে দক্ষ কারিগর হিসেবে নয়, বরং তথাকথিত ' কাজের লোক' হিসেবে কাজ খুঁজতে হতো ; কেবল দৈনন্দিন জীবিকা নির্বাহের জন্য যেকোনো ছোটখাটো কাজ করতে আমি প্রস্তুত থাকতাম।

সুতরাং, আমি নিজেকে সেই সমস্ত অভিবাসীদের মতোই একই পরিস্থিতিতে পেলাম যারা ঝেড়ে ফেলে
পায়ের পাতা থেকে ইউরোপের ধুলো ঝেড়ে, নতুন বিশ্বে এক নতুন জীবনের ভিত্তি স্থাপন এবং নিজেদের জন্য একটি নতুন আবাস অর্জনের ইস্পাত-কঠিন সংকল্প নিয়ে তারা এগিয়ে আসে। শ্রেণি ও পেশা, পরিবেশ ও ঐতিহ্যের সমস্ত পঙ্গুকারী কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে, তারা সাধ্যমতো যেকোনো সেবামূলক কাজ হাতে নেয়।
তাদের জন্য সুযোগের দরজা খোলা ছিল, তারা হাতের কাছে আসা যেকোনো কাজ গ্রহণ করত এবং ক্রমশ এই ব্যাপারে নিশ্চিত হচ্ছিল যে , কাজ যাই হোক না কেন, সৎ পরিশ্রম কখনো কারো জন্য লজ্জার কারণ হয় না । তাই আমি এই নতুন জগতে পা রাখার এবং নিজের পথ ধরে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

আমি দ্রুতই বুঝে গেলাম যে, কাজ সবসময়ই পাওয়া যায় , কিন্তু এও শিখে নিলাম যে তা ঠিক ততটাই দ্রুত ও সহজে হারিয়েও যেতে পারে । আমার জীবিকা নির্বাহের সামর্থ্যের অনিশ্চয়তাই আমার এই নতুন জীবনের সবচেয়ে হতাশাজনক দিক হিসেবে দ্রুত সামনে চলে এল ।

যদিও অদক্ষ শ্রমিকের মতো দক্ষ শ্রমিককে প্রায়শই পথে নামিয়ে দেওয়া হতো না, তবুও তিনি একই পরিণতি থেকে কোনোভাবেই সুরক্ষিত ছিলেন না; শ্রমবাজারে চাহিদার অভাবে বেকারত্বের কারণে তাকে অনাহারে থাকতে না হলেও, লকআউট ও ধর্মঘট দক্ষ শ্রমিককে তার জীবিকা নির্বাহের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করত। স্থিতিশীল জীবিকা অর্জনের এই অনিশ্চয়তাই ছিল সমগ্র আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার সবচেয়ে তিক্ত বৈশিষ্ট্য ।

গ্রামের যে ছেলেটি বড় শহরে পাড়ি জমায় , সে তথাকথিত সহজ কাজ —যা আসলেই সহজ হতে পারে —এবং স্বল্প কর্মঘণ্টার প্রতি আকৃষ্ট হয়। সে বিশেষ করে বড় শহরগুলোর জাদুকরী চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়। গ্রামে নিয়মিত মজুরি পেতে অভ্যস্ত হওয়ায় তাকে শেখানো হয়েছে যে, নতুন কোনো সুযোগ না পাওয়া পর্যন্ত পুরনো চাকরি ছাড়তে নেই । যেহেতু কৃষিশ্রমিকের তীব্র অভাব রয়েছে , তাই গ্রামে দীর্ঘমেয়াদী বেকারত্বের সম্ভাবনা খুবই কম। এটা ভাবা ভুল যে, যে ছেলেটি—

Machine Translated by Google

যে ব্যক্তি গ্রাম ছেড়ে শহরে পাড়ি জমায়, সে তাদের চেয়ে ভিন্ন প্রকৃতির, যারা বাড়িতে থেকে জমিতে কাজ করে। বরং অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, যারা বেশি সুস্থ ও কর্মঠ, তারাই দেশত্যাগ করে , এর উল্টোটা নয়। এই অভিবাসীদের মধ্যে শুধু তারাই নেই যারা বিদেশে পাড়ি জমায় , বরং সেই কৃষকেরাও রয়েছে যে নিজের গ্রাম ছেড়ে বড় শহরে পাড়ি জমানোর সিদ্ধান্ত নেয়, যেখানে সে হবে এক অচেনা মানুষ। সে এক অনিশ্চিত ভাগ্যের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, সে পকেটে সামান্য কিছু টাকা নিয়ে শহরে পৌঁছায় এবং প্রথম কয়েকদিন , যদি দুর্ভাগ্যবশত কোনো কাজ পেয়েও যায় , তাতেও সে হতাশ হয় না। কিন্তু যদি সে একটি কাজ পাওয়ার পরপরই তা হারিয়ে ফেলে , তবে তার অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যায়। অন্য কাজ খুঁজে পাওয়া , বিশেষ করে শীতকালে, সাধারণত কঠিন এবং কখনও কখনও প্রায় অসম্ভব। প্রথম কয়েক সপ্তাহ জীবনটা সহনীয়ই থাকে; সে তার ট্রেড ইউনিয়ন থেকে ভাতা পায় এবং কাজ চালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু যখন সে তার শেষ সম্বলটুকুও হারায় এবং তার বেকারত্ব দীর্ঘায়িত হওয়ায় ইউনিয়ন তাকে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেয় , তখনই আসল দুর্ভোগ শুরু হয়।

সে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ায় এবং ক্ষুধার্ত থাকে। তার সামান্য যা কিছু আছে, তা সে প্রায়ই বন্ধক রাখে বা বিক্রি করে দেয়। তার পোশাক ছিঁড়ে যায় , এবং তার বাহ্যিক দারিদ্র্য যত বাড়তে থাকে , সে ততই নিম্ন সামাজিক স্তরে নেমে আসে এবং এমন একদল মানুষের সাথে মেশে যারা তার শারীরিক কষ্টের পাশাপাশি তার মনকেও বিষিয়ে তোলে। তার ঘুমানোর কোনো জায়গা নেই, এবং শীতকালে এমনটা ঘটলে , যা প্রায়শই হয় , সে এক করুণ পরিস্থিতিতে পড়ে। অবশেষে , সে একটি কাজ পায়। কিন্তু সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। একই ঘটনা দ্বিতীয়বার ঘটে। তারপর তৃতীয়বার; এবং এখন সম্ভবত পরিস্থিতি আরও অনেক খারাপ। আগামীকালের এই চিরন্তন অনিশ্চয়তার প্রতি সে ধীরে ধীরে উদাসীন হয়ে পড়ে।

অবশেষে , সে এই পুনরাবৃত্ত চক্রে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে , এমনকি একজন পরিশ্রমী ব্যক্তিও ক্রমবর্ধমান বেপরোয়া মনোভাব নিয়ে জীবনযাপন করতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে বিবেকহীন ব্যক্তিদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়, যারা নিজেদের জঘন্য উদ্দেশ্যে তাকে শোষণ করে। নিজের কোনো দোষ ছাড়াই তাকে এতবার চাকরিচ্যুত করা হয়েছে যে, সে যে ধর্মঘটে অংশ নিচ্ছে তার লক্ষ্য তার অর্থনৈতিক অধিকার রক্ষা করা, নাকি রাষ্ট্র, সমগ্র সামাজিক ব্যবস্থা, বা এমনকি স্বয়ং সভ্যতাকে ধ্বংস করা—তা নিয়ে সে উদাসীন থাকে। যদিও ধর্মঘটের ধারণাটি তার নিজের পছন্দের সাথে মেলে না, তবুও সে নিছক উদাসীনতা থেকেই এতে যোগ দেয়।

আমি হাজার হাজার ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়াটি নিজের চোখে দেখেছি। আর যত বেশি আমি এটি পর্যবেক্ষণ করেছি, ততই এই বিশাল শহরটির প্রতি আমার বিতৃষ্ণা বেড়েছে, যা লোভের সাথে মানুষকে নিজের কোলে টেনে নেয় কেবল শেষে নির্মমভাবে তাদের চূর্ণবিচূর্ণ করার জন্য। যখন তারা পৌঁছায়
তারা এখনও বাড়ির মানুষদের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে; তারা থেকে গেলে সেই বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়।

আমি মহানগর জীবনে এমনভাবে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলাম যে, আমি এই ধরনের ভাগ্যের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করেছি এবং এর প্রভাব নিজের আত্মায় অনুভব করেছি। একটি বিষয় আমার চোখের সামনে স্পষ্ট: কাজ থেকে অলসতা এবং এর বিপরীতের আকস্মিক পরিবর্তন; এতটাই যে, আয় ও ব্যয়ের কারণে সৃষ্ট এই অবিরাম ওঠানামা শেষ পর্যন্ত বহু মানুষের মধ্যে মিতব্যয়িতার বোধ এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে ব্যয় নিয়ন্ত্রণের অভ্যাসকে ধ্বংস করে দিয়েছে। শরীর যেন খাদ্য ও ক্ষুধার এই ওঠানামার সাথে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিল —ভালো সময়ে খাওয়া আর খারাপ সময়ে উপোস থাকা। প্রকৃতপক্ষে, ভালো সময়ে, যখন চাকরি পাওয়া যায় , তখন ক্ষুধা নিয়মিত রেশনিংয়ের সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে দেয়। এর কারণ হলো বেকার শ্রমিকের ভোগ করা দুর্দশা —এবং এর জন্য মানসিকভাবে ক্ষতিপূরণ করার প্রয়োজন, যা সে এক অবিরাম মানসিক মরীচিকার মাধ্যমে করে, যেখানে সে কল্পনা করে যে সে আবার ভালোভাবে খেতে পারবে। আর এই স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয় , যা আবার এক অসুস্থ প্রবৃত্তিতে রূপান্তরিত হয় —যখন সে কাজ পায় এবং তার আয় বাড়ে , তখন সমস্ত বাধা-নিষেধ ঝেড়ে ফেলার জন্য। তাই যখন সে একটি চাকরি পায়, তখন সে তার আয় নিয়ন্ত্রণ করতে ভুলে যায়, কিন্তু আগামীকালের কথা না ভেবেই সবকিছু হারিয়ে ফেলে। এর ফলে ছোট সাপ্তাহিক পারিবারিক বাজেটে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, কারণ

ব্যয় যৌক্তিকভাবে পরিকল্পনা করা হয় না। আমি যে ঘটনার কথা উল্লেখ করেছি, তা যখন প্রথমবার ঘটে, তখন আয় সাত দিনের পরিবর্তে হয়তো পাঁচ দিনের জন্য যথেষ্ট হবে ; পরেরবার তা যথেষ্ট হবে।
মাত্র তিন দিনের জন্য; এবং যখন অভ্যাসটি ফিরে আসে, তখন তা বড়জোর একদিনের জন্য থাকে; অবশেষে এক রাতের ভোজের পর তারা অদৃশ্য হয়ে যায়।

Machine Translated by Google

সাধারণত, বাড়িতে স্ত্রী ও সন্তানরা থাকে। এবং অনেক ক্ষেত্রে, তারা এই জীবনধারায় প্রভাবিত হয় , বিশেষ করে যদি স্বামী তাদের প্রতি দয়ালু হন, তাদের জন্য সাধ্যমতো সেরাটা করতে চান এবং নিজের মতো করে ভালোবাসেন। তখন সাপ্তাহিক উপার্জন দুই-তিন দিনের মধ্যেই বাড়িতে খরচ হয়ে যায় । টাকা থাকা পর্যন্ত পরিবারটি খাওয়া-দাওয়া করে , এবং সপ্তাহের শেষে তারা সবাই একসঙ্গে ক্ষুধার্ত থাকে। তারপর স্ত্রী সপ্তাহটা পার করার চেষ্টায় পাড়ায় পাড়ায় গোপনে ঘুরে বেড়ায় , অল্প কিছু ধার করে এবং দোকানদারদের কাছে ছোটখাটো দেনা করে । তারা একসঙ্গে দুপুরের খাবার খেতে বসে , যা হয় খুবই সামান্য , এবং কখনও কখনও খাওয়ার মতো কিছুই থাকে না। তারা বেতনের দিনের জন্য অপেক্ষা করে , তা নিয়ে কথা বলে এবং পরিকল্পনা করে; আর যখন তারা ক্ষুধার্ত থাকে, তখন তারা আসন্ন প্রাচুর্যের কথা ভাবে। এইভাবে, ছোট শিশুরা খুব অল্প বয়সেই দারিদ্র্যের সঙ্গে পরিচিত হয়।

কিন্তু অশুভের চূড়ান্ত রূপ দেখা যায় যখন স্বামী সপ্তাহের শুরু থেকেই নিজের খেয়ালখুশিমতো চলতে থাকে, আর তার স্ত্রী সন্তানদের প্রতি ভালোবাসার কারণে এর প্রতিবাদ করে । ঝগড়া ও তিক্ততা শুরু হয় , এবং স্ত্রীর থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় স্বামী মদ্যপান শুরু করে । প্রতি শনিবার সে মাতাল থাকে । নিজের ও সন্তানদের জন্য বেঁচে থাকার সংগ্রামে , বেতনের দিনে কারখানা থেকে পাব-এ যাওয়ার পথে তার কাছ থেকে কয়েক শিলিং আদায়ের জন্য স্ত্রীকে তাকে উত্যক্ত করতে হয় । অবশেষে রবিবার বা সোমবার যখন সে বাকি টাকা হারিয়ে বাড়ি ফেরে, তখন এমন করুণ দৃশ্য উন্মোচিত হয় যা প্রতিশোধের জন্য আর্তনাদ করে ।

আমি এমন শত শত ঘটনা দেখেছি। প্রথমে আমার ঘৃণা ও ক্ষোভ হয়েছিল; কিন্তু পরে আমি তাদের দুর্ভাগ্যের ভয়াবহতা সম্পর্কে জানতে পারি এবং ঘটনাগুলো পুরোপুরি বুঝতে পারি। তারা ছিল পৈশাচিক পরিস্থিতির দুর্ভাগ্যজনক শিকার।

তখনকার আবাসন ব্যবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। ভিয়েনার শ্রমিকেরা ভয়াবহ দারিদ্র্যের পরিবেশে বাস করত। আজও সেইসব বিষণ্ন গুহায় মানুষের বসবাসের কথা, রাত্রিকালীন আশ্রয়কেন্দ্র ও বস্তিগুলোর কথা, এবং সেই জঘন্য অশালীনতা ও নিষ্ঠুরতার অন্ধকারময় দৃশ্যের কথা ভেবে আমি শিউরে উঠি ।

কী হবে একদিন, যখন মুক্ত দাসের দল তাদের জঘন্য আস্তানা থেকে বেরিয়ে এসে তাদের নিরীহ সহনাগরিকদের আক্রমণ করবে ? এই অন্য জগৎটি এমন সম্ভাবনার কথা চিন্তাও করেনি । তারা কোনো দুশ্চিন্তা ছাড়াই ঘটনাগুলোকে ঘটতে দিয়েছিল , এমনকি সন্দেহও করেনি —তাদের সহজাত বোধশক্তির চরম অভাবে— যে সময়মতো এর মোকাবিলা না করা হলে, শীঘ্র বা বিলম্বে ভাগ্য তার প্রতিশোধ নেবে ।

সন্তুষ্ট।

আজ আমি বিধাতাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই যে আমাকে এমন একটি স্কুলে পড়তে হয়েছিল । আমি পারি না অপ্রীতিকর বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করতে অস্বীকার করুন । এই স্কুলটি আমাকে একটি গভীর শিক্ষা দিয়েছে।

সেই সময়ে আমি যাদের মধ্যে বাস করতাম, তাদের জন্য হতাশায় পুরোপুরি ডুবে যাওয়া এড়াতে আমাকে একদিকে তাদের জীবনের বাহ্যিক রূপ এবং অন্যদিকে তাদের জীবন কেন সেই বিশেষ পথে চালিত হয়েছিল, সেই কারণগুলো বিবেচনা করতে হতো । তখন আমি নিরুৎসাহ ছাড়াই সবকিছু শুনতে পারতাম ; কারণ এই সমস্ত দুঃখ - কষ্ট , নোংরামি আর অপমান থেকে যারা বেরিয়ে এসেছিল , তারা মানুষ ছিল না , বরং জঘন্য আইনের জঘন্য পরিণতি ছিল। আমার নিজের জীবনেও, অনুরূপ অগ্নিপরীক্ষাগুলো আমাকে আইনের চাপে সৃষ্ট এই অধঃপতিত ফলগুলো দেখে করুণভাবে ভাবপ্রবণ হওয়া থেকে বিরত রেখেছিল।

পরিস্থিতি। না, এমন ভাবপ্রবণ মনোভাব অনুচিত হবে।

তবুও আমি দেখলাম যে, এমন একটি পদ্ধতি আছে যার মাধ্যমে এই অবস্থার উন্নতি করা সম্ভব। এই পদ্ধতিটি হলো: প্রথমত, সমাজে গভীর সামাজিক দায়িত্ববোধ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নের জন্য উন্নততর মৌলিক পরিস্থিতি তৈরি করা; দ্বিতীয়ত, এই সামাজিক দায়িত্ববোধের সাথে এমন সমস্ত বহিরাগত উপাদান নির্মূল করার কঠোর সংকল্পকে একত্রিত করা, যেগুলোর উন্নতি সম্ভব নয়।

প্রকৃতি যেমন বিদ্যমান সত্তার সংরক্ষণের চেয়ে প্রজাতির ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য নির্বাচিত প্রজননের ওপরই তার সর্বাধিক মনোযোগ নিবদ্ধ করে, ঠিক তেমনি মানবজীবনে বর্তমান প্রজন্মকে কৃত্রিমভাবে উন্নত করার চেয়ে—যা মানব স্বভাবের কারণে একশটির মধ্যে নিরানব্বইটি ক্ষেত্রেই অসম্ভব — শুরু থেকেই ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য একটি উন্নততর পথ নিশ্চিত করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ।

Machine Translated by Google

ভিয়েনায় টিকে থাকার সংগ্রামের সময় আমি খুব স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলাম যে, সমস্ত সামাজিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু কেবল সমাজকল্যাণ হতে পারে না, যা হাস্যকর ও নিষ্ফল; বরং আমাদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের মৌলিক অপূর্ণতাগুলো দূর করার একটি পথ খুঁজে বের করতে হবে— যে অপূর্ণতাগুলো ব্যক্তির অবক্ষয় ঘটায় , অথবা অন্তত পক্ষে তাকে সেই অবক্ষয়ের দিকে চালিত করে। রাষ্ট্রের প্রতি শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বিরাজমান বৈরিতা নির্মূল করার জন্য সবচেয়ে কঠোর উপায়গুলোসহ সকল উপায় ব্যবহারে যে অসুবিধাগুলো দেখা যায়, তার মূল কারণ হলো এই সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহের ফলে অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সৃষ্ট অনিশ্চয়তার মনোভাব । এই অনিশ্চয়তার ভিত্তি কেবল এই অবক্ষয়ের মর্মান্তিক পরিণতি ঘটতে দেওয়ার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির অপরাধবোধের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় । এই অনুভূতি কোনো গুরুতর ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রতিটি প্রচেষ্টাকে পঙ্গু করে দেয়। তাই, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এমনকি টিকে থাকার জন্য অপরিহার্য পদক্ষেপগুলো নিতেও দ্বিধাগ্রস্ত, ভীতু এবং উৎসাহহীন থাকেন । যখন ব্যক্তি এই বিষয়ে নিজের অপরাধবোধের ভার থেকে মুক্ত হয় , কেবল তখনই সে পরজীবী উদ্ভিদগুলোকে কঠোর ও নির্মমভাবে ছেঁটে ফেলে আগাছা উপড়ে ফেলার মতো অভ্যন্তরীণ শান্তি এবং বাহ্যিক শক্তি লাভ করে ।

কিন্তু যেহেতু অস্ট্রীয় রাষ্ট্রের সামাজিক অধিকার বা সামাজিক আইন সম্পর্কে প্রায় কোনো ধারণাই ছিল না, তাই এই মারাত্মক ক্ষতগুলো নির্মূল করতে তার অক্ষমতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে ।

* * *

আমি জানি না তখন কোন জিনিসটা আমাকে সবচেয়ে বেশি আতঙ্কিত করেছিল: আমার তৎকালীন সঙ্গীদের অর্থনৈতিক দারিদ্র্য, তাদের আদিম রীতিনীতি ও নৈতিকতা, নাকি তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কৃতির নিম্ন স্তর।

কতবার আমাদের বুর্জোয়া শ্রেণি নৈতিক ক্ষোভে গর্জে ওঠে, যখন তারা কোনো করুণ ভবঘুরের মুখ থেকে এই কথা শোনে যে, সে জার্মান কি না, তাতে তার কিছু যায় আসে না এবং
সে তার নিজের একটি ঘর খুঁজে পাবে, যেখানে সে তার আত্মা ও শরীর টিকিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট পাবে ।
তারা 'জাতীয় গর্বের' এই ধরনের অভাবের তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি তাদের আতঙ্ক তীব্রভাবে প্রকাশ করেন ।

কিন্তু কতজন মানুষ সত্যিই নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করে যে তাদের নিজেদের মতামত কেন এমন?
এখন কি ভালো? তাদের মধ্যে কতজন বোঝে যে, এমন একটি অনন্য জাতির সদস্য হিসেবে তাদের যে স্বাভাবিক গর্ব, তা তাদের সম্মুখীন হওয়া অগণিত ঘটনাপ্রবাহ থেকে উদ্ভূত, যা তাদের শৈল্পিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে পিতৃভূমি ও জাতির মহত্ত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়? তাদের মধ্যে কতজন উপলব্ধি করে যে, পিতৃভূমির প্রতি গর্ব স্পষ্টতই এই সকল ক্ষেত্রে এর মহত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল ? আমাদের বুর্জোয়া মহল কি কখনো ভেবে দেখেছে যে, জনগণের কত ক্ষুদ্র একটি অংশ এই জ্ঞান ধারণ করে, যা স্বদেশ নিয়ে গর্ববোধ করার জন্য একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত ?

এটা অস্বীকার করা যায় না যে অন্যান্য দেশেও একই রকম পরিস্থিতি বিদ্যমান এবং তা সত্ত্বেও শ্রমিক শ্রেণি দেশপ্রেমী থেকেছে। এমনকি যদি তাই হতো, আমাদের উদাসীন মনোভাবের কোনো অজুহাত থাকতে পারে না । কিন্তু তা নয়। যাকে আমরা উগ্র জাতীয়তাবাদী শিক্ষা বলি।

উদাহরণস্বরূপ, ফরাসিদের ক্ষেত্রে, এটি সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রে, বা ফরাসিদের ভাষায়, সভ্যতার ক্ষেত্রে ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠত্বের একটি অতিরঞ্জন মাত্র। ফরাসি বালককে সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠ নীতি শেখানো হয় না। যখন রাজনৈতিক গুরুত্ব এবং সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বের প্রসঙ্গ আসে , তখন তা তার মধ্যে সম্ভাব্য সবচেয়ে ব্যক্তিনিষ্ঠ উপায়ে গেঁথে দেওয়া হয় ।

এই শিক্ষাকে অবশ্যই বৃহত্তর প্রেক্ষিতের সাধারণ ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে এবং প্রয়োজনে নিরন্তর পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে এই ধারণাগুলোকে জনগণের স্মৃতি ও অনুভূতির গভীরে গেঁথে দিতে হবে।

কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে, আমরা কেবল নিষ্ক্রিয়তার পাপেই দোষী নই, বরং আমরা সেইসব সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদেরও মনোবল ভেঙে দিচ্ছি যারা স্কুলে পড়াশোনা করছে । ইঁদুরের বিষ।

Machine Translated by Google

আমাদের শরীর—রাজনীতি সাধারণ মানুষের হৃদয় ও স্মৃতিকে ক্ষয় করে দেয় , যারা বহু দুর্ভাগ্য ও যন্ত্রণা থেকে রেহাই পায়নি ।

পাঠককে এইরকম একটি পরিস্থিতি কল্পনা করতে বলা যাক : থাকার

জায়গাটি বেসমেন্টে এবং দুটি স্যাঁতসেঁতে ঘর নিয়ে গঠিত। এই ঘরগুলোতে একজন শ্রমিক ও তার পরিবার বাস করে – মোট সাতজন। ধরা যাক, সন্তানদের মধ্যে একজন তিন বছরের একটি ছেলে। এই বয়সে শিশুরা তাদের প্রাপ্ত অনুভূতিগুলো সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করে। অত্যন্ত প্রতিভাবান ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে, শৈশবে প্রাপ্ত অনুভূতির রেশ পরিণত বয়স পর্যন্ত স্মৃতিতে থেকে যায়। এই থাকার জায়গার ঘিঞ্জি ও জনাকীর্ণ অবস্থা পারস্পরিক সুখকর সম্পর্কের জন্য অনুকূল নয় । ফলে , ঝগড়া এবং পারস্পরিক ক্রোধের বিস্ফোরণ ঘটে । এটা বলা কঠিন যে এই মানুষগুলো একে অপরের সাথে বাস করে , বরং বলা যায় তারা একে অপরের উপর নির্ভরশীল। ছোটখাটো ভুল বোঝাবুঝি, যা এমন একটি বাড়িতে নিজে থেকেই দূর হয়ে যায় যেখানে মানুষ কিছুক্ষণের জন্য একে অপরের থেকে দূরে থাকার যথেষ্ট সুযোগ পায়, তা-ই এখানে দীর্ঘস্থায়ী তর্কের উৎস হয়ে দাঁড়ায় । যতক্ষণ পর্যন্ত সন্তানদের কথা মনে রাখা হয় , এই দৃষ্টিকোণ থেকে পরিস্থিতিটি সহনীয়। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, তারা ক্রমাগত একে অপরের সাথে ঝগড়া করে, কিন্তু সেই ঝগড়াগুলো স্বল্পস্থায়ী এবং সম্পূর্ণরূপে ভুলে যাওয়ার মতো। কিন্তু যখন বাবা-মা...

তারা দিনভর তর্কে জড়িয়ে পড়েন, যা প্রায়শই এমন অভদ্রতায় পর্যবসিত হয় যা কল্পনাও করা যায় না। এই ধরনের অভিজ্ঞতার প্রভাব পরবর্তী জীবনে সন্তানদের মধ্যে অবশ্যই দৃশ্যমান হয় । এই ধরনের পরিস্থিতি কল্পনা করতে হলে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক।
পারস্পরিক অভিযোগের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতি, যখন বাবা মাকে শারীরিকভাবে আক্রমণ করে।
এবং মাতাল অবস্থায় প্রচণ্ড রাগে তাকে গালিগালাজ করে। ছয় বছর বয়সে , শিশুটি আর এই জঘন্য বিবরণগুলো উপেক্ষা করতে পারে না , যা একজন প্রাপ্তবয়স্কের কাছেও জঘন্য মনে হবে । নৈতিক বিষে সংক্রমিত , শারীরিকভাবে অপুষ্টিতে ভোগা , এবং কীট-পতঙ্গে ভরা এক দুর্বল মস্তিষ্ক নিয়ে সেই তরুণ 'নাগরিক' প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায়। অনেক কষ্টে সে কোনোমতে পড়তে ও লিখতে শেখে। বাড়িতে পড়ানোর কোনো সম্ভাবনাই নেই । বরং ঠিক তার উল্টো । বাবা-মা সন্তানদের সামনে শিক্ষক ও স্কুল সম্পর্কে অত্যন্ত অপমানজনক ভাষায় কথা বলেন এবং সন্তানকে কোলে বসিয়ে কথা বলার চেয়ে শিক্ষকদের দোষারোপ করতেই বেশি আগ্রহী ।

সে পাগল হয়ে গেছে। একজন তরুণ বাড়িতে যা শোনে, তা তার চারপাশের মানুষদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগাতে সাহায্য করে না। সামগ্রিকভাবে মানব প্রকৃতি সম্পর্কে ভালো কিছু বলা হয় না , এবং স্কুল থেকে শুরু করে সরকার পর্যন্ত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকেই কলঙ্কিত করা হয়। সেটা ধর্ম হোক বা নৈতিকতা, রাষ্ট্র হোক বা সামাজিক ব্যবস্থা , তাতে কিছু যায় আসে না; সবকিছুকেই উপহাস করা হয়। যখন একটি ছেলে চৌদ্দ বছর বয়সে স্কুল ছাড়ে , তখন এটা বলা কঠিন যে তার চরিত্রের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো কী —প্রকৃত জ্ঞান সম্পর্কে অবিশ্বাস্য অজ্ঞতা, নাকি এমন এক বিদ্রূপাত্মক ঔদ্ধত্য যার সাথে যুক্ত আছে নৈতিকতার প্রতি এমন এক মনোভাব যা এত অল্প বয়সে সত্যিই বিস্ময়কর ।

জীবনে এমন একজন ব্যক্তি কোন স্থান অধিকার করতে পারে , যার কাছে কোনো কিছুই পবিত্র নয়, যে কখনো কোনো মহৎ কিছুর অভিজ্ঞতা লাভ করেনি, বরং এর বিপরীতে, মানব অস্তিত্বের সর্বনিম্ন রূপ সম্পর্কে যার গভীর জ্ঞান রয়েছে? এই তিন বছরের শিশুটি পনেরো বছর বয়সে পৌঁছানোর আগেই সমস্ত কর্তৃত্বকে কলঙ্কিত করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে । সে কেবল নৈতিক অধঃপতন ও নীচতার সংস্পর্শে এসেছে, এবং যা কিছু তার চিন্তাকে উচ্চতর বিষয়ের দিকে উদ্দীপিত করতে পারত , তা থেকে তাকে দূরে রাখা হয়েছে। আর এখন মানবজাতির এই নবীন নমুনাটি জীবনের বিদ্যালয়ে তার পড়াশোনা শুরু করছে ।

সে তার জীবনটা ঠিক সেভাবেই কাটায়, যেভাবে তার বাবা তাকে শৈশবে শিখিয়েছিলেন । সে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ায় এবং যখন খুশি বাড়ি ফেরে। কখনও কখনও সে তার মারূপী সেই ভগ্নপ্রায় সত্তাটিকে মারধর করে, ঈশ্বর ও পৃথিবীকে অভিশাপ দেয় , এবং অবশেষে একটি কিশোর সংশোধনাগারে তার ঠাঁই হয়। সেখানেই সে চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে।

এবং তার সমসাময়িক বুর্জোয়া শ্রেণি এই তরুণ 'নাগরিকের' মধ্যে প্রদর্শিত 'দেশপ্রেমিক উদ্দীপনার' অভাবে বিস্মিত।

দিন দিন বুর্জোয়া জগৎ থিয়েটার ও সিনেমার মতো উপকরণ, নিম্নমানের সংবাদপত্র এবং অশ্লীল বইয়ের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে বিষ ছড়ানোর ঘটনা প্রত্যক্ষ করছে ; এবং একই সাথে তারা জনসাধারণের শোচনীয় 'নৈতিক মান' ও 'জাতীয় উদাসীনতা ' দেখে বিস্মিত হচ্ছে। যেন সিনেমার আজেবাজে জিনিস, নিম্নমানের সংবাদপত্র এবং এই জাতীয় জিনিসগুলোই মানুষের মধ্যে নৈতিক শিক্ষা দিতে পারে।
ব্যক্তির পূর্ববর্তী শিক্ষা নির্বিশেষে , নিজের দেশের আয়তন সম্পর্কে জ্ঞান ।

Machine Translated by Google

তখন আমি এমন একটি বিষয় দ্রুত ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝতে পারলাম, যেদিকে আমি আগে কখনো মনোযোগ দিইনি। বিষয়টি ঠিক এটাই: সুস্থ সামাজিক

পরিবেশ প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষকে 'জাতীয়তাবাদী' করে তোলার বিষয়টিই প্রধান ও মৌলিক, যা একজন ব্যক্তির শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ভিত্তি প্রদান করবে। একমাত্র তখনই একজন ব্যক্তি এই দেশের নাগরিক হিসেবে গর্ববোধ করতে পারবে , যখন পারিবারিক লালন-পালন ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা একজন ব্যক্তির মধ্যে তার নিজের দেশের সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক মহত্ত্বের জ্ঞান সঞ্চারিত করবে। আমি কেবল তারই জন্য লড়াই করতে পারি , যা আমি ভালোবাসি।

আমি কেবল তাকেই ভালোবাসতে পারি যাকে আমি সম্মান করি। আর কোনো কিছুকে সম্মান করতে হলে , আমাকে সে সম্পর্কে অন্তত কিছুটা জানতে হয়। এই বিষয়ে।

* * *

যখন সামাজিক বিষয়ে আমার আগ্রহ জেগে উঠল , আমি সেগুলো নিয়ে পড়াশোনা শুরু করলাম। মৌলিকভাবে। আমার কাছে এক নতুন ও পূর্বে অজানা জগৎ উন্মোচিত হলো।

১৯০৯-১০ সালে আমি আমার অবস্থার এতটাই উন্নতি করেছিলাম যে আমাকে আর উপার্জন করতে হতো না। আমি একজন সাধারণ শ্রমিক হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করতাম। আমি স্বাধীনভাবে নকশাকার ও জলরঙের শিল্পী হিসেবে কাজ করতাম। আয় ছিল সামান্য এবং তা কেবল জীবনের তাৎক্ষণিক চাহিদা মেটানোর জন্যই যথেষ্ট ছিল। তবে, বিষয়টি আমার কাছে আকর্ষণীয় ছিল, কারণ আমি এই পেশাটিই বেছে নিয়েছিলাম। তাছাড়া, সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পর আমি আর আগের মতো মারাত্মক ক্লান্ত থাকতাম না , যখন বইয়ের দিকে তাকালেই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়তাম। তাই আমার বর্তমান পেশাটি , ভবিষ্যতে আমি যে পেশায় যেতে চেয়েছিলাম তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। অধিকন্তু, আমি আমার নিজের সময়ের মালিক ছিলাম এবং আগের চেয়ে ভালোভাবে আমার কাজের সময়সূচী গুছিয়ে নিতে পারতাম। আমি জীবিকা নির্বাহের জন্য ছবি আঁকতাম, এবং পড়াশোনা করতাম কারণ তা আমি উপভোগ করতাম।

এইভাবে , আমি সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলাম, যা আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে শেখা জ্ঞানের একটি প্রয়োজনীয় পরিপূরক ছিল। আমি এই বিষয়ে যত বই পেয়েছি, তার সবই পড়েছি এবং যা পড়েছি তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছি। আমার মনে হয়, সেই সময়ে আমি যাদের সাথে থাকতাম, তারা আমাকে একজন খামখেয়ালী মানুষ হিসেবে গণ্য করত।

সামাজিক বিষয়ে আগ্রহের পাশাপাশি , আমি অত্যন্ত উৎসাহের সাথে স্থাপত্যবিদ্যা অধ্যয়নে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলাম। সঙ্গীতের পাশাপাশি, আমি একে শিল্পকলার রানী বলে মনে করতাম। এর অধ্যয়ন আমার কাছে কাজ ছিল না, বরং ছিল আনন্দ। আমি ক্লান্তিহীনভাবে ভোর পর্যন্ত পড়তে বা আঁকতে পারতাম। এবং আমি ক্রমশ নিশ্চিত হয়ে উঠছিলাম যে আমার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হবে।
সত্য, যদিও তা সত্যি হওয়ার জন্য আমাকে অনেক বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। আমি খুব
আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে একদিন আমি একজন স্থপতি হিসেবে নিজের নাম প্রতিষ্ঠা করব।

আমার পেশাগত পড়াশোনার বাইরে যে আমি রাজনীতি সংক্রান্ত যেকোনো বিষয়েই সবচেয়ে বেশি আগ্রহী ছিলাম , সেই বিষয়টি আমার কাছে বিশেষ কোনো গুরুত্ব বহন করত না। বরং আমি রাজনীতির প্রতি এই আগ্রহকে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির উপর অর্পিত মৌলিক কর্তব্যেরই একটি অংশ হিসেবে দেখতাম। যারা তাদের চারপাশের রাজনৈতিক জগৎ সম্পর্কে একেবারেই বোঝে না , তাদের সমালোচনা বা অভিযোগ করার কোনো অধিকার নেই। তাই আমি রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে পড়া ও অধ্যয়ন চালিয়ে গেলাম। কিন্তু গড়পড়তা তথাকথিত "বুদ্ধিজীবী"দের কাছে পড়ার যে অর্থ, আমার কাছে সম্ভবত তার চেয়ে ভিন্ন একটি অর্থ ছিল।

আমি এমন অনেককে চিনি যারা অবিরাম বই পড়ে , একের পর এক বই , একের পর এক পাতা পড়ে, তবুও আমি তাদের 'সুপঠিত' বলব না। অবশ্যই, তাদের 'জ্ঞান' পরিমাণে বিশাল ; কিন্তু বই থেকে সংগৃহীত বিষয়বস্তু বাছাই ও শ্রেণিবদ্ধ করার ক্ষমতা তাদের মস্তিষ্কের নেই বলেই মনে হয়। একটি বইয়ের মধ্যে কোনটি দরকারি আর কোনটি অদরকারি, তা আলাদা করার ক্ষমতা তাদের নেই , যার ফলে তারা পড়ার সময় দরকারি অংশটি মনে রাখতে এবং সম্ভব হলে অদরকারি অংশটি এড়িয়ে যেতে পারে , অথবা অসম্ভব হলে পড়া শেষে সেটিকে অপ্রয়োজনীয় বোঝা হিসেবে ফেলে দিতে পারে। পড়া নিজেই কোনো লক্ষ্য নয়, বরং একটি লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম। এর মূল উদ্দেশ্য হলো প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব প্রতিভা ও দক্ষতার দ্বারা গঠিত কাঠামোটিকে পূর্ণ করতে সাহায্য করা। প্রত্যেকেই নিজের জন্য সেই...

Machine Translated by Google

তার জীবনের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও উপকরণ , তা সে দৈনন্দিন রুটি রোজগারের মতো সাধারণ কাজই হোক বা উচ্চতর মানবিক আকাঙ্ক্ষার সাথে সম্পর্কিত কোনো পেশাই হোক । এটাই পড়ার প্রথম উদ্দেশ্য। আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, সে সম্পর্কে একটি সাধারণ জ্ঞান প্রদান করা। তবে উভয় ক্ষেত্রেই, পড়ার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানকে বইয়ের পরবর্তী অধ্যায়ের মতো করে স্মৃতিতে সংরক্ষণ করা যায় না; বরং এভাবে অর্জিত জ্ঞানের প্রতিটি ক্ষুদ্র অংশকে মোজাইকে বসানোর জন্য একটি ছোট পাথরের মতো বিবেচনা করতে হবে, যাতে এটি পাঠকের মস্তিষ্কে বিশ্বের একটি সাধারণ চিত্র তৈরিতে সাহায্যকারী অন্যান্য সমস্ত টুকরো ও কণার মধ্যে তার সঠিক স্থান খুঁজে পায়। অন্যথায়, পুরো পড়াটি কেবল বিশৃঙ্খল ধারণার একটি জটলাপূর্ণ স্তূপে পরিণত হবে। এই স্তূপটি কেবল অকেজোই নয়, বরং এর দুর্ভাগ্যজনক অধিকারীকে অতিরিক্ত জ্ঞানী করে তোলে। সে নিজেকে সুশিক্ষিত বলে মনে করে ।

এবং সে মনে করে যে জীবন সম্পর্কে সে কিছু একটা বোঝে । সে বিশ্বাস করে যে সে জ্ঞান অর্জন করেছে, অথচ সত্যিটা হলো এই যে, এই 'জ্ঞানের' প্রতিটি বৃদ্ধি তাকে বাস্তব জীবন থেকে আরও দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়, যতক্ষণ না অবশেষে তার ঠাঁই হয় কোনো মানসিক হাসপাতালে অথবা সে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে সংসদ সদস্য হয়ে যায়।

এমন ব্যক্তি উপযুক্ত মুহূর্তে তার জ্ঞানকে বাস্তব প্রয়োগে রূপান্তর করতে কখনোই সফল হবে না ; কারণ তার মানসিক কাঠামো দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা মেটাতে পারে না । তার জ্ঞান মস্তিষ্কে সংরক্ষিত থাকে তার পড়া বইগুলোর হুবহু অনুলিপি হিসেবে এবং যে ক্রমে সে বইগুলো পড়েছে সেই ক্রমেই। আর যদি ভাগ্য কোনো একদিন জীবনের কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে তার পুঁথিগত জ্ঞান ব্যবহার করার জন্য তাকে ডাকে, তবে সেই ডাকে তাকে বই এবং পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করতে হবে, কারণ বেচারা নির্বোধ ব্যক্তিটি কখনোই সেই জায়গা খুঁজে পাবে না যেখানে এখন প্রয়োজনীয় তথ্যটি সংরক্ষিত আছে । কিন্তু যদি পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ না করা হয়, তবে সেই সংকটময় মুহূর্তে সুপঠিত বুদ্ধিজীবী নিজেকে এক হতাশাজনক বিভ্রান্তির মধ্যে খুঁজে পাবে। চরম অস্থিরতার মধ্যে সে অনুরূপ দৃষ্টান্ত খুঁজতে থাকে এবং প্রায় নিশ্চিতভাবেই ভুল সমাধানে উপনীত হয় ।

যদি এটি একটি সঠিক বর্ণনা না হয়, তবে সরকারের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত আমাদের সংসদীয় বীরদের রাজনৈতিক সাফল্যকে আমরা কীভাবে ব্যাখ্যা করব? অন্যথায়, আমাদের এই ধরনের রাজনীতিবিদদের কর্মকাণ্ডকে মানসিক অসুস্থতার ফল হিসেবে না দেখে , কেবল বিদ্বেষপূর্ণ উদ্দেশ্য এবং প্রতারণার ফল হিসেবেই দেখতে হবে ।

অন্যদিকে, যিনি পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলেন, তিনি একটি বই, সংবাদপত্র বা পুস্তিকা থেকে যা মনে রাখা উচিত তা সঙ্গে সঙ্গেই উপলব্ধি করতে পারেন , কারণ তা তার ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটায় অথবা সাধারণ জ্ঞান হিসেবে মূল্যবান । তিনি যা শেখেন তা বিভিন্ন সমস্যা বা বিষয় সম্পর্কে তার মানসিক উপমার সাথে মিশে যায়, যা সেই মানসিক চিত্রটিকে আরও সংশোধন করে বা প্রসারিত করে , ফলে তা আরও নির্ভুল ও সুনির্দিষ্ট হয়ে ওঠে। যদি হঠাৎ কোনো ব্যবহারিক সমস্যার শনাক্তকরণ বা সমাধানের প্রয়োজন হয়, তবে স্মৃতিশক্তি বছরের পর বছর ধরে পড়ার মাধ্যমে সঞ্চিত তথ্যের ভান্ডার থেকে সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত তথ্যটি নির্বাচন করে এবং সেই তথ্যটি অন্য কারো ব্যবহারের জন্য উপলব্ধ করে দেয়।

সমস্যাটি সম্পর্কে একটি নতুন ও সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করার জন্য অথবা এর সমাধানে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা।

কেবল এভাবেই পঠন অর্থবহ ও মূল্যবান হয়ে উঠতে পারে ।

উদাহরণস্বরূপ, একজন বক্তা যার কাছে কোনো বিষয় সঠিকভাবে আলোচনা করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের উৎস হাতের কাছে নেই, তিনি তার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নিজের মতামত রক্ষা করতে পারবেন না , এমনকি যদি সেই মতামতগুলো সম্পূর্ণ যৌক্তিক এবং সত্যও হয় । যেকোনো আলোচনায় তার স্মৃতিশক্তি তাকে লজ্জাজনকভাবে পিছিয়ে দেবে। তিনি নিজের বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি উপস্থাপন করতে বা প্রতিপক্ষের বক্তব্য খণ্ডন করতে পারবেন না । যতক্ষণ পর্যন্ত বক্তাকে নিজের পক্ষ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হয় , ততক্ষণ পরিস্থিতি গুরুতর নয়; কিন্তু অমঙ্গল তখনই আসে যখন ভাগ্য এমন একজন স্বঘোষিত সর্বজ্ঞকে জনবিষয়াবলীর শীর্ষে বসায়, যে আসলে কিছুই জানে না।

একেবারে ছোটবেলা থেকেই আমি মনোযোগ দিয়ে বই পড়ার চেষ্টা করতাম এবং সৌভাগ্যবশত আমার ভালো স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা ছিল যা আমাকে তা করতে সাহায্য করেছিল। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, আমার
ভিয়েনায় আমার অবস্থান বিশেষভাবে উপকারী ও ফলপ্রসূ ছিল। সেখানকার দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতাগুলো আমাকে আধুনিক প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় সমস্যাগুলো অধ্যয়ন করার জন্য নিরন্তর প্রেরণা যুগিয়েছে।

Machine Translated by Google

যেহেতু আমি তত্ত্ব দিয়ে বাস্তবতাকে এবং বাস্তবতা দিয়ে তত্ত্বকে যাচাই করতে পারতাম , তাই আমি একদিকে পাণ্ডিত্যপূর্ণ তাত্ত্বিকতার বিপদ থেকে এবং অন্যদিকে বাস্তবতার বাহ্যিক দিকগুলোকে অতিমূল্যায়ন করার বিপদ থেকে নিরাপদ ছিলাম ।

তৎকালীন দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা আমাকে সামাজিক প্রশ্নের ঊর্ধ্বে দুটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মৌলিক তাত্ত্বিক অধ্যয়ন শুরু করতে অনুপ্রাণিত করেছিল ।

কে জানে, যদি আমি মার্কসবাদের মতবাদ ও বৈশিষ্ট্যগুলো বিস্তারিতভাবে অধ্যয়ন করা শুরু করতাম
ব্যাপারটা এমন নয় যে আমি এরপর আক্ষরিক অর্থেই এই সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলাম।

* * *

আমার যৌবনে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে আমি খুব কমই জানতাম, এবং তার বেশিরভাগই ছিল অসত্য। তারা যে সার্বজনীন ভোটাধিকার ও গোপন ভোটের জন্য লড়ছিল , তা আমাকে এক ধরনের আত্মতৃপ্তি দিত; আমার সাধারণ জ্ঞান বলত যে এটি হ্যাবসবার্গ শাসনকে দুর্বল করে দেবে , যাকে আমি তীব্রভাবে ঘৃণা করতাম। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে , জার্মান উপাদানকে বিসর্জন দিলেও দানুবীয় রাষ্ট্রের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না । এমনকি অস্ট্রিয়ান জার্মানদের দীর্ঘ ও ধীর স্লাভিকরণ প্রক্রিয়ার বিনিময়েও রাষ্ট্রটি কোনো নিশ্চয়তা দিতে পারত না।

সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা ; কারণ স্লাভদের গঠনমূলক রাজনীতির জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ছিল কি না এবং কী পরিমাণে ছিল, তা অত্যন্ত অনিশ্চিত। তাই, আমি এমন প্রতিটি পদক্ষেপে আনন্দিত হয়েছিলাম যা এই অসম্ভব রাষ্ট্রের চূড়ান্ত বিলুপ্তি ঘটাতে পারত, যে রাষ্ট্র দশ মিলিয়ন মানুষের জার্মান পরিচয় নিশ্চিহ্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল । ভাষার এই বাবিল যত বেশি বিবাদ ও বিভেদ সৃষ্টি করছিল, এমনকি সংসদেও, এই ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের পতনের সময় ততই ঘনিয়ে আসছিল । এর অর্থ ছিল অস্ট্রিয়ান জার্মানদের মুক্তি, এবং কেবল তখনই পিতৃভূমিতে তাদের পুনর্মিলন সম্ভব হয়েছিল ।

সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের তৎকালীন নীতিমালার প্রতি আমার কোনো বিদ্বেষ ছিল না। শ্রমিক শ্রেণীর উন্নতির যে ঘোষিত লক্ষ্য তারা পোষণ করত—যা আমি তখন নির্বোধের মতো বিশ্বাস করতাম—সেটিও আরেকটি কারণ ছিল, যার জন্য আমার সোশ্যাল ডেমোক্রেসির বিরুদ্ধে না গিয়ে পক্ষেই ভোট দেওয়া উচিত ছিল । কিন্তু সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক আন্দোলন থেকে যা আমাকে সবচেয়ে বেশি বিমুখ করেছিল , তা হলো অস্ট্রিয়ায় জার্মান পরিচয় রক্ষার সংগ্রামের প্রতি তাদের বৈরিতা এবং তাদের স্লাভিক 'কমরেডদের' সাথে করুণ সখ্যতা । এই কমরেডরা এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিকে ততক্ষণই স্বাগত জানাত , যতক্ষণ তা থেকে কোনো বাস্তব সুবিধা পাওয়া যেত, কিন্তু অন্যথায় এক উদ্ধত সংযম বজায় রাখত, যার ফলে সেই নাছোড়বান্দা ভিক্ষুকদের তাদের আচরণের যোগ্য জবাবই দেওয়া হতো ।

সতেরো বছর বয়সে 'মার্ক্সবাদ' শব্দটি আমার কাছে প্রায় অপরিচিতই ছিল, অথচ 'সামাজিক গণতন্ত্র' ও 'সমাজতন্ত্র'কে আমি সমার্থক শব্দ হিসেবেই দেখতাম। কেবল ভাগ্যের কঠোর হস্তের এক আকস্মিক আঘাতেই এই অতুলনীয় বিষয়টির প্রতি আমার চোখ খুলে যায়।

জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ।

ততদিন পর্যন্ত, সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি সম্পর্কে আমার জ্ঞান তাদের কয়েকটি গণসভা পর্যবেক্ষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সামাজিক গণতান্ত্রিক শিক্ষা বা তাদের অনুসারীদের মানসিকতা সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না। হঠাৎ করেই আমি তাদের শিক্ষার ফল এবং যাকে তারা তাদের বিশ্বদৃষ্টি বলত, তার মুখোমুখি হলাম। এইভাবে, এমন কিছু শিখতে আমার কয়েক মাসই যথেষ্ট ছিল , যা অন্য পরিস্থিতিতে অধ্যয়নের জন্য কয়েক দশক সময় লাগত —অর্থাৎ, সামাজিক সদ্গুণ এবং প্রতিবেশীপ্রেমের আড়ালে এক সত্যিকারের মহামারী ছড়িয়ে পড়ছে , এবং এই মহামারী যদি অবিলম্বে পৃথিবী থেকে নির্মূল করা না হয় , তবে তা মানবজাতির বিনাশ ডেকে আনতে পারে।

নির্মাণ শিল্পে কাজ করার সময়ই সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় ।

Machine Translated by Google

আমার চাকরির একেবারে শুরু থেকেই পরিস্থিতি আমার জন্য খুব একটা সুখকর ছিল না। আমার পোশাক-পরিচ্ছদ তখনও বেশ শালীনই ছিল। আমি কী বলছি সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতাম এবং সাবধানতার সাথে কাজ করতাম । আমি আমার বর্তমান ভাগ্য এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নিয়ে ভাবতে এতটাই ব্যস্ত ছিলাম যে, আমার চারপাশের পরিবেশের দিকে তেমন মনোযোগ দিতাম না । অনাহার এড়াতে এবং একই সাথে পড়াশোনায় এগিয়ে যেতে আমাকে কাজ খুঁজতে হতো, যদিও অগ্রগতি ধীর হতে পারত । তৃতীয় বা চতুর্থ দিনে এমন কিছু না ঘটলে , যা আমাকে একটি চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করেছিল, সম্ভবত আমার সঙ্গীদের প্রতি আমার আগ্রহ জন্মাতো না । আমাকে ট্রেড ইউনিয়নে যোগ দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছিল ।

সেই সময় আমি ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে কিছুই জানতাম না । এগুলোর উপযোগিতা বা অন্যথা নিয়ে কোনো মতামত গঠনের সুযোগ আমার ছিল না । কিন্তু যখন আমাকে বলা হলো যে আমাকে একটি ইউনিয়নে যোগ দিতেই হবে , আমি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। আমার প্রত্যাখ্যানের কারণগুলো ছিল খুবই সাধারণ: আমি এ সম্পর্কে কিছুই জানতাম না এবং কোনো কিছুতে জোর করে রাজি হতে চাইনি ।
এই প্রথম কারণটিই সম্ভবত আমাকে তাৎক্ষণিক বহিষ্কার থেকে বাঁচিয়েছিল।
আমার ধারণা, তারা ভেবেছিল যে কয়েক দিনের মধ্যেই আমাকে বদলে ফেলবে এবং আরও বাধ্য করে তুলবে । কিন্তু যদি তারা এমনটা ভেবে থাকে , তবে তারা পুরোপুরি ভুল ছিল । দুই সপ্তাহ পর আমি বুঝতে পারলাম যে, প্রথমে চাইলেও আমার পক্ষে এমন একটা পদক্ষেপ নেওয়া একেবারেই অসম্ভব ছিল ।
এই চৌদ্দ দিনে আমি আমার সহকর্মীদের আরও ভালোভাবে জানতে পারলাম, এবং পৃথিবীর কোনো শক্তিই আমাকে এমন একটি সংস্থায় যোগ দিতে বাধ্য করতে পারত না , যার প্রতিনিধিরা ইতিমধ্যে নিজেদেরকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছিল যা আমার কাছে অত্যন্ত প্রতিকূল বলে মনে হয়েছিল।

সেই প্রথম দিনগুলোতে আমার ক্ষোভ আরও তীব্র হয়ে উঠল ।

দুপুরে আমার কিছু সহকর্মী কাছের পাবে চলে যেত , আর বাকিরা নির্মাণস্থলেই থেকে যেত এবং তাদের দুপুরের খাবার খেত, যা সাধারণত খুবই সামান্য হতো। এরা সবাই বিবাহিত পুরুষ ছিল। তাদের স্ত্রীরা নড়বড়ে হাঁড়িতে করে তাদের জন্য স্যুপ নিয়ে আসত । সপ্তাহের শেষের দিকে, নির্মাণস্থলে থেকে দুপুরের খাবার খাওয়া লোকের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল । পরে আমি কারণটা বুঝতে পারলাম। এখন তারা রাজনীতি নিয়ে কথা বলছিল।

শহরতলির কোনো এক জায়গায় আমি আমার সামান্য রুটিটা খেলাম আর বোতল থেকে দুধ পান করলাম , আর সতর্কভাবে চারপাশটা পর্যবেক্ষণ করলাম অথবা নিজের দুর্দশার কথা ভাবলাম । কিন্তু তা সত্ত্বেও, আমি প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশিই শুনলাম । আমার প্রায়ই মনে হতো , তাদের বলা কিছু কথা হয়তো আমাকে শোনানোর উদ্দেশ্যেই বলা হচ্ছিল, যাতে আমার ওপর কোনো একটা সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু আমি যা শুনলাম, তা কেবল আমার ভেতরের তীব্রতম বিরোধিতাকেই আরও বাড়িয়ে তুলল । সবকিছুকেই হেয় করা হচ্ছিল—জাতিকে, কারণ সে-ই 'পুঁজিবাদী' শ্রেণির জন্ম দিয়েছে (এই কথাটা আমাকে কতবার যে শুনতে হয়েছে !); পিতৃভূমিকে, কারণ তা বুর্জোয়াদের হাতে শ্রমজীবী জনগণকে শোষণ করার একটি হাতিয়ার; আইনের কর্তৃত্বকে, কারণ তা সর্বহারাকে দমন করার একটি উপায়; ধর্মকে, মানুষকে শোষণ করার জন্য এক নেশার বস্তু হিসেবে; আর নৈতিকতাকে, নির্বোধ আত্মসমর্পণের চিহ্ন হিসেবে । এমন কিছুই ছিল না যা তারা কাদায় মাখামাখি করবে না।

প্রথমে আমি চুপ করে ছিলাম; কিন্তু এটা বেশিদিন স্থায়ী হতে পারেনি । তারপর আমি আলোচনায় অংশ নিতে এবং তাদের দাবিগুলো খণ্ডন করতে শুরু করলাম। দুর্ভাগ্যবশত, আমাকে স্বীকার করতে হলো যে এই প্রচেষ্টা ছিল সম্পূর্ণ নিষ্ফল, কারণ আলোচিত বিষয়গুলো সম্পর্কে আমার কাছে পর্যাপ্ত সঠিক তথ্য ছিল না। তাই আমি সেই উৎসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম , যেখান থেকে আমার আলাপচারীরা তাদের তথাকথিত জ্ঞান আহরণ করত। আমি একের পর এক বই , একের পর এক পুস্তিকা গোগ্রাসে পড়লাম ।

এদিকে, আমরা নির্মাণস্থলে একে অপরের সাথে তর্ক করছিলাম । দিন দিন আমি হয়ে উঠছিলাম
যেসব বিষয়ে আমার সঙ্গীরা নিজেদের বিশেষজ্ঞ বলে দাবি করত , সেসব বিষয়ে আমি তাদের চেয়ে বেশি অবগত ছিলাম ।
তারপর সেই দিনটি এল, যখন আমার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর প্রতিপক্ষরা যুক্তির শক্তিকে প্রতিস্থাপন করার জন্য তাদের হাতে থাকা সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্রটি ব্যবহার করল। সেটি ছিল ভীতি প্রদর্শন এবং শারীরিক শক্তি। আমার প্রতিপক্ষদের মধ্যে কয়েকজন নেতা আমাকে নির্মাণস্থল ছেড়ে চলে যেতে অথবা মাচা থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়ার আদেশ দিল। যেহেতু আমি সম্পূর্ণ একা ছিলাম, তাই কোনো শারীরিক প্রতিরোধ করতে পারিনি ; ফলে আমি প্রথম বিকল্পটি বেছে নিলাম এবং চলে গেলাম, তবে অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে ।

Machine Translated by Google

আমি বিতৃষ্ণা নিয়ে চলে এসেছিলাম; কিন্তু একই সাথে, আমি এতটাই এগিয়ে গিয়েছিলাম যে পুরো পরিস্থিতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া এবং এ নিয়ে আর না ভাবা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল । আমার রাগ যখন কমতে শুরু করল , আমার জেদি মনোভাব ফিরে এল, এবং আমি যে কোনো মূল্যে নির্মাণ কাজে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। কয়েক সপ্তাহ পরে এই সিদ্ধান্তটি আরও দৃঢ় হলো , যখন আমার সামান্য সঞ্চয় পুরোপুরি শেষ হয়ে গেল এবং ক্ষুধা আবারও তার নির্মম থাবায় আমাকে আঁকড়ে ধরল। আমার আর কোনো উপায় ছিল না। আমি আবার কাজ শুরু করেছিলাম এবং আগের মতোই একই কারণে আমাকে তা থামাতে হয়েছিল ।

তখন আমি নিজেকে প্রশ্ন করলাম: এই লোকগুলো কি একটি মহান জাতির অংশ হওয়ার যোগ্য ? প্রশ্নটি ছিল অত্যন্ত পীড়াদায়ক; যদি উত্তর হয় 'হ্যাঁ', তবে এমন একদল উচ্ছৃঙ্খল লোকের স্বার্থে নিজেদের জাতীয়তা রক্ষার লড়াইটা, যা আমরা আমাদের সেরা মানুষদের কাছ থেকে দাবি করি, তার যোগ্য নয় । অন্যদিকে, যদি উত্তর হয় 'না—এই লোকগুলো একটি জাতির যোগ্য নয়,' তবে আমাদের জাতি আসলেই খুব অল্প কিছু লোক নিয়ে গঠিত । মানসিক যন্ত্রণা আর গভীর চিন্তার এই দিনগুলোতে , আমি আমার মনে এমন এক ক্রমবর্ধমান ও ভয়ংকর সৈন্যবাহিনীকে দেখতে পেলাম , যাদেরকে আর তাদের নিজেদের জাতির অংশ বলে গণ্য করা যায় না।

কয়েক দিন পর, এক গণবিক্ষোভে ভিয়েনার শ্রমিকদের অগণিত সারিকে হাতে হাত ধরে মিছিল করতে দেখাটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন এক অনুভূতি। আমি প্রায় দুই ঘণ্টা বাকরুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম, আমার সামনে এই বিশাল মানব-ড্রাগনকে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে দেখছিলাম। অবশেষে যখন আমি চত্বরটি ছেড়ে আমার কোয়ার্টারের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম, তখন আমি আতঙ্কিত ও বিষণ্ণ বোধ করছিলাম। পথে, একটি তামাকের দোকানে আমি 'আর্বাইটারৎসাইটুং' (শ্রমিকদের দৈনিক) দেখতে পেলাম। এটি ছিল পুরোনো অস্ট্রিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের প্রধান সংবাদপত্র। যে সস্তা ক্যাফেতে সাধারণ মানুষ জড়ো হতো এবং যেখানে আমি প্রায়ই সংবাদপত্র পড়তে যেতাম , সেখানেও 'আর্বাইটারৎসাইটুং' ছিল। কিন্তু তার আগ পর্যন্ত, আমি এটা পড়ার সাহস করতে পারিনি।

আমি কয়েক মিনিটের জন্য ওই জঘন্য জিনিসটার দিকে তাকাতে নিজেকে বাধ্য করলাম: এর পুরো সুরটাই আমার জন্য এক ধরনের মানসিক বিষের মতো ছিল। আমি যে বিক্ষোভটি দেখেছিলাম তার হতাশাজনক প্রভাবে , ভেতরের কোনো এক কণ্ঠ আমাকে তামাকের দোকান থেকে খবরের কাগজটা কিনে পড়তে বলল । আমি সেটা বাড়ি নিয়ে এলাম এবং ক্রমাগত মিথ্যের স্রোতে আমার ক্রোধ বাড়তে থাকা সত্ত্বেও , পুরো সন্ধ্যাটা ওটা পড়েই কাটালাম।

তখন আমি দেখলাম যে, সামাজিক গণতান্ত্রিক দৈনিক পত্রিকাগুলোতে এই রাজনৈতিক ও দার্শনিক ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত স্বরূপ অন্য যেকোনো মাধ্যমের চেয়ে অনেক ভালোভাবে অধ্যয়ন করা যায়।
তাদের সমস্ত তাত্ত্বিক সাহিত্যে।

তাদের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট বৈসাদৃশ্য ছিল । সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বের উপর রচিত সাহিত্যকর্মে স্বাধীনতা, মানব মর্যাদা এবং সৌন্দর্য সম্পর্কে উচ্চমার্গের শব্দচয়ন থাকত, যা গভীর প্রজ্ঞা এবং ভবিষ্যদ্বাণীমূলক আশ্বাসের আবহে প্রচারিত হত ; এটি ছিল পাঠককে অন্ধ ও বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত, নিপুণভাবে বোনা শব্দের এক ঝলমলে সমাহার । অন্যদিকে, দৈনিক সংবাদপত্রগুলো সবচেয়ে নৃশংস উপায়ে এই নতুন মানব পরিত্রাণের মতবাদটি প্রচার করত। কুৎসা রটানোর অভিযানে ব্যবহার করা গেলে কোনো উপায়ই তাদের কাছে খুব জঘন্য বলে গণ্য হত না । এই সাংবাদিকেরা তথ্য বিকৃত করা এবং সেগুলোকে প্রতারণামূলক রূপে উপস্থাপন করার শিল্পে প্রকৃত ওস্তাদ ছিলেন । তাত্ত্বিক সাহিত্য ছিল মধ্যবিত্ত এবং স্বাভাবিকভাবেই উচ্চবিত্ত শ্রেণীর বোকা এবং তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের জন্য উদ্দিষ্ট । সংবাদপত্রের প্রচারণা ছিল সাধারণ জনগণের জন্য।

বই ও সংবাদপত্রে নিমগ্ন থাকা এবং সমাজতন্ত্রের শিক্ষা অধ্যয়ন আমার নিজ দেশের প্রতি ভালোবাসা পুনর্জাগরিত করেছিল । এবং যা প্রথমে এক অসাধ্য বলে মনে হয়েছিল
অতল গহ্বরটি গভীরতর সহানুভূতির সুযোগ হয়ে উঠল ।

ব্যাপক মন-বিষক্রিয়ার এই সুবিশাল ব্যবস্থার কার্যপ্রণালী বোঝার পর, কেবল একজন বোকাই এর শিকারদের দোষ দিতে পারে। পরবর্তী বছরগুলোতে আমি আরও স্বাধীন হয়ে উঠি এবং এই সমাজতান্ত্রিক মতবাদের সাফল্যের পেছনের অভ্যন্তরীণ কারণগুলো আরও ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম হই। আমি সেইসব নিষ্ঠুর আদেশের অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিলাম, যা 'লাল' নয় এমন বই ও সংবাদপত্র পড়া নিষিদ্ধ করত এবং একই সাথে তা বাধ্যতামূলকও করত।

Machine Translated by Google

শুধুমাত্র 'লাল' সভাগুলোতে যোগদান করতাম। নির্মম বাস্তবতার স্পষ্ট আলোয় আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, এই ধরনের অসহনশীল শিক্ষার অনিবার্য পরিণতি কী।

জনসাধারণের মনস্তত্ত্ব কেবল শক্তিশালী ও আপোষহীনকেই উপলব্ধি করে। ঠিক যেমন একজন নারী, যার মানসিক অবস্থা বিমূর্ত যুক্তির চেয়ে তার প্রকৃতির পরিপূরক এক শক্তির জন্য এক অস্পষ্ট আবেগিক আকাঙ্ক্ষা দ্বারা বেশি সংজ্ঞায়িত হয়, এবং যে একজন দুর্বলকে বশীভূত করার চেয়ে একজন শক্তিশালী পুরুষের কাছে নত হতে বেশি পছন্দ করে , তেমনি সাধারণ মানুষ একজন আবেদনকারীর চেয়ে একজন নেতাকে বেশি পছন্দ করে এবং তাদেরকে স্বাধীন পছন্দের সুযোগ দেওয়ার চেয়ে এমন এক মতবাদ দ্বারা অধিকতর মানসিক নিরাপত্তায় পূর্ণ থাকে যা নিজেকে ছাড়া আর কিছুই সহ্য করে না । কীভাবে এমন পছন্দ করতে হয় সে সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই এবং তাই তারা পরিত্যক্ত বোধ করার প্রবণতা দেখায় । বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে আতঙ্কিত হতে তাদের কোনো লজ্জা নেই এবং তারা প্রায় অজ্ঞাত যে মানুষ হিসেবে তাদের স্বাধীনতা নির্লজ্জভাবে অপব্যবহার করা হয়েছে; তাই, সমগ্র মতবাদটির অন্তর্নিহিত ভ্রান্তি সম্পর্কে তাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তারা কেবল এর পরিকল্পিত প্রকাশগুলোর নির্মম শক্তি ও পাশবিকতা দেখে, যার কাছে তারা শেষ পর্যন্ত সর্বদা আত্মসমর্পণ করে।

যদি সমাজতন্ত্রের প্রতিপক্ষ আরও সত্য কোনো মতবাদ হতো, কিন্তু সমান নৃশংস পদ্ধতি ব্যবহার করত, তাহলে শেষোক্তটিই জয়ী হতো, যদিও এর জন্য হয়তো এক অত্যন্ত তিক্ত লড়াইয়ের প্রয়োজন হতো ।

দুই বছরেরও কম সময়ে আমি অপারেশনের তত্ত্ব ও কৌশল উভয়ই স্পষ্টভাবে বুঝেছিলাম।
সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব।

আমি এই আন্দোলনের দ্বারা পরিচালিত আধ্যাত্মিক সন্ত্রাসের কৌশলের অন্যায়টি উপলব্ধি করেছিলাম, যা এমন এক বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়েছিল যারা নৈতিক বা আধ্যাত্মিকভাবে এই ধরনের আক্রমণ প্রতিহত করতে পারত না । সমাজতন্ত্রের কৌশলটি ছিল একটি নির্দিষ্ট সংকেতে তাদের প্রতিপক্ষের মধ্যে যাকে সবচেয়ে বিপজ্জনক বলে মনে করা হতো , তার বিরুদ্ধে মিথ্যা ও কুৎসার এক সত্যিকারের ঝড় বইয়ে দেওয়া, যতক্ষণ না প্রতিপক্ষরা সাহস হারিয়ে শান্তিতে বসবাসের আশায় আক্রান্ত লোকটিকে বলিদান করত । কিন্তু এই আশা সর্বদাই মূর্খতাপূর্ণ প্রমাণিত হয়েছে , কারণ তাদের কখনোই শান্তিতে থাকতে দেওয়া হয়নি।

এই ক্রুদ্ধদের ভয় না জাগা পর্যন্ত একই কৌশল বারবার পুনরাবৃত্তি করা হয়।
কুকুর ইঙ্গিতের মাধ্যমে তাদের শিকারের উপর পক্ষাঘাত সৃষ্টিকারী প্রভাব ফেলবে না ।

যেহেতু সমাজতন্ত্রীরা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে ভয়ের মূল্য সবচেয়ে ভালো বোঝেন, তাই তারা সবচেয়ে নির্মমভাবে তাদেরকেই আক্রমণ করেন যারা কোনো একটি আদর্শের প্রতি সত্যিকারের, নিঃশর্ত নিষ্ঠা প্রদর্শন করে—যা নিঃসন্দেহে এক বিরল গুণ। অন্যদিকে, তারা তাদের প্রতিপক্ষের মধ্যে থাকা প্রত্যেক দুর্বল ব্যক্তিকে , তার বুদ্ধিমত্তার আসল বা অনুমিত মানের ওপর নির্ভর করে , কমবেশি পরিমিতভাবে প্রশংসা করে । তারা ইচ্ছাশক্তিহীন একজন প্রতিভাবানের চেয়ে ইচ্ছাশক্তিহীন একজন মানুষকে বেশি ভয় পায়।
মাঝারি বুদ্ধিমত্তার একজন উদ্যমী মানুষ। কিন্তু তারা অত্যন্ত উৎসাহের সাথে প্রশংসা করে।
যারা বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি উভয় থেকেই বঞ্চিত ।

সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা এই ধারণা তৈরি করতে জানে যে, একমাত্র তারাই শান্তির রক্ষক । এইভাবে, অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কাজ করে কিন্তু তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য থেকে কখনও বিচ্যুত না হয়ে, তারা একের পর এক পদ লাভ করে; কখনও নীরব ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে, আবার কখনও প্রকাশ্য দিবালোকে ডাকাতির মাধ্যমে। তারা এই শেষোক্ত কৌশলটি তখন ব্যবহার করে , যখন জনগণের মনোযোগ এমন অন্য বিষয়ে সরে যায় যেখান থেকে তা সরতে চায় না, অথবা যখন জনমত ঘটনাটিকে এতটাই তুচ্ছ মনে করে যে তা নিয়ে কোনো কেলেঙ্কারি সৃষ্টি করা বা কোনো বিপজ্জনক প্রতিপক্ষের ক্রোধ উস্কে দেওয়া সম্ভব নয়।

এই কৌশলটি মানুষের দুর্বলতার সুনির্দিষ্ট মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে তৈরি এবং অপর পক্ষ বিষাক্ত গ্যাসের বিরুদ্ধে বিষাক্ত গ্যাস দিয়ে লড়াই করতে না শেখা পর্যন্ত এটি প্রায় গাণিতিক নিশ্চয়তার সাথে সফল হতেই হবে। অবহিত করা আমাদের কর্তব্য।
সকল দুর্বলদের কাছে এটি তাদের "হওয়া বা না হওয়া"-র প্রশ্ন।

আমি আরও বুঝতে পারলাম যে মনস্তাত্ত্বিক ভীতি প্রদর্শনের তাৎপর্য জনসাধারণের জন্যেও রয়েছে।
পাশাপাশি ব্যক্তির জন্যও। এখানেও সমাজতন্ত্রীরা মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবটি নিখুঁতভাবে গণনা করেছিল।

কর্মশালা ও কারখানায়, সভাকক্ষে এবং গণবিক্ষোভে সন্ত্রাস।
আরও শক্তিশালী সন্ত্রাসের প্রতিরোধের সম্মুখীন না হওয়া পর্যন্ত এটি সর্বদা কার্যকর থাকবে।

Machine Translated by Google

তারপর, অবশ্যই, দলটি প্রতিবাদের এক আতঙ্কিত চিৎকার তুলবে, গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে সেই রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাবে যাকে তারা এইমাত্র প্রত্যাখ্যান করেছে। এইভাবে, তারা সাধারণ বিভ্রান্তি বাড়িয়ে তোলে যাতে তারা অলক্ষ্যে নিজেদের লক্ষ্য অর্জনের আরও ভালো সুযোগ পায়। তাদের লক্ষ্য হলো সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে এমন কোনো নির্বোধ প্রাণীকে খুঁজে বের করা , যে এই ভয়ংকর ও ভীতিপ্রদ বিরোধীদের অনুগ্রহ লাভের নির্বোধ আশায়— যাতে ভবিষ্যতের কোনো ঘটনায় তারা তাকে মনে রাখে— এই বৈশ্বিক মহামারীর বিরোধিতা করতে পারে এমন সকলকে ধ্বংস করতে তাদের সাহায্য করবে ।

এই ধরনের একটি সফল কৌশল সমর্থক বা বিরোধী নির্বিশেষে জনসাধারণের মনে যে ছাপ ফেলে , তা কেবল তিনিই বিচার করতে পারেন যিনি সাধারণ মনকে বই থেকে নয় , বরং বাস্তব জীবন থেকে চেনেন। এইভাবে অর্জিত সাফল্যগুলো হলো...

সমাজতন্ত্রীদের সমর্থকরা এটিকে তাদের উদ্দেশ্যের ন্যায্যতার এক বিজয়চিহ্ন হিসেবে গ্রহণ করে; অন্যদিকে, পরাজিত প্রতিপক্ষ প্রায়শই আরও প্রতিরোধের কার্যকারিতার ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলে ।

ব্যবহৃত মনস্তাত্ত্বিক ভীতি প্রদর্শনের পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে আমি যত বেশি বুঝতে পারছিলাম, সেগুলোর কাছে বশীভূত হওয়া জনতার প্রতি আমার সহানুভূতি ততই বাড়ছিল ।

সেই সময়ে আমাকে যে কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল, তার জন্য আমি এখন কৃতজ্ঞ ; কারণ আমি আবার আমার আপনজনদের সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করতে শুরু করি এবং অধিকন্তু, এই অভিজ্ঞতাগুলো আমাকে ভণ্ড নেতা ও তাদের দ্বারা প্রতারিত ভুক্তভোগীদের মধ্যে পার্থক্য করতে শিখিয়েছে ।

না।

আমাদের অবশ্যই শেষোক্তদেরকে কেবল ভুক্তভোগী হিসেবে দেখতে হবে। আমি উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি
সামাজিক সিঁড়ির সর্বনিম্ন স্তরের মানুষদের মানসিকতা প্রকাশ করে এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য; কিন্তু আমার চিত্রটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি আমি এটা যোগ না করি যে , এই গভীরতার মাঝেও আমি আলোর সন্ধান পেয়েছিলাম ; আমি এই মানুষগুলোর মধ্যে আত্মত্যাগ এবং বিশ্বস্ত ভ্রাতৃত্বের এক বিরল চেতনার অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, যারা জীবন থেকে সামান্যই প্রত্যাশা করত এবং তাদের সাধারণ পরিবেশেই সন্তুষ্ট ছিল। এই বিষয়টি বিশেষ করে শ্রমিকদের বয়স্ক প্রজন্মের ক্ষেত্রে সত্য ছিল। এবং যদিও বড় শহরের সর্বব্যাপী প্রভাবে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এই গুণগুলো ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল, তবুও তরুণ শ্রমিকদের মধ্যেও এমন অনেকেই ছিলেন যারা অন্তরে সুস্থ ছিলেন এবং দৈনন্দিন জীবনের ঘৃণ্য পরিস্থিতির মধ্যেও নিজেদের কলুষমুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই মানুষগুলো, যারা অনেক ক্ষেত্রেই সৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং ন্যায়পরায়ণ ও সৎ ছিলেন, যদি আমাদের জাতির সাধারণ শত্রুদের দ্বারা পরিচালিত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করে থাকেন, তবে তার একমাত্র কারণ ছিল এই যে, এই ভদ্র শ্রমিকেরা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকারীদের দ্বারা প্রচারিত মতবাদের নির্লজ্জ অপমান বুঝতে পারেননি এবং পারবেনও না । অধিকন্তু , এর কারণ ছিল সমাজের অন্য কোনো অংশই শ্রমিক শ্রেণীর ভাগ্য নিয়ে মাথা ঘামাত না । অবশেষে , সামাজিক পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, যারা অন্য পরিস্থিতিতে ভিন্নভাবে আচরণ করত , তারাও প্রাথমিকভাবে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল । যে দুর্দশার মধ্যে তারা পতিত হয়েছিল , তা শীঘ্র বা বিলম্বে তাদেরকে সামাজিক গণতন্ত্রের শিবিরে ঠেলে দিয়েছিল।

অগণিতবার বুর্জোয়া শ্রেণি শ্রমিক শ্রেণির এমনকি সবচেয়ে ন্যায্য মানবিক দাবিরও দ্ব্যর্থহীনভাবে বিরোধিতা করেছে । এই আচরণ ছিল অবিবেচনাপ্রসূত ও অনৈতিক, এবং তা বুর্জোয়া শ্রেণির কোনো উপকার বয়ে আনতে পারত না । ফলস্বরূপ, সৎ শ্রমিকেরা ট্রেড ইউনিয়নের মূল ধারণা ত্যাগ করে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে।

লক্ষ লক্ষ শ্রমিক সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির শত্রু হিসেবে যাত্রা শুরু করেছিল; কিন্তু তাদের প্রতিরোধ ক্রমাগত আক্রান্ত হওয়ায় শেষ পর্যন্ত তাদের আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল। এই পরাজয়ের কারণ ছিল বুর্জোয়া দলগুলোর নির্বুদ্ধিতা , যারা শ্রমিক শ্রেণীর উত্থাপিত প্রতিটি সামাজিক দাবির বিরোধিতা করেছিল। কাজের পরিবেশ উন্নত করার প্রচেষ্টা গ্রহণে দূরদৃষ্টিহীন অস্বীকৃতি ; কারখানায় দুর্ঘটনা প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণে অস্বীকৃতি ; শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করতে অস্বীকৃতি; নারী, বিশেষ করে গর্ভবতী নারীদের সুরক্ষার জন্য পদক্ষেপ বিবেচনা করতে অস্বীকৃতি – এই সবই ছিল সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক নেতাদের জন্য সুযোগ, যারা জনগণকে নিজেদের জালে টানার জন্য প্রতিটি সুযোগ কাজে লাগাতে পারলেই কৃতজ্ঞ থাকত । আমাদের বুর্জোয়া দলগুলো এর ফলে সৃষ্ট ক্ষতি কখনোই পূরণ করতে পারবে না ।

Machine Translated by Google

তারা তাদের কৃত ভুলের ফল ভোগ করছে। সামাজিক সংস্কারের সকল প্রচেষ্টার বিরোধিতা করে তারা ঘৃণার বীজ বপন করেছিল। এবং এভাবেই সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের করা দাবিগুলোকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য একটি দৃশ্যমান ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছিল – অর্থাৎ, একমাত্র তারাই প্রতিনিধিত্ব করে।
শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ।

আর এটাই ট্রেড ইউনিয়নের অস্তিত্বের নৈতিক ন্যায্যতা প্রতিপাদনের ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়, যার ফলে তখন থেকে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শ্রমিক সংগঠনগুলোই রাজনৈতিক কর্মী সংগ্রহের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয় ।

আমার চারপাশের সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে এই অধ্যয়নের সময়, আমি চাই বা না চাই, ট্রেড ইউনিয়নগুলোর প্রতি আমার কী মনোভাব থাকা উচিত, সেই সিদ্ধান্ত নিতে আমি বাধ্য হয়েছিলাম। যেহেতু আমি সেগুলোকে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখতাম, তাই আমার সিদ্ধান্তটি ছিল দ্রুত—এবং ভুল। আমি এক মুহূর্তও না ভেবে সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। তবে, এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভাগ্যও হস্তক্ষেপ করেছিল এবং আমাকে এমন একটি শিক্ষা দিয়েছিল যা আমার মতামত বদলে দিয়েছিল ।
প্রাথমিকভাবে আমি আকার দিয়েছিলাম।

বিশ বছর বয়সে আমি শ্রমিকদের সামাজিক অধিকার রক্ষা ও তাদের উন্নততর জীবনযাত্রার জন্য সংগ্রামের একটি মাধ্যম হিসেবে ট্রেড ইউনিয়ন এবং শ্রেণি সংগ্রামে দল কর্তৃক ব্যবহৃত একটি রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে পার্থক্য করতে শিখেছিলাম।

সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা ট্রেড ইউনিয়নের অপরিসীম গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিল। তারা সেগুলোকে একটি হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করে কার্যকরভাবে ব্যবহার করেছিল, অপরদিকে বুর্জোয়া দলগুলো তা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয় এবং ফলস্বরূপ তাদের রাজনৈতিক অবস্থান হারায়। তারা ভেবেছিল যে তাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ভেটো আন্দোলনের যৌক্তিক অগ্রগতি থামিয়ে দেবে, কিন্তু বাস্তবে তারা একে একটি অযৌক্তিক পথে চালিত করেছিল।
কিন্তু এটা বলা অযৌক্তিক ও অসত্য যে ট্রেড ইউনিয়নগুলো জন্মগতভাবেই জাতির প্রতি বিদ্বেষী। বরং ঠিক তার উল্টো। যদি ট্রেড ইউনিয়নের কার্যকলাপ শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে পরিচালিত হয় এবং তারা তাতে সফল হয়, তবে সেই কার্যকলাপ মাতৃভূমি-বিরোধী বা রাষ্ট্র- বিরোধী নয় , বরং শব্দটির প্রকৃত অর্থে তা জাতীয়তাবাদী। এইভাবে, ট্রেড ইউনিয়নগুলো একটি পূর্ণাঙ্গ জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক পরিস্থিতি তৈরিতে সাহায্য করে । যখন তারা সামাজিক ব্যাধির মনস্তাত্ত্বিক ও মানসিক জীবাণু ধ্বংস করে এবং এর মাধ্যমে জাতির সার্বিক কল্যাণ সাধন করে, তখন তারা উচ্চ প্রশংসার যোগ্য।

সুতরাং ট্রেড ইউনিয়ন প্রয়োজনীয় কিনা, তা জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন নেই ।

যতদিন এমন নিয়োগকর্তা থাকবেন যারা সামাজিক বিষয় বোঝেন না এবং ন্যায়বিচার ও ন্যায্যতার ধারণা রাখেন না , ততদিন এই কর্মচারীদের—যারা সর্বোপরি আমাদের জাতির অবিচ্ছেদ্য অংশ —ব্যক্তিবিশেষের লোভ ও মূর্খতার বিরুদ্ধে জনস্বার্থ রক্ষা করা কেবল অধিকারই নয়, কর্তব্যও বটে । জাতির আনুগত্য ও আস্থা রক্ষা করা রাষ্ট্রের জন্য ততটাই জরুরি, যতটা জনস্বাস্থ্য রক্ষা করা।

উভয়েই এমন অসাধু নিয়োগকর্তাদের দ্বারা গুরুতরভাবে হুমকির সম্মুখীন , যারা জাতীয় সমাজের সদস্য হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ । তাদের ব্যক্তিগত লোভ বা দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ভবিষ্যতের সমস্যার বীজ বপন করে। এই ধরনের ঘটনা নির্মূল করা গেলে তা নিঃসন্দেহে দেশের মঙ্গল বয়ে আনবে ।

এটা বলা ভুল যে প্রত্যেক শ্রমিক যেকোনো মুহূর্তে তার নিয়োগকর্তার হাতে বর্তমানে ভোগ করা অবিচার বা অনুমিত অবিচারের পরিণতি থেকে বাঁচতে পারে —অন্য কথায়, সে তার চাকরি ছেড়ে দিতে পারে । না। এই ধরনের যুক্তি সমস্যা থেকে মনোযোগ সরানোর একটি কৌশল মাত্র। সামাজিক অস্থিরতার কারণগুলো নির্মূল করা কি জাতীয় স্বার্থে? যদি তাই হয় , তবে এই লড়াই এমন অস্ত্র দিয়ে লড়তে হবে যা সফল হওয়ার সুযোগ দেয় । কিন্তু একজন ব্যক্তি শ্রমিক কখনোই একজন বড় নিয়োগকর্তার সমান ক্ষমতার অবস্থানে থাকবে না; কারণ এখানে আইনের জয় বিপন্ন নয়। যদি এই ধরনের সম্পর্কে আইনকে পথনির্দেশক নীতি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হতো , তাহলে কোনো সংঘাতই সৃষ্টি হতো না। প্রশ্ন হলো: কে বেশি শক্তিশালী? যদি তা না হতো, তবে ন্যায়বোধ সম্মানের সাথে বিবাদটির সমাধান করে দিত; অথবা, আরও সঠিকভাবে বললে, কোনো বিবাদই সৃষ্টি হতো না।

Machine Translated by Google

না। যদি মানুষের প্রতি অযোগ্য ও লজ্জাজনক আচরণ প্রতিরোধের জন্য দেয়, তবে শক্তিশালী পক্ষ সংঘাতে তাদের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারে, যতক্ষণ না সাংবিধানিক আইন প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ আইনের মাধ্যমে এই অশুভ শক্তিকে নির্মূল করে। সুতরাং এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, যদি কোনো একক শ্রমিকের সংগ্রামে জয়ী হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে, তবে তাকে অবশ্যই সহকর্মীদের একটি দলে থাকতে হবে এবং একটি ঐক্যবদ্ধ জোট গঠন করতে হবে।
সেই একক নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে একটি ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ, যিনি তার পরিচালিত শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিজের স্বার্থের সম্মিলিত শক্তিকে নিজের মধ্যেই ধারণ করেন ।

এইভাবে, ট্রেড ইউনিয়নগুলো দৈনন্দিন জীবনে সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তুলতে ও শক্তিশালী করতে পারে এবং বাস্তব ফলাফলের পথ প্রশস্ত করতে পারে । এর মাধ্যমে তারা সেইসব প্রতিবন্ধকতা দূর করে, যা অভিযোগ ও অসন্তোষের এক অবিরাম উৎস।

এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজটি পালনে ট্রেড ইউনিয়নগুলোর ব্যর্থতার দায়ভার বর্তায়
যারা নিজেদের রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে আইন প্রণয়নমূলক সামাজিক সংস্কারের পথে বাধা সৃষ্টি করে অথবা অন্তর্ঘাতের মাধ্যমে এ ধরনের সংস্কারকে অকার্যকর করে তোলে।

রাজনৈতিক বুর্জোয়া শ্রেণি ট্রেড ইউনিয়নের গুরুত্ব বুঝত না—কিংবা বলা ভালো, তারা বুঝতে চাইত না । সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা এই ভুল ধারণার সুযোগ নিয়েছিল ।
অপর পক্ষের কোনো প্রতিবাদ ছাড়াই তারা রাজনীতি দখল করে নেয় এবং শ্রমিক আন্দোলনকে তাদের একচেটিয়া সুরক্ষার অধীনে নিয়ে আসে । এভাবে তারা একটি মজবুত দুর্গ প্রতিষ্ঠা করে, যার আড়ালে সংগ্রাম সংকটময় মুহূর্তে তারা নিরাপদে আশ্রয় নিতে পারত । ফলে, আন্দোলনের প্রকৃত লক্ষ্যগুলো ধীরে ধীরে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায় এবং নতুন লক্ষ্য দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় । যে মূল লক্ষ্যগুলোর জন্য ট্রেড ইউনিয়নগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেগুলোকে সম্মান ও সমুন্নত রাখার বিষয়ে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা কখনোই মাথা ঘামায়নি । তারা কেবল নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পুরো আন্দোলনটিকেই ছিনতাই করে নিয়েছিল।

কয়েক দশকের মধ্যেই , সমাজতন্ত্রের অভিজ্ঞ নেতৃত্বে ট্রেড ইউনিয়নগুলো মানবাধিকার রক্ষার জন্য সৃষ্ট একটি হাতিয়ার থেকে জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামো ধ্বংসের হাতিয়ারে রূপান্তরিত হয়েছিল । এই লক্ষ্যের পথে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থকে এক মুহূর্তের জন্যও বাধা হতে দেওয়া হয়নি ; কারণ রাজনীতিতে অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগ করা সর্বদা সম্ভব , যদি এক পক্ষ যথেষ্ট নীতিহীন এবং অন্য পক্ষ যথেষ্ট নিষ্ক্রিয় ও বশ্যতা স্বীকারকারী হয়। এক্ষেত্রে, উভয় শর্তই পূরণ হয়েছিল।

* * *

এই শতাব্দীর শুরুতে , ট্রেড ইউনিয়নগুলো যে উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল , সেই কাজগুলো করা বন্ধ করে দেয় । বছর বছর ধরে, সেগুলো ক্রমশ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে চলে যেতে থাকে, অবশেষে শ্রেণি সংগ্রামে সেগুলোকে একটি আঘাতকারী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পরিকল্পনা ছিল, বারবার আঘাতের মাধ্যমে সেই অর্থনৈতিক কাঠামোটিকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়া , যা নির্মাণ করতে বহু সময় ও শ্রম লেগেছিল। এই লক্ষ্য অর্জিত হলে , রাষ্ট্রের ধ্বংস কেবল সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে, কারণ রাষ্ট্রের আর কোনো অর্থনৈতিক ভিত্তি থাকবে না ।

সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা শ্রমিক শ্রেণীর প্রকৃত স্বার্থের প্রতি ক্রমশ মনোযোগ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল , যতক্ষণ না...
অবশেষে , বিচক্ষণ নেতারা বুঝতে পারলেন যে ব্যাপক জনগণের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দাবিগুলো উপেক্ষিত থাকাই তাদের রাজনৈতিক স্বার্থে ছিল ; কারণ এই আশঙ্কা ছিল যে, জনগণের দাবিগুলো পূরণ করা হলে রাজনৈতিক সংগ্রামে তাদের আর নিষ্ক্রিয় উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না ।

শ্রেণী সংগ্রামের কন্ডোটিয়েরিদের চোখের সামনে যে ভয়াবহ সম্ভাবনাটি ভেসে উঠেছিল —যদি সেই যুদ্ধে জনগণের অসন্তোষ আর অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারযোগ্য না থাকে—তা তাদের এতটাই উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল যে, তারা এমনকি সবচেয়ে প্রাথমিক সামাজিক সংস্কারগুলোকেও বাধা দিত এবং বিরোধিতা করত । তাদের এই ধরনের আচরণের জন্য ব্যাখ্যার কোনো অভাব তাদের ছিল না , যা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক বলে মনে হতো।

জনসাধারণের দাবি যত বাড়তে ও তীব্র হতে থাকল , তা পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা ততই কমে গেল এবং গৃহীত যেকোনো প্রশমনমূলক পদক্ষেপও ক্রমশ আরও বেশি হয়ে উঠল ।

Machine Translated by Google

গুরুত্ব কমে গেল; তখন জনসাধারণকে এটা বোঝানো সম্ভব হলো যে, শ্রমিক শ্রেণীর সবচেয়ে মৌলিক অধিকারগুলো যেসব হাস্যকর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছিল, সেগুলো আসলে তাদের লড়াই করার ক্ষমতাকে সবচেয়ে সহজ উপায়ে দুর্বল করে দেওয়া এবং সম্ভব হলে পঙ্গু করে দেওয়ার এক শয়তানি পরিকল্পনা । এই দাবিগুলোর সাফল্য আশ্চর্যজনক নয় , যদি ব্যাপক জনসাধারণের চিন্তাশক্তির স্বল্পতার কথা মনে রাখা হয় ।

সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক কৌশলের সুস্পষ্ট কপটতায় বুর্জোয়া শিবিরে তীব্র ক্ষোভ ছিল; কিন্তু এর থেকে বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে এবং বুর্জোয়া পক্ষের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ সংগঠিত করতে কিছুই করা হয়নি। শ্রমিক শ্রেণীর শোচনীয় অবস্থার উন্নতির ব্যাপারে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিকদের যে ভয় ছিল, তা বুর্জোয়া দলগুলোতে এই দিকে সবচেয়ে জোরালো প্রচেষ্টা জাগিয়ে তোলার কথা ছিল এবং এর ফলে শ্রেণী সংগ্রামের নেতাদের তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র থেকে বঞ্চিত করার কথা ছিল ; কিন্তু সেরকম কিছুই ঘটেনি।

প্রতিপক্ষের অবস্থানে আক্রমণ করার পরিবর্তে বুর্জোয়া শ্রেণি হয়রানি ও কোণঠাসা হওয়াকেই শ্রেয় মনে করেছিল । পরিশেষে, তারা এতটাই বিলম্বিত ও নগণ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল যে তা অকার্যকর প্রমাণিত হয় এবং প্রত্যাখ্যাত হয়। বুর্জোয়া শ্রেণির হস্তক্ষেপের আগের মতোই সামগ্রিক পরিস্থিতি একই রয়ে গেল , শুধু অসন্তোষ আরও বেড়ে গেল ।

এক ভয়ংকর ঝড়ের মতো , 'মুক্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলো ' রাজনৈতিক দিগন্তে এবং প্রতিটি ব্যক্তির জীবনে ঘনিয়ে এসেছিল । এগুলো ছিল সন্ত্রাসের অন্যতম ভয়ঙ্কর হাতিয়ার, যা জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা , রাষ্ট্রের ভিত্তি এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর প্রধান কারণ ছিল এই যে, 'মুক্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলো ' গণতন্ত্রকে একটি হাস্যকর ও অবজ্ঞার বিষয় বানিয়ে ফেলেছিল , স্বাধীনতার আদর্শকে অপমান করেছিল এবং "যদি আমাদের কমরেড না হও, আমরা তোমার খুলি গুঁড়িয়ে দেব" —এই স্লোগানের মাধ্যমে ভ্রাতৃত্বকে কলঙ্কিত করেছিল ।

এভাবেই মানবতার এই বন্ধুর সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল। বছরের পর বছর ধরে আমার জ্ঞান আরও গভীর ও বিস্তৃত হয়েছে ; কিন্তু আমাকে কখনও কিছুই বদলাতে হয়নি।

সমাজতন্ত্রের বাহ্যিক রূপগুলোর সাথে আমি যতই পরিচিত হতে থাকলাম , ততই...
তাদের মতবাদের অন্তর্নিহিত স্বরূপ বোঝার আমার আকাঙ্ক্ষা আরও বেড়ে গেল ।

এই উদ্দেশ্যে দলের প্রাতিষ্ঠানিক প্রচারপত্র অনুপযুক্ত ছিল । অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনায় তাদের বক্তব্য ছিল মিথ্যা এবং তাদের প্রমাণ ছিল ত্রুটিপূর্ণ ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।
রাজনৈতিক লক্ষ্যের দিক থেকে তাদের মনোভাব ছিল কপটতাপূর্ণ। অধিকন্তু , যুক্তি উপস্থাপনের তাদের আধুনিক, ছলচাতুরী পদ্ধতি আমার কাছে অত্যন্ত বিরক্তিকর ছিল। তাদের কর্কশ ঘোষণা, তাদের জটিল ও দুর্বোধ্য বাক্যগুলোতে নাকি মহৎ ভাবনা রয়েছে , কিন্তু সেগুলো ছিল ভাবনাশূন্য ও অর্থহীন। এই মানসিক বিকৃতির গোলকধাঁধায় স্বচ্ছন্দ বোধ করতে , এই সাহিত্যিক দাদাবাদের দুর্গন্ধময় ধোঁয়ার মধ্যে 'ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা' খুঁজে পেতে হলে আমাদের আধুনিক শহরগুলোর কোনো এক শহরের একজন অধঃপতিত শিল্পী হতে হতো । এই লেখকেরা স্পষ্টতই আমাদের জাতির একটি নির্দিষ্ট অংশের প্রসিদ্ধ বিনয়ের উপর নির্ভর করেছিল, যারা বিশ্বাস করে যে, যে ব্যক্তি দুর্বোধ্যভাবে নিজেকে প্রকাশ করে, সে নিশ্চয়ই অসাধারণ জ্ঞানী।

এই মতবাদের তাত্ত্বিক মিথ্যাচার ও অযৌক্তিকতাকে এর বাহ্যিক প্রকাশের বাস্তবতার সাথে তুলনা করে , তারা যে লক্ষ্যগুলো অনুসরণ করে সে সম্পর্কে আমি ধীরে ধীরে একটি স্পষ্ট চিত্র পেলাম।

এমন মুহূর্তে আমার মনে অমঙ্গলের আশঙ্কা জাগত এবং কোনো অশুভ কিছুর ভয় হতো। আমি আমার সামনে দেখতাম স্বার্থপরতা ও ঘৃণার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এক মতবাদ , যা গাণিতিকভাবে বিজয়ের দিকেই চালিত করার জন্য পরিকল্পিত, অথচ এর বিজয় মানবজাতির জন্য এক মারাত্মক আঘাত হবে ।

ইতিমধ্যে , আমি এই ধ্বংসাত্মক মতবাদ এবং এর মধ্যে সংযোগগুলি আবিষ্কার করেছি
সেইসব মানুষের বিশেষ প্রকৃতি , যারা এ পর্যন্ত আমার কাছে প্রায় সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল।

ইহুদিদের সম্পর্কে জ্ঞানই একমাত্র চাবি যার দ্বারা বোঝা যায়
অন্তর্নিহিত প্রকৃতি এবং সেই সূত্রে সমাজতন্ত্রের প্রকৃত লক্ষ্যসমূহ।

যে ব্যক্তি এই জাতিকে জানতে পারে, সে কার্যকরভাবে তার চোখের সামনে থেকে সেই আবরণটি সরিয়ে ফেলতে পারে, যার আড়ালে সমাজতান্ত্রিক দলের কার্যকলাপের লক্ষ্য ও অর্থকে ভ্রান্ত দৃষ্টিতে দেখা যায়; এবং তখন, সামাজিক সূত্রায়নের অন্ধকার ও কুয়াশার আড়াল থেকে মার্কসবাদের বিকৃত রূপটি আবির্ভূত হয় ।

* * *

Machine Translated by Google

আজ আমার পক্ষে বলা কঠিন, এমনকি অসম্ভবও বটে , যে কখন 'ইহুদি' শব্দটি আমার মনে কোনো বিশেষ ভাবনা জাগাতে শুরু করেছিল। বাবার জীবদ্দশায় বাড়িতে শব্দটি শোনার কথাও আমার মনে পড়ে না । যদি শব্দটি কোনো অপমানজনক অর্থে উল্লেখ করা হতো, আমার মনে হয় , বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি যিনি সেভাবে শব্দটি ব্যবহার করতেন, তাকে একজন সাধারণ প্রতিক্রিয়াশীল বলে মনে করতেন। কর্মজীবনে তিনি কমবেশি বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছিলেন এবং তাঁর মধ্যে দৃঢ় জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছিল, যা আমাকেও প্রভাবিত করেছিল। স্কুলেও, বাড়িতে আমার যে ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছিল, তা বদলানোর কোনো কারণ আমি খুঁজে পাইনি ।

রিয়েলস্কুলে আমার এক ইহুদি ছেলের সাথে পরিচয় ছিল। আমরা সবাই তার সাথে মেলামেশার ব্যাপারে সতর্ক থাকতাম, কিন্তু তার কারণ ছিল তার লাজুক স্বভাব এবং কিছু বিশেষ আচরণ, যা আমাদের সংযম বজায় রাখতে বাধ্য করত । এছাড়া, তাকে নিয়ে আমার ও আমার সহপাঠীদের কোনো বিশেষ মতামত ছিল না।

চৌদ্দ- পনেরো বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত আমি 'ইহুদি' শব্দটি প্রায়শই শুনতে পেতাম না, কখনও কখনও রাজনৈতিক বিবাদের প্রসঙ্গে। এই উল্লেখগুলো আমাকে কিছুটা অস্বস্তিতে ফেলত।
বিতৃষ্ণা ছিল, এবং ধর্মীয় বিতর্ক শুনতে হলেই আমার মধ্যে যে অপ্রীতিকর অনুভূতিটা আসত, তা আমি ঝেড়ে ফেলতে পারতাম না । কিন্তু সেই সময়ে ইহুদি প্রশ্ন নিয়ে আমার অন্য কোনো অনুভূতি ছিল না ।

লিন্জে ইহুদির সংখ্যা ছিল খুবই কম । শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, এখানে বসবাসকারী ইহুদিরা চেহারায় ইউরোপীয় হয়ে উঠেছিল এবং অন্য মানুষদের মতোই দেখতে হয়ে গিয়েছিল , এতটাই যে আমি তাদের জার্মান বলেই মনে করতাম। এই ধরনের বিভ্রমের অযৌক্তিকতা আমি বুঝতে পারতাম না, কারণ আমাদের থেকে তাদের আলাদা করার একমাত্র চিহ্ন ছিল তাদের অদ্ভুত ধর্ম পালন। যখন আমি ভাবতাম যে তাদের বিশ্বাসের কারণে তাদের ওপর অত্যাচার করা হচ্ছে , তখন তাদের বিরুদ্ধে কোনো মন্তব্য শোনার প্রতি আমার বিতৃষ্ণা প্রায় ঘৃণার পর্যায়ে পৌঁছে যেত। আমি কল্পনাও করিনি যে পরিকল্পিত ইহুদি-বিদ্বেষ বলে কিছু থাকতে পারে ।

তারপর আমি ভিয়েনায় এলাম।

আমার চারপাশের স্থাপত্যিক পরিমণ্ডল থেকে পাওয়া বহুবিধ অনুভূতিতে মগ্ন এবং নিজের সমস্যায় জর্জরিত থাকায়, এই বিশাল শহরের জনসংখ্যার বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে আমি তাৎক্ষণিকভাবে পার্থক্য করতে পারিনি। যদিও সেই সময়ে ভিয়েনার মোট বিশ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় দুই লক্ষ ইহুদি ছিল, আমি তাদের খেয়াল করিনি । আমার থাকার প্রথম কয়েক সপ্তাহে, আমার চোখ ও মন নতুন ধারণা এবং মূল্যবোধের এই স্রোত সামলাতে পারছিল না। কেবল যখন আমি ধীরে ধীরে আমার চারপাশের পরিবেশে থিতু হলাম এবং বিভ্রান্তিকর চিত্রটি স্পষ্ট হতে শুরু করল , তখনই আমি আমার নতুন জগৎ সম্পর্কে একটি আরও পরিমার্জিত ধারণা পেলাম। আর তার সাথেই, আমি ইহুদি প্রশ্নের সম্মুখীন হলাম।

আমি বলতে পারি না যে তাদের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ আমার জন্য বিশেষভাবে অপ্রীতিকর ছিল। আমি তখনও একজন ইহুদিকে কেবল ভিন্ন ধর্মের একজন ব্যক্তি হিসেবেই দেখতাম, এবং তাই, মানবিক সহনশীলতার ভিত্তিতে, আমি তার ভিন্ন বিশ্বাসের কারণে তাকে আক্রমণ করার ধারণার বিরোধী ছিলাম। এইভাবে, ভিয়েনার ইহুদি-বিদ্বেষী সংবাদপত্রের গৃহীত সুরকে আমি একটি মহান জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অযোগ্য বলে মনে করেছিলাম। মধ্যযুগে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনার স্মৃতি মনে পড়ে গেল, এবং আমার মনে হলো আমি সেগুলো আর দেখতে চাই না । সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই ইহুদি-বিদ্বেষী সংবাদপত্রগুলো প্রথম সারির ছিল না —কিন্তু আমি তখন এর কারণ বুঝতে পারিনি—এবং আমি সেগুলোকে একটি আন্তরিক, যদিও ভ্রান্ত, বিশ্বাসের প্রকাশ না ভেবে বরং ঈর্ষা ও হিংসার ফল বলে মনে করতাম ।

এই আক্রমণগুলোর জবাবে বড় বড় সংবাদপত্রগুলো যে অসীমভাবে আরও মর্যাদাপূর্ণ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল, অথবা সেগুলোকে স্রেফ উপেক্ষা করেছিল—যা সবচেয়ে সম্মানজনক পন্থা বলে মনে হয়েছিল— তা দেখে আমার নিজের মতামতই আরও দৃঢ় হয়েছিল ।

আমি তথাকথিত বিশ্ব সংবাদমাধ্যম —যেমন নয়ে ফ্রাই প্রেস, ভিয়েনার টাগেব্লাট ইত্যাদি—মনোযোগ দিয়ে পড়তাম এবং তারা পাঠকদের যে পরিমাণ তথ্য দিত ও যে নিরপেক্ষতার সাথে প্রতিটি বিষয় উপস্থাপন করত, তা দেখে আমি বিস্মিত হতাম। তাদের সম্ভ্রান্ত বাচনভঙ্গি আমার ভালো লাগত না; কিন্তু মাঝে মাঝে তাদের লেখার বাড়াবাড়িটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হতো না এবং আমার তা পছন্দ হতো না। তবে, এর কারণ হিসেবে আমি বিশ্বনগরীর প্রবল প্রভাবকেই দায়ী করতাম ।

Machine Translated by Google

যেহেতু আমি তখন ভিয়েনাকে একটি বিশ্বনগরী হিসেবে বিবেচনা করতাম , তাই আমার মনে হয়েছিল সংবাদমাধ্যমের ত্রুটিগুলো ক্ষমা করার জন্য এটাই যথেষ্ট কারণ। কিন্তু ভিয়েনার সংবাদমাধ্যম যেভাবে রাজদরবারের চাটুকারের ভূমিকা পালন করত, তা দেখে আমি প্রায়শই বিরক্ত হতাম। হফবুর্গের এমন কোনো ঘটনা প্রায় ছিলই না, যা পাঠকদের কাছে প্রশংসার সুরে উপস্থাপন করা হয়নি। এটি ছিল একটি নির্বোধ অভ্যাস, যা বিশেষ করে "সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী রাজা"-র প্রসঙ্গে, আমাকে পাহাড়ি মোরগদের মাদী মোরগকে প্রেম নিবেদনের নাচের কথা মনে করিয়ে দিত। এটা ছিল স্রেফ অর্থহীন। রাজদরবারের অনুগ্রহ লাভের এই পদ্ধতিকে আমি জাতির জন্য অযোগ্য বলে মনে করতাম। আর এটাই ছিল মহান ভিয়েনীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতি আমার শ্রদ্ধার ওপর প্রথম কলঙ্ক।

ভিয়েনায় থাকাকালীন আমি জার্মানিতে ঘটে চলা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনাবলী গভীর আগ্রহের সাথে অনুসরণ করতে থাকলাম। নবীন জার্মান রাইখের উত্থানকে অস্ট্রিয়ান রাষ্ট্রের পতনের সাথে তুলনা করে আমি এক ধরনের গর্ব ও মুগ্ধতা অনুভব করলাম। কিন্তু রাইখের পররাষ্ট্রনীতি যেখানে সাধারণ আনন্দের উৎস ছিল, এর অভ্যন্তরীণ রাজনীতি সবসময় ততটা সন্তোষজনক ছিল না। দ্বিতীয় ভিলহেলমের বিরুদ্ধে তখন যে অভিযান চলছিল, আমি তার সাথে একমত ছিলাম না। আমি তাঁকে শুধু জার্মান সম্রাট হিসেবেই নয়, সর্বোপরি জার্মান নৌবাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে দেখতাম। সম্রাটকে রাইখস্ট্যাগে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছিল, এই ঘটনাটি আমাকে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ করেছিল, কারণ এই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল তারাই, যাদের তা জারি করার কোনো অধিকার ছিল না। একটিমাত্র অধিবেশনেই এই একই সংসদীয় নির্বোধরা এত বেশি আজেবাজে কথা বলেছিল, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সম্রাটদের সমগ্র রাজবংশ, এমনকি সবচেয়ে দুর্বল সম্রাটরাও, বলতে পারেনি।

এটা জেনে আমার বিরক্তি লাগত যে, এমন একটি দেশে যেখানে যেকোনো নির্বোধ ক্ষুদ্র ব্যক্তি শুধু সমালোচনা করার অধিকারই দাবি করে না, বরং জনগণের দ্বারা রাইখস্ট্যাগের 'আইনপ্রণেতা' হিসেবেও নির্বাচিত হতে পারে, সেখানে রাজমুকুট পরিহিত একজন ব্যক্তিকে ইতিহাসের সবচেয়ে জঘন্য, আজেবাজে কথা বলা লোকদের সমাবেশ 'তিরস্কার' করতে পারে।

আমি আরও বেশি ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম যেভাবে ভিয়েনার সংবাদপত্রগুলো হ্যাবসবার্গদের অশ্ববাহিনীর সবচেয়ে জঘন্য ঘোড়াটির সামনেও দাসসুলভ ভঙ্গিতে নতজানু হতো , এবং ঘোড়াটা জবাবে লেজ নাড়লেই উন্মত্ত উল্লাসে ফেটে পড়ত। একই সাথে, এই সংবাদপত্রগুলো জার্মান সম্রাট সম্পর্কিত বিষয়ে এক অস্বস্তিকর মনোভাব গ্রহণ করেছিল এবং একটি গম্ভীর ভাব দেখিয়ে তাদের বৈরিতাকে ঢাকার চেষ্টা করত। অবশ্যই, তারা তাকে আশ্বস্ত করেছিল যে জার্মানির অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার কোনো ইচ্ছা তাদের নেই— ঈশ্বর না করুন! তারা ভান করত যে, একটি সংবেদনশীল বিষয়কে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে স্পর্শ করার মাধ্যমে তারা দুই দেশের পারস্পরিক মৈত্রীর দ্বারা আরোপিত বাধ্যবাধকতা এবং একই সাথে সাংবাদিকতার সত্যনিষ্ঠার কর্তব্য পালন করছে। এইভাবে নিজেদের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করতে গিয়ে তারা নির্মমভাবে ক্ষতের উপর আরও খোঁচা দিয়েছিল।

এইসব ঘটনায় আমার মেজাজ গরম হয়ে যেত। ভিয়েনার সংবাদপত্রগুলো পড়ার পর আমি ক্রমশ সন্দিহান হয়ে উঠলাম।

আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে এই ধরনের বিষয়ে ইহুদি-বিদ্বেষী সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে একটি – ডয়েচে ভল্কসব্লাট – তুলনামূলকভাবে শালীন আচরণ করেছিল।

আরও বিরক্তিকর ছিল প্রধান সংবাদপত্রগুলোর ফ্রান্সের প্রতি প্রশংসা আদায়ের জঘন্য পদ্ধতি। "মহান, সংস্কৃতিবান জাতি"-র প্রশংসায় ভরা এই সুরেলা স্তবগানগুলোর মুখোমুখি হয়ে জার্মান হিসেবে লজ্জিত বোধ করাটাই স্বাভাবিক ছিল। ফরাসিদের পা চাটার এই অভিশপ্ত কাজটি প্রায়শই আমাকে এই "বিশ্ব সংবাদপত্রগুলো" প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য করত। আমি প্রায়শই 'ভক্সব্লাট'-এর দিকে হাত বাড়াতাম, যেটি আকারে অনেক ছোট হলেও এই ধরনের বিষয়গুলোকে আরও শালীনভাবে উপস্থাপন করত। এর তীব্র ইহুদি-বিদ্বেষী সুরের সাথে আমি একমত ছিলাম না; কিন্তু বারবার সেখানে এমন সব যুক্তি খুঁজে পেয়েছি যা আমাকে গভীরভাবে ভাবার খোরাক জুগিয়েছে।

যাই হোক, এই পাঠের ফলে আমি সেই ব্যক্তি ও আন্দোলনকে জানতে পারলাম, যারা তৎকালীন ভিয়েনার ভাগ্য নির্ধারণ করেছিল। তারা ছিলেন ডক্টর কার্ল লুয়েগার এবং খ্রিস্টান সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন। আমি যখন ভিয়েনায় পৌঁছালাম, তখন তাদের বিরোধিতা করেছিলাম। আমি এই ব্যক্তি ও তার আন্দোলনকে 'প্রতিক্রিয়াশীল' হিসেবে দেখতাম।

Machine Translated by Google

কিন্তু যখন সেই মানুষটি ও তাঁর কাজের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেলাম, তখন ন্যায়ের এক মৌলিক বোধ আমাকে আমার মত বদলাতে বাধ্য করেছিল , এবং বিচার করার আরও ভালো ভিত্তি পাওয়ার পর ধীরে ধীরে সেই মতামত নিখাদ প্রশংসায় পরিণত হলো । আজও, আগের মতোই, আমি ড.
কার্ল লুগার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জার্মান মেয়র হিসেবে। কতগুলো কুসংস্কার।
খ্রিস্টান সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি আমার মনোভাব পরিবর্তনের সাথে সাথে আমি এটি প্রত্যাখ্যান করেছি !

সময়ের সাথে সাথে ইহুদি-বিদ্বেষ নিয়ে আমার ধারণাও বদলে গিয়েছিল , কিন্তু এই পরিবর্তনটাই আমার জন্য সবচেয়ে কঠিন ছিল। এর জন্য আমাকে অনেক অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, এবং যুক্তি ও আবেগের লড়াইয়ের পর , পাল্লা যুক্তির দিকেই ঝুঁকতে শুরু করে । দুই বছর পর, আবেগ যুক্তিকে অনুসরণ করে এক বিশ্বস্ত অভিভাবক ও উপদেষ্টা হয়ে উঠল।

ঠান্ডা যুক্তি এবং যে আবেগ নিয়ে আমি বড় হয়েছি, তার মধ্যকার এই তিক্ত সংগ্রামের সময়ে , ভিয়েনার রাস্তায় শেখা শিক্ষাগুলো আমাকে অমূল্য সাহায্য করেছিল । এমন একটা সময় এল যখন আমি আর আগের মতো বড় শহরের রাস্তায় উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতাম না , বরং আমার চোখ শুধু দালানকোঠাগুলোকেই নয়, মানুষগুলোকেও পর্যবেক্ষণ করার জন্য উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল।

একবার শহরের কেন্দ্রস্থলে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ আমার সামনে এক অদ্ভুত অবয়ব ভেসে উঠল, যার পরনে ছিল লম্বা কাফতান আর দু'পাশে ঝুলছিল কালো চুলের গোছা। আমার প্রথম ভাবনা ছিল: এ কি ইহুদি? লিন্জে তো তাদের দেখতে এমন হয় না। আমি লোকটিকে সতর্ক ও সন্তর্পণে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম; কিন্তু যতই আমি এই অদ্ভুত মুখটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলাম, এর প্রতিটি বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করছিলাম, ততই আমার মস্তিষ্কে প্রথম প্রশ্নটা দানা বাঁধতে লাগল: এ কি জার্মান?

এই ধরনের ক্ষেত্রে আমার অভ্যাসমতো, সন্দেহ দূর করার জন্য আমি বইয়ের সাহায্য নিলাম । জীবনে প্রথমবারের মতো আমি বেশ কয়েকটি ইহুদি-বিদ্বেষী প্রচারপত্র কিনলাম। দুর্ভাগ্যবশত, সেগুলোর সবকটিতেই ধরে নেওয়া হয়েছিল যে পাঠকের ইহুদি প্রশ্ন সম্পর্কে আগে থেকেই কিছু জ্ঞান আছে বা তিনি এ বিষয়ে পরিচিত। অধিকন্তু, এই প্রচারপত্রগুলোর বেশিরভাগের সুর এমন ছিল যে আমি আবার সন্দেহ করতে শুরু করলাম , কারণ বক্তব্যগুলো ছিল আংশিকভাবে অগভীর এবং প্রমাণগুলো ছিল অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক। সপ্তাহ, এমনকি মাস ধরেও আমি আমার পুরোনো চিন্তাভাবনায় ফিরে গেলাম। বিষয়টি এতটাই বিশাল এবং অভিযোগগুলো এতটাই সুদূরপ্রসারী মনে হচ্ছিল যে, আমার প্রতি অন্যায় আচরণের ভয় হচ্ছিল এবং আমি আবারও অনিশ্চিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম।

স্বাভাবিকভাবেই, আমার আর কোনো সন্দেহ ছিল না যে এরা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী জার্মান নয় , বরং সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জাতি । যখন আমি এই বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করলাম এবং ইহুদিদের পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম, তখন ভিয়েনাকে আমি এক ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে পেলাম। আমি যেখানেই যেতাম, সেখানেই ইহুদিদের দেখতাম, এবং যত বেশি তাদের দেখতাম, ততই এটা স্পষ্ট ও প্রকট হয়ে উঠত যে তারা অন্য নাগরিকদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জাতি । বিশেষ করে শহরের কেন্দ্র এবং দানিউব খালের উত্তরের জেলাগুলো এমন লোকে গিজগিজ করছিল, যারা এমনকি বাহ্যিক রূপেও জার্মানদের সাথে সমস্ত সাদৃশ্য হারিয়ে ফেলেছিল ।

কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার মনে তখনও যেটুকু দ্বিধা ছিল, তা অবশেষে একদল ইহুদির দ্বারা দূর হয়ে যায়। তাদের মধ্যে জায়নবাদ নামে এক বিরাট আন্দোলন গড়ে ওঠে। এর লক্ষ্য ছিল ইহুদি ধর্মের জাতীয় চরিত্রকে প্রকাশ করা, এবং ভিয়েনায় এই আন্দোলনের শক্তিশালী প্রতিনিধিত্ব ছিল।

বাহ্যিকভাবে দেখে মনে হচ্ছিল যে, কেবলমাত্র একটি ইহুদি গোষ্ঠীই এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিল, যেখানে সিংহভাগ মানুষই এর বিরোধিতা করত এবং এমনকি একে প্রত্যাখ্যানও করত। কিন্তু পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলে বোঝা গেল যে, এই বাহ্যিক রূপটি ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্তিকর ছিল। এই বাহ্যিক রূপটি বাস্তব কারণে তৈরি করা তত্ত্বের এক ধোঁয়াশা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল , যদিও তা সরাসরি প্রতারণা ছিল না । তথাকথিত উদারপন্থী ইহুদিরা জায়নবাদীদের নিজেদের জাতি হিসেবে অস্বীকার করেনি , বরং তাদের এমন সহ- ইহুদি হিসেবে গণ্য করত যারা অবাস্তব উপায়ে প্রকাশ্যে নিজেদের বিশ্বাসের কথা প্রচার করে সমগ্র ইহুদি সম্প্রদায়ের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল ।

তবে, তাদের অভ্যন্তরীণ সংহতিতে কোনো প্রকৃত মতবিরোধ ছিল না ।

Machine Translated by Google

জায়নবাদী ও উদারপন্থী ইহুদিদের মধ্যকার এই কাল্পনিক সংঘাত আমাকে বীতশ্রদ্ধ করেছিল; কারণ এটি ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং নৈতিকতার সরাসরি পরিপন্থী ।
মর্যাদা এবং অনবদ্য চরিত্র, যা নিয়ে এই প্রজাতিটি সর্বদা গর্ববোধ করে এসেছে।

নৈতিক হোক বা অন্য কোনো ধরনের পবিত্রতা , এই লোকগুলোর কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাদের দিকে তাকালেই জলের প্রতি তাদের বিতৃষ্ণা স্পষ্ট বোঝা যেত , এবং দুর্ভাগ্যবশত, প্রায়শই না তাকালেও তা বোঝা যেত। এই কাফতান-পরিহিত লোকগুলোর দুর্গন্ধে সাধারণত আমার বমি বমি ভাব হতো। এ ছাড়াও, তাদের পোশাক ছিল অপরিচ্ছন্ন এবং তাদের চেহারা ছিল জঘন্য।

এই সমস্ত বিবরণ অবশ্যই খুব সুখকর ছিল না; কিন্তু তা ছিল বিকর্ষণীয়।
তাদের জঘন্য বাহ্যিক রূপের আড়ালে 'নির্বাচিত জনগোষ্ঠীর' নৈতিক ছাঁচটি লুকানো ছিল ।

অল্প সময়ের মধ্যেই জীবনের কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ইহুদিদের কার্যকলাপের প্রতি আমি গভীরভাবে আগ্রহী হয়ে উঠলাম , যা ছিল এক রহস্য এবং আমি ধীরে ধীরে তার গভীরে প্রবেশ করতে লাগলাম। এমন কোনো সন্দেহজনক উদ্যোগ বা জঘন্য কাজ কি আছে , বিশেষ করে সাংস্কৃতিক জীবনে , যেখানে অন্তত একজন ইহুদি অংশগ্রহণ করে না ? যদি কেউ সাবধানে এমন একটি ফোঁড়া চিরে ফেলে , তবে সে সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পাবে, পচনশীল মাংসের মধ্যে থাকা পোকার মতো , এক ক্ষুদ্র ইহুদিকে, যে সাধারণত আকস্মিক আলোয় অন্ধ হয়ে যায়।

আমার চোখে, সংবাদমাধ্যম, শিল্পকলা, সাহিত্য এবং নাটকে ইহুদিদের কার্যকলাপ আবিষ্কার করার মুহূর্তেই ইহুদিদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো গুরুতর হয়ে উঠল। সমস্ত ভণ্ডামিপূর্ণ প্রতিবাদই নিষ্ফল । জঘন্য চলচ্চিত্র ও নাট্য প্রযোজনার বিজ্ঞাপনী পোস্টারগুলোর দিকে তাকালেই এবং প্রশংসিত লেখকদের নামগুলো যাচাই করলেই ইহুদি প্রশ্নে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় । এটা ছিল এক মহামারী, এক নৈতিক সংক্রামক ব্যাধি যা মানুষকে সংক্রমিত করেছিল। এটা প্রাচীনকালের ব্ল্যাক ডেথের চেয়েও ভয়াবহ ছিল । আর কী প্রচণ্ড মাত্রায়ই না এই বিষ উৎপাদিত ও বিতরণ করা হয়েছিল! অবশ্যই, এই ধরনের সৃষ্টির স্রষ্টার নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক স্তর যত নিম্ন, তার সৃষ্টিশীলতা ততই অফুরন্ত। কখনও কখনও পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, এই ধরনের বদমাশরা নর্দমার পাম্পের মতো কাজ করত, সরাসরি মানবতার মুখের ওপর ময়লা বর্ষণ করত। এবং আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই ধরনের মানুষের সংখ্যা অসীম। এটা উপলব্ধি করতে হবে যে, প্রত্যেক গ্যেটের জন্য প্রকৃতি দশ হাজার এমন লেখকের জন্ম দেয়, যারা মানবাত্মাকে বিষাক্তকারী জীবাণুর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বাহক হিসেবে কাজ করে ।

এটা এক ভয়াবহ চিন্তা ছিল, কিন্তু এটা না দেখে উপায় নেই যে, বিশেষ করে ইহুদিদেরকেই প্রকৃতি বিপুল সংখ্যায় এই লজ্জাজনক ভূমিকা পালনের জন্য বেছে নিয়েছিল।

তাহলে কি তাদেরকে মনোনীত জাতি বলা উচিত?

আমি জনজীবনের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এইসব অশুদ্ধ সৃষ্টির সমস্ত নির্মাতাদের নাম সতর্কতার সাথে অনুসন্ধান করতে শুরু করলাম । এই অনুসন্ধানের ফল ইহুদিদের প্রতি আমার পূর্বের মনোভাবের জন্য অত্যন্ত অপ্রীতিকর ছিল। যদিও আমার অনুভূতি হাজারবার বিদ্রোহ করেছিল , যুক্তিকে তার সিদ্ধান্তে পৌঁছাতেই হয়েছিল ।

এই সত্যটি অনস্বীকার্য ছিল যে, সমস্ত অশ্লীল সাহিত্য, শৈল্পিক আবোলতাবোল এবং নাট্যিক মামুলি কথার নয়- দশমাংশের কৃতিত্ব এমন সব লোকের দেওয়া যেতে পারে, যারা দেশের জনসংখ্যার এক শতাংশেরও কম । তাই আমি আমার প্রিয় "সংবাদমাধ্যম" নিয়ে তদন্ত শুরু করলাম।
এই ক্ষেত্রে "বিশ্ব"

আমি যতই এর গভীরে গেলাম, সংবাদমাধ্যমের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ততই কমতে লাগল ।
আমি আগে তাদের প্রশংসা করতাম। তাদের লেখার ধরণ ক্রমশ বিরক্তিকর হয়ে উঠল, এবং আমি তাদের ধারণাগুলোকে সম্পূর্ণ অগভীর ও অন্তঃসারশূন্য বলে প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হলাম । তাদের তথ্য ও মতামত উপস্থাপনের নিরপেক্ষতার দাবিটিতে সত্যের চেয়ে মিথ্যাই বেশি থাকতে শুরু করল । লেখকরা ছিলেন ইহুদি।

হাজারো খুঁটিনাটি বিষয়, যা আমি আগে তেমন খেয়াল করিনি, এখন মনোযোগ দেওয়ার যোগ্য বলে মনে হলো । যেসব বিষয়কে আমি আগে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতাম , সেগুলো আমি উপলব্ধি করতে ও বুঝতে শুরু করলাম ।

এই সংবাদমাধ্যমের উদার মনোভাবকে আমি ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখলাম। বিরোধীদের আক্রমণ প্রতিহত করার সময় এর মর্যাদাপূর্ণ সুর এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে এর নিস্তব্ধতা প্রমাণিত হলো যে
পাঠকদের ধোঁকা দেওয়ার ধূর্ত ও জঘন্য পদ্ধতি । প্রতিভাবান নাট্য সমালোচকরা সর্বদা

Machine Translated by Google

তারা ইহুদি লেখকদের প্রশংসা করত, আর তাদের সমালোচনা কেবল জার্মানদের জন্যই সংরক্ষিত ছিল।

দ্বিতীয় ভিলহেলমের বিরুদ্ধে সূক্ষ্ম কটাক্ষগুলো তাদের নীতির দৃঢ়তা প্রমাণ করেছিল , যেমনটা করেছিল ফরাসি সংস্কৃতি ও সভ্যতার সুপরিকল্পিত মহিমান্বয়ন। কলামগুলোর বিষয়বস্তু ছিল তুচ্ছ এবং প্রায়শই অশ্লীল। এই সংবাদপত্রের ভাষায় সর্বত্রই একটি বিদেশি টান ছিল। এর সামগ্রিক সুর জার্মানদের প্রতি ছিল প্রকাশ্যভাবে আপত্তিকর , এবং এটি নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত ছিল ।

কোন স্বার্থগুলো ভিয়েনার সংবাদমাধ্যমকে এই নীতি গ্রহণে প্ররোচিত করেছিল? নাকি তারা নিছক আকস্মিকভাবেই এমনটা করেছিল? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমি ক্রমশ অনিশ্চিত হয়ে পড়লাম।

তারপর এমন কিছু ঘটল যা আমাকে একটি সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করল। আমি ভিয়েনার জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে ঘটে চলা একাধিক ঘটনার তাৎপর্য বুঝতে শুরু করলাম। সেগুলোর সবই ইহুদিদের একটি বড় অংশের প্রচলিত নৈতিকতা ও রীতিনীতির সাধারণ ধারণা দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল এবং সেগুলোকে তাদের সাথে সম্পর্কিত বলে বিবেচনা করা যেতে পারত । আবারও , রাস্তায় দেখা জীবন আমাকে শিখিয়ে দিল যে প্রকৃত শয়তান কোথায় লুকিয়ে আছে ।

পশ্চিম ইউরোপের অন্য যেকোনো শহরের চেয়ে এখানে বেশ্যাবৃত্তিতে, এবং তার চেয়েও বেশি শ্বেতাঙ্গ দাস ব্যবসায়, ইহুদিদের ভূমিকা আরও ভালোভাবে অধ্যয়ন করা যেতে পারে; সম্ভবত উত্তর ফ্রান্সের কিছু বন্দর ছাড়া। রাতে লিওপোল্ডস্টাটের রাস্তায় একা হাঁটার সময় , একজন প্রায় প্রতিনিয়ত এমন সব ঘটনার সাক্ষী হতো, যেগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে যুদ্ধের আগে বেশিরভাগ জার্মানদের কোনো ধারণাই ছিল না; যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সৈন্যরা পূর্ব রণাঙ্গনে সেগুলো পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়েছিল, বা বলা ভালো, বাধ্য হয়েছিল ।

যখন আমি প্রথম সেই ঠান্ডা মাথার, অনুভূতিহীন, নির্লজ্জ এবং হিসেবি ইহুদিটিকে চিনতে পারলাম, যে বড় শহরের নিকৃষ্ট মানুষদের ওপর এই জঘন্য শোষণ চালানোর ক্ষেত্রে তার অসামান্য প্রতিভা প্রদর্শন করেছিল , তখন আমার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল। তারপর আমি ক্রোধে জ্বলে উঠলাম।

ইহুদি সমস্যাটি তার সমস্ত খুঁটিনাটিসহ প্রকাশ্যে আসা উচিত কি না, সে বিষয়ে আমার আর কোনো সন্দেহ ছিল না। না। তখন থেকেই আমি তা করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম। কিন্তু যখন আমি সাংস্কৃতিক ও শৈল্পিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন দিকে ইহুদিদের খুঁজে বের করার উপায় শিখলাম, তখন হঠাৎ করেই এমন সব জায়গায় তাদের দেখা পেলাম, যেখানে তাদের পাওয়ার কথা আমি ভাবতেও পারিনি। আমি বুঝতে পারলাম যে ইহুদিরাই সামাজিক গণতন্ত্রের নেতা । এই উপলব্ধির মুখে আমার চোখের পর্দা সরে গেল। আমার দীর্ঘ অভ্যন্তরীণ সংগ্রামের অবসান ঘটল।

সহকর্মীদের সাথে আলাপচারিতার সময় আমি প্রায়ই অবাক হতাম যে , তারা একই বিষয়ে কত সহজে এবং ঘন ঘন তাদের মতামত পরিবর্তন করত; কখনও দিনের মধ্যেই , কখনও বা এমনকি ঘণ্টার মধ্যেই । আমার পক্ষে এটা বোঝা কঠিন ছিল যে, যারা ব্যক্তি হিসেবে কথা বলার সময় সঠিক মতামত পোষণ করত, তারা কীভাবে দলবদ্ধভাবে কাজ করার সময় হঠাৎ করে সমস্ত সাধারণ জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। এই ঘটনাটি প্রায়ই আমাকে হতাশায় ডুবিয়ে দিত। আমি তাদের সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তর্ক করতাম, এবং যখন আমি তাদেরকে আমার মতে একটি যুক্তিসঙ্গত চিন্তাধারায় আনতে পারতাম , তখন আমি আমার সাফল্যে আনন্দিত হতাম । কিন্তু পরের দিন, সবকিছুই বৃথা হয়ে যেত। আবার প্রথম থেকে শুরু করতে হবে , এই চিন্তাটাই হতাশাজনক ছিল ।

চিরন্তন দোলকের মতো তারা নিজেদের অযৌক্তিক মতামতের গভীরে ফিরে গেল।

আমি তাদের দুর্দশা পুরোপুরি বুঝতে পারতাম । তারা তাদের জীবন নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিল এবং যে ভাগ্য তাদের ওপর এতটা নির্মমভাবে আঘাত হেনেছিল, তাকে অভিশাপ দিত। তারা তাদের মালিকদের ঘৃণা করত, যাদেরকে তারা তাদের নিষ্ঠুর ভাগ্যের হৃদয়হীন নির্বাহক হিসেবে দেখত। তারা প্রায়শই সরকারি কর্মকর্তাদের প্রতি কটু ভাষা ব্যবহার করত , যাদের বিরুদ্ধে তারা শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতির অভাবের অভিযোগ করত। তারা খাদ্যমূল্যের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিক্ষোভ করত এবং নিজেদের দাবি আদায়ের জন্য রাস্তায় মিছিল করত। এই সবকিছুরই যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া যায় । কিন্তু এটা বোঝা অসম্ভব যে, কেন তারা নিজেদের জনগণের প্রতি এমন সীমাহীন ঘৃণা প্রকাশ করত , কেন তারা তাদের অবজ্ঞা করত, তাদের মহত্ত্বকে উপহাস করত , তাদের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করত এবং তাদের সবচেয়ে বিশিষ্ট প্রতিনিধিদের নামকে কলঙ্কিত করত।

নিজেদের প্রিয়জন ও পরিবারের প্রতি, নিজেদের মাতৃভূমির প্রতি এই শত্রুতা এবং
বাড়ি ছিল অযৌক্তিক ও দুর্বোধ্য। তা ছিল প্রকৃতির বিরুদ্ধে।

Machine Translated by Google

রোগটি সাময়িকভাবে নিরাময় করা সম্ভব ছিল , কিন্তু তা মাত্র কয়েক দিনের জন্য বা বড়জোর কয়েক সপ্তাহের জন্য। কিন্তু পরে যখন আপনি সেই ব্যক্তির সাথে দেখা করতেন, যাকে আপনি রূপান্তরিত বলে মনে করেছিলেন, তখন দেখা যেত সে আগের মতোই আছে। সেই অস্বাভাবিক রোগটি আবারও তাকে নিজের কব্জায় নিয়ে নিত।

* * *

ধীরে ধীরে আমি আবিষ্কার করলাম যে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক সংবাদমাধ্যম প্রধানত ইহুদিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল । কিন্তু আমি এই বিষয়ে খুব একটা মনোযোগ দিইনি কারণ...
অন্যান্য সংবাদপত্রগুলোতেও একই অবস্থা ছিল । তবে, এই সংমিশ্রণটির মধ্যে একটি লক্ষণীয় বিষয় ছিল। আমার শিক্ষা ও চিন্তাভাবনা থেকে পাওয়া অর্থে , সত্যিকারের জাতীয় সংবাদপত্র হিসেবে গণ্য করা যায় এমন একটিও সংবাদপত্রে ইহুদিদের উপস্থিতি ছিল না ।

আমি আমার স্বাভাবিক অনিচ্ছা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করলাম এবং পড়ার চেষ্টা করলাম।
মার্ক্সবাদী পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহ, কিন্তু এতে আমার বিতৃষ্ণা কেবল বাড়তেই থাকল।
তারপর আমি জানতে চাইলাম, যারা এই বিদ্বেষপূর্ণ অপকর্মগুলো লিখেছে ও প্রকাশ করেছে, তাদের সম্পর্কে কিছু । প্রকাশক থেকে শুরু করে , তারা সবাই ছিল ইহুদি। আমার মার্ক্সবাদী নেতাদের নাম মনে পড়ল এবং আমি বুঝতে পারলাম যে তাদের বেশিরভাগই ' নির্বাচিত জাতি'র অন্তর্ভুক্ত —সাম্রাজ্যিক মন্ত্রিসভায় সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক প্রতিনিধি, ট্রেড ইউনিয়নের সম্পাদক, রাজপথের আন্দোলনকারী। সর্বত্র একই অশুভ চিত্র ফুটে উঠল । আমি নামের সেই সারি কখনো ভুলব না —অস্টারলিৎস, ডেভিড, অ্যাডলার, এলেনবোজেন এবং আরও অনেকে। একটি বিষয় আমার কাছে বেশ স্পষ্ট হয়ে গেল। এই ভিন্ন জাতিই সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতৃত্বে ছিল, যাদের নিম্নস্তরের প্রতিনিধিদের সাথে অতীতে আমার বিতর্ক হয়েছিল। আমি এটা নিশ্চিতভাবে জেনে খুশি হলাম যে একজন ইহুদি জার্মান নয়।

অবশেষে আমি খুঁজে পেলাম, কে সেই অশুভ শক্তি যে আমাদের জাতিকে ভুল পথে চালিত করছে।
ভিয়েনায় কাটানো আমার এক বছর আমাকে এটা বোঝানোর জন্য যথেষ্ট ছিল যে, কোনো শ্রমিকই তার পূর্বধারণায় এতটা বদ্ধমূল নয় যে, আরও ভালো ও সুস্পষ্ট যুক্তি এবং ব্যাখ্যার মুখে সে তা পরিত্যাগ করবে না । ক্রমান্বয়ে, আমি মার্ক্সবাদী মতবাদে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠলাম এবং এই জ্ঞানকে আমার নিজের বিশ্বাসের জন্য লড়াইয়ে একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করলাম। আমি প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই সফল হয়েছিলাম। ব্যাপক জনসাধারণকে রক্ষা করা সম্ভব ছিল, কিন্তু এই কাজের জন্য প্রচুর সময় এবং ধৈর্যের প্রয়োজন ছিল ।

কিন্তু একজন ইহুদি তার প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস থেকে কখনো মুক্ত হতে পারে না ।

তখন আমি এতটাই ছেলেমানুষ ছিলাম যে তাদের মতবাদের অযৌক্তিকতা বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম । ছোট একটি বৃত্তে আমি তাদের সাথে কথা বলতে বলতে আমার গলা ব্যথা হয়ে গিয়েছিল এবং স্বর ভেঙে গিয়েছিল। আমার বিশ্বাস ছিল যে আমি অবশেষে তাদের মার্ক্সবাদী উন্মাদনার অন্তর্নিহিত বিপদ সম্পর্কে বোঝাতে পেরেছি । কিন্তু আমি কেবল বিপরীত ফলই পাচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল , যখনই মার্ক্সবাদী তত্ত্ব এবং তার বাস্তব প্রয়োগের বিধ্বংসী প্রভাবগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠত, তাদের প্রতিরোধ কেবল আরও তীব্র হতো।

তাদের সাথে যতই তর্ক করতাম, ততই তাদের যুক্তিতর্কের কৌশলগুলোর সাথে আমি পরিচিত হয়ে উঠতাম। প্রথমে তারা প্রতিপক্ষের বোকামির উপর ভরসা করত, কিন্তু যখন তারা এমনভাবে জড়িয়ে পড়ত যে বেরোনোর কোনো পথ খুঁজে পেত না , তখন তারা নিরীহ বোকার ভান করত। তাতেও কাজ না হলে , তাদের যুক্তির চালাকি সত্ত্বেও, তারা পাল্টা যুক্তিগুলো না বোঝার ভান করত এবং অন্য পথে পালিয়ে যেত।

আলোচনার একটি মঞ্চ । তারা স্বতঃসিদ্ধ ও গতানুগতিক কথা উদ্ধৃত করত; এবং আপনি যদি সেগুলো মেনে নিতেন, তবে তারা সেগুলোকে মূল বিষয় থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির অন্যান্য সমস্যা ও বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করত । আপনি চাপ দিলে
এই পর্যায়ে তারা আবার পালিয়ে যেত এবং তাদের দিয়ে নির্দিষ্ট কোনো কথা বলানো অসম্ভব ছিল। যখন আপনি এই ধর্মপ্রচারকদের একজনকে ধরার চেষ্টা করতেন, আপনার হাতে কেবল এক ধরনের আঠালো ও জেলি জাতীয় পদার্থ লাগত যা আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে এসে আবার জমাট বেঁধে একটি কঠিন পিণ্ডে পরিণত হতো ।
যদি আপনার প্রতিপক্ষ সাক্ষীদের সামনে আপনার যুক্তির কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হতো এবং আপনার মনে হতো যে আপনি অবশেষে কিছুটা অগ্রগতি করেছেন , তবে পরের দিন আপনার জন্য একটি বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। আগের দিন কী ঘটেছিল সে সম্পর্কে ইহুদি লোকটির কোনো ধারণাই থাকত না এবং সে এমনভাবে তার জঘন্য আজেবাজে কথা আবার শুরু করত যেন কিছুই ঘটেনি। যদি, ক্ষুব্ধ হয়ে,

Machine Translated by Google

যদি তুমি তাকে গতকালকের ব্যর্থতার কথা মনে করিয়ে দাও, সে অবাক হওয়ার ভান করবে এবং গতকাল যে নিজের বক্তব্য প্রমাণ করেছিল, তা ছাড়া আর কিছুই মনে রাখবে না। মাঝে মাঝে আমি হতবাক হয়ে যেতাম। আমি জানি না কোনটা বেশি অসাধারণ ছিল — তাদের কথার মারপ্যাঁচ , নাকি তাদের মিথ্যের পারদর্শিতা। ধীরে ধীরে আমি তাদের ঘৃণা করতে শুরু করলাম।

তবে এর একটা ভালো দিকও ছিল ; সমাজতন্ত্রের স্বতন্ত্র নেতাদের, বা অন্তত প্রচারকদের সম্পর্কে আমি যতই জানতে লাগলাম, আমার নিজের দেশের প্রতি ভালোবাসা ততই বাড়তে লাগল। তাদের প্রদর্শিত পৈশাচিক প্রতিভা জানার পর, সেই হতভাগ্য ভুক্তভোগীদের আর কী-ই বা দোষ দেওয়া যায় ? দ্বান্দ্বিক বিশ্বাসঘাতকতায় এই প্রতিযোগিতার সাথে পাল্লা দেওয়া আমার পক্ষে ছিল অত্যন্ত কঠিন । যাদের ঠোঁট সত্যকে বিকৃত করে , অস্বীকার করে, তাদের বিরুদ্ধে জেতার চেষ্টা কতই না বৃথা ছিল!

এইমাত্র বলা কথা এবং মুহূর্ত পরেই তা আবার ব্যবহার করে কিছু অর্জন করা।
তোমার লক্ষ্য! না। আমি ইহুদিদের যত বেশি চিনতাম , শ্রমিকদের পক্ষ নেওয়া তত সহজ হয়ে যেত।

আমার মতে, সবচেয়ে দোষী শ্রমিকদের মধ্যে ছিল না , বরং তারাই ছিল যারা নিজেদের আত্মীয়-স্বজনের জন্য দুঃখ করা এবং অকাট্য যুক্তিতে জাতীয় পরিবারের পরিশ্রমী সন্তানদের প্রাপ্য অধিকার দেওয়াকে অর্থহীন মনে করত ।

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা, এবং একই সাথে যারা তাদের মনোবল ভেঙে দিয়েছিল তাদের কোণঠাসা করা ।

আমার নিজের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার আলোকে আমি মার্ক্সবাদী মতবাদের উৎসগুলো আরও নিবিড়ভাবে খতিয়ে দেখতে শুরু করলাম । এর প্রভাবগুলো আমার কাছে বিস্তারিতভাবে জানা ছিল। সতর্ক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এর নিত্যনৈমিত্তিক অগ্রগতি আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল । এবং এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতিগুলো অনুমান করতে সামান্য কল্পনারই প্রয়োজন ছিল ।

এখন প্রশ্ন ছিল একটাই: নির্মাতারা কি তাদের কাজের সেই পরিণতি আগে থেকে দেখতে পেয়েছিলেন যা তারা প্রতিদিন দেখতে পেতেন, নাকি নির্মাতারা নিজেরাই নিজেদের ভুলের শিকার ছিলেন? আমার কাছে দুটো সম্ভাবনাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছিল।

যদি দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, তবে সবচেয়ে ভয়াবহ পরিণতি রোধ করার জন্য এই অশুভ আন্দোলনের বিরোধিতা করা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির কর্তব্য । তবে, যদি আমরা প্রথম প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ দিই, তবে আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, জাতিকে সংক্রামিত করা এই মহামারীর সৃষ্টিকর্তারা ছিল সাক্ষাৎ শয়তান। শুধুমাত্র একটি দানবের মস্তিষ্কেই এমন একটি সংগঠনের পরিকল্পনা করা সম্ভব, যার কার্যকলাপ শেষ পর্যন্ত মানব সভ্যতার পতন ঘটাবে এবং এই পৃথিবীকে এক বিরানভূমিতে পরিণত করবে।

এমন পরিস্থিতিতে, মানুষের মনোবল, বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি দ্বারা প্রদত্ত প্রতিটি অস্ত্র ব্যবহার করে লড়াই করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না , এবং জয়ের পাল্লা কার দিকে ঝুঁকবে সেই সিদ্ধান্ত ভাগ্যের উপর ছেড়ে দেওয়া ।

এই আন্দোলনের ভিত্তি অনুসন্ধান করার উদ্দেশ্যে আমি এই মতবাদের প্রণেতাদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু করলাম। ইহুদি প্রশ্ন সম্পর্কে আগের চেয়ে গভীরতর উপলব্ধির সুবাদে , আমি প্রত্যাশার চেয়েও দ্রুত আমার লক্ষ্যে পৌঁছেছিলাম । এই নব অর্জিত জ্ঞান আমাকে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতাদের দ্বারা প্রচারিত মতবাদগুলোর বাস্তব বাস্তবতা এবং তাত্ত্বিক ভণ্ডামির মধ্যে একটি তুলনা টানতে সক্ষম করেছিল ; কারণ আমি এখন ইহুদিদের ভাষা বুঝতে পারছিলাম । আমি বুঝতে পারলাম যে একজন ইহুদি তার চিন্তাভাবনা গোপন করার জন্য , বা অন্ততপক্ষে সেগুলোকে আড়াল করার জন্য ভাষা ব্যবহার করে , যাতে তার কথার মধ্যে তার আসল উদ্দেশ্যগুলো আবিষ্কৃত না হয় , বরং তা কথার ফাঁকে লুকিয়ে থাকে । এই জ্ঞান আমার মধ্যে এমন এক সর্বশ্রেষ্ঠ অভ্যন্তরীণ বিপ্লব নিয়ে এসেছিল যা আমি আগে কখনও অনুভব করিনি। একজন নরমপন্থী বিশ্বনাগরিক থেকে আমি একজন কট্টর ইহুদি-বিদ্বেষীতে পরিণত হলাম।

এরপর কেবল একবার এবং শেষবারের মতো, আমি সেই যন্ত্রণাদায়ক চিন্তাগুলোর কাছে হার মেনেছিলাম, যা আমার মধ্যে গভীর উদ্বেগ সৃষ্টি করেছিল।

ইতিহাসের দীর্ঘ সময় জুড়ে ইহুদিদের কার্যকলাপ গভীরভাবে মূল্যায়ন করতে গিয়ে আমি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি এবং নিজেকে প্রশ্ন করি, আমাদের মতো সাধারণ মানুষের বোধগম্যতার বাইরের কোনো দুর্বোধ্য কারণে , ভাগ্য কি অপরিবর্তনীয়ভাবে এই ক্ষুদ্র জাতিটির জন্যই চূড়ান্ত বিজয় নির্ধারণ করে রাখেনি? এমন কি হতে পারে না যে, পুরস্কারস্বরূপ এই মানুষদের জমি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল ? অস্তিত্ব রক্ষার জন্য লড়াই করার কি আমাদের কোনো বস্তুনিষ্ঠ অধিকার আছে, নাকি তা কেবলই ব্যক্তিগত? ভাগ্য আমাকে মার্ক্সবাদী মতবাদ এবং এর সঙ্গে যুক্ত ইহুদিদের কার্যকলাপের একটি বস্তুনিষ্ঠ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানের দিকে পরিচালিত করে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল ।

Machine Translated by Google

মার্ক্সবাদের ইহুদি মতবাদ প্রকৃতির অভিজাত নীতিগুলোকে ক্ষুণ্ন করে এবং শক্তি ও সামর্থ্যের যুগ যুগান্তরের বিশেষাধিকারকে বিপুল সংখ্যার গুরুত্ব দ্বারা প্রতিস্থাপন করে । এইভাবে এটি মূল্যকে প্রত্যাখ্যান করে।
মানুষ ও তার ব্যক্তিত্ব জাতীয়তা ও বর্ণের মৌলিক অর্থকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এবং এর মাধ্যমে মানব অস্তিত্ব ও সভ্যতার ভিত্তিকেই প্রত্যাখ্যান করে। যদি মহাবিশ্বে জীবনের ভিত্তি হিসেবে মার্ক্সবাদী মতবাদকে গ্রহণ করা হয় , তবে তা মানব মনের বোধগম্য সমস্ত শৃঙ্খলার ধ্বংস ডেকে আনবে । সুতরাং , এই ধরনের আইন গ্রহণ আমাদের জ্ঞাত বৃহত্তম জীবসত্তার কাঠামোতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং ফলস্বরূপ, এই গ্রহের বাসিন্দাদের বিনাশ ঘটবে।

যদি ইহুদি তার মার্ক্সবাদী মতবাদের সাহায্যে এই বিশ্বের জাতিসমূহের উপর বিজয় লাভ করে , তবে তার মুকুট মানবজাতির শোকস্তবকে পরিণত হবে এবং এই গ্রহটি তার পৃষ্ঠে কোনো মানব জীবন ছাড়াই কক্ষপথ থেকে মহাকাশে পতিত হবে , ঠিক যেমনটা লক্ষ লক্ষ বছর আগে ঘটেছিল।

চিরন্তন প্রকৃতি তার আইন লঙ্ঘনের নির্মম প্রতিশোধ নেয় ।

অতএব, আমি এখন বিশ্বাস করি যে, আমি সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছানুযায়ীই কাজ করছি ।
ইহুদিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করি , আমি ঈশ্বরের কাজকে রক্ষা করি।

পাদটীকা:

৫) [ফেসিয়ানরা] ছিল হোমারের ওডিসি মহাকাব্যে উল্লিখিত এক কিংবদন্তীতুল্য জাতি। বলা হয়, তারা বাস করত পূর্ব ভূমধ্যসাগরের কোনো এক অজানা স্থানে , যা কখনও কখনও কর্কাইরা (বর্তমান করফু) বলে মনে করা হয়। তারা কাজের চেয়ে বিলাসবহুল জীবন বেশি ভালোবাসত , তাই "[ফেসিয়ান]" নামটি পরজীবীর সমার্থক হয়ে ওঠে ।

Machine Translated by Google

অধ্যায় ৩

ভিয়েনায় অবস্থানকালীন রাজনৈতিক ভাবনা

সাধারণভাবে বলতে গেলে, ত্রিশ বছর বয়সের আগে কোনো ব্যক্তির রাজনীতিতে জনসমক্ষে অংশ নেওয়া উচিত নয় , যদিও স্বাভাবিকভাবেই গড়পড়তার চেয়ে বেশি রাজনৈতিক দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে অবশ্যই ব্যতিক্রম করতে হবে । এটাই আমার বর্তমান মতামত। এর কারণ হলো, প্রায় ত্রিশ বছর বয়সের আগে একজন ব্যক্তির মানসিক বিকাশ মূলত এমন একটি সাধারণ মঞ্চ প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান সংগ্রহ ও বাছাই করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, যেখান থেকে তিনি দৈনন্দিন উদ্ভূত বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যা পর্যালোচনা করতে পারেন এবং সেগুলোর প্রত্যেকটির প্রতি একটি সুস্পষ্ট মনোভাব গ্রহণ করতে সক্ষম হন। একজন ব্যক্তিকে প্রথমে কিছু সাধারণ ধারণা সংগ্রহ করে সেগুলোকে একত্রিত করে চিন্তার একটি অখণ্ড কাঠামো বা বিশ্বকে দেখার একটি উপায়—অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট বিশ্বদৃষ্টি — গঠন করতে হয় । তখন তিনি সেই মানসিক সরঞ্জাম অর্জন করেন যা ছাড়া তিনি স্বতন্ত্র বিষয়ে তার রায় প্রকাশ করতে পারতেন না , এবং তিনি রাজনৈতিক মতামতের সংগতি ও দৃঢ়তার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাও অর্জন করেন । এমন ব্যক্তি তখন, অন্তত ব্যক্তিগতভাবে, জনবিষয়াবলীর রাজনৈতিক পরিচালনায় অংশ নিতে প্রস্তুত থাকেন।

যদি এই পূর্বশর্তগুলো পূরণ না হয় এবং কোনো ব্যক্তিকে এই যোগ্যতা ছাড়াই রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করতে হয়, তবে তিনি দ্বিগুণ ঝুঁকির সম্মুখীন হন। প্রথমত, কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি প্রাথমিকভাবে যে অবস্থান নিয়েছিলেন , তা ঘটনাক্রমে অনুপযুক্ত প্রমাণিত হতে পারে । তখন তাকে হয় তার পূর্বের অবস্থান ত্যাগ করতে হবে , অথবা তার উন্নততর জ্ঞান ও পরিণত প্রজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও তাতে অটল থাকতে হবে , যদিও তার যুক্তি ও দৃঢ় বিশ্বাস সেটিকে অগ্রহণযোগ্য প্রমাণ করেছে । যদি তিনি প্রথম পথটি বেছে নেন, তবে তিনি নিজেকে এক কঠিন ব্যক্তিগত পরিস্থিতিতে দেখতে পাবেন ; কারণ পূর্বে ধারণ করা অবস্থান ত্যাগ করাটা অসংগতিপূর্ণ বলে মনে হবে এবং তিনি তার অনুসারীদের পাশে থাকার আশা করতে পারবেন না ।

তারা আগের মতোই তার প্রতি অনুগত থাকবে। সমর্থকরা নিজেরাই সহজেই শুরু করতে পারে।
তারা তাদের নেতার নীতি পরিবর্তনকে তার চরিত্রের অন্তর্নিহিত বিচারবুদ্ধির অভাবের প্রমাণ হিসেবে দেখে । অধিকন্তু, এই পরিবর্তনটি তাদের মধ্যে এতদিন পর্যন্ত নেতার বিরোধিতা করে আসা ব্যক্তিদের প্রতি এক ধরনের বিভ্রান্তির জন্ম দেয়।

যদি তিনি দ্বিতীয় বিকল্পটি গ্রহণ করেন —যা আজকাল খুবই সাধারণ—তবে নেতার প্রকাশ্য বিবৃতিগুলো আর তার ব্যক্তিগত বিশ্বাসের দ্বারা সমর্থিত থাকে না। এই অবস্থা যত দীর্ঘস্থায়ী হয়, তার আদর্শের পক্ষে তার যুক্তি ততই অগভীর ও ভাসা ভাসা হয়ে পড়ে । নেতা তার আত্মরক্ষার জন্য স্থূল পন্থা অবলম্বন করতে শুরু করবেন। যদিও তিনি শেষ পর্যন্ত তার রাজনৈতিক প্রতিবাদে অটল থাকার কথা আর গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেন না — কারণ যে বিষয়ে বিশ্বাস করে না, তার জন্য কোনো মানুষ প্রাণ দেবে না— তিনি তার অনুসারীদের কাছ থেকে আরও বেশি বেশি দাবি করতে থাকেন। তার কপটতা যত বাড়বে , তার দলের সদস্যদের সম্পর্কে তার মন্তব্যগুলো ততই দুর্ভাগ্যজনক ও অবিবেচনাপ্রসূত হবে । অবশেষে , তিনি সত্যিকারের নেতৃত্বের শেষ চিহ্নটুকুও বিসর্জন দেবেন এবং রাজনীতিবিদের ভূমিকা পালন করতে শুরু করবেন। এর অর্থ হলো, তিনি তাদের একজন হয়ে উঠবেন যাদের একমাত্র সঙ্গতি হলো অসংলগ্নতা, সাথে থাকবে উদ্ধত ঔদ্ধত্য এবং প্রায়শই , নির্লজ্জভাবে সত্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার এক নিপুণ প্রবণতা ।

সকল সৎ মানুষের দুর্ভাগ্য, যদি এমন কোনো ব্যক্তি সফল হন এবং সংসদ সদস্য হন, তবে শুরু থেকেই এটা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে তার কাছে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সারমর্ম হলো দুধের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ বজায় রাখার জন্য এক বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম , যা তার ও তার পরিবারের জীবিকার উৎস । তার স্ত্রী ও সন্তানরা তার ওপর যত বেশি নির্ভরশীল হবে , তিনি তার নির্বাচনী এলাকায় নিজের আসন ধরে রাখার জন্য তত বেশি জেদ ধরে লড়াই করবেন । এই কারণে, রাজনৈতিক দক্ষতার প্রমাণ দেওয়া অন্য যেকোনো ব্যক্তিই তার ব্যক্তিগত শত্রু। তিনি প্রতিটি নতুন আন্দোলনের মধ্যেই একটি সম্ভাব্য সূচনা দেখতে পাবেন ।

Machine Translated by Google

তার নিজের পতন। এবং যে কেউ তার চেয়ে ভালো মানুষ হবে, সে-ই তার জন্য হুমকি ।

পরে আমি এই ধরনের সংসদীয় কীটদের থেকে উদ্ভূত সমস্যাটি নিয়ে আরও বিশদ আলোচনা করব।

যখন একজন মানুষ ত্রিশ বছর বয়সে পৌঁছায় , তখনও তার অনেক কিছু শেখার থাকে। এটুকু তো স্পষ্টই। কিন্তু তারপর থেকে , সে যা শেখে তা মূলত তার মৌলিক ধারণাগুলোকেই আরও দৃঢ় করে; তা সেগুলোর সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে যায় এবং তার পূর্ব-বিদ্যমান বিশ্বদৃষ্টির মূল কাঠামোকে পূর্ণতা দান করে । এই শেখার অর্থ এই নয় যে সে তার পূর্ব-ধারণা করা নীতিগুলো পরিত্যাগ করবে, বরং সেই নীতিগুলো সম্পর্কে তার জ্ঞানকে আরও গভীর করবে। এইভাবে, তার সমবয়সীরা কখনও পিছিয়ে থাকবে না ।

তাদের মনে এই অপ্রীতিকর অনুভূতি হচ্ছিল যে, তিনি তাদের একটি বদ্ধ গলিতে নিয়ে গেছেন । পক্ষান্তরে , যখন তারা দেখত যে তাদের নেতার দক্ষতা স্বাভাবিক বিকাশের মাধ্যমে ক্রমাগত উন্নত হচ্ছে , যার ফলে তা ক্রমাগত আত্মস্থ হয়ে যাচ্ছে, তখন তাদের আত্মবিশ্বাস বেড়ে যেত ।
নতুন ধারণা; ফলে , অনুসারীরা এই প্রক্রিয়াটিকে তাদের বিশ্বাসকৃত মতামতের সমৃদ্ধি হিসেবে দেখবে ; তাদের দৃষ্টিতে , এই ধরনের প্রতিটি অগ্রগতি পূর্বে ধারণ করা সমগ্র মতামতের সঠিকতার এক নতুন সাক্ষ্য।

যে নেতাকে তাঁর সাধারণ নীতিমালার ওপর নির্মিত ভিত্তিটি ভ্রান্ত মনে করার কারণে তা পরিত্যাগ করতে হয়, তিনি কেবল তখনই সম্মানজনক আচরণ করতে পারেন, যদি তিনি তাঁর ভ্রান্ত বিশ্বাসের চূড়ান্ত পরিণতি মেনে নেওয়ার সদিচ্ছা ঘোষণা করেন ।

এমন পরিস্থিতিতে, ভবিষ্যতে তার যেকোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকা উচিত। যদি তিনি একবার মৌলিক বিষয়ে ভুল করে থাকেন, তবে তিনি আবারও ভুল করতে পারেন । কোনো অবস্থাতেই তার অন্য নাগরিকদের কাছ থেকে সমর্থন অব্যাহত রাখার প্রত্যাশা বা দাবি করা উচিত নয় ।

আজকাল আমাদের জননেতাদের কাছে এই ধরনের পদক্ষেপ কতটা অপছন্দের! এটি সেই গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক অধঃপতনকেই তুলে ধরে, যারা এখন রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্য নিজেদের যোগ্য মনে করছে । এই পুরো গোষ্ঠীর মধ্যে এমন প্রায় কেউই নেই যিনি এই কাজের জন্য যোগ্য।

যদিও আমি আজকালকার বেশিরভাগ মানুষের চেয়ে রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে বেশি সময় ভাবতাম , আমি সযত্নে রাজনীতিতে প্রকাশ্যে অংশগ্রহণ করা এড়িয়ে চলতাম। কেবল ছোট ছোট মহলেই আমি সেইসব বিষয় নিয়ে কথা বলতাম যা আমার মনকে নাড়া দিত বা যেগুলো নিয়ে আমার আগ্রহ সবসময় থাকত। এই ধরনের সীমিত গোষ্ঠীর মধ্যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করার অভ্যাসের অনেক সুবিধা আছে। তাদের সাথে কথা বলার পরিবর্তে, আমি আমার চারপাশের মানুষদের চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে শিখেছিলাম। প্রায়শই , এই চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গিগুলো বেশ আদিম প্রকৃতির ছিল। তাই আমি মানুষ সম্পর্কে আমার জ্ঞান বাড়ানোর জন্য প্রতিটি উপলব্ধ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতাম ।

জার্মান জনগণের মধ্যে ভিয়েনার মতো এই ধরনের পড়াশোনা করার এমন ভালো সুযোগ আর কোথাও ছিল না ।

* * *

প্রাচীন দানুবীয় রাজতন্ত্রে রাজনৈতিক চিন্তাধারা পরিধিতে ব্যাপকতর ও সমৃদ্ধতর ছিল।
সেই যুগের জার্মানির তুলনায় এখানে স্বার্থের বৈচিত্র্য বেশি ছিল – প্রুশিয়ার কিছু অংশ , হামবুর্গ এবং উত্তর সাগর সংলগ্ন অঞ্চলগুলো বাদে । আমি যখন এখানে অস্ট্রিয়ার কথা বলি, তখন আমি বিশাল হ্যাবসবার্গ সাম্রাজ্যের সেই অংশের কথা বলছি যা তার জার্মান জনসংখ্যার কারণে কেবল এই রাষ্ট্র গঠনের ঐতিহাসিক ভিত্তিই প্রদান করেনি , বরং যার জনসংখ্যাও...

বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে, এটি ছিল এমন এক রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাংস্কৃতিক জীবনের একমাত্র উৎস , যার কাঠামো ছিল অত্যন্ত কৃত্রিম। সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে, অস্ট্রীয় রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা এবং এর ধারাবাহিক অস্তিত্বের নিশ্চয়তা ক্রমবর্ধমানভাবে হ্যাবসবার্গ সাম্রাজ্যের এই কেন্দ্রবিন্দুর টিকে থাকার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল ।

সাম্রাজ্যের বংশানুক্রমিক প্রদেশগুলোই ছিল সাম্রাজ্যের হৃদয়। আর এই হৃদয়ই সমগ্র রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাজুড়ে অবিরাম প্রাণরস স্পন্দিত করত । সাম্রাজ্যের হৃদয়ের অনুরূপভাবে, ভিয়েনা ছিল তার মস্তিষ্ক ও ইচ্ছাশক্তির প্রতীক। সেই সময়ে, ভিয়েনার যে রূপটি ফুটে উঠত তা হলো...

Machine Translated by Google

এর ফলে আমরা তাঁকে এমন এক সিংহাসনে আসীন রাজা হিসেবে ভাবতে শুরু করি, যাঁর সুনিশ্চিত শাসন হ্যাবসবার্গ রাজদণ্ডের অধীনে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর এক সংমিশ্রণকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল।
রাজধানীর উজ্জ্বল সৌন্দর্যের কারণে সমগ্র রাষ্ট্রের বার্ধক্যজনিত ক্ষয়ের করুণ লক্ষণগুলো ভুলে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল।

যদিও সাম্রাজ্যটি বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যকার প্রচণ্ড সংঘাতে অভ্যন্তরীণভাবে বিপর্যস্ত ছিল, বহির্বিশ্ব —বিশেষ করে জার্মানি— শহরটির কেবল এক অলৌকিক চিত্রই দেখেছিল। এই বিভ্রম আরও তীব্র ছিল, কারণ সেই সময়ে ভিয়েনা যেন তার জাঁকজমকের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছাচ্ছিল। একজন প্রকৃত প্রশাসনিক প্রতিভার অধিকারী মেয়রের শাসনামলে, পুরনো সাম্রাজ্যের সম্রাটদের সেই শ্রদ্ধেয় শহরটি যেন তার হারানো গৌরব ফিরে পাচ্ছিল।

তাঁর যৌবনের। পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্তে উপনিবেশ স্থাপনকারী জনগোষ্ঠীর শেষ মহান জার্মান বংশধর আনুষ্ঠানিক অর্থে কোনো " রাষ্ট্রনায়ক" ছিলেন না। কিন্তু ডক্টর লুগার, সাম্রাজ্যের রাজধানীর মেয়র হিসেবে তাঁর ভূমিকায়, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উভয় ক্ষেত্রেই নগর কর্মকাণ্ডের প্রায় সকল ক্ষেত্রে এত কিছু অর্জন করেছিলেন যে, সমগ্র সাম্রাজ্যের হৃদয় নতুন শক্তিতে স্পন্দিত হয়েছিল। এইভাবে, তিনি নিজেকে সেই সময়ের তথাকথিত "কূটনীতিকদের" চেয়ে অনেক বড় রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে প্রমাণ করেছিলেন।

অস্ট্রিয়া নামক ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর এই রাজনৈতিক ব্যবস্থার চূড়ান্ত পতন পুরোনো পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্তে জার্মান জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক দক্ষতার অভাবের কোনো প্রমাণ নয়। এই পতন ছিল এক অসম্ভব পরিস্থিতির অবশ্যম্ভাবী ফল। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী নিয়ে গঠিত পঞ্চাশ মিলিয়ন মানুষের একটি রাষ্ট্র দশ মিলিয়ন মানুষ স্থায়ীভাবে টিকিয়ে রাখতে পারে না, যদি না যথাসময়ে কিছু পূর্বশর্ত পূরণ করা হয়।

অস্ট্রিয়ান জার্মানটির মানসিকতা ছিল অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী। বিশাল সাম্রাজ্যের জীবনে অভ্যস্ত হওয়ায়, এই পরিস্থিতিতে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে তার গভীর উপলব্ধি ছিল।
তিনিই ছিলেন অস্ট্রীয় রাষ্ট্রের একমাত্র সদস্য যিনি রাজতন্ত্রের সংকীর্ণ সীমানার ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করতেন এবং তাঁর মনে সাম্রাজ্যের সমস্ত সীমান্তকে ধারণ করতেন। যখন নিয়তি তাঁকে তাঁর সাধারণ মাতৃভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করল, তখন তিনি ফলস্বরূপ তাঁর সামনে আসা বিশাল কাজটি আয়ত্ত করার চেষ্টা করলেন। এই কাজটি ছিল অস্ট্রীয় জার্মানদের জন্য সেই ঐতিহ্যকে রক্ষা করা, যা তাদের পূর্বপুরুষেরা অগণিত সংগ্রামের পর পশ্চিমে অর্জন করেছিলেন। এটা মনে রাখতে হবে যে, অস্ট্রীয় জার্মানরা এই প্রচেষ্টায় তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতে পারেনি, কারণ তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠদের হৃদয় ও মন ক্রমাগত পিতৃভূমিতে থাকা আত্মীয়দের দিকে নিবদ্ধ থাকত, ফলে দেশের অভ্যন্তরে ব্যবহারের জন্য তাদের শক্তির সামান্য অংশই অবশিষ্ট থাকত।

অস্ট্রিয়ান জার্মানদের বুদ্ধিবৃত্তিক দিগন্তও তুলনামূলকভাবে ব্যাপক ছিল। এই বিচিত্র সাম্রাজ্যের প্রায় প্রতিটি অংশ জুড়েই তার বাণিজ্যিক স্বার্থ বিস্তৃত ছিল। প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের পরিচালনা তার হাতেই ছিল। তিনি মূলত তার শীর্ষস্থানীয় কারিগরি বিশেষজ্ঞ এবং সরকারি কর্মকর্তাদের দিয়ে রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রেখেছিলেন।

যতদূর পর্যন্ত এই কার্যকলাপের ক্ষেত্রটি ইহুদিদের নিয়ন্ত্রণে ছিল না, ততদূর পর্যন্ত বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর উপর ছিল। একমাত্র অস্ট্রিয়ান জার্মানরাই রাষ্ট্রকে একত্রিত করে রাখার রাজনৈতিক বন্ধন হিসেবে কাজ করত। তাঁর সামরিক দায়িত্ব তাঁকে নিজ দেশের সংকীর্ণ সীমানা ছাড়িয়ে অনেক দূরে নিয়ে যেতে পারত। যদিও একজন নবীন সৈনিক হিসেবে তিনি জার্মানদের নিয়ে গঠিত একটি রেজিমেন্টে যোগ দিতে পারতেন, সেই রেজিমেন্টটি ভিয়েনা বা গ্যালিসিয়ার পাশাপাশি হার্জেগোভিনাতেও মোতায়েন থাকতে পারত। হ্যাবসবার্গ সেনাবাহিনীর অফিসাররা তখনও জার্মান ছিলেন এবং বেসামরিক চাকরির উচ্চ শাখাগুলিতেও একই ধরনের উপাদানের প্রাধান্য ছিল। শিল্পকলা ও বিজ্ঞান জার্মানদের হাতে ছিল।

উপজাতিটি দ্বারা সহজেই উৎপাদিত হতে পারে এমন নতুন শৈল্পিক আবর্জনা ছাড়াও
নিগ্রোদের ক্ষেত্রে, সমস্ত প্রকৃত শৈল্পিক অনুপ্রেরণা এসেছিল জনসংখ্যার জার্মান অংশ থেকে। সঙ্গীত, স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং চিত্রকলায় ভিয়েনা সমগ্র শিল্পকে উল্লেখযোগ্যভাবে সমর্থন করেছিল।
দ্বৈত রাজতন্ত্র। এবং এই উৎসের নিঃশেষিত হওয়ার কোনো লক্ষণই কখনো দেখা যায়নি। সর্বোপরি, জার্মানরাই পররাষ্ট্রনীতির গতিপথ নির্ধারণ করত, যদিও অল্প সংখ্যক হাঙ্গেরীয়ও এই ক্ষেত্রে সক্রিয় ছিল।

Machine Translated by Google

তবে, রাজ্যের ঐক্য বজায় রাখার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল।
মূল পূর্বশর্তগুলো পূরণ না হওয়ায় ব্যর্থ হয়েছে ।

বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর বিভেদকামী শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ ও নিয়ন্ত্রণে রাখার একমাত্র সম্ভাব্য উপায় ছিল । আর তা হলো, অস্ট্রীয় রাষ্ট্রকে পরিচালনা করা এবং কেন্দ্রীকরণের নীতি অনুসারে এর অভ্যন্তরীণ সংগঠন গড়ে তোলা। এই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নিশ্চিত করার জন্য অন্য কোনো উপায় কল্পনাও করা যেত না।

সময়ে সময়ে এমন আলোকিত সময় এসেছিল যখন সরকারের উচ্চ মহল এই বিষয়টি বুঝতে পেরেছিল ।
এটাই ছিল সত্য। কিন্তু বাস্তবে তা বাস্তবায়নের অসুবিধাগুলো কাটিয়ে ওঠার প্রয়োজনের কারণে এটিকে দ্রুত ভুলে যাওয়া হয়েছিল, অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করা হয়েছিল। সাম্রাজ্যকে আরও যুক্তরাষ্ট্রীয় রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে যেকোনো প্রকল্পই অকার্যকর হতে বাধ্য ছিল, কারণ এমন কোনো শক্তিশালী কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ ছিল না , যারা রাষ্ট্রের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় উপাদানগুলোকে একত্রিত রাখার জন্য যথেষ্ট ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারত। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে , অস্ট্রিয়ার পরিস্থিতি বিসমার্ক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জার্মান রাইখের পরিস্থিতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল ।

জার্মানিকে কেবল একটিই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, আর তা হলো বিশুদ্ধ রাজনৈতিক ঐতিহ্যের রূপান্তর, কারণ বিসমার্কের জার্মানি জুড়ে একটি অভিন্ন সাংস্কৃতিক ভিত্তি ছিল। কিছু ক্ষুদ্র ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর অংশবিশেষ ছাড়া, রাইখটি কেবল একই জাতি বা জাতীয়তার সদস্যদের নিয়েই গঠিত ছিল।

অস্ট্রিয়ার জনতাত্ত্বিক পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। হাঙ্গেরি ছাড়া , বিভিন্ন সহযোগী রাষ্ট্রগুলোর কোনোটিতেই অতীত থেকে উদ্ভূত কোনো রাজনৈতিক ঐতিহ্য ছিল না। যদি থেকেও থাকে , সময় হয় তার সমস্ত চিহ্ন মুছে দিয়েছে, অথবা অন্তত সেগুলোকে অস্পষ্ট করে দিয়েছে। অধিকন্তু , এটি ছিল সেই যুগ যখন জাতীয়তার নীতি প্রাধান্য পেতে শুরু করেছিল ; এবং এই ঘটনাটি হ্যাবসবার্গ রাজদণ্ডের অধীনে থাকা বিভিন্ন দেশে জাতীয় প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তুলেছিল । এই নবজাগরিত জাতীয় শক্তিগুলোর কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন ছিল , কারণ দ্বৈত রাজতন্ত্রের সীমানার পাশাপাশি নতুন জাতি-রাষ্ট্রের উদ্ভব হচ্ছিল, যাদের জনসংখ্যা হ্যাবসবার্গ সাম্রাজ্য গঠনকারী বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মতোই সম্পর্কিত জাতি নিয়ে গঠিত ছিল । এই নতুন রাষ্ট্রগুলো জার্মান অংশের চেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল ।

এই সংঘাতে ভিয়েনাও বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি । বুদাপেস্ট যখন একটি মহানগরীতে পরিণত হলো, তখন এটি এমন এক প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হলো যার কাজ ছিল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন অংশকে একত্রিত রাখা নয় , বরং কোনো একটি অংশকে শক্তিশালী করা। প্রাগ শীঘ্রই বুদাপেস্টের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করল, এবং তার পরে লেমবার্গ, লাইবাখ ও অন্যান্য শহরগুলোও একই পথ অনুসরণ করল। এই প্রাদেশিক শহরগুলোকে জাতীয় শহরের মর্যাদায় উন্নীত করার মাধ্যমে স্বাধীন সাংস্কৃতিক জীবনের কেন্দ্রগুলো গড়ে উঠল। এর মাধ্যমে স্থানীয় জাতীয়তাবাদী প্রবৃত্তিগুলো একটি আধ্যাত্মিক ভিত্তি লাভ করে এবং ফলস্বরূপ জনগণের উপর তাদের প্রভাব আরও শক্তিশালী হয়। এমন এক সময় আসতেই হতো যখন এই বিভিন্ন দেশের বিশেষ স্বার্থগুলো সাধারণ সাম্রাজ্যিক স্বার্থের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠবে । যখন এই পর্যায়ে পৌঁছানো গেল, অস্ট্রিয়ার পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে গিয়েছিল।

আমরা বুঝতে পেরেছি।

দ্বিতীয় জোসেফের মৃত্যুর পর থেকেই এই ঘটনাপ্রবাহ সুস্পষ্টভাবে অনুমেয় ছিল । এর গতি বহু বিষয়ের উপর নির্ভরশীল ছিল , যার মধ্যে কয়েকটির উৎস ছিল খোদ রাজতন্ত্রের অভ্যন্তর এবং অন্যগুলো উদ্ভূত হয়েছিল সাম্রাজ্যের পররাষ্ট্রনীতি থেকে ।

একটি শক্তিশালী ও অবিচল কেন্দ্রীকরণ নীতি বাস্তবায়ন না করা পর্যন্ত অস্ট্রিয়ান রাষ্ট্রকে স্থায়ীভাবে সুসংহত করার জন্য কোনো কার্যকর প্রচেষ্টা চালানো অসম্ভব ছিল। সর্বোপরি, রাষ্ট্রের সরকারি ভাষা হিসেবে কেবল একটি ভাষাকেই প্রতিষ্ঠা করতে হতো । এভাবে এই সাম্রাজ্যিক সম্প্রদায়ের আনুষ্ঠানিক ঐক্যের ওপর জোর দেওয়া যেত । এবং এর ফলে প্রশাসনের হাতে এমন একটি কৌশলগত হাতিয়ার থাকত, যা ছাড়া রাষ্ট্র একটি রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে টিকে থাকতে পারত না। একইভাবে, যৌথ নাগরিকত্বের বোধ জাগিয়ে তোলার জন্য বিদ্যালয় এবং শিক্ষার অন্যান্য মাধ্যম ব্যবহার করা উচিত ছিল। এই ধরনের লক্ষ্য দশ বা বিশ বছরে অর্জন করা সম্ভব ছিল না । এই ধরনের প্রচেষ্টার জন্য শত শত বছর ধরে পরিকল্পনা করতে হতো ; উপনিবেশ স্থাপনের সমস্ত সমস্যার মতোই, একটি একক, বড় প্রচেষ্টার চেয়ে অবিরাম অধ্যবসায় অনেক বেশি অপরিহার্য উপাদান ।

Machine Translated by Google

বলা বাহুল্য , এমন পরিস্থিতিতে অভিন্নতার নীতি কঠোরভাবে মেনে দেশ শাসন ও পরিচালনা করতে হবে।

আমার জন্য এটা খুবই শিক্ষণীয় ছিল যে, কেন এমনটা ঘটেনি, বা বলা ভালো, কেন এটা করা হয়নি। হ্যাবসবার্গ সাম্রাজ্যের পতনের জন্য যারা এই নিষ্ক্রিয়তার জন্য দায়ী, তাদের জবাবদিহি করতে হবে।

অন্য যেকোনো রাষ্ট্রের চেয়ে প্রাচীন অস্ট্রিয়ার অস্তিত্ব একটি শক্তিশালী ও দক্ষ সরকারের ওপর বেশি নির্ভরশীল ছিল । হ্যাবসবার্গ সাম্রাজ্যে সেই জাতিগত ঐক্যের অভাব ছিল, যা একটি জাতি-রাষ্ট্রের মৌলিক ভিত্তি তৈরি করে এবং শাসক শক্তি সম্পূর্ণ অকার্যকর হলেও তার অস্তিত্ব নিশ্চিত করে। যখন একটি রাষ্ট্র সমজাতীয় জনগোষ্ঠী দ্বারা গঠিত হয় , তখন সেই জনগোষ্ঠীর স্বাভাবিক জড়তা রাষ্ট্রকে একত্রিত রাখে এবং আশ্চর্যজনকভাবে দীর্ঘ সময় ধরে দুঃশাসন ও অদক্ষ প্রশাসন সত্ত্বেও তার অস্তিত্ব নিশ্চিত করে । কখনো কখনো মনে হতে পারে যেন এই দেহে আর কোনো প্রাণ অবশিষ্ট নেই , কিন্তু এমন এক সময় আসে যখন আপাত এই শবদেহ জেগে ওঠে এবং বিশ্বকে তার অবিনশ্বর প্রাণশক্তির বিস্ময়কর প্রমাণ উপহার দেয়।

কিন্তু এমন একটি দেশের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন, যেখানে জনসংখ্যা সমজাতীয় নয়, যেখানে রক্তের সম্পর্ক নেই , বরং আছে কেবল একচ্ছত্র শাসন । এমন রাষ্ট্রে যদি এই একচ্ছত্র শাসন দুর্বলতার লক্ষণ দেখায় , তবে তা সুপ্ত থাকবে না , বরং জাতিগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সুপ্ত থাকা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী প্রবৃত্তিগুলোকে জাগিয়ে তুলবে। এই প্রবৃত্তিগুলো ততক্ষণ পর্যন্ত অনুভূত হয় না , যতক্ষণ এই গোষ্ঠীগুলো সরকারের কেন্দ্রীয় ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকে । এই সুপ্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবৃত্তিগুলোর দ্বারা সৃষ্ট বিপদকে কমবেশি নিষ্ক্রিয় করা যেতে পারে কেবল শত শত বছরের শিক্ষা, যৌথ ঐতিহ্য এবং অভিন্ন স্বার্থের মাধ্যমেই। এই ধরনের রাষ্ট্র যত নবীন হয় , তার অস্তিত্ব তত বেশি কেন্দ্রীয় সরকারের সক্ষমতা ও শক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। যদি তাদের গঠন কেবল একজন শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব বা একজন প্রতিভাবান নেতার কাজের ফলেই ঘটে থাকে , তবে অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠাতা অদৃশ্য হওয়ার সাথে সাথেই তারা ভেঙে পড়বে , কারণ তিনি যতই মহান হোন না কেন, তিনি একাই ছিলেন। কিন্তু শত শত বছরের যৌথ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার পরেও এই বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতাগুলোকে সম্পূর্ণরূপে কাটিয়ে ওঠা যায় না । এগুলো কেবল তখনই সুপ্ত থাকতে পারে এবং হঠাৎ জেগে উঠতে পারে, যখন কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বলতা প্রদর্শন করে এবং অভিন্ন ঐতিহ্যের মর্যাদাসহ সাধারণ শিক্ষার শক্তি , তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব গড়ে তোলা বিচ্ছিন্নতাবাদী জাতিগোষ্ঠীগুলোর প্রাণশক্তির মোকাবিলা করতে পারে না।

এই সত্যটি উপলব্ধি করতে না পারাকেই শাসক হ্যাবসবার্গদের মর্মান্তিক অপরাধ বলা যেতে পারে ।

কেবলমাত্র হ্যাবসবার্গ শাসকদের একজনের চোখের সামনেই, এবং শেষবারের মতো, ভাগ্যের হাত সেই মশালটি ধরেছিল যা তাঁর দেশের ভবিষ্যতের ওপর আলো ফেলত । কিন্তু সেই মশাল চিরতরে নিভে গিয়েছিল।

জার্মান জাতির পবিত্র রোমান সম্রাট দ্বিতীয় জোসেফ ক্রমবর্ধমান উদ্বেগে পূর্ণ ছিলেন, যখন তিনি উপলব্ধি করলেন যে তাঁর বংশকে সাম্রাজ্যের প্রান্তে ঠেলে দেওয়া হয়েছে এবং জাতিসমূহের এই ব্যাবিলন দ্বারা সৃষ্ট ঘূর্ণাবর্তে তা শীঘ্রই উৎখাত ও গ্রাসিত হবে, যদি না তাঁর পূর্বপুরুষদের অবহেলার ফলে সৃষ্ট অশুভ পরিণতি কাটিয়ে ওঠার জন্য শেষ মুহূর্তে কিছু করা হয় । অতিমানবীয় শক্তিতে, এই "মানবতার বন্ধু" তাঁর পূর্বসূরিদের উদাসীনতা ও অবিবেচনার প্রভাব প্রতিহত করার জন্য সম্ভাব্য সবরকম প্রচেষ্টা করেছিলেন । তিনি এক দশকের মধ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে হওয়া ক্ষতি পূরণ করার চেষ্টা করেছিলেন । যদি ভাগ্য তাঁকে তাঁর কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য চল্লিশ বছর সময় দিত, এবং যদি দুটি প্রজন্ম তাঁর শুরু করা কাজ চালিয়ে যেত , তবে একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটত । কিন্তু দশ বছরের শাসনের পর যখন তিনি শরীর ও মনে ভগ্নহৃদয়ে মৃত্যুবরণ করলেন , তাঁর কাজও তাঁর সাথে কবরে তলিয়ে গেল এবং ক্যাপুচিন ক্রিপ্টে তাঁর সঙ্গেই অনন্ত নিদ্রায় শায়িত রইল, যা আর কখনও জেগে ওঠার কোনো লক্ষণ দেখায় না।

তাঁর উত্তরসূরিদের সামনে যে কাজটি ছিল, তা সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা বা ইচ্ছাশক্তি কোনটাই ছিল না ।

ইউরোপে যখন এক নতুন বিপ্লবী যুগের প্রথম লক্ষণ দেখা দিল , তখন সেই আগুন ধীরে ধীরে অস্ট্রিয়ায় ছড়িয়ে পড়ল। আর এই আগুন যখন স্থিরভাবে জ্বলতে শুরু করল , তখন তাতে ইন্ধন যোগানো হলো।

Machine Translated by Google

সামাজিক বা রাজনৈতিক পরিস্থিতি দ্বারা নয়, বরং বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষা থেকে উদ্ভূত শক্তি দ্বারা চালিত।

১৮৪৮ সালের ইউরোপীয় বিপ্লবী আন্দোলন প্রায় সর্বত্রই শ্রেণি-সংঘাতের রূপ নিয়েছিল, কিন্তু অস্ট্রিয়ায় তা জাতিগত যুদ্ধে পরিণত হয়েছিল। এই আন্দোলনের উৎস ভুলে যাওয়া বা
সম্ভবত শুরু থেকেই বিষয়টি বুঝতে না পেরে এবং বিপ্লবী অভ্যুত্থানে ধারাবাহিকভাবে অংশগ্রহণ করেই জার্মান-অস্ট্রিয়ানরা নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করেছিল। তারা 'পাশ্চাত্য গণতন্ত্র'-এর চেতনা জাগাতে সাহায্য করেছিল, যা দ্রুত তাদের নিজেদের অস্তিত্বের ভিত্তি ধ্বংস করে দেয়।

রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সকল জনসম্পর্কে ব্যবহৃত একটি একক ভাষা প্রতিষ্ঠার দাবি প্রথমে না জানিয়েই একটি সংসদীয় প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা ছিল দ্বৈত রাজতন্ত্রে জার্মান উপাদানের প্রাধান্যের উপর প্রথম বড় আঘাত । সেই মুহূর্ত থেকে , রাষ্ট্রটি একটি পূর্ববর্তী পতনের দিকে ধাবিত হয়েছিল।

অথবা পরবর্তী বিনাশ। এর পরে যা কিছু ঘটেছিল , তা সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক অবসান ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

ক্রমিক পতনের এই প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করা ছিল একাধারে মর্মান্তিক ও শিক্ষণীয় । ইতিহাসের বিধান বাস্তবায়নের সঙ্গে জড়িত ছিল হাজারো খুঁটিনাটি । পতনের সুস্পষ্ট লক্ষণগুলোর প্রতি অধিকাংশ মানুষের উদাসীনতা কেবল এটাই প্রমাণ করে যে, দেবতারা অস্ট্রিয়ার ধ্বংসের বিধান দিয়েছিলেন।

আমি বিস্তারিত আলোচনায় যেতে চাই না, কারণ তা এই বইয়ের পরিধির বাইরে ।
আমি কেবল সেই ঘটনাগুলোই বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করতে চাই, যেগুলো জাতি ও রাষ্ট্রের পতনের কারণগুলোর সাধারণ নিদর্শন এবং সেই কারণে আমাদের বর্তমান সময়ের জন্য প্রাসঙ্গিক । অধিকন্তু, এই ঘটনাগুলো অধ্যয়ন করা আমাকে আমার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি গঠনে সাহায্য করেছে ।

* * *

যেসব প্রতিষ্ঠানে অবক্ষয়ের সবচেয়ে স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল, এমনকি একজন ক্ষীণদৃষ্টি দোকানদারের কাছেও, তার মধ্যে ছিল রাষ্ট্রের সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানটি — আমি সংসদের কথা বলছি , অথবা অস্ট্রিয়ায় যাকে বলা হতো রাইখসরাট।

এই সম্মিলিত সংস্থার সবচেয়ে সুস্পষ্ট উদাহরণ ছিল ইংল্যান্ডে, যা ছিল ধ্রুপদী গণতন্ত্রের একটি দেশ। এই বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির সম্পূর্ণ অংশ যথাসম্ভব কম পরিবর্তনসহ অস্ট্রিয়ায় স্থানান্তর করা হয়েছিল ।

ব্রিটিশ দ্বিকক্ষীয় ব্যবস্থার অস্ট্রিয়ান সমতুল্য ব্যবস্থা ভিয়েনায় আবগেওর্ডেনহাউস এবং হেরেনহাউস নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ভবনগুলো নিজেরা কিছুটা ভিন্ন ছিল। ব্যারি যখন টেমস নদীর তীরে তাঁর প্রাসাদগুলো, বা আমরা যেমন বলি, হাউসেস অফ পার্লামেন্ট, নির্মাণ করেন , তখন তিনি তাঁর কাজের অনুপ্রেরণা হিসেবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাসের দিকে তাকাতে পারতেন । এই ইতিহাসে, তিনি তাঁর এই চমৎকার স্থাপত্যের ১,২০০টি কুলুঙ্গি, কর্বেল এবং স্তম্ভ পূরণ ও সজ্জিত করার জন্য প্রচুর উপাদান খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁর স্মৃতিস্তম্ভ এবং চিত্রকর্মগুলো হাউস অফ লর্ডস এবং হাউস অফ কমন্সকে জাতীয় গৌরবের মন্দিরে পরিণত করেছিল ।

এখানেই ভিয়েনা তার প্রথম সমস্যার সম্মুখীন হলো। যখন ডেনিশ স্থপতি হ্যানসেন রাষ্ট্রীয় সংস্থার কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃতব্য মার্বেল প্রাসাদটির শেষ ত্রিকোণাকার ছাদটির নির্মাণকাজ শেষ করলেন , তখন অলঙ্করণ পূর্ণ করার জন্য তাঁকে প্রাচীন বিশ্বের দিকেই ফিরতে হয়েছিল। "পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের" এই নাট্যধর্মী ফোয়ারাটি গ্রিক ও রোমান রাষ্ট্রনায়ক এবং দার্শনিকদের মূর্তি ও প্রতিকৃতি দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছিল । পরিহাসের বিষয় হলো , উভয় কক্ষের উপরে থাকা চতুষ্পদী গাড়ির ঘোড়াগুলো সেগুলোকে চারদিকেই টেনে নিয়ে যেত । এই ভবনগুলোর অভ্যন্তরে যে কার্যকলাপ চলছিল , তার চেয়ে ভালো প্রতীক আর হতে পারে না।

এই ভবনের অলঙ্করণে অস্ট্রিয়ার ইতিহাসের যেকোনো ধরনের মহিমান্বিতকরণের বিরোধিতা করেছিল বিভিন্ন "জাতিগোষ্ঠী" , তাদের দাবি ছিল যে এটি একটি উস্কানি এবং আক্রমণের শামিল হবে । জার্মানিতেও একই ঘটনা ঘটেছিল , যেখানে ওয়ালোট নির্মিত রাইখস্ট্যাগ উৎসর্গ করা হয়নি।

Machine Translated by Google

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কামান গর্জে ওঠার আগ পর্যন্ত এটি জার্মান জাতির জন্য উৎসর্গীকৃত ছিল। এবং তারপর শিলালিপির মাধ্যমে এটি উৎসর্গ করা হয়।

আমার বয়স যখন কুড়ি বছরও হয়নি, তখন আমি প্রথমবার ফ্রানজেনসরিং-এর প্রাসাদে ' চেম্বার অফ ডেপুটিজ'-এর অধিবেশন দেখতে ও শুনতে প্রবেশ করি। এই প্রথম অভিজ্ঞতা আমার মনে গভীর বিতৃষ্ণার জন্ম দিয়েছিল।

আমি বরাবরই সংসদকে ঘৃণা করেছি, কিন্তু প্রতিষ্ঠান হিসেবে নয়। বরং ঠিক তার উল্টো। রাজনৈতিক স্বাধীনতার আদর্শকে যিনি সর্বদা লালন করেছেন, সেই হিসেবে আমি অন্য কোনো ধরনের সরকার ব্যবস্থা কল্পনাও করতে পারি না। হ্যাবসবার্গ রাজবংশের প্রতি আমার অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে, কোনো ধরনের একনায়কতন্ত্রের কথা ভাবাও ছিল স্বাধীনতা ও যুক্তির বিরুদ্ধে একটি অপরাধ ।

ব্রিটিশ সংসদের প্রতি আমার যে বিশেষ মুগ্ধতা ছিল, তা এই মতামত গঠনে ভূমিকা রেখেছিল। আমি মুগ্ধতার এক অনুভূতিতে আচ্ছন্ন ছিলাম, এবং তরুণ বয়সে অতিরিক্ত সংবাদপত্র পড়ার প্রভাব সম্পর্কে প্রায় অজ্ঞাতই ছিলাম। আমি এক মুহূর্তের জন্যও এই মুগ্ধতা ঝেড়ে ফেলতে পারিনি । ব্রিটিশ হাউস অফ লর্ডস যে মর্যাদাপূর্ণ ভঙ্গিতে তার কার্য সম্পাদন করত , তা আমার উপর গভীর ছাপ ফেলেছিল , প্রধানত অস্ট্রিয়ান সংবাদমাধ্যম যেভাবে উৎসাহের সাথে এই ঘটনাগুলো তুলে ধরেছিল তার কারণে । আমাকে নিজেকেই প্রশ্ন করতে হয়েছিল : জনগণের দ্বারা পরিচালিত সরকারের চেয়ে মহৎ কোনো শাসনব্যবস্থা কি থাকতে পারে ?

কিন্তু এই বিবেচনাগুলোই অস্ট্রিয়ান সংসদের প্রতি আমার বৈরিতার কারণ জুগিয়েছিল । সংসদীয় সরকারকে যে রূপে উপস্থাপন করা হয়েছিল, তা তার মহান আদিরূপের অযোগ্য বলে মনে হয়েছিল । নিম্নলিখিত বিবেচনাগুলোও আমার মনোভাবকে প্রভাবিত করেছিল :

অস্ট্রীয় রাষ্ট্রে জার্মানদের ভাগ্য সংসদে তাদের অবস্থানের উপর নির্ভর করত। সার্বজনীন গোপন ভোটাধিকার প্রবর্তনের আগে, সংসদে জার্মানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল, যদিও তা খুব উল্লেখযোগ্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। এমনকি এই পরিস্থিতিও উদ্বেগের কারণ ছিল, কারণ জাতীয় সমস্যা নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক গোষ্ঠীর উপর নির্ভর করা যেত না । জার্মান জনগোষ্ঠীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা সর্বদা একটি জার্মান-বিরোধী অবস্থান নিত, কারণ তারা ভয় পেত যে

অন্যান্য জাতীয় গোষ্ঠীর মধ্যে সমর্থকদের হ্রাস । সেই সময়েই – সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তনের আগে – সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিকে আর একটি জার্মান দল হিসেবে গণ্য করা যেত না। সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তনের ফলে জার্মান উপাদানের এই নিছক সংখ্যাগত সুবিধাও শেষ হয়ে যায়। অস্ট্রিয়ান রাষ্ট্রের আরও 'জার্মান-বিবর্জিতকরণের' পথ পরিষ্কার হয়ে যায় ।

আত্মরক্ষার জাতীয় প্রবৃত্তির কারণে আমার পক্ষে এমন একটি প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা মেনে নেওয়া অসম্ভব ছিল, যেখানে জার্মানদের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব ছিল না এবং উপরন্তু, তারা সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক গোষ্ঠীর দ্বারা সর্বদা প্রতারিত হতো। তবে, এই এবং আরও অনেক ত্রুটির জন্য সরাসরি সংসদীয় ব্যবস্থাকে দায়ী করা যেত না , বরং বিশেষভাবে অস্ট্রিয়ান রাষ্ট্রকেই দায়ী করা যেত। আমি তখনও বিশ্বাস করতাম যে যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পুনরুদ্ধার করা যায়

একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থায়, যতদিন অস্ট্রিয়ান রাষ্ট্র বিদ্যমান থাকবে , ততদিন এই ধরনের ব্যবস্থার বিরোধিতা করার কোনো কারণ থাকবে না ।

এই পবিত্র ও বিতর্কিত হলগুলোতে যখন আমি প্রথম প্রবেশ করি, তখন আমার সাধারণ মনোভাব এমনই ছিল । আমার কাছে এগুলো পবিত্র ছিল শুধুমাত্র এই মহিমান্বিত স্থাপত্যের উদ্ভাসিত সৌন্দর্যের কারণেই । জার্মান ভূমিতে এক গ্রিক অলৌকিক ঘটনা।

তবে, চোখের সামনে ঘটে চলা বীভৎস দৃশ্য দেখে আমি দ্রুতই প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলাম । আমার চোখের সামনেই, একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য কয়েকশ প্রতিনিধি সমবেত হয়েছিলেন এবং তাঁদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব মতামত প্রকাশের অধিকার ছিল ।

এই একদিনের অভিজ্ঞতা আমাকে ভাবার জন্য যথেষ্ট খোরাক জুগিয়েছে। আগামী কয়েক সপ্তাহের জন্য

বিতর্কের বুদ্ধিবৃত্তিক মান ছিল নিম্ন। মাঝে মাঝে অংশগ্রহণকারীদের কথা একেবারেই দুর্বোধ্য ছিল। উপস্থিতদের মধ্যে কেউ কেউ একেবারেই জার্মান বলতেন না, কেবল তাদের স্লাভিক জাতীয় ভাষা বা উপভাষায় কথা বলতেন। ফলে , কী বলা হচ্ছিল তা আমি নিজের কানেই শুনতে পাচ্ছিলাম ।

Machine Translated by Google

তার আগে পর্যন্ত আমি শুধু খবরের কাগজ পড়েই ব্যাপারটা জানতাম। উত্তেজিত জনতার এক বিশাল জনতা একে অপরের দিকে অঙ্গভঙ্গি করে চিৎকার করছিল, আর এক করুণ বৃদ্ধ ঘণ্টা বাজিয়ে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছিল ... বন্ধুত্বপূর্ণ বক্তৃতা, উৎসাহব্যঞ্জক বক্তব্য এবং কঠোর সতর্কবাণীর মাধ্যমে সংসদকে শৃঙ্খলায় ফিরিয়ে আনা।

আমি না হেসে পারলাম না।

কয়েক সপ্তাহ পরে, আমি দ্বিতীয়বার সেখানে গেলাম। এবার সংসদের দৃশ্যটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন, এতটাই যে জায়গাটা চেনা কঠিন হয়ে পড়েছিল। কক্ষটি প্রায় খালি ছিল। নিচে সবাই ঘুমিয়ে ছিল। বেশ কয়েকজন এমপি নিজেদের আসনে বসে একে অপরের দিকে তাকিয়ে হাই তুলছিলেন। তাদের মধ্যে একজন "বক্তৃতা" দিচ্ছিলেন। সংসদের ডেপুটি স্পিকার উপস্থিত ছিলেন। তিনি যখন চারদিকে তাকাচ্ছিলেন , তখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে তিনি বিরক্ত।

আমি পুরো বিষয়টি নিয়ে গুরুত্ব সহকারে ভাবতে শুরু করলাম। যখনই অবসর পেতাম, সংসদে যেতাম এবং নীরবে কিন্তু মনোযোগ দিয়ে সেই দৃশ্য দেখতাম। আমি যতটুকু বুঝতে পারতাম, বিতর্কগুলো শুনতাম এবং এই ভাঁড়ামিপূর্ণ রাষ্ট্রটি গঠনকারী বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধি— 'নির্বাচিতদের'—কমবেশি বুদ্ধিদীপ্ত মুখগুলো পর্যবেক্ষণ করতাম।

আমি যা দেখেছিলাম, তা নিয়ে ধীরে ধীরে আমার নিজস্ব ধারণা গড়ে উঠল।

এক বছরের এমন নীরব পর্যবেক্ষণই এই সংসদীয় প্রতিষ্ঠানের স্বরূপ সম্পর্কে আমার পূর্বের বিশ্বাসগুলোকে পুরোপুরি ভেঙে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। আমি আর বিরোধিতা করতাম না। শুধুমাত্র সেই বিকৃত রূপটি, যে রূপে অস্ট্রিয়ায় সংসদীয় প্রতিনিধিত্বের নীতি গৃহীত হয়েছিল। না। এই পুরো ব্যবস্থাটা মেনে নেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এতদিন পর্যন্ত আমি বিশ্বাস করতাম যে অস্ট্রিয়ান সংসদের ভয়াবহ ত্রুটিগুলোর কারণ হলো জার্মান সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাব , কিন্তু আমি এখন বুঝতে পেরেছি যে প্রতিষ্ঠানটি তার রূপ ও সারমর্মে নিজেই শয়তানি।

আমার মনে নানা সমস্যা জেগে উঠল। আমি ' সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্ত'— এই গণতান্ত্রিক নীতিটি আরও নিবিড়ভাবে খতিয়ে দেখলাম এবং সমান সতর্কতার সাথে সেই ভদ্রলোকদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক মূল্যও বিশ্লেষণ করলাম , যাঁদের ওপর জাতির নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে এই নীতিটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল।

এইভাবে , একই সময়ে, আমি প্রতিষ্ঠানটি এবং এর অন্তর্ভুক্ত মানুষ উভয়কেই জানতে পারলাম। তাই, বেশ কয়েক বছর ধরে , আমাদের সময়ের এক সাধারণ ও প্রিয় ব্যক্তিত্ব—সংসদীয় প্রতিনিধি— সম্পর্কে আমার একটি স্পষ্ট ও জীবন্ত চিত্র গড়ে উঠল। সেই সময়ে আমার মনে যে চিত্রটি তৈরি হয়েছিল, তা আমার স্মৃতিতে গভীরভাবে গেঁথে যায় এবং তারপর থেকে তা আর কখনও বদলায়নি, অন্তত এর মৌলিক দিকগুলোতে তো নয়ই।

আরও একবার, বাস্তব জীবনের এই ব্যবহারিক শিক্ষাগুলো আমাকে তত্ত্বের জালে জড়িয়ে পড়া থেকে বাঁচিয়েছে , যা প্রথম দর্শনে অনেকের কাছেই খুব লোভনীয় মনে হয়, যদিও এই তত্ত্বটি নিজেই মানব অধঃপতনের একটি লক্ষণ।

বর্তমানে পশ্চিম ইউরোপে প্রচলিত গণতন্ত্র মার্কসবাদের একটি পূর্বসূরি। বাস্তবে, গণতন্ত্র ছাড়া মার্কসবাদ অকল্পনীয়। গণতন্ত্র হলো এমন একটি উর্বর ক্ষেত্র যেখানে মার্কসবাদী জীবাণু বেড়ে উঠতে ও ছড়িয়ে পড়তে পারে। সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে গণতন্ত্র " ময়লা ও আগুনের এক বীভৎস রূপ" তৈরি করেছে, কিন্তু মনে হয় এর সৃজনশীল আগুন খুব দ্রুতই নিভে গেছে।

আমি ভাগ্যের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে এই সমস্যাটির সম্মুখীন আমি ভিয়েনায় থাকাকালীনই হয়েছিলাম; কারণ সেই সময়ে আমি যদি জার্মানিতে থাকতাম, তবে সহজেই কেবল একটি অগভীর সমাধান খুঁজে পেতাম। সংসদ নামক প্রতিষ্ঠানটির অযৌক্তিক প্রকৃতি যখন আমি প্রথম আবিষ্কার করি, তখন যদি আমি বার্লিনে থাকতাম , তবে আমি সহজেই অন্য চরমপন্থায় চলে যেতে পারতাম এবং বিশ্বাস করতে পারতাম —যেমনটা অনেকেই বিশ্বাস করত, এবং দৃশ্যত সঙ্গত কারণেই— যে জাতি ও রাইখের মুক্তি কেবল সাম্রাজ্যিক শক্তির পুনঃপুনঃ শক্তিশালীকরণের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। যারা এটা বিশ্বাস করত, তারা তাদের সময়ের গতিপ্রকৃতি চিনতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতি অন্ধ ছিল।

অস্ট্রিয়ায় এত সহজে ভুল করা যেত না। এক ভুল থেকে আরেক ভুল করা অসম্ভব ছিল। সংসদ যদি অকেজো হয়ে থাকে , তবে হ্যাবসবার্গরা আরও খারাপ ছিল; অথবা অন্তত কিছুটা ভালোও ছিল না। সংসদীয় ব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করে সমস্যার সমাধান করা যেত না। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন উঠল: তাহলে কী হবে? প্রত্যাখ্যান এবং

Machine Translated by Google

রাইখসরাটের বিলুপ্তি ঘটলে সমস্ত ক্ষমতা হ্যাবসবার্গদের হাতে চলে যাবে। বিশেষ করে আমার কাছে এই ধারণাটি অগ্রহণযোগ্য ছিল ।

যেহেতু অস্ট্রিয়ার ক্ষেত্রে সমস্যাটি বিশেষভাবে কঠিন ছিল, তাই আমি বেশ অল্প বয়সেই পুরো বিষয়টি অন্য সময়ের চেয়ে অনেক বেশি সতর্কতার সাথে বিবেচনা করতে বাধ্য হয়েছিলাম।

পুরো পরিস্থিতির সবচেয়ে বিস্ময়কর দিকটি, যা আমাকে সবচেয়ে বেশি গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলেছিল , তা হলো প্রতিনিধি পরিষদে ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি ।

সংসদ এমন কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যার বাস্তবায়ন সবচেয়ে ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে , কিন্তু এর জন্য কাউকে জবাবদিহি করতে হয় না । কাউকেই জবাবদিহি করানো সম্ভব নয় । কোনো বিপর্যয় ঘটানোর পর সরকার পদত্যাগ করলে যে তার দায়ভার থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তা নিশ্চয়ই বলা যায় না । নতুন জোট গঠিত হলে বা সংসদ ভেঙে দেওয়া হলে এই দায়ভার কি পুরোপুরি উধাও হয়ে যায় ? দায়ভারের নীতিটি কি কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির দায়িত্ব ছাড়া আর অন্য কিছু বোঝাতে পারে ?

যেসব পদক্ষেপ সমগ্র জনপ্রতিনিধিমণ্ডলীর ইচ্ছা থেকে উদ্ভূত এবং তাদের অনুমোদন বা নির্দেশে বাস্তবায়িত হয়েছে, সেগুলোর জন্য সরকারি নেতাদের কি আদৌ জবাবদিহি করা সম্ভব ? গঠনমূলক ধারণা ও পরিকল্পনা প্রণয়নের পরিবর্তে, একজন রাষ্ট্রনায়কের কাজ কি একদল নির্বোধকে তার প্রকল্পগুলো বোঝানোর শিল্পে নিহিত ? তার কাজ কি তাদের কাছে উদার অনুমতির জন্য ভিক্ষা করা ?

একজন রাষ্ট্রনায়কের জন্য অপরিহার্য দক্ষতা — অর্থাৎ প্ররোচিত করার ক্ষমতা—কি তাঁর বৃহৎ রাজনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের সামর্থ্যের সমতুল্য ?

যদি কোনো রাষ্ট্রনায়ক তাঁর নীতির সমর্থনে নগণ্য সংখ্যক উচ্ছৃঙ্খল জনতার কাছ থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেতে ব্যর্থ হন, তবে তা কি সত্যিই তাঁর অযোগ্যতা প্রমাণ করে?
অথবা আরও অনুকূল মামলা?

এমন কোনো নজির কি কখনো হয়েছে যেখানে এই ধরনের কোনো সমাবেশ একটি মহান জিনিসের যথাযথ প্রশংসা করেছে? একটি রাজনৈতিক ধারণা , যা বাস্তবায়িত হওয়ার এবং এর সাফল্যের মাধ্যমে এর মহিমা প্রকাশ্যে আসার আগেই তৈরি হয়েছিল ?

এই পৃথিবীতে, প্রতিভার সৃজনশীল কাজ কি সর্বদা জনতার জড়তার বিরোধিতা করবে না ?

সংসদীয় জনতাকে বোঝাতে ব্যর্থ হলে একজন রাষ্ট্রনায়কের কী করা উচিত?
তার নীতিমালায় সম্মতি ? বিশেষ পরিস্থিতিতে তার কি এই সম্মতি কিনে নেওয়া উচিত ?

নাকি, সহনাগরিকদের ক্রমাগত মূর্খতার সম্মুখীন হয়ে, তিনি জাতির জীবনের জন্য অপরিহার্য বলে মনে করা পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়ন করা থেকে বিরত থাকবেন? তিনি কি পদত্যাগ করবেন নাকি ক্ষমতায় থাকবেন ?

এমন পরিস্থিতিতে, একজন সম্মানীয় ব্যক্তি কি একদিকে তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং অন্যদিকে তাঁর নৈতিক সততা , কিংবা আরও সঠিকভাবে বললে , তাঁর সততাবোধের মধ্যে এক নিদারুণ দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হবেন না?

জনসেবা ও ব্যক্তিগত সম্মানের মধ্যে আমরা কোথায় সীমারেখা টানতে পারি?

প্রত্যেক প্রকৃত নেতাকে কি নিজেকে রাজনৈতিক গুণ্ডার পর্যায়ে নামিয়ে আনার ধারণাটি প্রত্যাখ্যান করতে হবে ?

অন্যদিকে, প্রত্যেক গ্যাংস্টারই কি 'রাজনীতি করার' তাগিদ অনুভব করে না , যেহেতু চূড়ান্ত দায়ভার কখনোই ব্যক্তিগতভাবে তার ওপর বর্তাবে না , বরং এমন এক বেনামী জনতার ওপর বর্তাবে যাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য কখনোই জবাবদিহি করানো যাবে না?

সংখ্যাগত সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সরকার পরিচালনার সংসদীয় নীতি কি অনিবার্যভাবে নেতৃত্বের সকল রূপের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে?

Machine Translated by Google

কেউ কি সত্যিই বিশ্বাস করে যে মানব অগ্রগতি কোনো ব্যক্তির মস্তিষ্ক থেকে নয়, বরং সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মিলিত মস্তিষ্ক থেকে আসে ?

আমরা কি আশা করতে পারি যে ভবিষ্যৎ মানব সভ্যতা মানব সংস্কৃতির এই ভিত্তি পরিত্যাগ করতে সক্ষম হবে ?

কিন্তু আজ কি এটা আগের চেয়েও বেশি সত্যি নয় যে, একজন ব্যক্তির সৃজনশীল মস্তিষ্ক
অপরিবর্তনযোগ্য ?

সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়ার সংসদীয় নীতিটি ব্যক্তির কর্তৃত্বকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তার জায়গায় বেশ কিছু নামহীন নেতাকে স্থাপন করে। এর মাধ্যমে এটি অভিজাততন্ত্রের নীতির বিরোধিতা করে, যা প্রকৃতির একটি মৌলিক নিয়ম; কিন্তু অবশ্যই আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমাদের এই অধঃপতিত যুগে এই নীতিটিকে শীর্ষ দশ হাজারের মধ্যে মূর্ত বলে মনে করা উচিত নয় ।

এই সংসদীয় প্রতিষ্ঠানের বিধ্বংসী প্রভাব ইহুদি সংবাদপত্রের পাঠকদের কাছে ততটা সহজে স্পষ্ট নাও হতে পারে , যতক্ষণ না পাঠক নিজে থেকে চিন্তা করতে এবং তথ্য-প্রমাণ মূল্যায়ন করতে শেখে। রাজনীতির ময়দানে সাধারণ মানের মানুষদের আগমনের জন্য প্রধানত এই প্রতিষ্ঠানটিই দায়ী । এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে, প্রকৃত নেতৃত্বগুণসম্পন্ন একজন মানুষও রাজনৈতিক জীবন থেকে সরে যেতে প্রলুব্ধ হবেন ; কারণ এমন পরিস্থিতিতে একজন গঠনমূলক রাষ্ট্রনায়কের গুণাবলীসম্পন্ন মানুষের প্রয়োজন হয় না , বরং এমন একজনের প্রয়োজন হয় যিনি সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন আদায় করতে পারেন । এই ধরনের পরিস্থিতি সংকীর্ণমনাদের আকর্ষণ করে এবং তাদের আকৃষ্ট করবেই ।

একজন রাজনৈতিক গুণ্ডার দিগন্ত যত সংকীর্ণ এবং জ্ঞানের ভিত্তি যত নগণ্য হয়, নিজের রাজনৈতিক ভিত্তি সম্পর্কে তার মূল্যায়ন তত সুনির্দিষ্ট হয়, এবং সে এমন একটি ব্যবস্থাকে তত বেশি মূল্য দিতে আগ্রহী হবে যার জন্য সৃজনশীল প্রতিভা বা উচ্চমানের দক্ষতার প্রয়োজন হয় না; বরং প্রয়োজন হয় সেই ধূর্ত বিচক্ষণতা যা একজন কার্যকর নগর কর্মকর্তার বৈশিষ্ট্য । বস্তুত, সে পেরিক্লিসের রাজনৈতিক প্রতিভার চেয়ে এই ধরনের তুচ্ছ ধূর্ততাকে বেশি মূল্য দেয় । এই ধরনের সাধারণ মানের ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের জন্য দায়বদ্ধতা নিয়ে চিন্তাও করতে হয় না। সে শুরু থেকেই জানে যে তার " রাষ্ট্রনায়কত্বের " ফলাফল যাই হোক না কেন , তার পরিণতি ইতিমধ্যেই ভাগ্যলিপিতে লেখা আছে; একদিন তাকে অবসর নিতে হবে এবং একই ধরনের মানসিক যোগ্যতাসম্পন্ন কারও জন্য জায়গা করে দিতে হবে । আমাদের এই অধঃপতিত সময়ের আরেকটি লক্ষণ হলো, অসাধারণ রাষ্ট্রনায়কদের সংখ্যা ততই বাড়ছে, যতই ব্যক্তিগত ব্যক্তিত্বের মান সংকুচিত হচ্ছে । এই মান ক্রমশ আরও ছোট হয়ে আসবে, কারণ প্রত্যেক রাজনীতিবিদকে সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর নির্ভর করতে হবে । সত্যিকারের রাজনৈতিক দক্ষতাসম্পন্ন একজন ব্যক্তি নির্বোধ চিৎকারকারী দলের চাটুকার হতে অস্বীকার করবে; অপরদিকে, তারা সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধি হওয়ায় —অর্থাৎ নির্বোধ জনতার—গড়পড়তা মানের চেয়ে উন্নত মস্তিষ্ককে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে।

অবিবেচক সাংসদদের জন্য এমন কারো দ্বারা পরিচালিত হওয়া সবসময়ই স্বস্তিদায়ক , যার বুদ্ধিবৃত্তিক মর্যাদা তাদের সমপর্যায়ের। তখন তাদের প্রত্যেকেই অন্যদের মাঝে বিতর্কে নিজেদের প্রতিভা দেখানোর সুযোগ পায় এবং সর্বোপরি, প্রত্যেকেই অনুভব করে যে একদিন তারাও শীর্ষস্থানে পৌঁছাতে পারবে । পিটার যদি আজ বস হতে পারেন , তবে পল কেন পারবেন না ?

আগামীকালের আগে?

গণতন্ত্রের এই নতুন উদ্ভাবনটি সম্প্রতি ভীতিকরভাবে ছড়িয়ে পড়া একটি বিশেষ ঘটনার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, আর তা হলো আমাদের তথাকথিত রাজনৈতিক নেতাদের একটি বড় অংশের কাপুরুষতা । যখনই কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হয় , তারা সবসময় তথাকথিত 'কাপুরুষ'দের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে আনন্দ পায় ।

সংখ্যাগরিষ্ঠ।

এই ধরনের রাজনৈতিক চক্রান্তকারীদের একজনকে দেখলে বোঝা যায় , কীভাবে সে তার প্রতিটি কাজের সমর্থনে সংখ্যাগরিষ্ঠকে প্রলুব্ধ করে। তার সহযোগীদের প্রয়োজন হয়, যাতে সুযোগ পেলেই সে অন্যদের ওপর দায় চাপিয়ে দিতে পারে । এটাই মূল কারণ যে, এই ধরনের রাজনৈতিক কার্যকলাপ সাহসী ও চরিত্রবান মানুষের কাছে ঘৃণ্য , অথচ একই সাথে তা নিম্নশ্রেণীর লোকদের আকর্ষণ করে ; কারণ

Machine Translated by Google

এমন একজন ব্যক্তি যে নিজের কাজের দায়িত্ব নিতে চায় না , কিন্তু সর্বদা হতে চায় কোনোভাবে সুরক্ষিত থাকায়, তাকে অবশ্যই দুষ্ট ও খলনায়কদের কাতারে ফেলতে হবে। যদি রাষ্ট্রনেতা এই নিম্ন রাজনৈতিক শ্রেণি থেকে আসেন , তবে ভয়াবহ পরিণতি দ্রুতই প্রকট হয়ে উঠবে । কোনো চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেওয়ার সাহস কারও থাকবে না । চূড়ান্ত অবস্থান নেওয়ার সাহস সঞ্চয় করার চেয়ে তারা বরং অপমান ও অপবাদ সহ্য করবে ।

একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শকে সমর্থন করার জন্য, প্রয়োজনে, নিজের পদ ও কর্মজীবন ঝুঁকির মুখে ফেলতে ইচ্ছুক এমন কেউ আর থাকবে না ।

আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠতা কখনো মানুষের স্থান নিতে পারে না। এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা কেবল অজ্ঞতাই নয় , কাপুরুষতারও প্রতিনিধিত্ব করে। আর যেমন একশজন নির্বোধ একজন জ্ঞানীর সমান নয় , তেমনি একশজন হতভাগ্য কাপুরুষ নৈতিক শক্তি ও দৃঢ়তা প্রয়োজন এমন কোনো রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণে অক্ষম ।

প্রত্যেক নেতার ওপর দায়িত্বের বোঝা যত হালকা হবে , ততই সেইসব মানুষের সংখ্যা বাড়বে যারা নিজেদের শোচনীয় সাধারণত্ব সত্ত্বেও জাতির সেবায় তাদের অফুরন্ত শক্তি উৎসর্গ করতে অনুপ্রাণিত হবেন । তাদের সংখ্যা এত বেশি যে তারা পারেন না
নিজেদের পালা আসার জন্য অপেক্ষা করে । তারা দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে কষ্ট করে ও বিষণ্নভাবে তাদের সামনে কতজন আছে তা গণনা করে এবং অবশেষে সামনে এগোনোর জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা গুনতে থাকে । তারা পর্যবেক্ষণ করে
যে পদের ওপর তারা ভরসা করে আছেন , সেখানকার কর্মীদের মধ্যে ঘটা প্রতিটি পরিবর্তনের প্রতি তারা সংবেদনশীল , এবং সারিতে তাদের সামনে থাকা কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীকে সরিয়ে দেওয়া প্রতিটি কেলেঙ্কারির জন্য তারা কৃতজ্ঞ । যদি কেউ খুব বেশিদিন তার পদে থেকে যায়, তবে তারা এটিকে তাদের পারস্পরিক সংহতির ওপর ভিত্তি করে হওয়া পবিত্র চুক্তির প্রায় লঙ্ঘন বলে মনে করে। তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং সেই কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তিটি শেষ পর্যন্ত অপসারিত না হওয়া পর্যন্ত এবং জনগণের কাছে তার আরামদায়ক পদটি সমর্পণ করতে বাধ্য না হওয়া পর্যন্ত তারা থামে না । এরপর, তাদের আরেকটি সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম থাকে। সাধারণত, পদ ছাড়তে বাধ্য হওয়া ব্যক্তিরা অপেক্ষমাণ তালিকার আরও গভীরে চলে যায়, যতক্ষণ না অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতিবাদে তারা বিতাড়িত হয়।

এর ফলস্বরূপ , এমন একটি রাষ্ট্রে সরকারি দপ্তর ও পদগুলিতে আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে , যা সাধারণত খুবই উদ্বেগজনক প্রভাব ফেলে, কিন্তু কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত সংকট দেখা দিলে তা সহজেই বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে । কেবল অজ্ঞ ও অযোগ্যরাই যে এই সংসদীয় পরিস্থিতির শিকার হন তা নয়, কারণ ভাগ্যের পরিহাসে একজন প্রকৃত নেতাও যদি এমন পরিস্থিতিতে পড়েন, তবে তিনি অন্যদের মতোই, এমনকি তার চেয়েও বেশি প্রভাবিত হতে পারেন । এমন নেতার উচ্চতর যোগ্যতা স্বীকৃত হওয়ার সাথে সাথেই তার বিরুদ্ধে একটি ঐক্যবদ্ধ জোট গঠিত হবে , বিশেষ করে যদি এই নেতা তাদের দলের না হয়েও , এই চমৎকার নির্বোধদের সাথে তাদের স্তরে নেমে কথা বলার অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন । তারা আশেপাশে থাকতে চায়।

কেবল নিজেদের মধ্যেই তারা থাকে, এবং তাদের চেয়ে উঁচু স্তরের কোনো ব্যক্তি তাদের দলে মিশলে তারা দ্রুত তার প্রতি বৈরী হয়ে ওঠে। তাদের এই প্রবৃত্তি, যা অন্য সব ক্ষেত্রে অন্ধ, এই ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রখর।

এর অনিবার্য ফলস্বরূপ শাসক শ্রেণীর বুদ্ধিবৃত্তিক স্তরের ক্রমাগত অবনতি ঘটে। পরিস্থিতির এমন পরিণতিতে জাতি ও রাষ্ট্র কতটা ভোগান্তির শিকার হয় , তা সহজেই অনুমান করা যায় , যদি না কেউ সেই একই 'নেতা' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়।

প্রাচীন অস্ট্রিয়ায় সংসদীয় শাসনব্যবস্থা তার বিশুদ্ধতম রূপে বিদ্যমান ছিল।

যদিও অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী রাজা-সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হতেন, এই নিয়োগ প্রক্রিয়াটি ছিল সংসদের ইচ্ছার নিছকই একটি বাস্তব ফল। প্রতিটি মন্ত্রীর পদ নিয়ে যে দর কষাকষি হতো , তাতে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের সমস্ত চিরাচরিত লক্ষণই বিদ্যমান ছিল। ফলাফলগুলো আলোচিত নীতিগুলোর সঙ্গেই সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। একজনের বদলে আরেকজনের পরিবর্তনের মধ্যবর্তী ব্যবধান ক্রমশ কমতে কমতে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছাল যে , তা এক উন্মত্ত রিলে দৌড়ে পরিণত হলো। প্রতিটি পরিবর্তনের সাথে সাথে "রাষ্ট্রনায়কদের " গুণমান হ্রাস পেতে থাকল , অবশেষে কেবল ক্ষুদ্র রাজনৈতিক ধূর্ত ব্যক্তিরাই অবশিষ্ট রইল। এই ধরনের লোকদের গুণাবলী বিচার করা হতো একের পর এক জোট গঠনে তাদের দক্ষতার দ্বারা; অন্য কথায়, ক্ষুদ্রতম বিষয়গুলোকে চালনা করার ক্ষেত্রে তাদের চতুরতার দ্বারা ।

Machine Translated by Google

আরও রাজনৈতিক লেনদেন। এটাই ছিল একমাত্র বাস্তব কাজ যা করতে এই প্রতিনিধিরা সক্ষম ছিলেন।

এই ক্ষেত্রে, ভিয়েনা ছিল সেই শিক্ষালয় যা সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল ।
আরেকটি বৈশিষ্ট্য যা আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ করা বৈশিষ্ট্যগুলোর মতোই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে
যেমনটা আমি বলেছিলাম, একদিকে জাতির এই নির্বাচিত ব্যক্তিদের প্রতিভা ও জ্ঞান এবং অন্যদিকে তাঁদের যে ধরনের দায়িত্বের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তার মধ্যে একটি বৈপরীত্য ছিল । ভালো লাগুক বা না লাগুক , বিভিন্ন অঙ্গীভূত জাতিগোষ্ঠীর এই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংকীর্ণ বৌদ্ধিক দিগন্ত নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করা থেকে বিরত থাকা অসম্ভব ছিল , এবং আমাদের জনজীবনের এই মহৎ ব্যক্তিত্বরা যে পদ্ধতিতে আবিষ্কৃত হয়েছিলেন, সেই পদ্ধতিগুলো বিবেচনা করাও অসম্ভব ছিল না ।

এই ভদ্রলোকদের প্রকৃত প্রতিভা কীভাবে দেশের সেবায় নিয়োজিত হয়েছিল, সে বিষয়ে একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়ন ও গবেষণা করা সার্থক হবে ; অন্য কথায়, তাঁদের কর্মকাণ্ডের কারিগরি পদ্ধতিগুলো বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা।

সংসদীয় জীবনের পুরো চিত্রটি ক্রমশ হতাশাজনক হয়ে উঠত, যতই এর অভ্যন্তরীণ কাঠামোতে গভীরভাবে প্রবেশ করা যেত এবং নির্মম বস্তুনিষ্ঠতার মনোভাব নিয়ে এর মানুষ ও ব্যবস্থার মূলনীতিগুলো অধ্যয়ন করা যেত । এমন একটি প্রতিষ্ঠানকে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে কঠোরভাবে বস্তুনিষ্ঠ থাকা অপরিহার্য ছিল, যার পৃষ্ঠপোষকেরা মূল্যায়ন ও রায়ের একমাত্র ন্যায্য ভিত্তি হিসেবে প্রতিটি বাক্যে ' বস্তুনিষ্ঠতা'র কথা বলতেন । যদি এই ভদ্রলোকদের এবং তাদের কষ্টকর জীবনের নিয়মকানুনগুলো পরীক্ষা করে দেখা হতো , তবে ফলাফল ছিল অপ্রত্যাশিত।

সংসদীয় নীতির মতো এত ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত অন্য কোনো নীতি নেই।
বস্তুনিষ্ঠভাবে দেখলে
আমাদের গবেষণায় আমরা নতুন প্রতিনিধি নির্বাচনের পদ্ধতি , সেইসাথে তাঁদেরকে পদায়ন এবং উপাধি প্রদানের পদ্ধতি উপেক্ষা করতে পারি । এটা বেশ স্পষ্ট যে জনগণের ইচ্ছা ও প্রয়োজনকে খুব সামান্যই বিবেচনায় নেওয়া হয় ।

নির্বাচন যেভাবে অনুষ্ঠিত হয় তাতে সন্তুষ্ট; কারণ জনগণের রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তা যিনি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করেন, তিনি সহজেই দেখতে পাবেন যে তা নিজেদের উদ্যোগে সাধারণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য , অথবা তাদের ধারণাগুলোকে বাস্তবে রূপ দিতে সক্ষম এমন ব্যক্তিদের নির্বাচিত করার জন্য যথেষ্ট উন্নত নয় ।

'জনমত' শব্দটিকে যেভাবেই সংজ্ঞায়িত করা হোক না কেন , এর একটি অতি ক্ষুদ্র অংশই কেবল সত্য।
এটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা স্বতন্ত্র পর্যবেক্ষণ থেকে আসে। এর একটি বড় অংশই হলো, এক অত্যন্ত প্ররোচনামূলক ও নিরলস "তথ্য" ব্যবস্থার মাধ্যমে জনবিষয়সমূহকে মানুষের কাছে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়, তার ফল।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে, কোনো বিশ্বাসের প্রকাশ মূলত শিক্ষার ফল, অপরদিকে ধর্মীয় আকাঙ্ক্ষাগুলো আত্মার গভীরে সুপ্ত থাকে; তেমনি জনসাধারণের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি হলো মানুষের বুদ্ধি ও অনুভূতির ওপর পদ্ধতিগতভাবে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন প্রভাবের চূড়ান্ত পরিণতি , যা কখনও কখনও প্রায় অবিশ্বাস্য নির্ভুলতা ও অধ্যবসায়ের সাথে প্রয়োগ করা হয়।

রাজনৈতিক শিক্ষার সবচেয়ে কার্যকর শাখা , যাকে এখানে 'প্রোপাগান্ডা' শব্দটি দ্বারা সবচেয়ে ভালোভাবে বর্ণনা করা যায় , তা সংবাদমাধ্যম দ্বারা পরিচালিত হয়। সংবাদমাধ্যমই প্রধান
রাজনৈতিক 'জ্ঞানদীপ্তি'র প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি । এটি প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য এক ধরনের বিদ্যালয়। তবে, এই শিক্ষামূলক কার্যক্রম রাষ্ট্রের হাতে নয় , বরং এমন কিছু শক্তির কবলে, যাদের প্রকৃতি আংশিকভাবে অত্যন্ত সন্দেহজনক। ভিয়েনায় যুবক বয়সে, এই গণশিক্ষার যন্ত্রের মালিকদের এবং সেইসাথে যারা একে এমন সব ধারণা সরবরাহ করে যা এটি পরে প্রচার করে, তাদের সাথে দেখা করার এক চমৎকার সুযোগ আমার হয়েছিল। প্রথমে আমি এটা উপলব্ধি করে অবাক হয়েছিলাম যে, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে থাকা এই বিপজ্জনক ও শক্তিশালী শক্তিটির জনগণের মধ্যে একটি দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে কত কম সময় লাগে , যদিও তা জনগণের প্রকৃত ইচ্ছা ও বিশ্বাসকে সম্পূর্ণ ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে। সংবাদমাধ্যমের জন্য কোনো হাস্যকর তুচ্ছ বিষয়কে জাতীয় গুরুত্বের ইস্যুতে পরিণত করতে মাত্র কয়েক দিন সময় লাগে, অথচ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে হয় পুরোপুরি উপেক্ষা করা হতো অথবা জনচক্ষু থেকে আড়াল করে রাখা হতো।

সংবাদমাধ্যম কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই শূন্য থেকে নাম তৈরি করার জাদুকরী শিল্পে পারদর্শী হয়ে উঠেছে । তারা জনসাধারণকে এই নামগুলোর সাথে বিপুল আশা জুড়ে দিতে প্ররোচিত করে। তারাই এই নামগুলোকে তৈরি করে।

Machine Translated by Google

যেকোনো প্রকৃত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির চেয়েও বেশি জনপ্রিয়
তাদের দীর্ঘ জীবন জুড়ে আশা। এই সবকিছু করা হয়েছিল এই সত্যটি সত্ত্বেও যে , সংবাদমাধ্যম কর্তৃক জনসমক্ষে তাদের অলঙ্কৃত করার এক মাস আগেও এই নামগুলো সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল এবং শোনাও যায়নি। একই সময়ে, রাজনীতি এবং জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের পুরোনো ও পরীক্ষিত ব্যক্তিত্বরা দ্রুত জনস্মৃতি থেকে বিলীন হয়ে যেতেন এবং মৃতের মতো বিস্মৃত হতেন, যদিও তারা তখনও সুস্থ এবং পূর্ণ শক্তিতে ভরপুর ছিলেন। কখনও কখনও এই ধরনের মানুষদের এমন ভয়ানকভাবে অপমান করা হতো যে তাদের নামগুলো নিকৃষ্টতম ধরনের নীচতার স্থায়ী প্রতীকে পরিণত হতো। সংবাদমাধ্যম যে সত্যিকারের ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে তা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করার জন্য , সেই লজ্জাজনক ইহুদি পদ্ধতিটি পরীক্ষা করা আবশ্যক, যার মাধ্যমে সম্মানিত এবং ভদ্র মানুষদের উপর শত শত দিক থেকে একই সাথে, যেন কোনো জাদুকরী মন্ত্র দ্বারা পরিচালিত হয়ে, নীচ অপবাদ এবং অপমানের আকারে কাদা ও ময়লা নিক্ষেপ করা হতো।

এই ডাকাতরা তাদের জঘন্য লক্ষ্য অর্জনের জন্য যেকোনো কিছু করতে পারে।

তারা সবচেয়ে ব্যক্তিগত পারিবারিক বিষয়েও নাক গলাবে এবং তাদের শিকারের সুনাম নষ্ট করার জন্য ব্যবহারযোগ্য কোনো ছোটখাটো খুঁটিনাটি খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত শান্ত হবে না। কিন্তু এতসব নাক গলানোর পরেও যদি তারা শিকারের ব্যক্তিগত বা প্রকাশ্য জীবনে আপত্তিকর কিছু খুঁজে না পায়, তাহলে তারা তার দিকে অপমান ছুঁড়ে মারতে থাকবে , এই বিশ্বাসে যে তাদের সমালোচনার হাজারো খণ্ডন সত্ত্বেও , কোনো না কোনো কথা ঠিকই লেগে যাবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, শিকার শেষ পর্যন্ত তার আত্মপক্ষ সমর্থন চালিয়ে যেতে পারে না , কারণ অভিযোগকারীর এত সহযোগী থাকে যে তার অপবাদ অবিরাম প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। কিন্তু এই অপবাদকারীরা কখনোই এমন কোনো উদ্দেশ্য থেকে কাজ করার দাবি করে না যা প্রভাবিত করে বা যার দ্বারা তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তারা বোঝে। ওহ, না। যে বদমাশটা এই জঘন্যভাবে তার সমসাময়িকদের বদনাম করে, সে অতিমাত্রায় উচ্ছ্বসিত শব্দচয়ন দিয়ে গড়া এক বীরোচিত নিষ্কলঙ্ক সততার আভা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, আর তার 'সাংবাদিকতার কর্তব্য' এবং এই জাতীয় অন্যান্য আজেবাজে কথা বলে। যখন এই কাটলফিশগুলো সভা-সমাবেশে বড় ঝাঁকে জড়ো হয়, তখন তারা সাংবাদিকের পেশাগত সম্মান নামক এক বিশেষ ধরনের সম্মান নিয়ে নোংরাভাবে কথা বলে। তারপর পুরো সমাবেশ একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধার সাথে মাথা নত করে।

এই ধরনের সত্তারা তথাকথিত জনমতের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি তৈরি করে, এবং এই ফেনা থেকেই অবশেষে সংসদীয় আফ্রোদিতির উদ্ভব হয়।

সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি যথাযথভাবে বর্ণনা করতে এবং এর সমস্ত ত্রুটি নির্ভুলভাবে ব্যাখ্যা করতে বেশ কয়েকটি খণ্ডের প্রয়োজন হবে। কিন্তু যদি আমরা খুঁটিনাটি বিষয়গুলো উপেক্ষা করে মূল ফল এবং এর কার্যকলাপের দিকে তাকাই, আমার মনে হয় , তা সবচেয়ে অজ্ঞ ও সহজে বিশ্বাসপ্রবণ মানুষেরও চোখ খুলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে , যাতে তারা বস্তুনিষ্ঠভাবে দেখে এই প্রতিষ্ঠানটির অযৌক্তিকতা উপলব্ধি করতে পারে। মানুষের এই বিচ্যুতি কতটা ক্ষতিকর ও অযৌক্তিক, তা উপলব্ধি করার পরীক্ষা এবং

সবচেয়ে সহজ উপায় হলো গণতান্ত্রিক সংসদীয় ব্যবস্থাকে প্রকৃত ব্যবস্থার সাথে তুলনা করা।

জার্মান গণতন্ত্র।

সংসদীয় গণতন্ত্রের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষ, ধরা যাক পাঁচশ জন — যাদের মধ্যে সাম্প্রতিককালে নারীরাও অন্তর্ভুক্ত — সংসদে নির্বাচিত হন এবং যেকোনো বিষয়ে চূড়ান্ত রায় দেওয়ার ক্ষমতা তাঁদের দেওয়া হয়। কার্যত, তাঁরাই শাসকগোষ্ঠী ; যদিও তাঁরা এমন একটি সরকার গঠন করতে পারেন যা দেখে মনে হয় রাষ্ট্রের বিষয়াদি পরিচালনা করছে, কিন্তু এই সরকারের নিজস্ব কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই। প্রকৃতপক্ষে, তথাকথিত সরকার সংসদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারে না। এটি হতে পারে না

কোনো কিছুর জন্য জবাবদিহি করা যায় না , কারণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার সরকারকে দেওয়া হয়নি , বরং সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠকে দেওয়া হয়েছে। সরকার সর্বদা কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছার বাস্তবায়নকারী হিসেবেই কাজ করে। এর রাজনৈতিক সক্ষমতা কেবল এ দিয়েই বিচার করা যায় যে, এটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছার সঙ্গে কতটা কার্যকরভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠকে রাজি করাতে পারে।
তার প্রস্তাবের উপর। কিন্তু এর অর্থ হলো , একে প্রকৃত শাসক শক্তির স্তর থেকে এমন এক ভিক্ষুকের স্তরে নেমে আসতে হবে, যাকে যেকোনো মুহূর্তে সংগৃহীত সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনের জন্য ভিক্ষা করতে হয়। বস্তুত, সরকারের প্রধান কাজ হবে প্রতিটি ক্ষেত্রে বর্তমান শাসক সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুগ্রহ লাভ করা , অথবা তা করতে ব্যর্থ হলে , একটি নতুন শক্তি তৈরি করা।

Machine Translated by Google

একটি নতুন সংখ্যাগরিষ্ঠতা , যারা আরও বেশি অনুকূল মনোভাবাপন্ন হবে। যদি তিনি এই দুটি প্রচেষ্টার কোনো একটিতে সফল হন, তবে তিনি আরও কিছুকাল "শাসন" করতে পারবেন । যদি তিনি জিততে বা সংখ্যাগরিষ্ঠতা গঠন করতে ব্যর্থ হন, তবে তাঁকে পদত্যাগ করতে হবে। সরকারের নীতিগুলো স্বয়ং ভালো না খারাপ, সেই প্রশ্নটি অপ্রাসঙ্গিক।

এইভাবে, সমস্ত দায়িত্ব কার্যত বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই অবস্থার পরিণতি নিম্নলিখিত সহজ বিবেচনাগুলো থেকে সহজেই বোঝা যায় : জনগণের দ্বারা নির্বাচিত পাঁচশ জন প্রতিনিধি বিভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন পেশা থেকে আসেন এবং তাঁদের রাজনৈতিক দক্ষতার মাত্রাও অত্যন্ত ভিন্ন , যার ফলে পুরো সংমিশ্রণটি বিশৃঙ্খল হয়ে ওঠে এবং কখনও কখনও

এক করুণ চিত্র উপস্থাপন করে। নিশ্চিতভাবেই কেউ বিশ্বাস করে না যে জাতির এই নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আধ্যাত্মিকভাবে বা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে বিশিষ্ট । আমি আশা করি, কেউই এতটা বোকা নয় যে বিশ্বাস করবে যে গড় বুদ্ধিমত্তার ভোটারদের ব্যালট বাক্সে রাখা কাগজ থেকে শত শত রাষ্ট্রনায়ক উঠে আসতে পারে । জনপ্রিয় ভোটের মাধ্যমে প্রতিভাদের জন্ম হয়—এই অযৌক্তিক বিশ্বাসের কোনো নিন্দাই খুব কঠোর নয়। প্রথমত, সেই সময়গুলো সত্যিই আশীর্বাদপূর্ণ যখন জনগণের মধ্য থেকে একজন রাষ্ট্রনায়কের আবির্ভাব ঘটে। এমন মানুষ একবারে শত শত সংখ্যায় আবির্ভূত হন না । দ্বিতীয়ত, জনসাধারণের মধ্যে যেকোনো অসামান্য প্রতিভার প্রতি একটি সহজাত বিদ্বেষ রয়েছে। নির্বাচনের মাধ্যমে একজন সত্যিকারের মহান ব্যক্তিকে "আবিষ্কৃত" হতে দেখার চেয়ে সূঁচের ছিদ্র দিয়ে উট পার হতে দেখার সম্ভাবনা বেশি ।

ইতিহাসে যা কিছু ঘটেছে তা বৃহত্তর সমাজের গড় স্তরের ঊর্ধ্বে।
এর প্রধান কারণ ছিল একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্বের চালিকাশক্তি।

কিন্তু এখানে, সামান্য বুদ্ধিমত্তার অধিকারী পাঁচশ জন ব্যক্তি দেশের সবচেয়ে জরুরি বিষয়গুলোতে রায় দেন। তাঁরা সরকার গঠন করেন, যা আবার তাদের গৃহীত প্রতিটি আইন প্রণয়নমূলক পদক্ষেপের জন্য এই বিশিষ্ট পরিষদের সমর্থন লাভ করে, যার অর্থ হলো বর্তমান নীতিই এই পাঁচশ জন ব্যক্তির নীতি ।

এবং প্রকৃতপক্ষে, সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই নীতিটি তার উৎসের ছাপ বহন করে ।

কিন্তু আসুন এই প্রতিনিধিদের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতাকে একপাশে রেখে প্রশ্ন করি, তাদের সামনে থাকা কাজের প্রকৃতি কী। যদি আমরা বিবেচনা করি যে, যে সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা ও সমাধান করতে হবে সেগুলো অত্যন্ত ভিন্ন ও বিজাতীয় ক্ষেত্রের অন্তর্গত , তাহলে আমরা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারব যে , একটি শাসনব্যবস্থা কতটা অদক্ষ হতে পারে, যা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এমন একটি গণসমাবেশের হাতে অর্পণ করে, যেখানে মাত্র কয়েকজন লোকেরই সিদ্ধান্তযোগ্য বিষয়গুলো মোকাবিলা করার মতো জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা রয়েছে । সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রশ্নগুলো এমন একটি ট্রাইব্যুনালের কাছে পেশ করা হয় , যার সদস্যদের এক-দশমাংশের বেশি অর্থনীতির মৌলিক বিষয়গুলো অধ্যয়ন করেননি। এর অর্থ হলো , চূড়ান্ত ক্ষমতা এমন ব্যক্তিদের হাতে ন্যস্ত থাকে, যাদের এমন কোনো পূর্ব প্রশিক্ষণ নেই যা তাদেরকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আহ্বান করা বিষয়গুলোতে দক্ষ করে তুলতে পারে।

অন্য যেকোনো সমস্যার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য । সবসময় সংখ্যাগরিষ্ঠই দায়ী।
অজ্ঞ ও অযোগ্য লোকেরাই সবকিছু সিদ্ধান্ত নেয়; কারণ প্রতিষ্ঠানটির গঠন অপরিবর্তিত থাকে , অথচ আলোচ্য বিষয়গুলো জনজীবনের সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় ক্ষেত্র থেকে আসে। বুদ্ধিদীপ্ত বিচার-বিবেচনা কেবল তখনই সম্ভব হতো, যদি বিভিন্ন প্রতিনিধির বিভিন্ন বিষয় সমাধানের কর্তৃত্ব থাকত । এটা ভাবা অযৌক্তিক যে একই ব্যক্তিরা পরিবহন বা, ধরা যাক, পররাষ্ট্রনীতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সমানভাবে উপযুক্ত, যদি না তাদের প্রত্যেকেই একজন সর্বজনীন প্রতিভাধর হন । কিন্তু একটি নির্দিষ্ট যুগে খুব কমই একাধিক প্রতিভার আবির্ভাব ঘটে। এখানে আমরা শৌখিন ব্যক্তিদের প্রকৃত মস্তিষ্কের সাথে মোকাবিলা করছি, যারা অহংকারী ও দাম্ভিক হওয়ার পাশাপাশি সংকীর্ণমনাও বটে ; আমরা বুদ্ধিবৃত্তিক জগতের নিকৃষ্টতম প্রতিনিধিদের সাথে কাজ করছি। একারণেই এই মহৎ ভদ্রলোকেরা এমন সব বিষয় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আশ্চর্যজনকভাবে গাম্ভীর্যের অভাব দেখান, যেগুলোর জন্য এমনকি মহান ব্যক্তিদের কাছ থেকেও সবচেয়ে সূক্ষ্ম বিবেচনার প্রয়োজন হয়। রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ অস্তিত্বের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আরও উপযুক্ত পরিবেশে আলোচনা ও বিতর্ক করা হয় ।

Machine Translated by Google

তাস খেলার টেবিলে তার পাশে। প্রসঙ্গত, এটি এই ভদ্রলোকদের জন্য জাতির ভাগ্য নির্ধারণের চেয়ে অনেক বেশি উপযুক্ত একটি পেশার ইঙ্গিত দেয়।

অবশ্যই, এটা ধরে নেওয়া অনুচিত হবে যে সংসদের প্রত্যেক সদস্যই বিশেষ গুণসম্পন্ন।
স্বভাবগতভাবেই দায়িত্ববোধ খুবই কম। এ বিষয়ে কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

কিন্তু এই ব্যবস্থাটি, ব্যক্তিদেরকে এমন সব বিষয়ে রায় দিতে বাধ্য করার মাধ্যমে যে বিষয়ে কথা বলার যোগ্যতা তাদের নেই, ধীরে ধীরে এর নৈতিক চরিত্রকে ক্ষুণ্ণ করছে। কেউ বলার সাহস করে না, "মহোদয়গণ, আমি দুঃখিত যে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি সে সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। আমি তো এই বিষয়ে একেবারেই যোগ্য নই।" এমন ঘোষণা দেওয়া হলেও তাতে বিশেষ কোনো পার্থক্য হবে না; এমন স্পষ্ট আন্তরিকতা কেউ বুঝবে না।

এই ঘোষণাটি যিনি করবেন, তাকে একজন সম্মানীয় গাধা হিসেবে গণ্য করা হবে, যাকে দিয়ে মজাটা নষ্ট করতে দেওয়া যাবে না । মানব প্রকৃতি সম্পর্কে যারা সামান্যতমও জানেন, তারা জানেন যে কেউই তার সঙ্গীদের কাছে বোকা হিসেবে পরিচিত হতে চায় না ; এবং কিছু মহলে আন্তরিকতাকে বোকামির মাপকাঠি হিসেবে ধরা হয় ।

এভাবেই ঘটে যে, একজন স্বভাবতই সৎ ব্যক্তি সংসদে নির্বাচিত হলে, অবশেষে পরিস্থিতির চাপে একটি সাধারণ বিষয়ে সম্মতি দিতে বাধ্য হতে পারেন ।
এমন এক ধরনের আচরণ যা স্বয়ং ঘৃণ্য এবং জনবিশ্বাসের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার শামিল । এই অনুভূতি যে, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো কিছুতে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে
এই সিদ্ধান্ত পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন ঘটাবে না, বরং একজন ব্যক্তির মনে মাঝেমধ্যে জেগে ওঠা সম্মানবোধকেও ধ্বংস করে দেবে।
পরিশেষে , একজন সাধারণভাবে সৎ ডেপুটি হয়তো নিজেকে এটা বোঝাতে সফল হতে পারেন যে তিনি মোটেই সবচেয়ে খারাপ নন এবং একটি নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে তিনি আরও খারাপ কিছু ঘটা থেকে প্রতিরোধ করছেন।

এখানে একটি পাল্টা যুক্তি দেওয়া যেতে পারে । বলা যেতে পারে যে, অবশ্যই কোনো একক সদস্যের এই বা সেই বিষয় মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকে না , কিন্তু প্রতিটি রাজনৈতিক বিষয়ে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হিসেবে দলের পরামর্শের ভিত্তিতেই সেগুলোর প্রতি তার মনোভাব গঠিত হয় ; আরও বলা যেতে পারে যে, দল বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বিশেষ কমিটি গঠন করে, যাদের সামনে উপস্থাপিত বিষয়গুলো মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের চেয়েও বেশি জ্ঞান থাকে।

প্রথম দৃষ্টিতে এই যুক্তিটি যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। কিন্তু তখন আরেকটি সমস্যা দেখা দেয় – তা হলো, যখন সবচেয়ে গুরুতর সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা মাত্র কয়েকজনেরই রয়েছে , তখন পাঁচশ জনকে কেন নির্বাচন করা হবে?

আমাদের আধুনিক সংসদীয় ব্যবস্থার লক্ষ্য বুদ্ধিমান ও সুশিক্ষিত প্রতিনিধিদের একটি সমাবেশ তৈরি করা নয়। মোটেই না। বরং, এর লক্ষ্য হলো এমন একদল সাধারণ মানের মানুষকে একত্রিত করা, যারা একে অপরের মতামতের উপর নির্ভরশীল এবং যাদের বুদ্ধিবৃত্তিক পরিধি যত সংকীর্ণ হয়, তাদেরকে তত সহজে পরিচালিত করা যায় । শুধুমাত্র এইভাবেই দলীয় নীতি, যা বর্তমানে একটি নেতিবাচক অর্থ বহন করে, তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব ।

এইভাবে , প্রকৃত নিয়ন্ত্রক চক্রান্তকারীর পক্ষে আড়ালে থাকা সম্ভব হয় এবং তাকে তার কৃতকর্মের জন্য কখনো জবাবদিহি করতে হয় না । এমন পরিস্থিতিতে , গৃহীত কোনো সিদ্ধান্তের দায় , তা সমগ্র জাতির জন্য যতই বিপর্যয়কর হোক না কেন , সেই ব্যক্তির উপর চাপানো যায় না , যাকে সবাই এই পুরো ঘটনার জন্য দায়ী খলনায়ক হিসেবে চেনে । সমস্ত দায়ভার এসে পড়ে পুরো দলের কাঁধে ।

বাস্তবে, কোনো দায়িত্বই অবশিষ্ট থাকে না। কারণ দায়িত্ববোধ কেবল ব্যক্তিগত কর্তব্য থেকেই উদ্ভূত হয়, অন্তঃসারশূন্য কথা বলা সংসদীয় সভার ওপর অর্পিত বাধ্যবাধকতা থেকে নয় ।

সংসদ নামক প্রতিষ্ঠানটি বেজি-সদৃশ এমন লোকদের আকর্ষণ করে, যারা মুক্ত বিশ্বকে অপছন্দ করে। এই ধরনের প্রতিষ্ঠান এমন কোনো সৎ ব্যক্তিকে আকর্ষণ করবে না, যিনি নিজের কাজের ব্যক্তিগত দায়িত্ব নিতে ইচ্ছুক ।

এই কারণেই এই ধরনের গণতন্ত্র এমন এক জাতির হাতে হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে, যারা নিজেদের অভ্যন্তরীণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রকাশ্য আলো এড়িয়ে চলতে বাধ্য হয় , যেমন

Machine Translated by Google

সর্বদাই ছিল এবং সর্বদাই থাকবে। কেবল একজন ইহুদিই এমন একটি প্রতিষ্ঠানের প্রশংসা করতে পারে যা তার নিজের মতোই দুর্নীতিগ্রস্ত ও ভণ্ড।

* * *

এই ধরনের গণতন্ত্রের বিপরীতে রয়েছে জার্মান গণতন্ত্র, যা একটি প্রকৃত গণতন্ত্র; কারণ এতে নেতা অবাধে নির্বাচিত হন এবং নিজের কাজ ও ভুলের জন্য সম্পূর্ণ দায়ভার গ্রহণ করতে বাধ্য থাকেন। সমাধানযোগ্য সমস্যাগুলো সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে নির্ধারিত হয় না , বরং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ব্যক্তি নিজে, এবং এই সিদ্ধান্তগুলোর প্রতি দায়বদ্ধতার নিশ্চয়তা হিসেবে তিনি তাঁর সর্বস্ব , এমনকি জীবন পর্যন্ত, সঁপে দিয়ে শপথ করেন।

এখানে আপত্তি তোলা যেতে পারে যে, এমন পরিস্থিতিতে খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন হবে
এমন একজন মানুষ যিনি এমন একটি ভাগ্যনির্ধারক কাজে নিজেকে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকবেন । এই আপত্তির জবাবটি নিম্নরূপ: আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই যে
আমাদের জার্মান গণতন্ত্রের অন্তর্নিহিত চেতনা একজন আকস্মিক সুযোগসন্ধানীকে, যে হয়তো বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে শূন্য এবং নৈতিকভাবে একজন প্রতারক, এমন কোনো কুটিল পদে অধিষ্ঠিত হতে বাধা দেয় যেখান থেকে সে তার সহনাগরিকদের উপর শাসন করতে পারে । জার্মান গণতন্ত্রে এমন সুদূরপ্রসারী দায়িত্ব গ্রহণের ভয়ই অজ্ঞ ও অযোগ্যদের নিবৃত্ত করবে।

কিন্তু এমন কোনো ব্যক্তি যদি নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিয়েও ঢোকে , তাকে সহজেই চিহ্নিত করা যাবে ।
একে চিহ্নিত করুন এবং নির্মমভাবে সম্বোধন করুন, অনেকটা এইরকম : "দূর হও, বদমাশ! তোমার পা দিয়ে এই পথ অপবিত্র করো না; কারণ এই পথ ইতিহাসের দেবালয়ের প্রবেশদ্বারে নিয়ে যায়, এবং তা বিশ্বাসঘাতক চোরদের জন্য নয়, বরং বীরদের জন্য!"

* * *

ভিয়েনার সংসদের অধিবেশনে দুই বছর যোগ দেওয়ার পর আমার এই ধারণা তৈরি হয়েছিল । আমি আর সেখানে কখনো যাইনি।
সংসদীয় শাসনব্যবস্থা হ্যাবসবার্গ সাম্রাজ্যের শেষ বছরগুলিতে পতনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছানোর অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল । সংসদীয় পদ্ধতির মাধ্যমে জার্মান উপাদানের আধিপত্য যত হ্রাস পেয়েছিল, এর গুরুত্বও তত বৃদ্ধি পেয়েছিল ।

একটি জাতিগোষ্ঠীকে অন্যটির বিরুদ্ধে উস্কে দেওয়ার একটি ব্যবস্থা । সাম্রাজ্যের সংসদে জার্মান গোষ্ঠীটি এই ব্যবস্থার কারণে সর্বদাই ক্ষতিগ্রস্ত হতো, যার অর্থ হলো এর ফলাফল সমগ্র সাম্রাজ্যের জন্যই ক্ষতিকর ছিল; শতাব্দীর শেষ নাগাদ, এমনকি সবচেয়ে সরলমনা ব্যক্তিরাও দেখতে পাচ্ছিল যে, দ্বৈত রাজতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ সংহতির শক্তি প্রাদেশিক জাতিগোষ্ঠীগুলোর বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতাকে প্রতিহত করার জন্য আর যথেষ্ট ছিল না। বরং ঠিক তার উল্টো!

রাষ্ট্র নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য যে পদক্ষেপগুলো নিতান্তই দুর্বল হয়ে পড়ছিল , এবং একই সাথে রাষ্ট্রের প্রতি সাধারণ মানুষের অশ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছিল। শুধু হাঙ্গেরীয়রাই নয়, বিভিন্ন স্লাভীয় প্রদেশগুলোও ক্রমান্বয়ে তাদের সকলকে ঘিরে থাকা রাজতন্ত্রের সাথে নিজেদের একাত্মতা হারিয়ে ফেলছিল, এবং তাই তারা এর দুর্বলতাগুলোকে কোনোভাবেই নিজেদের জন্য ক্ষতিকর বলে মনে করত না । বরং তারা বার্ধক্যজনিত এই অবক্ষয়ের প্রকাশগুলোতে আনন্দিত হচ্ছিল। তারা রাষ্ট্রের পুনরুদ্ধারের আশায় নয়, বরং এর চূড়ান্ত পতনের আশায় ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে ছিল ।

সম্পূর্ণ পতনের পূর্বে সংসদে জার্মান অংশের স্বার্থের বিনিময়ে সব ধরনের জোরালো দাবির কাছে অপমানজনক ছাড় দেওয়া হয়েছিল । সারাদেশে, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীকে একে অপরের বিরুদ্ধে উস্কে দেওয়ার মাধ্যমেই রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা গড়ে তোলা হয়েছিল ।
তবে, উন্নয়নের সাধারণ ধারাটি জার্মানদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হচ্ছিল। বিশেষ করে আর্চডিউক ফ্রানৎস ফার্দিনান্দ সিংহাসনের বৈধ উত্তরাধিকারী হওয়ার পর, প্রশাসনের উচ্চ স্তর থেকে নিম্ন স্তর পর্যন্ত চেক শক্তি বৃদ্ধির নীতি পদ্ধতিগতভাবে অনুসরণ করা হয়েছিল । দ্বৈত রাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ শাসক সম্ভাব্য সকল উপায়ে ব্যক্তিগতভাবে...

Machine Translated by Google

তিনি জার্মান প্রভাব নির্মূল করার নীতিকে প্রসারিত করেছিলেন , অথবা অন্তত সেই নীতির রক্ষক হিসেবে কাজ করেছিলেন। রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে, বিশুদ্ধ জার্মান অধ্যুষিত জেলাগুলোকে ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে মিশ্র ভাষার বিপজ্জনক অঞ্চলে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল । এমনকি নিম্ন অস্ট্রিয়াতেও এই প্রক্রিয়াটি ক্রমবর্ধমান দ্রুত গতিতে এগোতে শুরু করে এবং চেকদের কাছে ভিয়েনা তাদের বৃহত্তম শহর হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে।

এই নতুন হ্যাবসবার্গের পারিবারিক পরিমণ্ডলে চেক ভাষাই ছিল পছন্দের ভাষা। আর্চডিউকের স্ত্রী পূর্বে একজন চেক কাউন্টেস ছিলেন এবং রাজকুমারকে একটি মর্গ্যান্যাটিক বিবাহের মাধ্যমে বিয়ে করেছিলেন ।
তিনি এমন এক পরিবেশ থেকে এসেছিলেন যেখানে জার্মানদের প্রতি শত্রুতা ছিল ঐতিহ্যগত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ
আর্চডিউকের মনে এই ধারণা ছিল যে, মধ্য ইউরোপে শুধুমাত্র ক্যাথলিক ধর্মের ভিত্তিতে একটি স্লাভিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হবে , যা অর্থোডক্স রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করবে ।

হ্যাবসবার্গদের ইতিহাসে যেমনটা প্রায়শই ঘটত , ধর্মকে নিছক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছিল, এবং এক্ষেত্রে এটি ছিল একটি বিপর্যয়কর নীতি, অন্তত যদি বিচার করা হয় তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে।
জার্মান স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি বিবেচনা করা হয়েছিল। এর পরিণতি নানা কারণে শোচনীয় ছিল।
হ্যাবসবার্গ রাজবংশ বা ক্যাথলিক চার্চ কেউই তাদের প্রত্যাশিত পুরস্কার পায়নি । হ্যাবসবার্গরা তাদের সিংহাসন হারায় এবং চার্চ তার বিশাল রাষ্ট্রব্যবস্থা হারায়। রাজনীতির স্বার্থে ধর্মীয় উদ্দেশ্য ব্যবহার করে এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা হয়েছিল, যা এই নীতির প্রবর্তকরা আগে অসম্ভব বলে মনে করতেন ।

পুরাতন রাজতন্ত্রে সকল সম্ভাব্য উপায়ে জার্মানবাদকে নির্মূল করার প্রচেষ্টার জবাবে অস্ট্রিয়ায় বৃহত্তর জার্মান আন্দোলনের উদ্ভব ঘটে ।
১৮৮০-এর দশকে, ম্যানচেস্টার উদারনীতিবাদ, যার মূল ধারণা ছিল ইহুদি-প্রভাবিত, দ্বৈত রাজতন্ত্রে তার প্রভাবের শিখরে পৌঁছেছিল বা তা ইতিমধ্যেই অতিক্রম করে গিয়েছিল । এই প্রতিক্রিয়া সামাজিক প্রবণতা থেকে নয়, বরং জাতীয়তাবাদী প্রবণতা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল, কারণ
পুরনো অস্ট্রিয়ায় এমনটা বরাবরই ঘটত। আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি জার্মানদেরকে জোরালো প্রতিরক্ষায় চালিত করেছিল। অর্থনৈতিক বিষয়গুলো ধীরে ধীরে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছিল; কিন্তু সেই সময়ে সেগুলো ছিল গৌণ । সাধারণ রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার মধ্য থেকে দুটি দলীয় সংগঠনের উদ্ভব ঘটে। একটি ছিল চরিত্রগতভাবে অধিকতর জাতীয়তাবাদী, অন্যটি অধিকতর সামাজিক; তবে উভয়ই ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও শিক্ষণীয় ছিল।

১৮৬৬ সালের যুদ্ধের পর, যা অস্ট্রিয়ার চরম অপমানের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছিল, হ্যাবসবার্গরা রণক্ষেত্রে প্রতিশোধ নেওয়ার কথা ভাবছিল । শুধুমাত্র মেক্সিকোতে সম্রাট ম্যাক্সিমিলিয়ানের মর্মান্তিক পরিণতিই ফ্রান্সের সাথে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ম্যাক্সিমিলিয়ানের বিপর্যয়কর অভিযানের জন্য প্রধানত তৃতীয় নেপোলিয়নই দায়ী ছিলেন , এবং ফরাসিরা তাকে পরিত্যাগ করায় ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু হ্যাবসবার্গরা তখনও তাদের সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। যদি ১৮৭০-৭১ সালের যুদ্ধটি এমন এক অসাধারণ বিজয় না হতো, তবে ভিয়েনার রাজদরবার সম্ভবত সাদোয়ার প্রতিশোধ নিতে একটি রক্তক্ষয়ী খেলায় মেতে উঠত। কিন্তু যখন ফরাসি-জার্মান যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রথম খবর আসতে শুরু করল, যা সত্য হলেও অবিশ্বাস্য এবং প্রায় অলৌকিক বলে মনে হচ্ছিল , তখন সমস্ত রাজাদের মধ্যে "সবচেয়ে জ্ঞানী" রাজা বুঝতে পারলেন যে মুহূর্তটি প্রতিকূল এবং তা মেনে নেওয়ার চেষ্টা করলেন ।

প্রতিকূল পরিস্থিতি যথাসম্ভব সৌজন্যের সাথে মোকাবেলা করা ।
এই দুই বছরের (১৮৭০-৭১) বীরত্বপূর্ণ সংঘাত আরও বড় এক অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়েছিল; কারণ হ্যাবসবার্গদের ক্ষেত্রে এই হৃদয়ের পরিবর্তন কখনও হৃদয়ের প্রয়োজন থেকে আসেনি, বরং এসেছিল কেবল পরিস্থিতির চাপ থেকে। কিন্তু পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্তের জার্মান জনগোষ্ঠী নবপ্রতিষ্ঠিত জার্মান রাইখের বিজয়গৌরবে উদ্বেলিত হয়েছিল এবং তাদের পূর্বপুরুষদের স্বপ্নকে এক গৌরবময় বাস্তবে পুনর্জন্ম নিতে দেখে তারা গভীরভাবে আবেগাপ্লুত হয়েছিল।

এখানে আমরা যেন কোনো ভুল না করি - প্রকৃত অস্ট্রিয়ান জার্মান পরবর্তীকালে বুঝেছেন যে, কোনিগ্রাৎস ছিল এমন এক রাইখ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য একটি দুঃখজনক, কিন্তু প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত , যে রাইখ আর পুরোনো মৈত্রীর বোঝায় ভারাক্রান্ত হবে না এবং আর কোনো রোগে আক্রান্ত হবে না ।
অত্যন্ত জঘন্য। সর্বোপরি, অস্ট্রিয়ান জার্মান তার অন্তরের গভীরে অনুভব করেছিলেন যে হ্যাবসবার্গদের ঐতিহাসিক অধ্যায়ের অবসান ঘটেছে এবং নতুন সাম্রাজ্য কেবল এমন একজন সম্রাটকেই বেছে নিতে পারে , যাঁর বীরত্ব তাঁকে ‘ রাইনের মুকুট ’ পরিধানের যোগ্য করে তুলবে । এটাই ছিল সঠিক এবং আমরা তাঁর প্রশংসা করি।

Machine Translated by Google

বিধাতা সেই পরিবারেরই এক বংশধরকে বেছে নিয়েছিলেন, যে পরিবার থেকে মহান ফ্রেডরিক এসেছিলেন , যিনি প্রাচীনকালে জাতিকে তার পুনর্জন্মের এক উজ্জ্বল ও চিরন্তন প্রতীক দান করেছিলেন।

১৮৭০-৭১ সালের মহাযুদ্ধের পর, হ্যাবসবার্গ রাজবংশ বিপজ্জনক জার্মান শক্তিকে— তাদের অনুভূতি ও মনোভাব নিয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না —ধীরে ধীরে কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ধ্বংস করার জন্য পূর্ণ সংকল্প নিয়ে কাজে নেমে পড়ল। আমি ‘ধ্বংস’ শব্দটি ব্যবহার করছি, কারণ স্লাভদের সমর্থন করার এই নীতির চূড়ান্ত পরিণতি যা অবশ্যম্ভাবী ছিল , এই শব্দটি তা-ই প্রকাশ করে । তারপরই আগুন জ্বলে উঠল।
যাদের নির্মূল করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যেই বিদ্রোহ । আধুনিক জার্মান ইতিহাসে এমন আগুন আগে কখনো দেখা যায়নি।

এই প্রথমবার জাতীয়তাবাদী ও দেশপ্রেমিকরা বিদ্রোহীতে পরিণত হলো।

তারা জাতি বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নয়, বরং এমন এক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, যা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী, অনিবার্যভাবে তাদের নিজেদের জাতির ধ্বংস ডেকে আনবে। আধুনিক ইতিহাসে প্রথমবারের মতো, চিরাচরিত রাজবংশীয় দেশপ্রেম এবং স্বদেশ ও জাতির প্রতি জাতীয় ভালোবাসা প্রকাশ্য সংঘাতে লিপ্ত হয়েছিল।

বিগত শতাব্দীর শেষ দশকে অস্ট্রিয়ায় বৃহত্তর জার্মান আন্দোলনের কৃতিত্ব ছিল এই সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ইঙ্গিত যে, সম্মান দাবি করার এবং সুরক্ষা দেওয়ার অধিকার রাষ্ট্রের রয়েছে।
এর ক্ষমতা কেবল তখনই প্রয়োগ করা হবে, যখন তা জাতির স্বার্থ অনুসারে অথবা অন্তত এমনভাবে প্রয়োগ করা হবে না যা সেই স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর।

রাষ্ট্রের ক্ষমতা নিজেই কোনো লক্ষ্য হতে পারে না; যদি তা হতো, তবে সব ধরনের স্বৈরাচারই অলঙ্ঘনীয় ও পবিত্র হয়ে যেত।

যদি কোনো সরকার জনগণকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে ক্ষমতার হাতিয়ার ব্যবহার করে, তবে বিদ্রোহ করা কেবল প্রত্যেক নাগরিকের অধিকারই নয়, বরং কর্তব্যও ।

এই ধরনের পরিস্থিতি আদৌ ঘটে কি না এবং কখন ঘটে, সেই প্রশ্নের উত্তর তত্ত্বে দেওয়া সম্ভব নয়।
কৌশলগত বিবেচনা সাপেক্ষে, কিন্তু শুধুমাত্র বলপ্রয়োগের মাধ্যমেই, এবং সাফল্যই বিষয়টি নিষ্পত্তি করে।

প্রত্যেকটি সরকার, এমনকি সবচেয়ে নিকৃষ্ট সরকারটিও, জাতির বিশ্বাসের সঙ্গে হাজারবার বিশ্বাসঘাতকতা করলেও, দাবি করবে যে তার কর্তব্য হলো রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব সমুন্নত রাখা । এর বিরোধীরা, যারা জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য লড়াই করে, তাদের যদি এমন সরকারের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে এবং নিজেদের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য নিশ্চিত করতে হয়, তবে সরকারের মতোই একই অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে।
সুতরাং, যাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হবে সেই শক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত ‘বৈধ’ উপায় ব্যবহার করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘাতটি সেই উপায়েই পরিচালিত হবে ; কিন্তু অত্যাচারী যদি অবৈধ উপায় ব্যবহার করে, তবে বিদ্রোহীরাও তা ব্যবহার করতে দ্বিধা করবে না ।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে মানব অস্তিত্বের সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য কোনো রাষ্ট্র বা সরকার টিকিয়ে রাখা নয় , বরং জাতির অস্তিত্ব রক্ষা করা।

যদি কোনো জাতি নিপীড়ন, এমনকি ধ্বংসের হুমকির সম্মুখীন হয় , তবে বৈধতার প্রশ্নটি গৌণ হয়ে পড়ে । প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষ তখন কেবল 'বৈধ' বলে বিবেচিত উপায়ই ব্যবহার করতে পারে , কিন্তু নিপীড়িতের আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি সর্বদাই, সর্বোচ্চ মাত্রায়, উপলব্ধ সকল উপায় ব্যবহারের ন্যায্যতা প্রমাণ করে।

শুধুমাত্র এই নীতিটি অনুধাবন করার মাধ্যমেই জাতিসমূহের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পরাধীনতা থেকে মুক্তির সংগ্রাম পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছিল , যেমনটি চমৎকার ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত আমাদের দেখায়।

রাষ্ট্রের অধিকারের চেয়ে মানবাধিকার অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মানুষ যদি নিজেদের অধিকারের সংগ্রামে হেরে যায়, তার মানে হলো , এই পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য বিধাতার বিধানে তারা বড্ড দুর্বল ছিল । এই পৃথিবী কাপুরুষ জাতিদের জন্য নয়।

স্বৈরাচার কত সহজে লুকিয়ে পড়তে পারে, অস্ট্রিয়া তার একটি অত্যন্ত স্পষ্ট ও চমকপ্রদ উদাহরণ ।
তথাকথিত 'আইনবাদের' আড়ালে।

হ্যাবসবার্গ রাষ্ট্রে ক্ষমতার আইনসম্মত প্রয়োগ নির্ভর করত সংসদের জার্মানি-বিরোধী মনোভাবের ওপর, যেখানে অ-জার্মান সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল, এবং রাজবংশের ওপর, যা নিজেও জার্মানির প্রতি বিদ্বেষী ছিল । রাষ্ট্রের সমগ্র ক্ষমতা এই দুটি উপাদানের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত ছিল।
এই দুটি কারণের মাধ্যমে জার্মানদের ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা করা নিরর্থক ছিল। যারা একমাত্র সম্ভাব্য উপায় হিসেবে 'আইনি' পথ এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্যের পরামর্শ দিয়েছিলেন, তারা তা করেননি।

Machine Translated by Google

প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না ; কারণ আইনি উপায়ে প্রতিরোধের নীতি বাস্তবায়ন করা যেত না । আইনবাদী উপদেষ্টাদের পরামর্শ মেনে চললে রাজতন্ত্রের অভ্যন্তরে জার্মান অংশের অবশ্যম্ভাবী ধ্বংস নেমে আসত, এবং এই বিপর্যয় ঘটতে বেশি সময় লাগত না । জার্মান অংশটি কেবল এই কারণেই রক্ষা পেয়েছিল যে, রাষ্ট্র নিজেই ভেঙে পড়েছিল ।

চশমা পরা তাত্ত্বিকরা নিজেদের জাতির জন্য মরার চেয়ে নিজেদের মতবাদের জন্য মরতে বেশি পছন্দ করবে।
যেহেতু মানুষ আইন তৈরি করে, তাই সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে সে এই আইনগুলোর জন্যই বেঁচে থাকে।
সর্ব-জার্মান আন্দোলন আমাদের যে মহান কাজটি করেছিল তা হলো এই সবকিছুকে উৎখাত করা।
গোঁড়া তাত্ত্বিক এবং অন্যান্য অন্ধবিশ্বাসীদের বিস্ময় সত্ত্বেও, এটি একটি বাজে কথা।
যখন হ্যাবসবার্গরা সর্বপ্রকার উপায় অবলম্বন করে জার্মান শক্তিকে আক্রমণ করার পরিকল্পনা করেছিল , তখন সর্ব -জার্মান আন্দোলন সেই "মহিমান্বিত " রাজবংশের বিরুদ্ধে নির্মমভাবে আঘাত হেনেছিল । এই দলটিই সর্বপ্রথম রাষ্ট্রের অবক্ষয়কে পরীক্ষা করে উন্মোচন করেছিল; এবং এর মাধ্যমে এটি লক্ষ লক্ষ মানুষের চোখ খুলে দিয়েছিল । এই জঘন্য রাজবংশের কবল থেকে দেশপ্রেমের আদর্শকে মুক্ত করা ছিল সর্ব-জার্মান আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি ।

যখন দলটি প্রথম আত্মপ্রকাশ করে, তখন এর অনেক সমর্থক ছিল – বস্তুত, আন্দোলনটি একটি তুষারধসে পরিণত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু প্রাথমিক সাফল্যগুলো টেকসই হয়নি। যখন
আমি যখন ভিয়েনায় পৌঁছালাম, ততদিনে ক্রিশ্চিয়ান সোশ্যালিস্ট পার্টি ক্ষমতায় এসে পড়ায় প্যান-জার্মান পার্টি ম্লান হয়ে গিয়েছিল । বস্তুত, প্যান-জার্মান পার্টি প্রায় সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছিল।

একদিকে সর্ব-জার্মান আন্দোলনের উত্থান ও পতন এবং অন্যদিকে খ্রিস্টান সমাজতান্ত্রিক দলের অলৌকিক অগ্রগতি আমার অধ্যয়নের বিষয় হয়ে ওঠে, কারণ এগুলি আমার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

যখন আমি ভিয়েনায় পৌঁছালাম, আমার সহানুভূতি একচেটিয়াভাবে বৃহত্তর জার্মান আন্দোলনের প্রতিই ছিল।

যে বিষয়টি আমাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছিল তা হলো , 'হাইল হোহেনজোলার্ন' ধ্বনি দেওয়ার সাহস এবং নিজেদেরকে জার্মান রাইখের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করার দৃঢ় সংকল্প, যেখান থেকে তারা কেবল সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন ছিল। তারা জনসমক্ষে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে কখনো দ্বিধা করেনি , যা আমার উৎসাহ ও বিশ্বাসকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। জার্মানত্ব সম্পর্কিত প্রতিটি বিষয়ে জনসমক্ষে নিজেদের মতামত প্রকাশ করা এবং কখনো আপোস না করাই ছিল, আমার কাছে, আমাদের জাতিকে বাঁচানোর একমাত্র উপায় । আমি বুঝতে পারছিলাম না , এত উজ্জ্বল একটি সূচনার পর কীভাবে এমন একটি আন্দোলন এত দ্রুত ভেঙে যেতে পারে ; একইভাবে এটাও অবোধ্য ছিল যে, খ্রিস্টান সমাজতন্ত্রীরা কীভাবে এত অল্প সময়ে এত বিপুল শক্তি অর্জন করেছিল । তখন তারা তাদের জনপ্রিয়তার শীর্ষে ছিল।

যখন আমি দুটি আন্দোলনের মধ্যে তুলনা করতে শুরু করলাম, তখন ভাগ্য আমাকে এই ধাঁধাময় সমস্যার কারণগুলো সবচেয়ে ভালোভাবে বোঝার সুযোগ করে দিল । এক্ষেত্রে, আমার নিজের দুঃখজনক পরিস্থিতির কারণে ভাগ্যের এই কার্যকলাপ ত্বরান্বিত হয়েছিল।

আমি আমার বিশ্লেষণ শুরু করব এমন দুজন ব্যক্তিকে নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে, যাঁরা এই আন্দোলনগুলোর প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা ছিলেন: গেয়র্গ ফন শোনারার এবং ড. কার্ল লুয়েগার।
ব্যক্তিত্বের দিক থেকে, দুজনেই তথাকথিত সংসদীয় ব্যক্তিত্বদের স্তর ও মর্যাদার চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে ছিলেন । ব্যাপক রাজনৈতিক দুর্নীতির মাঝেও তাঁরা নিষ্কলঙ্ক সততার জীবনযাপন করতেন। ব্যক্তিগতভাবে, আমি প্রথমে বৃহত্তর জার্মান আন্দোলনের প্রতিনিধি শ্যোনেরারকে পছন্দ করতাম এবং পরে ধীরে ধীরে খ্রিস্টান সমাজতন্ত্রীদের নেতাকেও পছন্দ করতে শুরু করি ।

যখন আমি তাদের দক্ষতার তুলনা করলাম, তখন মৌলিক বিষয়গুলিতে শোনারারকে আমার কাছে একজন উন্নততর ও গভীরতর চিন্তাবিদ বলে মনে হলো। তিনি অন্য সকলের চেয়ে আরও স্পষ্টভাবে ও নির্ভুলভাবে অস্ট্রীয় রাষ্ট্রের অবশ্যম্ভাবী পতনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। হ্যাবসবার্গ সাম্রাজ্য সম্পর্কিত এই সতর্কবাণী যদি জার্মানিতে আমলে নেওয়া হতো, তবে জার্মানিকে সমগ্র ইউরোপের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো সেই ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধ কখনোই ঘটত না।

কিন্তু শোনারার সমস্যাটির মূল কারণ খুঁজে বের করতে পারলেও , তিনি প্রায়শই ভুল করতেন।
মানুষ সম্পর্কে তাদের মূল্যায়নে।

আর এখানেই ছিল ডক্টর লুয়েগারের বিশেষ প্রতিভা। মানব প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর এক বিরল অন্তর্দৃষ্টি ছিল এবং তিনি মানুষকে তাদের প্রকৃত অবস্থার চেয়ে ভালো ভেবে ভুল না করার ব্যাপারে খুব সতর্ক ছিলেন। তিনি তাঁর পরিকল্পনাগুলো গড়ে তুলেছিলেন...

Machine Translated by Google

মানব জীবন তাকে যে বাস্তব সম্ভাবনাগুলো দিয়েছিল , সে বিষয়ে শোনারারের তেমন কোনো অন্তর্দৃষ্টি ছিল না । বৃহত্তর জার্মান আন্দোলনের এই নেতার সমস্ত ধারণা তাত্ত্বিকভাবে সঠিক ছিল, কিন্তু জনগণের কাছে তাঁর ধারণাগুলো উপস্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা বা বোধশক্তি তাঁর ছিল না। তিনি সেগুলোকে এমনভাবে সূত্রবদ্ধ করতে অক্ষম ছিলেন যা জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হতো।

সাধারণ মানুষের কাছে সহজে বোধগম্য, যাদের যুক্তিবোধ সীমিত এবং সর্বদা সীমিতই থাকবে ।

সুতরাং, শোনারারের সমস্ত জ্ঞান ছিল একজন নবীর জ্ঞান এবং তিনি তা বাস্তবে প্রয়োগ করতে কখনো সফল হতে পারেননি।

মানব প্রকৃতি সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টির এই অভাব তাকে নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের পেছনের শক্তিগুলোকে ভুলভাবে বিচার করতে পরিচালিত করেছিল। আন্দোলনসমূহ এবং পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্তর্নিহিত শক্তি।

শোনেনার অবশ্যই বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁকে যে সমস্যাগুলির মুখোমুখি হতে হয়েছিল সেগুলি আদর্শগত বিষয় , কিন্তু তিনি বুঝতে পারেননি যে কেবল জাতির ব্যাপক জনগণই এই বিশ্বাসগুলির বিজয় আনতে পারে, যেগুলি প্রকৃতিগতভাবে প্রায় ধর্মীয় ।

দুর্ভাগ্যবশত, তথাকথিত বুর্জোয়াদের মধ্যে সংগ্রামী মনোভাব কতটা দুর্বল, তা তিনি খুব অসম্পূর্ণভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। এই দুর্বলতার উৎস হলো তাদের অর্থনৈতিক অবস্থান – ব্যক্তিরা ঝুঁকি নিতে অত্যন্ত ভীত এবং তাই কোনো পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত থাকে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, কোনো বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির সফল হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই থাকে না, যদি না বৃহত্তর জনসাধারণ তার পতাকাবাহক হিসেবে কাজ করতে এবং যেখানে ও যত পরিমাণেই প্রয়োজন, তার জন্য লড়াই করতে নিজেদের প্রস্তুতি ঘোষণা করে ।

জনসংখ্যার নিম্নস্তরের গুরুত্ব অনুধাবন করতে না পারার এই অক্ষমতা অত্যন্ত নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। সামাজিক প্রশ্ন সম্পর্কে একটি অসম্পূর্ণ ধারণা ।

এই সব ক্ষেত্রে, ডক্টর লুয়েগার ছিলেন শোনারারের বিপরীত । মানব প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান তাঁকে বিভিন্ন সামাজিক শক্তি সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন করতে সক্ষম করেছিল এবং বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষমতাকে অবমূল্যায়ন করা থেকে বিরত রেখেছিল । আর সম্ভবত এই ক্ষমতাই তাঁকে নিজের রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের উপায় হিসেবে এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যবহার করার সুযোগ করে দিয়েছিল ।

কেবল তিনিই স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছিলেন যে, আমাদের এই যুগে উচ্চবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল নগণ্য এবং একটি নতুন মহান আন্দোলন বিজয়ী না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য লড়াই করতে তারা অক্ষম । তাই, তিনি তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সিংহভাগ উৎসর্গ করেছিলেন জনসংখ্যার সেই অংশকে নিজের পক্ষে আনার জন্য , যাদের অস্তিত্ব ছিল হুমকির মুখে, এবং তাদের সংগ্রামী চেতনাকে পঙ্গু করার চেষ্টা না করে তা জাগিয়ে তোলার জন্য। তিনি দ্রুত দীর্ঘকাল ধরে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলোর সমর্থন লাভের জন্য উপলব্ধ প্রতিটি উপায় অবলম্বন করেন , যাতে ক্ষমতার এই পুরোনো উৎসগুলো থেকে তাঁর আন্দোলনের জন্য সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সুবিধা অর্জন করা যায়।

প্রথমত, তিনি তাঁর নতুন দলের সামাজিক ভিত্তি হিসেবে বিলুপ্তির ঝুঁকিতে থাকা মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে বেছে নিলেন । এভাবে তিনি এমন সমর্থক জোগাড় করলেন যারা ব্যাপক ত্যাগ স্বীকারে ইচ্ছুক এবং যাদের লড়াইয়ের সহনশীলতা ছিল প্রবল । ক্যাথলিক চার্চের প্রতি তাঁর অসাধারণ বিচক্ষণ দৃষ্টিভঙ্গি দ্রুতই বিপুল সংখ্যায় তরুণ যাজকদের মন জয় করে নেয় , যার ফলে পুরনো যাজক দলটি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে যেতে অথবা, আরও বিচক্ষণতার সাথে, একীভূত হতে বাধ্য হয়।

একটি নতুন দলের সাথে , ক্রমান্বয়ে পরবর্তী পদগুলো অধিগ্রহণের আশায়।

কিন্তু এটা তার মৌলিক বিষয় বলে বিবেচনা করা হলে তা হবে এক গুরুতর অবিচার।

বৈশিষ্ট্যসমূহ। তিনি একজন প্রতিভাবান রণকৌশলীর দক্ষতার অধিকারী ছিলেন এবং মহৎ সংস্কারের ক্ষেত্রে ছিলেন এক প্রকৃত প্রতিভা; কিন্তু সম্ভাবনাগুলো সম্পর্কে তাঁর সুনির্দিষ্ট উপলব্ধি এবং নিজের সামর্থ্যের কারণেই তিনি সীমাবদ্ধ ছিলেন।

এই সত্যিই অসাধারণ মানুষটি যে লক্ষ্যগুলো অর্জন করতে চেয়েছিলেন, সেগুলো ছিল অত্যন্ত বাস্তবসম্মত। তিনি রাজতন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দু ভিয়েনা জয় করতে চেয়েছিলেন । ভিয়েনা থেকে জীবনের শেষ স্পন্দনটুকু পতনোন্মুখ সাম্রাজ্যের রুগ্ন ও জীর্ণ দেহে প্রবাহিত হচ্ছিল। এই হৃদয়কে যদি সুস্থ করা যায় , তবে দেহের অন্যান্য অংশও সেরে উঠবে।

প্রাণবন্ত হয়ে উঠত । ধারণাটি সঠিক ছিল ; কিন্তু এটি বাস্তবায়নের সময় ছিল অত্যন্ত সীমিত। আর এটাই ছিল লোকটির দুর্বলতা।

ভিয়েনার মেয়র হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব সর্বোত্তম অর্থে অমর ।

কথাগুলো। কিন্তু তা রাজতন্ত্রকে বাঁচাতে পারেনি । অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল।

তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী, শোনারার, বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছিলেন। ডক্টর লুয়েগার যা প্রয়োগ করেছিলেন তা অলৌকিকভাবে কার্যকর প্রমাণিত হয়েছিল । কিন্তু এই সাফল্যগুলোর ওপর তিনি যে আশা রেখেছিলেন ,

Machine Translated by Google

ব্যর্থ হয়েছিল। শোনারারের প্রচেষ্টা নিষ্ফল ছিল, কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় আশঙ্কাই সত্যি হয়েছিল। উভয়েই তাঁদের পরবর্তী লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হন। লুয়েগার অস্ট্রিয়াকে বাঁচাতে পারেননি , এবং শোনারার অস্ট্রিয়ায় জার্মান জাতির পতন রোধ করতে পারেননি।

এই দুটি দলের ব্যর্থতার কারণগুলো খতিয়ে দেখা আমাদের যুগের জন্য একটি অত্যন্ত শিক্ষণীয় পাঠ । এটি আমার বন্ধুদের জন্য বিশেষভাবে উপকারী, কারণ অনেক দিক থেকে আমাদের সময়ের পরিস্থিতি তাদের সময়ের পরিস্থিতির অনুরূপ। সুতরাং, এই ধরনের শিক্ষা আমাদের সেই ভুলগুলো করা থেকে বিরত থাকতে সাহায্য করতে পারে , যে ভুলগুলোর কারণে এই আন্দোলনগুলোর একটি ব্যর্থ হয়েছিল এবং অন্যটি নিষ্ফল ফল দিয়েছিল।

আমার মতে, অস্ট্রিয়ায় বৃহত্তর জার্মান আন্দোলনের পতন তিনটি বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত।

প্রথম কারণটি হলো , নেতাদের মধ্যে সামাজিক সমস্যার গুরুত্ব সম্পর্কে, বিশেষ করে নতুন বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য, কোনো সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। শ্যোনেরার এবং তাঁর অনুসারীরা তাঁদের মনোযোগ প্রধানত বুর্জোয়া শ্রেণীর দিকেই নিবদ্ধ করেছিলেন। এই কারণে, তাঁদের আন্দোলন মাঝারি মানের এবং বশ্যতামূলক প্রমাণিত হতে বাধ্য ছিল। জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণী, বিশেষ করে এর উচ্চ স্তরে , জাতি ও রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সম্পূর্ণ আত্মত্যাগের পর্যায়ে শান্তিবাদী —যদিও ব্যক্তি নিজে হয়তো এ বিষয়ে অবগত নন । সুসময়ে, যা এক্ষেত্রে সুশাসন বোঝায় , এই মনস্তাত্ত্বিক মনোভাব এই সামাজিক স্তরটিকে রাষ্ট্রের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান করে তোলে। কিন্তু যেখানে কুশাসন থাকে , সেখানে এর বিধ্বংসী প্রভাব পড়ে। একটি সত্যিকারের ক্লান্তিকর সংগ্রামের সম্ভাবনা নিশ্চিত করতে , সর্ব-জার্মান আন্দোলনকে অবশ্যই জনগণকে বোঝানোর দিকে তার প্রচেষ্টা নিবদ্ধ করতে হবে। এই ক্ষেত্রে ব্যর্থতা আন্দোলনটিকে শুরু থেকেই সেই মৌলিক প্রেরণা থেকে বঞ্চিত করেছিল , যা এই তরঙ্গের প্রয়োজন, যদি এটি অল্প সময়ের মধ্যেই স্তিমিত না হতে চায়।

আন্দোলনের একেবারে শুরুতেই এই নীতির সত্যতা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়ে এবং এই নীতিকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে অবহেলা করার মাধ্যমে নতুন দলটি এমন একটি ভুল করেছিল যা সংশোধন করা যায় না।
তারপর তা সোজা হয়ে গেল। আন্দোলনে অসংখ্য মধ্যপন্থী বুর্জোয়া উপাদানকে গ্রহণ করার ফলে এর অভ্যন্তরীণ অভিমুখ ক্রমশ নির্ধারিত হয়ে পড়ে, এবং এর ফলে জনগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সমর্থন লাভের আর কোনো সম্ভাবনাও নষ্ট হয়ে যায় । এমন পরিস্থিতিতে, আন্দোলনটি আলোচনা ও সমালোচনার বাইরে যেতে পারেনি। আধা-ধর্মীয় বিশ্বাস এবং

আন্দোলনে ত্যাগের চেতনা আর ছিল না । পরিবর্তে, "ইতিবাচক" সহযোগিতার দিকে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছিল , যার অর্থ ছিল এক্ষেত্রে স্থিতাবস্থার সাথে আপোস করা, আলোচনার বিষয়গুলির কঠিন দিকগুলো ধীরে ধীরে নরম করে আনা এবং অবশেষে এক অশুভ শান্তি স্থাপন করা।

সর্ব-জার্মান আন্দোলনের এমনই পরিণতি হয়েছিল, কারণ শুরুতে এর নেতারা সাফল্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্তটি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন— আর তা হলো , দেশের ব্যাপক জনগণের মধ্য থেকেই তাদের সমর্থক সংগ্রহ করতে হবে । আন্দোলনটি বুর্জোয়া-সুলভ ভদ্র এবং মধ্যপন্থী উগ্রপন্থী হয়ে উঠেছিল।

এই ব্যর্থতা থেকেই তার দ্রুত পতনের দ্বিতীয় কারণটি উদ্ভূত হয়েছিল।
সর্ব-জার্মান আন্দোলন যখন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, তখন অস্ট্রিয়ায় জার্মানদের অবস্থা আগে থেকেই শোচনীয় ছিল । বছরের পর বছর ধরে, অস্ট্রিয়ার জার্মানদের ক্রমিক ধ্বংসের হাতিয়ার হিসেবে সংসদকে আরও বেশি করে ব্যবহার করা হচ্ছিল। তাদের বাঁচানোর জন্য শেষ মুহূর্তের কোনো প্রচেষ্টার একমাত্র আশা ছিল সংসদীয় ব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করা; কিন্তু এর সম্ভাবনা ছিল খুবই ক্ষীণ ।

সর্ব-জার্মান আন্দোলনকে একটি মৌলিক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল । সংসদকে প্রত্যাখ্যান করতে হলে , তৎকালীন
স্লোগান অনুযায়ী এর প্রতিনিধিদের কি সংসদে প্রবেশ করে " ভেতর থেকে একে দুর্বল করে দেওয়া" উচিত? নাকি বাইরে থেকে প্রতিষ্ঠানটিকেই আক্রমণ করা উচিত ?

তারা সংসদে প্রবেশ করে পরাজিত হয়েছিলেন। কিন্তু তারা প্রবেশ করতে বাধ্য বোধ করেছিলেন ।
এইরূপ বহিরাগত শক্তির বিরুদ্ধে কার্যকর যুদ্ধ পরিচালনার জন্য অদম্য সাহস ও আত্মত্যাগের মানসিকতা ছিল অপরিহার্য অস্ত্র । এমন পরিস্থিতিতে সরাসরি সমস্যার মোকাবিলা করতে হতো।
প্রচণ্ড আঘাতে কখনও কখনও আক্রমণকারী মাটিতে পড়ে যেতে পারে; কিন্তু যদি তার শক্তিশালী হৃদয় থাকে-

Machine Translated by Google

একাধিক হাড় ভেঙে গেলেও সে উঠে দাঁড়াবে , এবং দীর্ঘ ও কঠিন সংগ্রামের পরেই কেবল সে বিজয় লাভ করবে । এর নামে করা মহান আত্মত্যাগের কথা উল্লেখ করে নতুন যোদ্ধারা এই আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয় , যতক্ষণ না এই অদম্য চেতনা অবশেষে সাফল্যে ভূষিত হয়।

তবে, এমন ফলাফল অর্জনের জন্য গণসন্তানদের প্রয়োজন । একমাত্র তাদেরই আছে এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের জন্য শেষ পর্যন্ত লড়াই করার প্রয়োজনীয় সংকল্প ও অধ্যবসায় । কিন্তু সর্ব-জার্মান আন্দোলনে যোদ্ধা হিসেবে এই ব্যাপক জনসমর্থন ছিল না, এবং সংসদে প্রবেশ করা ছাড়া অন্য কোনো সমাধানও চেষ্টা করা যেত না।

এটা ভাবা ভুল হবে যে এই ধরনের সিদ্ধান্তটি দীর্ঘদিনের অভ্যন্তরীণ নৈতিক দোলাচলের ফল ছিল , অথবা এটি কোনো সতর্ক হিসাবের ফল ছিল । না। তারা অন্য কোনো সমাধানের কথা ভাবেনি পর্যন্ত। যারা এই ভুলটিতে অংশ নিয়েছিল, তারা সাধারণ কিছু বিবেচনা এবং এমন একটি প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণ কতটা তাৎপর্যপূর্ণ হবে সে সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল, যেটিকে তারা নীতিগতভাবে নিন্দা করত। সাধারণভাবে বলতে গেলে , তারা আশা করেছিল যে এইভাবে তারা জনগণের কাছে তাদের বক্তব্য তুলে ধরার উপায় খুঁজে পাবে, কারণ তারা "সমগ্র জাতির সামনে" কথা বলতে সক্ষম হবে । তাছাড়া, এটা বিশ্বাস করাও যুক্তিসঙ্গত মনে হয়েছিল যে মন্দের মূলে আঘাত করা, এর চেয়ে বেশি কার্যকর হবে।

তারা বিশ্বাস করত যে , এই আক্রমণ যদি বাইরে থেকে আসে, তাহলে সংসদীয় সুরক্ষার আওতায় স্বতন্ত্র জঙ্গিদের অবস্থান আরও শক্তিশালী হবে এবং এর ফলে তাদের আক্রমণের শক্তিও বৃদ্ধি পাবে।

বাস্তবে সবকিছু সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ ধারণ করেছিল।

যে মঞ্চে সর্ব-জার্মান আন্দোলনের প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখতেন, তা প্রসারিত না হয়ে বরং সংকুচিত হয়েছিল; কারণ প্রত্যেক ব্যক্তি কেবল তাদের কাছেই বক্তব্য রাখতেন , যারা তার কথা শুনতে বা সংবাদপত্রে তার বক্তৃতার প্রতিবেদন পড়তে আগ্রহী ছিল।

সরাসরি শ্রোতাদের বৃহত্তর কোনো মঞ্চ সংসদীয় সভাগৃহ নয়, বরং এটি একটি বৃহৎ জনসভা। পার্থক্য শুধু এই যে, সেখানে হাজার হাজার মানুষ কেবল বক্তার বক্তব্য শোনার জন্যই আসেন ; অথচ সংসদীয় অধিবেশনে মাত্র কয়েকশ লোক উপস্থিত থাকেন এবং তাদের অধিকাংশই কেবল উপস্থিতি ভাতা নিতে আসেন, 'জনগণের নির্বাচিত' কোনো ব্যক্তির প্রজ্ঞায় আলোকিত হতে নয় ।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সেখানে সবসময় একই লোকেরা উপস্থিত থাকে এবং এই লোকেরা নতুন কিছু শিখতে চায় না; কারণ, তাদের বুদ্ধিমত্তা থাকা সত্ত্বেও , শেখার জন্য প্রচেষ্টা করার মতো সামান্য ইচ্ছাশক্তিটুকুও তাদের নেই ।

এই নির্বাচিত ব্যক্তিদের মধ্যে একজনও পরম সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেননি এবং এর সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেননি । না। তাদের মধ্যে একজনও তা করবে না, যদি না তার এই আশা করার কারণ থাকে যে, এই ধরনের পরিবর্তনের মাধ্যমে তিনি আসন্ন সংসদে তার আসনটি ধরে রাখতে সক্ষম হবেন। সুতরাং , যেইমাত্র এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে আসন্ন নির্বাচনে পুরনো দলটি কঠিন সময়ের সম্মুখীন হবে , তখনই এই সর্বগুণসম্পন্ন আদর্শগুলো এমন একটি নতুন দলের সন্ধান করতে শুরু করে যা আরও ভালো নির্বাচনী ফলাফল অর্জন করতে পারে ; কিন্তু অবশ্যই, এই অবস্থান পরিবর্তনের ন্যায্যতা প্রতিপাদনের জন্য উচ্চ নৈতিক কারণের এক সত্যিকারের বন্যা বয়ে যাবে । এমনটা সবসময় তখনই ঘটে যখন বিদ্যমান দলটি জনগণের মধ্যে এমন বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলে যে তার অস্তিত্বই হুমকির মুখে পড়ে।

শোচনীয় পরাজয় – তারপর ঘটে গণ-স্থানান্তর । সংসদের ইঁদুরেরা দলীয় জাহাজ ত্যাগ করে।

এই সবকিছু ঘটছে, তার কারণ এই নয় যে ব্যক্তিরা নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে আরও ভালোভাবে অবগত হয়েছেন এবং সেই অনুযায়ী কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । সামনের সারির এই পরিবর্তনগুলো কেবল সেই দূরদৃষ্টির ক্ষমতারই প্রমাণ, যা সঠিক মুহূর্তে সংসদীয় ক্ষুদ্র জীবটিকে সতর্ক করে দেয় এবং তাকে অন্য দলের উষ্ণ শয্যায় ঝাঁপিয়ে পড়তে সক্ষম করে তোলে ।

এই ধরনের মঞ্চে কথা বলা মানে পরিচিত পশুদের সামনে মুক্তা ছড়ানো।

প্রকৃতপক্ষে, এটি কেবল ভোগ করা কষ্টের প্রতিদানই দেয় না; এর ফলাফল সর্বদা নেতিবাচকই হতে হয়।

আর ঠিক সেটাই ঘটেছিল। সর্ব-জার্মান আন্দোলনের প্রতিনিধিরা কথা বলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

গলা ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়, কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয় না।

সংবাদমাধ্যম হয় তাদের পুরোপুরি উপেক্ষা করত, অথবা তাদের বক্তব্যকে এমনভাবে বিকৃত করত যে তার যৌক্তিক সংগতি নষ্ট হয়ে যেত, কিংবা তার অর্থ এমনভাবে ঘুরিয়ে দেওয়া হতো যে মানুষ মারাত্মক ভুল বুঝত।

Machine Translated by Google

নতুন আন্দোলনের লক্ষ্যগুলো সম্পর্কে ধারণা । ব্যক্তিগত সদস্যরা কী বলছিল, তা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।
গুরুত্বপূর্ণ ছিল মানুষ তাদের কথা থেকে কী বুঝত। এগুলো ছিল প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করা নিছক খণ্ডাংশ , যা অসংলগ্ন অর্থহীন কথার ছাপ দিত এবং ঠিক যেমনটা হওয়ার জন্য এগুলো তৈরি করা হয়েছিল । সুতরাং, তারা আসলে যে একমাত্র শ্রোতার কাছে কথা বলত, তারা ছিল মাত্র পাঁচশ সংসদ সদস্য; আর তাতেই সবটা পরিষ্কার হয়ে যায় ।

সবচেয়ে খারাপ দিকটি
ছিল এই: সর্ব-জার্মান আন্দোলন কেবল তখনই সফল হওয়ার আশা করতে পারত , যদি এর নেতারা শুরু থেকেই বুঝতেন যে নতুন দলের কাছে একটি নতুন বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কোনো বিষয় নেই। কেবল এটিই এমন এক বিশাল সংগ্রামের জন্য প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ নৈতিক শক্তি জাগিয়ে তুলতে পারত । এই সংগ্রামে নেতাদের হতে হতো প্রথম সারির মেধা এবং অটল সাহসের অধিকারী । যদি বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির এই সংগ্রাম বীরত্বপূর্ণ মনোভাবসম্পন্ন, সবকিছু উৎসর্গ করতে ইচ্ছুক মানুষের দ্বারা পরিচালিত না হয় , তবে শীঘ্রই এমন সত্যিকারের যোদ্ধা খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়বে যারা এই আদর্শের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত ।

যে ব্যক্তি কেবল নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য লড়াই করে, সমাজের সেবায় তার দেওয়ার মতো তেমন কিছুই থাকে না ।

সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তগুলো নিশ্চিত করতে হলে , প্রত্যেককে বুঝতে হতো যে নতুন আন্দোলনটি সম্মান ও গৌরবের এক ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছে , কিন্তু বর্তমান সদস্যদের দেওয়ার মতো কোনো প্রতিদান এর কাছে নেই। যদি কোনো আন্দোলন সহজলভ্য ও বহুসংখ্যক পদ ও দপ্তরের প্রস্তাব দেয় , তবে বহু অযোগ্য প্রার্থী তাতে যোগ দিতে চাইবে , এবং অবশেষে এমন এক দিন আসবে যখন এই রাজনৈতিক অনুগামীরা আন্দোলনের চেহারা এমনভাবে পাল্টে দেবে যে, আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রধান সংগ্রামী শক্তি হিসেবে থাকা প্রবীণ যোদ্ধারা আর নিজেদের দলকেই চিনতে পারবে না এবং পরবর্তীতে অবাঞ্ছিত বোঝা হিসেবে তাদের দল থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে । এরপর, আন্দোলনটির আর পূরণ করার মতো কোনো উদ্দেশ্য থাকবে না।

যখন সর্ব-জার্মান আন্দোলন সংসদের সাথে সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তখন তারা আর গণ-আন্দোলনের নেতা ও যোদ্ধা ছিলেন না, বরং কেবল সংসদ সদস্য ছিলেন।
ফলে , আন্দোলনটি তৎকালীন একটি সাধারণ রাজনৈতিক দলের পর্যায়ে নেমে আসে এবং এর আর কোনো ক্ষমতা ছিল না প্রতিকূল ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়ার এবং দুর্ভোগের ঝুঁকি উপেক্ষা করার শক্তি আর ছিল না। যুদ্ধ করার পরিবর্তে, বৃহত্তর জার্মান আন্দোলনের নেতারা আলোচনা ও সমঝোতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়লেন।
নতুন সংসদ সদস্যরা দ্রুতই উপলব্ধি করলেন যে , তাঁদের দায়িত্ব পালনের জন্য এটি একটি অনেক বেশি সন্তোষজনক এবং কম ঝুঁকিপূর্ণ উপায়— এমন একটি লড়াইয়ে অংশ নেওয়ার পরিবর্তে সংসদীয় বাগ্মিতার আধ্যাত্মিক অস্ত্র দিয়ে নতুন বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গিকে রক্ষা করা, যে লড়াইয়ে তাঁরা নিজেদের জীবনকে বিপদে ফেলছিলেন , যার ফলাফল ছিল অনিশ্চিত এবং সর্বোত্তম ক্ষেত্রেও কোনো লাভ বয়ে আনতে পারত না।
নিজেদের ব্যক্তিগত লাভের আশা।
সংসদে তাঁরা আসন গ্রহণ করার সময় বাইরে থাকা তাঁদের সমর্থকেরা আশাবাদী ছিলেন।
এবং অলৌকিক ঘটনা ঘটার জন্য অপেক্ষা করছিলাম । স্বাভাবিকভাবেই, সেরকম কোনো অলৌকিক ঘটনা ঘটেনি, আর ঘটা সম্ভবও ছিল না। এরপর, আন্দোলনের সমর্থকেরা দ্রুত অধৈর্য হয়ে পড়ল, কারণ নিজেদের প্রতিনিধিদের সম্পর্কে তারা যে প্রতিবেদনগুলো পড়ছিল, তা নির্বাচনে তাদের ভোট দেওয়ার সময় করা প্রত্যাশার সাথে মোটেও মিলছিল না। কারণটা বোঝা কঠিন ছিল না। কারণটা ছিল এই যে, একটি বিদ্বেষী সংবাদমাধ্যম বৃহত্তর জার্মান আন্দোলনের প্রতিনিধিরা আসলে কী করছিল , সে সম্পর্কে সত্য প্রকাশ করা থেকে বিরত ছিল ।

সংসদ ও ডায়েটে 'বিপ্লবী' সংগ্রামের এই মধ্যপন্থী রূপটির প্রতি নতুন প্রতিনিধিরা আকৃষ্ট হওয়ায় , তাঁরা ক্রমশ সাধারণ জনগণের কাছে আন্দোলনের মূলনীতি ব্যাখ্যা করার আরও ঝুঁকিপূর্ণ কাজটি পুনরায় শুরু করতে অনিচ্ছুক হয়ে পড়েন।

জনগণের সাথে গণসভা ক্রমশ বিরল হয়ে পড়ল , যদিও মানুষের উপর সত্যিকারের কার্যকর প্রভাব ফেলার জন্য এটিই একমাত্র উপায় ; কারণ এক্ষেত্রে এই প্রভাব সরাসরি ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় এবং এভাবে বৃহৎ সামাজিক গোষ্ঠীর সমর্থন লাভ করা যায় ।

যখন বড় বড় বিয়ার হলগুলোতে বক্তারা যে টেবিলে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার মানুষের উদ্দেশে ভাষণ দিতেন , তা পরিত্যক্ত হয়ে সংসদীয় মঞ্চের প্রচলন শুরু হলো, এবং যখন ভাষণগুলো আর সরাসরি জনগণের উদ্দেশ্যে না হয়ে তথাকথিত 'নির্বাচিত' প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে দেওয়া হতে লাগল,

Machine Translated by Google

প্রতিনিধিদের কারণে, সর্ব-জার্মান আন্দোলন তার জনপ্রিয়তা হারায় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তা একটি মোটামুটি গুরুতর ক্লাবের পর্যায়ে নেমে আসে , যেখানে দৈনন্দিন সমস্যা নিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হতো।

সংবাদমাধ্যম দ্বারা সৃষ্ট ভ্রান্ত ধারণাগুলো জনসভায় জনগণের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে আর সংশোধন করা হচ্ছিল না , যেখানে স্বতন্ত্র প্রতিনিধিরা তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সত্য তথ্য জানাতে পারতেন । এই অবহেলার চূড়ান্ত ফল ছিল এই যে, 'বৃহত্তর জার্মানি' শব্দটি জনসাধারণের কানে একটি অপ্রীতিকর ধ্বনিতে পরিণত হয়েছিল।

কলমের বীরগণ এবং আজকের সাহিত্যিক অহংকারীদের উপলব্ধি করা উচিত যে, বিশ্বে যে মহান বিপ্লবগুলো সংঘটিত হয়েছে, সেগুলো কখনোই পালকের কলম দিয়ে সম্পন্ন হয়নি । না।
এই কলমের কাজ সর্বদাই হবে এমন সব তাত্ত্বিক ধারণা উপস্থাপন করা, যা এই ধরনের পরিবর্তনগুলোকে যৌক্তিকতা দেয়। যে শক্তি সর্বদা এবং সর্বত্র ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আন্দোলনের বিশাল ঐতিহাসিক স্রোতকে গতিশীল করেছে, তা হলো কথিত শব্দের জাদুকরী শক্তি।

সাধারণ জনগণ অন্য যেকোনো কিছুর চেয়ে বাগ্মিতার আকর্ষণে বেশি প্রভাবিত হয় ।
শক্তি। সকল মহান আন্দোলনই সর্বজনীন আন্দোলন। এগুলি মানবীয় আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতির আগ্নেয় অগ্ন্যুৎপাত , যা নির্দয় দুঃখদেবী অথবা জনতার মাঝে নিক্ষিপ্ত উচ্চারিত শব্দের মশালের দ্বারা সক্রিয় হয়ে ওঠে। কোনো ক্ষেত্রেই মহান আন্দোলনগুলি নান্দনিক সাহিত্যিক এবং স্যালন নায়কদের ভাবালু আবেগের বহিঃপ্রকাশে জেগে ওঠেনি।

কেবলমাত্র তীব্র আবেগের ঝড়ই একটি জাতির ধ্বংস রোধ করতে পারে ; কিন্তু কেবল তারাই, যারা স্বয়ংসম্পূর্ণ ।
যাঁরা আবেগপ্রবণ, তাঁরা অন্যদের মধ্যেও এই আবেগ জাগিয়ে তুলতে পারেন। কেবলমাত্র আবেগ দিয়ে অনুভব করার ক্ষমতার মাধ্যমেই একজন নির্বাচিত নেতা শব্দের সেই শক্তিকে প্রয়োগ করতে পারেন , যা হাতুড়ির আঘাতের মতো মানুষের হৃদয়ের দরজা খুলে দেয়।

যিনি এতে অক্ষম, বিধাতা তাঁর ইচ্ছার দূত হওয়ার জন্য তাঁকে কখনও মনোনীত করেননি। অতএব, একজন লেখকের যদি প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও জ্ঞান থাকে, তবে তাঁর উচিত নিজের কালির বোতল নিয়েই থাকা এবং তাত্ত্বিক বিষয় নিয়েই চর্চা করা। তিনি নেতা হিসেবে জন্ম নেননি , কিংবা মনোনীতও হননি।

মহৎ লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি আন্দোলনকে অবশ্যই জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার বিপদ থেকে সতর্ক থাকতে হবে । এর সম্মুখীন হওয়া প্রতিটি সমস্যাকে প্রাথমিকভাবে এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করতে হবে এবং গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো সর্বদা এই নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

একটি আন্দোলনকে এমন সবকিছু পরিহার করতে হবে যা জনগণের উপর তার প্রভাবকে হ্রাস বা দুর্বল করতে পারে ; জনতুষ্টিমূলক কারণে নয়, বরং সহজভাবে বলতে গেলে, কোনো মহৎ ধারণা, তা যতই উন্নত বা মহৎ বলে মনে হোক না কেন , জনগণের হাতে কার্যকর শক্তি না থাকলে বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে না । লক্ষ্যের পথে একমাত্র কঠোর বাস্তবতাই পথ দেখাবে । কঠিন পথ অবলম্বন করতে অনিচ্ছা প্রায়শই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ পরিত্যাগের কারণ হয়ে দাঁড়ায় , তা সচেতনভাবে করা হোক বা না হোক।

বৃহত্তর জার্মান আন্দোলনের নেতারা যখন সংসদীয় নীতি গ্রহণ করে তাদের কার্যকলাপের কেন্দ্রবিন্দু জনগণ থেকে সংসদের দিকে সরিয়ে নিয়েছিলেন, সেই মুহূর্তটি ছিল সস্তা, ক্ষণস্থায়ী সাফল্যের জন্য ভবিষ্যৎকে বিসর্জন দেওয়ার একটি মুহূর্ত। এই সংগ্রামে তারা সহজ পথ বেছে নিয়েছিলেন এবং এর মাধ্যমে চূড়ান্ত বিজয়ের অযোগ্য প্রমাণিত হয়েছিলেন ।

ভিয়েনায় থাকাকালীন আমি এই দুটি প্রশ্ন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছিলাম এবং উপলব্ধি করেছিলাম যে, সর্ব-জার্মান আন্দোলনের পতনের প্রধান কারণ ছিল এই বিষয়গুলো অনুধাবন করতে না পারা। তখন আমার বিশ্বাস ছিল যে, এই আন্দোলনটি অস্ট্রিয়ান জার্মানদের নেতৃত্ব নিজের হাতে তুলে নিতে পারত।

সর্ব-জার্মান আন্দোলনের পতনের কারণ হওয়া প্রথম দুটি ভুল পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। বৃহৎ আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চালিকাশক্তিগুলোকে ভুলভাবে চিহ্নিত করার ফলে , এই ধরনের রূপান্তর সাধনে ব্যাপক জনগণের ইচ্ছাকে ভুলভাবে বিচার করা হয়েছিল । ফলস্বরূপ, সামাজিক সমস্যার প্রতি খুব কম মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল এবং নিম্নবর্গের মন জয় করার প্রচেষ্টাগুলো ছিল অত্যন্ত বিরল ও দুর্বল। এর আরেকটি পরিণতি ছিল সংসদীয় রাজনীতির গ্রহণযোগ্যতা, যা জনগণের গুরুত্বের উপর একই ধরনের প্রভাব ফেলেছিল।

Machine Translated by Google

বিপ্লবী আন্দোলনে জনগণ যে বিপুল শক্তি ও সহনশীলতা সর্বদা প্রদর্শন করে , তার যদি যথাযথ কদর করা হতো , তবে সামাজিক সমস্যার প্রতি একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রচারণার ক্ষেত্রে একটি ভিন্ন নীতি গ্রহণ করা হতো। তখন আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু সংসদে স্থানান্তরিত না হয়ে কারখানায় ও রাজপথেই থেকে যেত।

এটি ছিল তৃতীয় ভুল, যার মূলও ছিল জনগণের গুরুত্ব অনুধাবন করতে না পারা । জনগণকে প্রথমে অসাধারণ প্রতিভাধর ব্যক্তিরা একটি নির্দিষ্ট দিকে চালিত করেন ; কিন্তু একবার চালিত হলে, তারা একটি ফ্লাইহুইলের মতো কাজ করে আক্রমণের গতি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখে।

সর্ব-জার্মান আন্দোলনের নেতাদের ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম চালানোর সিদ্ধান্তকে শুধুমাত্র জনগণের আধ্যাত্মিক চরিত্র সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণার ফল হিসেবেই ব্যাখ্যা করা যায় ।

নতুন দলটি কেন রোমের বিরুদ্ধে একটি আক্রমণাত্মক প্রচারণা শুরু করেছিল তার কারণগুলি।
ini গুলো নিম্নরূপ ছিল :

যখন হ্যাবসবার্গরা অবশেষে অস্ট্রিয়াকে একটি স্লাভিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নিল , তখন তারা এই লক্ষ্যে কোনোভাবে কার্যকর বলে মনে হওয়া প্রতিটি উপায়ই অবলম্বন করেছিল। হ্যাবসবার্গরা তাদের নতুন ' রাষ্ট্রীয় ধারণা'র সেবায় এমনকি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবহার করতেও দ্বিধা করেনি। তাই, গৃহীত বহু পদ্ধতির মধ্যে একটি ছিল অস্ট্রিয়ায় স্লাভিক আধিপত্য বিস্তারের হাতিয়ার হিসেবে চেক যাজক সম্প্রদায়কে ব্যবহার করা । এটি নিম্নোক্তভাবে সম্পন্ন করা হয়েছিল:

সম্পূর্ণরূপে জার্মান অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে চেক জাতীয়তার ধর্মযাজকদের নিয়োগ করা হয়েছিল।
ক্রমান্বয়ে কিন্তু অবিচলিতভাবে, গির্জার স্বার্থের ঊর্ধ্বে চেকদের স্বার্থকে স্থান দিয়ে , প্যারিশগুলো ও তাদের যাজকেরা জার্মান-বিমুখীকরণ প্রক্রিয়ার প্রজনন কোষে পরিণত হয়েছিল ।

দুর্ভাগ্যবশত, অস্ট্রো-জার্মান যাজক সম্প্রদায় এই প্রক্রিয়াটি প্রতিহত করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। তারা শুধু জার্মান পক্ষে একটি অনুরূপ উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে অক্ষমই ছিল না, বরং চেক আক্রমণের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতেও তারা অপারগ প্রমাণিত হয়েছিল। ফলে , একদিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় বিশ্বাসের বিকৃতি এবং অন্যদিকে যথাযথ প্রতিরোধের অভাবের কারণে জার্মান পক্ষকে ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে পিছু হটতে বাধ্য করা হয়েছিল। এটি ছিল ছোটখাটো সমস্যা মোকাবেলার একটি কৌশল; কিন্তু বড় সমস্যা মোকাবেলার ক্ষেত্রেও তা খুব একটা ভিন্ন ছিল না ।

হ্যাবসবার্গদের অনুসৃত জার্মানি-বিরোধী লক্ষ্যগুলো সামান্যই প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল, বিশেষ করে উচ্চপদস্থ যাজক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে, অপরদিকে জার্মান স্বার্থের যাজকীয় প্রতিনিধিরা সম্পূর্ণরূপে পশ্চাৎভাগে সরে গিয়েছিলেন। এর ফলে যে সাধারণ ধারণাটি তৈরি হয়েছিল, তা ছাড়া আর কিছুই হতে পারত না যে, ক্যাথলিক যাজক সম্প্রদায় সামগ্রিকভাবে জার্মান জনগণের অধিকারের প্রতি মূলত উদাসীন ছিল ।

সুতরাং, এটা প্রতীয়মান হয়েছিল যে ক্যাথলিক চার্চের জার্মান জনগণের প্রতি কোনো সহানুভূতি ছিল না, বরং তারা অন্যায়ভাবে তাদের বিরোধীদের সমর্থন করছিল। বিশেষ করে শোনারারের মতে, সকল অশুভের মূল ছিল এই যে, ক্যাথলিক চার্চের নেতৃত্ব জার্মানিতে ছিল না, এবং শুধুমাত্র এই একটি কারণই আমাদের জনগণের দাবির প্রতি চার্চের বৈরিতার জন্য যথেষ্ট ছিল।

এই সময়ে সমগ্র অস্ট্রিয়া জুড়ে তথাকথিত সাংস্কৃতিক বিষয়টি প্রায় পুরোপুরি আড়ালে চলে গিয়েছিল। ক্যাথলিক চার্চের প্রতি বৈরী মনোভাব গ্রহণ করে, বৃহত্তর জার্মান আন্দোলনের নেতারা চার্চের বৈজ্ঞানিক বিষয়ের প্রতি মনোভাব দ্বারা ততটা প্রভাবিত হননি, বরং প্রধানত এই বিষয়টি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, চার্চ যেভাবে জার্মানদের অধিকার রক্ষা করা উচিত ছিল সেভাবে করেনি, বরং যারা সেই অধিকার লঙ্ঘন করত, বিশেষ করে স্লাভদের, সর্বদা তাদেরই সমর্থন করত।

গেয়র্গ শোনেনার কোনো দায়সারা সমাধানের মানুষ ছিলেন না। তিনি চার্চের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছিলেন কারণ তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে কেবল এইভাবেই তিনি জার্মান জনগণকে রক্ষা করতে পারবেন। ‘লস-ফন-রোম’ (রোম থেকে দূরে) আন্দোলনটি শত্রুর শক্ত ঘাঁটি আক্রমণ ও ধ্বংস করার সবচেয়ে শক্তিশালী, যদিও সবচেয়ে কঠিন, উপায় বলে মনে হয়েছিল। শোনেনার বিশ্বাস করতেন যে এই আন্দোলন সফল হলে , জার্মানিতে দুটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যেকার দুর্ভাগ্যজনক বিভাজন দূর হয়ে যাবে এবং এই বিজয়ের ফলে জার্মান রাইখ ও জাতির অভ্যন্তরীণ শক্তি বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাবে।

Machine Translated by Google

কিন্তু এক্ষেত্রে অনুমান ও সিদ্ধান্ত উভয়ই ভুল ছিল।

এটা নিঃসন্দেহে সত্য ছিল যে, জার্মানত্ব সম্পর্কিত প্রায় সকল বিষয়ে জাতীয় প্রতিরোধের শক্তি জার্মান ক্যাথলিক যাজক সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক দুর্বল ছিল ।
তাদের অ-জার্মান ভাইদের মধ্যে, বিশেষ করে চেকদের মধ্যে। আর কেবল একজন অজ্ঞ ব্যক্তিই তা লক্ষ্য না করে পারে ।
এই সত্য যে, জার্মান যাজক সম্প্রদায়ের প্রায় কেউই জার্মান স্বার্থে কোনো আক্রমণ শুরু করার কথা ভাবেননি।

কিন্তু একই সাথে , যিনি বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত, তাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে এই সবকিছুর কারণ হলো সেই বৈশিষ্ট্যটি, যা ভোগান্তির শিকার হতে সকল জার্মান বাধ্য ছিল।
আমাদের জাতীয়তা সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গিতে এই বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশিত হয়েছিল , যেন তা আমাদের বাইরে অবস্থিত কোনো বস্তু ।

চেক যাজকেরা যেখানে নিজেদের জাতির প্রতি ব্যক্তিগত এবং গির্জার প্রতি বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন , সেখানে জার্মান প্যারিশ যাজকেরা তাদের গির্জার প্রতি ব্যক্তিগত ভক্তি প্রদর্শন করলেও জাতির প্রতি বস্তুনিষ্ঠই থেকে গিয়েছিলেন। এটি এমন একটি ঘটনা যা, দুর্ভাগ্যবশত, অন্য হাজার হাজার ক্ষেত্রেও ঠিক একইভাবে ঘটতে দেখা যায় ।

এটা কোনোভাবেই ক্যাথলিক ধর্মের কোনো নির্দিষ্ট উত্তরাধিকার নয়; বরং এটা আমাদের ভেতরেরই এমন কিছু যা প্রায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে, বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং আদর্শবাদী লক্ষ্যযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে দ্রুত ক্ষয় করে দেয় । উদাহরণস্বরূপ, জাতীয় পুনরুজ্জীবন আনার প্রচেষ্টার প্রতি আমাদের সরকারি কর্মকর্তাদের মনোভাব নিন এবং এই ধরনের ক্ষেত্রে অন্য কোনো দেশের সরকারি কর্মকর্তাদের গৃহীত অবস্থানের সাথে এর তুলনা করুন। এটা কি বিশ্বাস করা যায় যে, বিশ্বের অন্য কোনো দেশের সামরিক কর্মকর্তারা "রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব" এই শব্দবন্ধের আড়ালে লুকিয়ে জাতীয় আকাঙ্ক্ষার নামে কাজ করতে অস্বীকার করবে , যেমনটা আমাদের দেশে গত পাঁচ বছর ধরে হয়ে আসছে এবং যা সর্বদা একটি প্রশংসনীয় অবস্থান হিসেবে বিবেচিত হয়েছে? অথবা আরেকটি উদাহরণ নিন । ইহুদি সমস্যার প্রসঙ্গে , খ্রিস্টধর্মের দুটি শাখা কি এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেনি যা আজ আর জাতীয় প্রয়োজন বা এমনকি ধর্মের স্বার্থের সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়? আসুন, একটি জাতি হিসেবে ইহুদিদের সম্পর্কিত যেকোনো প্রশ্ন , তা যতই তুচ্ছ হোক না কেন, তার প্রতি একজন ইহুদি রাব্বির মনোভাব বিবেচনা করি এবং ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট উভয় সম্প্রদায়ের অধিকাংশ যাজকের মনোভাবের সাথে এর তুলনা করি ।

যখনই কোনো বিমূর্ত ধারণাকে সমর্থন করার প্রসঙ্গ আসে, আমরা একই ঘটনা লক্ষ্য করি ।

"রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ," "গণতন্ত্র," "শান্তিবাদ," " আন্তর্জাতিক সংহতি" ইত্যাদি—এই সমস্ত ধারণা কঠোর ও গোঁড়া ধারণায় পরিণত হয়েছে ; এবং একটি জাতির প্রয়োজন যত বেশি জরুরি হবে, সেগুলোকে তত বেশি কেবল এই ধারণাগুলোর আলোকেই বিচার করা হবে।

সমস্ত জাতীয় প্রয়োজনকে পূর্বকল্পিত চিন্তার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার এই দুর্ভাগ্যজনক অভ্যাসের ফলে বিষয়ীগত দিকটি দেখার অক্ষমতা তৈরি হয় , যা বস্তুগতভাবে একজনের মতবাদের পরিপন্থী। পরিশেষে, এটি উপায় ও লক্ষ্যের মধ্যকার সম্পর্কের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী পরিবর্তন ঘটায় । জাতীয় পুনরুজ্জীবনের যেকোনো প্রচেষ্টাই বিরোধিতার সম্মুখীন হবে, যদি সেই পুনরুজ্জীবনের পূর্বশর্ত হয় একটি অশুভ ও ক্ষতিকর শাসনব্যবস্থার প্রত্যাখ্যান ; কারণ এই ধরনের কাজকে "রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের" লঙ্ঘন হিসেবে গণ্য করা হবে । যারা এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে, তাদের চোখে "রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব" কোনো লক্ষ্য পূরণের জন্য উদ্দিষ্ট লক্ষ্য নয় , বরং বস্তুনিষ্ঠতায় গোঁড়া বিশ্বাসী মনের কাছে এটি নিজেই একটি লক্ষ্য; এবং তারা এটিকে তাদের নিজেদের দুর্দশাগ্রস্ত অস্তিত্বের জন্য যথেষ্ট যুক্তি বলে মনে করে। এই ধরনের লোকেরা তীব্র প্রতিবাদ জানাবে যদি, উদাহরণস্বরূপ, কেউ একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে, এমনকি যদি এর জন্য দায়ী ব্যক্তি ফ্রেডরিক দ্য গ্রেটও হন, এবং এমনকি যদি তৎকালীন রাজনীতিবিদরা, যারা সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা গঠন করেছিলেন , তারা তুচ্ছ ও অযোগ্য ব্যক্তি , বা সম্ভবত তার চেয়েও নিম্নস্তরের হন; কারণ এই আনুষ্ঠানিকতাবাদীদের কাছে গণতান্ত্রিক অধিকারের বিমূর্ত নীতিগুলো জাতির কল্যাণের চেয়েও বেশি পবিত্র । তার নীতি অনুসারে, একজন নিকৃষ্টতম স্বৈরাচারকেও সমর্থন করবে, যদিও সে জনগণকে নেতৃত্ব দিতে পারে।

Machine Translated by Google

ধ্বংস করার কারণ হলো এটি ' রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের' মূর্ত প্রতীক , এবং অন্য কেউ এমনকি একটি অত্যন্ত উপকারী সরকারকেও প্রত্যাখ্যান করবে যদি তা তার 'গণতন্ত্র' ধারণার সাথে একমত না হয়।

একইভাবে, আমাদের জার্মান শান্তিবাদী নীরব থাকবেন যখন জাতি রক্তাক্ত সামরিক শক্তির নিপীড়নে আর্তনাদ করবে , যখন এই পরিস্থিতি সক্রিয় প্রতিরোধের দিকে ঠেলে দেবে; কারণ এই ধরনের প্রতিরোধের অর্থ হলো শারীরিক শক্তির ব্যবহার, যা শান্তিবাদী সংগঠনগুলোর চেতনার পরিপন্থী। জার্মান আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী 'সংহতি' - র নামে বিশ্বের অন্য সব দেশের কমরেডদের দ্বারা প্রতারিত ও লুণ্ঠিত হতে পারেন , কিন্তু তিনি ভ্রাতৃত্বসুলভ সৌজন্যের সাথে তার জবাব দেন এবং যা তার তা ফিরিয়ে নেওয়ার বা এমনকি আত্মরক্ষার কথাও কখনো ভাবেন না। কেন? কারণ তিনি জার্মান।

এই সত্যগুলো নিয়ে ভাবাটা হয়তো অপ্রীতিকর , কিন্তু যদি কিছু হতে হয়...
পরিবর্তনের জন্য, আমাদের রোগ নির্ণয় শুরু করতে হবে ।

আমি এইমাত্র যে ঘটনাটির বর্ণনা দিলাম, তা যাজক সম্প্রদায়ের একাংশ কর্তৃক জার্মান স্বার্থের প্রচার ও সুরক্ষার উপায়গুলোর দুর্বলতায়ও অবদান রেখেছিল ।

এই ধরনের আচরণ কোনো বিদ্বেষপূর্ণ অভিপ্রায়ের লক্ষণ নয় , কিংবা এটি "উপর থেকে" দেওয়া আদেশের ফলও নয়; বরং জাতীয় চরিত্র ও সংকল্পের এই অভাব আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি থেকেই উদ্ভূত। তরুণদের মধ্যে তাদের জার্মান জাতীয়তার জীবন্ত অনুভূতি জাগিয়ে তোলার পরিবর্তে , শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য হলো একটি ধারণার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তাদেরকে মাটিতে নামিয়ে আনা , যেন সেই ধারণাটি একটি মূর্তি।

যে শিক্ষা তাদেরকে 'গণতন্ত্র', 'আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্র', 'শান্তিবাদ' ইত্যাদির মতো বিমূর্ত ধারণার অনুসারী করে তোলে, তা তাদের বাহ্যিক জীবনের সামগ্রিক চিত্র গঠনে এতটাই অনমনীয়, বাছাইকৃত এবং ব্যক্তিনিষ্ঠ যে তারা সম্পূর্ণরূপে এই পূর্বকল্পিত ধারণাগুলোর প্রভাবে থাকে । কিন্তু, অন্যদিকে, তাদের নিজেদের জার্মান জাতীয়তার প্রতি তাদের মনোভাব যৌবনকাল থেকেই অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ । যে শান্তিবাদী—যতদূর সে জার্মান— তার গোঁড়া নীতির নির্দেশের কাছে দেহ ও আত্মা দিয়ে ব্যক্তিগতভাবে আত্মসমর্পণ করে, সে তার নিজের জাতির উপর বিপদ ঘনিয়ে এলে , এমনকি সেই বিপদ গুরুতর হলেও , সর্বদা প্রথমে বস্তুনিষ্ঠভাবে পরিস্থিতি বিবেচনা করবে । কিন্তু সে কখনোই নিছক আত্মরক্ষার জন্য জাতির পক্ষে যোগ দেবে না এবং এর জন্য ও এর সাথে যুদ্ধ করবে না।

বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এটি কতটা ভালোভাবে প্রযোজ্য , তা আরেকটি উদাহরণ দিয়ে আরও ভালোভাবে বোঝানো যেতে পারে । প্রোটেস্ট্যান্টবাদ তার উৎস ও ঐতিহ্য যতদূর জার্মান আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত , ততদূর সেই আদর্শগুলোকে ভালোভাবে রক্ষা করে। কিন্তু যখন তাকে এমন জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য আহ্বান জানানো হয় যা তার আদর্শ ও ঐতিহ্যগত বিকাশের পরিধির বাইরে , অথবা যা কোনো কারণেই হোক সেই পরিধি দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হতে পারে, তখন এটি ব্যর্থ হয় ।

সুতরাং, প্রোটেস্ট্যান্টবাদ নৈতিক সংহতি বা জাতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে জার্মান আদর্শের প্রসারে সর্বদা অংশগ্রহণ করবে, যখন জার্মান আধ্যাত্মিকতা, ভাষা বা আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা রক্ষার প্রশ্ন আসবে : কারণ এই নীতিগুলোর উপরেই প্রোটেস্ট্যান্টবাদ প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই একই প্রোটেস্ট্যান্টবাদ জাতিকে তার ঘোর শত্রুর কবল থেকে উদ্ধারের যেকোনো প্রচেষ্টার তীব্র বিরোধিতা করবে ; কারণ ইহুদিদের প্রতি প্রোটেস্ট্যান্টদের মনোভাব কমবেশি অনমনীয় এবং গোঁড়ামিপূর্ণভাবে স্থির। আর এটাই প্রথম সমস্যা যার সমাধান করতে হবে, কারণ অন্যথায় জার্মান পুনর্জন্ম ঘটানোর বা জাতির মানোন্নয়নের সমস্ত প্রচেষ্টা অর্থহীন ও অসম্ভব বলে প্রমাণিত হতে বাধ্য ।

ভিয়েনায় অবস্থানকালে কোনো পূর্বধারণাকে বাধা হতে না দিয়ে এই সমস্যাটি অধ্যয়ন করার জন্য আমি যথেষ্ট স্বাধীনতা ও সুযোগ পেয়েছিলাম ; এবং মানুষের সাথে আমার দৈনন্দিন মেলামেশার মাধ্যমে , হাজার হাজার ঘটনা যাচাই করে আমি আমার গঠিত মতামতগুলোর সঠিকতা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলাম ।

এই মিলনস্থলে, যেখানে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষেরা একত্রিত হতেন, প্রত্যেকেই পরিষ্কারভাবে দেখতে পেতেন যে জার্মান শান্তিবাদী সর্বদাই এবং একচেটিয়াভাবে তিনিই ছিলেন যিনি তাঁর জাতির স্বার্থকে বস্তুনিষ্ঠভাবে বিবেচনা করার চেষ্টা করতেন ; কিন্তু এমন কোনো ইহুদিকে খুঁজে পাওয়া যেত না যিনি তাঁর নিজ জাতির প্রতি অনুরূপ মনোভাব পোষণ করতেন । অধিকন্তু , আমি দেখলাম যে কেবল

Machine Translated by Google

জার্মান সমাজতন্ত্রী এই অর্থে একজন "আন্তর্জাতিকতাবাদী" যে, তিনি তার আন্তর্জাতিক কমরেডদের কাছে ঘ্যানঘ্যান করে নিজের জাতির জন্য ন্যায়বিচার দাবি করতে বাধ্য বোধ করেন। চেক বা পোলদের বিরুদ্ধে কেউ কখনো এমন আচরণের অভিযোগ করতে পারবে না। সংক্ষেপে, আমি তখন থেকেই বুঝেছিলাম যে এই অশুভ শক্তির জন্য সমাজতন্ত্র, শান্তিবাদ ইত্যাদির প্রচারিত মতবাদ আংশিকভাবে দায়ী, কিন্তু এর প্রধান কারণ হলো আমাদের চূড়ান্তভাবে অপর্যাপ্ত শিক্ষা ব্যবস্থা, যার ঘাটতিগুলোই আমাদের জাতীয় আদর্শের প্রতি অঙ্গীকারের অভাবের জন্য দায়ী ।

সুতরাং, ক্যাথলিক ধর্মের বিরুদ্ধে আক্রমণের ভিত্তি হিসেবে সর্ব-জার্মান আন্দোলনের নেতাদের দ্বারা উত্থাপিত প্রথম তাত্ত্বিক যুক্তিটি রক্ষা করা অসম্ভব ছিল।

আমি যে অশুভ শক্তির কথা বলেছি, তার প্রতিকারের একমাত্র উপায় হলো, জার্মানদের শৈশব থেকেই তাদের নিজ জাতির অধিকার সম্পর্কে একটি প্রকৃত বোধে শিক্ষিত করা; এমনকি আমাদের অস্তিত্ব-সংক্রান্ত বিষয়েও অভিশপ্ত 'বস্তুনিষ্ঠতা'র ভাইরাস দিয়ে তাদের মনকে বিষিয়ে তোলার পরিবর্তে । এর ফলে , আয়ারল্যান্ড , পোল্যান্ড বা ফ্রান্সের মতো জার্মানিতেও একজন ক্যাথলিক সর্বোপরি একজন জার্মান হবেন। কিন্তু এই সবকিছুর জন্য আমাদের শাসন পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন ।

আমার দাবির সমর্থনে সবচেয়ে জোরালো প্রমাণ হলো ইতিহাসের সেই সন্ধিক্ষণে যা ঘটেছিল, যখন আমাদের জাতিকে জীবন - মরণের এক সংগ্রামে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শেষবারের মতো ইতিহাসের বিচারালয়ে তলব করা হয়েছিল ।

যতদিন উচ্চ মহলে নেতৃত্বের কোনো অভাব ছিল না, ততদিন মানুষ অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তাদের কর্তব্য পালন করেছিল । প্রোটেস্ট্যান্ট যাজক বা ক্যাথলিক পুরোহিত আমাদের প্রতিরোধ বাহিনীকে শুধু পরিখাতেই নয় , বরং দেশেও, এবং সম্ভবত তার চেয়েও বেশি, সমর্থন করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিলেন । সেই বছরগুলোতে, বিশেষ করে প্রাথমিক উৎসাহের জোয়ারের সময়, উভয় ধর্মীয় শিবিরেই একটিই অবিভক্ত ও পবিত্র জার্মান রাইখের ধারণা ছিল, যার টিকে থাকা ও অস্তিত্বের ধারাবাহিকতার জন্য তারা সকলেই প্রার্থনা করত।

অস্ট্রিয়ার সর্ব-জার্মান আন্দোলনের নিজেদের একটি প্রশ্ন করা উচিত: ক্যাথলিক ধর্মের প্রভাবাধীন থাকা অবস্থায় অস্ট্রিয়ায় জার্মান সত্তা বজায় রাখা সম্ভব কি না? যদি উত্তর হ্যাঁ হয়, তবে দলের ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। কিন্তু যদি উত্তর না হয়, তবে রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, বরং একটি ধর্মীয় সংস্কার প্রয়োজন হবে।

যে কেউ যদি বিশ্বাস করে যে কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের কার্যকলাপের মাধ্যমে ধর্মীয় সংস্কার সাধিত হতে পারে , তবে তা এটাই প্রমাণ করে যে ধর্মীয় ধারণা ও বিশ্বাসের মতবাদের বিকাশ কিংবা গির্জা কর্তৃক সেগুলো কীভাবে বাস্তবায়িত হয় , সে সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই।

কেউ দুই প্রভুর সেবা করতে পারে না। তাই আমি মনে করি, একটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি বা ধ্বংসের চেয়ে , এমনকি একটি রাজনৈতিক দলের কথা তো ছেড়েই দিন, একটি ধর্মের সৃষ্টি বা বর্জনের পরিণতি অনেক বেশি সুদূরপ্রসারী।

এবং এটা বলা যায় না যে আক্রমণগুলো কেবল অপর পক্ষের আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা ছিল।

নিঃসন্দেহে সবসময়ই এমন বিবেকহীন দস্যুরা ছিল, যারা ধর্মকে নিম্নমানের রাজনীতিতে নামিয়ে আনতে দ্বিধা করত না। এই ধরনের লোকেরা প্রায় সবসময়ই শুধু ভাবত কীভাবে ফায়দা তোলা যায়।
ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে । কিন্তু অন্যদিকে, এটা বলাও ভুল হবে যে, কোনো ধর্ম বা ধর্মীয় সম্প্রদায় সেইসব দুষ্কৃতকারীদের জন্য দায়ী , যারা নিজেদের হীন স্বার্থে গির্জাকে ব্যবহার করেছে , ঠিক যেমন তারা অংশগ্রহণ করা অন্য সবকিছুকেই ব্যবহার করে ।

এই সংসদীয় ফাঁকিবাজ ও প্রতারকদের এর চেয়ে বেশি খুশি আর কিছুতেই হতে পারে না।
তাদের রাজনৈতিক অপকর্মের জন্য দোষারোপ করার মতো একজন বলির পাঁঠা খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা —অবশ্যই, ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে । যখনই কোনো ধর্ম বা সম্প্রদায়কে আক্রমণ করা হয় এবং তার ব্যক্তিগত অপকর্মের জন্য দায়ী করা হয় , তখন এমন একজন নির্লজ্জ মিথ্যাবাদী হৈচৈ ফেলে দেয় এবং সারা বিশ্বকে দেখতে বলে যে তার কাজগুলো কতটা ন্যায়সঙ্গত ছিল, এই দাবি করে যে সে নিজেই এবং তার বাগ্মিতা ধর্ম ও গির্জাকে রক্ষা করেছে। জনসাধারণ, যারা মূলত নির্বোধ এবং সংকীর্ণমনা , তারা আসল প্ররোচনাকারীকে চিনতে পারে না—

Machine Translated by Google

এইসব হট্টগোলের মধ্যে। প্রায়শই তার লড়াইয়ের শুরুটা মনে থাকে না , এবং গুণ্ডাটা তার পাল্লা ভারী করে ফেলে।
সংখ্যা।

এই ধরনের ধূর্ত শেয়াল জানে যে তার অপকর্মের সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই । তার সৎ কিন্তু সরল প্রতিপক্ষ যখন খেলায় হেরে যায়, তখন সে মনে মনে আরও হাসে, এবং একদিন মানবতার ওপর বিশ্বাস হারিয়ে সে জনজীবন থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেবে।

কিন্তু অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে, ব্যক্তির অন্যায়ের জন্য ধর্মকে , বা গির্জাকে, দায়ী করাও ভুল । যদি আমরা সকলের কাছে দৃশ্যমান এই সংগঠনের বিশাল আকারকে মানব প্রকৃতির গড় দুর্বলতার সাথে তুলনা করি, তবে আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে ভালো ও মন্দের অনুপাত অন্য যেকোনো জায়গার চেয়ে অনেক ভালো। যাজকদের মধ্যে অবশ্যই এমন লোক থাকতে পারে যারা তাদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে নিজেদের পবিত্র ব্রতকে ব্যবহার করে । এমনও অনেকে আছেন যারা দুর্ভাগ্যবশত ভুলে যান যে রাজনৈতিক সংগ্রামে তাদের উচিত মহৎ সত্যের রক্ষক হওয়া, মিথ্যা ও অপবাদের সহযোগী নয়। কিন্তু এই অযোগ্যদের প্রত্যেকের বিপরীতে হাজার বা তারও বেশি এমন মানুষ আছেন যারা আত্মার বিশ্বস্ত রক্ষক হিসেবে মহৎভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করেন , এবং জলাভূমির সাগরে ছোট ছোট দ্বীপের মতো আমাদের এই কলুষিত যুগকে উন্নত করে তোলেন।

আমি গির্জাকে সরাসরি নিন্দা করতে পারি না, কিংবা যদি যাজকের পোশাক পরিহিত কোনো অনৈতিক ব্যক্তি নৈতিক আইনের বিরুদ্ধে কোনো অপরাধ করে, তবে তা করার কোনো যৌক্তিকতাও আমার নেই। গির্জার অগণিত সদস্যের মধ্যে কেউ যদি তার স্বদেশবাসীকে বিশ্বাসঘাতকতা করে ও অপবাদ দেয়, তবে এক মুহূর্তের জন্যও গির্জাকে দোষারোপ করা আমার উচিত নয় , বিশেষ করে এমন এক যুগে যখন এই ধরনের আচরণ খুবই সাধারণ। আমাদের অবশ্যই ভুলে যাওয়া উচিত নয়, বিশেষ করে আমাদের এই সময়ে, যে প্রত্যেক এফিয়াল্টেসের (Ephialtes) বিপরীতে এমন হাজারো মানুষ আছেন, যাদের হৃদয় জাতির দুর্ভাগ্যে ব্যথিত এবং যারা আমাদের জাতির শ্রেষ্ঠ মানুষদের সাথে মিলে সেই মুহূর্তটির জন্য আকুলভাবে অপেক্ষা করে , যখন সুখ ফিরে আসবে।

আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসবে ।

যদি কেউ আপত্তি করেন যে আমরা এখানে দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ সমস্যা নিয়ে নয়, বরং মৌলিক সত্য ও মতবাদের মৌলিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি, তবে এর উত্তর দেওয়ার একমাত্র উপায় হলো এই প্রশ্নটি করা:

আপনার কি মনে হয় যে বিধাতা আপনাকে জগতের কাছে সত্য প্রচার করার জন্য ডেকেছেন ? যদি তাই হয়, তবে যান এবং তা করুন। কিন্তু আপনার তা সরাসরি করার সাহস থাকতে হবে , কোনো রাজনৈতিক দলকে আপনার মুখপাত্র হিসেবে ব্যবহার করে নয় ; সেভাবে আপনি আপনার আহ্বান থেকে সরে দাঁড়ান। অন্য কিছুর পরিবর্তে
বর্তমানে যা খারাপ, তার পরিবর্তে আরও ভালো এবং ভবিষ্যতে টিকে থাকবে এমন কিছু তৈরি করুন।

যদি তোমার প্রয়োজনীয় সাহসের অভাব থাকে, অথবা ব্যাপারটা কেমন হওয়া উচিত তা তুমি না জানো,
যা আছে তার চেয়ে ভালো বিকল্প যা-ই হোক, তা ছেড়ে দেওয়াই ভালো। কিন্তু যা-ই ঘটুক না কেন , যদি প্রকাশ্যে লড়াই করার মতো সাহস আপনার না থাকে , তবে কোনো রাজনৈতিক দলের ঘুরপথে নিজের লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করবেন না ।

রাজনৈতিক দলগুলোর ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার নেই, তবে সেইসব বিষয় এর ব্যতিক্রম যা জাতির মঙ্গলের পরিপন্থী এবং যার উদ্দেশ্য হলো জাতিগত রীতিনীতি ও নৈতিকতাকে ক্ষুণ্ন করা ।

যদি গির্জার কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তি তাদের জাতিকে পঙ্গু করার জন্য ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বা শিক্ষার অপব্যবহার করেন , তবে তাদের বিরোধীদের কখনোই একই পথ অনুসরণ করা এবং একই অস্ত্র দিয়ে লড়াই করা উচিত নয় ।

একজন রাজনৈতিক নেতার জন্য তাঁর জাতির ধর্মীয় শিক্ষা ও রীতিনীতি পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয় হওয়া উচিত। অন্যথায়, তাঁর রাষ্ট্রনায়ক না হয়ে একজন সংস্কারক হওয়া উচিত, যদি এই ধরনের কাজের জন্য তাঁর প্রয়োজনীয় দক্ষতা থাকে।

এর অন্য কোনো পদক্ষেপ বিপর্যয় ডেকে আনবে, বিশেষ করে জার্মানিতে।

সর্ব-জার্মান আন্দোলন এবং রোমের সাথে এর সংঘাত নিয়ে অধ্যয়ন করার সময় আমি তখন এবং পরবর্তীতে আরও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছিলাম যে , সামাজিক সমস্যার গুরুত্ব অনুধাবন করতে না পারার কারণে আন্দোলনের প্রতিনিধিরা ব্যাপক জনগণের সমর্থন হারিয়েছিলেন, যারা এই ধরনের আন্দোলনে অপরিহার্য যোদ্ধা। সংসদে প্রবেশ করে আন্দোলনের নেতারা নিজেদেরকে বঞ্চিত করেছিলেন

জনগণের মধ্যে সুপ্ত বিপুল শক্তি , এবং একই সাথে সমস্ত বোঝা তাদের কাঁধে এসে পড়ল।

Machine Translated by Google

সংসদীয় প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতা । গির্জার বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম বহু নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মহলে তাদেরকে অগ্রহণযোগ্য করে তুলেছিল , এবং একই সাথে তাদেরকে উচ্চবিত্ত শ্রেণীর অগণিত সদস্য থেকে বঞ্চিত করেছিল —যাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন জাতির শ্রেষ্ঠ সদস্য। অস্ট্রিয়ান সাংস্কৃতিক সংগ্রামের বাস্তব ফলাফল ছিল নেতিবাচক।

যদিও তারা এক লক্ষ বিশ্বাসীকে গির্জা থেকে নিজেদের দিকে টানতে সক্ষম হয়েছিল, তারা এর কোনো উল্লেখযোগ্য ক্ষতি করতে পারেনি। এই পথভ্রষ্ট মেষদের জন্য গির্জার চোখের জল ফেলার কোনো প্রয়োজন ছিল না, যারা অনেক আগেই মনে মনে এর অন্তর্ভুক্ত থাকা ছেড়ে দিয়েছিল । এই নতুন সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে পার্থক্য হলো...
এবং এই মহান সংস্কারের ঐতিহাসিক যুগে, গির্জার কিছু শ্রেষ্ঠ সদস্য ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে তা ত্যাগ করেছিলেন, যেখানে পূর্বে উদাসীন থাকা ব্যক্তিরাই কেবল রাজনৈতিক মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তা ত্যাগ করেছিল । রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে, এর ফলাফল ছিল হাস্যকর এবং দুঃখজনক।

আরও একবার, একটি রাজনৈতিক আন্দোলন যা জার্মান জনগণকে অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা ব্যর্থ হলো, কারণ এটি নগ্ন বাস্তবতার কঠোর আনুগত্যের চেতনায় পরিচালিত হয়নি , বরং যে ময়দানে এর ধ্বংস হওয়া অবধারিত ছিল, সেখানেই পথ হারিয়ে ফেলল।

সর্ব-জার্মান আন্দোলন এই ভুলটি কখনোই করত না, যদি এটি ব্যাপক জনগণের মনস্তত্ত্ব সঠিকভাবে বুঝতে পারত । যদি আন্দোলনের নেতারা জানতেন যে, শুধুমাত্র মনস্তাত্ত্বিক কারণেই জনগণের সামনে দুই বা ততোধিক প্রতিপক্ষকে চিহ্নিত করা সুবিধাজনক নয় – কারণ
এটি তাদের যুদ্ধ শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে বিভক্ত করে দেয়—তারা তাদের পূর্ণ ও অবিভক্ত আক্রমণ শক্তি একটিমাত্র প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীভূত করবে । দলীয় রাজনীতিতে এমন লোকদের দ্বারা সিদ্ধান্ত নিতে দেওয়াটা সবচেয়ে বিপজ্জনক, যারা একবারে সবকিছু চায় কিন্তু কিছুই অর্জন করতে পারে না।

কিন্তু বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলার থাকলেও , রাজনৈতিক নেতাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা আমাদের শেখায়, অনুরূপ পরিস্থিতিতে কোনো বিশুদ্ধ রাজনৈতিক দলই কখনো ধর্মীয় সংস্কার সাধন করতে পারেনি । আর ইতিহাসকে ভুলে যাওয়ার বা অবিশ্বাস করার জন্য অধ্যয়ন করা হয় না।

এর শিক্ষা তখনই অর্জিত হয়, যখন সেগুলোকে বাস্তবে প্রয়োগ করার প্রয়োজন পড়ে। এটা বিশ্বাস করা ভুল হবে যে, এই বিশেষ ক্ষেত্রে ঘটনা ভিন্নরকম ঘটত এবং ইতিহাসের শাশ্বত সত্যগুলো প্রযোজ্য হতো না। ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা হয় যাতে এর শিক্ষা বর্তমান যুগে প্রয়োগ করা যায়, এবং যিনি তা করতে পারেন না, তিনি নিজেকে রাজনৈতিক নেতা বলে দাবি করতে পারেন না । প্রকৃতপক্ষে, তিনি একজন বেশ অগভীর ব্যক্তি , অথবা, যেমনটা প্রায়শই ঘটে, একজন দাম্ভিক নির্বোধ, যার সদিচ্ছা বাস্তব বিষয়ে তার অযোগ্যতাকে পুষিয়ে দিতে পারে না।

সর্বকালের প্রকৃত মহান নেতাদের দ্বারা প্রদর্শিত নেতৃত্বের শিল্প হলো, জনগণের মনোযোগকে একটিমাত্র শত্রুর উপর কেন্দ্রীভূত করা এবং নিশ্চিত করা যে কোনো কিছুই যেন সেই মনোযোগকে বিভক্ত করতে না পারে। জনগণের সংগ্রামের শক্তি যত বেশি একটিমাত্র লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত হবে, কর্মের ঐক্যের আকর্ষণে তত বেশি নতুন সদস্য আন্দোলনে যোগ দেবে এবং এভাবেই এর আঘাত হানার শক্তি ক্রমাগত শক্তিশালী হবে । একজন মেধাবী নেতাকে অবশ্যই বিভিন্ন প্রতিপক্ষকে এমনভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হতে হবে যেন তারা একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত; নেতার অনুসারীদের মধ্যে থাকা দুর্বল ও সিদ্ধান্তহীন ব্যক্তিরা যদি বিভিন্ন শত্রুর মুখোমুখি হয় , তবে তারা সহজেই তাদের উদ্দেশ্যের ন্যায্যতা নিয়ে সন্দেহ করতে শুরু করতে পারে।

যেইমাত্র সিদ্ধান্তহীন জনতা বুঝতে পারে যে তারা বিরোধিতার সম্মুখীন হচ্ছে
বিভিন্ন শত্রু গোষ্ঠী দ্বারা গঠিত হওয়ায় , তাদের বস্তুনিষ্ঠতাবোধ জাগ্রত হবে এবং তারা প্রশ্ন করতে শুরু করবে যে, এটা কীভাবে সম্ভব যে বাকি সবাই খারাপ এবং কেবল তারাই ও তাদের আন্দোলনই ভালো ।

এই অনুভূতি তাদের লড়াই করার শক্তিকে অচল করে দেওয়ার প্রথম ধাপ । যদি তারা হয়
বিভিন্ন দলে বিভক্ত নানা শত্রুকে একত্রিত করে একটি অবিচ্ছিন্ন ফ্রন্ট গঠন করা প্রয়োজন , যাতে গণ-আন্দোলনের সমর্থক জনতা কেবল একজনই অভিন্ন শত্রুকে দেখতে পায়, যার বিরুদ্ধে তাদের লড়াই করতে হবে। এই ধরনের একীকরণ তাদের নিজেদের উদ্দেশ্যের ন্যায্যতার বোধকে শক্তিশালী করে এবং শত্রুর প্রতি তাদের শত্রুতার অনুভূতিকে আরও দৃঢ় করে।

Machine Translated by Google

সর্ব-জার্মান আন্দোলনটি অজনপ্রিয় ছিল, কারণ এর নেতারা এই সত্যের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন । তাদের লক্ষ্য সুস্পষ্ট ছিল এবং তাদের উদ্দেশ্যও সৎ ছিল; কিন্তু তারা ভুল পথ বেছে নিয়েছিল। তাদের কার্যকলাপকে এমন একজন পর্বতারোহীর সাথে তুলনা করা যেতে পারে , যে তার কাঙ্ক্ষিত চূড়া থেকে কখনো দৃষ্টির বিসর্জন দেয় না , যে সর্বোচ্চ সংকল্প ও শক্তি নিয়ে যাত্রা শুরু করে কিন্তু তার পায়ের তলার রাস্তার দিকে কোনো মনোযোগ দেয় না । ক্রমাগত লক্ষ্যের দিকে চোখ স্থির রাখায়, সে আরোহণের প্রকৃতি বিবেচনা করতে বা লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয় এবং শেষ পর্যন্ত তাকে পড়ে যেতেই হয় ।

সর্ব-জার্মান পার্টির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী যেভাবে তাদের লক্ষ্য অর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল , তা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারা যে পথ বেছে নিয়েছিল তা ভালো এবং সুচিন্তিত ছিল; কিন্তু তাদের লক্ষ্য সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট রূপরেখা ছিল না।
প্রায় সকল ক্ষেত্রেই যেখানে সর্ব-জার্মান আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল, সেখানে খ্রিস্টান সমাজতান্ত্রিক দলের নীতি সঠিক ও সুসংবদ্ধ ছিল ।

তারা জনগণের গুরুত্ব সঠিকভাবে অনুধাবন করেছিলেন এবং সেই কারণে একেবারে শুরু থেকেই আন্দোলনের সামাজিক চরিত্রের ওপর জোর দিয়ে বিপুল সংখ্যক মানুষের সমর্থন লাভ করেছিলেন। বিশেষ করে নিম্ন মধ্যবিত্ত ও কারিগরদের দিকে তাদের প্রচেষ্টা নিবদ্ধ করার মাধ্যমে তারা অনুগত, অবিচল এবং আত্মত্যাগী সমর্থকদের একটি অনুসারী গোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন। খ্রিস্টান সমাজতান্ত্রিক নেতারা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে যেকোনো ধরনের বিবাদ এড়িয়ে চলতেন এবং এভাবেই একটি শক্তিশালী সংগঠন —ক্যাথলিক চার্চের—সমর্থন নিশ্চিত করেছিলেন। এই নেতারা মূল্য উপলব্ধি করেছিলেন

তারা ব্যাপক পরিসরে প্রচারণা চালাতেন এবং তাদের অনুসারীদের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আধ্যাত্মিক প্রবৃত্তিকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে প্রকৃত ওস্তাদ ছিলেন।

অস্ট্রিয়াকে বিভাজনের হাত থেকে বাঁচানোর স্বপ্ন বাস্তবায়নে এই দলের ব্যর্থতার কারণ হিসেবে তাদের গৃহীত পদ্ধতির দুটি প্রধান ত্রুটি এবং তারা যে লক্ষ্যগুলো অর্জন করতে চেয়েছিল সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার অভাবকে দায়ী করতে হবে।

খ্রিস্টান সমাজতন্ত্রীদের ইহুদি-বিদ্বেষ ধর্মীয় নীতির উপর ভিত্তি করে ছিল, অন্য কোনো কারণে নয়।
এই ভুলের কারণটিই দ্বিতীয় ত্রুটিটিরও উৎস ছিল।

খ্রিস্টান সোশ্যালিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতারা বিশ্বাস করতেন যে , অস্ট্রিয়াকে বাঁচাতে হলে তাঁরা জাতিগত নীতির উপর ভিত্তি করে নিজেদের অবস্থান গড়ে তুলতে পারেন না, কারণ তাঁদের মতে, এই ধরনের নীতি গ্রহণ করলে তা দ্রুত রাষ্ট্রের সার্বিক ধ্বংস ডেকে আনতে পারে । দলীয় নেতাদের মতে, ভিয়েনার পরিস্থিতিতে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীকে বিচ্ছিন্ন করে এমন যেকোনো বিষয় সতর্কতার সাথে পরিহার করা এবং ঐক্য সৃষ্টিকারী বিষয়গুলোকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন ছিল ।

সেই সময়ে ভিয়েনা বিদেশী উপাদান, বিশেষ করে চেকদের দ্বারা এতটাই পরিপূর্ণ ছিল যে, মৌলিকভাবে জার্মানি-বিরোধী নয় এমন কোনো দলের সারিতে এই উপাদানগুলোকে গ্রহণ করাতে হলে সর্বোচ্চ সহনশীলতার প্রয়োজন ছিল। অস্ট্রিয়াকে বাঁচাতে হলে এই উপাদানগুলো অপরিহার্য ছিল। তাই , ম্যানচেস্টার স্কুলের উদারনীতির বিরোধিতা করে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের, যাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন চেক, সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করা হয়েছিল; তারা বিশ্বাস করত যে এই অবস্থান গ্রহণের মাধ্যমে তারা ইহুদিদের বিরুদ্ধে এমন একটি স্লোগান খুঁজে পেয়েছে যা তার ধর্মীয় তাৎপর্যের কারণে পুরোনো অস্ট্রিয়ার জনসংখ্যা গঠনকারী সমস্ত জাতিগোষ্ঠীকে একত্রিত করবে ।

তবে এটা স্পষ্ট ছিল যে, এই ধরনের ইহুদি-বিদ্বেষ ইহুদিদের খুব একটা বিচলিত করবে না, কারণ এর ভিত্তি ছিল সম্পূর্ণ ধর্মীয়। যদি পরিস্থিতি সবচেয়ে খারাপও হয়, তবে বাপ্তিস্মের জলের কয়েক ফোঁটাই যথেষ্ট হবে, এবং ইহুদি তখন নিরাপদে তার ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারবে এবং একই সাথে তার ইহুদি জাতীয়তাও বজায় রাখতে পারবে।

এমন অগভীর যুক্তির ভিত্তিতে পুরো বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে ও যৌক্তিকভাবে আলোচনা করা অসম্ভব ছিল । ফলে, অনেকেই এই ধরনের ইহুদি-বিদ্বেষ বুঝতে পারেননি এবং এতে অংশ নিতে অস্বীকার করেন।

এই ধারণাটির আবেদন তাই কেবল সংকীর্ণমনা মহলেই সীমাবদ্ধ ছিল , কারণ নেতারা নিছক আবেগপ্রসূত অনুভূতির ঊর্ধ্বে উঠে নিজেদের অবস্থানকে সত্যিকারের যুক্তির ভিত্তিতে স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। বুদ্ধিজীবীরা নীতিগতভাবে এই ধরনের নীতির বিরোধিতা করেছিলেন । একদিকে, ক্রমশই মনে হচ্ছিল যে পুরো আন্দোলনটি ছিল একটি নতুন প্রচেষ্টা ।

একদিকে ইহুদিদের ধর্মান্তর , এবং অন্যদিকে, এটি অন্যান্য সমসাময়িক আন্দোলনের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । সমগ্র সংগ্রামটি আধ্যাত্মিক ও উত্তরণের জন্য তার সাংগঠনিক রূপের সমস্ত চিহ্ন হারিয়ে ফেলেছে।

Machine Translated by Google

একটি মূল্যহীন অভিযান। কিছু মানুষের কাছে—এবং এঁরা কোনোভাবেই মূল্যহীন ব্যক্তি ছিলেন না —এটি অনৈতিক ও নিন্দনীয় বলে মনে হয়েছিল। এই আন্দোলন মানুষের মধ্যে এই অনুভূতি জাগাতে ব্যর্থ হয়েছিল যে, এটি সমগ্র মানবজাতির জন্য এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা এবং বিশ্বের সকল অ-ইহুদি মানুষের ভাগ্য এর সমাধানের উপর নির্ভরশীল।

খ্রিস্টান ইহুদি-বিদ্বেষের সমস্যা সমাধানে এই সিদ্ধান্তহীনতার কারণে ,
জাপানি সমাজতন্ত্রীরা বেশ অকার্যকর প্রমাণিত হয়েছিল।

এটা ছিল কেবল বাহ্যিকভাবেই ইহুদি-বিদ্বেষ। আরও খারাপ ব্যাপার হলো, এটি ইহুদি-বিদ্বেষ হওয়ার কোনো ভানই করত না; এটি জনগণের মধ্যে এক ধরনের মিথ্যা নিরাপত্তার অনুভূতি জাগিয়ে তুলেছিল , যারা বিশ্বাস করত যে শত্রুকে কান ধরে কাবু করা হয়েছে; কিন্তু বাস্তবে, জনগণকেই নাক ধরে ঘোরানো হচ্ছিল। ইহুদিরা সহজেই ইহুদি-বিদ্বেষের এই রূপটির সাথে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছিল এবং

এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে এর
এটি শেষ করে দেওয়ার চেয়ে চালিয়ে যাওয়াই তার জন্য বেশি লাভজনক।

যদি বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী নিয়ে গঠিত একটি রাষ্ট্রের জন্য খ্রিস্টান সোশ্যালিস্ট পার্টিকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়ে থাকে, তবে সামগ্রিকভাবে জার্মান পরিচয়কে রক্ষা করার ক্ষেত্রে তাদের আরও বড় ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল।

এমনকি ভিয়েনাতেও তারা 'জাতীয়তাবাদী' হওয়ার সাহস করতে পারেনি , কারণ তাতে তারা সঙ্গে সঙ্গেই পিছিয়ে পড়ত। তারা আশা করেছিল যে, জাতীয় প্রশ্নটি নীরবে এড়িয়ে চললে হ্যাবসবার্গ রাষ্ট্রকে রক্ষা করা যাবে ; কিন্তু এই নীতিই রাষ্ট্রের ধ্বংস ডেকে এনেছিল। এই একই নীতি খ্রিস্টীয় সমাজতন্ত্রের পতনের কারণ হয়েছিল, কারণ আন্দোলনটি তার একমাত্র শক্তির উৎস থেকে বঞ্চিত হয়েছিল, যেখান থেকে একটি রাজনৈতিক দল কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি আহরণ করতে পারত।

এই বছরগুলোতে আমি সতর্কতার সাথে এই দুটি আন্দোলনকে সমর্থন করেছি এবং তাদের বিকাশ পর্যবেক্ষণ করেছি; একটির কারণ ছিল তার প্রতি আমার হৃদয়ের টান, এবং অন্যটির কারণ ছিল এই অসাধারণ মানুষটির প্রতি আমার শ্রদ্ধা, যিনি আমার কাছে অস্ট্রিয়ার সমগ্র জার্মান জনগোষ্ঠীর এক তিক্ত প্রতীকে পরিণত হয়েছিলেন।

প্রয়াত মেয়রের বিশাল শবযাত্রাটি রাস্তা ধরে এগিয়ে যাওয়ার সময়
টাউন হল থেকে রিংস্ট্রাস পর্যন্ত, আমি লক্ষ লক্ষ মানুষের মাঝে দাঁড়িয়ে এই গম্ভীর দৃশ্যটি দেখছিলাম।
মিছিল। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে গভীরভাবে আবেগাপ্লুত হলাম, এবং আমার সহজাত প্রবৃত্তি আমাকে স্পষ্টভাবে বলে দিল, এই মানুষটির সমস্ত পরিশ্রমই বৃথা গেল, কারণ এক অশুভ নিয়তি এই রাষ্ট্রকে অনিবার্যভাবে তার পতনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ডক্টর কার্ল লুয়েগার যদি জার্মানিতে বাস করতেন, তবে তিনি আমাদের জাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা হতেন। তাঁর এবং তাঁর কাজের জন্য এটা এক দুর্ভাগ্য ছিল যে তিনি এই আশাহীন রাষ্ট্রে বাস করতেন।

যখন তিনি মারা গেলেন, ততক্ষণে বলকান জুড়ে আগুন জ্বলে উঠেছিল এবং মাস পেরিয়ে তা ছড়িয়ে পড়ছিল। ভাগ্য তাঁর প্রতি সদয় ছিল যে, তিনি একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যা প্রতিরোধ করার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন, তা তাঁকে দেখতে হয়নি।

আমি সেই কারণগুলো বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছিলাম যা এই আন্দোলনগুলোর একটিকে নিষ্ফল করে তুলেছিল এবং অন্যটির অগ্রগতি ব্যাহত করেছিল। এই অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ এই গভীর প্রত্যয় জন্মায় যে, পুরোনো অস্ট্রিয়ায় রাষ্ট্রের অবস্থান শক্তিশালী করার অন্তর্নিহিত অসম্ভবতা ছাড়াও, উভয় পক্ষই নিম্নলিখিত মারাত্মক ভুলটি করেছিল: সর্ব-জার্মান দলটি আন্দোলনের লক্ষ্য—যা ছিল জার্মানির পুনরুজ্জীবন

— সম্পর্কিত মৌলিক ধারণায় সম্পূর্ণ সঠিক ছিল, কিন্তু তারা তাদের কর্মপন্থা বেছে নিয়েছিল দুর্ভাগ্যজনকভাবে।

তিনি জাতীয়তাবাদী ছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, তিনি সামাজিক সমস্যার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেননি এবং ফলস্বরূপ গণসমর্থন অর্জনে ব্যর্থ হন। তবে, তাঁর ইহুদি-বিরোধী নীতি ধর্মীয় নীতির উপর ভিত্তি করে নয়, বরং জাতিগত সমস্যা সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধির উপর ভিত্তি করে ছিল। কিন্তু, তিনি ঘটনাকে ভুলভাবে বিচার করেন এবং একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে ভুল কৌশল অবলম্বন করেন।
ধর্মীয়।

খ্রিস্টান সমাজতান্ত্রিক দলের জার্মান পুনর্জন্ম সম্পর্কে ধারণা ছিল অত্যন্ত অস্পষ্ট, কিন্তু দলটি ছিল বুদ্ধিমান এবং নিজেদের নীতি বাস্তবায়নের জন্য সফলভাবে কর্মপন্থা বেছে নিয়েছিল। খ্রিস্টান সমাজতন্ত্রীরা সামাজিক প্রশ্নের গুরুত্ব বুঝত ; কিন্তু ইহুদিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তারা ভুল নীতি অবলম্বন করেছিল এবং রাজনৈতিক শক্তির উৎস হিসেবে জাতীয় ধারণার মূল্যকে স্বীকার করতে একগুঁয়েভাবে অস্বীকার করেছিল।

Machine Translated by Google

যদি খ্রিস্টান সোশ্যালিস্ট পার্টি, ব্যাপক জনগণের মূল্যবোধের প্রতি তাদের সঠিক উপলব্ধির পাশাপাশি , জাতিগত সমস্যার তাৎপর্যও সঠিকভাবে উপলব্ধি করত —যা সর্ব-জার্মান আন্দোলন ভালোভাবে অনুধাবন করেছিল—এবং যদি সেই দলটি সত্যিকারের জাতীয়তাবাদী হতো; অথবা যদি অন্যদিকে সর্ব-জার্মান আন্দোলনের নেতারা, ইহুদি সমস্যা ও জাতীয় ধারণার প্রতি তাদের সঠিক উপলব্ধির পাশাপাশি, খ্রিস্টান সোশ্যালিস্ট পার্টির বাস্তব প্রজ্ঞা , এবং বিশেষ করে সমাজতন্ত্রের প্রতি তার ঝোঁক গ্রহণ করত —তাহলে এমন একটি আন্দোলন হয়তো এমনভাবে বিকশিত হতে পারত যা, আমার মতে, তখন জার্মানদের ভাগ্য কার্যকরভাবে পরিবর্তন করতে পারত ।

যদি ঘটনাগুলো সেভাবে না ঘটত, তবে তার প্রধান দোষ ছিল প্রভুর অন্তরের প্রকৃতিতেই।
অস্ট্রিয়ান রাষ্ট্র।

পরবর্তীকালে গঠিত কোনো দলের মধ্যেই আমি আমার মতামতের কোনো প্রতিফলন খুঁজে পাইনি , আর এই সংগঠনগুলোর কোনোটিতে যোগ দিতে বা তাদের সংগ্রামে সাহায্য করতেও পারিনি । এমনকি তখনও, এই সমস্ত সংগঠনকে আমার কাছে ক্লান্ত মনে হয়েছিল এবং সেই কারণে তারা জার্মান জাতির একটি কেবল বাহ্যিক নয়, বরং সত্যিকারের গভীর পুনর্জন্ম ঘটাতে অক্ষম ছিল ।

হ্যাবসবার্গ রাষ্ট্রের প্রতি আমার অন্তরের বিদ্বেষ দিন দিন বাড়ছিল।

পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে আমি যত বেশি মনোযোগ দিতে লাগলাম , ততই আমার এই বিশ্বাস দৃঢ় হতে লাগল যে এই কাল্পনিক রাষ্ট্রটি জার্মান জনগণের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনবে। আমি ক্রমশ উপলব্ধি করতে লাগলাম যে জার্মান জাতির ভাগ্যকে এখানে প্রভাবিত করা সম্ভব নয় , বরং তা কেবল জার্মান রাইখের অভ্যন্তরেই সম্ভব। এবং এই বিষয়টি কেবল সাধারণ রাজনৈতিক বিষয়ের ক্ষেত্রেই নয়, বরং সাংস্কৃতিক জীবনের সমগ্র পরিমণ্ডলের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য ছিল।

এছাড়াও জাতীয় সংস্কৃতি ও শিল্পকলা সম্পর্কিত সকল বিষয়ে অস্ট্রীয় রাষ্ট্র বার্ধক্যজনিত জরাজীর্ণতার, অথবা অন্তত জার্মান জাতির কাছে তার তাৎপর্য হারানোর, সকল লক্ষণই প্রদর্শন করছিল। স্থাপত্যের ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে সত্য ছিল। সমসাময়িক স্থাপত্য অস্ট্রিয়ায় কোনো বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারেনি, কারণ রিংস্ট্রাসের নির্মাণের পর থেকে—অন্তত ভিয়েনায়—জার্মানিতে পরিকল্পিত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাগুলোর তুলনায় স্থাপত্যচর্চা গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছিল।

আর এভাবেই আমি ক্রমশ এমন এক জীবনের দিকে ঝুঁকে পড়লাম, যাকে দ্বৈত জীবন বলা যেতে পারে ।
যুক্তি ও বাস্তবতা আমাকে অস্ট্রিয়ায় আমার কঠিন পড়াশোনা চালিয়ে যেতে বাধ্য করেছিল, যদিও এখন বলতেই হয় যে এই পড়াশোনা শেষ পর্যন্ত সফলভাবেই সমাপ্ত হয়েছিল । কিন্তু আমার মন ছিল অন্য কোথাও।

আমার অন্তরে এক ধরনের অসন্তোষ দানা বাঁধতে লাগল এবং এই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শূন্যতা ও একে পতন থেকে বাঁচানোর অসম্ভবতা উপলব্ধি করে আমি ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়লাম । একই সাথে, আমি এ ব্যাপারেও সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিলাম যে এটি জার্মান জাতির উপর সব ধরনের দুর্ভাগ্য ডেকে আনবে ।

আমি নিশ্চিত ছিলাম যে হ্যাবসবার্গ সাম্রাজ্য অস্বীকার করবে এবং পিছিয়ে দেবে।
এমন কোনো জার্মান যে প্রকৃত মহত্ত্বের লক্ষণ দেখাতে পারে , অথচ একই সাথে যেকোনো অ-জার্মান কর্মকাণ্ডে সাহায্য ও প্ররোচনা দেয় ।

দ্বৈত রাজতন্ত্রের রাজধানীতে উপস্থাপিত ভিন্ন ভিন্ন জাতির এই সম্মিলিত দৃশ্য, চেক, পোল, হাঙ্গেরিয়ান, রুথেনিয়ান, [?], সার্ব, ক্রোয়েট ইত্যাদির এই বিচিত্র সমাহার, এবং অবশ্যই, মানব সমাজের দ্রাবকস্বরূপ সেই জীবাণু — এখানে, সেখানে, এবং সর্বত্র ইহুদি —এই পুরো দৃশ্যটি আমার কাছে ছিল বিকর্ষণীয়। এই বিশাল শহরটি আমার কাছে ছিল জাতিগত অবমাননার মূর্ত প্রতীক।

আমি ছোটবেলা থেকে যে জার্মান ভাষা বলতাম তা ছিল একটি আঞ্চলিক উপভাষা।
লোয়ার বাভারিয়া। আমি কথা বলার সেই বিশেষ ভঙ্গিটা কখনো ভুলিনি এবং ভিয়েনার উপভাষাটাও শিখিনি । যতদিন সেই শহরে থেকেছি , সেই ভঙ্গিটা ততই দৃঢ় হয়েছে।
জার্মান সংস্কৃতির এই পুরোনো আঁতুড়ঘরের ওপর লুটপাট শুরু করা বিদেশিদের এলোমেলো ভিড়ের প্রতি আমার ঘৃণা । এই রাষ্ট্রটি যে কোনোদিনও তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে, এই ধারণাটাই ছিল চূড়ান্ত অযৌক্তিক।

Machine Translated by Google

অধ্যায় ৩ – ভিয়েনায় অবস্থানকালীন রাজনৈতিক ভাবনা

অস্ট্রিয়া তখন এক প্রাচীন মোজাইকের অংশ ছিল , যার সিমেন্ট শুকিয়ে গিয়ে পরিণত হয়েছিল পুরোনো এবং ভঙ্গুর। যতক্ষণ এমন একটি শিল্পকর্ম অক্ষত থাকে, ততক্ষণ তা টিকে থাকতে পারে এবং অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে; কিন্তু যেই মুহূর্তে কোনো আঘাত লাগে , তা হাজার টুকরো হয়ে ভেঙে যায়।
এখন প্রশ্ন ছিল: এর প্রভাব কখন পড়বে?

যেহেতু আমার মন সর্বদা জার্মান রাইখের পক্ষেই ছিল, অস্ট্রিয়ার রাজতন্ত্রের পক্ষে নয় , তাই আমার কাছে রাষ্ট্র হিসেবে অস্ট্রিয়ার বিলুপ্তিই ছিল জার্মান জনগণের মুক্তির পথে প্রথম পদক্ষেপ।

এই সমস্ত চিন্তাভাবনা আমার সেই দেশে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আরও বাড়িয়ে দিল, যে দেশের জন্য আমার মন যৌবনকাল থেকেই গোপনে আকুল ছিল।

আমি আশা করেছিলাম যে একদিন আমি একজন স্থপতি হিসেবে পরিচিত হব এবং আমার প্রতিভাকে কাজে লাগাব । দেশের সেবায়, বৃহৎ বা ক্ষুদ্র পরিসরে , ভাগ্য যেমন চায়।

অবশেষে, আমি সেইসব মানুষদের মাঝে থাকতে চেয়েছিলাম যারা এমন একটি দেশে বাস ও কাজ করবে যেখান থেকে একটি আন্দোলনের জন্ম হবে , যার লক্ষ্য হবে আমার হৃদয়ের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা —অর্থাৎ, আমার জন্মভূমি আমাদের অভিন্ন মাতৃভূমি, জার্মান রাইখের একীকরণ ।

অনেকে হয়তো বুঝতে পারবেন না এমন আকাঙ্ক্ষা কতটা প্রবল হতে পারে ; কিন্তু আমি মূলত দুই ধরনের মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। প্রথম দলে রয়েছেন তারা, যারা এখনও সেই অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেননি।
আমি যে সুখের কথা বলেছি, এবং দ্বিতীয়টি তাদের অন্তর্ভুক্ত করে যারা তা উপভোগ করেছিল কিন্তু এক নির্মম নিয়তির কারণে তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। আমি তাদের সম্বোধন করছি, যারা নিজেদের মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত হয়েছিল এবং তাদের সবচেয়ে পবিত্র ঐতিহ্য, নিজেদের ভাষাকে রক্ষা করার জন্য লড়াই করতে বাধ্য হয়েছিল; যারা মাতৃভূমির প্রতি আনুগত্য ও ভালোবাসার কারণে নির্যাতিত ও হয়রানির শিকার হয়েছে, এবং পৈতৃক গৃহে ফিরে যাওয়ার সেই মুহূর্তটির জন্য আকুল হয়ে আছে। এই কথাগুলো আমি তাদের উদ্দেশ্যেই বলছি , এবং আমি জানি তারা তা বুঝবে।

কেবল তারাই যারা নিজেদের জীবনে উপলব্ধি করেছেন জার্মান হওয়ার অর্থ কী এবং অন্য কিছু না থাকার অর্থ কী। স্বদেশের প্রতি আপনত্বের অধিকার সেই গভীর স্মৃতিকাতরতাকে উপলব্ধি করতে পারে যা দেশত্যাগে বাধ্য করে।
এটি এক নিরন্তর হৃদয়বেদনা, এবং আনন্দ ও সন্তুষ্টির কোনো অবকাশ নেই, যতক্ষণ না পিতৃভূমির দ্বার উন্মুক্ত হয় এবং যাদের শিরায় ভ্রাতৃত্বের রক্ত প্রবাহিত, তারা অভিন্ন রাষ্ট্রে শান্তি ও বিশ্রাম খুঁজে পায়।

ভিয়েনা আমার জন্য এক কঠিন শিক্ষালয় ছিল ; কিন্তু এটিই আমাকে জীবনের গভীরতম শিক্ষাগুলো দিয়েছে। যখন আমি সেখানে থাকতে যাই, তখন আমি নিতান্তই এক বালক ছিলাম , আর যখন সেখান থেকে চলে আসি, তখন আমি এক গম্ভীর ও চিন্তাশীল মানুষ। ভিয়েনায় আমি একটি সাধারণ বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি অর্জন করি এবং স্বতন্ত্র রাজনৈতিক বিষয় বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা গড়ে তুলি। সেই সময়ে গঠিত এই বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি আমি কখনোই পরিত্যাগ করিনি , যদিও পরবর্তীকালে তা বিভিন্ন দিকে প্রসারিত হয়েছিল। এখন আমি পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারি যে, অধ্যয়নের সেই বছরগুলো আমার জন্য কতটা মূল্যবান ছিল।

এই কারণেই আমি এই সময়কালটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করছি। এখানে ভিয়েনায়, কঠোর বাস্তবতা এটি আমাকে এমন কিছু সত্য শিখিয়েছে যা এখন দলের মৌলিক নীতিগুলোকে রূপ দিয়েছে, যে দলটি পাঁচ বছরে ক্ষুদ্র সূচনা থেকে একটি সত্যিকারের গণ আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। আমি জানি না, ইহুদি, সমাজতন্ত্রী, বা বরং সাধারণভাবে মার্ক্সবাদীদের প্রতি, সামাজিক সমস্যাগুলোর প্রতি, ইত্যাদি বিষয়ে আজ আমার মনোভাব কী হতো, যদি আমি এত অল্প বয়সে, এক কঠিন শিক্ষাপর্বে এবং ভাগ্যের চাপে একগুচ্ছ ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন না করতাম।

সুতরাং, যদিও স্বদেশের দুর্ভাগ্য হাজার হাজার মানুষকে পতনের অভ্যন্তরীণ কারণগুলো বিবেচনা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তবুও তারা এমন গভীর সিদ্ধান্তে ও জ্ঞানে পৌঁছাতে পারেনি, যা বহু বছর ধরে সংগ্রাম করে আসা একজন মানুষ পেরেছিলেন ।

নিজের ভাগ্যের নিয়ন্তা।

Machine Translated by Google

পাদটীকা:

৬) Spottgeburt von Dreck und Feuer। বাগানে ফাউস্ট ও মার্থার কথোপকথনের মাঝে মেফিস্টোফেলিস বাধা দিলে ফাউস্ট তাকে এই উপাধিটি ছুড়ে দেন ।

৭) হেরোডোটাস (সপ্তম খণ্ড, ২১৩-২১৮) বর্ণনা করেছেন কীভাবে গ্রিক বিশ্বাসঘাতক এফিয়াল্টেস থার্মোপাইলির যুদ্ধে (৪৮০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) পারস্য আক্রমণকারীদের সাহায্য করেছিলেন। যখন পারস্যের রাজা জারক্সেস গ্রিক প্রতিরক্ষা ভেদ করতে না পেরে হতাশ হতে শুরু করেন , তখন এফিয়াল্টেস অর্থের বিনিময়ে রাজাকে গিরিপথের গ্রিক প্রান্ত পর্যন্ত পাহাড়ের মধ্য দিয়ে একটি পথের কথা বলেন। একটি চুক্তি হয় এবং এফিয়াল্টেস সেনাপতি হাইড্রেনসের অধীনে পারস্য সৈন্যদের একটি দলকে এই পাহাড়ি পথ ধরে নিয়ে যান। পেছন থেকে আক্রান্ত হয়ে স্পার্টার রাজা লিওনিডাসের অধীনে থাকা গ্রিক রক্ষাকারীরা সংকীর্ণ গিরিপথে দুই বিপরীত দিকে যুদ্ধ করতে বাধ্য হন । এরপর এক ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড শুরু হয় এবং লিওনিডাস সেই যুদ্ধে নিহত হন।

লিওনিডাসের সাহস এবং এফিয়াল্টেসের বিশ্বাসঘাতকতা হিটলারকে মুগ্ধ করেছিল, যেমনটা স্কুলের প্রায় প্রত্যেক ছাত্রকেই করেছিল । হিটলার সপ্তম অধ্যায়ে আবারও এই ঘটনার উল্লেখ করেন, যেখানে তিনি ফ্রান্স ও ফ্ল্যান্ডার্সে নিহত জার্মান সৈন্যদের থার্মোপাইলির গ্রিকদের সাথে তুলনা করেন, এবং এফিয়াল্টেসের বিশ্বাসঘাতকতা বিশ্বযুদ্ধের শেষে জার্মান রাজনীতিবিদদের পরাজয়বাদী নীতির একটি আদি রূপ হিসেবে কাজ করে ।

Machine Translated by Google

চতুর্থ অধ্যায়

মিউনিখ

১৯১২ সালের বসন্তে আমি অবশেষে মিউনিখে এসে পৌঁছালাম।

শহরটা আমার কাছে পরিচিত ছিল, যেন আমি বহু বছর ধরে এর প্রাচীরের ভেতরেই বাস করে আসছি।

এর কারণ ছিল এই যে, স্থাপত্যবিদ্যা নিয়ে আমার পড়াশোনা ক্রমাগত এই বিষয়টির প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। জার্মান শিল্পের মহানগরী । জার্মানিকে জানতে হলে মিউনিখকে জানতেই হবে , এবং মিউনিখ না দেখে জার্মান শিল্পকলা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়।

বলা যেতে পারে , যুদ্ধের আগের এই সময়টাই ছিল আমার জীবনের এ পর্যন্ত সবচেয়ে সুখের ও তৃপ্তিদায়ক । আমার আয় ছিল খুবই সামান্য; কিন্তু আসলে, আমি তো ছবি আঁকার জন্য বাঁচতাম না । পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি জীবনধারণের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানোর জন্যই আমি ছবি আঁকতাম । আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতাম যে, নিজের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যে আমি শেষ পর্যন্ত পৌঁছাবই । আর এই বিশ্বাস এতটাই প্রবল ছিল যে, তা আমাকে দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাটো অসুবিধাগুলো নিয়ে অতিরিক্ত বিচলিত না হয়েই সহ্য করতে সাহায্য করত ।

তাছাড়া, এখানে থাকার প্রায় শুরু থেকেই, আমি আমার চেনা অন্য যেকোনো জায়গার চেয়ে এই শহরটাকে বেশি ভালোবেসে ফেলেছিলাম। একটা জার্মান শহর! আমি নিজেকে বললাম। ভিয়েনা থেকে কী যে আলাদা । যখন আমার কল্পনা সেই জাতি-ব্যাবিলনের দিকে ফিরে গেল, তখন আমার মধ্যে এক ধরনের বিতৃষ্ণা জেগে উঠল । এখানকার আরেকটি মনোরম বিষয় ছিল মানুষের জার্মান ভাষায় কথা বলার ধরণ, যা ভিয়েনার উপভাষার চেয়ে আমার নিজের বলার ধরনের অনেক বেশি কাছাকাছি ছিল । এটা আমাকে আমার যৌবনের দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দিত, বিশেষ করে যখন আমি লোয়ার বাভারিয়া থেকে মিউনিখে আসা মানুষদের সাথে কথা বলতাম। এখানে এমন হাজারো জিনিস ছিল যা আমি গভীরভাবে ভালোবেসেছিলাম, বা এখানে থাকার সময় ভালোবাসতে শুরু করেছিলাম । কিন্তু যা আমাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করেছিল তা হলো শহরটির আদিম শক্তি এবং সূক্ষ্ম শৈল্পিক চেতনার চমৎকার মেলবন্ধন, হফব্রাউহাউস ও ওডিওন, অক্টোবরফেস্ট ও পিনাকোথেক ইত্যাদির অনন্য সামঞ্জস্য। পৃথিবীর অন্য কোনো জায়গার মতো নয়, এই শহরের সাথে আমার যে এমন সংযোগ, তার কারণ সম্ভবত এই যে, মিউনিখ আমার কর্মজীবনের বিকাশের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত এবং থাকবে ; এবং এই যে, আমার সফরের শুরু থেকেই আমি অনুভব করেছিলাম...

অভ্যন্তরীণভাবে সুখী ও সন্তুষ্ট থাকার কারণ হিসেবে চমৎকার উইটেলসবাক বাসভবনের আকর্ষণকে উল্লেখ করা যেতে পারে , যা সম্ভবত বাণিজ্যিক প্রবৃত্তির পরিবর্তে সৌন্দর্যবোধে ধন্য প্রত্যেককেই আকৃষ্ট করে।

পেশাগত কাজের বাইরে, আমি সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাবলিতে, বিশেষ করে পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে, সবচেয়ে বেশি আগ্রহী ছিলাম। এই বিষয়ে আমার আগ্রহ জন্মেছিল জার্মান জোট নীতির মাধ্যমে, যেটিকে আমি অস্ট্রিয়ায় থাকাকালীনও পুরোপুরি ভুল বলে মনে করতাম। কিন্তু ভিয়েনায় আমি পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম না যে জার্মান রাইখ নিজেকে কতটা প্রতারিত করেছে। ভিয়েনায় আমি এই ব্যাখ্যা দিতে আগ্রহী ছিলাম , অথবা সম্ভবত জার্মানির ভুল ব্যাখ্যা করার জন্যই আমি নিজেকে এটা বিশ্বাস করিয়েছিলাম যে , বার্লিনের কর্তৃপক্ষ হয়তো জানত বাস্তবতার মুখোমুখি হলে তাদের মিত্র কতটা দুর্বল ও অবিশ্বস্ত প্রমাণিত হবে , কিন্তু কিছু কমবেশি রহস্যময় কারণে তারা জনমতকে তাদের মতামত শুনতে দিচ্ছিল না ।

তারা হয়তো অনুভব করেছিলেন যে , বিসমার্ক কর্তৃক প্রবর্তিত জোট নীতি তাদের বজায় রাখা উচিত এবং এর আকস্মিক বিচ্ছেদ অনাকাঙ্ক্ষিত হতে পারে , কারণ তা সুযোগের অপেক্ষায় থাকা দেশগুলোকে জাগিয়ে তুলতে পারে অথবা দেশের অভ্যন্তরে ফিলিস্তিনীয়দের ভীত করে তুলতে পারে ।

কিন্তু সাধারণ মানুষের সংস্পর্শে এসে আমি দ্রুতই হতাশ হয়ে বুঝতে পারলাম যে আমার ধারণাগুলো ভুল ছিল। আমি সর্বত্র, এমনকি বিদগ্ধ মহলেও, এটা দেখে অবাক হয়েছিলাম যে হ্যাবসবার্গ রাজতন্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে কারও বিন্দুমাত্র ধারণাও ছিল না। বিশেষ করে সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ভ্রম প্রচলিত ছিল যে, অস্ট্রিয়া এমন এক মিত্র যাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা যায় , যে প্রয়োজনে তার শক্তি ব্যবহার করবে। সাধারণ মানুষ তখনও এই দ্বৈত রাজতন্ত্রকে একটি "জার্মান রাষ্ট্র" হিসেবে দেখত এবং বিশ্বাস করত যে তাদের ওপর ভরসা করা যায় । তারা ধরে নিয়েছিল যে জার্মানির মতোই তাদের শক্তি তাদের লক্ষ লক্ষ নাগরিকের মধ্যেই নিহিত । প্রথমত, তারা বুঝতে পারেনি যে অস্ট্রিয়ার আর কোনো রাষ্ট্র নেই ।

Machine Translated by Google

জার্মান রাষ্ট্র, এবং দ্বিতীয়ত, অস্ট্রিয়ায় বিরাজমান পরিস্থিতি এটিকে এখনও অন্ধভাবে অতল গহ্বরের কিনারায় ঠেলে দিচ্ছে।

সেই সময়ে, পেশাদার কূটনীতিকদের চেয়েও আমি অস্ট্রিয়ার পরিস্থিতি ভালো জানতাম । প্রায় সবসময়ই যেমনটা হয়, চোখ বাঁধা অবস্থায় এই কূটনীতিকরা নিজেরাই বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। অধিকাংশ মানুষের প্রচলিত মতামত কেবল উপর থেকে তাদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া কথারই প্রতিফলন ছিল। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা তাদের "মিত্রের" সামনে সোনার বাছুরের সামনে মাথা নত করার মতো করে নতজানু হতেন। তারা সম্ভবত ভাবতেন যে, ভদ্রতা ও সৌজন্যের মাধ্যমে তারা পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবেন।
অপর পক্ষের আন্তরিকতার অভাব ছিল । তাই তারা প্রতিটি ঘোষণাকেই চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করেছিল ।

ভিয়েনায় থাকাকালীনও , সরকারি কর্মকর্তাদের বক্তৃতা এবং ভিয়েনার সংবাদপত্রের বিষয়বস্তুর মধ্যেকার অসামঞ্জস্য আমাকে ক্রমাগত বিরক্ত করত । আর ভিয়েনা তখনও একটি জার্মান শহরই ছিল, অন্তত বাহ্যিকভাবে। ভিয়েনা, বা বলা ভালো জার্মান অস্ট্রিয়া ছেড়ে স্লাভিক প্রদেশগুলোতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হতো । ত্রিপক্ষীয় জোটের সমস্ত জাঁকজমকপূর্ণ ভেলকিবাজিকে তারা কীভাবে মূল্যায়ন করত, তা দেখার জন্য প্রাগের সংবাদপত্রগুলোর দিকে শুধু একবার চোখ বুলালেই চলত । সেই সময়ে প্রাগে এই " রাষ্ট্রনীতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন "-এর উপহাসকারী ও বিদ্রূপকারী ছাড়া আর কেউ ছিল না। এমনকি শান্তিকালীন সময়েও, যখন দুই সম্রাট বন্ধুত্বের চিহ্নস্বরূপ একে অপরের কপালে চুম্বন করতেন , তখনও এই সংবাদপত্রগুলো তাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস গোপন রাখত না যে, নিবেলুঙ্গেনলিডের গৌরবে উদ্ভাসিত আদর্শ থেকে বাস্তবতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার মুহূর্তেই এই জোট ভেঙে পড়বে ।

কয়েক বছর পর যখন জোটগুলো প্রথম বাস্তব পরীক্ষার সম্মুখীন হলো, তখন ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল । ইতালি শুধু ত্রিপক্ষীয় জোট থেকে সরে এসে অন্য দুই সদস্যকে তাদের ভাগ্যের ওপর ছেড়েই দেয়নি, বরং আমাদের শত্রুদের সাথেও যোগ দিয়েছিল!
এই ধরনের অলৌকিক ঘটনার সম্ভাবনায় কেউ যে এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্বাস করেছিল — যে ইতালি হবে
অস্ট্রিয়ার পক্ষে যুদ্ধ করা — আনুষ্ঠানিক কূটনীতির অন্ধত্বে ভোগা ব্যক্তিদের কাছে এটা ছিল একেবারেই অবিশ্বাস্য। আর অস্ট্রিয়ার মানুষেরাও ঠিক এমনই অনুভব করত।

অস্ট্রিয়ায় কেবল হ্যাবসবার্গ এবং অস্ট্রিয়ান জার্মানরাই এই জোটকে সমর্থন করেছিল। হ্যাবসবার্গরা বিচক্ষণ হিসাবনিকাশ ও প্রয়োজনের তাগিদেই এমনটি করেছিল। জার্মানরা সরল বিশ্বাসে এবং রাজনৈতিক অজ্ঞতা থেকে এমনটি করেছিল। তারা এই অর্থে সরল বিশ্বাসে কাজ করেছিল যে , ত্রিপক্ষীয় জোট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তারা জার্মান রাইখের এক বিরাট সেবা করছে এবং একে শক্তিশালী ও উন্নত করতে সাহায্য করছে।
এর নিরাপত্তা। তবে, এই ধরনের ধারণা পোষণ করে তারা তাদের রাজনৈতিক অজ্ঞতারই পরিচয় দিয়েছিল , কারণ জার্মান রাইখকে সাহায্য করার পরিবর্তে, তারা আসলে একে একটি ক্ষয়িষ্ণু রাষ্ট্রের সাথে বেঁধে ফেলেছিল যা তার কমরেডকে নিজের সাথে কবরে টেনে নিয়ে যেতে পারত; এবং সর্বোপরি, এই জোটকে রক্ষা করার মাধ্যমে, তারা হ্যাবসবার্গদের জার্মান-বিবর্জন নীতির ক্রমবর্ধমান শিকার বলে নিজেদের অনুভব করতে শুরু করেছিল। এই জোট হ্যাবসবার্গদের এই বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ জুগিয়েছিল যে জার্মান রাইখ তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না , এবং এর ফলে তারা জার্মান উপাদানকে ক্রমান্বয়ে নির্মূল করার অভ্যন্তরীণ নীতি আরও সহজে এবং কম ঝুঁকিতে বাস্তবায়ন করার জন্য একটি সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল। শুধু যে জার্মান সরকারের "বস্তুনিষ্ঠতার" উপর নির্ভর করা যেত , তাই সেই দিক থেকে কোনো প্রতিবাদের ভয় ছিল না , তা-ই নয়, বরং অস্ট্রিয়ান জার্মানদেরও সর্বদা এই জোটের কথা মনে করিয়ে দিয়ে তাদের চুপ করিয়ে দেওয়া যেত , যদি তারা দ্বৈত রাজতন্ত্রে স্লাভিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবহৃত নিন্দনীয় পদ্ধতির বিরুদ্ধে কখনও আপত্তি জানাত।

জার্মান রাইখের নাগরিকরা যখন প্রকাশ্যে
হ্যাবসবার্গ শাসনের প্রতি তাদের আস্থা ঘোষণা করেছিল ?

তারা কি প্রতিরোধ করবে এবং এর ফলে রাইখে থাকা তাদের আত্মীয়দের সামনে জাতীয় স্বার্থের বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিহ্নিত হবে? তারাই তো, যারা দশকের পর দশক ধরে তাদের জার্মান ঐতিহ্যের নামে এত ত্যাগ স্বীকার করেছে !

অস্ট্রিয়া থেকে জার্মান প্রভাব অপসারিত হওয়ার পর এই মৈত্রীর গুরুত্ব কী ছিল ?
যদি ত্রিপক্ষীয় জোট জার্মানদের জন্য লাভজনক হতে হতো, তাহলে অস্ট্রিয়ায় জার্মান শক্তির প্রাধান্য বজায় রাখা কি একটি অপরিহার্য শর্ত হতো না? কেউ কি সত্যিই...
তিনি বিশ্বাস করতেন যে আধিপত্যের অধীনেও জার্মানি হ্যাবসবার্গ সাম্রাজ্যের মিত্র থাকতে পারত।
স্লাভিক?

Machine Translated by Google

অস্ট্রিয়ার অভ্যন্তরীণ জাতিগত সমস্যা নিয়ে জার্মান কূটনীতির আনুষ্ঠানিক মনোভাব, সেইসাথে জনমতের মনোভাবও, কেবল নির্বোধের মতোই ছিল না, বরং পুরোপুরি উন্মাদনাপূর্ণ ছিল। তারা এই জোটকে একটি মজবুত ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করে তাদের নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ গড়ে তুলেছিল।
সত্তর মিলিয়ন জনসংখ্যার একটি জাতির অস্তিত্বকেই বিপন্ন করা , এবং একই সাথে তাদের অংশীদারকে বছরের পর বছর ধরে পদ্ধতিগতভাবে ও চূড়ান্তভাবে এই জোটের মূল ভিত্তিকেই দুর্বল করে দেওয়ার নীতি চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া। এমন একটা দিন আসতেই হতো যখন ভিয়েনার কূটনীতিকদের সাথে একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না । একটি কার্যকর সমর্থন হিসেবে জোটটি নিজেই জার্মানির কাছে হারিয়ে যাবে।

ইতালির ক্ষেত্রে তো একেবারে শুরু থেকেই এমনটা হয়ে আসছে ।

জার্মানির জনগণ যদি জাতিসমূহের ইতিহাস ও মনস্তত্ত্ব আরেকটু মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করত, তবে তাদের কেউই এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্বাস করত না যে কুইরিনাল এবং ভিয়েনা হফবুর্গ একই যুদ্ধক্ষেত্রে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতে পারে। ইতালীয় সরকার যদি হ্যাবসবার্গ রাষ্ট্রের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য একজনও ইতালীয় সৈন্য পাঠানোর সাহস করত , তবে ইতালি আগ্নেয়গিরির মতো ফেটে পড়ত। এই রাষ্ট্রটি এতটাই উন্মত্তভাবে ঘৃণিত ছিল যে, ইতালীয়রা কেবল অস্ট্রিয়ার শত্রু হিসেবেই সম্মুখ সমরে নিজেদের খুঁজে পেত । ভিয়েনায় আমি একাধিকবার সেই অবজ্ঞা ও গভীর ঘৃণার বিস্ফোরণ প্রত্যক্ষ করেছি, যার মাধ্যমে ইতালি অস্ট্রীয় রাষ্ট্রের সাথে "মিত্র" হয়েছিল । শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইতালির স্বাধীনতা ও মুক্তির বিরুদ্ধে হ্যাবসবার্গরা যে অপরাধ করেছিল তা এতটাই গুরুতর ছিল যে , ক্ষমা করার ইচ্ছা থাকলেও তা সম্ভব ছিল না। কিন্তু জনগণের মধ্যে বা সরকারের মধ্যে , কোথাওই এমন ইচ্ছা ছিল না। তাই, ইতালির জন্য অস্ট্রিয়ার সাথে সহাবস্থানের দুটি মাত্র পথ খোলা ছিল : মিত্রতা অথবা যুদ্ধ। প্রথম বিকল্পটি বেছে নেওয়ার মাধ্যমে, দ্বিতীয়টির জন্য ধীরে ধীরে প্রস্তুতি নেওয়া যেত ।

বিশেষ করে যখন রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যকার সম্পর্ক ক্রমশ যুদ্ধের দিকে ঝুঁকে পড়ছিল , তখন জার্মানির জোট নীতি কেবল অর্থহীনই ছিল না, বরং বিপজ্জনকও ছিল। এটি ছিল যৌক্তিক চিন্তাভাবনার অভাবের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ ।

কিন্তু প্রথমত এই জোট গঠনের কারণটা কী ছিল? এর একমাত্র কারণ হতে পারে রাইখের জন্য এমন এক উন্নততর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার আকাঙ্ক্ষা , যা তাকে কেবল নিজস্ব সম্পদের উপর নির্ভর করতে হতো না । কিন্তু রাইখের ভবিষ্যৎ বলতে জার্মান জাতির জীবন-জীবিকা সুরক্ষিত করা ছাড়া আর কিছুই বোঝাতে পারত না।

সুতরাং প্রশ্নগুলো ছিল কেবল এই : অদূর ভবিষ্যতে —অর্থাৎ, আমরা যে সময়কাল অনুমান করতে পারি তার মধ্যে— জাতীয় জীবন কী রূপ নেবে ? এবং ইউরোপের জাতিগুলোর মধ্যে ক্ষমতার সাধারণ বণ্টনের কাঠামোর মধ্যে এই বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় ভিত্তি ও নিরাপত্তা কোন উপায়ে নিশ্চিত করা যেতে পারে ? জার্মান পররাষ্ট্রনীতি যে নীতিগুলোর উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত, তার একটি বিশ্লেষণ নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত করবে: জার্মানিতে বার্ষিক স্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রায় ৯ লক্ষ। এই বিপুল সংখ্যক নতুন নাগরিকের জোগান দেওয়ার অসুবিধা বছর বছর বাড়তেই
থাকবে এবং দুর্দশা ও দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা এড়ানোর জন্য যদি পদ্ধতি ও উপায় খুঁজে না পাওয়া যায়, তবে তা শেষ পর্যন্ত বিপর্যয়ে পর্যবসিত হবে । এই ভয়াবহ বিপর্যয় মোকাবেলা করার চারটি উপায় ছিল :

ফ্রান্সের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে কৃত্রিমভাবে জন্মসংখ্যা সীমিত করার মাধ্যমে অতিরিক্ত জনসংখ্যা প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল ।

বিশেষ পরিস্থিতিতে, দারিদ্র্যের সময়ে বা প্রতিকূল আবহাওয়ায়, কিংবা ফসল খুব কম হলে , প্রকৃতি নিজেই কিছু দেশে ও কিছু জাতির মধ্যে এমন এক পদ্ধতিতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে যা যতটা নির্মম, ততটাই বিচক্ষণ। এটি সরাসরি প্রজনন ক্ষমতাকে বাধা দেয় না ; কিন্তু এটি বংশধরদের এমন সব পরীক্ষা ও বঞ্চনার মধ্যে ফেলে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে বাধা দেয় , যার ফলে যা কিছু কম শক্তিশালী বা কম স্বাস্থ্যবান, তাকে অনন্ত অজানার কোলে ফিরে যেতে হয়। অস্তিত্বের এই কঠিন পরিস্থিতি থেকে যা কিছু টিকে থাকে , তা হাজারবার পরীক্ষিত ও যাচাইকৃত হয়েছে , শক্তিশালী হয়েছে এবং প্রজনন প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়ার জন্য ভালোভাবে খাপ খাইয়ে নিয়েছে; তারপর সেই একই পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্বাচন প্রক্রিয়া আবার ঘটে । ব্যক্তির প্রতি এই ধরনের পাশবিক আচরণ এবং তাকে ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে...

Machine Translated by Google

ঠিক সেই মুহূর্তে যখন এটি জীবনের প্রতিকূলতার সাথে খাপ খাওয়াতে ব্যর্থ হয় , প্রকৃতি তখন কোনো জাতি বা প্রজাতির শক্তি সংরক্ষণ করে এবং তাকে দক্ষতার সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করে।

পরিমাণ হ্রাস করলে ব্যক্তির শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং পরিণামে তা প্রজাতির উদ্দীপনা জোগায়।

তবে, মানুষ যখন সংখ্যা সীমিতকরণের প্রক্রিয়া শুরু করে, তখন পরিস্থিতি ভিন্ন রূপ নেয়। মানুষ প্রকৃতির মতো একই কাঠ দিয়ে গড়া নয়। সে 'মানব' উপাদান দিয়ে তৈরি। সে প্রজ্ঞার নির্মম রানীর চেয়েও বেশি জানে। সে ব্যক্তির আচরণে বাধা দেয় না, বরং প্রজননকেই প্রতিরোধ করে। সেই ব্যক্তির জন্য, যে সর্বদা কেবল নিজেকেই দেখে, জাতিকে নয়, এই কর্মপন্থাটি বিপরীতটির চেয়ে বেশি মানবিক ও ন্যায়সঙ্গত বলে মনে হয় । কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, এর পরিণতিও বিপরীতই হয় ।

প্রজনন প্রক্রিয়াকে অবাধ রেখে এবং প্রাণীদের জীবনের সবচেয়ে কঠিন প্রস্তুতিমূলক পরীক্ষার সম্মুখীন করে প্রকৃতি তার প্রাচুর্য থেকে সেরা প্রাণীদের বেছে নেয় এবং তাদের বেঁচে থাকার ও প্রজাতিকে টিকিয়ে রাখার যোগ্য হিসেবে চিহ্নিত করে । কিন্তু মানুষ প্রজনন ক্ষমতাকে সীমিত করে এবং যেকোনো মূল্যে জীবন টিকিয়ে রাখতে জেদ ধরে চেষ্টা করে ।

যা জন্ম নিয়েছিল । পবিত্র ইচ্ছার এই সংশোধন তার কাছে বিচক্ষণ ও মানবিক বলে মনে হয় , এবং সে আনন্দিত যে সে অন্তত একটি খেলায় প্রকৃতির তাসকে পরাজিত করেছে এবং এভাবে প্রমাণ করেছে যে এটি সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। সর্বশক্তিমান পিতার প্রিয় ছোট্ট বানরটি সংখ্যাগত সীমাবদ্ধতা প্রবর্তন করতে পেরে আনন্দিত , কিন্তু যদি বলা হয় যে এই ব্যবস্থা ব্যক্তির অধঃপতনের দিকে নিয়ে যায় , তবে সে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হবে।

যেইমাত্র প্রজনন ব্যাহত হয় এবং জন্মহার কমে যায় , অস্তিত্বের জন্য যে স্বাভাবিক সংগ্রাম কেবল সুস্থ ও সবলদেরই টিকে থাকতে দেয়, তার জায়গায় যেকোনো উপায়ে দুর্বল এমনকি অসুস্থ প্রাণীদের "বাঁচানোর" এক চরম উন্মাদনা দেখা দেয়।

মূল্য। আর এভাবেই এমন এক মানব বংশধরের বীজ বপন করা হয়, যারা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ক্রমশ দুর্দশাগ্রস্ত হতে থাকবে, যতদিন প্রকৃতির ইচ্ছাকে উপহাস করা হবে।

তবে এই নীতি অনুসরণ করা হলে , তার চূড়ান্ত ফল হবে পৃথিবীতে জাতির অস্তিত্বের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ; যদিও মানুষ কিছু সময়ের জন্য প্রজননের চিরন্তন নিয়মকে অগ্রাহ্য করতে পারে , প্রতিশোধ শীঘ্র বা বিলম্বে আসবেই । শক্তিশালী জাতি দুর্বল হয়ে পড়াদের নির্মূল করবে ; অপরিহার্য প্রয়োজনে, তার চূড়ান্ত রূপে, এটি তথাকথিত মানবসত্তার সমস্ত অযৌক্তিক শৃঙ্খল ভেঙে ফেলবে এবং সেগুলোকে প্রকৃতির মানবসত্তা দিয়ে প্রতিস্থাপন করবে, যা সবলদের জন্য জায়গা করে দিতে দুর্বলদের নির্মূল করে ।

যে কোনো নীতি যা জন্মহার সীমিত করার মাধ্যমে কোনো জাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লক্ষ্য রাখে, তা সেই জাতিকে তার ভবিষ্যৎ থেকে বঞ্চিত করে।

২. দ্বিতীয় সমাধানটি হলো অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ স্থাপন। এই প্রস্তাবটি আমাদের সময়ে প্রায়শই পুনরাবৃত্তি করা হয় এবং একটি ভালো সমাধান হিসেবে প্রশংসিত হয়। এই পরামর্শটি সদিচ্ছা নিয়েই দেওয়া হয়, কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই এটি ভুল বোঝে , ফলে এটি কল্পনার চেয়েও বেশি ক্ষতি করতে পারে।

এটা সত্যি যে জমির উৎপাদনশীলতা একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বাড়ানো যেতে পারে ; কিন্তু তা কেবল একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই, অনির্দিষ্টকালের জন্য নয়। জমির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর মাধ্যমে কিছু সময়ের জন্য অতিরিক্ত জন্মসংখ্যার প্রভাবকে সমান করা সম্ভব হবে।
অনাহারের আশঙ্কা ছাড়াই সময় । কিন্তু আমাদের এই বাস্তবতা মেনে নিতে হবে যে, জন্মহারের চেয়েও দ্রুতগতিতে জীবনযাত্রার সাধারণ মান বাড়ছে । খাদ্য ও বস্ত্রের চাহিদা বেড়েই চলেছে।
বছর বছর ধরে জনসংখ্যা বাড়ছে এবং তা, ধরা যাক, একশ বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষদের যা ছিল তার তুলনায় অসামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই এটা বিশ্বাস করা ভুল হবে যে পৃথিবীর উৎপাদন ক্ষমতার প্রতিটি বৃদ্ধি জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হয়। না। এটা কেবল একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত সত্য, কারণ বর্ধিত উৎপাদনের অন্তত একটি অংশ জীবনযাত্রার মানের ক্রমাগত বৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট চাহিদা মেটাতে ব্যবহৃত হবে । কিন্তু এমনকি যদি এই চাহিদাগুলো

সর্বনিম্ন সম্ভাব্য সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে এবং একই সাথে চাষাবাদ নিবিড় করার জন্য সমস্ত উপলব্ধ শক্তি ব্যবহার করলেও, আমরা পৃথিবীর অন্তর্নিহিত প্রকৃতি দ্বারা নির্ধারিত একটি নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছাব । আমরা যতই পরিশ্রম করি না কেন, উৎপাদন বাড়াতে পারব না ।

Machine Translated by Google

এই সীমার বাইরে কৃষি । সুতরাং, যদিও আমরা কারও কারও জন্য দুঃখের সেই দুঃসময়কে বিলম্বিত করতে পারি অবশেষে সেই সময় আসবে । এর প্রথম লক্ষণ হবে সময়ে সময়ে দুর্ভিক্ষের পুনরাবৃত্তি, যা খারাপ ফসল ইত্যাদির কারণে ঘটবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এই দুর্ভিক্ষগুলোর মধ্যবর্তী ব্যবধান ক্রমশ কমতে থাকবে ; এবং অবশেষে দুর্ভিক্ষ কেবল সেই বিরল প্রাচুর্যের বছরগুলোতে অদৃশ্য হবে, যখন শস্যভাণ্ডারগুলো পূর্ণ থাকবে । এবং অবশেষে এমন এক সময় আসবে যখন এই প্রাচুর্যের বছরগুলোতেও সকলের জন্য যথেষ্ট থাকবে না; এবং দুর্ভিক্ষ জাতিকে ছাড়বে না। তখন প্রকৃতিকে আবার হস্তক্ষেপ করতে হবে এবং যারা টিকে থাকতে পারে তাদের বেছে নিতে হবে , নতুবা মানুষ কৃত্রিমভাবে তার সংখ্যাবৃদ্ধি সীমিত করতে শুরু করবে , যার ফলস্বরূপ জাতি ও প্রজাতির জন্য সেই সমস্ত ভয়াবহ পরিণতি ঘটবে যা ইতোমধ্যেই আলোচনা করা হয়েছে।

এর বিরোধিতা করে বলা যেতে পারে যে, কোনো না কোনো রূপে এই ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে সমগ্র মানবজাতি এবং কোনো একক জাতি বা গোষ্ঠী এই নিয়তি থেকে পালাতে পারে না।

প্রথম দৃষ্টিতে এই আপত্তিটি যৌক্তিক বলে মনে হয় ; কিন্তু আমাদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে : এমন একটি দিন অবশ্যই আসবে যখন সমগ্র

মানবজাতি মানব প্রজাতির বৃদ্ধি সীমিত করতে বাধ্য হবে , কারণ জনসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধির সাথে পৃথিবীর উৎপাদনশীলতাকে সামঞ্জস্য করার আর কোনো সম্ভাবনা থাকবে না । প্রকৃতিকে তার নিজস্ব পদ্ধতি ব্যবহার করার সুযোগ দিতে হবে , অথবা মানুষ আজ আমাদের হাতে থাকা উপায়ের চেয়ে উন্নততর উপায় ব্যবহার করে এই নিয়ন্ত্রণের কাজটি নিজের হাতে তুলে নেবে এবং প্রয়োজনীয় ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করবে। কিন্তু তখন এটি হবে সমগ্র মানবজাতির সমস্যা, অথচ বর্তমানে কেবল সেই জাতিগুলোকেই ভোগান্তি পোহাতে হয় যাদের নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট জমি অর্জনের শক্তি ও সাহস নেই। বর্তমানে, সমগ্র পৃথিবীর পৃষ্ঠ জুড়ে বিশাল এলাকা এখনও অনাবাদী পড়ে আছে । এই অঞ্চলগুলো কেবল লাঙলের ফলার জন্য অপেক্ষা করছে। এবং এটা নিশ্চিত যে প্রকৃতি এই ভূমিগুলোকে কোনো একটি জাতি বা গোষ্ঠীর একচেটিয়া ব্যবহারের জন্য চারণভূমি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবে না, কিংবা ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষিত সম্পদ হিসেবেও অব্যবহৃত রেখে যাবে না। এই ধরনের ভূমিগুলো সেইসব মানুষের জন্য অপেক্ষা করছে যাদের এগুলো দখল করার শক্তি এবং চাষ করার পরিশ্রম আছে ।

প্রকৃতির কোনো রাজনৈতিক সীমানা নেই। এই গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই তার সূচনা হয়েছিল এবং সে শক্তির অবাধ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে। যারা সর্বাধিক সাহস ও অধ্যবসায় প্রদর্শন করে, তারাই তার হৃদয়ের সবচেয়ে কাছের সন্তান এবং অস্তিত্বের সর্বোচ্চ অধিকার দিয়ে পুরস্কৃত হবে ।

যদি কোনো জাতি কেবল 'অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ স্থাপনে' নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখে, আর অন্যদিকে অন্যান্য জাতিরা বিশ্বজুড়ে ক্রমাগত তাদের ভূখণ্ড দখল করে চলতে থাকে , তবে সেই জাতি তার জনসংখ্যা বৃদ্ধি সীমিত করতে বাধ্য হবে , যখন অন্যান্য জাতিরা তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করবে । এই পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত ঘটতেই হবে। যদি জাতিটির হাতে থাকা ভূখণ্ড ছোট হয়, তবে এটি দ্রুত ঘটবে। দুর্ভাগ্যবশত এটা সত্যি যে , প্রায়শই সেরা জাতিগুলো—অথবা আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, একমাত্র প্রকৃত সংস্কৃতিবান জাতিগুলো যারা মানব প্রগতিরও ধারক — তাদের অন্ধ শান্তিবাদে নতুন ভূখণ্ড অধিগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নেয় এবং 'অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ স্থাপন' নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে । কিন্তু একই সময়ে, নিকৃষ্ট জাতিগুলো বিশ্বজুড়ে বিশাল উপনিবেশিক ভূখণ্ড দখল করতে সফল হয় ।

এই বৈপরীত্যের ফলে যে পরিস্থিতি অবশ্যই উদ্ভূত হবে তা নিম্নরূপ:

সাংস্কৃতিকভাবে উন্নত কিন্তু কম নিষ্ঠুর জাতিগুলো তাদের জনসংখ্যা ধারণের জন্য অপর্যাপ্ত ভূখণ্ডের কারণে নিজেদের বৃদ্ধি সীমিত করতে বাধ্য হবে , অপরদিকে কম সভ্য জাতিগুলো তাদের হাতে থাকা বিশাল ভূখণ্ডের কল্যাণে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিস্তার লাভ করতে পারবে । অন্য কথায়, যদি এই অবস্থা চলতে থাকে, তবে একদিন বিশ্ব মানবজাতির সেই অংশের দ্বারা শাসিত হবে যারা সাংস্কৃতিকভাবে নিকৃষ্ট কিন্তু অধিক সক্রিয় ও উদ্যমী।

এমন এক সময় আসবে, যদিও তা সুদূর ভবিষ্যতে, যখন কেবল দুটি বিকল্পই অবশিষ্ট থাকবে। হয় বিশ্ব আমাদের গণতন্ত্রের আধুনিক ধারণা অনুযায়ী শাসিত হবে , সেক্ষেত্রে প্রতিটি সিদ্ধান্ত সংখ্যায় শক্তিশালী জাতিগুলোর অনুকূলে নেওয়া হবে ; অথবা বিশ্ব ক্ষমতার প্রাকৃতিক বণ্টনের নিয়ম অনুসারে শাসিত হবে , সেক্ষেত্রে কৃচ্ছ্রসাধনকারী জাতিগুলো নয়, বরং অধিকতর নৃশংস জাতিগুলোই বিজয়ী হবে ।

Machine Translated by Google

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, একদিন এই পৃথিবী মানবজাতির একাংশের অস্তিত্ব রক্ষার এক ভয়াবহ সংগ্রামের ময়দানে পরিণত হবে। পরিশেষে , আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিই জয়ী হবে । এই লাগামহীন আগুনের সামনে, তথাকথিত মানবতাবাদ— যা নির্বোধ ভীরুতা ও ঔদ্ধত্যের মিশ্রণ ছাড়া আর কিছুই নয়— মার্চ মাসের বরফের মতো গলে যাবে । মানুষ নিরন্তর সংগ্রামের মাধ্যমেই মহান হয়েছে। চিরস্থায়ী শান্তিতে তার মহত্ত্বের পতন অবশ্যম্ভাবী।

আমাদের জার্মানদের জন্য "অভ্যন্তরীণ উপনিবেশায়ন" স্লোগানটি একটি বিপর্যয়, কারণ এটি আমাদেরকে এই বিশ্বাস করতে উৎসাহিত করে যে আমরা এমন একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছি যা আমাদের সহজাত শান্তিবাদিতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যা আমাদেরকে এক প্রায়-নিষ্ক্রিয় অস্তিত্বে জীবিকা নির্বাহ করতে দেবে। এই ধরনের শিক্ষা যদি জাতি গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে , তবে বিশ্বে আমাদের প্রাপ্য স্থান অর্জনের সমস্ত প্রচেষ্টার অবসান ঘটবে । যদি সাধারণ জার্মান এই বিশ্বাসে অটল থাকে যে তার জীবিকা সুরক্ষিত করার এবং তার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার সুযোগ আছে , তবে তার দেশের গুরুত্বপূর্ণ দাবিগুলো রক্ষায় সক্রিয় ও কার্যকর ভূমিকা পালনের যেকোনো প্রচেষ্টাই অসম্ভব হয়ে পড়বে । যদি জাতি এই ধরনের মনোভাব গ্রহণ করে, তবে জার্মান জাতির ভবিষ্যতের সমস্ত আশার সাথে যেকোনো সত্যিকারের কার্যকর পররাষ্ট্রনীতিকেও মৃত ও সমাধিস্থ বলে গণ্য করা যেতে পারে ।

এখন যেহেতু আমরা এই 'অভ্যন্তরীণ উপনিবেশায়ন' তত্ত্বের পরিণতি সম্পর্কে জানি, তাই এটাকে আর কাকতালীয় বলে মনে করা যায় না যে, যারা আমাদের জনগণের মধ্যে এই ক্ষতিকর চিন্তাধারা ঢুকিয়ে দেয়, তাদের মধ্যে ইহুদিরাই সবসময় অগ্রভাগে থাকে। ইহুদিরা এই কাপুরুষদের এত ভালো করেই চেনে যে তারা জানে যে, এরা যেকোনো প্রতারণার কৃতজ্ঞ শিকার হতে প্রস্তুত, যদি সেই প্রতারণা এমন কোনো আবিষ্কারের প্রতিশ্রুতি দেয় যা তাদেরকে প্রকৃতিকে বোকা বানাতে সক্ষম করবে এবং এর ফলে বেঁচে থাকার কঠিন ও নিরলস সংগ্রামকে অপ্রয়োজনীয় করে তুলবে ; যাতে শেষ পর্যন্ত তারা পরিস্থিতি অনুযায়ী আংশিকভাবে কাজ করে এবং আংশিকভাবে কিছুই না করে এই গ্রহের শাসক হয়ে উঠতে পারে।

এই বিষয়টির উপর অত্যন্ত জোর দেওয়া প্রয়োজন যে, যেকোনো জার্মান "অভ্যন্তরীণ উপনিবেশায়ন"-কে শুধুমাত্র সামাজিক অন্যায় দূর করার উদ্দেশ্যেই উপযুক্ত বলে গণ্য করতে হবে।
অভ্যন্তরীণ উপনিবেশায়ন ব্যবস্থায় , সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক পদক্ষেপ হবে ভূমিকে ফাটকাবাজদের হাত থেকে মুক্ত করা এবং এই স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। কিন্তু নতুন ভূখণ্ড অধিগ্রহণ ছাড়া জাতির ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্য এই ধরনের ব্যবস্থা কখনোই যথেষ্ট হবে না ।

যদি আমরা অন্য কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করি, তাহলে আমরা দ্রুত এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যাব যেখান থেকে আমাদের পৃথিবীর সম্পদ আর ব্যবহার করা যাবে না এবং একই সাথে আমরা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছাব যেখান থেকে আমাদের মানবশক্তিরও আর বিকাশ ঘটবে না।

সারসংক্ষেপে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলো উল্লেখ করা আবশ্যক :

অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ স্থাপনের ক্ষেত্রে অনিবার্য একটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র এলাকায় সীমাবদ্ধতা , এবং সেইসাথে প্রজনন সীমিত করার মাধ্যমে অর্জিত একই পরিণতি —এই দুটি বিষয় একটি জাতির সামরিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের উপর অত্যন্ত প্রতিকূল প্রভাব ফেলে।

একটি রাষ্ট্রের বাহ্যিক নিরাপত্তা নির্ধারণে তার ভূখণ্ডের আকার একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক । কোনো দেশের ভূখণ্ড যত বড় হয়, তার প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও তত শক্তিশালী হয়। বিশাল ভূখণ্ডবিশিষ্ট রাষ্ট্রের তুলনায় সীমিত এলাকা জুড়ে থাকা দেশগুলোর বিরুদ্ধে সামরিক সিদ্ধান্তগুলো আরও দ্রুত, সহজে, কার্যকরভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে নেওয়া হয়। অধিকন্তু , একটি দেশের ভূখণ্ডের আকার নিজেই একটি নিশ্চিত নিশ্চয়তা দেয় যে, কোনো বহিরাগত শক্তি দ্রুত আক্রমণের ঝুঁকি নেবে না; কারণ সেক্ষেত্রে সংগ্রামটি এতটাই দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর হতে পারে যে বিজয়ের আশা করা যায় না । ঝুঁকিটি অনেক বেশি হবে , তাই এই ধরনের আগ্রাসনের জন্য অবশ্যই অসাধারণ কারণ থাকতে হবে। সুতরাং, একটি রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের আকার এমন একটি ভিত্তি তৈরি করে যার উপর ভিত্তি করে দেশটির স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য তুলনামূলকভাবে সহজে বজায় রাখা যায় ; অপরদিকে , যে রাষ্ট্রের ভূখণ্ড ছোট, তা স্বাভাবিকভাবেই আক্রমণকারীদের প্রলুব্ধ করে।

মূলত, জার্মান রাইখের তথাকথিত জাতীয়তাবাদী মহল স্থির জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং আনুপাতিকভাবে সম্প্রসারণ-অযোগ্য ভূখণ্ডের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার প্রথম দুটি সম্ভাবনা প্রত্যাখ্যান করেছিল । কিন্তু এই প্রত্যাখ্যানের কারণগুলো আমি যা উপস্থাপন করেছি তার থেকে ভিন্ন ছিল। তারা জন্মহার সীমিত করার বিরোধিতা করেছিল।

Machine Translated by Google

মূলত নৈতিক কারণে। অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ স্থাপনের প্রস্তাবগুলো তীব্র ক্ষোভের সাথে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল, কারণ সন্দেহ করা হয়েছিল যে এই ধরনের নীতি বড় ভূস্বামীদের উপর আক্রমণের শামিল হতে পারে এবং এই আক্রমণ ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর একটি সাধারণ আক্রমণের পূর্বাভাস দিতে পারে । দ্বিতীয় সমাধান — অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ স্থাপন —যে রূপে উপস্থাপন করা হয়েছিল, তা বড় ভূস্বামীদের আশঙ্কাকে যথার্থ প্রমাণ করেছিল।

কিন্তু উপনিবেশ স্থাপনের প্রস্তাবটি যে পদ্ধতিতে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল, তা সাধারণ মানুষের উপর যে প্রভাব ফেলতে পারে সেদিক থেকে খুব একটা বিচক্ষণ ছিল না, এবং যাই হোক, এটি সমস্যার মূলে আদৌ পৌঁছায়নি ।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য কাজ ও জীবিকা নিশ্চিত করার মাত্র দুটি পথ খোলা ছিল ।

৩. এমন একটি নতুন ভূখণ্ড জয় করার কথা ভাবা সম্ভব ছিল যার কোনো এক অংশে গাছপালা জন্মায়-
ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা প্রতি বছর বসতি স্থাপন করতে পারত ; অথবা

৪. আমাদের শিল্প ও বাণিজ্যকে এমনভাবে সংগঠিত করা যেতে পারে, যার মাধ্যমে রপ্তানি বৃদ্ধি নিশ্চিত করা যাবে এবং বৈদেশিক বাজার থেকে অর্জিত মুনাফার দ্বারা জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়িয়ে তাদের সহায়তা করা যাবে।

এতে একটি উভয়সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছিল: ভূখণ্ড সম্প্রসারণের নীতি, নাকি ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্য নীতি। এই উভয় নীতিই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচিত, বিতর্কিত, সুপারিশকৃত এবং প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল; পরিশেষে , দ্বিতীয় বিকল্পটিই গৃহীত হয় । তবে, প্রথমটিই নিঃসন্দেহে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ছিল।

অতিরিক্ত জনসংখ্যার বসতি স্থাপনের জন্য নতুন ভূখণ্ড অধিগ্রহণের নীতিটির অনেক সুবিধা ছিল, বিশেষ করে যদি আমরা শুধু বর্তমান নয় , ভবিষ্যতের কথাও বিবেচনা করি।

প্রথমত, জাতীয় সমাজের ভিত্তি হিসেবে একটি সুস্থ কৃষক সমাজকে টিকিয়ে রাখবে এমন নীতি গ্রহণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে কোনোভাবেই উপেক্ষা করা যায় না। আমাদের বর্তমান দুর্দশার বেশিরভাগই শুধুমাত্র শহুরে ও গ্রামীণ জনসংখ্যার বৈষম্য থেকে উদ্ভূত । ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের কৃষকদের একটি নির্ভরযোগ্য জোগানই আজকের প্রচলিত সামাজিক ব্যাধিগুলোর বিরুদ্ধে সর্বদা সর্বোত্তম সুরক্ষা । অধিকন্তু , এটিই একমাত্র সমাধান যা দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির মধ্যে জাতির দৈনন্দিন খাদ্যের জোগান নিশ্চিত করে । যদি এই শর্ত পূরণ হয়, তবে শিল্প ও বাণিজ্য তাদের বর্তমান প্রাথমিক গুরুত্বের অস্বাস্থ্যকর অবস্থান থেকে সরে আসবে এবং জাতীয় অর্থনীতির সামগ্রিক কাঠামোতে তাদের সঠিক স্থান গ্রহণ করবে , যা সরবরাহ ও চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করবে। এইভাবে , শিল্প ও বাণিজ্য আর জাতির টিকে থাকার ভিত্তি থাকবে না , বরং সহায়ক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে । তাদের সঠিক কাজ, অর্থাৎ জাতীয় উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে ভারসাম্য নিশ্চিত করার মাধ্যমে , তারা নিশ্চিত করে...

বিদেশী রাষ্ট্রসমূহ থেকে কমবেশি স্বাধীনতা অর্জন এবং এর মাধ্যমে জাতির মুক্তি ও স্বাতন্ত্র্য নিশ্চিত করা , বিশেষ করে এর ইতিহাসের সংকটময় সন্ধিক্ষণে ।

এই ধরনের ভূখণ্ডগত নীতি ক্যামেরুনে অনুসরণ করা যায় না, বরং প্রায় একচেটিয়াভাবে এখানেই, ইউরোপে, তা করা সম্ভব। আমাদের অবশ্যই শান্তভাবে ও সততার সাথে সত্যের মুখোমুখি হতে হবে – অবশ্যই
ঈশ্বরের বিধানে এটা হতে পারে না যে , এক জাতির কাছে অন্য জাতির চেয়ে পঞ্চাশ গুণ বেশি ভূমি থাকবে । বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে , কঠোর ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে যা থাকা উচিত, তা থেকে বিদ্যমান রাজনৈতিক সীমানাকে বিচ্যুত হতে দেওয়া উচিত নয় । পৃথিবীতে যদি প্রত্যেকের জন্য যথেষ্ট জায়গা থাকে, তবে আমাদের অস্তিত্বের জন্য যতটুকু একান্তই প্রয়োজন, ততটুকুই আমাদের থাকা উচিত।

অবশ্যই, মানুষ স্বেচ্ছায় মেনে নেবে না । এখানেই প্রশ্নটি আসে।
আত্মরক্ষার অধিকার। এবং যখন বন্ধুত্বপূর্ণভাবে সমস্যা সমাধানের সমস্ত প্রচেষ্টা প্রত্যাখ্যাত হয়, তখন মুষ্টিবদ্ধ হাতই বন্ধুত্বের উন্মুক্ত হাতের কাছে সেই জিনিসটি ছিনিয়ে নেবে যা অস্বীকার করা হয়েছিল। যদি অতীতে আমাদের পূর্বপুরুষেরা অনুরূপ বিষয়ের উপর ভিত্তি করে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন

Machine Translated by Google

আমাদের প্রজন্মের মতো শান্তিবাদী আজেবাজে কথা বললে, আমাদের একের বেশি থাকত না ।

আজ আমাদের যে ভূখণ্ড আছে, তার এক-তৃতীয়াংশ হলে সম্ভবত এমন কোনো জার্মান জাতিই থাকত না, যাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ইউরোপে আমাদের দুশ্চিন্তা করতে হতো। না। রাইখের দুটি পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্ত আমরা পেয়েছি আমাদের পূর্বপুরুষদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে তাদের সহজাত দৃঢ়সংকল্পের কারণে, এবং সেই একই অটল নীতির কারণেই আমরা আমাদের [৮)] রাজনৈতিক ও জাতিগত ভূখণ্ডের আকারের ওপর ভিত্তি করে যে অভ্যন্তরীণ শক্তি অর্জন করেছি, তা আজ পর্যন্ত আমাদের অস্তিত্বকে সম্ভব করে তুলেছে।

এই সমাধানটি সঠিক হওয়ার আরও একটি কারণ আছে : অনেক আধুনিক ইউরোপীয়
রাষ্ট্রকে তাদের চূড়ার উপর দাঁড়িয়ে থাকা পিরামিডের মতো দেখায়। তাদের উপনিবেশ, বৈদেশিক বাণিজ্য ইত্যাদির বিশাল ভারের তুলনায় ইউরোপে এই রাষ্ট্রগুলোর অধিকৃত ভূখণ্ড হাস্যকরভাবে ছোট। বলা যেতে পারে যে তাদের

ইউরোপে চূড়া এবং বিশ্বজুড়ে পিরামিডের ভিত্তি ; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন , যার ভিত্তি আমেরিকান মহাদেশে এবং বাকি বিশ্বের সাথে যার যোগাযোগ রয়েছে।
বিশ্বকে কেবল তার শীর্ষস্থানের মাধ্যমেই দেখা যায়। এই পরিস্থিতির ফলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অতুলনীয় অভ্যন্তরীণ শক্তি অর্জিত হয়েছে, এবং অধিকাংশ ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তির দুর্বলতার জন্য এর বিপরীত পরিস্থিতিই দায়ী।

এই দাবির বিরুদ্ধে যুক্তি হিসেবে ইংল্যান্ডকে ব্যবহার করা যায় না, যদিও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মানচিত্রের দিকে তাকালে সমগ্র অ্যাংলো-স্যাক্সন বিশ্বের অস্তিত্ব সহজেই চোখ এড়িয়ে যেতে পারে । ইংল্যান্ডের অবস্থানকে ইউরোপের অন্য কোনো দেশের সঙ্গে তুলনা করা যায় না, কারণ...
এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ভাষা ও সংস্কৃতির একটি বিশাল সম্প্রদায় গঠন করে।

সুতরাং, জার্মানির পক্ষে একটি বিচক্ষণ ভূখণ্ডগত নীতি বাস্তবায়নের একমাত্র উপায় হলো খোদ ইউরোপের মধ্যেই নতুন ভূখণ্ড অধিগ্রহণ করা। উপনিবেশগুলো এই উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক হতে পারে না।
এই কারণে যে, এগুলো ইউরোপীয়দের দ্বারা বৃহৎ পরিসরে বসতি স্থাপনের জন্য উপযুক্ত নয় । ঊনবিংশ শতাব্দীতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে এই ধরনের উপনিবেশ অধিগ্রহণ করা আর সম্ভব ছিল না ।
সুতরাং , উপনিবেশ সম্প্রসারণের যেকোনো প্রচেষ্টার অর্থই হতো এক ব্যাপক সংগ্রাম। ফলস্বরূপ, বিদেশে ভূখণ্ড অধিগ্রহণের জন্য যুদ্ধ করার চেয়ে ইউরোপের অভ্যন্তরে নতুন অঞ্চলের জন্য লড়াই করাই অধিকতর বাস্তবসম্মত ছিল ।

* * *

এই ধরনের সিদ্ধান্তের জন্য নিঃসন্দেহে জাতির অবিভক্ত শক্তির উৎসর্গ প্রয়োজন। এ ধরনের একটি নীতি, যা বাস্তবায়নের জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে হয়, তা হতে পারে না ...
অসম্পূর্ণভাবে বা সিদ্ধান্তহীনভাবে তা সম্পন্ন করা । জার্মান রাইখের রাজনৈতিক নেতৃত্বের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত এই কাজটি এবং তা সম্পাদনের উপায় ব্যতীত অন্য কোনো রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত নয়। জার্মানদের এই বিষয়ে সচেতন থাকা উচিত যে , এই ধরনের লক্ষ্য কেবল যুদ্ধের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব , এবং যুদ্ধের সম্ভাবনাকে ঠান্ডা মাথায় ও স্থির সংকল্পের সাথে মোকাবেলা করা উচিত ।

সমগ্র জোট ব্যবস্থাটিকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন করা উচিত।
ইউরোপে যদি নতুন ভূখণ্ড অধিগ্রহণ করতে হতো, তবে তা প্রধানত রাশিয়ার বিনিময়েই করতে হতো, এবং নতুন জার্মান রাইখকে আবারও সেই একই পথ অনুসরণ করতে হয়েছিল যা পূর্বে টিউটোনিক নাইটরা অনুসরণ করেছিল — এবার জার্মান তরবারি দিয়ে জার্মান লাঙলের জন্য ভূমি জয় করে জাতির দৈনন্দিন খাদ্যের জোগান দেওয়া।

তবে, এই ধরনের নীতির জন্য ইউরোপে কেবল একজনই সম্ভাব্য মিত্র ছিল। সেটি ছিল অ্যান-
গ্লিয়া।

কেবলমাত্র ইংল্যান্ডের সঙ্গে মিত্রতা করেই নতুন জার্মান ধর্মযুদ্ধের পশ্চাৎভাগ সুরক্ষিত করা সম্ভব ছিল। এই ধরনের একটি অভিযান পরিচালনার যৌক্তিকতা আমাদের পূর্বপুরুষদের অভিযানের সময়ের চেয়েও শক্তিশালী ছিল। আমাদের শান্তিবাদীদের মধ্যে একজনও প্রাচ্যে উৎপাদিত শস্য দিয়ে তৈরি রুটি খেতে অস্বীকার করেন না, যদিও প্রথম লাঙলকে 'তরবারি' বলা হতো।

Machine Translated by Google

ইংল্যান্ডের বন্ধুত্ব অর্জনের জন্য প্রয়োজনে কোনো ত্যাগকেই অতি বড় বলে মনে করা উচিত নয় । ঔপনিবেশিক ও সামুদ্রিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিহার করা উচিত এবং ব্রিটিশ শিল্পের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কোনো চেষ্টা করা উচিত নয়।

শুধুমাত্র একটি সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত নীতিই এমন সাফল্য এনে দিতে পারে । এই ধরনের নীতিতে বিশ্ববাজার জয়ের আকাঙ্ক্ষা পরিহার করা উচিত এবং সেইসাথে বর্জন করা উচিত।
ঔপনিবেশিক উদ্দেশ্য এবং নৌ শক্তি । রাষ্ট্রের হাতে থাকা সমস্ত সম্পদ স্থল বাহিনীতে কেন্দ্রীভূত করা উচিত। এই নীতির জন্য এক মহান ও শক্তিশালী ভবিষ্যতের স্বার্থে কিছু সময়ের জন্য সাময়িক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে ।

একটা সময় ছিল যখন ইংল্যান্ড এই প্রস্তাবটি নিয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে পারত।
ইংল্যান্ড ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিল যে জনসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট সমস্যাগুলো বাধ্য করেছিল জার্মানিকে হয় ইংল্যান্ডের সাহায্যে ইউরোপে , অথবা তার সাহায্য ছাড়াই বিশ্বের অন্য কোনো অংশে সমাধান খুঁজতে হবে ।

সম্ভবত এই দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল প্রধান কারণ, যার জন্য শতাব্দীর শুরুতে লন্ডন জার্মানির কাছাকাছি আসার চেষ্টা করেছিল । জার্মানিতে প্রথমবারের মতো,
এমন একটি মনোভাব যা পরবর্তীকালে সবচেয়ে মর্মান্তিক রূপে প্রকাশ পেয়েছিল । লোকেরা এক অপ্রীতিকর অনুভূতি প্রকাশ করেছিল যে, আমাদের হয়তো ইংরেজদের বিপদ থেকে উদ্ধার করতে বাধ্য করা হবে। যেন পারস্পরিক ছাড় ছাড়া অন্য কিছুর উপর ভিত্তি করে কোনো মৈত্রী হতে পারে ! আর ইংল্যান্ড এমন একটি পারস্পরিক চুক্তিতে অংশীদার হয়ে উঠবে । ব্রিটিশ কূটনীতিকরা এটা বোঝার মতো যথেষ্ট বিচক্ষণ ছিলেন যে, কোনো কিছুই বিনামূল্যে আসে না।

ধরা যাক , ১৯০৪ সালে আমাদের জার্মান পররাষ্ট্রনীতি এতটাই বিচক্ষণতার সাথে পরিচালিত হয়েছিল যে আমরা জাপানের অবস্থানে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছিলাম । এটি পরিমাপ করা সহজ নয়।
এই ধরনের নীতির ফলে জার্মানির জন্য যে পরিণতি হতে পারে তার মাত্রা ।
কোনো বিশ্বযুদ্ধ হতো না । ১৯০৪ সালের রক্তপাতও ঘটত না।
১৯১৪-১৯১৮ সালে যা ঢালা হয়েছিল, তার দশ ভাগের এক ভাগ । আর আজকের বিশ্বে জার্মানির অবস্থান কী হতো?

যাইহোক , অস্ট্রিয়ার সাথে জোটটি অযৌক্তিক ছিল।
এই মৃতপ্রায় রাষ্ট্রটি জার্মানির সাথে যুদ্ধ করার জন্য নয়, বরং এক চিরস্থায়ী শান্তি বজায় রাখার জন্য একত্রিত হয়েছিল , যা দ্বৈত রাজতন্ত্রে জার্মান উপাদানকে ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হওয়ার কথা ছিল।

এই জোটের ব্যর্থতার আরেকটি কারণ ছিল যে, কেউই প্রত্যাশা করতে পারছিল না।
এমন একটি রাষ্ট্রের হাত থেকে জার্মানির জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়া, যে রাষ্ট্রের নিজের সীমানার মধ্যে জার্মান-বিবর্জনের নীতি ব্যাহত করার মতো শক্তি বা সংকল্প ছিল না। যদি একই জার্মান জাতির এক কোটি বাসিন্দার ভাগ্য নির্ধারণের অধিকার থেকে এই অযৌক্তিক হ্যাবসবার্গ রাষ্ট্রকে বঞ্চিত করার মতো যথেষ্ট জাতীয় চেতনা এবং নির্মম সংকল্প জার্মানির না থাকে , তবে এটা আশা করা যায় না যে হ্যাবসবার্গ রাষ্ট্র জার্মানির কোনো মহান ও সাহসী উদ্যোগে অংশ নেবে । অস্ট্রিয়া প্রশ্নের প্রতি পুরাতন রাইখের মনোভাবকে এমন একটি লড়াইয়ে তার সহনশীলতার পরীক্ষা হিসেবে দেখা যেতে পারে , যেখানে সমগ্র জাতির ভাগ্য ঝুঁকির মধ্যে ছিল ।

যাই হোক, অস্ট্রিয়ায় জার্মান জনগোষ্ঠীর ওপর দমনমূলক নীতিকে বছর বছর আরও শক্তিশালী হতে দেওয়া অসম্ভব ছিল; কারণ মিত্র হিসেবে অস্ট্রিয়ার গুরুত্ব কেবল সেখানে জার্মান জনগোষ্ঠীকে বজায় রাখার মাধ্যমেই নিশ্চিত করা যেত। কিন্তু কেউই এই পথ অনুসরণ করেনি।

সশস্ত্র সংঘাতের সম্ভাবনার চেয়ে ভয়াবহ আর কিছুই ছিল না ; কিন্তু অবশেষে, সবচেয়ে প্রতিকূল মুহূর্তে, সেই সংঘাতের মুখোমুখি হতে এবং তা মেনে নিতেই হতো।
তারা তাদের নিয়তি থেকে পালাতে চেয়েছিল, কিন্তু নিয়তি তাদের ধরে ফেলল। তারা
বিশ্বশান্তি বজায় রাখার স্বপ্ন দেখেছিল এবং জেগে উঠল এক বিশ্বযুদ্ধের মাঝে ।
শান্তির এই স্বপ্নই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ, যার জন্য জার্মানির ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য উপরে উল্লিখিত তৃতীয় সম্ভাবনাটিকে একেবারেই আমলে নেওয়া হয়নি। এটা বোঝা গিয়েছিল যে নতুন ভূখণ্ড কেবল পূর্বেই অধিগ্রহণ করা সম্ভব; কিন্তু এর অর্থ ছিল যে

Machine Translated by Google

যুদ্ধ, অথচ যেকোনো মূল্যে শান্তি বজায় রাখতে চাওয়া। জার্মান পররাষ্ট্রনীতির স্লোগান একসময় ছিল: জার্মান জাতিকে রক্ষা করার জন্য সম্ভাব্য সকল উপায় ব্যবহার করা। এখন তা পরিবর্তন করে করা হয়েছে: যেকোনো মূল্যে বিশ্ব শান্তি রক্ষা করা।

এর ফলাফল কী হয়েছিল তা আমরা জানি। আমি পরে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

আরও একটি সম্ভাবনা ছিল, যাকে আমরা চতুর্থ বলতে পারি। সেটি হলো: শিল্প।
এবং বিশ্ব বাণিজ্য, নৌ শক্তি ও উপনিবেশ।

শুরুতে এই ধরনের উন্নয়ন হয়তো আরও দ্রুত এবং সহজে অর্জন করা যেত। কোনো ভূখণ্ডে উপনিবেশ স্থাপন একটি ধীর প্রক্রিয়া, যা প্রায়শই শত শত বছর সময় নেয়। তবে, এটাই এর অভ্যন্তরীণ শক্তির উৎস, কারণ এটি কোনো আকস্মিক উৎসাহের বিস্ফোরণের উপর নির্ভর করে না, বরং একটি ধীর ও টেকসই বিকাশের প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে, যা শিল্পোন্নতির থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, কারণ শিল্পোন্নতি কয়েক বছরের মধ্যেই ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তোলা যায়। তবে, এইভাবে অর্জিত ফল স্থায়ী কিছু নয়, বরং সাবানের বুদবুদের মতো ভঙ্গুর। কোনো ভূখণ্ডে কৃষক বসতি স্থাপন এবং খামার প্রতিষ্ঠার কঠিন কাজটি করার চেয়ে দ্রুত কিছু তৈরি করা অনেক সহজ। কিন্তু শেষেরটির চেয়ে প্রথমটি ধ্বংস করাও অনেক সহজ।

এই পথ অবলম্বন করার মাধ্যমে জার্মানি নিশ্চয়ই জানত যে এর অর্থ অনিবার্য যুদ্ধ।
আজ হোক বা কাল হোক। কেবল শিশুরাই বিশ্বাস করতে পারে যে, শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যের অবিরাম আশ্বাস এই 'জাতিসমূহের শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতায়' তাদের কোনো উপকার বয়ে আনতে পারে, কোনো আশ্বাস ছাড়া।
তাদের জন্য লড়াই করতে হচ্ছে।

না। যেহেতু আমরা এই পথ বেছে নিয়েছি, ইংল্যান্ড একদিন এমনটা হতে বাধ্য ছিল।
আমাদের শত্রু। অবশ্যই, এটা আমাদের সরল আশ্বাসের সাথে খাপ খেয়েছিল, কিন্তু এই সত্যের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করাটা তবুও অর্থহীন ছিল যে এমন একদিন আসবে যখন ইংল্যান্ড একজন আগ্রাসী আত্মম্ভরীর বর্বরতা দিয়ে আমাদের শান্তিপূর্ণ কার্যকলাপের বিরোধিতা করবে।

অবশ্যই, আমরা নিজেরা কখনো এমন কিছু করব না।

যদি রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটি ভূখণ্ডগত নীতি কেবল ইংল্যান্ডকে মিত্র হিসেবে নিয়েই বাস্তবে প্রয়োগ করা যেত, তাহলে অন্যদিকে, ইংরেজ স্বার্থের বিরুদ্ধে একটি ঔপনিবেশিক নীতি কেবল রাশিয়ার সমর্থনেই বাস্তবায়ন করা সম্ভব ছিল। কিন্তু সেক্ষেত্রে এই নীতিটি এর পরিণতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থেকেই গ্রহণ করা উচিত ছিল, এবং সর্বোপরি, অস্ট্রিয়াকে যত দ্রুত সম্ভব নির্মূল করা উচিত ছিল।

শতাব্দীর শুরুতে অস্ট্রিয়ার সাথে জোটটি সব দিক থেকেই এক চরম অযৌক্তিকতায় পরিণত হয়েছিল।

কিন্তু ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে রাশিয়ার সঙ্গে জোট গঠনের কথা কেউ ভাবেনি, ঠিক যেমন রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের সঙ্গে জোট গঠনের কথাও কেউ ভাবেনি, কারণ যেকোনো ক্ষেত্রেই এর শেষ পরিণতি অনিবার্যভাবে যুদ্ধই হতো। আর যুদ্ধ এড়ানোই ছিল শিল্প ও বাণিজ্য নীতি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্তের মূল কারণ। বিশ্বাস করা হতো যে, বাণিজ্যের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে বিশ্বজয় এমন একটি পদ্ধতি যা ক্ষমতার রাজনীতিকে স্থায়ীভাবে প্রতিস্থাপন করবে। তবে, এই নীতির কার্যকারিতা নিয়ে মাঝে মাঝে সন্দেহ দেখা দিত, বিশেষ করে যখন সেই সন্দেহগুলো ইংল্যান্ডের পক্ষ থেকেই আসত।

কিছু দুর্বোধ্য সতর্কবার্তা। এই কারণেই নৌবহরটি নির্মাণ করা হয়েছিল। ইংল্যান্ডকে আক্রমণ বা ধ্বংস করার জন্য নয়, বরং কেবল উপরে উল্লিখিত বিশ্বশান্তির ধারণা এবং "শান্তিপূর্ণ" উপায়ে বিশ্বজয়ের নীতিকে রক্ষা করার জন্য। তাই আমাদের শান্তিপূর্ণ অভিপ্রায়ের আরও একটি প্রমাণ হিসেবে নৌবহরটিকে কেবল জাহাজের সংখ্যা ও টনেজের দিক থেকেই নয়, বরং তাদের অস্ত্রশস্ত্রের দিক থেকেও ছোট রাখা হয়েছিল।

বাণিজ্যের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে বিশ্বজয়ের কথাবার্তা সম্ভবত রাষ্ট্রীয় নীতির পথনির্দেশক হিসেবে উন্নীত হওয়া সবচেয়ে অর্থহীন বিষয় ছিল। এই অর্থহীনতা আরও বেশি মূর্খতাপূর্ণ হয়ে উঠল যখন ইংল্যান্ডকে একটি আদর্শ উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হলো, যা প্রমাণ করে যে এটি বাস্তবে করা সম্ভব। ইতিহাসকে দেখার আমাদের গোঁড়া দৃষ্টিভঙ্গি এবং এ বিষয়ে আমাদের পণ্ডিতসুলভ ধারণাগুলো অপূরণীয় ক্ষতি করেছিল এবং এটি এক চমকপ্রদ "প্রমাণ" দিয়েছিল যে, মানুষ কীভাবে ইতিহাসকে আদৌ না বুঝেই "শেখে"। বস্তুত, বাণিজ্যিক উপায়ে শান্তিপূর্ণভাবে বিশ্বজয়ের তত্ত্বের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডকে একটি জোরালো যুক্তি হিসেবেই দেখতে হতো। তরবারির সাহায্যে ইংল্যান্ড যেভাবে নৃশংসভাবে বাণিজ্যিক বিজয়ের পথ প্রস্তুত করেছিল, অন্য কোনো জাতি তা করেনি, এবং অন্য কোনো জাতি এই পথ রক্ষা করেনি।

Machine Translated by Google

আরও নির্মমভাবে বিজয় অর্জন। এটা কি ব্রিটিশ শাসনের বৈশিষ্ট্য নয় যে, তারা অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জনের জন্য রাজনৈতিক শক্তি ব্যবহার করতে জানে , এবং বিপরীতভাবে, অর্থনৈতিক বিজয়কে রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করতে জানে? এটা বিশ্বাস করা কী এক বিস্ময়কর ভুল যে, অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের নামে ইংল্যান্ড নিজের রক্ত ঝরাতে সাহস দেখাবে না ! ইংল্যান্ডের কোনো জাতীয় সেনাবাহিনী ছিল না, এই ঘটনাটি কিছুই প্রমাণ করে না; কারণ যা গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা সামরিক কাঠামো নয়, বরং সমস্ত প্রয়োজনীয় সামরিক শক্তি ব্যবহার করার ইচ্ছা এবং সংকল্প । ইংল্যান্ডের কাছে সবসময় তার প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ছিল। সাফল্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র দিয়েই এটি সবসময় যুদ্ধ করেছে । যতক্ষণ পর্যন্ত তা যথেষ্ট ছিল, ততক্ষণ এটি ভাড়াটে সৈন্য পাঠিয়েছে; কিন্তু যদি এই ধরনের আত্মত্যাগের মাধ্যমে বিজয় অর্জন করা যেত , তবে সমগ্র জাতির সেরা রক্ত থেকে গভীরভাবে রক্ত ঝরাতে এটি কখনও দ্বিধা করেনি। এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে, যুদ্ধ করার মানসিকতা, অদম্য সংকল্প এবং সামরিক অভিযান পরিচালনায় নৃশংস উপায়ের ব্যবহার একই ছিল।

কিন্তু জার্মানিতে স্কুল, সংবাদপত্র এবং হাস্যরসাত্মক পত্রিকার মাধ্যমে ইংরেজদের সম্পর্কে ধীরে ধীরে এমন একটি ধারণা তৈরি হয়েছিল, যা সবচেয়ে নিকৃষ্ট ধরনের আত্মপ্রবঞ্চনার জন্ম দিয়েছিল। এই অযৌক্তিকতা ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে জার্মান জীবনের সকল ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছিল । এর ফলস্বরূপ এক ধরনের অবমূল্যায়ন ঘটেছিল, যার জন্য আমাদের চড়া মূল্য দিতে হয়েছিল ।
এই ভ্রান্তি এতটাই গভীর ছিল যে, সবাই ইংরেজটিকে একজন ধূর্ত ব্যবসায়ী হিসেবে দেখলেও ব্যক্তিগতভাবে এক চরম কাপুরুষ হিসেবে দেখত। দুর্ভাগ্যবশত , আমাদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ইতিহাসের শিক্ষকেরা তাদের ছাত্রদের এই সত্যটি বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন যে, শুধুমাত্র প্রতারণা ও ছলনার মাধ্যমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মতো শক্তিশালী একটি সংগঠন গড়ে তোলা অসম্ভব ।

যে অল্প কয়েকজন উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন, তাঁদের হয় উপেক্ষা করা হয়েছিল অথবা চুপ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফ্ল্যান্ডার্সে যখন আমার সহযোদ্ধারা প্রথমবারের মতো [টমিদের] মুখোমুখি হয়েছিলেন , তখন তাঁদের বিস্মিত মুখগুলো আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। বেশ কয়েকদিন লড়াই করার পর, আমাদের সৈন্যদের মধ্যে ধীরে ধীরে এই উপলব্ধি জাগতে শুরু করল যে, স্কটরা ঠিক তেমন ছিল না যেমনটা রসাত্মক পত্রিকায় তাদের বর্ণনা ও ব্যঙ্গচিত্রে তুলে ধরা হয়েছিল, অথবা যেমনটা তাদের বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল।

তখনই বিভিন্ন ধরনের প্রচারণার কার্যকারিতা সম্পর্কে আমার নিজস্ব মতামত প্রথম গড়ে উঠেছিল।

তবে, এই ধরনের বিকৃতি যারা এটি তৈরি করেছে তাদের উদ্দেশ্য সাধন করে। ইংরেজদের এই ব্যঙ্গচিত্রটি, যদিও মিথ্যা, বাণিজ্যের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে বিশ্বজয়ের সম্ভাবনা প্রদর্শনের জন্য ব্যবহার করা যেত । ইংরেজরা যদি সফল হয়ে থাকে, তাহলে আমরাও পারব । আমাদের অনেক বেশি সততা এবং বিশেষভাবে ইংরেজদের 'বিশ্বাসঘাতকতা' থেকে মুক্তিই আমাদের সুবিধা। এইভাবে, ছোট দেশগুলোর সহানুভূতি এবং বড় দেশগুলোর বিশ্বাস আরও সহজে অর্জন করার আশা ছিল ।

আমরা বুঝতে পারিনি যে আমাদের আন্তরিকতাই অন্যদের মনে গভীর বিতৃষ্ণার কারণ ছিল , কারণ আমরা নিজেরাই তা বিশ্বাস করতাম । বাকি বিশ্ব আমাদের আচরণকে ধূর্ত অসততার প্রকাশ হিসেবে দেখত; কিন্তু যখন বিপ্লব এলো, তখন তারা আমাদের মানসিকতার গভীরে তাকিয়ে বিস্মিত হয়েছিল, যা ছিল মূর্খতার সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া এক আন্তরিকতা ।

বাণিজ্যের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ বিশ্বজয়ের এই অযৌক্তিক ধারণাটি যে ভূমিকা পালন করেছিল, তা একবার বুঝতে পারলে আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারব কীভাবে আরেকটি অযৌক্তিকতার উদ্ভব হয়েছিল, আর তা হলো ত্রিপক্ষীয় জোট। সেই সময়ে আমরা আর কোন দেশের সাথেই বা জোটে আবদ্ধ হতে পারতাম ? অস্ট্রিয়ার সাথে জোটে আমরা সামরিক উপায়ে, এমনকি ইউরোপেও, নতুন কোনো ভূখণ্ড দখল করতে পারতাম না । আর এই ঘটনাটি ছিল...
ত্রিপক্ষীয় জোটের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার আসল কারণ । বিসমার্কের সামর্থ্য ছিল
প্রয়োজনের তাগিদে জন্ম নেওয়া এমন একটি অস্থায়ী ব্যবস্থার জন্য , কিন্তু অবশ্যই তার কোনো অযোগ্য উত্তরসূরির জন্য নয় , বিশেষ করে যখন বিসমার্ক যে ভিত্তির ওপর তার সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন
ত্রিপক্ষীয় জোট। বিসমার্কের সময়ে অস্ট্রিয়াকে তখনও একটি জার্মান রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করা যেত ; কিন্তু ক্রমান্বয়ে সার্বজনীন ভোটাধিকারের প্রচলন দেশটিকে একটি সংসদীয় বাবিলের মিনারে পরিণত করেছিল, যেখানে জার্মানদের কণ্ঠস্বর প্রায় শোনাই যেত না।

জাতিগত রাজনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে, অস্ট্রিয়ার সাথে জোটটি ছিল নিতান্তই একটি বিপর্যয়। এটি জার্মান রাইখের সীমান্তে একটি নতুন স্লাভিক শক্তির উত্থানের সুযোগ করে দিয়েছিল। এই শক্তিকে , উদাহরণস্বরূপ, রাশিয়ার প্রতি তাদের মনোভাবের চেয়ে জার্মানির প্রতি sooner or later (অচিরেই) ভিন্ন মনোভাব গ্রহণ করতে হতো । জোটটিকে ক্রমশ অন্তঃসারশূন্য ও দুর্বল হতেই হতো, কারণ যারা

Machine Translated by Google

যারা তাকে সমর্থন করেছিল, তারা তাদের প্রভাব হারায় এবং পরিকল্পিতভাবে আরও গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় পদ থেকে বিতাড়িত হয় ।

১৯০০ সালের দিকে অস্ট্রিয়ার সাথে জোটটি অস্ট্রিয়া ও ইতালির মধ্যকার জোটের মতো একই পর্যায়ে প্রবেশ করেছিল ।

এখানেও একটিই পথ খোলা ছিল : হয় হ্যাবসবার্গ রাজতন্ত্রের পক্ষ নেওয়া, নয়তো অস্ট্রিয়ায় জার্মান নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা। কিন্তু সাধারণভাবে বলতে গেলে, এমন কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হলে তার পরিণতি সবসময়ই প্রকাশ্য সংঘাতে গড়াতো ।

মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ত্রিপক্ষীয় জোটের উপযোগিতাও সীমিত ছিল, কারণ জোটটি তার লক্ষ্যকে স্থিতাবস্থা রক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছিল। কিন্তু, অন্যদিকে, জোটের স্থিতিশীলতা তার প্রতিটি পক্ষের সুনির্দিষ্ট ও বাস্তব সম্প্রসারণমূলক লক্ষ্য অর্জনের ক্ষমতার অনুপাতে বৃদ্ধি পায় । এখানেও, অন্য সব জায়গার মতোই, শক্তি প্রতিরক্ষায় নয়, বরং আক্রমণেই নিহিত ।

এই সত্যটি বিভিন্ন স্থানে স্বীকৃত ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত জনগণের তথাকথিত নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তা স্বীকার করেননি। ১৯১২ সালের গোড়ার দিকেই, লুডেনডর্ফ, যিনি তখন জেনারেল স্টাফের একজন কর্নেল ও কর্মকর্তা ছিলেন, তাঁর প্রস্তুত করা একটি স্মারকলিপিতে জোটের দুর্বল দিকগুলো তুলে ধরেছিলেন । কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই, 'রাষ্ট্রনায়করা' এই দলিলটিকে কোনো গুরুত্ব বা মূল্য দেননি। সাধারণভাবে, দেখে মনে হচ্ছিল যেন যুক্তি একটি সাধারণ ক্ষমতা মাত্র।

কেবলমাত্র সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রেই সক্রিয় , কিন্তু 'কূটনীতিক' নামে পরিচিত প্রজাতির শাখার ক্ষেত্রে এটি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

* * *

জার্মানির জন্য সৌভাগ্যবশত , ১৯১৪ সালের যুদ্ধটি সরাসরি অস্ট্রিয়ার ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কারণ হ্যাবসবার্গরা এতে অংশ নিতে বাধ্য হয়েছিল । যদি যুদ্ধের কারণ ভিন্ন হতো, তবে জার্মানিকে তার নিজের ভাগ্যেই ছেড়ে দেওয়া হতো। হ্যাবসবার্গ রাষ্ট্র এমন কোনো যুদ্ধে অংশ নিতে কখনোই প্রস্তুত বা ইচ্ছুক ছিল না, যার জন্য জার্মানি দায়ী। ইতালির ক্ষেত্রে যা পরবর্তীকালে চরম লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তা অস্ট্রিয়ার ক্ষেত্রেও আরও আগে ঘটত। অন্য কথায়, যদি জার্মানি কোনো কারণে যুদ্ধে বাধ্য হতো, তবে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরপরই যে বিপ্লব ঘটতে পারত, তা থেকে রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য অস্ট্রিয়া "নিরপেক্ষ" থাকত । স্লাভিক জনগোষ্ঠী ১৯১৪ সালে দ্বৈত রাজতন্ত্রকে জার্মানির সাহায্যে এগিয়ে আসতে দেওয়ার চেয়ে বরং তাকে উৎখাত করাকেই শ্রেয় মনে করত । কিন্তু সেই সময়ে, দানিউবীয় রাজতন্ত্রের সাথে জোটবদ্ধ হওয়ার ফলে সৃষ্ট সমস্ত বিপদ ও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি খুব কম লোকই বুঝতে পেরেছিল ।

প্রথমত, অস্ট্রিয়ার অনেক শত্রু ছিল যারা দখল করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল।
এই পতনোন্মুখ রাষ্ট্রের উত্তরাধিকারের ফলে , এই মানুষগুলোর মনে ধীরে ধীরে জার্মানির প্রতি বিদ্বেষ জন্মায় , কারণ জার্মানি তাদের আকাঙ্ক্ষার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং বহু পক্ষের প্রত্যাশা অনুযায়ী দ্বৈত রাজতন্ত্রের পতনকে প্রতিরোধ করছিল । এই বিশ্বাস জন্মায় যে ভিয়েনায় কেবল বার্লিনের মাধ্যমেই পৌঁছানো সম্ভব ।

দ্বিতীয়ত, এই নীতি গ্রহণের ফলে জার্মানি অন্যান্য জোট গঠনের সেরা ও সবচেয়ে সম্ভাবনাময় সুযোগগুলো হারিয়েছিল । পরিবর্তে, এই সুযোগগুলোর স্থান দখল করেছিল রাশিয়া এবং এমনকি ইতালির সঙ্গে সম্পর্কের ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা । অথচ জার্মানির প্রতি রোমের সাধারণ মনোভাব যতটা বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল, অস্ট্রিয়ার প্রতি ততটাই বৈরী ছিল; এই বৈরিতা প্রত্যেক ইতালীয়র অন্তরে সুপ্ত ছিল এবং প্রায়শই নির্মমভাবে তার উপস্থিতি জানান দিত।

যেহেতু বাণিজ্য ও শিল্পনীতি গৃহীত হয়েছিল , তাই রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার কোনো কারণ ছিল না । এমন পরিস্থিতিতে কেবল জার্মানি ও রাশিয়া—উভয় দেশের শত্রুরাই যুদ্ধে আগ্রহী হতে পারত। প্রকৃতপক্ষে, কেবল ইহুদি ও মার্ক্সবাদীরাই দুই দেশের মধ্যে বিবাদ উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল ।

তৃতীয়ত, এই জোট জার্মানির নিরাপত্তার জন্য একটি নিরন্তর হুমকি ছিল ; বিসমার্কের রাইখের প্রতি বিদ্বেষী যেকোনো রাষ্ট্র অস্ট্রিয়ান মিত্রের স্বার্থের বিনিময়ে সুবিধা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অন্য বহু রাষ্ট্রকে একত্রিত করতে পারত।

Machine Translated by Google

অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে সমগ্র পূর্ব ইউরোপকে , বিশেষ করে রাশিয়াকে, এবং সেই সাথে ইতালিকেও উসকানি দেওয়া সম্ভব ছিল। রাজা এডওয়ার্ডের নেতৃত্বে গঠিত বিশ্ব জোটটি কখনোই বাস্তবে রূপ নিত না , যদি জার্মানির মিত্র অস্ট্রিয়া লুণ্ঠনের এমন লোভনীয় সম্ভাবনা না দেখাত। শুধুমাত্র এই একটি কারণেই ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থান্বেষী এতগুলো বিজাতীয় রাষ্ট্রকে একটি সাধারণ আক্রমণকারী ব্যূহে একত্রিত করা সম্ভব হয়েছিল । জার্মানির বিরুদ্ধে এই সাধারণ আক্রমণে যোগ দিয়ে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীই অস্ট্রিয়ার খরচে নিজেদের সমৃদ্ধ করার আশা করতে পারত। অস্ট্রিয়ার সাথে এই দুর্ভাগ্যজনক জোটে তুরস্কের নীরব অংশগ্রহণ জার্মানির জন্য হুমকিকে এক অসাধারণ মাত্রায় বাড়িয়ে দিয়েছিল। ইহুদি আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নিকারীদের জার্মানির ধ্বংসের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকারের টোপের প্রয়োজন ছিল ; কারণ জার্মানি তখনও অর্থ ও বাণিজ্যের আন্তর্জাতিক প্রভাবশালী শক্তিগুলোর নিয়ন্ত্রণে বশ্যতা
স্বীকার করেনি।

অন্যান্য রাজ্যগুলোর ওপর। এইভাবে , শুধুমাত্র সংখ্যাগত শ্রেষ্ঠত্বের মাধ্যমে জোটকে শক্তিশালী করা এবং 'শিংওয়ালা' সিগফ্রিডের ওপর আক্রমণ চালানোর জন্য এটিকে যথেষ্ট শক্তিশালী ও সাহসী করে তোলা সম্ভব হয়েছিল ।
৯)

হ্যাবসবার্গ রাজতন্ত্রের সাথে মৈত্রী , যার প্রতি অস্ট্রিয়াতেও আমার বিতৃষ্ণা ছিল , তা আমার জন্য গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং আমাকে এ নিয়ে ক্রমাগত ভাবতে বাধ্য করে, যতক্ষণ না আমি অবশেষে উপরে উল্লিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হই ।

সেই সময়ে আমার ওঠাবসা থাকা ছোট মহলে আমি আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস গোপন করিনি যে, পতনের দিকে ধাবমান একটি রাষ্ট্রের সাথে এই অশুভ চুক্তি জার্মানির জন্যও বিপর্যয় ডেকে আনবে, যদি দেশটি সময়মতো এর থেকে নিজেকে মুক্ত করতে না পারে । আমি এক মুহূর্তের জন্যও এই দৃঢ় মত পরিবর্তন করিনি, এমনকি যখন বিশ্বযুদ্ধের ঝড় যুক্তিবাদী চিন্তার সমস্ত ক্ষমতাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে তার জায়গায় অন্ধ উৎসাহ এনে দিয়েছে বলে মনে হচ্ছিল ; এমনকি সেইসব মহলেও, যেগুলো ঠান্ডা, বস্তুনিষ্ঠ চিন্তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত ছিল । পরিখায়, যখনই এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হতো, আমি আমার মতামত প্রকাশ করতাম এবং তা বজায় রাখতাম । আমি মনে করতাম যে, হ্যাবসবার্গ রাজতন্ত্র ত্যাগ করা কোনো ত্যাগ হবে না, যদি এর মাধ্যমে জার্মানি তার নিজের শত্রুর সংখ্যা কমাতে পারে ; লক্ষ লক্ষ জার্মান তাদের ইস্পাতের হেলমেট পরেছিল একটি ক্ষয়িষ্ণু রাজবংশকে রক্ষা করার জন্য নয় , বরং জার্মান জাতিকে বাঁচানোর জন্য।

যুদ্ধের আগেও এমন সময় ছিল যখন মনে হয়েছিল যে, অস্ট্রিয়ার সাথে জোট গঠনের রাজনৈতিক যৌক্তিকতা নিয়ে জার্মান জনগণের অন্তত একটি অংশের মনে কিছু সংশয় ছিল। সময়ে সময়ে জার্মানির রক্ষণশীল মহল এই জোটের গুরুত্বকে অতিরিক্ত মূল্যায়ন করার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিল ; কিন্তু তৎকালীন অন্য সব যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাবের মতোই এটিকেও খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল। সাধারণ বিশ্বাস ছিল যে , বিশ্ব "জয়ের" সঠিক উপায় বেছে নেওয়া হলে , নগণ্য ত্যাগের বিনিময়েই বিপুল সাফল্য আসবে ।

আরও একবার, ‘অনভিজ্ঞ’ সাধারণ মানুষ অসহায়ভাবে চেয়ে চেয়ে দেখল, কীভাবে ‘নির্বাচিতরা’ সোজা বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং হ্যামেলিনের বাঁশিওয়ালার পেছনে ইঁদুরের মতো নিজেদের জাতিকে তাদের অনুসরণ করতে প্ররোচিত করছে।

* * *

যদি আমরা সেই গভীরতর কারণগুলো অনুসন্ধান করি, যার ফলে বাণিজ্যের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে বিশ্বজয়ের এই অযৌক্তিক ধারণাটি মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল , এবং কীভাবে বিশ্বশান্তি রক্ষাকে একটি জাতীয় লক্ষ্য হিসেবে সামনে আনা সম্ভব হয়েছিল , তাহলে আমরা দেখতে পাব যে এই কারণগুলো একটি সাধারণ ব্যাধির মধ্যে নিহিত ছিল, যা সমগ্র জার্মান রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে গ্রাস করেছিল ।

জার্মানিতে কারিগরি বিজ্ঞানের বিজয়সূচক অগ্রগতি এবং জার্মান শিল্প ও বাণিজ্যের অলৌকিক বিকাশের ফলে এই সত্যটি বিস্মৃত হয়েছিল যে, এই সাফল্যের জন্য একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র অপরিহার্য পূর্বশর্ত ছিল । এর বিপরীতে, কিছু মহল এতটাই তত্ত্বায়ন করেছিল যে , রাষ্ট্রের অস্তিত্ব এই ঘটনাগুলোর ওপরই নির্ভরশীল; যে এটি সর্বোপরি একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং একে অবশ্যই অর্থনৈতিক স্বার্থ অনুসারে পরিচালিত হতে হবে।

Machine Translated by Google

সুতরাং, এই ধারণা পোষণ করা হতো যে রাষ্ট্র অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর নির্ভরশীল। এই পরিস্থিতিকেই সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত ও স্বাভাবিক বলে মনে করা হতো।

তবে সত্যটা হলো, রাষ্ট্রের সাথে কোনো নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ধারণা বা নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোনো সম্পর্ক নেই। অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কোনো সংজ্ঞায়িত ও সীমিত ভূখণ্ডের মধ্যে পক্ষগুলোর মধ্যে হওয়া কোনো চুক্তি থেকে এর উদ্ভব হয় না। রাষ্ট্র হলো পরস্পর সম্পর্কিত শারীরিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির জীবসত্তার একটি সম্প্রদায় , যা তাদের প্রজাতির অস্তিত্ব রক্ষা নিশ্চিত করতে এবং বিধাতা কর্তৃক সেই নির্দিষ্ট জাতি বা জাতির শাখার জন্য নির্ধারিত উদ্দেশ্য পূরণে সহায়তা করার জন্য সংগঠিত হয় ।

এর মধ্যেই, এবং কেবল এর মধ্যেই, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য নিহিত রয়েছে । এই লক্ষ্যগুলো অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় বহু সহায়ক উপায়ের মধ্যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড একটি । কিন্তু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কখনোই রাষ্ট্রের উৎস বা উদ্দেশ্য নয়, ব্যতিক্রম কেবল মিথ্যা বা অপ্রাকৃতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র । আর এ কারণেই রাষ্ট্র , একটি সম্ভা সত্তা হিসেবে, তার গঠনের শর্ত হিসেবে আবশ্যিকভাবে একটি নির্দিষ্ট ও সীমিত ভূখণ্ডের প্রয়োজন বোধ করে না । এই শর্তটি হয়ে ওঠে

কেবলমাত্র সেইসব মানুষের মধ্যেই এর প্রয়োজন, যারা নিজেদের পরিশ্রমের মাধ্যমে তাদের স্বজাতিদের অস্তিত্ব নিশ্চিত ও সুরক্ষিত করে, যার অর্থ হলো তারা নিজেদের কাজের মাধ্যমে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রাম করতে ইচ্ছুক । যারা পরজীবীর মতো মানব সমাজে গোপনে প্রবেশ করতে পারে এবং নানা অজুহাতে অন্যদেরকে তাদের জন্য কাজ করতে বাধ্য করতে পারে, তারা কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ছাড়াই একটি রাষ্ট্র তৈরি করতে পারে । এটি প্রধানত সেই পরজীবী জাতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য , যারা বিশেষ করে এই সময়ে মানবজাতির সৎ অংশের — অর্থাৎ ইহুদিদের—ওপর শোষণ করে।

ইহুদি রাষ্ট্র কখনোই ভৌগোলিকভাবে সীমাবদ্ধ ছিল না। এটি কোনো সীমানা ছাড়াই সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে এবং সর্বদা একটি একক জাতির অন্তর্ভুক্ত হিসেবেই সংজ্ঞায়িত হয়েছে । তাই, ইহুদিরা সবসময় রাষ্ট্রের মধ্যে আরেকটি রাষ্ট্র তৈরি করে । এযাবৎকালের অন্যতম সেরা কৌশল হলো এই ইহুদি রাষ্ট্রকে একটি পতাকার অধীনে পরিচালনা করা ।

ধর্ম এবং এর মাধ্যমে সেই সহনশীলতা নিশ্চিত করা যা আর্যরা সর্বদা প্রদান করতে প্রস্তুত ।
বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়। কিন্তু মোজাইক আইন মূলত ইহুদি জাতির অস্তিত্ব রক্ষার একটি মতবাদ ছাড়া আর কিছুই নয় । সুতরাং, এই আইন সমাজতাত্ত্বিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের সেই সমস্ত ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে যা এই লক্ষ্যকে প্রভাবিত করে।

নিজ প্রজাতির অস্তিত্ব রক্ষার প্রবৃত্তিই মানব সমাজ গঠনের মূল কারণ । সুতরাং, রাষ্ট্র একটি জাতিগত সত্তা, কোনো অর্থনৈতিক সংগঠন নয়। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এতটাই বিশাল যে আমাদের সমসাময়িক তথাকথিত "রাষ্ট্রনায়কদের " কাছে তা বোধগম্য নয়। তাই, তারা বিশ্বাস করেন যে রাষ্ট্রকে একটি অর্থনৈতিক কাঠামো হিসেবে সৃষ্টি করা যায় , অথচ প্রকৃতপক্ষে এটি সর্বদাই এমন সব কর্মকাণ্ড থেকে উদ্ভূত হয়েছে যা প্রজাতি ও জাতিকে রক্ষা করার ইচ্ছারই অংশ । কিন্তু এই কর্মকাণ্ডগুলো সর্বদাই বীরোচিত সদ্গুণ হিসেবে বিদ্যমান ও কার্যকর থাকে এবং এর সাথে বাণিজ্যিক আত্মস্বার্থের কোনো সম্পর্ক নেই; প্রজাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সর্বদাই ব্যক্তির আত্মত্যাগের ইচ্ছা পূর্বশর্ত হিসেবে কাজ করে । এটাই কবির কথার অর্থ:

আর যদি নিজের জীবনকে বাজি না ধরো, তবে
তুমি কখনোই জিততে পারবে না।

যদি নিজের জীবন বাজি না ধরো , তবে জীবনে
কখনো জয়ী হতে পারবে না । ১০)

জাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য ব্যক্তির জীবন উৎসর্গ করা অপরিহার্য।
সুতরাং , একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও টিকিয়ে রাখার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো চরিত্র ও জাতিগত সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করে এক বিশেষ ধরনের সংহতিবোধ এবং যেকোনো মূল্যে তা রক্ষা করার অদম্য প্রস্তুতি। যারা নিজেদের ভূখণ্ডে বাস করে , তাদের মধ্যে এটি বীরোচিত গুণাবলীর জন্ম দেয়; পরজীবী জনগোষ্ঠীর মধ্যে এটি প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার কলাকৌশল গড়ে তোলে ; যদি না আমরা ধরে নিই যে, এটি তাদের জন্য সহজাত, এবং পরজীবী জাতি যে বিভিন্ন রাজনৈতিক রূপের মাধ্যমে নিজেদের প্রকাশ করে, তা কেবল তাদের সহজাত চরিত্রের বাহ্যিক বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

Machine Translated by Google

অন্তত প্রাথমিকভাবে, একটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি কেবল আমার উল্লিখিত বীরোচিত গুণাবলীর প্রকাশের ফল হতে পারে। অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে যারা ব্যর্থ হয়, তারা হলো সেইসব ব্যক্তি যারা অধীনস্থ প্রজায় পরিণত হয় এবং ফলস্বরূপ শীঘ্র বা বিলম্বে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হতে বাধ্য হয় ; তারা যুদ্ধে এই বীরোচিত গুণাবলী প্রদর্শনে ব্যর্থ হয় ; অথবা তারা পরজীবীদের বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়। আর ব্যর্থতার এই দ্বিতীয় কারণটিও তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তির অভাবের ফল ততটা নয়, বরং সাহস ও দৃঢ়তার অভাবের ফল। মানবতাবাদী বিশ্বাসের আবরণে এই ব্যর্থতার প্রকৃত স্বরূপকে আড়াল করার চেষ্টা করা হয়।

একটি রাষ্ট্র গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে বৈশিষ্ট্যগুলো গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলোর সাথে অর্থনৈতিক অবস্থার সম্পর্ক প্রায় নেই বললেই চলে। এই বিষয়টি এ থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে, একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শক্তির সাথে তার তথাকথিত অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের খুব কমই সম্পর্ক থাকে। বরং , এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যেখানে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সময়কাল একটি রাষ্ট্রের আসন্ন পতনের ইঙ্গিত দিয়েছে। যদি মানব সমাজের গঠনকে অর্থনৈতিক শক্তির ফল হিসেবেই ধরা হয়, তবে রাষ্ট্রের শক্তিও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সময়েই সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকা উচিত , এর বিপরীতটা নয়।

এটা বোঝা অত্যন্ত কঠিন যে, অর্থনৈতিক শক্তির দ্বারা রাষ্ট্রের উদ্ভব ও স্থায়িত্ব ঘটে— এই বিশ্বাসটি এমন একটি দেশে কীভাবে জনপ্রিয়তা পেতে পারে, যে দেশটি তার ইতিহাসের প্রতিটি পর্যায়ে এর বিপরীত প্রমাণ দিয়েছে। প্রুশিয়ার ইতিহাস বিশেষভাবে সুস্পষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নয়, বরং জনগণের নৈতিক গুণাবলীই এটিকে সম্ভব করে তোলে।
রাষ্ট্রের উদ্ভব। কেবলমাত্র এই সদ্গুণগুলোর সুরক্ষাতেই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিকাশ ঘটতে পারে , এবং তা ততক্ষণ পর্যন্ত বিকশিত হতে থাকবে যতক্ষণ না সৃজনশীল রাজনৈতিক ক্ষমতার অভাব দেখা দেয়। তখন অর্থনৈতিক কাঠামোও ভেঙে পড়বে , যা আমাদের চোখের সামনেই উদ্বেগজনকভাবে ঘটছে। মানবতার বস্তুগত স্বার্থ কেবল মহৎ সদ্গুণের ছায়াতেই বিকশিত হতে পারে। যে মুহূর্তে এটি জীবনের মৌলিক পরিমণ্ডলে পরিণত হয় , সে মুহূর্তে তা নিজের অস্তিত্বের ভিত্তিকেই ধ্বংস করে দেয়।

যখনই জার্মানির রাজনৈতিক ক্ষমতা বিশেষভাবে শক্তিশালী ছিল, অর্থনৈতিক অবস্থারও উন্নতি ঘটেছিল। কিন্তু যখনই মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক স্বার্থ প্রাধান্য পেয়ে সর্বোচ্চ আদর্শকে পেছনে ফেলে দিয়েছে, তখনই রাষ্ট্রের পতন ঘটেছে এবং দ্রুত অর্থনৈতিক ধ্বংস নেমে এসেছে।

একটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি ও অস্তিত্বের জন্য কোন শক্তিগুলো প্রকৃতপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ , এই প্রশ্নটি বিবেচনা করলে আমরা সেটিকে নিম্নোক্তভাবে সারসংক্ষেপ করতে পারি: বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য ব্যক্তিকে উৎসর্গ করার সামর্থ্য ও ইচ্ছা। এগুলোর সাথে অর্থনীতির কোনো সম্পর্ক নেই, তা প্রমাণ করা যায় নিম্নোক্ত যুক্তির মাধ্যমে :
এই সহজ সত্যের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, মানুষ জাগতিক স্বার্থের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে না। অন্য কথায়, সে আদর্শের জন্য মরতে পারে, কিন্তু স্বার্থের জন্য নয়। সাধারণ মানুষের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে এর চেয়ে ভালো বোঝাপড়া আর কিছুতেই প্রকাশ পায় না , যেভাবে ইংরেজরা বিশ্বযুদ্ধের সময় তাদের উদ্দেশ্য উপস্থাপন করেছিল। আমরা রুটির জন্য লড়ছিলাম ; কিন্তু ইংরেজরা ঘোষণা করেছিল যে তারা লড়ছে "স্বাধীনতার" জন্য, এবং সেটাও তাদের নিজেদের স্বাধীনতার জন্য নয়। না, ছোট ছোট জাতিগুলোর স্বাধীনতার জন্য। জার্মান জনগণ এই ঔদ্ধত্যে হেসেছিল অথবা এতে ক্ষিপ্ত হয়েছিল; কিন্তু এর মাধ্যমে তারা দেখিয়ে দিয়েছিল যে, যুদ্ধের আগেই জার্মানিতে আমাদের তথাকথিত কূটনীতিকদের মধ্যে রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা কতটা অধঃপতিত হয়েছিল। যে শক্তি মানুষকে তাদের নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছায় মৃত্যুর দিকে চালিত করে, সেই শক্তি সম্পর্কে এই কূটনীতিকদের বিন্দুমাত্র ধারণাও ছিল না।

১৯১৪ সালে জার্মানরা যতদিন বিশ্বাস করত যে তারা আদর্শের জন্য লড়াই করছে , ততদিন তারা আত্মসমর্পণ করেনি। যখন যেইমাত্র তাদের বলা হলো যে তারা তাদের নিত্যদিনের খাবারের জন্য লড়াই করছে , তারা এই লড়াই ছেড়ে দিতে শুরু করল।

আমাদের জ্ঞানী 'রাষ্ট্রনায়কেরা' মনোভাবের এই পরিবর্তনে অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁরা কখনও বোঝেননি যে, যখনই কোনো মানুষকে নিছক জাগতিক কারণে যুদ্ধ করতে হয়, সে সর্বতোভাবে মৃত্যুকে এড়িয়ে চলে , কারণ মৃত্যু এবং বিজয়ের জাগতিক ফলের আনন্দ সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী ধারণা। যখন সন্তানের জীবন বিপন্ন হয় , তখন দুর্বলতম নারীও বীরাঙ্গনা হয়ে ওঠে। আর কেবল জাতি এবং সেই জাতিকে রক্ষাকারী রাষ্ট্রের ভূখণ্ডকে রক্ষা করার ইচ্ছাই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষকে সশস্ত্র প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে বাধ্য করেছে।

নিম্নলিখিত বিবৃতিটি একটি চিরন্তন সত্য হিসাবে বিবেচিত হতে পারে :

Machine Translated by Google

শান্তিপূর্ণ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোনো রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় না; কিন্তু রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় সর্বদা একটি জাতিগোষ্ঠীকে রক্ষা করার সহজাত প্রবৃত্তি থেকে, সেই প্রবৃত্তি বীরত্বের ক্ষেত্রে প্রকাশ পাক বা ধূর্ততা ও শঠতার ক্ষেত্রে । প্রথম ক্ষেত্রে, আমরা শ্রম ও সাংস্কৃতিক বিকাশের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত আর্য রাষ্ট্রগুলোর কথা বলছি। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, আমরা ইহুদি পরজীবী উপনিবেশগুলোর কথা বলছি। কিন্তু যখনই কোনো ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের মধ্যে জাতিগত ও সাংস্কৃতিক প্রবৃত্তির উপর অর্থনৈতিক স্বার্থ প্রাধান্য পেতে শুরু করে, তখন এই স্বার্থগুলো পরাধীনতা ও নিপীড়নের কারণগুলোকে আরও শক্তিশালী করে তোলে।

যুদ্ধের আগে জার্মানিতে যে বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে , শান্তিপূর্ণ বাণিজ্যিক অনুপ্রবেশ ও বাণিজ্য নীতির মাধ্যমে জার্মানি বিশ্ব জয় করতে পারে , তা ছিল রাষ্ট্রের জন্ম ও অস্তিত্বের ভিত্তি স্থাপনকারী প্রকৃত সক্ষমতাগুলোর অবক্ষয়ের একটি সাধারণ লক্ষণ; যার মধ্যে সেই সক্ষমতাগুলো থেকে উদ্ভূত ইচ্ছাশক্তি ও ব্যক্তিগত সংকল্পের অবক্ষয়ও অন্তর্ভুক্ত ।

বিশ্বযুদ্ধ ও তার পরিণতি ছিল এই অবক্ষয়ের এক স্বাভাবিক শাস্তি ।

যারা বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে ভাবেননি, তাদের কাছে জার্মান জনগণের এই মনোভাব —যা বেশ ব্যাপক ছিল— একটি সমাধানহীন ধাঁধার মতো মনে হয়ে থাকবে । সর্বোপরি , জার্মানি ছিল নিছক ক্ষমতা- রাজনীতির মাধ্যমে নির্মিত একটি সাম্রাজ্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ।

জার্মান রাইখের কেন্দ্রবিন্দু প্রুশিয়া, কোনো আর্থিক বা বাণিজ্যিক চুক্তির মাধ্যমে নয়, বরং চোখধাঁধানো বীরত্বের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল। এবং স্বয়ং রাইখটি ছিল শক্তি ও বীরত্বের নীতি বজায় রাখা নেতৃত্বের এক চমৎকার পুরস্কার ।

এই একই জার্মান জাতির রাজনৈতিক প্রবৃত্তি কীভাবে এমন অধঃপতিত হলো ? এই অবক্ষয়ের পেছনে এটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না , বরং এটি ছিল এক রোগের লক্ষণ যা উদ্বেগজনক হারে সমাজে ছড়িয়ে পড়ছিল এবং পচনশীল ঘা-এর মতো এই দেহকে গ্রাস করছিল । মনে হচ্ছিল যেন কোনো এক রহস্যময় হাত একদা-বীরোচিত এই দেহের রক্তধারায় কোনো সর্বব্যাপী বিষ প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে , যা যুক্তি ও আত্মরক্ষার মৌলিক প্রবৃত্তিকে প্রভাবিত করে এক ক্রমবর্ধমান পক্ষাঘাত নিয়ে এসেছে।

১৯১২-১৯১৪ সালগুলিতে আমি ত্রিপক্ষীয় জোটের নীতি এবং জার্মান রাইখ কর্তৃক অনুসৃত অর্থনৈতিক নীতি সম্পর্কিত সমস্যাগুলি নিয়ে ক্রমাগত চিন্তাভাবনা করছিলাম ।

আমি আবারও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, এই রহস্যের একমাত্র ব্যাখ্যা নিহিত আছে ভিয়েনায় আমার সম্মুখীন হওয়া সেই শক্তির কার্যকলাপের মধ্যেই , যদিও তা এক ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। আমি যে শক্তির কথা বলছি, তা হলো মার্ক্সবাদী মতবাদ, বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি এবং দেশজুড়ে এর সংগঠিত কার্যকলাপ।

জীবনে দ্বিতীয়বারের মতো আমি এই বিধ্বংসী মতবাদে গভীরভাবে নিমজ্জিত হলাম। তবে এবার আমার দৈনন্দিন পরিমণ্ডলে এর প্রভাব অধ্যয়ন করার জন্য নয়, বরং জার্মান রাজনৈতিক জীবনের সাধারণ ঘটনাপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ করার জন্য। এই নতুন জগতের তাত্ত্বিক সাহিত্যে আবারও ডুব দিয়ে এবং মতবাদটির সম্ভাব্য পরিণতির একটি স্পষ্ট চিত্র পাওয়ার চেষ্টায় , আমি মার্কসবাদের তাত্ত্বিক নীতিগুলোর সাথে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এর কার্যকলাপের ফলে উদ্ভূত ঘটনাপ্রবাহের তুলনা করলাম।

জীবনে প্রথমবারের মতো আমি এই ব্যাপক মহামারী নিয়ন্ত্রণে গৃহীত প্রচেষ্টার দিকে মনোযোগ দিলাম।

আমি বিসমার্কের আইন—এর মূল ধারণা, কার্যপ্রণালী এবং ফলাফল—অধ্যয়ন করেছিলাম। ক্রমান্বয়ে, আমি আমার নিজস্ব মতামতের এমন একটি ভিত্তি গড়ে তুলেছিলাম যা পাথরের মতো অটল প্রমাণিত হয়েছিল, ফলে সামগ্রিক সমস্যাটির প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গি আমাকে আর কখনো পরিবর্তন করতে হয়নি । আমি মার্কসবাদ ও ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে আরও একটি বিশদ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ পরিচালনা করেছিলাম ।

ভিয়েনায় থাকাকালীন আমি জার্মানিকে এক অটল মহাকায় হিসেবে দেখতাম; কিন্তু তখনও আমি প্রায়শই গুরুতর সন্দেহ ও ভয়ে বিচলিত হতাম । মনে মনে এবং আমার অল্প পরিচিত মহলে আমি জার্মানির পররাষ্ট্রনীতি এবং আমার মতে, মার্কসবাদের প্রতি যে অবিশ্বাস্যরকম অগভীর আচরণ করা হতো, তার সমালোচনা করতাম, যদিও

সে সময় এটাই ছিল জার্মানির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। আমি বুঝতে পারছিলাম না, এই হুমকির মুখে তারা কীভাবে নিজেদের চোখ বেঁধে রাখতে পারে , যার পরিণতি হবে মারাত্মক, যদি মার্ক্সবাদের প্রকাশ্যে ঘোষিত লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়িত হয় । আমি তখনো সতর্ক করেছিলাম।

Machine Translated by Google

আমার চারপাশের মানুষদের, ঠিক যেমন আমি এখন বৃহত্তর জনসাধারণকে, সমস্ত অলস ও দায়িত্বজ্ঞানহীনদের সেই আশ্বাসদায়ক স্লোগানটির বিরুদ্ধে সতর্ক করছি: " আমাদের কিছুই হতে পারে না ।" একই ধরনের এক মানসিক ব্যাধি ইতিমধ্যেই একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করে দিয়েছে। জার্মানি কি সেইসব আইনের কাছে আত্মসমর্পণ করা এড়াতে পারবে , যেগুলোর অধীন অন্য সকল মানব সমাজ?

* * *

১৯১৩ ও ১৯১৪ সালে আমি বিভিন্ন মহলে সর্বপ্রথম এই মত প্রকাশ করি যে , জার্মান জাতির ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার সমস্যাটি মার্কসবাদকে ধ্বংস করার সমস্যার সমতুল্য। এই মহলগুলোর মধ্যে কয়েকটি এখন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অংশ।

আমি ত্রিজোটের বিপর্যয়কর নীতিগুলোকে মার্ক্সবাদী মতবাদের বিধ্বংসী প্রভাবের অন্যতম পরিণতি হিসেবে দেখেছি; সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার ছিল যে, এই মতবাদটি অদৃশ্যভাবে সুস্থ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিগুলোকে বিকৃত করে দিয়েছিল । এর দ্বারা কলুষিত ব্যক্তিরা প্রায়শই বুঝতে পারতেন না যে তাদের লক্ষ্য ও কর্মকাণ্ডের উৎস ছিল এই বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি, যাকে তারা প্রকাশ্যেই প্রত্যাখ্যান করতেন।

তারও অনেক আগে থেকে জার্মান জাতির আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অবক্ষয় শুরু হয়ে গিয়েছিল, যদিও অবক্ষয়ের এই ব্যাধিতে আক্রান্তরা প্রায়শই অসচেতন থাকত—যেমনটা প্রায়ই হয়ে থাকে—সেই শক্তিগুলো সম্পর্কে, যা তাদের অস্তিত্বকে ধ্বংস করে দিচ্ছিল। কখনও কখনও তারা এর নিরাময়ের চেষ্টাও করত।
রোগের ফলাফলকেই তার কারণ বলে ধরে নেওয়া । কিন্তু যেহেতু এই রোগের প্রকৃত কারণ কেউ স্বীকার করেনি, বা করতে চায়নি, তাই মার্কসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইটা কোনো হাতুড়ে ডাক্তারের মলম লাগানোর চেয়ে বেশি কার্যকর ছিল না।

পাদটীকা:

৮) জার্মান অস্ট্রিয়া দক্ষিণে পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্ত অঞ্চল ছিল এবং পূর্ব প্রুশিয়া ছিল উত্তরে পূর্ব মার্চ ।

৯) কার্লাইল এই উপাধিটির ব্যাখ্যা নিম্নরূপভাবে দেন : "প্রথমত, 'শিংওয়ালা তুমি' উপাধিটির কারণে কেউ যেন এমনটা মনে না করে যে, আমাদের সাহসী সিগফ্রিড, যিনি ছিলেন পুরুষদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ও বীর, তিনি শিংওয়ালা ছিলেন এবং মাইকেলেঞ্জেলোর মোজেসের মতো তাঁর কপালে একটি শিং ছিল ; এমনকি তাঁর চামড়া কুমিরের মতো শক্ত ছিল, এমনটাও যেন না মনে করে; প্রকৃতপক্ষে, তাঁর এই শিং-এর মতো আকৃতি কেবল অভেদ্যতারই প্রতীক ছিল, যেমনটা ছিল অ্যাকিলিসের..."

১০) শিলারের 'ওয়াল্লেনস্টাইন' চলচ্চিত্রে অশ্বারোহী সৈন্যের গান থেকে উদ্ধৃত পঙক্তিসমূহ ।

Machine Translated by Google

অধ্যায় ৫

বিশ্বযুদ্ধ

আমার যৌবনের উত্তাল বছরগুলোতে, এই ভাবনাটির চেয়ে বেশি আর কিছুই আমার উদ্দাম সত্তাকে দমন করতে পারত না যে, আমি এমন এক সময়ে জন্মেছি যখন পৃথিবী স্পষ্টতই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে যে দোকানদার আর সরকারি কর্মকর্তাদের সম্মান জানানো ছাড়া গৌরবের আর কোনো মন্দির নির্মাণ করা হবে না। মনে হচ্ছিল , ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের ঝড় অবশেষে থেমে গেছে, এবং ভবিষ্যৎ যেন জাতিসমূহের মধ্যে তথাকথিত শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতার দিকেই অপরিবর্তনীয়ভাবে ধাবিত হচ্ছে। এর সহজ অর্থ ছিল অবৈধ উপায়ে পারস্পরিক শোষণের একটি ব্যবস্থা, যেখানে আত্মরক্ষার্থে শক্তি প্রয়োগের নীতিকে আনুষ্ঠানিকভাবে বর্জন করা হয়েছে। প্রতিটি দেশ ক্রমশ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের রূপ ধারণ করছিল , যেকোনো অজুহাতে একে অপরের কাছ থেকে জমি, গ্রাহক এবং সুযোগ-সুবিধা ছিনিয়ে নিচ্ছিল। আর এই সবকিছুর সাথে ছিল এক উচ্চকণ্ঠ কিন্তু নিরীহ কোলাহল। এই প্রবণতাটি যেন অবিচলিত ও অবিরামভাবে বিকশিত হতে নিয়তি নির্ধারিত ছিল। জনসমর্থন পেলে, এটি অবশেষে পৃথিবীকে একটি বিশাল ডিপার্টমেন্ট স্টোরে রূপান্তরিত করবে। এই শপিং সেন্টারের প্রবেশকক্ষে সারি সারি বিশাল আবক্ষ মূর্তি দাঁড়িয়ে থাকবে, যা সবচেয়ে ধূর্ত ফটকাবাজ এবং সবচেয়ে নিরীহ সরকারি কর্মকর্তাদের অমরত্ব দান করবে। বিক্রয়কর্মীরা ইংরেজ এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তারা জার্মান হতে পারতেন; ইহুদিরা মালিক হওয়ার অলাভজনক কাজে নিজেদের নিয়োজিত করত , কারণ তারা ক্রমাগত ঘোষণা করত যে তাদের কোনো লাভ নেই এবং তাদের প্রতিনিয়ত " ব্যবসায় অবদান রাখতে" হয়। অধিকন্তু, বিদেশি ভাষা জানার সুবিধাও তাদের রয়েছে।

আমি কেন একশো বছর আগে জন্মাতে পারলাম না? মুক্তিযুদ্ধের কোনো এক সময়ে।
অলস মানুষ, যখন একজন ব্যক্তির কিছু মূল্য থাকত, এমনকি তার কোনো "স্বার্থ" না থাকলেও।

আমার মনে হতো , অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ভাগ্যবশত আমি এই পৃথিবীতে অনেক দেরিতে এসেছি , এবং আমার জীবনটা শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে কাটবে — এই ভেবে আমার মনে তিক্ততা জন্মাতো। ছেলেবেলায় আমি 'শান্তিবাদী' ছিলাম না, এবং আমাকে তা বানানোর সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছিল।

তারপর [বোয়ার] যুদ্ধ শুরু হলো, যেন দূর দিগন্তে বিদ্যুতের ঝলকানি। দিনের পর দিন আমি একদৃষ্টে খবরের কাগজের দিকে তাকিয়ে থাকতাম আর টেলিগ্রাম ও বার্তাপত্রগুলো প্রায় গোগ্রাসে গিলতাম; এত দূর থেকেও এই যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করতে পারার আনন্দে আমি বিভোর ছিলাম।

রুশ- জাপান যুদ্ধের সময় আমি বয়সে বড় ছিলাম এবং পরিস্থিতিটি ভালোভাবে মূল্যায়ন করতে পারতাম। জাতীয় কারণে, আমাদের আলোচনায় আমি জাপানের পক্ষ নিয়েছিলাম। আমি বিশ্বাস করতাম যে রাশিয়ার পরাজয় অস্ট্রিয়ান স্লাভবাদের জন্য একটি বড় আঘাত হবে।

তারপর থেকে মিউনিখে আমার পৌঁছানোর মধ্যে অনেক বছর কেটে গেল। আমি উপলব্ধি করলাম যে, যাকে আমি আগে অসুস্থ অবক্ষয় বলে মনে করতাম, তা আসলে ঝড়ের আগের শান্ত অবস্থা মাত্র। ভিয়েনায় আমার থাকার সময়, বলকান অঞ্চল ইতিমধ্যেই সেই দমবন্ধ করা নীরবতায় আচ্ছন্ন ছিল যা এক ভয়ংকর ঝড়ের আগে নেমে আসে। এখানে -সেখানে মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝলক দেখা যাচ্ছিল ; কিন্তু তা দ্রুতই সেই অশুভ অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছিল। তারপর বলকান যুদ্ধ শুরু হলো; এবং তার সাথে, আসন্ন টর্নেডোর প্রথম দমকা হাওয়া এক অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ইউরোপের উপর দিয়ে বয়ে গেল। আসন্ন শান্ত অবস্থার মধ্যে , এক প্রবল অমঙ্গলের আশঙ্কার আবহ অনুভূত হচ্ছিল , এতটাই যে আসন্ন বিপর্যয়ের অনুভূতি এক অধীর প্রত্যাশার অনুভূতিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। তারা চাইছিল, স্বর্গ যেন এমন এক নিয়তিকে অবাধ স্বাধীনতা দেয় যাকে আর আটকে রাখা সম্ভব নয়। তারপর প্রথম প্রচণ্ড বজ্রপাত পৃথিবীতে আঘাত হানল। ঝড় বইতে লাগল এবং আকাশ থেকে নেমে আসা বজ্রধ্বনি বিশ্বযুদ্ধের কামানের গর্জনের সাথে মিশে গেল।

যখন মিউনিখে আর্চডিউক ফ্রানৎস ফার্দিনান্দের হত্যার খবর পৌঁছাল , আমি সারাদিন বাড়িতেই ছিলাম এবং ঘটনাটি কীভাবে ঘটেছিল তার বিস্তারিত জানতাম না। প্রথমে আমার ভয় হয়েছিল যে , গুলিগুলো হয়তো অস্ট্রিয়ান জার্মান ছাত্ররাই চালিয়েছে, যারা হ্যাবসবার্গ সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর ক্রমাগত স্লাভ-পন্থী কর্মকাণ্ডে ক্ষিপ্ত ও ক্ষুব্ধ হয়ে জার্মান জনগণকে এক অভ্যন্তরীণ শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিল।

Machine Translated by Google

এমন একটি ভুলের পরিণতি কী হবে, তা কল্পনা করা কঠিন ছিল । এর ফলে নিপীড়নের এক নতুন ঢেউ আসবে , যার উদ্দেশ্যকে সমগ্র বিশ্বের সামনে 'ন্যায্য' বলে প্রমাণ করা হবে। কিন্তু শীঘ্রই আমি কথিত হত্যাকারীদের নাম শুনলাম এবং জানতে পারলাম যে তারা সার্ব। ভাগ্যের অমোঘ প্রতিশোধের মুখে আমি কিছুটা বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম । স্লাভদের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু স্লাভিক দেশপ্রেমিকদের ছোড়া গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন।

তৎকালীন ভিয়েনার সরকারকে সেই সময়ে প্রদত্ত চরমপত্রের ধরন ও সুরের জন্য দোষারোপ করাটা অবিচার । একই রকম পরিস্থিতিতে এবং একই রকম অবস্থায়, বিশ্বের অন্য কোনো শক্তি ভিন্নভাবে কাজ করত না । দক্ষিণে, অস্ট্রিয়ার সীমান্তে ছিল এক নাছোড়বান্দা, মারাত্মক শত্রু , যে দ্বৈত রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান ঘন ঘন উস্কানি দিয়ে যাচ্ছিল । সাম্রাজ্য ধ্বংসের উপযুক্ত মুহূর্ত না আসা পর্যন্ত এই অবিরাম কর্মপন্থা পরিবর্তন করা হয়নি। অস্ট্রিয়ায় এই আশঙ্কা করার কারণ ছিল যে, বৃদ্ধ সম্রাটের মৃত্যুর সাথে সাথেই এটি ঘটবে । এটা খুবই সম্ভব ছিল যে, তখন রাজতন্ত্র কোনো গুরুতর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে না। বহু বছর ধরে , রাষ্ট্র ফ্রাঞ্জ জোসেফের ব্যক্তিত্বের সাথে এতটাই ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল যে, সাধারণ মানুষের চোখে সাম্রাজ্যের এই শ্রদ্ধেয় প্রতিমূর্তির মৃত্যু স্বয়ং সাম্রাজ্যের মৃত্যুর সমতুল্য হবে। স্লাভিক রাজনীতির অন্যতম চতুর কৌশল ছিল এই ধারণা তৈরি করা যে, অস্ট্রিয়ান রাষ্ট্রের অস্তিত্ব শুধুমাত্র এই সম্রাটের অসাধারণ প্রতিভার কারণেই সম্ভব হয়েছে। হফবুর্গে এই ধরনের তোষামোদ বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিল, বিশেষত যেহেতু এর সাথে সম্রাটের প্রকৃত কর্তব্যের কোনো সম্পর্ক ছিল না । এই প্রশংসার আড়ালে সুকৌশলে রচিত প্রহসনটি খুঁজে বের করার কোনো চেষ্টাই করা হয়নি। এই সত্যটি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছিল, সম্ভবত ইচ্ছাকৃতভাবেই, যে সাম্রাজ্য "সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী সম্রাট"-এর তথাকথিত প্রশাসনিক প্রতিভার উপর যত বেশি নির্ভরশীল থাকবে, নিয়তি যখন দরজায় কড়া নাড়বে এবং তার প্রাপ্য দাবি করবে , তখন পরিস্থিতি ততই ভয়াবহ হবে।

এর শ্রদ্ধেয় শাসককে ছাড়া অস্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যকে কি কল্পনা করা যায় ?
মারিয়া তেরেসার উপর যে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল, তার কি পুনরাবৃত্তি ঘটবে না ?

যে যুদ্ধ এড়ানো যেত, তা শুরু করার জন্য ভিয়েনার সরকারি মহলকে দোষারোপ করা সত্যিই অন্যায় । এই যুদ্ধটা হতেই হতো। হয়তো সম্ভব হতো
এটাকে এক বছর, বড়জোর দুই বছরের জন্য স্থগিত করা । কিন্তু জার্মানদের অভিশাপ তো বরাবরই আছে, সেইসাথে অস্ট্রিয়ান কূটনীতিকরা অবশ্যম্ভাবী বিচারের দিনটি বিলম্বিত করার চেষ্টা করছিলেন, যার ফলে আঘাতটি সর্বদা সবচেয়ে প্রতিকূল মুহূর্তে এসে পড়ত।

না। যারা এই যুদ্ধ চায়নি, তাদের এই অস্বীকৃতির পরিণতি মেনে নেওয়ার সাহস থাকা উচিত ছিল। সেই পরিণতির অর্থ ছিল নিশ্চিতভাবেই অস্ট্রিয়াকে বলিদান করা । আর তারপরেও যুদ্ধ আসত, এমন যুদ্ধ নয় যেখানে সমস্ত জাতি আমাদের বিরুদ্ধে একজোট হবে , বরং এমন যুদ্ধ যা হ্যাবসবার্গ রাজতন্ত্রকে বিভক্ত করে দেবে। আর তখন আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হতো যে আমরা হ্যাবসবার্গদের সাহায্যে এগিয়ে যাব , নাকি হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে দেখব এবং ভাগ্যকে তার নিজের পথে চলতে দেব ।

যারা আজ সবচেয়ে উচ্চস্বরে অভিশাপ দেয় এবং যুদ্ধের কারণ বিশ্লেষণে নিজেদের মহান প্রজ্ঞা জাহির করে, তারাই আমাদেরকে এই যুদ্ধে টেনে আনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে।

বিগত কয়েক দশক ধরে জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য এক কুটিল ও অন্যায়ভাবে উস্কানি দিয়ে আসছিল ; অন্যদিকে জার্মান সেন্টার পার্টি ধর্মীয় কারণে অস্ট্রিয়াকে জার্মান নীতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছিল। এই উন্মাদনার পরিণতি ভোগ করা অবশ্যম্ভাবী ছিল । যা হওয়ার ছিল , তা কোনো অবস্থাতেই এড়ানো যেত না । জার্মান সরকারের অপরাধ এই যে , শুধুমাত্র যেকোনো মূল্যে শান্তি রক্ষার নামে তারা পদক্ষেপ নেওয়ার অনুকূল সুযোগগুলো হাতছাড়া করেছে, বিশ্বশান্তি রক্ষার নামে জোটবদ্ধ হয়েছে এবং অবশেষে হয়ে উঠেছে

সেই বিশ্ব জোটের শিকার , যারা জার্মানির শান্তি বজায় রাখার প্রচেষ্টার বিরোধিতা করেছিল এবং একটি বিশ্বযুদ্ধ শুরু করতে বদ্ধপরিকর ছিল ।

Machine Translated by Google

সেই সময়ে ভিয়েনার সরকার যদি চরমপত্রটি আরও কম কঠোরভাবে জারি করত, তাহলে পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তনই হতো না; কিন্তু তা হয়তো জনরোষের কারণ হতে পারত। সাধারণ মানুষের চোখে চরমপত্রটি ছিল যথেষ্ট সংযত এবং কোনোভাবেই অতিরিক্ত বা নৃশংস ছিল না।

যারা আজ এটা অস্বীকার করে, তারা হয় স্বল্পস্মৃতির বোকা অথবা ইচ্ছাকৃত মিথ্যাবাদী।

১৯১৪ সালের যুদ্ধ জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়নি; এটি ছিল সমগ্র জাতির কাম্য।

সাধারণ নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতিকে চিরতরে শেষ করে দেওয়ার একটি আকাঙ্ক্ষা ছিল এটি । আর কেবল এই সত্যের আলোকেই আমরা বুঝতে পারি, কেন বিশ লক্ষেরও বেশি জার্মান এই আদর্শের জন্য নিজেদের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে স্বেচ্ছায় সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল ।

* * *

আমার কাছে সেই সময়গুলো ছিল যৌবনকালে চেপে থাকা দুশ্চিন্তাগুলো থেকে মুক্তির মতো। আজ এটা স্বীকার করতে আমার কোনো লজ্জা নেই যে, আমি সেই মুহূর্তের উত্তেজনায় এতটাই মগ্ন হয়েছিলাম যে, হাঁটু গেড়ে বসে এমন সময়ে বেঁচে থাকার সুযোগ দেওয়ার জন্য অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম ।

বিশ্ব ইতিহাসে নজিরবিহীন এক স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হয়েছিল । যে মুহূর্ত থেকে নিয়তি হাল ধরল , জনগণের মধ্যে এই বিশ্বাস দৃঢ় হতে লাগল যে, এখানে অস্ট্রিয়া বা সার্বিয়ার ভাগ্য নয় , বরং সমগ্র জার্মান জাতির অস্তিত্বই ঝুঁকির মুখে।

অবশেষে , বহু বছরের অন্ধত্বের পর, মানুষ ভবিষ্যতের দিকে উজ্জ্বলভাবে তাকাচ্ছিল। তাই, এই বিশাল সংগ্রাম শুরু হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই , অতিরিক্ত উৎসাহের জায়গায় আরও গম্ভীর ও যথাযথ একটি সুর চলে আসে, কারণ সাধারণ আধ্যাত্মিক উচ্ছ্বাস কেবল একটি ক্ষণস্থায়ী উন্মাদনা ছিল না। পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করা প্রয়োজন ছিল । সেই সময়ে, সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই যুদ্ধ কতদিন চলতে পারে সে সম্পর্কে মানুষের কোনো ধারণাই ছিল না । মানুষ স্বপ্ন দেখত যে সৈন্যরা বড়দিনে ফিরে আসবে এবং শান্তিতে তাদের দৈনন্দিন কাজে ফিরে যাবে।

মানুষ যা চায়, তাতেই আশা ও বিশ্বাস রাখে। দেশের সিংহভাগ মানুষ দীর্ঘদিন ধরেই জনজীবনের সার্বিক পরিস্থিতি ঘিরে থাকা অবিরাম অনিশ্চয়তায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল । তাই , কেউই বিশ্বাস করত না যে অস্ট্রো-সার্বীয় সংঘাতের শান্তিপূর্ণ সমাধান হতে পারে। ফলে, তারা কোনো আমূল সমাধানের জন্য অপেক্ষা করতে পারছিল না । আমিও সেই লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে একজন ছিলাম যারা এটাই চাইত।

যখন সারায়েভোর সহিংসতার খবর মিউনিখে পৌঁছাল, তখন আমার মনে দুটি চিন্তা এল । প্রথমত, যুদ্ধ ছিল একেবারেই অনিবার্য, এবং দ্বিতীয়ত, হ্যাবসবার্গ রাষ্ট্র জোটে তাদের অংশগ্রহণ স্বীকার করতে বাধ্য হবে। আমার সবচেয়ে বড় ভয় ছিল যে, হয়তো এই জোটের ফলেই একদিন জার্মানি এমন এক সংঘাতে জড়িয়ে পড়বে, যার মূল কারণের সঙ্গে অস্ট্রিয়ার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। আমার আশঙ্কা ছিল যে , সেক্ষেত্রে অস্ট্রিয়া অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কারণে তার মিত্রের পক্ষে সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম প্রমাণিত হবে। কিন্তু এখন আর সেরকম কোনো বিপদ ছিল না।

পুরাতন রাষ্ট্রটি ইচ্ছা করুক বা না করুক, যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল।

এই সংঘাতের প্রতি আমার নিজস্ব মনোভাব ছিল সহজ ও স্পষ্ট। আমি বিশ্বাস করতাম, এটা আত্মতৃপ্তির জন্য অস্ট্রিয়ার সাথে সার্বিয়ার যুদ্ধ নয়, বরং জার্মানির অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম— জার্মান জাতির নিজস্ব অস্তিত্ব , স্বাধীনতা এবং ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রাম। বিসমার্কের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতেই হতো । ভাইসেনবার্গ থেকে সেডান ও প্যারিস পর্যন্ত বহু বীরত্বপূর্ণ রণক্ষেত্রে আমাদের পূর্বপুরুষদের ঝরানো রক্তের যোগ্য প্রমাণ করতে হতো নবীন জার্মানিকে । আর এই সংগ্রাম যদি আমাদের বিজয় এনে দিত, তবে আমাদের জাতি আবারও মহান জাতিগুলোর কাতারে ফিরে আসত। কেবল তখনই জার্মান রাইখ শান্তি রক্ষার নামে তার সন্তানদের দৈনন্দিন জীবনধারণে বাধা না দিয়েই শান্তির এক শক্তিশালী রক্ষক হিসেবে কাজ করতে পারত।

ছেলেবেলায় ও যুবক বয়সে আমি প্রায়ই এটা প্রমাণ করার সুযোগের জন্য আকুল থাকতাম যে, আমার জাতীয় উদ্দীপনা নিছক কোনো খেয়াল ছিল না। মাঝে মাঝে আমার মনে হতো যে "হুররে" ধ্বনিটি ছিল

Machine Translated by Google

এক ধরনের দুর্বলতা, যদিও আমি কোনোভাবেই এই অনুভূতিকে সমর্থন করতে পারি না ; সর্বোপরি , যেখানে কোনো ভান নেই , এবং যেখানে ভাগ্যদেবীর হাত জাতি ও জনগণের আন্তরিকতা এবং সত্যবাদিতাকে তাঁর অমোঘ পরীক্ষার সম্মুখীন করে, সেখানে এই বিজয়সূচক শব্দটি উচ্চারণ করার অধিকার কার আছে , যদি না সে তা করার অধিকার অর্জন করে থাকে? লক্ষ লক্ষ অন্যদের মতো, এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরে আমিও এক গর্বিত আনন্দ অনুভব করেছিলাম। আমি এতবার "ডয়েচলান্ড উবার আলেস" গেয়েছি এবং এতবার "হাইল" বলে চিৎকার করেছি যে আমার কাছে এটা এক ধরনের বিলম্বিত অনুগ্রহ বলে মনে হয়েছিল যে , এই অনুভূতিগুলোর সত্যতা প্রমাণ করার জন্য আমাকে শাশ্বত ন্যায়বিচারের আদালতে হাজির হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

একেবারে শুরু থেকেই একটা বিষয় আমার কাছে স্পষ্ট ছিল: যুদ্ধ শুরু হলে, যা এখন অনিবার্য বলে মনে হচ্ছিল , আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার বইগুলো ফেলে দেব । আমি উপলব্ধি করেছিলাম যে, বিবেকের অন্তরের ডাক যেখানে আমাকে ডাকবে, সেখানেই আমার স্থান ।

আমি মূলত রাজনৈতিক কারণেই অস্ট্রিয়া ত্যাগ করেছিলাম । যুদ্ধ শুরু হলে আমার রাজনৈতিক মতাদর্শের যৌক্তিক পরিণতি বাস্তবায়ন করার চেয়ে যুক্তিসঙ্গত আর কী হতে পারত? হ্যাবসবার্গদের পক্ষে যুদ্ধ করার কোনো ইচ্ছা আমার ছিল না, কিন্তু আমার ভাইদের জন্য এবং যে রাইখের তারা প্রকৃতই অংশ ছিল , তার জন্য আমি যেকোনো মুহূর্তে প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলাম ।

১৯১৪ সালের ৩রা আগস্ট, আমি বাভারিয়ার একটি রেজিমেন্টে কাজ করার অনুমতি চেয়ে মহামান্য রাজা তৃতীয় লুডভিগের কাছে একটি জরুরি আবেদনপত্র পেশ করি। সেই দিনগুলিতে চ্যান্সেলরির কাজের চাপ অনেক বেশি ছিল, তাই পরের দিনই উত্তর পেয়ে আমি আরও বেশি আনন্দিত হলাম – আমার আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছিল। আমি কাঁপতে কাঁপতে নথিটি খুললাম ; এবং যখন পড়লাম যে আমাকে সেখানে কাজ করার জন্য পাঠানো হবে, তখন আমার যে তৃপ্তি হয়েছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।
বাভারিয়ান রেজিমেন্টের কাছে একটি প্রতিবেদনের জন্য । কয়েক দিনের মধ্যেই আমি এমন একটি ইউনিফর্ম পরলাম যা আমি প্রায় ছয় বছর খুব কমই খুলেছি ।

আমার জন্য, এবং প্রত্যেক জার্মানের মতোই, আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় অধ্যায় শুরু হয়েছিল । এই বিশাল সংগ্রামের মুখোমুখি হয়ে , সমগ্র অতীত বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গিয়েছিল। আমরা সেই দিনগুলোকে গভীর গর্বের সাথে স্মরণ করি, বিশেষ করে যখন এই স্মরণীয় ঘটনার দশম বার্ষিকী ঘনিয়ে আসছে । আমার মনে পড়ে যুদ্ধের সেই প্রথম সপ্তাহগুলোর কথা, যখন সৌভাগ্য আমাকে সুযোগ করে দিয়েছিল ...
জাতিসমূহের মধ্যে এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে অংশগ্রহণ ।

একের পর এক ছবি আমার স্মৃতিতে ভেসে ওঠে , যেন ঘটনাটা গতকালই ঘটেছে। আমি দেখি
আমাদের প্রথম কুচকাওয়াজে আমি আমার তরুণ সহযোদ্ধাদের মধ্যে ছিলাম, এবং এভাবেই চলতে থাকলো সেই দিন পর্যন্ত যেদিন আমাদের রণাঙ্গনের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার কথা ছিল।

অন্যদের মতো আমারও তখন একটাই চিন্তা ছিল: ভয় হচ্ছিল, আমরা হয়তো যুদ্ধ করার জন্য রণাঙ্গনে খুব দেরিতে পৌঁছাব । এই চিন্তাটা আমাকে বারবার পীড়া দিত, এবং প্রতিটি বিজয়ের ঘোষণা এক তিক্ত অনুভূতি রেখে যেত, যা পরবর্তী বিজয়ের খবর আসার সাথে সাথে আরও গভীর হতো ।

অবশেষে সেই দিনটি এল যখন আমরা আমাদের লক্ষ্য পূরণের জন্য মিউনিখ ত্যাগ করলাম।
সেবা। এক চিরাচরিত ও লোভী শত্রুর বিরুদ্ধে এই ঐতিহাসিক জার্মান নদীর তীরে দাঁড়ানোর জন্য যখন আমরা পশ্চিমে যাচ্ছিলাম, তখন জীবনে প্রথমবারের মতো রাইন নদী দেখলাম। যখন ভোরের প্রথম আলো কুয়াশা ভেদ করে নিডারওয়াল্ড স্মৃতিস্তম্ভকে দৃশ্যমান করল, তখন সৈন্যদের পুরো দলটি সমস্বরে "ডাই ওয়াখট আম রাইন" (রাইনের জলরাশি) গাইতে শুরু করল । আমার মনে হচ্ছিল যেন আমার হৃদয় সেই উদ্দীপনা ধারণ করতে পারছে না।

তারপর ফ্ল্যান্ডার্সে এলো এক স্যাঁতসেঁতে, ঠান্ডা রাত। আমরা সারারাত নিঃশব্দে এগিয়ে চললাম, আর কুয়াশার আড়াল থেকে ভোরের সূর্য উঠতেই হঠাৎ আমাদের মাথার উপর লোহার এক স্বাগত ধ্বনি বিস্ফোরিত হলো। আমাদের মাঝে শ্র্যাপনেল বিস্ফোরিত হয়ে স্যাঁতসেঁতে মাটিকে ছড়িয়ে দিল। কিন্তু বিস্ফোরণের ধোঁয়া মিলিয়ে যাওয়ার আগেই, মৃত্যুকে দেওয়া এই প্রথম স্বাগত সম্ভাষণে দুশো কণ্ঠ থেকে এক উন্মত্ত 'হুররে' ধ্বনি গর্জে উঠল। শুরু হলো গুলির শিস আর বন্দুকের গর্জন, যোদ্ধাদের চিৎকার আর গান । আমরা আরও দ্রুত, আরও দ্রুত এগিয়ে চললাম , অবশেষে মানুষে মানুষে লড়াইয়ে প্রবেশ করলাম ।

দূর থেকে ভেসে আসা গানের সুর দ্রুত আমাদের কাছে এসে পৌঁছাল । একের পর এক দল এসে তা আরও কাছে আসতে লাগল । আর যখন মৃত্যু আমাদের ওপর তার আঘাত হানতে শুরু করল , আমরা গানটি এগিয়ে দিলাম।
tym, którzy byli za nami: Deutschland, Deutschland uber Alles, uber Alles in der Welt.

Machine Translated by Google

চার দিন পরিখায় থাকার পর আমরা ফিরলাম। এমনকি আমাদের হাঁটার ভঙ্গিও ছিল অন্যরকম। সতেরো বছর বয়সী ছেলেগুলোকে দেখতে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের মতো লাগতো। লিস্টের রেজিমেন্টের সাধারণ সৈনিকরা যুদ্ধবিদ্যায় তেমন প্রশিক্ষিত ছিল না, কিন্তু তারা অভিজ্ঞ সৈনিকের মতো মৃত্যুবরণ করতে জানত। ১১)

ওটাই ছিল শুরু। আর এভাবেই চলল, বছরের পর বছর। রোমাঞ্চকর লড়াইয়ের চেতনার জায়গা নিল আতঙ্ক। ধীরে ধীরে উৎসাহ কমে গেল, আর সর্বব্যাপী মৃত্যুর ভয়ে মৌলিক শক্তিগুলো রুদ্ধ হয়ে গেল । এমন এক সময় এল যখন আমাদের প্রত্যেকের ভেতরে বেঁচে থাকার ইচ্ছা আর কর্তব্যবোধের মধ্যে এক দ্বন্দ্ব দেখা দিল। আমাকেও এই দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল । যখন মৃত্যু সর্বত্র নির্মমভাবে শিকার খুঁজছিল , তখন দুর্বল শরীরের ভেতরে এক নামহীন সত্তা বিদ্রোহ করে উঠল এবং নিজেকে সাধারণ জ্ঞান হিসেবে জাহির করার চেষ্টা করল; কিন্তু আদতে, সেটা ছিল ভয়, যা এই ছদ্মবেশে ব্যক্তিকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করত। কিন্তু বিচক্ষণতার পরামর্শ দেওয়া কণ্ঠস্বরটি যতই জোরালো হতে লাগল...

সে তার প্রচেষ্টা বাড়িয়ে দিল, এবং তার আকর্ষণ যত স্পষ্ট ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠল , প্রতিরোধও তত প্রবল হতে লাগল; অবশেষে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের অবসান ঘটল এবং কর্তব্যবোধের জয় হলো।
১৯১৫-১৬ সালের শীতে আমি এক অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম । আমার ইচ্ছাশক্তি তার অদম্য আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করল। যেখানে প্রথমে আমি হাসি-খুশি আর আনন্দ নিয়ে যুদ্ধে নেমেছিলাম , এখন আমি ছিলাম স্বভাবসুলভভাবে শান্ত ও ধীরস্থির। আর এই মেজাজ বজায় রইল। ভাগ্য আমার স্নায়ু বা বিবেককে না ভেঙেই আমাকে চূড়ান্ত পরীক্ষায় ফেলতে পারত । সেই তরুণ স্বেচ্ছাসেবক হয়ে উঠল
পুরোনো সৈনিক।

সমগ্র সেনাবাহিনী জুড়েই একই রূপান্তর ঘটেছিল। অবিরাম লড়াই সেনাবাহিনীকে বয়স্ক ও শক্তিশালী করে তুলেছিল , ফলে তা যেকোনো আক্রমণের বিরুদ্ধে অটল ও নির্ভীকভাবে রুখে দাঁড়াতে পারত ।

কেবল এখনই এই সেনাবাহিনীকে মূল্যায়ন করা সম্ভব ছিল । দুই-তিন বছর ধরে অবিরাম লড়াই, এক যুদ্ধ থেকে আরেক যুদ্ধে নিক্ষিপ্ত হওয়া, সংখ্যা ও অস্ত্রের আধিক্যের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিরোধ গড়া , ক্ষুধা ও বঞ্চনা সহ্য করার পর, এর মূল্য যাচাই করার সময় এসে গিয়েছিল।
এই অসাধারণ সেনাবাহিনী।

আগামী সহস্র বছর ধরে , বিশ্বযুদ্ধে জার্মান সেনাবাহিনীর কথা উল্লেখ না করে বীরত্বের কথা বলার সাহস কেউ করবে না । আর তখন, সুদূর অতীত থেকে , ইস্পাতের শিরস্ত্রাণ পরিহিত অবিচল ও অটল সৈন্যদের সারিবদ্ধ অবিস্মরণীয় প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠবে । যতদিন জার্মানি বেঁচে থাকবে, তারা গর্বের সাথে স্মরণ করবে যে এই মানুষগুলো ছিল তাদেরই পূর্বপুরুষদের সন্তান।

আমি তখন একজন সৈনিক ছিলাম এবং রাজনীতিতে জড়াতে চাইনি , বিশেষ করে যেহেতু সময়টা অনুকূল ছিল না। আমি এখনও বিশ্বাস করি যে, সেই সময়ে সবচেয়ে সাধারণ একজন আস্তাবলের ছেলেও দেশের জন্য সেরা , ধরা যাক, "সংসদ সদস্যদের" চেয়ে ভালো কাজ করেছিল । এই অলসদের প্রতি আমার ঘৃণা তখন সবচেয়ে বেশি ছিল, যখন সমস্ত ভদ্র মানুষেরা, যাদের কিছু বলার ছিল, তারা তাদের প্রতিপক্ষের মুখের ওপর তা বলত; অথবা তা না করলে , চুপ থাকত এবং অন্যত্র নিজেদের দায়িত্ব পালন করত । আমি এই রাজনৈতিক দলটিকে ঘৃণা করতাম, এবং যদি পারতাম, আমি তাদের নিয়ে একটি কার্যকরী ব্যাটালিয়ন গঠন করতাম এবং ভদ্র মানুষদের কোনো ক্ষতি না করে তাদের নিজেদের মধ্যে ইচ্ছামতো কথা বলার সুযোগ দিতাম ।

সেই দিনগুলিতে আমি রাজনীতি নিয়ে চিন্তিত ছিলাম না; কিন্তু এমন কিছু বিষয় নিয়ে আমার একটা মতামত তৈরি হয়ে গিয়েছিল যা শুধু সমগ্র জাতিকেই নয়, বিশেষ করে সৈন্যদেরকেও প্রভাবিত করত। দুটি বিষয় ছিল যা সেই সময়ে আমাকে সবচেয়ে বেশি চিন্তিত করেছিল এবং যেগুলোকে আমি আমাদের স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর বলে মনে করতাম।

আমাদের প্রথম জয়ের ধারার কিছুদিন পরেই, সংবাদমাধ্যমের একাংশ শীতল মনোভাব দেখাতে শুরু করে । জনমতের উৎসাহের উপর ফোঁটা ফোঁটা করে জল ঢালা হচ্ছিল। প্রথমে , এই বিষয়টি অনেকের কাছেই স্পষ্ট ছিল না। এটি করা হয়েছিল সদিচ্ছা এবং সহানুভূতির আড়ালে। জনগণকে বলা হয়েছিল যে বিজয়ের জাঁকজমকপূর্ণ উদযাপন অনুচিত এবং একটি মহান জাতির চেতনা প্রকাশের যোগ্য নয়। জার্মান সৈন্যদের শক্তি ও সাহসকে এমন সত্য হিসেবে মেনে নেওয়া হয়েছিল, যার জন্য উদযাপনের উদ্দামতার কোনো প্রয়োজন ছিল না । অধিকন্তু, প্রশ্ন করা হয়েছিল যে এই প্রদর্শনী সম্পর্কে বিদেশী মতামত কী বলবে? এই উন্মত্ত উল্লাসের চেয়ে বিদেশীরা কি একটি শান্ত ও শান্তিপূর্ণ উদযাপনের প্রতি আরও ভালোভাবে সাড়া দেবে না ? নিশ্চয়ই সময় এসে গেছে – যেমনটা সংবাদমাধ্যম বলছিল – আমাদের জার্মানদের মনে করার যে এই যুদ্ধ আমাদের করা নয় এবং এর জন্য দুঃখ করার কোনো প্রয়োজন নেই।

জাতিসমূহের মধ্যে বোঝাপড়া তৈরিতে অংশগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করার জন্য আমরা লজ্জিত । এই কারণে, এই উজ্জ্বল কীর্তিগুলোকে কলঙ্কিত করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

Machine Translated by Google

আমাদের সেনাবাহিনীকে একটি অনুপযুক্ত উদযাপনের মাধ্যমে; বাকি বিশ্ব তা কখনোই বুঝবে না। অধিকন্তু , একজন প্রকৃত বীর যে বিনয়ের সাথে নীরবে ও শান্তিপূর্ণভাবে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যান, তার চেয়ে প্রশংসনীয় আর কিছুই নেই । এটাই ছিল তাদের সতর্কবাণীর সারমর্ম।

এই দলটিকে তাদের লম্বা কান ধরে টেনে কোনো খাদে ফেলে গলায় দড়ি বেঁধে দেওয়ার পরিবর্তে , যাতে জাতির বিজয়োল্লাস এই কলমবাজ বীরদের নান্দনিক অনুভূতিতে আঘাত না করে , সংবাদমাধ্যমকে বিজয় উদযাপনের তথাকথিত "অনুপযুক্ত" এবং "মর্যাদাহীন" রূপগুলোর বিরুদ্ধে প্রচার চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

কারোরই যে বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না যে , একবার জনউচ্ছ্বাস দমন করা হলে, প্রয়োজনের সময় কোনো কিছুই তা পুনরায় জাগিয়ে তুলতে পারবে না। এই উচ্ছ্বাস ছিল এক নেশার মতো এবং একে সেই অবস্থাতেই বজায় রাখতে হবে। এই উদ্যমী চেতনার সাহায্য ছাড়া এমন এক সংগ্রামে টিকে থাকা কীভাবে সম্ভব, যা মানবিক মানদণ্ডে একটি জাতির আধ্যাত্মিক সহনশীলতার ওপর এমন বিপুল দাবি উত্থাপন করে?

জনসাধারণের মনস্তত্ত্বের সাথে আমার এতটাই ভালো পরিচয় ছিল যে আমি জানতাম , এমন ক্ষেত্রে একটি উদার 'সৌন্দর্যবোধ' লোহাকে গরম রাখার জন্য প্রয়োজনীয় আগুন জ্বালাতে ব্যর্থ হয় । আমার মতে, ভুলটা ছিল উত্থাপন করার চেষ্টা না করা।
জনউচ্ছ্বাসের শিখরকে আরও উঁচুতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। তাই আমি কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না কেন এর বিপরীত নীতি, অর্থাৎ জনমনে উৎসাহ দমনের নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল।

আরেকটি বিষয় যা আমাকে বিরক্ত করেছিল তা হলো মার্ক্সবাদকে যেভাবে স্বীকৃতি ও গ্রহণ করা হয়েছিল। আমার মনে হয়েছিল, এতেই বোঝা যায় মার্ক্সবাদী মহামারী সম্পর্কে তাদের জ্ঞান কতটা কম ছিল। তারা বেশ গুরুত্বের সাথেই বিশ্বাস করত যে, যুদ্ধের সময় দলীয় ভেদাভেদ বিলুপ্ত হয়ে গেলে মার্ক্সবাদ নম্র ও মধ্যপন্থী হয়ে উঠবে।

কিন্তু এটা দলীয় বিষয় ছিল না। এটা ছিল মতবাদের বিষয় যা নেতৃত্ব দিতে বাধ্য ছিল।
মানবতার ধ্বংসের দিকে। এই মতবাদের অর্থ ভুল বোঝা হয়েছিল, কারণ আমাদের ইহুদি-শাসিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সমস্যার এই দিকটি নিয়ে কিছুই বলা হয়নি এবং আমাদের দাম্ভিক আমলাতান্ত্রিক কর্মকর্তারা তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত নয় এমন বিষয়গুলিকে মনোযোগের যোগ্য বলে মনে করেননি। এই শক্তিশালী বিপ্লবী প্রবণতাগুলি তাদের পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছিল; কিন্তু এই "বুদ্ধিজীবীরা" তাদের মনোযোগ দিয়ে সেগুলোকে সম্মান জানাননি । এ কারণেই রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলি প্রায় সবসময়ই বেসরকারি উদ্যোগগুলির থেকে পিছিয়ে থাকে। বলা যেতে পারে যে তাদের নীতি

তাদের মূলমন্ত্র ছিল: "যা আমরা জানি না, তা নিয়ে আমরা চিন্তিত নই।" ১৯১৪ সালের আগস্ট মাসে জার্মান শ্রমিককে মার্ক্সবাদী সমাজতন্ত্রের সমর্থক হিসেবে দেখা হতো। এটি ছিল এক গুরুতর ভুল। যখন সেই দুর্ভাগ্যজনক মুহূর্তটি উপস্থিত হলো , জার্মান শ্রমিক এই মহামারীর বিষাক্ত কবল থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছিল; নইলে সে লড়াই করার জন্য এতটা ইচ্ছুক ও প্রস্তুত থাকত না। ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিরা এতটাই বোকা ছিল যে তারা ভেবেছিল মার্ক্সবাদ "জাতীয়তাবাদী" হয়ে উঠেছে , যা এই সত্যের আরেকটি উপযুক্ত দৃষ্টান্ত যে তারা মার্ক্সবাদী মতবাদের প্রকৃত মর্ম অধ্যয়ন করার কষ্টটুকুও কখনো করেনি। যদি তারা তা করত, তবে তারা এমন বোকামির ভুল করত না।

মার্ক্সবাদ, যার প্রধান লক্ষ্য ছিল এবং থাকবে অ- ইহুদি জাতি-রাষ্ট্রগুলোর ধ্বংসসাধন, সে নিশ্চয়ই দেখেছে যে, ১৯১৪ সালের জুলাই মাসের সেই দিনগুলোতে, তারই ফাঁদে আটকানো জার্মান শ্রমিক শ্রেণি কীভাবে জাতীয় চেতনায় জাগ্রত হয়ে দ্রুত পিতৃভূমির পক্ষ নিয়েছিল। কয়েক দিনের মধ্যেই এই লজ্জাজনক জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতার ছলনাময় ধোঁয়াশা উধাও হয়ে গেল , এবং ইহুদি মালিকরা হঠাৎ নিজেদের একা ও পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখতে পেল। যেন ষাট বছর ধরে জার্মান জাতির মধ্যে গেঁথে দেওয়া মূর্খতা ও উন্মাদনার কোনো চিহ্নই অবশিষ্ট ছিল না। জার্মান শ্রমিকদের বিশ্বাসঘাতকদের জন্য এটি ছিল সত্যিই এক অশুভ দিন । কিন্তু, যখন তারা নিজেদের ওপর আসন্ন বিপদ উপলব্ধি করল , তখন তারা প্রতারণার জাদুর টুপিটি কানে টেনে নিল এবং কারও নজরে না পড়েই জাতির পুনর্জাগরণে মূকাভিনয়কারীর ভূমিকা পালন করল ।

সমাজের উপদ্রবকারী ইহুদিদের পুরো দলটিকে শায়েস্তা করার সময় এসে গিয়েছিল । কোনো রকম ঘ্যানঘ্যানানি বা প্রতিবাদ সত্ত্বেও এই কাজটি করতেই হতো । ১৯১৪ সালের আগস্ট মাসে এক আঘাতেই আন্তর্জাতিক সংহতি বিষয়ক সমস্ত অন্তঃসারশূন্য বুলি জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর মন থেকে মুছে দেওয়া হয়েছিল। কয়েক সপ্তাহ পরে, এই সব বোকার মতো কথাবার্তার পরিবর্তে, তারা তাদের মাথার উপর দিয়ে আমেরিকান-নির্মিত শ্র্যাপনেলের শিস দেওয়ার শব্দ শুনতে পেল।

Machine Translated by Google

আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বের প্রতীক হিসেবে মিছিল। জার্মান শ্রমিকরা জাতীয়তাবাদের পথ পুনরায় খুঁজে পেয়েছিল , এবং জনগণের প্রতি যত্নশীল প্রতিটি সরকারেরই কর্তব্য হওয়া উচিত এই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে জাতীয় চেতনার বিরোধী সবকিছুকে নির্মমভাবে নির্মূল করা।

যখন জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানরা রণাঙ্গনে মৃত্যুবরণ করছিল, তখন দেশের অভ্যন্তরে এই কীটদের নির্মূল করার যথেষ্ট সময় ছিল। কিন্তু তা না করে, মহামান্য সম্রাট এই চিরস্থায়ী অপরাধীদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন , এবং এভাবে তাদের সুরক্ষা ও আরোগ্য লাভের সুযোগ করে দিলেন।

আর তাই বিষধর সাপগুলো আবার তাদের কাজ শুরু করতে পারল। এবার আগের চেয়ে আরও সতর্কভাবে , কিন্তু আরও ধ্বংসাত্মকভাবে। সৎ মানুষেরা যখন মীমাংসার স্বপ্ন দেখছিল, এই শপথভঙ্গকারী দস্যুরা তখন বিপ্লবের প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

অবশ্যই, সেই সময়ে নেওয়া অসম্পূর্ণ পদক্ষেপগুলো নিয়ে আমি চিন্তিত ছিলাম ; কিন্তু আমি কখনো কল্পনাও করিনি যে এর চূড়ান্ত পরিণতি এতটা ভয়াবহ হবে।

কিন্তু তখন কী করা উচিত ছিল? মূল হোতাদের কারাগারে নিক্ষেপ করে তাদের বিচার করা এবং জাতিকে তাদের থেকে মুক্ত করা। এই অশুভ শক্তিকে নির্মূল করতে নির্মম সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত ছিল। দলগুলোকে ভেঙে দেওয়া উচিত ছিল এবং প্রয়োজনে বেয়নেটের জোরে রাইখস্ট্যাগকে নিয়ন্ত্রণে আনা উচিত ছিল। কিন্তু এর চেয়েও ভালো হতো যদি সরকারকে অবিলম্বে ভেঙে দেওয়া যেত।

রাইখস্ট্যাগ। যেহেতু আজকের প্রজাতন্ত্র ইচ্ছামতো দল ভেঙে দেয় , তাই এই পদক্ষেপটি আরও বেশি যুক্তিযুক্ত ছিল, কারণ জাতির অস্তিত্বই বিপন্ন ছিল। অবশ্যই, এই প্রস্তাবটি নিম্নলিখিত প্রশ্নটি উত্থাপন করে: সশস্ত্র শক্তি দিয়ে কি ধারণা নির্মূল করা যায় ? কোনো বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গিকে কি শারীরিকভাবে আক্রমণ করা যায় ?

এই সময়ে আমি মনে মনে বিষয়টি নিয়ে ভাবতে থাকলাম। অনুরূপ ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত, বিশেষ করে ধর্মীয় কারণে উদ্ভূত ঘটনাগুলো অধ্যয়ন করে আমি নিম্নলিখিত মৌলিক সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম: দার্শনিক ধারণা ও ব্যবস্থা, সেইসাথে আন্দোলনসমূহ, কিছু নির্দিষ্ট আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যা

সত্য হোক বা না হোক, একটি নির্দিষ্ট পর্যায় অতিক্রম করার পর বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ধ্বংস করা যায় না, একটি ক্ষেত্র ছাড়া: আর তা হলো, যদি এই বলপ্রয়োগ কোনো নতুন ধারণা বা বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির স্বার্থে করা হয় , যা এক নতুন শিখায় প্রজ্বলিত হয়েছে।

আধ্যাত্মিক ধারণার উপর ভিত্তি করে নৈতিক সমর্থন ছাড়া শুধুমাত্র বলপ্রয়োগ কোনো ধারণাকে ধ্বংস করতে বা তার বিস্তারকে বাধা দিতে পারে না, যদি না কেউ এর অনুসারীদের শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্ত নির্মমভাবে নির্মূল করতে এবং এর রেখে যাওয়া সমস্ত ঐতিহ্য মুছে ফেলতে প্রস্তুত থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে , এর অর্থ হলো রাষ্ট্রকে সাময়িকভাবে বা স্থায়ীভাবে রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রগুলোর তালিকা থেকে বাদ দেওয়া ; কিন্তু অভিজ্ঞতা এও দেখায় যে এই ধরনের রক্তাক্ত নির্মূল অভিযান জনসংখ্যার উত্তম অংশকেই প্রভাবিত করে। প্রকৃতপক্ষে, আধ্যাত্মিক প্রেরণা ছাড়া যেকোনো নিপীড়ন নৈতিকভাবে অন্যায় এবং জনসংখ্যার শ্রেষ্ঠ অংশের মধ্যে প্রতিরোধের জন্ম দেয়, যার ফলে তারা ক্রমশ অন্যায়ভাবে নিপীড়িত ধারণাগুলোর সমর্থক হয়ে ওঠে। অনেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে, এটি পাশবিক শক্তি দ্বারা আধ্যাত্মিক বিষয়কে দমন করার যেকোনো প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে এক বিশুদ্ধ বিরোধিতার মনোভাব থেকে উদ্ভূত হয়।

সুতরাং, নিপীড়ন যত বাড়তে থাকে , নির্যাতিত মতবাদের দৃঢ়প্রত্যয়ী অনুসারীর সংখ্যাও তত বৃদ্ধি পায়। তাই, একটি নতুন মতবাদের সম্পূর্ণ বিনাশ কেবল পূর্ণাঙ্গ নির্মূলের মাধ্যমেই সম্ভব ; কিন্তু চূড়ান্ত বিশ্লেষণে এর অর্থ হলো জাতি বা রাষ্ট্রের সেরা কিছু রক্তকে হারানো। আর এই রক্তই পরে তার প্রতিশোধ নেয় , কারণ এই ধরনের পূর্ণাঙ্গ অভ্যন্তরীণ শুদ্ধিকরণ জাতির শক্তির পতন ঘটায়। যদি আক্রান্ত মতবাদটি ছড়িয়ে পড়ে , তবে এই ধরনের প্রক্রিয়া শুরু থেকেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

একটি ছোট বৃত্তের বাইরে।

সুতরাং, এক্ষেত্রে, সকল বিকাশের মতোই , মতবাদটি তার একেবারে প্রাথমিক পর্যায়েই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে প্রতিরোধের শক্তি বৃদ্ধি পায়, যতক্ষণ না বার্ধক্যের দুর্বলতা নতুন যৌবনের কাছে পথ ছেড়ে দেয় , যদিও তা ভিন্ন রূপে এবং ভিন্ন কারণে।

Machine Translated by Google

বাস্তবতা হলো , কোনো আধ্যাত্মিক ভিত্তি ছাড়াই এই মতবাদকে নির্মূল করার এবং এর দ্বারা সৃষ্ট সমস্ত সংগঠনকে নিশ্চিহ্ন করার প্রায় সকল প্রচেষ্টাই অনেক ক্ষেত্রে বিপরীত ফল দিয়েছে; নিম্নলিখিত কারণগুলোর জন্য :

যখন কোনো মতবাদের বিস্তার রোধ করতে সাধারণ শক্তি ব্যবহার করা হয় , তখন সেই শক্তি অবশ্যই পদ্ধতিগতভাবে এবং অবিচ্ছিন্নভাবে প্রয়োগ করতে হবে। এর অর্থ হলো , মতবাদটিকে থামানোর একমাত্র সুযোগ নিহিত রয়েছে নির্বাচিত পদ্ধতিগুলোর অবিচ্ছিন্ন ও অভিন্ন প্রয়োগের মধ্যে । যখনই দ্বিধার কোনো মুহূর্ত আসে এবং সহনশীলতার পর্বের সাথে শক্তি প্রয়োগ পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে , তখন যে মতবাদের বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থাগুলো নেওয়া হয়েছে, তা কেবল তার শক্তিই ফিরে পাবে না, বরং যেকোনো সফল নিপীড়ন প্রয়োগকৃত দমনমূলক পদ্ধতিতে হতবাক হয়ে এর অনুসারীর সংখ্যা বাড়িয়ে দেবে ।

পুরোনো অনুসারীরা আরও তিক্তমনা হয়ে উঠবে এবং তাদের আনুগত্য আরও দৃঢ় হবে। সুতরাং , যদি শক্তি প্রয়োগ করা হয় , তবে তার সাফল্য নির্ভর করে এর প্রয়োগের ধারাবাহিকতার ওপর । তবে, এই ধারাবাহিকতা নির্দিষ্ট আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের ফল ছাড়া আর কিছুই নয় । আধ্যাত্মিক ভিত্তি দ্বারা সমর্থিত নয় এমন যেকোনো ধরনের শক্তি সর্বদা দ্বিধাগ্রস্ত ও অনিশ্চিত হবে । একনিষ্ঠ সমর্থক রয়েছে এমন একটি বিশ্বদৃষ্টিতে যে স্থিতিশীলতা পাওয়া যায় , এই ধরনের শক্তিতে তার অভাব থাকে । এই ধরনের শক্তি হলো ব্যক্তিগত শক্তির একটি প্রকাশ; সুতরাং , এটি সময়ে সময়ে সেই ব্যক্তিদের পরিবর্তনের ওপর নির্ভরশীল, যাদের হাতে এর প্রয়োগের ভার ন্যস্ত , সেইসাথে তাদের চরিত্র ও ক্ষমতার ওপরও নির্ভরশীল।

কিন্তু এখানে আরও কিছু বলার আছে। প্রতিটি বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি, তা ধর্মীয় হোক বা রাজনৈতিক—এবং কখনও কখনও এটা বলা কঠিন যে একটি কোথায় শেষ হয় এবং অন্যটি কোথায় শুরু হয়—প্রতিপক্ষের চিন্তাজগতকে ধ্বংস করার জন্য ততটা লড়াই করে না , যতটা করে নিজের চিন্তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য। সুতরাং , এই লড়াইটি প্রতিরক্ষার চেয়ে আক্রমণের দিকেই বেশি ঝুঁকে থাকে। এর সুবিধা হলো , এটি জানে এর লক্ষ্য কোথায় , কারণ এই লক্ষ্যটি হলো এর নিজের চিন্তার বাস্তবায়ন । বিপরীতভাবে, শত্রুর মতবাদ ধ্বংস করার লক্ষ্য কখন অর্জিত ও সুরক্ষিত হয়, তা বলা কঠিন । শুধুমাত্র এই কারণেই, একটি আক্রমণাত্মক বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির পরিকল্পনাগুলো আরও সুনির্দিষ্ট হয় এবং এটি সম্পূর্ণরূপে প্রতিরক্ষামূলক মনোভাব গ্রহণকারী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে কর্মে অধিক শক্তিশালী ও সিদ্ধান্তমূলক হয় । যদি কেউ ব্যবহার করে

আত্মার শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার যে সামর্থ্য , এই শক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত কেবল আত্মরক্ষার একটি উপায় হিসেবেই থাকে, যতক্ষণ না এর ধারকেরা নতুন আধ্যাত্মিক মতবাদের পতাকাবাহক ও প্রেরিত পুরুষে পরিণত হন।

সারসংক্ষেপে আমরা বলতে পারি যে , কোনো বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের প্রতিটি প্রচেষ্টাই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ প্রমাণিত হবে , যদি সেই লড়াই গ্রহণযোগ্য না হয় ।
সম্পূর্ণ নতুন এক আধ্যাত্মিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত এক ধরনের আক্রমণ । কেবল দুটি বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির সংগ্রামে , অবিরাম ও নির্মমভাবে প্রয়োগ করা শারীরিক শক্তিই অবশেষে পাল্লাকে নিজের অনুকূলে ঝুঁকিয়ে দেবে । এ কারণেই মার্কসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এ পর্যন্ত পরাজয় ঘটেছে।

এই কারণেই সবকিছু সত্ত্বেও বিসমার্কের সমাজতন্ত্র-বিরোধী আইন ব্যর্থ হয়েছিল এবং দীর্ঘমেয়াদে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য ছিল। এর মধ্যে এমন একটি নতুন বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তির অভাব ছিল, যার জন্য লড়াই করা ও যাকে বিকশিত করা যেত ।

জীবন-মৃত্যুর সংগ্রামে আধ্যাত্মিক চালিকাশক্তির জন্য তথাকথিত " রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব " বা "আইনশৃঙ্খলা "-র মতো অর্থহীন বিষয়ের সেবা করাই যথেষ্ট — এই দাবি কেবল সরকারের উচ্চ পদে থাকা জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাছ থেকেই আসতে পারে ।

যেহেতু এই আক্রমণের পেছনে কোনো পর্যাপ্ত আধ্যাত্মিক প্রেরণা ছিল না, তাই বিসমার্ক তাঁর আইন বাস্তবায়নের ভার এমন সব মহলের বিচার ও অনুমোদনের ওপর ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, যারা নিজেরাই ছিল মার্ক্সবাদী মতবাদের ফসল। ফলে এক বীভৎস পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, কারণ এই লৌহচ্যান্সেলর মার্ক্সবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ভাগ্য বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সদিচ্ছার কাছে সঁপে দিয়েছিলেন ।
তিনি নেকড়েকে ভেড়া চরাতে রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু এটি ছিল একটি মৌলিকভাবে নতুন বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি খুঁজে বের করার অক্ষমতার অনিবার্য ফল মাত্র , যা এই আদর্শের প্রতি একনিষ্ঠ সমর্থকদের আকৃষ্ট করতে পারত এবং যে ভিত্তি থেকে মার্ক্সবাদকে উৎখাত করা হয়েছিল, তার উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারত। সুতরাং, বিসমার্কের অভিযানের ফলাফল ছিল শোচনীয়।

বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন বা এর শুরুতে পরিস্থিতি কি ভিন্ন ছিল ? দুর্ভাগ্যবশত, না।

মার্ক্সবাদের আধুনিক রূপ হিসেবে সমাজতন্ত্রের প্রতি সরকারের মনোভাব পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আমি যত বেশি ভাবতে লাগলাম, ততই আমি উপলব্ধি করতে লাগলাম।

Machine Translated by Google

এই মতবাদের একটি বাস্তবসম্মত বিকল্পের প্রয়োজন । ধরা যাক, আমরা সমাজতন্ত্রকে পরাজিত করলাম, তার বিনিময়ে আমরা জনগণকে কী দিতে পারতাম? এমন কোনো আন্দোলন ছিল না যা বিপুল সংখ্যক নেতৃত্বহীন শ্রমিককে আকৃষ্ট করে নিজের দলে ধরে রাখার ক্ষেত্রে সাফল্যের প্রতিশ্রুতি দিতে পারত । এটা কল্পনা করা অর্থহীন।

কল্পনা করুন যে একজন আন্তর্জাতিকতাবাদী উগ্রপন্থী, যিনি সবেমাত্র একটি শ্রেণী- দলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন , তিনি একটি বুর্জোয়া দলে , অথবা অন্যভাবে বললে, অন্য কোনো শ্রেণীর সংগঠনে যোগ দেবেন । এই বিভিন্ন সংগঠনগুলোকে যতই অসন্তোষজনক মনে হোক না কেন, এটা অস্বীকার করা যায় না যে বুর্জোয়া রাজনীতিবিদরা শ্রেণীভেদকে সামাজিক জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে দেখতেন , যতক্ষণ পর্যন্ত তা তাদের জন্য রাজনৈতিকভাবে অসুবিধাজনক না হয়ে দাঁড়াত।
যদি তারা এটা অস্বীকার করত, তবে তারা শুধু ঔদ্ধত্যপূর্ণই নয়, ভণ্ডও ছিল।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, জনসাধারণকে তাদের প্রকৃত অবস্থার চেয়ে বেশি বোকা ভাবা থেকে সতর্ক থাকতে হবে । সত্যিই। রাজনৈতিক বিষয়ে প্রায়শই দেখা যায় যে অনুভূতির চেয়ে আবেগই বেশি সঠিক বিচার করে।
কারণ। কিন্তু জনগণের এই অনুভূতিগুলোই তাদের নির্বোধ আন্তর্জাতিকতাবাদী মনোভাবের যথেষ্ট প্রমাণ—এই মতটিকে একটি সাধারণ সত্যের দ্বারাই তাৎক্ষণিকভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে নাকচ করে দেওয়া যায়, আর তা হলো , শান্তিবাদী গণতন্ত্রও কোনো অংশে কম নির্বোধ নয়, যদিও এর সমর্থকরা প্রায় একচেটিয়াভাবে বুর্জোয়া মহল থেকেই আসে । যতদিন লক্ষ লক্ষ নাগরিক প্রতিদিন সমাজ-গণতান্ত্রিক সংবাদমাধ্যম যা বলে তা গিলে খাবে , ততদিন পর্যন্ত "কমরেডদের" নিয়ে ঠাট্টা করা "ভদ্রলোকেরাই" হবে আসল শত্রু ; দীর্ঘমেয়াদে তারা সবাই একই আবর্জনা গিলে খায়, যদিও

এগুলোকে ভিন্নভাবে মশলাযুক্ত করা যেতে পারে । উভয় ক্ষেত্রেই রাঁধুনি একই ব্যক্তি – একজন ইহুদি।

প্রতিষ্ঠিত সত্যের বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে । এটি এক অনস্বীকার্য সত্য যে, শ্রেণি প্রশ্নের সাথে আদর্শগত প্রশ্নের কোনো সম্পর্ক নেই, যদিও নির্বাচনের সময় এমনটাই দাবি করা হয় । আমাদের জনগণের একটি বড় অংশের শ্রেণিগত ঔদ্ধত্য এবং শ্রমিকদের অবজ্ঞা করার প্রচলিত প্রবণতা সুস্পষ্ট বাস্তবতা , কোনো স্বপ্নদ্রষ্টার কল্পনাপ্রসূত বিষয় নয় । তবে, এটি আমাদের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী মহলের মানসিকতাকেই প্রকাশ করে, যারা এখনও এই সত্যটি উপলব্ধি করতে পারেনি যে, এমন একটি পরিস্থিতি যেখানে মার্ক্সবাদের মহামারীর বিস্তার রোধ করা যায় না, সেখানে যা হারিয়ে গেছে তা পুনরুদ্ধার করাও নিশ্চিতভাবে সম্ভব হবে না ।

শঙ্ক।

বুর্জোয়া দলগুলো —এই নামটি তারাই তৈরি করেছে— কখনোই সর্বহারা জনগণকে নিজেদের পক্ষে জয় করতে এবং ধরে রাখতে পারবে না । এর কারণ হলো এই দুটি জগৎ বিদ্যমান।
পরস্পরের বিপরীতে, আংশিকভাবে স্বাভাবিকভাবে এবং আংশিকভাবে কৃত্রিমভাবে বিভক্ত। এই দুটি শিবিরের একটিই মূলনীতি : তাদের একে অপরের বিরুদ্ধে লড়তেই হবে । কিন্তু এই লড়াই থেকে নবীন পক্ষটিই বিজয়ী হবে; আর সেটিই হবে মার্কসবাদ।

১৯১৪ সালে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটি সংগ্রাম বেশ অনুমেয় ছিল। কিন্তু কোনো বিকল্পের অভাব এই সংগ্রাম কতদিন স্থায়ী হতে পারে, তা নিয়ে সন্দেহ জাগিয়েছিল। সেই অর্থে, একটি বিরাট শূন্যতা ছিল।

যুদ্ধের অনেক আগে থেকেই আমার একই মত ছিল, এবং এই কারণে তৎকালীন কোনো দলেই আমি মনস্থির করতে পারিনি । বিশ্বযুদ্ধের সময় সোশ্যাল ডেমোক্রেসির বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে লড়াই করার সুস্পষ্ট অসম্ভবতা আমার বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করেছিল : এই উদ্দেশ্যে এমন একটি আন্দোলনের প্রয়োজন ছিল যা কেবল একটি 'সংসদীয়' দলের চেয়েও বেশি কিছু হবে , কিন্তু সেরকম কিছুই ছিল না।

আমি প্রায়ই আমার ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের সঙ্গে এই প্রয়োজনটি নিয়ে আলোচনা করতাম। তখনই আমি পরবর্তী রাজনৈতিক জীবনের জন্য প্রথম পরিকল্পনা সাজাতে শুরু করি । আমি আমার বন্ধুদের প্রায়ই আশ্বস্ত করতাম যে, যুদ্ধের পর পেশাগত কাজের পাশাপাশি আমি একজন সক্রিয় বক্তা হতে আগ্রহী ছিলাম। আমি নিশ্চিত যে, এই সিদ্ধান্তটি গভীর বিবেচনার পরেই নেওয়া হয়েছিল।

পাদটীকা:

১১) দ্বিতীয় বাভারিয়ান পদাতিক রেজিমেন্ট, যেখানে হিটলার স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করতেন ।

Machine Translated by Google

ষষ্ঠ অধ্যায়

যুদ্ধ প্রচারণা

রাজনৈতিক ঘটনাবলীর গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে আমি প্রচারণার সক্রিয় ভূমিকা দেখে সর্বদা বিস্মিত হয়েছি। আমি একে এমন একটি হাতিয়ার হিসেবে দেখেছি যা মার্ক্সবাদী সমাজতন্ত্রীরা নিপুণভাবে ব্যবহার করত এবং বাস্তব উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করত । আমি দ্রুতই উপলব্ধি করলাম যে, প্রচারণার যথাযথ ব্যবহার নিজেই একটি শিল্প , এবং আমাদের বুর্জোয়া দলগুলোর কাছে তা কার্যত অজানা । কেবলমাত্র খ্রিস্টান সোশ্যালিস্ট পার্টি, বিশেষত লুয়েগারের সময়ে, এই হাতিয়ারটি প্রয়োগে কিছুটা কার্যকারিতা প্রদর্শন করেছিল এবং এর সাফল্যের অনেকটাই এর কাছে ঋণী ছিল ।

তবে, যুদ্ধের সময়ই, একটি সঠিকভাবে পরিচালিত প্রচার ব্যবস্থার মাধ্যমে যে চমৎকার ফলাফল অর্জন করা যেতে পারে, তা মূল্যায়ন করার সেরা সুযোগ আমাদের ছিল । দুর্ভাগ্যবশত, আবারও সবকিছু ঘটছিল অপর পক্ষে, কারণ আমরা যে কাজ করেছিলাম তা নগণ্যেরও ঊর্ধ্বে ছিল। পুরো জার্মান তথ্য ব্যবস্থার চরম ব্যর্থতা— এমন এক ব্যর্থতা যা প্রত্যেক সৈনিকের কাছেই সুস্পষ্ট ছিল — আমাকে প্রচারণার সমস্যাটিকে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করতে বাধ্য করেছিল। এই বিষয়ে বাস্তব শিক্ষা লাভের বহু সুযোগ আমার ছিল; দুর্ভাগ্যবশত , শত্রুপক্ষ তা খুব ভালোভাবে শিখে ফেলেছিল। আমাদের পক্ষের এই দুর্বলতাকে শত্রুপক্ষ এতটাই কার্যকরভাবে কাজে লাগিয়েছিল যে, তা নিজেই এক প্রকৃত প্রতিভার প্রকাশ বলে মনে হচ্ছিল । শত্রুপক্ষের পরিচালিত এই প্রচারণার মধ্যে আমি জ্ঞান আহরণের এক চমৎকার উৎস খুঁজে পেয়েছিলাম। দুর্ভাগ্যবশত, এই শিক্ষা আমাদের পক্ষের প্রতিভাদের কাছে কোনো আগ্রহের বিষয় ছিল না । সর্বোপরি, তারা এতটাই চালাক ছিল যে কোনো শিক্ষাই গ্রহণ করতে রাজি ছিল না । তাছাড়া, তারা কিছুই শিখতে অস্বীকার করেছিল।

আমাদের কি আদৌ কোনো প্রচারণা ছিল? দুর্ভাগ্যবশত, আমি কেবল নেতিবাচক উত্তরই দিতে পারি। এই দিকে গৃহীত সমস্ত প্রচেষ্টা শুরু থেকেই এতটাই একগুঁয়েভাবে অসম্পূর্ণ এবং অপরিকল্পিত ছিল যে, সেগুলো কেবল অকেজোই ছিল না, বরং কখনও কখনও ক্ষতিকরও ছিল। বস্তুত, সেগুলো অপর্যাপ্ত ছিল। মনস্তাত্ত্বিকভাবে, সেগুলো ছিল চূড়ান্ত অশুভ। যিনিই জার্মান প্রচারণা সতর্কভাবে বিশ্লেষণ করেছেন , তিনি নিশ্চয়ই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন । আমাদের জনগণ এমনকি এই মৌলিক প্রশ্নেও স্পষ্ট ছিল না : প্রচারণা কি একটি উপায়, নাকি লক্ষ্য?

প্রচারণা একটি মাধ্যম এবং তাই এর বিচার অবশ্যই সেই উদ্দেশ্যের সাপেক্ষে করতে হবে যা এটি সাধনের জন্য উদ্দিষ্ট । একে এমনভাবে সংগঠিত করতে হবে যাতে এর উদ্দেশ্য সাধিত হয় । এবং, এটা স্পষ্ট যে, সাধারণ প্রয়োজনের দৃষ্টিকোণ থেকে এই উদ্দেশ্যের গুরুত্ব ভিন্ন হতে পারে , তাই প্রচারণার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যও ভিন্ন হতে হবে । এই যুদ্ধে আমরা যে আদর্শের জন্য লড়াই করেছিলাম, তা ছিল মানুষের পক্ষে সংগ্রাম করার মতো সর্বোচ্চ ও মহৎ আদর্শ । আমরা আমাদের দেশের স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য, আমাদের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির নিরাপত্তার জন্য এবং আমাদের জাতির সম্মানের জন্য লড়াই করেছি। সমস্ত বিপরীত মতামত সত্ত্বেও, এই সম্মান সত্যিই বিদ্যমান, অথবা বলা ভালো, এর অস্তিত্ব থাকা আবশ্যক; কারণ সম্মানহীন জাতি শীঘ্র বা বিলম্বে তার স্বাধীনতা ও মুক্তি হারাবে। উচ্চতর ন্যায়বিচারের বিধান অনুসারে , এক হতভাগ্য কাপুরুষের প্রজন্ম স্বাধীনতার অধিকারী নয়। যে দাস, তার সম্মান থাকতে পারে না ; কারণ এই সম্মান দ্রুতই সাধারণ অবজ্ঞার পাত্রে পরিণত হবে ।

জার্মানি তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যুদ্ধ করছিল । যুদ্ধ প্রচারণার লক্ষ্য হওয়া উচিত
অতএব, এই সংগ্রামের চেতনাকে সমর্থন করুন এবং বিজয় অর্জনে সহায়তা করুন।

কিন্তু যখন জাতিসমূহ এই পৃথিবীতে নিজেদের অস্তিত্বের জন্য লড়াই করে, যখন 'হব কি হব না' —এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, তখন সমস্ত মানবিক ও নান্দনিক বিবেচনাকে অবশ্যই একপাশে সরিয়ে রাখতে হয় , কারণ এই আদর্শগুলো নিজে থেকে বাতাসে কোথাও বিরাজ করে না , বরং সেগুলো হলো
এগুলো মানুষের সৃজনশীল কল্পনার ফসল , এবং তার বিলুপ্তির সাথে সাথে এগুলোও বিলীন হয়ে যায়। প্রকৃতি এগুলোর কিছুই জানে না। অধিকন্তু , এগুলো কেবল কয়েকটি জাতি, বা বলা ভালো কয়েকটি বর্ণের বৈশিষ্ট্য। মানবতাবাদ ও নান্দনিক আদর্শ পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে, যখন সেইসব বর্ণ বিলুপ্ত হবে যারা এগুলোর স্রষ্টা ও ধারক ।

Machine Translated by Google

অধ্যায় ৬ – যুদ্ধ প্রচারণা

যখন কোনো জাতি অস্তিত্ব রক্ষার জন্য লড়াই করে, তখন এই সমস্ত আদর্শ গৌণ হয়ে পড়ে।
যখন তারা যুদ্ধরত জাতির সহনশীলতাকে দুর্বল করে দেওয়ার হুমকি দেয়, ঠিক সেই মুহূর্তে তাদের যুদ্ধে প্রবেশ করা থেকে অবশ্যই বিরত রাখতে হবে। বিচার করলে, এটাই সর্বদা একমাত্র দৃশ্যমান প্রভাব।
লড়াইয়ে তাদের ভূমিকা

মানবিক আবেগের ভূমিকা প্রসঙ্গে মোল্টকে বলেছেন যে, যুদ্ধকালীন সময়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যত দ্রুত সম্ভব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং যুদ্ধের সবচেয়ে নির্মম পদ্ধতিগুলোই সবচেয়ে মানবিক। যখন মানুষ নন্দনতত্ত্ব ইত্যাদি নিয়ে আড়ম্বরপূর্ণ কথাবার্তার মাধ্যমে এই যুক্তির জবাব দেওয়ার চেষ্টা করে, তখন তার একটিই উত্তর থাকতে পারে। যখন সংগ্রামটি কোনো জাতির অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে হয়, তখন তাকে কোনো নান্দনিক বিবেচনার অধীন করা উচিত নয়। দাসত্বের জোয়াল মানবজাতির জন্য সবচেয়ে অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা ছিল এবং চিরকাল থাকবে। শোয়াবিং-এর অধঃপতিতরা কি জার্মানির বর্তমান ভাগ্যকে "নান্দনিক" হিসেবে দেখে? অবশ্যই, ইহুদিদের সাথে এই বিষয়ে তর্ক করার কোনো মানে হয় না, কারণ তারাই এই সাংস্কৃতিক সুগন্ধের আধুনিক আবিষ্কারক। ১২)

তাদের অস্তিত্বই হলো ঈশ্বরের সৃষ্টিতে তাঁর প্রতিচ্ছবির সৌন্দর্যের এক মূর্ত অস্বীকৃতি।

যেহেতু সৌন্দর্য ও মানবতাবাদের এই আদর্শগুলোর যুদ্ধক্ষেত্রে কোনো স্থান নেই, তাই এগুলো হতে পারে না
যুদ্ধ প্রচারণার মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহৃত হত।

যুদ্ধের সময়, প্রচারণা ছিল একটি লক্ষ্য অর্জনের উপায়। আর সেই লক্ষ্যটি ছিল জার্মান জাতির অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম। সুতরাং, সেই লক্ষ্যের জন্য এর উপযোগিতার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রচারণাকে বিবেচনা করা উচিত। সেই সময়ে সবচেয়ে নিষ্ঠুর অস্ত্রগুলোই ছিল সবচেয়ে মানবিক, কারণ সেগুলো যুদ্ধকে আরও দ্রুত শেষ করতে সাহায্য করেছিল; এবং কেবল সেই পদ্ধতিগুলোই ভালো ও সুন্দর ছিল, যেগুলো জাতির মর্যাদা ও স্বাধীনতা সুরক্ষিত করতে সাহায্য করেছিল। জীবন - মৃত্যুর এই সংগ্রামে প্রচারণার জন্য এটাই ছিল একমাত্র সম্ভাব্য পন্থা।

ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিরা যদি এই বিষয়টি বুঝতেন, তাহলে অস্ত্র হিসেবে যুদ্ধ প্রচারণার রূপ ও ব্যবহার নিয়ে কোনো অনিশ্চয়তা থাকত না; কারণ যারা এর ব্যবহার জানে, তাদের হাতে এটি একটি অস্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং এক অত্যন্ত ভয়ংকর অস্ত্র।

দ্বিতীয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো: প্রচারণা কাদের কাছে আবেদন করবে?
শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর জন্য? নাকি স্বল্পশিক্ষিতদের জন্য?

প্রচারণাকে অবশ্যই সর্বসাধারণের কাছে আবেদনময় হতে হবে। বুদ্ধিজীবী, বা আমরা আজ যাদের বুদ্ধিজীবী বলি, তারা প্রচারণার দ্বারা আকৃষ্ট হন না, কেবল একটি বৈজ্ঞানিক প্রদর্শনীর দ্বারাই হন। বার্তা উপস্থাপনের আঙ্গিকের দিক থেকে, বিজ্ঞানের সাথে প্রচারণার সম্পর্ক ঠিক ততটাই নগণ্য, যতটা শিল্পের সাথে একটি বিজ্ঞাপনের পোস্টারের। বিজ্ঞাপনের পোস্টারের শিল্পকলা নিহিত থাকে নকশাকারীর আঙ্গিক ও রঙের নির্বাচনের মাধ্যমে জনতার মনোযোগ আকর্ষণ করার দক্ষতায়। একটি শিল্প প্রদর্শনীর ঘোষণাকারী বিজ্ঞাপনের পোস্টারের প্ররোচিত করা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকে না।

এই প্রদর্শনীর গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা। এটি এই উদ্দেশ্য যত ভালোভাবে পূরণ করবে, পোস্টারটির শিল্পকর্মও তত উন্নত হবে। যেহেতু এর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো এই প্রদর্শনীর গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষকে প্রভাবিত করা, তাই পোস্টারটি কখনোই প্রদর্শনীতে দেখানো শিল্পকর্মের স্থান নিতে পারবে না। অতএব, যদি কেউ শিল্পকলা নিয়ে অধ্যয়ন করতে চায়, তবে তাকে প্রচলিত ধারার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু নিয়ে অধ্যয়ন করতে হবে।
পোস্টারে যা লেখা থাকে, তার জন্য শুধু গ্যালারি ও প্রদর্শনীতে ঘুরে বেড়ানোই যথেষ্ট নয়। একজন শিল্পকলার শিক্ষার্থীকে অবশ্যই প্রতিটি প্রদর্শনী সামগ্রী যত্নসহকারে ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করে ধীরে ধীরে সে সম্পর্কে একটি নিজস্ব মতামত গড়ে তুলতে হবে।

প্রচারণা বলতে আমরা যা বুঝি, তার ক্ষেত্রেও একই পরিস্থিতি প্রযোজ্য। প্রচারণার উদ্দেশ্য কোনো ব্যক্তিকে প্রশিক্ষিত করা নয়, বরং এমন কিছু বিষয়ের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, যেগুলোর গুরুত্ব কেবল এইভাবেই জনগণের কাছে তুলে ধরা সম্ভব।

সুতরাং, প্রচারণার শিল্প হলো জনগণের কাছে বিষয়বস্তু এমন যথেষ্ট স্পষ্ট ও জোরালোভাবে উপস্থাপন করা, যাতে কোনো একটি নির্দিষ্ট ঘটনার বাস্তবতা, কিছু জিনিসের আবশ্যকতা এবং প্রয়োজনীয় কোনো কিছুর প্রকৃতি সম্পর্কে একটি সাধারণ প্রত্যয় সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই শিল্পটি নিজেই কোনো লক্ষ্য নয়, কারণ এর উদ্দেশ্য অবশ্যই একটি বিজ্ঞাপনের পোস্টারের মতোই হতে হবে—জনসাধারণের আগ্রহ আকর্ষণ করা, এবং কোনো অবস্থাতেই এমন লোকদের ব্যক্তিগত নির্দেশনা দেওয়া নয়, যাদের কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে আগে থেকেই একটি গঠিত মতামত রয়েছে, বা যারা তা চায়।

Machine Translated by Google

বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার ভিত্তিতে এটি গঠন করুন - কারণ প্রচারণার উদ্দেশ্য তা নয়, একে মানুষের অনুভূতির কাছে আবেদন জানাতে হবে , তাদের যুক্তির কাছে নয়।

সকল প্রচারণাকে অবশ্যই সহজবোধ্য আঙ্গিকে উপস্থাপন করতে হবে এবং এর স্তর এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে, যাতে তা উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সর্বনিম্ন স্তরকে অতিক্রম না করে ।

সুতরাং , নিছক বুদ্ধিবৃত্তিক স্তরে, এটি অবশ্যই সেইসব মানুষের সর্বনিম্ন মানসিক সাধারণ মানের সমান হতে হবে যাদের কাছে এটি পৌঁছাতে চায়। যখন একটি গোটা জাতিকে তার প্রভাবাধীনে আনার প্রশ্ন আসে , যেমনটা যুদ্ধকালীন প্রচারণার ক্ষেত্রে হয়, তখন অতি উচ্চ মান পরিহার করার ব্যাপারে যতই সতর্ক হওয়া যাক না কেন, তা যথেষ্ট নয়; কারণ এই মান জনগণের মধ্যে তুলনামূলকভাবে উচ্চ বুদ্ধিমত্তার একটি অনুমান করে নেয়।

প্রচারণার সুর যত কম বৈজ্ঞানিক হবে এবং তা মানুষের অনুভূতিকে যত বেশি নাড়া দেবে, এর সাফল্যও তত বেশি সুনিশ্চিত হবে। প্রচারণার উপযোগিতার এটাই শ্রেষ্ঠ পরীক্ষা , মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী বা শিল্পীদের অনুমোদন নয়।

প্রচারণার শিল্প বলতে কেবল মানুষের আবেগকে নাড়া দিয়ে তাদের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করা এবং এমন সঠিক মনস্তাত্ত্বিক রূপ খুঁজে বের করাকেই বোঝায়, যা মনোযোগ আকর্ষণ করবে ও জনগণের হৃদয়ে জায়গা করে নেবে। যাঁদের যুক্তিবোধ সর্বোচ্চ স্তরের হওয়া উচিত, তাঁরা যে এই বিষয়টি বুঝতে ব্যর্থ হন, তা তাঁদের অযোগ্যতা বা মানসিক জড়তার আরও একটি প্রমাণ ।

একবার যখন আমরা বুঝতে পারি যে প্রচারণার প্ররোচনামূলক শক্তিকে ব্যাপক জনগণের উপর কেন্দ্রীভূত করা কতটা জরুরি , তখন নিম্নলিখিত শিক্ষাগুলো পাওয়া যায়: প্রত্যক্ষ প্রচারণাকে

বহুমুখী পদ্ধতিতে সংগঠিত করা একটি ভুল, যেন এটি একটি বৈজ্ঞানিক নির্দেশিকা ।

জনসাধারণের উপলব্ধি ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত এবং তাদের যুক্তিবোধ দুর্বল। অন্যদিকে, তারা দ্রুত ভুলে যায়। এই কারণে, সমস্ত কার্যকর প্রচারণাকে অবশ্যই কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে, যেগুলোকে গতানুগতিক স্লোগানের আকারে যথাসম্ভব সুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করতে হবে । এই স্লোগানগুলো বারবার পুনরাবৃত্তি করতে হবে, যতক্ষণ না প্রত্যেক ব্যক্তি উপস্থাপিত ধারণাটি উপলব্ধি করতে পারে। যদি এই নীতিটি ভুলে যাওয়া হয় এবং কেউ যদি বিষয়গুলোকে বিমূর্ত ও সাধারণ ভাষায় উপস্থাপন করার চেষ্টা করে, তবে প্রচারণা অকার্যকর প্রমাণিত হবে ; মানুষ এই রূপে উপস্থাপিত কোনো কিছুই হজম করতে বা মনে রাখতে পারবে না । অতএব , বার্তার প্রসার যত বেশি হবে, প্রচারকের জন্য এটি আবিষ্কার করা তত বেশি জরুরি যে কোন কর্মপরিকল্পনাটি মনস্তাত্ত্বিকভাবে সবচেয়ে কার্যকর হবে।

উদাহরণস্বরূপ, শত্রুর যোগ্যতাকে উপহাস করা একটি মৌলিক ভুল ছিল , যা অস্ট্রিয়ান ও জার্মান কৌতুক পত্রিকাগুলো তাদের প্রচারণার একটি প্রধান অংশ হিসেবে ব্যবহার করত। এই নীতিটি ত্রুটিপূর্ণ ছিল, কারণ শত্রুর মুখোমুখি হয়ে আমাদের সৈন্যদের মনে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি ধারণা তৈরি হয়েছিল। ফলস্বরূপ, এই ভুলের ভয়াবহ পরিণতি হয়েছিল। জার্মান সৈন্য যখন বুঝতে পারল যে তাকে কত শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তে হবে, তখন সে অনুভব করল যে যারা তাকে তথ্য দিয়েছিল, তারা তাকে ঠকিয়েছে। তাই, তার যুদ্ধ করার মনোবলকে শক্তিশালী ও উদ্দীপিত করার পরিবর্তে, এই তথ্যটি ঠিক বিপরীত প্রভাব ফেলেছিল। অবশেষে সে তার উৎসাহ হারিয়ে ফেলে।

অন্যদিকে, ব্রিটিশ ও আমেরিকান যুদ্ধকালীন প্রচারণা মনস্তাত্ত্বিকভাবে কার্যকর ছিল। জার্মানদেরকে তাদের সৈন্যদের কাছে বর্বর ও হুন হিসেবে চিত্রিত করার মাধ্যমে, তারা তাদের সৈন্যদের যুদ্ধের ভয়াবহতার জন্য প্রস্তুত করেছিল এবং তাদেরকে বিভ্রম থেকে রক্ষা করেছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে এই সৈন্যরা যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অস্ত্রের সম্মুখীন হয়েছিল, তা কেবল তাদের প্রাপ্ত তথ্যকেই নিশ্চিত করেছিল, যার ফলে তাদের সরকারের দাবির সত্যতার প্রতি তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছিল । এভাবেই, তাদের কুখ্যাত শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের ক্রোধ ও ঘৃণা বৃদ্ধি পেয়েছিল। জার্মান অস্ত্রের দ্বারা সৃষ্ট ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ ছিল এই বর্বরদের নৃশংসতার আরেকটি দৃষ্টান্ত মাত্র; অন্যদিকে এনটেন্ট পক্ষের সৈন্যদের এটা ভাবারও সময় ছিল না যে তাদের নিজেদের অস্ত্রও একই ধরনের ধ্বংসযজ্ঞ ঘটাতে পারে । এইভাবে, ব্রিটিশ সৈন্যদের কখনোই এটা অনুভব করতে দেওয়া হয়নি যে দেশে প্রাপ্ত তথ্য মিথ্যা ছিল। দুর্ভাগ্যবশত, জার্মানদের ক্ষেত্রে এর বিপরীতটাই সত্য ছিল, যারা অবশেষে সবকিছুকে নিছক প্রতারণা ও বাজে কথা বলে উড়িয়ে দিতে শুরু করেছিল । এই প্রভাব সম্ভব হয়েছিল কারণ দেশটি বিশ্বাস করত যে প্রচারণার কাজটি তাদের দেখা প্রথম নির্বোধ ব্যক্তি (বা এমনকি অন্য কেউ) দ্বারাও করা যেতে পারে ।

Machine Translated by Google

(এক ভিন্ন ধরনের বুদ্ধিমত্তা), এবং এটা বোঝা যায়নি যে প্রচারণার জন্য সেরা মেধাবীদের প্রয়োজন হয় ।

এইভাবে , জার্মান যুদ্ধকালীন প্রচারণা আমাদের সামনে এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে যে, কীভাবে 'জ্ঞানদীপ্তি' বাস্তবায়ন করা উচিত নয় এবং কীভাবে এই দৃষ্টান্তটি কোনো মনস্তাত্ত্বিক বিষয়কে আমলে নিতে সম্পূর্ণ অক্ষমতার ফল ।

তবে, যারা চোখ খোলা রেখেছিল, যাদের বোধশক্তি অনমনীয় ছিল না এবং যাদের সাড়ে চার বছর ধরে শত্রুর প্রচারণার অবিরাম আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তারা শত্রুপক্ষ থেকে অনেক মূল্যবান জ্ঞান লাভ করতে পেরেছিল।

সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার ছিল যে, আমাদের লোকেরা যেকোনো ধরনের প্রচারণার জন্য অপরিহার্য মৌলিক শর্তটি বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল : আর তা হলো, মোকাবিলা করার মতো প্রতিটি সমস্যার প্রতি একটি সুসংবদ্ধ ও একপাক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গি । যুদ্ধের একেবারে শুরু থেকেই এত ভুল করা হয়েছিল যে, এই ধরনের মূর্খতাকে শুধুমাত্র উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের নির্বুদ্ধিতার ফল হিসেবেই দায়ী করা যায় কি না , তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যুক্তিসঙ্গত ছিল ।

উদাহরণস্বরূপ , একটি নতুন ব্র্যান্ডের বিজ্ঞাপন বলে দাবি করা একটি পোস্টার সম্পর্কে কী বলা যেতে পারে ? প্রতিযোগী পণ্যের উৎকৃষ্ট মানের দাবি করে সাবান তৈরি করা ? এ নিয়ে শুধু মাথা নাড়া ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না । এবং একটি রাজনৈতিক ঘোষণার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য হওয়া উচিত ।

প্রচারণার উদ্দেশ্য প্রতিদ্বন্দ্বী যুক্তিগুলোর বিচার করা নয় , বরং শুধুমাত্র আমাদের নিজেদের দাবির বৈধতার ওপর জোর দেওয়া। প্রচারণা বস্তুনিষ্ঠ সত্যের সন্ধান করতে পারে না এবং যদি তা প্রতিপক্ষের জন্য সুবিধাজনক হয়, তবে ন্যায়বিচারের তাত্ত্বিক নিয়ম অনুসারে তা তাদের সামনে উপস্থাপনও করতে পারে না; একে অবশ্যই সত্যের কেবল সেই দিকটিই উপস্থাপন করতে হবে যা আমাদের পক্ষের জন্য সুবিধাজনক।

মূল ভুলটি ছিল এই যে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার জন্য কে দায়ী সেই প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করা এবং ঘোষণা করা যে এর একক দায় জার্মানদের ওপর চাপানো যায় না ।
কোনো আলোচনা ছাড়াই একক দায় শত্রুর কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া উচিত ।

আর এই অর্ধ-পদক্ষেপগুলোর পরিণতি কী ছিল ? সাধারণ জনগণ কূটনীতিক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক, এমনকি কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে যুক্তিসঙ্গত মতামত গঠনে সক্ষম ব্যক্তি দ্বারা গঠিত নয় , বরং তারা হলো সিদ্ধান্তহীন একদল শিশু, যারা অনবরত দোদুল্যমান ।
এক ধারণা থেকে আরেক ধারণার মাঝে। যেইমাত্র আমাদের নিজেদের প্রচারণায় সামান্যতম ইঙ্গিত দেওয়া হলো যে ন্যায়বিচার আংশিকভাবে শত্রুর পক্ষেও থাকতে পারে, তখনই তা এমন এক ভিত্তি স্থাপন করল যার ওপর আমাদের উদ্দেশ্যের ন্যায্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে । সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না শত্রুর দোষ কোথায় শেষ আর আমাদের দোষ কোথায় শুরু। এমন পরিস্থিতিতে, তারা সিদ্ধান্তহীন ও অবিশ্বাসী হয়ে পড়ে, বিশেষ করে যদি শত্রু একই ভুল না করে সমস্ত দোষ প্রতিপক্ষের ওপর চাপিয়ে দেয়। এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে যে, মানুষ শেষ পর্যন্ত আমাদের নিজেদের প্রচারণার কথার চেয়ে শত্রুর প্রচারণার কথাই বিশ্বাস করেছিল, যা তার দাবিতে ছিল অভিন্ন ও অবিচল? অবশ্যই, বস্তুনিষ্ঠতার প্রতি আমাদের জনগণের আসক্তি এই বিষয়টিকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল । প্রত্যেকেই শত্রুর প্রতি অবিচার না করার ব্যাপারে সতর্ক হয়ে গিয়েছিল , এমনকি এর জন্য নিজেদের জাতি ও রাষ্ট্রকে আহত বা ধ্বংস করার ঝুঁকি নিতেও প্রস্তুত ছিল।

অবশ্যই জনসাধারণ এই বিষয়টি সম্পর্কে অবগত ছিল না যে ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিরা অক্ষম ছিল
এই দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাটি দেখুন ।

দেশের সিংহভাগ মানুষ চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গিতে এতটাই নারীসুলভ যে, তাদের চিন্তা ও কর্ম সুবিবেচনার চেয়ে অনুভূতি দ্বারাই বেশি পরিচালিত হয় । তবে এই অনুভূতিগুলো জটিল নয়, বরং সরল ও সুসংহত। এগুলোর মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নেই ; আছে কেবল ভালোবাসা ও ঘৃণা, ভালো ও মন্দ, সত্য ও মিথ্যার মতো ইতিবাচক ও নেতিবাচক ধারণা । এগুলো কখনোই

অর্ধেক এক, অর্ধেক অন্য। বিশেষ করে ইংরেজ প্রচারমাধ্যম এই বিষয়টি চমৎকারভাবে বুঝেছিল এবং যা বুঝেছিল তা বাস্তবে প্রয়োগ করেছিল । তারা এমন কোনো আংশিক পদক্ষেপকে প্রশ্রয় দেয়নি যা সন্দেহের জন্ম দিতে পারে।

জনসাধারণের অনুভূতির আদিম প্রকৃতি তারা কতটা ভালোভাবে বুঝত, তার প্রমাণ ছিল তাদের সেই নীতি— তৎকালীন প্রকৃত বিভীষিকার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ ভয়াবহতা ও সহিংসতার কাহিনী প্রকাশ করা, যার মাধ্যমে তারা চরম পরাজয়ের সময়েও রণাঙ্গনে নৈতিক সংহতির জন্য চতুর ও নির্মমভাবে ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল । অধিকন্তু, যে পদ্ধতিতে

Machine Translated by Google

যেভাবে তারা জার্মান শত্রুকে যুদ্ধের একমাত্র দায়ী হিসেবে উপস্থাপন করেছিল —যা ছিল এক নির্মম ও নির্জলা মিথ্যা—এবং যেভাবে তারা তার অপরাধ ঘোষণা করেছিল, তা জনগণের কাছে পৌঁছানোর জন্য নিখুঁতভাবে পরিকল্পিত ছিল, কারণ তারা জানত যে জনগণের অনুভূতি সবসময়ই চরমপন্থী হয় । আর তাই এই ভয়ংকর মিথ্যাটি বিশ্বাস করা হয়েছিল।

এই ধরনের প্রচারণার কার্যকারিতা এই ঘটনা থেকেই ভালোভাবে বোঝা যায় যে, সাড়ে চার বছর পরেও শত্রুপক্ষ শুধু প্রচারণাই চালিয়ে যাচ্ছিল না, বরং দেশের অভ্যন্তরে আমাদের জনগণের প্রতিরোধ ক্ষমতাকেও দুর্বল করে দিচ্ছিল।

এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে আমাদের প্রচারণা অনুরূপ ফলাফল অর্জন করতে পারেনি , কারণ
এর অস্পষ্টতার কারণে এর মূলসত্তাতেই অকার্যকারিতার বীজ প্রোথিত ছিল। এর বিষয়বস্তুর কারণে , এটি জনসাধারণের উপর যথাযথ প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা যেত না । কেবল আমাদের দায়িত্বজ্ঞানহীন 'রাষ্ট্রনায়করাই' কল্পনা করতে পারতেন যে, এমন শান্তিবাদী মামুলি রচনা থেকে দেশের জন্য প্রাণ দিতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার মতো চেতনা প্রজ্বলিত করার প্রয়োজনীয় উদ্দীপনা জন্ম নিতে পারে ।

সুতরাং আমাদের পণ্যটি শুধু মূল্যহীনই ছিল না , বরং ক্ষতিকরও ছিল।

প্রচারণা সংগঠনে যতই প্রতিভা নিয়োগ করা হোক না কেন , যদি তা এর মৌলিক নীতি অনুসারে পরিচালিত না হয়, তবে তা অকার্যকর থেকে যাবে । প্রচারণা অবশ্যই হতে হবে
কয়েকটি সাধারণ বিষয়ে সীমাবদ্ধ এবং বারবার পুনরাবৃত্ত। এখানে, অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রের মতোই, অধ্যবসায়ই সাফল্যের প্রথম এবং মৌলিক শর্ত।

বিশেষ করে প্রচারণার ক্ষেত্রে, নম্র সৌন্দর্যরসিক এবং উদাসীন বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্ব দেওয়া উচিত নয়। প্রথমোক্তরা প্রকৃত প্রচারণার ইঙ্গিতপূর্ণ প্রকৃতিকে দ্রুত এমন কিছুতে রূপান্তরিত করবে যা কেবল সাহিত্যিক চা-চক্রের জন্যই উপযুক্ত । আর শেষোক্তদের ক্ষেত্রে, এই সংক্রামক প্রভাব সম্পর্কে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে ; কারণ, সাধারণ অনুভূতির প্রতি তাদের সংবেদনহীনতার ফলস্বরূপ , তারা ক্রমাগত সন্ধান করে চলেছে
নতুন।

এই ধরনের মানুষ খুব দ্রুত সবকিছুতে একঘেয়ে ও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তারা সবসময় পরিবর্তন চায় এবং তাদের আশেপাশের কম অনুভূতিহীন সহনাগরিকদের আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত করার মতো অবস্থানে নিজেদের কখনোই রাখতে পারে না, তাদের বোঝার চেষ্টা করা তো দূরের কথা । তারাই সবার আগে প্রচারণার, বা বলা ভালো, তার বার্তার সমালোচনা করে, কারণ তাদের কাছে তা সেকেলে ও তুচ্ছ বলে মনে হয় । তারা সবসময় নতুন কিছুর সন্ধানে থাকে এবং পরিবর্তনের জন্য মুখিয়ে থাকে ; আর একারণে তারা জনগণকে কার্যকরভাবে প্রভাবিত করার যেকোনো প্রচেষ্টার ঘোর শত্রুতে পরিণত হয় । যখন প্রচারণার গঠন ও বার্তা তাদের রুচি অনুযায়ী সাজানো শুরু হয় , তখন তারা অসংলগ্ন ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে।

প্রচারণার উদ্দেশ্য এই বিতৃষ্ণ ব্যক্তিকে খুশি করার জন্য অনুভূতির ধারাবাহিক পরিবর্তন ঘটানো নয়।
মহত্ত্ব। এর প্রধান কাজ হলো জনসাধারণকে বোঝানো, যাদের বোঝার ধীরতার কারণে তথ্য আত্মস্থ করতে সময় লাগে; এবং কেবল অবিরাম পুনরাবৃত্তিই জনতার স্মৃতিতে ধারণাটি গেঁথে দিতে সফল হয় ।

প্রচারণা বার্তার বিষয়বস্তুতে যেকোনো পরিবর্তনে অবশ্যই একই উপসংহারের ওপর জোর দিতে হবে। মূল ধারণাটি অবশ্যই বিভিন্ন উপায়ে এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করতে হবে , কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা অবশ্যই একই সূত্রকে নিশ্চিত করার দিকে ফিরে আসবে। কেবল এভাবেই প্রচারণা সুসংহত ও গতিশীল হতে পারে ।

শুধুমাত্র এই নীতিগুলো অনুসরণ করে এবং সমান ও অবিরাম চাপের মাধ্যমে দৃঢ়ভাবে তা মেনে চললেই চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করা সম্ভব । এর পুরস্কার হবে সেই বিস্ময়কর ও প্রায় অবিশ্বাস্য ফলাফল, যা এই ধরনের ধারাবাহিক নীতি নিশ্চিত করে।

ব্যবসায়িক বা রাজনৈতিক, যেকোনো ধরনের বিজ্ঞাপনের সাফল্য ধারাবাহিকতার ওপর নির্ভর করে।
এবং যে অবিচলতার সাথে এটি ব্যবহার করা হয়।

এক্ষেত্রে , আমাদের শত্রুদের দ্বারা পরিচালিত প্রচারণা ছিল একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এটি নিজেকে কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয়ে সীমাবদ্ধ রেখেছিল, যা শুধুমাত্র গণভোগের জন্য তৈরি করা হয়েছিল , এবং অক্লান্ত অধ্যবসায়ের সাথে সেগুলোরই পুনরাবৃত্তি করত। একবার যখন এই মৌলিক বিষয়গুলো এবং বিশ্বের সামনে সেগুলো উপস্থাপনের পদ্ধতিটি কার্যকর বলে বিবেচিত হলো, তখন তারা যুদ্ধ চলাকালীন বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ছাড়াই সেগুলোতে অটল রইল। প্রথমে , এর উদ্ধত আত্মবিশ্বাসকে মূর্খতা বলে মনে হয়েছিল । পরে, এটিকে উদ্বেগজনক মনে হলেও , অবশেষে মানুষ তা বিশ্বাস করেছিল।

Machine Translated by Google

কিন্তু ইংল্যান্ডে আরও একটি বিষয়ও বোঝা গিয়েছিল : তা হলো, এই আধ্যাত্মিক অস্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে সাফল্যের সম্ভাবনা এর ব্যাপক প্রয়োগের মধ্যেই নিহিত, এবং যখন এটি এভাবে ব্যবহৃত হয়, তখন এর জন্য ব্যয়িত বিপুল অর্থের পূর্ণ প্রতিদান পাওয়া যায়।

ইংল্যান্ডে প্রচারণাকে একটি প্রথম শ্রেণীর অস্ত্র হিসেবে বিবেচনা করা হতো, অথচ এখানে এটি ছিল বেকার রাজনীতিবিদদের জীবিকার শেষ ভরসা এবং একটি আরামদায়ক জীবন ।
অলসদের জন্য একটি কাজ ।

সামগ্রিকভাবে, এর প্রভাব ছিল নেতিবাচক।

পাদটীকা:

১২) শোয়াবিং হলো মিউনিখের একটি শৈল্পিক এলাকা, যেখানে শিল্পীদের স্টুডিও রয়েছে এবং সাহিত্যপ্রেমীরা, বিশেষ করে বোহেমিয়ান ধারার সদস্যরা, সমবেত হন ।

Machine Translated by Google

অধ্যায় ৭

বিপ্লব

১৯১৫ সালে শত্রুপক্ষ আমাদের সৈন্যদের মধ্যে তাদের প্রচারণা শুরু করে । ১৯১৬ সাল থেকে তা ক্রমশ তীব্র হতে থাকে এবং ১৯১৮ সালের শুরুর দিকে তা ঝড়ের জলোচ্ছ্বাসের মতো মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।
এই ক্রমিক প্রলোভনের প্রভাব এখন মূল্যায়ন করা যেতে পারে । ধীরে ধীরে, আমাদের সৈন্যরা ভাবতে শুরু করল।
শত্রুরা তাদের দিয়ে ঠিক সেভাবেই ভাবাতে চেয়েছিল। জার্মান পক্ষে কোনো পাল্টা প্রচারণা ছিল না।

আমাদের সক্ষম ও দৃঢ়চেতা কমান্ডারের নেতৃত্বে সামরিক কর্তৃপক্ষ, প্রচারণার ক্ষেত্রসহ, এই লড়াইয়ে নামতে আগ্রহী ও প্রস্তুত ছিল , কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তাদের প্রয়োজনীয় সম্পদের অভাব ছিল। অধিকন্তু, সামরিক কর্তৃপক্ষ যদি এই বৌদ্ধিক প্রশিক্ষণের কাজটি নিজেরাই হাতে নিত , তবে তারা একটি মনস্তাত্ত্বিক ভুল করত । কার্যকর হতে হলে, এর উৎস দেশের ভেতর থেকেই হতে হতো। কেবল তখনই এটি সেইসব মানুষের মধ্যে কার্যকর হতো, যারা প্রায় চার বছর ধরে দেশের নামে অমর বীরত্ব প্রদর্শন করেছে এবং সব ধরনের প্রতিকূলতা সহ্য করেছে । কিন্তু দেশের মানুষ কী করছিল? তাদের এই নিষ্ক্রিয়তা কি কেবলই নির্বুদ্ধিতা বা অসততার কারণে ছিল?

১৯১৮ সালের গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময়ে, মার্নের দক্ষিণ তীর থেকে পশ্চাদপসরণের পর, জার্মান সংবাদমাধ্যম এমন এক হতাশাজনকভাবে অনুপযুক্ত, এমনকি অপরাধমূলকভাবে নির্বোধ নীতি গ্রহণ করল যে, আমি নিজেকে এমন একটি প্রশ্ন করতে শুরু করলাম যা দিন দিন আমার ক্রোধ বাড়িয়ে তুলছিল: এটা কি সত্যিই ছিল?
আমাদের বীর সৈন্যদের মধ্যে পরিচালিত এই আধ্যাত্মিক অন্তর্ঘাতের প্রক্রিয়াটি বন্ধ করার সাহস কি কারও নেই ?

১৯১৪ সালে ফ্রান্সে কী ঘটেছিল , যখন আমাদের সেনাবাহিনী সেই দেশ আক্রমণ করে একের পর এক বিজয়ে সগৌরবে এগিয়ে গিয়েছিল ? ইতালিতে কী ঘটেছিল, যখন ইসোঞ্জো রণাঙ্গনে তাদের সেনাবাহিনী ভেঙে পড়েছিল? ১৯১৮ সালের বসন্তে ফ্রান্সে কী ঘটেছিল, যখন জার্মান ডিভিশনগুলো আক্রমণের মাধ্যমে ফরাসিদের প্রধান ঘাঁটিগুলো দখল করে নিয়েছিল এবং দূরপাল্লার কামান দিয়ে প্যারিসে গোলাবর্ষণ করেছিল?

কীভাবে তারা পলায়নরত সৈন্যদের ম্লান হয়ে আসা সাহসে ইন্ধন জুগিয়েছিল এবং তাদের অন্তরে জাতীয় উদ্দীপনার আগুন প্রজ্বলিত করেছিল ! কীভাবে তাদের প্রচারকার্য এবং জনসাধারণকে প্রভাবিত করার অলৌকিক ক্ষমতা বিধ্বস্ত রণাঙ্গনে যুদ্ধ করার চেতনাকে পুনর্জাগরিত করেছিল এবং সৈন্যদের মাথায় চূড়ান্ত বিজয়ের বিশ্বাস গেঁথে দিয়েছিল !

এই সময়ে আমাদের লোকেরা কী করছিল? কিছুই না, অথবা কিছুই না করার চেয়েও খারাপ কিছু । সর্বশেষ সংবাদপত্রগুলো পড়ে আমি বারবার ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়েছি এবং জনগণের ও সৈন্যদের মনের ওপর তাদের প্রভাব খাটিয়ে যে গণহত্যা চালানো হচ্ছিল, তার স্বরূপ উপলব্ধি করেছি ।
এই চিন্তা আমাকে প্রায়ই পীড়া দেয় যে, বিধাতা যদি ঐসব অযোগ্য, অজ্ঞ, দুর্বল, এমনকি অপরাধীদের পরিবর্তে জার্মান প্রচারণার দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করতেন, তাহলে যুদ্ধের ফলাফল হয়তো ভিন্ন হতে পারত।

সেই মাসগুলোতে আমি প্রথমবারের মতো অনুভব করলাম যে, ভাগ্য আমাকে অকারণে সম্মুখ সমরে আটকে রেখেছে, এমন এক জায়গায় যেখানে কোনো নিগ্রোর ছোড়া যেকোনো এলোমেলো গুলি আমার জীবন কেড়ে নিতে পারে , অথচ আমি অন্যভাবেও আমার দেশের সেবা করতে পারতাম।
তখন আমি এতটাই অহংকারী ছিলাম যে বিশ্বাস করতাম আমি প্রচার ব্যবস্থাপনা সামলাতে পারব ।

কিন্তু আমি ছিলাম এক নামহীন ব্যক্তি, আশি লক্ষ মানুষের মধ্যে একজন। তাই আমাকে যেখানেই দায়িত্ব দেওয়া হোক না কেন, চুপ করে থেকে সাধ্যমতো নিজের কর্তব্য পালন করাই আমার জন্য শ্রেয় ছিল।

* * *

১৯১৫ সালের গ্রীষ্মে, শত্রুপক্ষের প্রথম প্রচারপত্রগুলো আমাদের পরিখায় এসে পড়ল। লেখার ধরনে সামান্য ভিন্নতা থাকলেও, সেগুলোতে কমবেশি একই কথা লেখা ছিল। তাতে বলা হয়েছিল যে, জার্মানদের দুর্ভোগ ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

Machine Translated by Google

আরও বড় কথা হলো; এই যুদ্ধ চিরকাল চলবে ; বিজয়ের সম্ভাবনা দিন দিন ক্ষীণ হয়ে আসছে ; দেশের মানুষ শান্তি চায় , কিন্তু "সামরিকবাদ" এবং "কাইজার" তা হতে দেয় না; বিশ্ব—যারা এটা খুব ভালো করেই জানে—জার্মান জনগণের বিরুদ্ধে নয়, বরং কেবল সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত, যিনি এর জন্য এককভাবে দায়ী —কাইজার; বিশ্ব শান্তির এই শত্রুকে অপসারণ না করা পর্যন্ত সংঘাতের অবসান হবে না ; কিন্তু তাকে অপসারণ করা হলে যুদ্ধের অবসান ঘটবে এবং মুক্ত ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো বিশ্ব শান্তি লীগে জার্মানদের সহকর্মী হিসেবে গ্রহণ করবে । এটা তখনই ঘটবে যখন "প্রুশীয় সামরিকবাদ" চূড়ান্তভাবে ধ্বংস হবে। এই সমস্ত দাবিকে দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ দেওয়ার জন্য প্রচারপত্রগুলোতে প্রায়শই থাকে—

বাড়ি থেকে আসা চিঠি ছিল, যেগুলোর বিষয়বস্তু শত্রুপক্ষের প্রচারণামূলক বার্তাকে সমর্থন করছে বলে মনে হচ্ছিল ।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, আমরা এই সমস্ত প্রচেষ্টা নিয়ে হাসাহাসি করতাম । আমরা প্রচারপত্রগুলো পড়তাম, সদর দপ্তরে পাঠিয়ে দিতাম এবং সেগুলোর কথা ভুলে যেতাম, যতক্ষণ না কোনো অনুকূল বাতাস নতুন এক চালান আবার পরিখায় উড়িয়ে আনত। এগুলো বেশিরভাগই বিশেষভাবে এই কাজের জন্য ব্যবহৃত বিমান থেকে ফেলা হতো।

এই প্রচারণার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল চোখে পড়ার মতো। যেখানেই বাভারিয়ান সৈন্যরা মোতায়েন ছিল, শত্রুপক্ষের প্রচারকরা প্রুশিয়ানদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ উস্কে দেওয়ার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করত । তাদের দাবি ছিল যে , যুদ্ধ শুরু ও চালিয়ে যাওয়ার জন্য একমাত্র প্রুশিয়ান সৈন্যরাই দায়ী এবং বাভারিয়ানদের প্রতি কোনো শত্রুতা ছিল না ; কিন্তু যতক্ষণ তারা প্রুশিয়ানদের সেবা করে যাবে এবং প্রুশিয়ানদের বিপদ থেকে উদ্ধার করতে সাহায্য করবে , ততক্ষণ তাদের কিছু করার ছিল না।

এই ধারাবাহিক প্রচার ১৯১৫ সালে আমাদের সৈন্যদের উপর প্রকৃত প্রভাব ফেলতে শুরু করে।
বাভারিয়ার সৈন্যদের মধ্যে প্রুশিয়ার প্রতি বিদ্বেষ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল , কিন্তু কর্তৃপক্ষ তা প্রতিহত করার জন্য কিছুই করেনি। এটি কেবল একটি নিষ্ক্রিয়তার পাপ ছিল না; বরং শীঘ্র বা বিলম্বে কেবল প্রুশীয়রাই নয়, বরং সমগ্র জার্মান জাতি এবং তাদের মধ্যে থাকা বাভারীয়দেরও এর জন্য চরম মূল্য দিতে হয়েছিল ।

এই ক্ষেত্রে, ১৯১৬ সাল থেকে শত্রুপক্ষের প্রচারণা অনস্বীকার্য সাফল্য অর্জন করতে শুরু করে।

একইভাবে, বাড়ি থেকে আসা চিঠিপত্রেরও অনেক দিন ধরেই প্রভাব ছিল। শত্রুদের আর প্রচারপত্র আকারে এই ধরনের চিঠি বিলি করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। আবারও, সরকারের জারি করা কয়েকটি অত্যন্ত নির্বোধ 'সতর্কবার্তা' ছাড়া এই প্রভাব সম্পর্কে কিছুই করা হয়নি । অবিবেচক নারীদের পাঠানো বিষে পুরো রণাঙ্গন ডুবে যাচ্ছিল ; তারা এক মুহূর্তের জন্যও সন্দেহ করেনি যে এর মাধ্যমে তারা শত্রুর চূড়ান্ত বিজয়ের সম্ভাবনাকে আরও শক্তিশালী করে তুলছে , অথবা এর ফলে রণাঙ্গনে তাদের স্বামীদের দুর্ভোগ দীর্ঘায়িত ও আরও তীব্র হবে । জার্মান নারীদের লেখা এই নির্বোধ চিঠিগুলো শেষ পর্যন্ত আমাদের লক্ষ লক্ষ সেনার জীবন কেড়ে নিয়েছিল ।

১৯১৬ সাল নাগাদ ইতিমধ্যেই বেশ কিছু উদ্বেগজনক ঘটনা ঘটছিল । পুরো রণাঙ্গন জুড়েই অসন্তোষ আর নালিশ চলছিল, নানা বিষয়ে তারা ছিল অতৃপ্ত, এবং প্রায়শই তাদের এই অসন্তোষ সঙ্গত কারণেই। যখন তারা ক্ষুধার্ত ও ধৈর্যশীল ছিল এবং বাড়িতে তাদের প্রিয়জনেরা চিন্তিত ছিল , তখন অন্য মহলে চলছিল প্রাচুর্য আর আমোদ-প্রমোদ। হ্যাঁ; এমনকি খোদ রণাঙ্গনেও এই ব্যাপারে সবকিছু ঠিকঠাক ছিল না ।

যুদ্ধের একেবারে প্রথম দিকেও সৈন্যরা মাঝে মাঝে অসন্তোষ প্রকাশ করত; কিন্তু এই সমালোচনা " অভ্যন্তরীণ বিষয়ে" সীমাবদ্ধ ছিল। যে লোকটি এক মুহূর্তে অসন্তোষ প্রকাশ করছিল, পরমুহূর্তেই সে বিড়বিড় করা থামিয়ে দিত এবং এমনভাবে চুপচাপ নিজের কর্তব্য পালন করে যেত যেন সবকিছু স্বাভাবিক। যে কোম্পানিটি কিছুক্ষণ আগেও অসন্তোষের লক্ষণ দেখিয়েছিল , তারা এখন নিজেদের পরিখা আঁকড়ে ধরে দাঁতে দাঁত চেপে তা রক্ষা করছিল , যেন জার্মানির ভাগ্য ওই কয়েকশ গজ কাদা আর গোলার গর্তের উপর নির্ভর করছে। সেই মহান পুরোনো সেনাবাহিনী তখনও তার অবস্থানে ছিল। আমার ভাগ্যের এই আকস্মিক পরিবর্তন আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

এমন এক জায়গায়, যেখানে আমি এই পুরোনো সেনাবাহিনী এবং দেশের মধ্যকার বৈসাদৃশ্য স্বচক্ষে উপলব্ধি করতে পারতাম।
১৯১৬ সালের সেপ্টেম্বরের শেষে আমার ডিভিশনকে সোমের যুদ্ধে পাঠানো হয়েছিল। আমাদের জন্য এটি ছিল প্রথম ধারাবাহিক ভয়াবহ যুদ্ধ, যা যুদ্ধের চেয়ে জীবন্ত নরকের মতো বেশি মনে হয়েছিল। সপ্তাহব্যাপী তীব্র গোলন্দাজ হামলার মধ্যেও আমরা দৃঢ়ভাবে টিকে ছিলাম; কখনও কখনও কিছুটা জায়গা ছেড়ে দিলেও , পরে তা পুনরুদ্ধার করেছি এবং কখনও আত্মসমর্পণ করিনি।

Machine Translated by Google

হ্যাঁ, তাই করেছিলাম। ১৯১৬ সালের ৭ই অক্টোবর আমি আহত হয়েছিলাম, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমাদের লাইনে ফিরতে পেরেছিলাম এবং আমাকে একটি মেডিকেল ট্রেনে করে জার্মানিতে পাঠানো হয়েছিল।

দেশ ছাড়ার পর দুই বছর কেটে গেছে , এমন পরিস্থিতিতে যা প্রায় এক অনন্তকাল । উর্দি ছাড়া জার্মানদের দেখতে কেমন , তা আমি কল্পনাও করতে পারতাম না । আমি হার্মিসের একটি ফিল্ড হাসপাতালে শুয়ে ছিলাম এবং হঠাৎ আমার পাশের আহতদের একজনের সাথে একজন জার্মান মহিলা, একজন নার্সের , কথা বলার কণ্ঠস্বর শুনে অবাক হয়ে গেলাম । দুই বছর! আর এই প্রথমবার, সেই কণ্ঠস্বর!

আমাদের অ্যাম্বুলেন্সের বহরটি জার্মান সীমান্তের যত কাছে আসছিল , আমাদের প্রত্যেকের উদ্বেগ ততই বাড়ছিল । পথিমধ্যে, আমরা সেই সমস্ত জায়গা চিনতে পারলাম যেগুলোর ওপর দিয়ে দু'বছর আগে তরুণ স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে গিয়েছিলাম —ব্রাসেলস, লুভ্যাঁ, লিয়েজ—এবং অবশেষে , আমরা প্রথম জার্মান খামারবাড়িটি চিনতে পারলাম, তার চেনা উঁচু ছাদ আর রঙিন শাটারগুলোসহ। বাড়ি!

কী এক পরিবর্তন! সোমের যুদ্ধক্ষেত্রের কাদা থেকে এই চমৎকার ভবনের ধবধবে সাদা বিছানা । সেগুলোতে ঢোকার আগে আমরা ইতস্তত করছিলাম। ধীরে ধীরে আমরা আবার এই নতুন জগতের সাথে অভ্যস্ত হয়ে উঠলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, কিছু দিক থেকে এই নতুন জগৎটা ছিল ভিন্ন।

সম্মুখসারির সেনাবাহিনীর সেই উদ্দীপনা আর ছিল না । প্রথমবারের মতো আমি এমন কিছুর সম্মুখীন হলাম যা আগে রণাঙ্গনে অজানা ছিল: অর্থাৎ, নিজের কাপুরুষতা নিয়ে গর্ব করা। যদিও রণাঙ্গনে আমরা অবশ্যই অভিযোগ শুনতাম , কিন্তু সেগুলো কখনোই আন্দোলন বা অবাধ্যতার মনোভাব থেকে আসত না, এবং কারও ভয়কে মহিমান্বিত করার চেষ্টাও ছিল না । না; রণাঙ্গনে একজন কাপুরুষ কাপুরুষই ছিল, এর বেশি কিছু নয়। এবং তার দুর্বলতা অন্যদের মধ্যে যে ঘৃণার জন্ম দিত তা ছিল সর্বজনীন, ঠিক যেমন একজন সত্যিকারের বীর সর্বত্র প্রশংসিত হন। কিন্তু হাসপাতালে, পরিবেশটা অনেক দিক থেকেই সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। উচ্চকণ্ঠের আন্দোলনকারীরা ভালো সৈন্যদের উপহাস করতে এবং ভীরু, হতভাগ্য কাপুরুষদের মহিমান্বিত রূপে চিত্রিত করতে ব্যস্ত ছিল। একদল করুণার পাত্র ব্যক্তি এই অপবাদ প্রক্রিয়ার প্ররোচনাকারী ছিল। তাদের মধ্যে একজন গর্ব করে বলছিল যে হাসপাতালে আসার জন্য সে ইচ্ছাকৃতভাবে কাঁটাতারের বেড়ায় নিজের হাত আহত করেছে । যদিও তার ক্ষতটি সামান্য ছিল, দেখে মনে হচ্ছিল সে সেখানে অনেকক্ষণ ধরে পড়ে আছে এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য সেখানেই থাকবে । এই সংক্রামক ব্যক্তিটি তার দুষ্টামিকে মৃত্যুপথযাত্রী একজন সাহসী সৈনিকের সাহসের চেয়েও বড় সাহস হিসেবে উপস্থাপন করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছিল ।

নায়ক। অনেকে নীরবে এ কথা শুনছিল; কিন্তু কেউ কেউ তার কথায় সায় দিচ্ছিল ।

ব্যক্তিগতভাবে আমি এটা ভেবে বীতশ্রদ্ধ হয়েছিলাম যে, এমন একজন রাষ্ট্রদ্রোহী আন্দোলনকারী এমন একটি প্রতিষ্ঠানে থাকতে পারে । কী-ই বা করার ছিল ? হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই জানত সে কে এবং কী; তারা অবশ্যই জানত। কিন্তু তারা এ ব্যাপারে কিছুই করেনি।

শীঘ্রই আমি আবার হাঁটতে সক্ষম হলাম এবং বার্লিন ভ্রমণের অনুমতি পেলাম ।

সর্বত্র চরম দারিদ্র্য প্রকট ছিল । কোটি কোটি মানুষের এই মহানগরী ক্ষুধায় ভুগছিল। সৈন্যদের যাতায়াতের বিভিন্ন বিশ্রামাগার ও আশ্রয়কেন্দ্রে আমাদের হাসপাতালের মতোই একই কথা বলা হচ্ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল , এই আন্দোলনকারীরা তাদের মতামত ছড়ানোর জন্য বিশেষভাবেই এই ধরনের জায়গাগুলো বেছে নিয়েছে ।

কিন্তু মিউনিখের অবস্থা আরও অনেক খারাপ ছিল। হাসপাতাল থেকে বেরোনোর পর আমাকে সেখানকার রিজার্ভ ব্যাটালিয়নে পাঠানো হলো। আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন এক অচেনা, অচেনা শহরে এসে পড়েছি । আমি যেখানেই যেতাম, সেখানেই রাগ, অসন্তোষ আর অভিযোগ শোনা যেত ।

এর একটি কারণ ছিল ফ্রন্ট থেকে ফেরা সৈন্যদের সাথে নন-কমিশন্ড অফিসারদের অত্যন্ত বেমানান আচরণ । এই অফিসাররা জীবনে একদিনও সক্রিয় যুদ্ধে অংশ নেননি এবং সেই কারণে প্রবীণ সৈন্যদের প্রতি যথাযথ মনোভাব গ্রহণে আংশিকভাবে অক্ষম ছিলেন । অবশ্যই , এই সৈন্যদের মধ্যে কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যা ট্রেঞ্চের অভিজ্ঞতার ফলে গড়ে উঠেছিল । রিজার্ভ ইউনিটের অফিসাররা এই বিশেষত্বগুলো বুঝতে পারতেন না, অথচ ফ্রন্ট-লাইনের অফিসাররা তা ব্যাখ্যা করতে পারতেন । ফলে, তারা পেছনের অফিসারদের চেয়ে বেশি সম্মান পেতেন । কিন্তু এসব ছাড়াও, সামগ্রিক মনোভাব ছিল শোচনীয়। এড়িয়ে চলার কৌশলকে প্রায়শই স্বাভাবিক বলে মনে করা হতো ।

Machine Translated by Google

উচ্চতর বুদ্ধিমত্তার নিদর্শন হিসেবে কর্তব্যনিষ্ঠাকে বিবেচনা করা হতো, এবং কর্তব্যনিষ্ঠাকে দুর্বলতা বা গোঁড়ামির লক্ষণ বলে মনে করা হতো । প্রায় সকল সরকারি পদেই ইহুদিরা নিযুক্ত ছিল । প্রায় প্রত্যেক কর্মকর্তাই ছিলেন ইহুদি, এবং প্রত্যেক ইহুদিই ছিলেন কর্মকর্তা। সম্মুখ সমরে নির্বাচিত এই জাতির যোদ্ধাদের বিপুল সংখ্যা তাদের স্বল্প সংখ্যার তুলনায় ছিল বিস্ময়কর ।

ব্যবসায়িক জগতে পরিস্থিতি আরও খারাপ ছিল। এখানে ইহুদিরা 'অপরিহার্য' হয়ে উঠেছিল।
জোঁকের মতো তারা ধীরে ধীরে জাতির শরীর থেকে রক্ত চুষে নিচ্ছিল। নবগঠিত যুদ্ধ উদ্যোগের মাধ্যমে তারা জাতির মুক্ত অর্থনীতিকে ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন করার একটি উপায় খুঁজে বের করেছিল।

মুক্ত কেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল । অতএব, ইতোমধ্যেই
১৯১৬-১৯১৭ সালে কার্যত সমগ্র উৎপাদনই ইহুদি অর্থদাতাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল।

কিন্তু জনগণের ক্রোধ কার বিরুদ্ধে ছিল ? সেই সময় আমি আসন্ন দিনটি দেখতে পেয়েছিলাম, যা সময়মতো প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা না নেওয়া হলে শেষ পর্যন্ত বিপর্যয় ডেকে আনবে ।

যখন ইহুদিরা দেশ লুণ্ঠন করতে এবং তাদের স্বৈরাচার আরও দৃঢ় করতে ব্যস্ত ছিল, তখন প্রুশিয়ানদের বিরুদ্ধে জনগণের উস্কানি আরও তীব্র হয়ে উঠল। আর এই বিষাক্ত প্রচারণা থামাতে রণাঙ্গনে যেমন কিছুই করা হয়নি , তেমনি দেশেও কোনো সরকারি পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি । কেউই যেন বুঝতে পারছিল না যে প্রুশিয়ার পতন কখনোই বাভারিয়ার উত্থান ঘটাবে না। বরং , একজনের পতন মানেই অন্যজনের পতন ।

এই ধরনের আচরণ আমাকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। আমি এর মধ্যে কেবল চতুরতাই দেখতে পেয়েছিলাম।
নিজেদের থেকে জনগণের মনোযোগ সরানোর জন্য এটি ছিল ইহুদিদের একটি কৌশল । যখন প্রুশিয়ান ও বাভারিয়ানরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছিল , তখন ইহুদিরা উভয়ের নাকের ডগা থেকে জীবিকার উৎস চুরি করছিল। বাভারিয়ায় যখন প্রুশিয়ানরা অপমানিত হচ্ছিল, তখন ইহুদিরা একটি বিপ্লব সংগঠিত করে এক আঘাতেই প্রুশিয়া ও বাভারিয়া উভয়কেই চূর্ণ করে দেয় ।

একই জার্মান জাতির মানুষের মধ্যে এই জঘন্য ঝগড়া আমি সহ্য করতে পারছিলাম না, এবং আমি বরং রণাঙ্গনে ফিরে যেতেই পছন্দ করছিলাম । তাই , মিউনিখে পৌঁছানোর সাথে সাথেই আমি আবার কাজে যোগ দিলাম। ১৯১৭ সালের মার্চের শুরুতে , আমি রণাঙ্গনে আমার পুরনো রেজিমেন্টে পুনরায় যোগদান করি।

* * *

১৯১৭ সালের শেষ নাগাদ মনে হচ্ছিল , রণাঙ্গনের মনোবল ভেঙে যাওয়ার সবচেয়ে খারাপ সময়টা কেটে গেছে। রাশিয়ার পতনের পর পুরো সেনাবাহিনী সাহস ও আশা ফিরে পেয়েছিল এবং আমরা ক্রমশ আরও বেশি করে নিশ্চিত হচ্ছিলাম যে এই লড়াইয়ের পরিণতি আমাদের অনুকূলেই হবে। আমরা আবার গান গাইতে পারছিলাম। কাকেরা কা কা করা বন্ধ করে দিয়েছিল। আমাদের মাতৃভূমির ভবিষ্যতের প্রতি বিশ্বাস আবার দৃঢ় হচ্ছিল।

১৯১৭ সালের শরৎকালে ইতালির পতন এক অসাধারণ প্রভাব ফেলেছিল; এই বিজয় প্রমাণ করেছিল যে , কেবল রাশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রেই নয়, সর্বত্রই সাফল্য সম্ভব । এই অনুপ্রেরণামূলক ভাবনাটি রণাঙ্গনের লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে প্রাধান্য পেতে শুরু করে এবং ১৯১৮ সালের বসন্তের দিকে আত্মবিশ্বাসের সাথে তাকানোর জন্য তাদের উৎসাহিত করে । এটা বেশ স্পষ্ট ছিল যে শত্রুপক্ষ হতাশায় নিমজ্জিত ছিল। সেই শীতকালে রণাঙ্গন স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা শান্ত ছিল। কিন্তু এটা ছিল ঝড়ের আগের নীরবতা।

ঠিক যখন এই অন্তহীন যুদ্ধের অবসান ঘটানো চূড়ান্ত আক্রমণের প্রস্তুতি চলছিল , ঠিক যখন সৈন্য ও গোলাবারুদ বহনকারী অন্তহীন পরিবহন বহরগুলো সম্মুখের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, ঠিক যখন চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য সৈন্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছিল, তখনই পুরো যুদ্ধকালে জার্মানিতে সংঘটিত সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনাটি ঘটে গেল।

জার্মানি যুদ্ধে জিততে পারেনি । ঠিক যখন মনে হচ্ছিল জার্মান পতাকায় বিজয়ের জয়জয়কার , তখনই পেছন থেকে জার্মান বসন্তকালীন আক্রমণের কেন্দ্রস্থলে আঘাত হেনে বিজয়কে ঠেকানোর জন্য একটি ষড়যন্ত্র করা হলো। অস্ত্র কারখানাগুলোতে একটি সাধারণ ধর্মঘটের আয়োজন করা হয়েছিল।

যদি এই ষড়যন্ত্রটি তার লক্ষ্যে পৌঁছাত , তাহলে জার্মান ফ্রন্ট ভেঙে পড়ত এবং ফোরভার্টস (সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক মুখপত্র)-এর এই ইচ্ছা পূরণ হতো যে এবার বিজয় যেন জার্মানদের পক্ষে না যায় । গোলাবারুদের অভাবে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ফ্রন্টটি ভেঙে পড়ত এবং আক্রমণটি থেমে যেত।

Machine Translated by Google

এবং মৈত্রী রক্ষা পেত। তখন আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা জার্মানির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিত এবং মার্ক্সবাদী জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতার অভ্যন্তরীণ লক্ষ্য অর্জিত হতো। তাদের লক্ষ্য ছিল জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ধ্বংস করে তার জায়গায় আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা। এবং এক পক্ষের নির্বোধ সরলতা ও অপর পক্ষের অবর্ণনীয় বিশ্বাসঘাতকতার কারণে এই লক্ষ্য সত্যিই অর্জিত হয়েছিল।

তবে, গোলাবর্ষণটি প্রত্যাশিত সাফল্য এনে দিতে পারেনি।

প্রত্যাশা ছিল: অর্থাৎ, সম্মুখভাগকে গোলাবারুদ থেকে বঞ্চিত করা। এই অভাব এতটাই স্বল্পস্থায়ী ছিল যে, মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী তা সেনাবাহিনীর বিপর্যয় ডেকে আনতে পারেনি। কিন্তু এর নৈতিক বিপর্যয় ছিল আরও অনেক বেশি ভয়াবহ।

প্রথমত, দেশের মানুষ যদি সেনাবাহিনীর জয় না-ই চায়, তবে তারা কিসের জন্য যুদ্ধ করছিল? তারা কার জন্য বিপুল ত্যাগ স্বীকার করেছিল এবং এতসব প্রতিকূলতা সহ্য করেছিল? সৈন্যরা কি বিজয়ের জন্য যুদ্ধ করবে, অথচ দেশে বসে তার বিরুদ্ধেই আঘাত হানবে?

দ্বিতীয়ত, এই পদক্ষেপটি শত্রুর উপর কী প্রভাব ফেলেছিল?

১৯১৭-১৯১৮ সালের শীতে, মিত্রশক্তির দিগন্তে কালো মেঘ ছেয়ে গিয়েছিল। প্রায় চার বছর ধরে জার্মান দৈত্যটির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানো হয়েছিল, কিন্তু তাকে পরাস্ত করতে ব্যর্থ হয়েছিল সে। তাকে এক হাতে একটি প্রতিরক্ষামূলক ঢাল ধরে রেখে আক্রমণগুলো প্রতিহত করতে হয়েছিল, কারণ
পূর্ব ও দক্ষিণের শত্রুদের বিরুদ্ধে তরবারি চালানোর জন্য তার অন্য হাতটি মুক্ত থাকা আবশ্যক ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত, এই শত্রুরা পরাজিত হয়েছিল এবং পশ্চিমের সংঘাতের জন্য তার পশ্চাৎভাগ মুক্ত হয়েছিল। এই কাজটি সম্পন্ন করতে রক্তের স্রোত বয়ে গিয়েছিল; কিন্তু এখন, পশ্চিম রণাঙ্গনের যুদ্ধে কেবল ঢালই নয়, তরবারিও ব্যবহার করা যেত। এবং যেহেতু শত্রুরা এখন পর্যন্ত জার্মান প্রতিরক্ষা ভেদ করতে পারেনি, তাই জার্মানদের একটি আক্রমণ শুরু করতেই হতো। জার্মান বিজয়ের আশঙ্কায় শত্রুরা ভীত ও কম্পিত ছিল।

প্যারিস ও লন্ডনে অবিরাম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। এমনকি শত্রুপক্ষের প্রচারণাও বাধার সম্মুখীন হচ্ছিল। জার্মানির জয়ের কোনো সম্ভাবনা নেই—এটা প্রমাণ করা আর ততটা সহজ ছিল না। রণাঙ্গনে এক ইচ্ছাকৃত নীরবতা বিরাজ করছিল, এমনকি মৈত্রী জোটের সৈন্যদের মধ্যেও। তাদের প্রভুদের দুঃসাহস হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেল। এক অস্বস্তিকর সত্য তাদের কাছে স্পষ্ট হতে শুরু করল। জার্মান সৈন্য সম্পর্কে তাদের ধারণা বদলে গিয়েছিল। এতদিন পর্যন্ত তারা তাকে ধ্বংসের মুখে থাকা এক বোকা হিসেবে চিত্রিত করতে পারত; কিন্তু এখন তারা এমন সৈন্যদের মুখোমুখি হলো, যারা তাদের রুশ মিত্রকে পরাজিত করেছিল। পরিস্থিতিগত কারণে জার্মান সামরিক কর্তৃপক্ষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া, অর্থাৎ আক্রমণকে কেবল পূর্বে সীমাবদ্ধ রাখার নীতিটি এখন মৈত্রী জোটের কাছে এক অসাধারণ কৌশলগত প্রতিভা বলে মনে হচ্ছিল। তিন বছর ধরে জার্মানরা রুশ রণাঙ্গনে কোনো দৃশ্যমান সাফল্য ছাড়াই যুদ্ধ করে আসছিল। এই নিষ্ফল প্রচেষ্টাগুলোকে উপহাস করা হতো; মনে করা হতো যে, দীর্ঘমেয়াদে রুশ দৈত্যটি কেবল এত রক্ত ঝরিয়েই জয়ী হবে।

এবং ঘটনাগুলো এই আশাকেই যেন সত্যি প্রমাণ করছিল।

১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে, যখন ট্যানেনবার্গের যুদ্ধের পর রুশ যুদ্ধবন্দীদের অবিরাম স্রোত জার্মানিতে প্রবেশ করতে শুরু করে, তখন মনে হচ্ছিল যেন এই স্রোত কখনো থামবে না, এবং একটি পরাজিত সেনাবাহিনীর জায়গায় অবিলম্বে আরেকটি নতুন সেনাবাহিনী গঠন করা হবে। জার-এর অধীনে থাকা বিশাল সাম্রাজ্যে সৈন্যের যোগান অফুরন্ত বলে মনে হচ্ছিল; এই যুদ্ধের জন্য নতুন বলি সবসময় হাতের কাছেই ছিল। এই প্রতিযোগিতায় জার্মানরা আর কতদিন টিকে থাকতে পারবে? এমন দিন কি আসবে না যখন, জার্মানির শেষ বিজয়ের পরেও, চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য সংরক্ষিত রুশ সেনাবাহিনী জড়ো করা থাকবে? আর তারপর কী হবে? মানবিক মানদণ্ডে, জার্মানির উপর রাশিয়ার বিজয় হতে পারত

সময় গড়িয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটা ঘটতেই হতো।

রাশিয়ার উপর রাখা সমস্ত আশা এখন বিলীন হয়ে গিয়েছিল। যে মিত্রপক্ষ অভিন্ন স্বার্থের বেদিতে সবচেয়ে বেশি রক্ত উৎসর্গ করেছিল, তার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল এবং এক অদম্য শত্রুর সামনে সে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। এন্তেন্তের সৈন্যদের মধ্যে আতঙ্ক ও ভয়ের এক অনুভূতি ছেয়ে গেল, যারা এতদিন পর্যন্ত অন্ধ বিশ্বাসের উপর ভর করে টিকে ছিল। তারা আসন্ন বসন্তকে ভয় পাচ্ছিল।
তারা দেখল যে, পশ্চিম রণাঙ্গনে নিজেদের বাহিনীর কেবল একটি অংশকে কেন্দ্রীভূত করেই যদি তারা জার্মানদের প্রতিরোধ ভাঙতে ব্যর্থ হয়, তবে এই বীরদের বিস্ময়কর দেশটির সমস্ত শক্তি যখন পশ্চিমে এক বিরাট আক্রমণের জন্য সমবেত হবে, তখন তারা বিজয়ের আশা কীভাবে করতে পারে?

Machine Translated by Google

অধ্যায় ৭ – বিপ্লব

দক্ষিণ টাইরোলে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর ছায়া , পরাজিত সেনাবাহিনীগুলোর প্রেতাত্মা
ফ্ল্যান্ডার্সে এনটেন্ট সৈন্যদের কঠোর মুখমণ্ডলে ক্যাডোর্নাদের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছিল । বিজয়ের বিশ্বাস পরাজয়ের ভয়ে পরিণত হয়েছিল ।

সেইসব শীতের রাতে, যখন মহাবিপদের জন্য এগিয়ে আসা জার্মান সেনাবাহিনীর পদশব্দ প্রায় শোনা যাচ্ছিল, এবং ভয় ও কম্পন নিয়ে পরিণতির প্রতীক্ষা চলছিল, ঠিক তখনই হঠাৎ জার্মানিতে একটি উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠল এবং তার রশ্মি শত্রুপক্ষের রণাঙ্গনের শেষ ফাঁকটুকুতেও পৌঁছে গেল।
ঠিক যে মুহূর্তে জার্মান ডিভিশনগুলো বড় ধরনের আক্রমণের জন্য তাদের চূড়ান্ত আদেশ পাচ্ছিল, সেই মুহূর্তে জার্মানিতে একটি সাধারণ ধর্মঘট শুরু হয়ে গেল।

প্রথমে বিশ্ব হতবাক হয়ে গিয়েছিল। তারপর , শত্রুপক্ষের প্রচারমাধ্যমগুলো আবার সক্রিয় হয়ে উঠল , একেবারে শেষ মুহূর্তে সাহায্যের জন্য ছুটে এল । মিত্রবাহিনীর সৈন্যদের ভেঙে পড়া আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে সম্ভাব্য সব উপায় ব্যবহার করা হয়েছিল । বিজয়ের সম্ভাবনাকে নিশ্চিত বলে উপস্থাপন করা হয়েছিল, এবং আসন্ন ঘটনা সম্পর্কে আশঙ্কাগুলোকে চূড়ান্ত নিশ্চয়তার অনুভূতিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছিল । যে রেজিমেন্টগুলোকে ইতিহাসের সর্ববৃহৎ জার্মান আক্রমণের মূল আঘাত সহ্য করতে হয়েছিল, তাদের বোঝানো সম্ভব হয়েছিল যে এই যুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় জার্মান আক্রমণের সাহসিকতায় নয়, বরং প্রতিরক্ষায় দৃঢ়তার মাধ্যমে অর্জিত হবে । জার্মানি তার বিজয় অর্জন করুক, তবুও পিতৃভূমি একটি বিপ্লবকে স্বাগত জানাবে, কোনো বিজয়ী সেনাবাহিনীকে নয় ।

ব্রিটিশ, ফরাসি এবং আমেরিকান সংবাদপত্রগুলো তাদের পাঠকদের মধ্যে এই বিশ্বাস ছড়াতে শুরু করে, অন্যদিকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পরিচালিত প্রচারণা সম্মুখ সমরের সৈন্যদের মনোবলকে শক্তিশালী করে তোলে ।

"জার্মানি বিপ্লবের মুখোমুখি! মিত্রশক্তির বিজয় অনিবার্য!" টলমল করা পোইলু ও টমিদের আবার উঠে দাঁড় করানোর জন্য এটাই ছিল সেরা দাওয়াই । আমাদের রাইফেল ও মেশিনগানগুলো আবার গুলি চালাতে পারত; কিন্তু তাতে আতঙ্কিত হয়ে পালানোর পরিবর্তে , সেগুলো দৃঢ় ও আত্মবিশ্বাসী প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল।

অস্ত্র কারখানাগুলোতে ধর্মঘটের ফলেই এমনটা ঘটেছিল। শত্রু দেশগুলোতে বিজয়ের বিশ্বাস পুনরুজ্জীবিত ও সুদৃঢ় হয়েছিল এবং এ পর্যন্ত সম্ভব হওয়া হতাশার পঙ্গুকারী অনুভূতি দূর হয়ে গিয়েছিল।
এনটেন্ট ফ্রন্টে অসন্তোষ নির্বাসিত করা হয়েছিল। এই ধর্মঘটে হাজার হাজার জার্মান সৈন্যের প্রাণহানি ঘটে । কিন্তু এই জঘন্য ধর্মঘটের ঘৃণ্য প্ররোচনাকারীরা ছিল বিপ্লবী জার্মানির সর্বোচ্চ সরকারি পদের প্রার্থী ।

জার্মান সৈন্যদের মধ্যে এই ঘটনাগুলোর পরিণতি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হলেও, শত্রুপক্ষের ওপর এর প্রভাব ছিল দীর্ঘস্থায়ী। প্রতিরোধ বাহিনী আর এক পরাজিত লক্ষ্যের জন্য লড়াইরত সেনাবাহিনী রইল না।
এর পরিবর্তে ছিল বিজয়ের জন্য লড়াই করার এক কঠোর সংকল্প । মানবিক মানদণ্ডে, পশ্চিম রণাঙ্গন যদি জার্মান আক্রমণ কয়েক মাসের জন্যও প্রতিহত করতে পারত, তবে বিজয় নিশ্চিত ছিল । মিত্রশক্তির সংসদগুলো এক উন্নততর ভবিষ্যতের সম্ভাবনা উপলব্ধি করেছিল এবং জার্মানির অভ্যন্তরীণ সংহতি ভাঙার লক্ষ্যে পরিচালিত প্রচারকার্য চালিয়ে যাওয়ার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দের পক্ষে ভোট দিয়েছিল ।

* * *

প্রথম দুটি এবং শেষ আক্রমণে অংশ নেওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল । এগুলো আমার জীবনে সবচেয়ে গভীর ছাপ ফেলেছিল—সবচেয়ে গভীর, কারণ ১৯১৪ সালের মতোই এই শেষবারের মতো লড়াইটা রক্ষণাত্মক না থেকে আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছিল ।
তিন বছর ধরে এই নরকযন্ত্রণা সহ্য করার পর যখন অবশেষে সেই চূড়ান্ত দিনটি এসে পৌঁছাল, তখন জার্মান পরিখা ও বাঙ্কারগুলো থেকে স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল । বিজয়ের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত পতাকায় অমরত্বের শেষ মুকুটগুলো ঝুলিয়ে দেওয়ার সময় বিজয়ী ব্যাটালিয়নগুলোর গগনভেদী উল্লাসধ্বনি আবারও শোনা গেল। মার্চ করে চলা অন্তহীন সৈন্যদলের ওপর দিয়ে দেশাত্মবোধক গানের সুর আবারও আকাশে ভেসে উঠল , এবং শেষবারের মতো , ঈশ্বর তাঁর অকৃতজ্ঞ সন্তানদের প্রতি প্রসন্ন হলেন ।

Machine Translated by Google

অধ্যায় ৭ – বিপ্লব

* * *

১৯১৮ সালের গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময়ে, রণাঙ্গনের উপর এক ধরনের দমবন্ধ করা অনুভূতি ছেয়ে ছিল। দেশে ফিরে তারা তর্ক করছিল । কী নিয়ে? রণাঙ্গনের বিভিন্ন ইউনিটের মধ্যে আমরা নানা কথা শুনছিলাম: যুদ্ধটা হয়ে উঠেছিল আশাহীন, এবং কেবল একজন পাগলই জয়ের কথা ভাবতে পারে । জনগণ নয়, বরং পুঁজিপতি ও রাজতন্ত্রই এখনও বিষয়টিকে টেনে নিয়ে যেতে চায় । এই ধরনের ধারণা গ্রাম থেকেই এসেছিল এবং রণাঙ্গনে এ নিয়ে আলোচনা করা হতো।

প্রথমদিকে , এই সবকিছু খুব সামান্যই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। সার্বজনীন ভোটাধিকার আমাদের কাছে কী এমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল? আমরা কি চার বছর ধরে এর জন্যই লড়াই করছিলাম? কী জঘন্য এক চুরি — আমাদের বীরদের কবর থেকে সেই আদর্শকেই টেনে বের করা , যার জন্য তাঁরা প্রাণ দিয়েছেন। ফ্ল্যান্ডার্সে আমাদের সৈন্যরা "সার্বজনীন ভোটাধিকার দীর্ঘজীবী হোক" এই স্লোগানের জন্য নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে যায়নি, বরং গিয়েছিল "বিশ্বে সবকিছুর উপরে জার্মানি" এই স্লোগানের জন্য। একটি ছোট, কিন্তু অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য। আর যারা এই ভোটের জন্য চিৎকার করেছিল, যুদ্ধের সময় তাদের বেশিরভাগই উপস্থিত ছিল না। রণাঙ্গনে থাকা আমাদের কাছে এই সমস্ত রাজনৈতিক হট্টগোল ছিল সম্পূর্ণ অচেনা। সেই দিনগুলিতে, যেখানে সৎ জার্মানরা সমবেত হতো , সেখানে সংসদীয় অভিজাতদের একটি ক্ষুদ্র অংশই কেবল উপস্থিত থাকত।

রণাঙ্গনে যুদ্ধরত পুরোনো সৈনিকেরা এবার্ট, শাইডম্যান, বার্থ, লিবকনেখট ও অন্যদের দ্বারা নির্ধারিত নতুন যুদ্ধ-লক্ষ্যগুলোতে সায় দেননি। আমরা বুঝতে পারছিলাম না, কেন এই দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তিরা হঠাৎ করে সামরিক বাহিনীর ওপর কর্তৃত্ব করে রাষ্ট্রের সমস্ত নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করবে ।

একেবারে শুরু থেকেই আমার নিজস্ব সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিগত মতামত ছিল। জাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা ওই জঘন্য রাজনীতিবিদদের পুরো দলটির প্রতি আমার তীব্র ঘৃণা ছিল । আমি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলাম যে, এই লজ্জাজনক দলটির কাছে দেশের স্বার্থের কোনো স্থানই ছিল না , যারা কেবল নিজেদের খালি পকেট ভরার আশায় ছিল। আমার মতে, এই লোকগুলোর ফাঁসি হওয়া পুরোপুরি উচিত ছিল, কারণ তারা শান্তি বিসর্জন দিতে এবং প্রয়োজনে পরাজয় বরণ করতেও প্রস্তুত ছিল ।

জার্মানি কেবল নিজেদের লক্ষ্য অর্জনের জন্যই এমনটা করেছিল। এর অর্থ ছিল একদল চোরের লাভের জন্য শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া । তাদের ইচ্ছার সাথে একমত হওয়ার অর্থ ছিল জার্মানিকে বলিদান করতে রাজি হওয়া ।

অধিকাংশ সেনাবাহিনীরই এই মত ছিল । কিন্তু স্বদেশ থেকে আসা অতিরিক্ত সৈন্যদল ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছিল; তাদের আগমন আমাদের সৈন্যদের জন্য শক্তির নয় , বরং দুর্বলতার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছিল।
বিশেষ করে তরুণ সৈন্যরা প্রায় অকেজো ছিল। মাঝে মাঝে বিশ্বাস করা কঠিন ছিল যে তারা সেই একই জাতির সন্তান, যারা একসময় তাদের যুবকদের চারপাশের যুদ্ধে পাঠিয়েছিল।
ইপ্রেস।

আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে নৈতিক অবক্ষয়ের লক্ষণগুলো ক্রমশ আরও প্রকট হয়ে উঠল , যদিও শত্রুপক্ষের আক্রমণ আমাদের পূর্ববর্তী প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধগুলোর ভয়াবহতার তুলনায় নগণ্য ছিল । এই আক্রমণের তুলনায় , সোম ও ফ্ল্যান্ডার্সে সংঘটিত যুদ্ধগুলোই আমাদের স্মৃতিতে সবচেয়ে ভয়াবহ বিভীষিকা হিসেবে রয়ে গেছে।

সেপ্টেম্বরের শেষে , আমার ডিভিশন তৃতীয়বারের মতো সেই অবস্থানগুলো দখল করল, যেখানে আমরা একসময় তরুণ স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে হানা দিয়েছিলাম । কী অসাধারণ স্মৃতি!

১৯১৪ সালের অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে এখানেই আমাদের অগ্নিপরীক্ষা হয়েছিল । মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসায় হৃদয় জ্বলছিল আর মুখে ছিল গান , আমাদের নবীন রেজিমেন্ট যেন নাচের তালে তালে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এই বিশ্বাসে এখানে বহু মূল্যবান রক্ত ঝরেছিল যে, সেই রক্তক্ষরণ আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও মুক্তিকে রক্ষা করবে।

১৯১৭ সালের জুলাই মাসে আমরা দ্বিতীয়বারের মতো এই পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করেছিলাম । আমাদের শ্রেষ্ঠ সহযোদ্ধারা এখানে শায়িত আছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বালকের চেয়ে সামান্য বড় – দেশের নামে মৃত্যুবরণকারী সেইসব সৈনিক, যাঁদের চোখে ছিল উদ্দীপ্ত ভালোবাসার আগুন ।

আমাদের মধ্যে যারা বয়োজ্যেষ্ঠ এবং একেবারে শুরু থেকেই এই রেজিমেন্টে ছিলেন , তাঁরা সেই পবিত্র স্থানে দাঁড়িয়ে গভীরভাবে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন , যেখানে আমরা 'মৃত্যু পর্যন্ত আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার' শপথ নিয়েছিলাম । তিন বছর আগে, রেজিমেন্টটি ঝটিকা আক্রমণে এই অবস্থানটি দখল করেছিল; এখন ক্লান্তিকর লড়াইয়ের মাধ্যমে আমাদের এটিকে রক্ষা করতে হচ্ছিল ।

Machine Translated by Google

অধ্যায় ৭ – বিপ্লব

তিন সপ্তাহব্যাপী গোলন্দাজ হামলার মাধ্যমে ইংরেজরা তাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছিল ফ্ল্যান্ডার্সে এক বিরাট আক্রমণ । মৃতদের আত্মা যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। রেজিমেন্টটি কাদায় নিজেদের পুঁতে ফেলল , জেদ করে গর্ত আর খাদে আঁকড়ে রইল; তারা পিছু হটলও না , ছত্রভঙ্গও হলো না ; কেবল সৈন্যসংখ্যাই প্রতিদিন কমতে থাকল । অবশেষে, ১৯১৭ সালের ৩১শে জুলাই ব্রিটিশরা তাদের আক্রমণ শুরু করল ।

আগস্টের শুরুতে আমাদের প্রত্যাহার করা হয়েছিল । রেজিমেন্টটি কমে কয়েকটি কোম্পানিতে পরিণত হয়েছিল, যারা কাদায় মাখামাখি হয়ে টলমল করছিল; মানুষের চেয়ে ভূতের মতোই বেশি লাগছিল তাদের । মাটিতে কয়েকশ মিটার গর্ত ছাড়া, মৃত্যুই ছিল ইংরেজদের একমাত্র প্রাপ্তি ।

এখন, ১৯১৮ সালের শরৎকালে, আমরা তৃতীয়বারের মতো সেই ভূমিতে দাঁড়ালাম যা আমরা ১৯১৪ সালে দখল করেছিলাম । কমিনেস গ্রাম, যা আগে আমাদের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হতো, তা ছিল যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে। যদিও চারপাশের পরিবেশে তেমন কোনো পরিবর্তন আসেনি , মানুষগুলো কেমন যেন অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল । তারা এখন রাজনীতি নিয়ে কথা বলত। অন্যান্য জায়গার মতোই , দেশের বিষ এখানেও প্রভাব ফেলেছিল। তরুণ নবীন সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করল। তাকে পুরোপুরি। তারা সরাসরি গ্রাম থেকে এসেছিল।

অক্টোবরের ১৩ থেকে ১৪ তারিখের রাতে , ব্রিটিশরা ইপ্রেসের দক্ষিণে রণাঙ্গনে একটি গ্যাস হামলা চালায়। তারা একটি হলুদ গ্যাস ব্যবহার করেছিল, যার প্রভাব সম্পর্কে আমাদের অন্তত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল না। সেই রাতেই আমারও এর অভিজ্ঞতা হয়েছিল । ১৩ই অক্টোবর সন্ধ্যায় ওয়ারউইক হিলে, আমাদের উপর বেশ কয়েক ঘন্টা ধরে গ্যাস বোমার প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করা হয়েছিল , যা সারা রাত ধরে বিভিন্ন মাত্রার তীব্রতায় চলতে থাকে। মধ্যরাতের দিকে, আমাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মী কর্মক্ষমতা হারায়, কেউ কেউ স্থায়ীভাবে। পরের দিন সকালে, আমিও ব্যথা অনুভব করতে শুরু করি । প্রতি পনেরো মিনিট অন্তর তা বাড়ছিল ; প্রায় সাতটার দিকে, আমার চোখ জ্বালা করছিল যখন আমি টলতে টলতে যুদ্ধের শেষ বার্তাটি পৌঁছে দিতে যাচ্ছিলাম , যা ছিল আমার নিয়তি। কয়েক ঘন্টা পরে, আমার চোখ জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো হয়ে গিয়েছিল এবং অন্ধকার আমাকে গ্রাস করেছিল ।

আমাকে পোমেরানিয়ার পাসওয়াক হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল এবং সেখানেই আমি বিপ্লবের কথা শুনেছিলাম।

* * *

অনেক দিন ধরেই, অনির্দিষ্ট কিন্তু ভয়ংকর কিছু একটা বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল। লোকে বলছিল আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কিছু একটা ঘটবে , কিন্তু এর মানে কী হতে পারে তা আমি কল্পনাও করতে পারছিলাম না। আমার প্রথম ভাবনা ছিল বসন্তে ঘটে যাওয়া ধর্মঘটের মতো কিছু একটা। নৌবাহিনী থেকে অনবরত প্রতিকূল গুজব আসছিল, বলা হচ্ছিল যে সেখানে একটা অস্থিরতা চলছে। কিন্তু এটাকে বিচ্ছিন্ন কিছু তরুণের অদ্ভুত সৃষ্টি বলে মনে হচ্ছিল । এটা সত্যি যে হাসপাতালের সবাই যুদ্ধের শেষ নিয়ে কথা বলছিল এবং আশা করছিল যে তা আসন্ন, কিন্তু কেউই ভাবেনি যে সঙ্গে সঙ্গে কোনো সিদ্ধান্ত আসবে । আমি খবরের কাগজ পড়তে পারতাম না ।

নভেম্বরে এই সাধারণ চাপ আরও তীব্র হলো । হঠাৎ একদিন, কোনো সতর্কবার্তা ছাড়াই বিপর্যয় আমাদের ওপর নেমে এলো। নাবিকেরা ট্রাকে করে এসে বিপ্লবের জন্য সমর্থন চাইল। আমাদের জাতীয় অস্তিত্বের 'স্বাধীনতা, সৌন্দর্য ও মর্যাদা'র জন্য এই সংগ্রামের নেতা ছিল কয়েকজন ইহুদি বালক । তাদের কেউই সম্মুখ সমরে ছিল না। যৌনরোগের হাসপাতাল থেকে তাদের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এখন তাদের লাল কাপড়গুলো এখানে প্রদর্শন করা হচ্ছিল।

গত কয়েকদিন ধরে আমি কিছুটা ভালো বোধ করতে শুরু করেছিলাম । আমার চোখের কোটরের জ্বালাপোড়া কিছুটা কমে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে, আমি আমার চারপাশের সাধারণ আকৃতিগুলো চিনতে শুরু করেছিলাম। আশা করা হচ্ছিল যে, পরবর্তীতে কোনো একটা কাজ খুঁজে নেওয়ার মতো দৃষ্টিশক্তি আমি ফিরে পাব । আমি আবার আঁকতে বা নকশা করতে পারব কি না , সে প্রশ্নই ওঠে না। তাই আমি যখন সুস্থতার পথে, ঠিক তখনই সেই ভয়ংকর মুহূর্তটি এসে পড়ল।

প্রথমে আমি ভেবেছিলাম এই রাষ্ট্রদ্রোহিতার ঘটনাটি একটি স্থানীয় ব্যাপার। আমি আমার কমরেডদের উপর এই বিশ্বাসটি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম । হাসপাতালে আমার বাভারিয়ান সহকর্মীরা তা সহজেই মেনে নিয়েছিল। তাদের কোনো বিপ্লবী প্রবণতা ছিল না। মিউনিখে এই উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়ার কথা আমি কল্পনাও করতে পারিনি ; আমার কাছে মনে হয়েছিল যে উইটেলসবাক পরিবারের প্রতি আনুগত্য...

Machine Translated by Google

মুষ্টিমেয় কয়েকজন ইহুদির ইচ্ছার চেয়ে ইহুদিদের ইচ্ছাশক্তি প্রবল ছিল । তাই আমি বিশ্বাস না করে পারছিলাম না যে, এটা নৌবাহিনীর মধ্যে কেবল একটি বিদ্রোহ এবং কয়েক দিনের মধ্যেই তা দমন করা হবে ।

পরবর্তী কয়েক দিনের মধ্যে আমার জীবনের সবচেয়ে মর্মান্তিক খবরটি এলো। গুজবগুলো ক্রমশ জেঁকে বসল। আমাকে বলা হলো যে, আমি যাকে একটি স্থানীয় ব্যাপার বলে মনে করেছিলাম , তা আসলে একটি সাধারণ বিপ্লব। শুধু তাই নয়, রণাঙ্গন থেকে লজ্জাজনক খবর আসছিল যে তারা আত্মসমর্পণ করার পরিকল্পনা করছে ! এটা কি আদৌ সম্ভব ছিল ? ১০ই নভেম্বর, স্থানীয় যাজক একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেওয়ার জন্য হাসপাতালে গেলেন ।

এভাবেই আমরা পুরো ঘটনাটা জানতে পারলাম।

উত্তেজনা ও উত্তেজনায় আমি তাঁর ভাষণ শুনলাম। সেই সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ ভদ্রলোক কাঁপতে কাঁপতে আমাদের বললেন যে, হোহেনজোলার্ন পরিবার আর রাজমুকুট পরিধান করে না, পিতৃভূমি একটি "প্রজাতন্ত্রে" পরিণত হয়েছে, এবং আমাদের প্রার্থনা করা উচিত যেন সর্বশক্তিমান এই নতুন ব্যবস্থার উপর তাঁর আশীর্বাদ ফিরিয়ে না নেন এবং আগামী দিনে মানবজাতিকে পরিত্যাগ না করেন ।

এই খবরটি দেওয়ার সময় , তিনি রাজপরিবারের প্রতি, পোমেরানিয়া, প্রুশিয়া এবং সমগ্র জার্মান মাতৃভূমির প্রতি তাদের সেবার জন্য কেবল সংক্ষেপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারলেন—এবং তারপর তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। এই সমাবেশে উপস্থিত মানুষদের মধ্যে এক গভীর আতঙ্কের অনুভূতি নেমে এল, এবং আমার মনে হয় কেউই নিজেদের চোখের জল ধরে রাখতে পারেনি । বৃদ্ধ লোকটি যখন কথা শেষ করার চেষ্টা করছিলেন, তখন আমি ব্যক্তিগতভাবে পুরোপুরি ভেঙে পড়েছিলাম।

এর ইতিহাস আমাদের জানাচ্ছে যে, এই দীর্ঘ যুদ্ধের অবসান ঘটাতেই হবে , কারণ যুদ্ধে আমরা হেরে গেছি এবং এখন আমরা বিজয়ীদের করুণার পাত্র । ভবিষ্যতে এই মাতৃভূমিকেই এর বোঝা বহন করতে হবে।

গুরুভার । আমাদের যুদ্ধবিরতির শর্ত মেনে নিতে হয়েছিল এবং আমাদের প্রাক্তন শত্রুদের উদারতার উপর ভরসা করতে হয়েছিল । আমি আর দাঁড়িয়ে শুনতে পারছিলাম না। অন্ধকার আমাকে গ্রাস করল , যখন আমি টলতে টলতে আর হোঁচট খেতে খেতে আমার ঘরে ফিরে গেলাম এবং আমার যন্ত্রণাকে কবর দিলাম।

কম্বল ও বালিশের মাঝে মাথা ।

মায়ের কবরের পাশে দাঁড়ানোর পর থেকে আমি আর কাঁদিনি। যৌবনে যখন ভাগ্য আমার সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করেছিল , আমার ভেতরের সংকল্পের স্পিরিট আরও দৃঢ় হয়েছিল। যুদ্ধের দীর্ঘ বছরগুলোতে, যখন মৃত্যু আমাদের সারি থেকে অনেক সত্যিকারের বন্ধু ও সহযোদ্ধাদের কেড়ে নিয়েছিল, তখন অভিযোগের একটি শব্দ উচ্চারণ করাও পাপ বলে মনে হতো। তারা কি জার্মানির জন্য প্রাণ দেয়নি? এবং অবশেষে, সেই মহাযুদ্ধের শেষ কয়েক দিনে, যখন বিষাক্ত গ্যাসের ঢেউ আমাকে ঘিরে ধরেছিল এবং আমার চোখে প্রবেশ করতে শুরু করেছিল, তখন চিরতরে অন্ধ হয়ে যাওয়ার চিন্তা আমাকে দুর্বল করে দিয়েছিল; কিন্তু বিবেকের কণ্ঠস্বর তৎক্ষণাৎ বলে উঠল: বেচারা, অসহায় মানুষ, তুমি কি বিলাপ করবে যখন হাজার হাজার মানুষ আছে যাদের ভাগ্য তোমার চেয়ে শতগুণ খারাপ? এভাবেই আমি নীরবে আমার দুর্ভাগ্যকে মেনে নিলাম, এটা উপলব্ধি করে যে এটাই আমার একমাত্র করণীয় ছিল।

যা করা যেত এবং সেই ব্যক্তিগত কষ্ট দেশের এই ট্র্যাজেডির তুলনায় কিছুই নয় ।

সবই বৃথা গেল। সমস্ত ত্যাগ ও বঞ্চনা; অন্তহীন মাস ধরে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ; ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিজ নিজ দায়িত্বে থাকা , যদিও

মৃত্যুভয় আমাদের আত্মাকে গ্রাস করেছিল; কর্তব্য পালন করতে গিয়ে প্রাণ হারানো বিশ লক্ষ মানুষের মৃত্যু । আমি সেই লক্ষ লক্ষ মানুষের কথা ভাবছিলাম , যাদের হৃদয় স্বদেশের প্রতি বিশ্বাসে পূর্ণ ছিল এবং যারা আর কখনও ফেরেনি। তাদের কবর কি খুলে যাওয়া উচিত ছিল না, যাতে কাদা আর রক্তে মাখামাখি এই বীরদের আত্মা ঘরে ফিরে এসে তাদের উপর প্রতিশোধ নিতে পারে, যারা দেশের জন্য একজন মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মত্যাগের সাথে এমন নির্লজ্জভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল ? ১৯১৪ সালের আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে সৈন্যরা কি এই কারণেই মারা গিয়েছিল , সেই বছরের শরৎকালে স্বেচ্ছাসেবী রেজিমেন্টগুলো কি এই কারণেই তাদের বয়স্ক কমরেডদের অনুসরণ করেছিল ? ফ্ল্যান্ডার্সে সতেরো বছরের ছেলেদের কি এই কারণেই মাটিতে মিশে যেতে দেওয়া হয়েছিল ? জার্মান মায়েদের সেই আত্মত্যাগের ফল কি এগুলোই ছিল, যখন তারা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাদের সেই সব ছেলেদের বিদায় জানিয়েছিল যারা আর কখনও ফেরেনি? এই সবকিছু কি শুধু একদল জঘন্য দস্যুর পিতৃভূমির উপর হাত রাখার জন্য করা হয়েছিল ?

এই কারণেই কি জার্মান সৈন্যরা প্রখর তাপ ও দৃষ্টিহীনকারী তুষারঝড়ের মধ্যে যুদ্ধ করত, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও শীত সহ্য করত, এবং নিদ্রাহীন রাত ও অন্তহীন পদযাত্রায় পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ত ?

এই কারণেই কি তারা কামানের গোলাবর্ষণের নরক থেকে বেঁচে ফিরেছিলেন, গ্যাস হামলায় শ্বাসরুদ্ধ ও শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় পড়েছিলেন, কিন্তু পিছু হটেননি বা ভেঙে পড়েননি , বরং শত্রুকে প্রতিহত করে নিজেদের মাতৃভূমি রক্ষার কথা ভেবেছিলেন ? এই বীরেরা অবশ্যই এই সমাধিলিপির যোগ্য ছিলেন: পথিক, যখন

Machine Translated by Google

তোমরা জার্মানিতে থাকবে, পিতৃভূমিকে বলবে যে আমরা এখানে আছি, এর প্রতি এবং আমাদের কর্তব্যের প্রতি অনুগত থেকে।১৩)

আর দেশে? এটাই কি আমাদের একমাত্র ত্যাগ ছিল ? অতীতে জার্মানি কি মূল্যহীন ছিল ? তার ইতিহাসের প্রতি কি কোনো দায়বদ্ধতা ছিল না ? আমরা কি এখনও অতীতের গৌরবে অংশীদার হওয়ার যোগ্য ? ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমরা এই সত্যটি কীভাবে ব্যাখ্যা করব ?

কী জঘন্য ও দুশ্চরিত্র ডাকাতদের দল!

এই ভয়াবহ ঘটনাগুলো সম্পর্কে সঠিক তথ্য জোগাড় করার যতই চেষ্টা করছিলাম , ততই আমার মন ক্রোধ আর লজ্জায় জ্বলে উঠছিল। এই মর্মান্তিক ঘটনার তুলনায় আমার চোখের সমস্ত যন্ত্রণা আর কী-ই বা ছিল ?

পরবর্তী দিনগুলো ছিল অসহনীয়, আর রাতগুলো ছিল আরও ভয়াবহ। শত্রুর দয়ার উপর নির্ভর করা—এমন নীতি কেবল বোকা, মিথ্যাবাদী বা দস্যুরাই সমর্থন করতে পারে । সেই রাতগুলোতে এই জঘন্য অপরাধের হোতাদের প্রতি আমার ঘৃণা বাড়তে থাকল।

পরবর্তী দিনগুলোতে আমার নিয়তি আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল । আমার ব্যক্তিগত ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমি হাসতে বাধ্য হলাম, যা নিয়ে এতদিন আমি ভীষণ চিন্তিত ছিলাম। এমন ভিত্তির ওপর কিছু একটা গড়ার কথা ভাবাটা কি হাস্যকর নয়? অবশেষে আমার কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, যা অবশ্যম্ভাবী ছিল তা ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে; এমন কিছু যা আমি দীর্ঘদিন ধরে ভয় পেতাম, যদিও তা মন থেকে বিশ্বাস করার মতো সাহস আমার কখনো ছিল না ।

সম্রাট দ্বিতীয় উইলহেলম ছিলেন প্রথম জার্মান সম্রাট যিনি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন ।
মার্ক্সবাদী নেতাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল , বিন্দুমাত্র সন্দেহ না করে যে তারা ছিল সম্মানবোধহীন বদমাশ। যখন তারা সাম্রাজ্যবাদী হাতটি নিজেদের হাতে ধরে রেখেছিল, তখন অন্য হাতটি ইতিমধ্যেই ছোরাটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

ইহুদিদের সাথে সমঝোতায় পৌঁছানোর কোনো সুযোগই নেই । হয় এটা, নয়তো ওটা—এই কঠিন সিদ্ধান্তই নিতে হবে।

এরপর আমি রাজনৈতিক কাজে যুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম ।

পাদটীকা:

১৩) এখানেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান বীরত্বের আদি রূপ হিসেবে থার্মোপাইলির রক্ষাকারীদের উল্লেখ করা হয়েছে। হিটলারের উক্তিটি হলো থার্মোপাইলিতে লিওনিডাস এবং তাঁর স্পার্টান সৈন্যদের স্মরণে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভে খোদিত একটি দ্বিপদীর জার্মান রূপ, যাঁরা গিরিপথটি রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন।

Machine Translated by Google

অষ্টম অধ্যায়

আমার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সূচনা

নভেম্বরের শেষে আমি মিউনিখে ফিরে এলাম। আমি আমার রেজিমেন্টের সদর দপ্তরে গেলাম, যা তখন ' সৈন্য পরিষদ'- এর হাতে ছিল। এই সমস্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা আমার কাছে জঘন্য মনে হলো, তাই আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেখান থেকে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম । আমার বিশ্বস্ত সহযোদ্ধা আর্নস্ট শ্মিটের সাথে আমি ট্রাউনস্টাইনে গেলাম এবং সেখানে থাকলাম যতক্ষণ না...

শিবিরটি ভেঙে দেওয়া পর্যন্ত । ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে আমরা মিউনিখে ফিরে এসেছিলাম।

বর্তমান পরিস্থিতি বেশিদিন স্থায়ী হতে পারেনি। এটি অপ্রতিরোধ্যভাবে বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আইজনারের মৃত্যু এই অগ্রগতিকে কেবল ত্বরান্বিত করেছিল এবং পরিণামে একটি পরিষদীয় একনায়কতন্ত্রের জন্ম দিয়েছিল—অথবা আরও সঠিকভাবে বললে , একটি ইহুদি আধিপত্যের, যা অস্থায়ী প্রমাণিত হলেও, বিপ্লবের পরিকল্পনাকারীদের মূল লক্ষ্য ছিল এটাই ।

এই পর্যায়ে আমার মনে অসংখ্য পরিকল্পনা দানা বাঁধতে লাগল। কী করা যেতে পারে , সেই সমস্যাটা নিয়ে আমি দিনের পর দিন ভাবতাম , কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, প্রতিটি প্রকল্পকেই পথ ছেড়ে দিতে হতো।

এই কঠিন সত্যটি জানার আগেই যে আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলাম এবং সেই কারণে কার্যকর পদক্ষেপের জন্য প্রয়োজনীয় প্রথম প্রাথমিক শর্তটিও পূরণ করতে পারিনি। সেই সময়ে বিদ্যমান কোনো দলেই যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত আমি কেন নিয়েছিলাম, তার কারণ পরে ব্যাখ্যা করব ।

মিউনিখে যখন নতুন পরিষদ বিপ্লব শুরু হলো , আমার প্রথম কর্মকাণ্ডের কারণেই কেন্দ্রীয় পরিষদের শত্রুতা আমার ওপর নেমে আসে । ১৯১৯ সালের ২৭শে এপ্রিল ভোরবেলা আমাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছিল; কিন্তু আমাকে গ্রেপ্তার করতে আসা তিনজন গুণ্ডা আমার রাইফেলের মুখোমুখি হওয়ার সাহস না পেয়ে যেভাবে এসেছিল সেভাবেই চলে গেল।

মিউনিখ মুক্ত হওয়ার কয়েকদিন পর, বিপ্লবী কার্যকলাপ তদন্তের জন্য ২য় পদাতিক রেজিমেন্টে গঠিত তদন্ত কমিশনের সামনে হাজির হওয়ার আদেশ আমি পাই। বিশুদ্ধ রাজনৈতিক কার্যকলাপের সাথে এটাই ছিল আমার প্রথম পরিচয় ।

কয়েক সপ্তাহ পরে, আমি সেনাবাহিনীর সদস্যদের জন্য আয়োজিত একটি ধারাবাহিক বক্তৃতায় যোগ দেওয়ার আদেশ পেলাম । এই ধারাবাহিক বক্তৃতার উদ্দেশ্য ছিল কিছু মৌলিক নীতি গেঁথে দেওয়া, যার ওপর ভিত্তি করে একজন সৈনিক তার রাজনৈতিক ধারণা গড়ে তুলতে পারে। আমার জন্য এই বক্তৃতাগুলোর সুবিধা ছিল আমার মতো চিন্তাভাবনার সহযোদ্ধাদের সাথে দেখা করার সুযোগ , যাদের সাথে আমি সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারতাম।

আমরা সকলেই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতাম যে, নভেম্বরের বিশ্বাসঘাতকতায় অংশগ্রহণকারীদের—অর্থাৎ কেন্দ্রপন্থী ও সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের—দ্বারা জার্মানিকে অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয় থেকে রক্ষা করা সম্ভব নয় ; তথাকথিত জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া গোষ্ঠীও এর প্রতিকার করতে পারবে না।

তাদের উদ্দেশ্য মহৎ হলেও ক্ষতি হয়েছিল । তারা এমন অনেক শর্ত পূরণে ব্যর্থ হয়েছিল, যা ছাড়া এই ধরনের কাজ কখনোই কার্যকরভাবে সম্পন্ন করা যেত না। পরবর্তী বছরগুলো সেই সময়ে আমাদের পোষণ করা মতামতকেই সত্য প্রমাণ করেছিল।

আমাদের ছোট গণ্ডির মধ্যে আমরা একটি নতুন দল গঠনের প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। তখন প্রস্তাবিত প্রধান ধারণাগুলোই পরে জার্মান শ্রমিক দল প্রতিষ্ঠার সময় বাস্তবায়িত হয়েছিল। নতুন এই আন্দোলনের জন্য আমাদের একটি উপযুক্ত মঞ্চ খুঁজে বের করতে হয়েছিল।

জনসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি নাম ; এই শর্ত পূরণ না হলে আমাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ ও নিষ্ফল প্রমাণিত হতো। এই কারণেই আমরা 'সমাজ বিপ্লবী দল' নামটি বেছে নিয়েছিলাম, বিশেষ করে কারণ আমাদের নতুন সংগঠনের সামাজিক নীতিগুলো ছিল প্রকৃতই বাস্তবসম্মত।

বিপ্লবী।

কিন্তু এর আরও একটি মৌলিক কারণও ছিল । আমার জীবনের প্রথম দিকে অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর প্রতি আমার মনোযোগ মূলত সামাজিক প্রশ্ন থেকে সরাসরি উদ্ভূত বিষয়গুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে, যখন আমি জার্মানির ত্রিপক্ষীয় জোট নীতি নিয়ে অধ্যয়ন শুরু করি, তখন এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হয় । এই নীতিটি মূলত অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি ভুল মূল্যায়নের ফল ছিল , যার সাথে যুক্ত ছিল জার্মান জাতির ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব কোন ভিত্তির ওপর নিশ্চিত করা যেতে পারে সে সম্পর্কে একটি অস্পষ্ট ধারণা ।

Machine Translated by Google

এই সমস্ত ধারণা শুধুমাত্র এই নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল যে, পুঁজি হলো শ্রমেরই একটি ফল এবং শ্রমের মতোই এটিও একে বাধা দিতে বা সমর্থন করতে পারে এমন সমস্ত উপাদানের উপর নির্ভরশীল।
মানবিক কার্যকলাপ। সুতরাং, জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, পুঁজির গুরুত্ব রাষ্ট্র বা জাতির স্বাধীনতা ও শক্তির উপর নির্ভরশীল ছিল , এবং এই নির্ভরশীলতার ফলেই পুঁজি তার নিজস্ব উন্নয়ন ও আত্মরক্ষার প্রবৃত্তির নামে রাষ্ট্র ও জাতির স্বার্থ রক্ষা করত ।

এইসব নীতির ভিত্তিতে, পুঁজির প্রতি রাষ্ট্রের মনোভাব তুলনামূলকভাবে সরল ও সুস্পষ্ট হবে। এর একমাত্র কাজ হলো এটা নিশ্চিত করা যে, পুঁজি যেন রাষ্ট্রের জন্য উপকারী থাকে এবং জাতীয় স্বার্থের ওপর আধিপত্য বিস্তারের অধিকার যেন স্বয়ং গ্রহণ না করে। সুতরাং, এটি তার কার্যকলাপকে নিম্নলিখিত দুটি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখতে পারে : একদিকে, একটি টেকসই ও স্বাধীন জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, এবং অন্যদিকে, শ্রমিকদের সামাজিক অধিকার রক্ষা করা।

পূর্বে, শুধুমাত্র সৃজনশীল শ্রমের ফলস্বরূপ পুঁজি এবং শুধুমাত্র আর্থিক জল্পনা-কল্পনার ফলস্বরূপ পুঁজির মধ্যেকার পার্থক্য আমি যথেষ্ট স্পষ্টভাবে বুঝতে পারিনি। এই দিকে চিন্তা শুরু করার জন্য আমার একটি প্রেরণার প্রয়োজন ছিল ; কিন্তু এখন পর্যন্ত সেই প্রেরণার অভাব ছিল ।

প্রয়োজনীয় প্রেরণাটি এসেছিল আমার ইতোমধ্যে উল্লিখিত ধারাবাহিক বক্তৃতামালাটির একজন বক্তার কাছ থেকে । তিনি ছিলেন গটফ্রিড ফেদের।
জীবনে প্রথমবারের মতো আমি শেয়ার বাজার এবং ঋণের জন্য ব্যবহৃত মূলধন নিয়ে আলোচনা শুনলাম । ফেডারের প্রথম বক্তৃতা শোনার পর আমার তৎক্ষণাৎ মনে হলো যে, একটি নতুন দল প্রতিষ্ঠার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্তের পথ আমি খুঁজে পেয়েছি ।

* * *

আমার মতে, ফেডারের কৃতিত্ব নিহিত ছিল শেয়ার বাজার এবং ঋণ লেনদেনে ব্যবহৃত পুঁজির দ্বৈত প্রকৃতিকে তাঁর নির্মম ও তীক্ষ্ণ ভঙ্গিতে বর্ণনা করার মধ্যে , যা এই সত্যটি উন্মোচন করে যে এই পুঁজি সর্বদা এবং সর্বত্র সুদ প্রদানের উপর নির্ভরশীল। মৌলিক বিষয়গুলিতে তাঁর বক্তব্য এতটাই সাধারণ জ্ঞানে পরিপূর্ণ ছিল যে, যাঁরা তাঁর সমালোচনা করতেন তাঁরা তাঁর ধারণার যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেননি , বরং সেগুলোর বাস্তব প্রয়োগ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন । আমার কাছে, এটিই ছিল ফেডারের শিক্ষার সবচেয়ে শক্তিশালী দিক, যদিও অন্যরা এটিকে একটি দুর্বলতা হিসেবে গণ্য করতেন ।

* * *

যিনি একটি তাত্ত্বিক সমস্যা সংজ্ঞায়িত করেন, তাঁর কাজ কোনো কিছুকে বাস্তবে প্রয়োগ করার বিভিন্ন উপায় ব্যাখ্যা করা নয়। তাঁর কাজ হলো সমস্যাটিকেই মোকাবেলা করা ; সুতরাং , তাঁকে উপায়ের পরিবর্তে লক্ষ্যের দিকেই নজর দিতে হবে । গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হলো ধারণাটি মৌলিকভাবে সঠিক কি না। এটিকে বাস্তবে প্রয়োগ করা সহজ হবে নাকি কঠিন হবে, তা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি বিষয়। যখন কোনো তাত্ত্বিক সমস্যার ভিত্তি নির্ধারণের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি...

যখন কোনো কর্মসূচি বা নীতি নিজেকে কেবল পরম সত্য বিবৃত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তার উপযুক্ততা ও বাস্তবতার বিষয়টি বিবেচনা করতে শুরু করে, তখন তার কাজ যারা আলোর দিকে তাকায় তাদের জন্য পথপ্রদর্শক তারা হিসেবে কাজ করা বন্ধ করে দেবে এবং বড়জোর দৈনন্দিন জীবনের জন্য একটি ব্যবস্থাপত্রে পরিণত হবে । যিনি একটি আন্দোলনের কর্মসূচি প্রণয়ন করেন , তাকে কেবল লক্ষ্যটিই বিবেচনায় রাখতে হবে। রাজনৈতিক নেতাকেই সেই পথ নির্দেশ করতে হবে , যে পথে এই লক্ষ্য অর্জন করা হবে। সুতরাং, পূর্বোক্ত ব্যক্তির চিন্তাভাবনা অবিনশ্বর সত্য দ্বারা নির্ধারিত হবে , অপরদিকে পরবর্তী ব্যক্তির কার্যকলাপকে অবশ্যই সেই বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে পরিচালিত হতে হবে , যেখানে এই সত্যগুলো প্রয়োগ করা হবে ।

জীবন্ত করে তোলা হয়েছে

প্রথমটির মহত্ত্ব নির্ভর করবে বিমূর্তভাবে বিবেচিত ধারণাটির পরম সত্যতার ওপর ; এবং দ্বিতীয়টি নির্ভর করবে তা বাস্তবতাকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করে কি না তার ওপর।
অথবা না এবং পূর্ববর্তী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সত্যগুলো থেকে কতটা ব্যবহার করা যেতে পারে । তে-

Machine Translated by Google

একজন রাজনৈতিক নেতার মহত্ত্বের মাপকাঠি হলো তাঁর পরিকল্পনা ও উদ্যোগের সাফল্য , যার অর্থ হলো তাঁর ঘোষিত লক্ষ্য অর্জনের সম্ভাবনা ; পক্ষান্তরে, একজন রাজনৈতিক দার্শনিকের নির্ধারিত চূড়ান্ত লক্ষ্য হয়তো কখনোই অর্জিত হয় না ; কারণ যদিও মানব চিন্তা সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে এবং লক্ষ্যকে সুস্পষ্টভাবে চিত্রিত করতে পারে, মানব প্রকৃতির দুর্বলতা ও অপূর্ণতার কারণে এই লক্ষ্যগুলো কখনোই সম্পূর্ণরূপে অর্জিত হতে পারে না । কোনো ধারণা তাত্ত্বিকভাবে যত বেশি সঠিক এবং সেই কারণে যত বেশি শক্তিশালী হয়, বাস্তবে তা বাস্তবায়নের সম্ভাবনা তত কমে যায় , অন্তত যতক্ষণ তা মানুষের উপর নির্ভরশীল থাকে। একজন রাজনৈতিক দার্শনিকের গুরুত্ব তাঁর সৃষ্ট পরিকল্পনার বাস্তব সাফল্যের উপর নির্ভর করে না, বরং সেগুলোর পরম সত্যতা এবং মানবজাতির অগ্রগতিতে সেগুলোর প্রভাবের উপর নির্ভর করে । যদি তা না হতো, তবে ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাদের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা যেত না , কারণ তাদের নৈতিক লক্ষ্যগুলো বাস্তবে কখনোই সম্পূর্ণরূপে, এমনকি আনুমানিকভাবেও, পূরণ হবে না । এমনকি ভালোবাসার ধর্ম নামক ধর্মটিও বাস্তবে তার অনন্য প্রতিষ্ঠাতার ইচ্ছার এক ক্ষীণ প্রতিচ্ছবি মাত্র । কিন্তু এর তাৎপর্য নিহিত রয়েছে সেই দিকনির্দেশনায়, যা মানুষকে সভ্যতা, সদ্গুণ ও নৈতিকতা প্রদানের চেষ্টা করে।

একজন রাজনৈতিক দার্শনিক এবং একজন বাস্তববাদী রাজনৈতিক নেতার কার্যাবলীর মধ্যে এই ব্যাপক পার্থক্যের কারণেই উভয় কাজের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা একই ব্যক্তির মধ্যে খুব কমই দেখা যায় । এটি বিশেষ করে তথাকথিত স্বল্প পরিচিত কার্যকর রাজনীতিবিদদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যাদের কার্যকলাপ মূলত কোনো কিছুকে সম্ভব করে তোলার শিল্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ , যেমনটা বিসমার্ক সাধারণভাবে রাজনীতিকে বিনয়ের সাথে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন । যদি এই ধরনের রাজনীতিবিদ মহৎ ধারণাগুলোকে পুরোপুরি এড়িয়ে চলেন, তবে তিনি আরও সহজে সাফল্য অর্জন করতে পারবেন ; সেই সাফল্য অনেক দ্রুত অর্জিত হবে এবং প্রায়শই তা আরও বেশি বাস্তব হবে। তবে, ঠিক এই একই কারণে, এই ধরনের সাফল্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য এবং কখনও কখনও এর স্রষ্টার মৃত্যুর পরেও টিকে থাকতে পারে না। সাধারণভাবে বলতে গেলে, রাজনীতিবিদদের কাজ পরবর্তী প্রজন্মের জন্য অপ্রাসঙ্গিক , কারণ তাদের সাময়িক সাফল্য নির্ভর করে সেই সমস্ত সত্যিকারের মহৎ সমস্যা ও ধারণাগুলোকে অনুকূলভাবে এড়িয়ে চলার উপর, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ হবে ।

ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ ধারণার অন্বেষণ সাধারণত খুব লাভজনক কাজ নয় , এবং যিনি এই পথ অনুসরণ করেন , তাঁকে সাধারণ মানুষ খুব কমই বোঝে; এই সাধারণ মানুষ ভবিষ্যতের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার চেয়ে বিয়ার আর দুধকেই রাজনৈতিক মূল্যের অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য সূচক বলে মনে করে ; যে পরিকল্পনার বাস্তবায়ন হয়তো পরে হবে এবং যার সুফল কেবল ভবিষ্যৎ প্রজন্মই ভোগ করতে পারবে ।

মূর্খতার সঙ্গে সর্বদা থাকা এক বিশেষ ধরনের অহংকারের কারণে , অধিকাংশ রাজনীতিবিদ সেইসব ভবিষ্যৎ প্রকল্প এড়িয়ে চলেন , যেগুলোর বাস্তবায়ন সত্যিই কঠিন; তারা এই পরিহার করেন জনতার ক্ষণিকের সমর্থন না হারানোর জন্য । এই রাজনীতিবিদদের গুরুত্ব ও সাফল্য কেবল বর্তমানের সঙ্গেই সম্পর্কিত এবং এর কোনো ভবিষ্যৎ পরিণতি নেই। কিন্তু এতে সংকীর্ণমনা মানুষেরা বিচলিত হন না; তারা ক্ষণিকের ফলাফলেই যথেষ্ট সন্তুষ্ট থাকেন।

গঠনমূলক রাজনৈতিক দার্শনিকের অবস্থান সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁর কাজের গুরুত্ব সর্বদা ভবিষ্যতের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হবে; এবং তাঁকে প্রায়শই 'স্বপ্নদ্রষ্টা' বলে অভিহিত করা হয়। যেখানে একজন রাজনীতিবিদের দক্ষতা হলো সম্ভাব্যতার শিল্পে পারদর্শী হওয়া, সেখানে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাতা হলেন সেইসব ব্যক্তিদের মধ্যে একজন, যাঁদের সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে দেবতারা সন্তুষ্ট হন, কারণ তাঁরা অসম্ভবকে চান এবং দাবি করেন । তাঁরা সর্বদা সমসাময়িক খ্যাতি প্রত্যাখ্যান করবেন; কিন্তু যদি তাঁদের ধারণা অমর হয় , তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবে ।

মানব প্রগতির দীর্ঘ ইতিহাসে কখনও কখনও এমনও হতে পারে যে, বাস্তববাদী রাজনীতিবিদ এবং রাজনৈতিক দার্শনিক একই সত্তায় পরিণত হন । এই মিলন যত ঘনিষ্ঠ হবে, রাজনীতিবিদের কর্মকাণ্ড তত বেশি বাধার সম্মুখীন হবে । এমন মানুষ প্রত্যেক সংকীর্ণমনা ব্যক্তির কাছে সুস্পষ্ট দাবি মেটানোর জন্য কাজ করেন না, বরং এমন লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হন যা কেবল অল্প কিছু মানুষই বুঝতে পারে। তার জীবন ঘৃণা ও ভালোবাসায় জর্জরিত । তার সমসাময়িকদের প্রতিবাদ, যারা এই মানুষটিকে বোঝেন না, তা উত্তরসূরিদের স্বীকৃতির সাথে সাংঘর্ষিক , যাদের জন্যও তিনি কাজ করেন।

Machine Translated by Google

ভবিষ্যতের জন্য একজন মানুষ যত বড় কাজ করে, তার সমসাময়িকদের কাছে সে তত কম সমাদৃত হয়। তার সংগ্রাম আরও কঠিন হয় এবং সাফল্যও দুর্লভ হয়ে ওঠে। যুগে যুগে যখন সাফল্যমণ্ডিত এমন কোনো মানুষের আবির্ভাব ঘটে , তখন জীবনের অন্তিমকালে তার মনে হয়তো ভবিষ্যৎ গৌরবের এক ক্ষীণ আভাস জাগতে পারে । কিন্তু এই ধরনের মহান মানুষেরা হলেন ইতিহাসের ম্যারাথন দৌড়বিদ। সমসাময়িক খ্যাতির জয়গান কেবল মৃত্যুপথযাত্রী কোনো বীরের ললাটের জন্যই নির্ধারিত ।

মহান নায়কেরা হলেন তাঁরা, যাঁরা সমসাময়িকদের চোখে কোনো স্বীকৃতি না পেলেও নিজেদের ধারণা ও আদর্শের জন্য লড়াই করে যান । ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হৃদয়ে এঁদের স্মৃতি সম্মানিত হবে । যেন প্রত্যেক ব্যক্তিই তাঁদের সমসাময়িকদের হাতে মহান ব্যক্তিদের ভোগ করা অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করাকে নিজের কর্তব্য বলে মনে করতেন । তাঁদের জীবন ও কর্ম গভীর আবেগ এবং কৃতজ্ঞ প্রশংসার সাথে অধ্যয়ন করা হয় । বিশেষ করে দুঃখের অন্ধকার দিনগুলিতে, এমন মানুষেরা ভগ্ন হৃদয়কে সারিয়ে তোলার এবং শোকাহত মানুষের মনোবল বাড়িয়ে তোলার ক্ষমতা রাখেন ।

এই দলে শুধু প্রকৃত মহান রাষ্ট্রনায়করাই নন, সকল মহান সংস্কারকও অন্তর্ভুক্ত। ফ্রেডরিক দ্য গ্রেট ছাড়াও মার্টিন লুথার এবং রিচার্ড ওয়াগনারের মতো ব্যক্তিরা রয়েছেন ।

যখন আমি গটফ্রিড ফেডারের 'সুদদাসত্বের বিলোপ' বিষয়ক প্রথম বক্তৃতাটি শুনলাম, আমি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলাম যে এটি জার্মান জাতির ভবিষ্যতের জন্য এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সত্য। দেশের অর্থনৈতিক জীবন থেকে শেয়ার বাজারের পুঁজির সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটলে , একই সাথে খোদ পুঁজির উপর আক্রমণ না করেই জার্মান ব্যবসার আন্তর্জাতিকীকরণের প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করা সম্ভব হবে , কারণ তা আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার ভিত্তিকে হুমকির মুখে ফেলবে। জার্মানিতে কী ঘটছে তা আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম এবং বুঝতে পারছিলাম যে সবচেয়ে কঠিন লড়াইটি শত্রুভাবাপন্ন দেশগুলোর বিরুদ্ধে নয়, বরং আন্তর্জাতিক পুঁজির বিরুদ্ধে লড়তে হবে । ফেডারের বক্তৃতায় আমি আসন্ন সংগ্রামের জন্য একটি কার্যকর রণহুঙ্কার খুঁজে পেলাম।

পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ আবারও প্রমাণ করেছে যে, সেই সময়ে আমাদের যে ধারণা ছিল তা কতটা সঠিক ছিল। আমাদের বুর্জোয়া রাজনীতিবিদদের মধ্যে থাকা বোকারা আর আমাদের নিয়ে উপহাস করত না ; এমনকি তারাও এখন দেখতে পাচ্ছে — যদি তারা সত্যি বলে থাকে — যে আন্তর্জাতিক শেয়ার বাজারের পুঁজিই কেবল যুদ্ধ উস্কে দেওয়ার প্রধান কারণ ছিল না , বরং যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও,
শেষ হলে, ঘরটা নরকে পরিণত হয়।

আন্তর্জাতিক আর্থিক ও ফটকাবাজি পুঁজির বিরুদ্ধে লড়াইটি সেই কর্মসূচির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়েছিল, যার ওপর ভিত্তি করে জার্মান জাতি তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রাম গড়ে তুলেছিল।

তথাকথিত বাস্তববাদী ব্যক্তিদের উত্থাপিত আপত্তিগুলোর কথা বলতে গেলে , সেগুলো অবশ্যই হতে হবে
তারা নিম্নলিখিত উত্তরে সন্তুষ্ট হবেন : ফটকা পুঁজির ফলে সৃষ্ট দাসপ্রথা বিলোপের পর যে ভয়াবহ অর্থনৈতিক পরিণতি ঘটবে, তা নিয়ে যেকোনো ভয় অমূলক ; প্রথমত, কারণ এ পর্যন্ত প্রয়োগকৃত অর্থনৈতিক নীতিগুলো জার্মান জাতির স্বার্থের জন্য মারাত্মক বলে প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন উঠলে যে মনোভাব গ্রহণ করা হয় , তা সুস্পষ্টভাবে এই উপদেশের অনুরূপ।

বিশেষজ্ঞরা—যেমন, বাভারিয়ান মেডিকেল একাডেমি— একসময় রেলপথ প্রবর্তন প্রসঙ্গে যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। এই সম্মানিত বিশেষজ্ঞ প্যানেলের দ্বারা প্রকাশিত আশঙ্কা অমূলক প্রমাণিত হয়েছিল । নতুন 'বাষ্পীয় ঘোড়া'- য় ভ্রমণকারীরা মাথাঘোরায় ভোগেননি। যারা তাদের পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, তারাও অসুস্থ হননি, এবং নতুন এই আবিষ্কারকে আড়াল করার জন্য নির্মিত বেড়াগুলো অবশেষে ভেঙে ফেলা হয়েছিল। কেবল এই তথাকথিত 'বিশেষজ্ঞদের' দৃষ্টিসীমা সীমিত করে রাখা অন্ধত্বটুকুই রয়ে গেল। আর এমনই চিরকাল থাকবে।

দ্বিতীয়ত, একটি বিষয় অবশ্যই মনে রাখতে হবে: প্রতিটি ধারণাই বিপদের কারণ হতে পারে যদি তাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ লক্ষ্য হিসেবে দেখা হয় , অথচ বাস্তবে তা লক্ষ্য অর্জনের একটি উপায় মাত্র। আমার এবং সকল জাতীয় সমাজতন্ত্রীর জন্য মতবাদ একটাই: জাতি ও পিতৃভূমি।

আমাদের জাতি ও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও বিকাশ সুরক্ষিত করতে, এর সন্তানদের ভরণপোষণ করতে এবং আমাদের জাতির বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে , আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য আমাদের অবশ্যই সংগ্রাম করতে হবে , যাতে আমাদের জাতি স্রষ্টা কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারে।

Machine Translated by Google

সকল ধারণা ও আদর্শ, সকল শিক্ষা ও জ্ঞানকে অবশ্যই এই উদ্দেশ্যগুলো পূরণ করতে হবে । এই দৃষ্টিকোণ থেকে, সবকিছুকে মূল্যায়ন করে বাস্তব প্রয়োগে আনতে হবে অথবা বর্জন করতে হবে।
এইভাবে, তত্ত্ব কখনোই নিছক মৃত মতবাদে পরিণত হতে পারে না , কারণ সবকিছুকেই দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক উদ্দেশ্য পূরণ করতে হয় ।

এইভাবে, গটফ্রিড ফেডারের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে আমি এমন একটি বিষয়ে মৌলিক গবেষণা করতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম, যা আমার কাছে ততদিন পর্যন্ত তেমন বোধগম্য ছিল না ।
পরিচিত।

যখন আমি আবার পড়াশোনা শুরু করলাম, তখন প্রথমবারের মতো ইহুদি কার্ল মার্ক্সের জীবনব্যাপী কাজের সারমর্ম ও উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম। তাঁর 'দাস ক্যাপিটাল' আমার কাছে প্রথমবারের মতো বোধগম্য হলো । এবং এর আলোকে , আমি জাতীয় অর্থনীতির বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামকে পুরোপুরি বুঝতে পারলাম —যে সংগ্রামটি আন্তর্জাতিক শেয়ারবাজার পুঁজির আধিপত্যের পথ প্রস্তুত করেছিল।

* * *

অন্যান্য দিক থেকেও এই বক্তৃতামালাটি আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরিণতি বয়ে এনেছিল ।

একদিন, আমি একটি আলোচনায় অংশ নিতে আমার নাম লিখিয়েছিলাম । আরেকজন অংশগ্রহণকারী ভাবলেন যে তিনি ইহুদিদের দিকে তাক করা বর্শাটি ভেঙে দেবেন এবং দীর্ঘ যুক্তিতর্কের মাধ্যমে তাদের পক্ষ সমর্থন করতে শুরু করলেন। এতে আমি বিরোধিতা করতে উদ্বুদ্ধ হলাম। বক্তৃতা সিরিজে উপস্থিতদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ আমার মতামতকে সমর্থন করেছিল। ফলস্বরূপ, কয়েকদিন পর, আমাকে মিউনিখে অবস্থিত তৎকালীন রেজিমেন্টে একজন 'প্রশিক্ষক' হিসেবে নিযুক্ত করা হয় ।

সেই সময়ে সৈন্যদের মধ্যে শৃঙ্খলা বেশ দুর্বল ছিল। এটি তখনও সোলজার্স কাউন্সিলগুলোর রেশ থেকে মুক্ত ছিল না । কার্ট আইজনারের বিশৃঙ্খল শাসনামলে সামরিক শৃঙ্খলার আদর্শ বোঝাতে ব্যবহৃত 'স্বেচ্ছামূলক আনুগত্য' নামক পরিভাষাটির পরিবর্তে কেবল ধীরে ধীরে ও ক্রমান্বয়ে সামরিক শৃঙ্খলার এক নতুন চেতনার প্রবর্তন করা সম্ভব হয়েছিল। সৈন্যদের জাতীয়তাবাদী ও দেশপ্রেমিকভাবে চিন্তা করতে ও অনুভব করতে শিখতে হয়েছিল । আমার ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ড এই দুটি দিকেই অগ্রসর হওয়ার কথা ছিল।

আমি অত্যন্ত উৎসাহ ও নিষ্ঠার সাথে আমার চাকরিটি গ্রহণ করেছিলাম। আমাকে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল।
বেশ বড় এক শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে বক্তৃতা দিচ্ছিলাম । আমি যা আগে শুধু সন্দেহ করতাম, তা নিশ্চিত হতে পারলাম , অর্থাৎ, জনসমক্ষে বক্তৃতা দেওয়ার প্রতিভা আমার আছে। আমার কণ্ঠস্বর যথেষ্ট উন্নত হয়েছিল, ফলে আমার কথা ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছিল , অন্ততপক্ষে সেই ছোট হলঘরের সব অংশে যেখানে সৈন্যরা জড়ো হয়েছিল ।

অন্য কোনো কাজ আমাকে এর চেয়ে বেশি আনন্দ দিতে পারত না ; এখন, চাকরি থেকে অব্যাহতির আগে, আমি আমার হৃদয়ের অত্যন্ত প্রিয় একটি প্রতিষ্ঠানকে —সেনাবাহিনীকে—প্রকৃত সেবা প্রদান করতে পারছিলাম।

আমি বলতে পারি যে আমার বক্তৃতাগুলো কার্যকর ছিল। আমার বক্তৃতা কর্মসূচির মাধ্যমে আমি শত শত, এমনকি হাজার হাজার স্বদেশবাসীকে তাদের জাতি ও মাতৃভূমিতে ফিরিয়ে এনেছিলাম। আমি এই সৈন্যদের 'জাতীয়করণ' করেছিলাম এবং এর দ্বারা সাধারণ শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারে সহায়তা করেছিলাম।

আবারও আমার এমন কয়েকজন কমরেডের সঙ্গে পরিচয় হলো, যাঁদের চিন্তাভাবনা আমার মতোই ছিল এবং যাঁরা পরবর্তীকালে সেই প্রথম দলের সদস্য হয়েছিলেন, যেখান থেকে নতুন আন্দোলনটি গড়ে উঠেছিল ।

Machine Translated by Google

অধ্যায় ৯

জার্মান শ্রমিক দল

একদিন, আমি আমার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছ থেকে একটি আপাতদৃষ্টিতে রাজনৈতিক সংগঠনের স্বরূপ তদন্ত করার আদেশ পেলাম । সংগঠনটির নাম ছিল জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি, এবং শীঘ্রই তাদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল , যেখানে গটফ্রিড ফেডারের বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল। আমাকে সেই সভায় উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছিল ।

তৎকালীন সামরিক কর্তৃপক্ষ রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে যে কৌতূহলের সাথে আচরণ করত তা হতে পারে
খুব সহজেই বোঝা যায়। বিপ্লব সৈন্যদের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়ার অধিকার দিয়েছিল, এবং বিশেষ করে যাদের অভিজ্ঞতা সবচেয়ে কম ছিল, তারা এর সবচেয়ে বেশি সদ্ব্যবহার করেছিল । কিন্তু যখন কেন্দ্র এবং সমাজতন্ত্র অনিচ্ছাসত্ত্বেও দেখল যে সৈন্যদের সহানুভূতি অন্যদিকে মোড় নিচ্ছে।
বিপ্লবী দলগুলো থেকে জাতীয় আন্দোলন ও জাতীয় নবজাগরণের দিকে, তারা অনুভব করেছিল
সেনাবাহিনীকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে এবং যেকোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে নিষিদ্ধ করতে বাধ্য ।

কেন্দ্র ও মার্ক্সবাদীরা যে এমন নীতি গ্রহণ করেছিল, তা শিক্ষণীয় ছিল, কারণ যদি তারা এভাবে 'নাগরিক অধিকার'— বিপ্লবের আগে সৈন্যদের রাজনৈতিক অধিকারকে তারা এভাবেই বর্ণনা করত — সীমাবদ্ধ না করত, তাহলে ১৯১৮ সালের নভেম্বরে প্রতিষ্ঠিত সরকার কয়েক বছরের মধ্যেই উৎখাত হয়ে যেত এবং জাতির লজ্জা ও অপমানও বেশিদিন স্থায়ী হতো না । তখন সৈন্যরা সর্বোত্তম পথটিই অবলম্বন করতে চেয়েছিল।
দেশের অভ্যন্তরে এনটেন্টের রক্তচোষা ও অনুচরদের হাত থেকে জাতিকে মুক্ত করার উপায় । কিন্তু তথাকথিত "জাতীয়তাবাদী" দলগুলো যে নভেম্বরে (১৯১৮) বিপ্লব সংগঠিতকারী দস্যুদের মতাদর্শগত নীতির পক্ষে উৎসাহের সাথে ভোট দিয়েছিল, তা জাতীয় পুনর্জন্মের হাতিয়ার হিসেবে সেনাবাহিনীকে অকেজো করে তুলতে সাহায্য করেছিল এবং আরও একবার দেখিয়ে দিয়েছিল এর পরিণতি কী হবে ।

এগুলো নিছক বিমূর্ত তত্ত্ব হতে পারে যা অনভিজ্ঞ লোকেরা গ্রহণ করে।
বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মন এতটাই স্থবির হয়ে গিয়েছিল যে তারা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করত যে সেনাবাহিনী আবারও তার আগের রূপে ফিরে আসতে পারে , অর্থাৎ জার্মান বীরত্বের এক দুর্গ ; অপরদিকে মধ্যপন্থী দলগুলো ও মার্ক্সবাদীরা কেবল জাতীয়তাবাদের বিষাক্ত দাঁতটি উপড়ে ফেলতে চেয়েছিল , যা ছাড়া সেনাবাহিনী কেবল একটি পুলিশ বাহিনী হতে পারত , কিন্তু কখনোই কোনো বহিরাগত শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে সক্ষম একটি সামরিক সংগঠন হতে পারত না। পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে এই সত্যটি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছিল ।

আমাদের "জাতীয়তাবাদী" রাজনীতিবিদরা কি বিশ্বাস করতেন যে সেনাবাহিনীর উন্নয়ন জাতীয় উন্নয়ন থেকে ভিন্ন হতে পারে ? এই দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা এভাবে দেওয়া যায় যে , যুদ্ধের সময় তারা সৈনিক ছিল না, বরং কেবল বক্তা ছিল। অন্য কথায়, তারা ছিল সংসদ সদস্য, এবং সেই হিসেবে, যারা তাদের অতীতের মহিমা এবং একসময় নিজেদের বিশ্বের প্রথম সৈনিক হিসেবে স্মরণ করত , তাদের অন্তরে কী চলছিল সে সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না ।

আমি এই দলটির একটি সভায় যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম, যেটি এর আগে আমার কাছে সম্পূর্ণ অজানা ছিল। সেদিন সন্ধ্যায় যখন আমি প্রাক্তন স্টারনেকারব্রাউ-এর অতিথি কক্ষে প্রবেশ করলাম—যেটি আমাদের জন্য একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ স্থানে পরিণত হয়েছিল—তখন সেখানে প্রায় ২০-২৫ জন লোক উপস্থিত ছিলেন, যাদের অধিকাংশই ছিলেন নিম্নবিত্ত শ্রেণীর।

ফেডারের বক্তৃতার বিষয়বস্তু আমার কাছে আগে থেকেই পরিচিত ছিল, কারণ আমি যে বক্তৃতা সিরিজটি নিয়ে আলোচনা করছিলাম, সেখানে এটি শুনেছিলাম। এর ফলে আমি সমাজটিকেই পর্যবসিত করার দিকে আমার মনোযোগ নিবদ্ধ করতে পেরেছিলাম।

তারা আমার উপর ভালো বা খারাপ কোনো ছাপই ফেলেনি। সেই সময়ের অন্যান্য নবগঠিত সমিতিগুলোর মতোই আমার অনুভূতি হয়েছিল । সেই দিনগুলোতে, যখন সবাই ঘটনাপ্রবাহে অসন্তুষ্ট হতো এবং বিদ্যমান সব দলের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলত , তখন তারা একটি নতুন দল প্রতিষ্ঠা করার তাগিদ অনুভব করত । তাই বৃষ্টির পর ব্যাঙের ছাতার মতো তাদের চারপাশে নতুন সমিতিগুলো গজিয়ে উঠত এবং ঠিক ততটাই দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যেত, কোনো প্রভাব না ফেলে বা কোনো শোরগোল না করেই। সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই ধরনের সমিতিগুলোর প্রতিষ্ঠাতাদের কোনো ধারণাই ছিল না যে একটি দল বা আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করার জন্য একদল লোককে একত্রিত করার অর্থ কী ।

Machine Translated by Google

ফলে, পরিস্থিতির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যথাযথ উপলব্ধির শোচনীয় অভাবের কারণে এই সংগঠনগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেল ।

তাদের দুই ঘণ্টার আলোচনা শোনার পরেও 'জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি' সম্পর্কে আমার মতামতে খুব একটা পরিবর্তন আসেনি । ফেডার যখন অবশেষে তার বক্তব্য শেষ করলেন , তখন আমি স্বস্তি পেলাম । আমার যথেষ্ট দেখা হয়ে গিয়েছিল এবং আমি চলে যেতেই যাচ্ছিলাম, এমন সময় তারা বলল যে, যে কেউ চাইলে আলোচনা শুরু করতে পারে । তাই আমি থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। কিন্তু আলোচনাটি মনে হচ্ছিল...
তিনি কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না তুলেই কথা বলে যাচ্ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ 'প্রফেসর' বলে ডাকতে শুরু করলেন । তিনি ফেডারের কথার যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে কথা শুরু করলেন , এবং ফেডার যখন খুব জোরালোভাবে তার জবাব দিলেন, তখন প্রফেসর হঠাৎ করেই তথাকথিত 'বাস্তবতার ভিত্তিতে' একটি অবস্থান নিলেন । তবে তার আগে তিনি তরুণ দলটিকে তাদের কর্মসূচির অন্যতম প্রধান প্রস্তাব হিসেবে জরুরি ভিত্তিতে প্রুশিয়া থেকে বাভারিয়ার বিচ্ছিন্নতাকে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেন । তিনি অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সাথে দাবি করলেন যে জার্মান-অস্ট্রিয়া বাভারিয়াকে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করে নেবে , এবং তখন শান্তি আরও ভালোভাবে কাজ করবে। তিনি একইভাবে আরও কিছু অতিরঞ্জিত মন্তব্য করেন। এই পর্যায়ে, আমি কথা বলার সুযোগ চেয়ে সেই বিদ্বান ভদ্রলোককে আমার মতামত জানাতে বাধ্য হলাম। ফলস্বরূপ, সেই বিশিষ্ট ভদ্রলোক একটি কথাও না বলে, মার খাওয়া কুকুরের মতো সেই স্থান থেকে উধাও হয়ে গেলেন । আমি যখন কথা বলছিলাম, শ্রোতারা অবাক মুখে তা শুনছিল। আমি যেইমাত্র সভাকে 'শুভরাত্রি' বলে চলে যেতে উদ্যত হলাম, ঠিক তখনই একজন লোক দ্রুত আমার সামনে এসে নিজের পরিচয় দিলেন । আমি নামটি ঠিকমতো শুনতে পাইনি; কিন্তু তিনি আমার হাতে একটি ছোট বই তুলে দিলেন, যেটা স্পষ্টতই একটি রাজনৈতিক প্রচারপত্র ছিল, এবং আমাকে খুব গম্ভীরভাবে সেটি পড়তে বললেন।

আমি বেশ খুশি হয়েছিলাম; কারণ এভাবে তাদের বিরক্তিকর সভাগুলোতে যোগ না দিয়েই আমি এই সমিতিটি সম্পর্কে আরও জানতে পারতাম। তাছাড়া, শ্রমিকের মতো দেখতে এই লোকটি আমার মনে ভালো ছাপ ফেলেছিল । তারপর আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

তখন আমি ২য় পদাতিক রেজিমেন্টের ব্যারাকে থাকতাম। আমার একটা ছোট ঘর ছিল, যেখানে বিপ্লবের সুস্পষ্ট চিহ্ন তখনও বিদ্যমান ছিল। দিনের বেলায় আমি বেশিরভাগ সময় ৪১তম রাইফেল রেজিমেন্টে কাটাতাম, অথবা সেনাবাহিনীর অন্যান্য ইউনিটে সভা বা বক্তৃতায় অংশ নিতাম। আমি শুধু রাতটা আমার কোয়ার্টারে কাটাতাম। যেহেতু আমি সাধারণত ভোর পাঁচটার দিকে ঘুম থেকে উঠতাম , তাই আমার ছোট ঘরে যে ইঁদুরগুলোর সাথে আমি খেলতাম, তাদের পর্যবেক্ষণ করার একটা অভ্যাস ছিল । আমি মেঝেতে কয়েক টুকরো শুকনো রুটি বা শক্ত অংশ রেখে দিতাম এবং এই মজার ছোট প্রাণীগুলোকে সেই সুস্বাদু খাবারগুলো উপভোগ করতে দেখতাম। আমি আমার জীবনে এত কষ্ট সহ্য করেছি যে, ক্ষুধার কষ্ট কেমন হয় তা আমি জানতাম এবং এই ছোট প্রাণীগুলো যে আনন্দ পেত, তা আমি সহজেই কল্পনা করতে পারতাম।

তো , আমার উল্লেখ করা মিটিংয়ের পরের দিন সকালে, প্রায় ভোর পাঁচটার দিকে , আমি বিছানায় জেগে শুয়ে ইঁদুরদের খেলা আর একে অপরকে ধাওয়া করা দেখছিলাম । যেহেতু আর ঘুম আসছিল না , তাই হঠাৎ আমার সেই প্রচারপত্রটির কথা মনে পড়ল, যেটা মিটিংয়ে একজন শ্রমিক আমাকে দিয়েছিল। ওটা ছিল সেই শ্রমিকের নিজের লেখা একটি ছোট প্রচারপত্র। এই ছোট বইটিতে তিনি বর্ণনা করেছেন, কীভাবে তাঁর মন মার্ক্সবাদী ও ট্রেড ইউনিয়নবাদী বাগাড়ম্বরের শেকল ঝেড়ে ফেলেছিল এবং কীভাবে তিনি জাতীয় আদর্শে ফিরে এসেছিলেন। একারণেই তিনি বইটির নাম দিয়েছিলেন ‘ আমার রাজনৈতিক জাগরণ ’ ।

যখন আমি পুস্তিকাটি পড়তে শুরু করলাম , এটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল এবং আমি আগ্রহ নিয়ে পুরোটা পড়লাম । এতে যে প্রক্রিয়ার বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল, তা বিগত বছরগুলোতে আমার অভিজ্ঞতার অনুরূপ ছিল। অবচেতনভাবেই আমার নিজের অভিজ্ঞতাগুলো মনে ভেসে উঠতে শুরু করল । দিনের বেলায় , আমি যা পড়েছিলাম সেদিকে আমার চিন্তা বেশ কয়েকবার ফিরে গিয়েছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি বিষয়টি নিয়ে আর মাথা না ঘামানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। তবে, এক সপ্তাহ পরে আমি একটি পোস্টকার্ড পেলাম , যা আমাকে অবাক করে দিয়ে জানাল যে, আমাকে জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টিতে গ্রহণ করা হয়েছে । আমাকে উত্তর দিতে এবং পরের বুধবার পার্টি কমিটির সভায় আসতে বলা হয়েছিল।

সদস্য সংগ্রহের এই পদ্ধতি দেখে আমি হতবাক হয়ে গেলাম, এবং বুঝতে পারছিলাম না যে রাগ করব নাকি হাসব। এই পর্যন্ত আমি কোনো বিদ্যমান দলে যোগ দিতে চাইনি , কিন্তু নিজের একটা দল শুরু করতে চেয়েছিলাম । তাই , আমার পাওয়া আমন্ত্রণটি আমার কাছে পুরোপুরি ঔদ্ধত্যপূর্ণ এবং অর্থহীন মনে হয়েছিল।

Machine Translated by Google

আমি একটি লিখিত উত্তর পাঠাতে যাচ্ছিলাম , এমন সময় কৌতূহলবশত নির্ধারিত দিনে সভায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম, যাতে আমি সশরীরে তাদের কাছে আমার নিয়মগুলো ব্যাখ্যা করতে পারি।
নাম।

* * *

বুধবার এসে গেল । সভাটি হের্নেস্ট্রাসের 'আল্টে রোজেনবাড'-এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যে জায়গাটিতে দৃশ্যত কেবল সাধারণ ভোজনরসিকরাই যাতায়াত করতেন । ১৯১৯ সালে এটা আশ্চর্যজনক ছিল না , কারণ তখন এমনকি বড় রেস্তোরাঁগুলোর মেনুও খুব সংক্ষিপ্ত ও অপ্রতুল ছিল এবং সেই কারণে গ্রাহকদের কাছে তেমন আকর্ষণীয় ছিল না। কিন্তু আমি এর আগে এই রেস্তোরাঁটির নাম কখনো শুনিনি ।

আমি আবছা আলোয় ভরা, খালি হলঘরে প্রবেশ করে পাশের ঘরে যাওয়ার দরজাটা খুঁজতে লাগলাম ; আর গিয়েই আমি 'সম্মেলন'-এর মুখোমুখি হলাম। কালিমাখা গ্যাস বাতির আবছা আলোয় আমি দেখলাম , চারজন যুবক একটি টেবিলের চারপাশে বসে আছে, তাদের মধ্যে একজন হলেন পুস্তিকাটির লেখক। তিনি আমাকে উষ্ণভাবে অভিবাদন জানালেন এবং জার্মান শ্রমিক দলের নতুন সদস্য হিসেবে স্বাগত জানালেন।

দলের সভাপতি এখনও এসে পৌঁছাননি জেনে আমি কিছুটা অবাক হয়েছিলাম ; আমি আমার ঘোষণাটি দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলাম। অবশেষে , সভাপতি এসে উপস্থিত হলেন ।
এই সেই ব্যক্তি যিনি স্টারনেকারব্রাউতে সেই সভার সভাপতিত্ব করছিলেন যখন ফেদের বক্তৃতা দিয়েছিলেন।
আমার কৌতূহল আবার জেগে উঠল, এবং কী ঘটে তা দেখার জন্য আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। অবশেষে , আমি জড়িত ভদ্রলোকদের নাম জানতে পারলাম । রাইখে সংগঠনটির সভাপতি ছিলেন জনৈক হের হ্যারার, এবং মিউনিখ জেলার সভাপতি ছিলেন আন্তন ড্রেক্সলার।

পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী পাঠ করা হলো এবং সচিবের প্রতি আস্থা প্রকাশ করা হলো।
এরপর আর্থিক প্রতিবেদন পেশ করা হলো । সমিতির মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ৭ মার্ক ও ৫০ ফেনি, যার পর কোষাধ্যক্ষ নিশ্চিত হন যে তিনি সদস্যদের সাধারণ আস্থাভাজন। এটি কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। এরপর সভাপতি কোলন, ডুসেলডর্ফ এবং বার্লিন থেকে প্রাপ্ত চিঠিগুলোর উত্তর পড়ে শোনান। উপস্থিত সকলের সমর্থনে সবগুলো চিঠিই গৃহীত হয়েছিল।

এরপর প্রাপ্ত চিঠিগুলো পড়ে শোনানো হলো – একটি বার্লিন থেকে, একটি ডুসেলডর্ফ থেকে এবং একটি বার্লিন থেকে।
এই চিঠিগুলো পাওয়াটাই সম্ভবত সবচেয়ে বড় সন্তুষ্টির কারণ ছিল। চিঠিপত্রের এই ক্রমবর্ধমান পরিমাণকে জার্মান শ্রমিক দলের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের সর্বোত্তম এবং সবচেয়ে সুস্পষ্ট লক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করা হতো । আর তারপর? আচ্ছা, নতুন প্রাপ্ত চিঠিগুলোর প্রতিক্রিয়া নিয়ে একটি দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল ।

সবকিছু জঘন্য ছিল। এটা ছিল ছোট শহরের ক্লাবগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বাজে ধরনের। আর আমি
আমার কি এমন কোনো ক্লাবের সদস্য হওয়ার কথা ছিল ?
তারপর নতুন সদস্যদের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হলো – অর্থাৎ, আমাকে ফাঁদে ফেলার প্রশ্ন।

আমি প্রশ্ন করতে শুরু করলাম । কিন্তু দেখা গেল যে , কিছু সাধারণ কথাবার্তা ছাড়া আর কিছুই ছিল না—কোনো কর্মসূচি নেই, কোনো পুস্তিকা নেই, ছাপানো কিছুই নেই, কোনো সদস্যপদ কার্ড নেই, এমনকি দলের কোনো সিলমোহরও নেই, বিশ্বাস আর সদিচ্ছা ছাড়া আর কিছুই না।
আমার আর হাসতে ইচ্ছে করছিল না ; কারণ সব রাজনৈতিক দল, তাদের কর্মসূচি, দৃষ্টিভঙ্গি এবং কার্যকলাপের ব্যাপারে এটা কি চরম অসহায়ত্ব ও হতাশার এক সাধারণ লক্ষণ ছিল না ? এই হাস্যকর দেখতে উদ্যোগে এই অল্প কয়েকজন তরুণকে একত্রিত করার পেছনের অনুভূতিটি আর কিছুই ছিল না, বরং এক অন্তরের কণ্ঠস্বর যা তাদের বলছিল—যদিও সচেতনভাবে নয়, বরং স্বজ্ঞার জোরে —যে, বর্তমান রূপে সমগ্র দলীয় ব্যবস্থা এমন কোনো শক্তি নয় যা জার্মান জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে , অথবা যারা এতদিন দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ন্ত্রণ করত তাদের দ্বারা জার্মান জাতির যে ক্ষতি হয়েছে তা মেরামত করতে পারে। আমি দ্রুত সেই নীতিমালার তালিকাটি পড়লাম যা দলটির ভিত্তি তৈরি করেছিল। সেগুলো টাইপ করা ছিল। আবারও, আমি এক আকুলতা ও অনুসন্ধানের চেতনার প্রমাণ পেলাম, কিন্তু যে সংঘাতে আমাকে অংশ নিতে হবে , সে সম্পর্কে জ্ঞানের কোনো চিহ্ন পেলাম না । আমি নিজেও সেই অনুভূতিগুলো অনুভব করেছি যা চালিত করেছিল—

Machine Translated by Google

এই লোকেরাই দায়িত্বে ছিলেন। এটি ছিল এমন একটি আন্দোলনের আকাঙ্ক্ষা, যা প্রচলিত অর্থে একটি দলের চেয়েও বড় কিছু হবে।

সেদিন সন্ধ্যায় ব্যারাকে আমার ঘরে ফিরে এসে, এই সংগঠনটি সম্পর্কে আমার একটি চূড়ান্ত মতামত তৈরি হয়ে গিয়েছিল এবং আমি আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি হলাম । আমি কি এই দলে যোগ দেব , নাকি প্রত্যাখ্যান করব?

বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে, সমস্ত পরিস্থিতি আমাকে প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য করছিল; কিন্তু আমার অনুভূতি আমাকে শান্তিতে থাকতে দিচ্ছিল না। এই পুরো ক্লাবটা যে কতটা অর্থহীন, তা আমি নিজেকে যত বেশি বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম, আমার অনুভূতি ততই এর পক্ষে ঝুঁকে পড়ছিল। পরের কয়েকদিন আমি অস্থির ছিলাম।

আমি ভালো-মন্দ দিকগুলো বিচার-বিশ্লেষণ করতে শুরু করলাম। আমি অনেক আগেই রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। এটা যে কেবল একটি নতুন আন্দোলনের মাধ্যমেই সম্ভব, তা আমার কাছে বেশ স্পষ্ট ছিল; কিন্তু ততদিন পর্যন্ত, সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়ার মতো প্রেরণা আমার ছিল না । আমি সেই ধরনের মানুষ নই যারা আজ কিছু একটা শুরু করে আর কালই নতুন কিছু শুরু করার জন্য তা ছেড়ে দেয় । এটাই ছিল মূল কারণ যার জন্য নতুন গঠিত কোনো কিছুতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া আমার জন্য এত কঠিন ছিল; এই আন্দোলনকে আমার সমস্ত স্বপ্নের বাস্তবায়ন হতে হতো , অথবা তার চেয়েও ভালো হতো যদি এর কোনো অস্তিত্বই না থাকত। আমি জানতাম, এমন একটি সিদ্ধান্ত আমাকে চিরকালের জন্য বেঁধে ফেলবে এবং আর ফিরে যাওয়ার কোনো উপায় থাকবে না । আমার জন্য কোনো অহেতুক ঘ্যানঘ্যানানি চলত না , চলত কেবল এমন একটি উদ্দেশ্য যার জন্য আমি আবেগভরে কথা বলতে পারতাম। সহজাতভাবেই, আমি সেইসব মানুষের বিরুদ্ধে ছিলাম যারা সবকিছু শুরু করে কিন্তু কোনো কিছুই শেষ পর্যন্ত করে দেখায় না । আমি এই 'সহায়কদের ' ঘৃণা করতাম এবং বিশ্বাস করতাম যে তারা যদি কিছুই না করত, তবে তার চেয়ে অনেক ভালো হতো।

ভাগ্যই আমাকে পথ দেখিয়েছিল। আমার কখনোই বিদ্যমান কোনো প্রধান দলে যোগ দেওয়া উচিত হয়নি এবং পরে তার কারণ ব্যাখ্যা করাও উচিত হয়নি । হাতেগোনা কয়েকজন সদস্য নিয়ে গঠিত এই হাস্যকরভাবে ছোট দলটির একটি অনন্য সুবিধা ছিল – এটি তখনও একটি 'সংগঠনে' পরিণত হয়ে পাথরের মতো শক্ত হয়ে যায়নি এবং ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত কার্যকলাপের সুযোগ দিত। তখনও কিছু কার্যকর কাজ সম্পন্ন করা যেত ; এবং আন্দোলনটি ছোট হওয়ায়, একে কাঙ্ক্ষিত রূপ দেওয়া সহজ ছিল। আন্দোলনের প্রকৃতি , অর্জনযোগ্য লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথ তখনও নির্ধারণ করা সম্ভব ছিল , যা একটি বড়, প্রতিষ্ঠিত দলের ক্ষেত্রে অসম্ভব হতো ।

এই সমস্যাটি নিয়ে আমি যত বেশি ভাবছিলাম, ততই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছিলাম যে, এমন একটি ছোট আন্দোলনই জাতীয় নবজাগরণের পথ প্রশস্ত করার সর্বোত্তম মাধ্যম হতে পারে; যা কখনোই সেইসব সংসদীয় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব নয়, যারা সেকেলে ধারণায় অতিমাত্রায় আবদ্ধ ছিল অথবা নতুন শাসনব্যবস্থাকে সমর্থন করার ক্ষেত্রে যাদের স্বার্থ জড়িত ছিল । যা প্রয়োজন ছিল তা হলো একটি নতুন বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির ঘোষণা , কোনো নতুন নির্বাচনী স্লোগানের নয়।

তবে, এই অভিপ্রায়টি বাস্তবে রূপ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া ছিল অত্যন্ত কঠিন ।
এই ধরনের কাজ সম্পাদন করার জন্য আমার কী কী দক্ষতা ছিল যা আমি কাজে লাগাতে পারতাম?

আমি যে গরীব ছিলাম এবং আমার কোনো উপায় ছিল না , এই সত্যটা মেনে নেওয়া আমার জন্য সবচেয়ে সহজ ছিল। কিন্তু আমি যে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলাম, তা আরও কঠিন একটি সমস্যা তৈরি করেছিল। আমি ছিলাম সেই লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে একজন, যাদের অস্তিত্বে আসা বা না আসাটা ভাগ্যেরই খেলা ; যাদের সম্পর্কে এমনকি রাস্তার ওপাশের প্রতিবেশীরাও কিছু জানতে চায় না। আরেকটি অসুবিধা দেখা দিয়েছিল এই কারণে যে, আমার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না।

তথাকথিত "বুদ্ধিজীবীরা" তখনও অসীম ঔদ্ধত্যের সাথে তাদের অবজ্ঞা করত , যারা স্কুলে যায়নি এবং তাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণের সুযোগ পায়নি। তারা কখনও জিজ্ঞাসা করত না একজন মানুষ কী করতে পারে , বরং সে কী শিখেছে। "শিক্ষিত" লোকেরা প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রিধারী যেকোনো নির্বোধকে এই মূল্যবান কাগজপত্রবিহীন সবচেয়ে মেধাবী যুবকের চেয়েও শ্রেষ্ঠ বলে মনে করত। তাই আমি সহজেই কল্পনা করতে পারতাম এই "শিক্ষিত" জগৎ আমাকে কীভাবে গ্রহণ করবে, এবং এখন পর্যন্ত আমি কেবল এই ভেবেই ভুল করেছি যে, বাস্তবতার কঠিন আলোয় তারা যা প্রমাণ করেছে , তার চেয়ে আমি শ্রেষ্ঠ । তাদের মধ্যে যে অল্প কয়েকজন ব্যতিক্রম রয়েছে , তারা আরও বেশি চোখে পড়ে। আমি তাদের মধ্যে পার্থক্য করতে শিখেছিলাম যারা সারাজীবন স্কুলে থাকবে এবং যারা একদিন থাকবে।

বাস্তবে কিছু জানা ।

Machine Translated by Google

দুই দিন ধরে গভীরভাবে চিন্তা করার পর আমি নিশ্চিত হলাম যে আমাকে এই সুচিন্তিত পদক্ষেপটি নিতেই হবে।

এটা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। আর পিছু হটার কোনো উপায় ছিল না।

অতএব আমি জার্মান রোমান পার্টির সদস্যপদ গ্রহণে আমার প্রস্তুতি ঘোষণা করলাম। এবং একটি অস্থায়ী সদস্যপদ কার্ড পেলাম। আমার নম্বর ছিল সাত।

Machine Translated by Google

দশম অধ্যায়

দ্বিতীয় রাইখের পতন কেন হয়েছিল?

কোনো বস্তুর পতনের গভীরতা সর্বদা তার পূর্ববর্তী স্তর এবং বর্তমান স্তরের পার্থক্য দ্বারা পরিমাপ করা হয়। জাতি ও দেশের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য । এখানে গুরুত্বপূর্ণ হলো আদি স্তরের উচ্চতা , অথবা বলা যায়, পতন শুরু হওয়ার আগে অর্জিত সর্বোচ্চ উচ্চতা ।

অসাধারণ উচ্চতায় পৌঁছাতে সক্ষম কোনো কিছুর পতন বা শোচনীয় অধঃপতনই পর্যবেক্ষকের মনে এক অসাধারণ ছাপ ফেলতে পারে । দ্বিতীয় রাইখের পতন তাদের কাছে আরও বেশি বিস্ময়কর ছিল, যারা তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে এবং এর প্রভাব অন্তরে অনুভব করতে পেরেছিলেন; কারণ দুঃখ ও অপমানের সেই দিনগুলিতে রাইখ এমন এক উচ্চতা থেকে পতিত হয়েছিল যা ছিল অকল্পনীয় ।

দ্বিতীয় রাইখ এমন চোখধাঁধানো জাঁকজমকের পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে সমগ্র জাতি মুগ্ধ ও উদ্দীপ্ত হয়েছিল। অভূতপূর্ব ধারাবাহিক বিজয়ের পর, তাঁদের অমর বীরত্বের পুরস্কারস্বরূপ রাইখটি বীরদের সন্তান ও নাতি-নাতনিদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল ।
তারা এ বিষয়ে পুরোপুরি অবগত ছিল কি না, তা অপ্রাসঙ্গিক; যাই হোক, জার্মানরা অনুভব করেছিল যে এই রাইখ সংসদীয় চ্যানেলের মাধ্যমে ধারাবাহিক সফল রাজনৈতিক আলোচনার দ্বারা অস্তিত্বে আসেনি , বরং এর প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত বৃহত্তর প্রেক্ষাপটের কারণে এটি অন্যত্র সৃষ্ট অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান থেকে ভিন্ন ছিল । যখন এর ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল, তখন তার সঙ্গী ছিল না সংসদীয় বিতর্কের কোলাহল, বরং প্যারিসের চারপাশের রণাঙ্গনে যুদ্ধের বজ্র ও গর্জন। এটি ছিল আমাদের ইচ্ছার এক ঘোষণা, যার মাধ্যমে জার্মানরা, রাজপুত্র ও সাধারণ মানুষ নির্বিশেষে, ভবিষ্যৎ রাইখ প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং সাম্রাজ্যিক রাজমুকুটের প্রতীক পুনরুদ্ধার করেছিল। বিসমার্কের রাষ্ট্র বিশ্বাসঘাতকতা ও হত্যার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়নি, পলাতক বা অলসদের দ্বারাও নয়, বরং রণাঙ্গনে যুদ্ধরত রেজিমেন্টগুলোর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই অনন্য জন্ম এবং অগ্নিপরীক্ষাই দ্বিতীয় রাইখকে এমন এক ঐতিহাসিক মহিমার আভায় ঘিরে রাখার জন্য যথেষ্ট ছিল, যার দাবি কেবল অল্প কয়েকটি প্রাচীনতর রাষ্ট্রই করতে পারে ।

আর তারপর কী এক সমৃদ্ধির সূচনা হলো! বহির্বিশ্ব থেকে স্বাধীনতা দেশটির জীবন-জীবিকা নিশ্চিত করেছিল । জাতি জনসংখ্যায় ও সমৃদ্ধিতে বৃদ্ধি পেয়েছিল। রাষ্ট্রের সম্মান , এবং সেই সূত্রে সমগ্র জাতির সম্মান, সেনাবাহিনীর দ্বারা সুরক্ষিত ও সংরক্ষিত হয়েছিল, যা ছিল এই নতুন রাইখ এবং পুরাতন জার্মান কনফেডারেশনের মধ্যকার পার্থক্যের সবচেয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ ।

কিন্তু দ্বিতীয় রাইখ ও জার্মান জাতির পতন এতটাই গভীর ছিল যে, সবাই যেন বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল; এর পতনের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে বা তা নিয়ে ভাবতে তারা অক্ষম ছিল। সাম্রাজ্যের পূর্ববর্তী সাফল্যের শিখরকে মানসিকভাবে কল্পনা করতে মানুষ যেন পুরোপুরি অক্ষম ছিল; বর্তমানের দুর্দশার তুলনায় সেই দিনগুলোর জাঁকজমক ও ঐশ্বর্য এতটাই স্বপ্নময় ও অবাস্তব বলে মনে হয় । এই বিষয়টি মাথায় রাখলে আমরা বুঝতে পারি, কীভাবে এবং কেন মানুষ মহিমান্বিত অতীতের দিকে তাকাতে গিয়ে এতটা হতবিহ্বল হয়ে পড়ে, এটা ভুলে গিয়ে যে এক বিরাট পতনের চিহ্ন কোনো না কোনোভাবে দৃশ্যমান হতেই হবে।

অবশ্যই, এই কথাটি কেবল তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য , যাদের কাছে জার্মানি শুধু বসবাসের জায়গা ও জীবিকার উৎসের চেয়েও বেশি কিছু ছিল। কেবল এই লোকেরাই বর্তমান পরিস্থিতিকে সত্যিকারের বিপর্যয় হিসেবে উপলব্ধি করতে পেরেছিল , অপরদিকে অন্যরা এই পরিস্থিতিকে তাদের প্রত্যাশার এবং সেই সূত্রে তাদের গোপন আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন হিসেবে দেখেছিল ।

ভবিষ্যৎ পতনের লক্ষণগুলো আগে থেকেই সুস্পষ্ট ছিল , যদিও খুব কম লোকই এর তাৎপর্য থেকে কোনো বাস্তব শিক্ষা নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এখন এর প্রয়োজনীয়তা আগের চেয়ে অনেক বেশি । যেমন শারীরিক অসুস্থতার উৎস জানা গেলেই তা নিরাময় করা যায় , তেমনি রাজনৈতিক রোগেরও রোগ নির্ণয় করা গেলেই তা নিরাময় করা সম্ভব । এটা স্পষ্ট যে, যেকোনো রোগের অভ্যন্তরীণ কারণের চেয়ে তার বাহ্যিক লক্ষণগুলো অনেক সহজে শনাক্ত করা যায়।

Machine Translated by Google

কারণ এই লক্ষণগুলো অনেক বেশি সুস্পষ্ট । একই কারণে, অনেকে কেবল বাহ্যিক লক্ষণগুলো দেখে এবং সেগুলোকে কারণ বলে ভুল করে। কখনও কখনও তারা এই কারণগুলোর অস্তিত্ব অস্বীকার করারও চেষ্টা করে । আর একারণেই দেশের অধিকাংশ মানুষ জার্মানির পতনকে কেবল বিরাজমান অর্থনৈতিক দুর্দশা এবং তার ফলস্বরূপ সৃষ্ট পরিণতির মধ্যেই দেখে। প্রায় প্রত্যেককেই এই বোঝার ভাগ বহন করতে হয় , আর একারণেই সবাই অর্থনৈতিক বিপর্যয়কে বর্তমান এই শোচনীয় অবস্থার কারণ হিসেবে দেখে । সাধারণ মানুষ এই পতনের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং নৈতিক প্রেক্ষাপট প্রায় দেখতেই পায় না । এই প্রেক্ষাপট দেখার জন্য প্রয়োজনীয় সংবেদনশীলতা এবং যুক্তিবোধ— উভয়েরই তাদের অনেকের মধ্যে সম্পূর্ণ অভাব রয়েছে ।

সাধারণ মানুষ যে জার্মানির পতনের কারণগুলোকে এভাবে মূল্যায়ন করে, তা বেশ বোধগম্য। কিন্তু বুদ্ধিজীবী মহল যে জার্মানির পতনকে প্রধানত একটি অর্থনৈতিক বিপর্যয় হিসেবে বিবেচনা করে এবং ক্রমাগত বিশ্বাস করে যে এর প্রতিকার একটি অর্থনৈতিক সমাধানের মধ্যেই নিহিত, আমার মতে সেটাই এখন পর্যন্ত কোনো উন্নতি না ঘটার কারণ । এবং যতক্ষণ না এটা বোঝা যাচ্ছে যে অর্থনীতি কেবল একটি গৌণ বা তৃতীয় স্তরের ভূমিকা পালন করে, যেখানে রাজনৈতিক, নৈতিক এবং জাতিগত কারণগুলোই প্রধান ভূমিকা পালন করে , ততক্ষণ কোনো উন্নতি হতে পারে না। কেবল যখন এই বিষয়টি বোঝা যাবে , তখনই বর্তমান এই অশুভের কারণগুলো বোঝা এবং এর প্রতিকারের উপায় ও পদ্ধতি খুঁজে বের করা সম্ভব হবে।

সুতরাং, জার্মানির পতন আসলেই কেন হয়েছিল, সেই প্রশ্নটি সর্বাধিক জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ।
বিশেষ করে সেই রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য, যার লক্ষ্য এই বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠা।

জার্মানির পতনের কারণ উদঘাটনের জন্য অতীত বিশ্লেষণ করার সময় , সহজে দৃশ্যমান বাহ্যিক প্রভাব দ্বারা বিভ্রান্ত না হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকা প্রয়োজন , যার ফলে সেইসব প্রভাবের কম লক্ষণীয় কারণগুলোকে উপেক্ষা করা হয় ।

বর্তমান দুর্ভাগ্যকে ব্যাখ্যা করার সবচেয়ে সহজ এবং সেই কারণেই সবচেয়ে সাধারণভাবে গৃহীত উপায় হলো, এর জন্য একটি হেরে যাওয়া যুদ্ধকে দায়ী করা, এবং এটাই বর্তমান দুর্ভাগ্যের আসল কারণ। অনেকেই হয়তো এই অযৌক্তিক ব্যাখ্যাটি বিশ্বাস করেন, কিন্তু আরও অনেকেই আছেন যারা ইচ্ছাকৃতভাবে এবং জেনেশুনে এই মিথ্যাটি ছড়ান । এটি প্রযোজ্য।

যারা এখন সরকারি কোষাগার থেকে ফায়দা লুটছেন, তাদের সকলের প্রতি । বিপ্লবের ভবিষ্যদ্বক্তারা জনগণকে বারবার বলেছিলেন যে, সাধারণ মানুষের জন্য যুদ্ধের ফলাফল হবে অপ্রাসঙ্গিক। বরং , তারা দৃঢ়ভাবে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, উচ্চবিত্তদের মূল আগ্রহ ছিল জাতিসমূহের মধ্যকার এই বিশাল সংগ্রামে জয়লাভ করা , কিন্তু জার্মান জনগণ এবং জার্মান শ্রমিকদের এমন ফলাফলে কোনো স্বার্থ ছিল না। বিশ্ব পুনর্মিলনের প্রচারকরা দাবি করেছিলেন যে , "সামরিকবাদ" ধ্বংস হয়ে গেলে জার্মান জাতির কোনো পতন হবে না , বরং পুনর্জন্ম ঘটবে । এই একই গোষ্ঠীগুলো কি এনটেন্টের প্রশংসা করছিল না , এবং তারাই কি এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সমস্ত দোষ জার্মানির কাঁধে চাপিয়ে দেয়নি ? এমন ব্যাখ্যা ছাড়া, তারা কি এই তত্ত্বটি সামনে আনতে পারত যে সামরিক পরাজয়ের জার্মান জাতির জন্য কোনো রাজনৈতিক পরিণতি থাকবে না ? দেশে ও বিদেশে জার্মান জনগণের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য জার্মান পতাকার বিজয় মিছিল থামানোর উপায় হিসেবেই কি সমগ্র বিপ্লবকে জাঁকজমকপূর্ণ রঙে সাজানো হয়নি ?

তাই না, তোরা হতভাগা, মিথ্যুক বদমাশগুলো?

ইহুদিদের স্বভাবসুলভ এই ধরনের ঔদ্ধত্যের প্রয়োজন ছিল কারণটি ঘোষণা করার জন্য।
জার্মানির পতন ছিল সেনাবাহিনীর পরাজয়। জাতির বিশ্বাসঘাতকদের মুখপত্র ও মুখপাত্র 'বার্লিন ফোরভার্টস' লিখেছিল যে, জার্মান জাতিকে বিজয়ের পতাকা নিয়ে তাদের মাতৃভূমিতে ফিরতে দেওয়া যাবে না !

আর এখন তারা আমাদের পতনের কারণ হিসেবে সামরিক পরাজয়কে দায়ী করছে?

অবশ্যই, এই মিথ্যাবাদীদের সাথে আলোচনায় যাওয়ার কোনো মানে হয় না, যারা এক মুহূর্তে এক কথা বলে এবং পরক্ষণেই তা অস্বীকার করে । আমি তাদের পেছনে আর কোনো কথা নষ্ট করতাম না , যদি না অনেক অবিবেচক মানুষ কোনো অসৎ উদ্দেশ্য ছাড়াই এই কথাগুলো তোতাপাখির মতো আওড়াত । কিন্তু আমার এই পর্যবেক্ষণগুলো আমাদের সংগ্রামরত সমর্থকদের জন্যও প্রযোজ্য, কারণ আজকাল মানুষের কথা প্রায়শই ভুলে যাওয়া হয় এবং তার অর্থ বিকৃত করা হয়।

Machine Translated by Google

অধ্যায় ১০ – দ্বিতীয় রাইখের পতন কেন হয়েছিল?

এই দাবি যে যুদ্ধে পরাজয়ই জার্মানির পতনের কারণ ছিল, তা নিম্নোক্তভাবে সবচেয়ে ভালোভাবে খণ্ডন করা যায় : এটা সত্য যে যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে আমাদের দেশের

ভবিষ্যতের জন্য মর্মান্তিক পরিণতি ঘটেছিল । কিন্তু এই পরাজয়টি নিজে কারণ ছিল না। বরং, এটি ছিল অন্যান্য কারণের পরিণতি ।

এই জীবন - মৃত্যুর লড়াইয়ের বিপর্যয়কর পরিণতি যে অনিবার্যভাবে বিধ্বংসী হবে , তা সাধারণ যুক্তিবোধসম্পন্ন যে কারো কাছেই স্পষ্ট ছিল । কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, এমন মানুষও ছিল যাদের যুক্তিবোধ এই সংকটময় মুহূর্তে ব্যর্থ হয়েছিল বলে মনে হয়। আবার এমনও অনেকে ছিল যারা প্রথমে এই সত্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছিল, তারপর তা অস্বীকার করেছিল। এরপর এমন মানুষও ছিল, যাদের গোপন আকাঙ্ক্ষা পূরণ হওয়ার পর , তাদের সহযোগিতার ফলে উদ্ভূত বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল । এই ধরনের লোকেরাই পতনের জন্য দায়ী, যুদ্ধে হারের জন্য নয়, যদিও তারা এখন সবকিছুর দায় তাদের ওপর চাপাতে চায়। প্রকৃতপক্ষে, যুদ্ধে হার তাদেরই কর্মকাণ্ডের ফলে হয়েছিল, দুর্বল নেতৃত্বের কারণে নয়, যেমনটা তারা এখন দাবি করতে পছন্দ করে।

আমাদের শত্রুরা কাপুরুষ ছিল না। তারা মরতে জানত। বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিন থেকেই তারা সংখ্যায় জার্মান সেনাবাহিনীর চেয়ে বেশি ছিল এবং তাদের সামরিক সরঞ্জাম পুনরায় পূরণ করার জন্য সারা বিশ্বে তাদের অস্ত্রাগার ও অস্ত্র কারখানা ছিল । এটা সর্বজনস্বীকৃত ছিল যে, সমগ্র বিশ্বের বিরুদ্ধে চার বছরব্যাপী যুদ্ধে জার্মানদের বিজয় অর্জিত হয়েছিল সৈন্যদের বীরত্বের পাশাপাশি অসাধারণ নেতৃত্বের কল্যাণে। সবকিছু শুধুমাত্র জার্মান সামরিক বাহিনীর নেতৃত্বের দক্ষতার মাধ্যমেই সংগঠিত হয়েছিল । এই সংগঠন এবং নেতৃত্ব ছিল বিশ্বের দেখা সবচেয়ে শক্তিশালী জিনিস। যে দুর্বলতাগুলো প্রকাশ পেয়েছিল , তা মানুষের জন্য অনিবার্য ছিল । এই সেনাবাহিনীর পতন আমাদের বর্তমান দুর্দশার কারণ নয়। এটি ছিল অন্যান্য ভুলের পরিণতি । কিন্তু এই পরিণতি আরও একটি পতনের কারণ হয়েছিল, যা ছিল আরও বেশি দৃশ্যমান। এটি নিম্নোক্তভাবে দেখানো যেতে পারে :

সামরিক পরাজয় কি অনিবার্যভাবে রাষ্ট্র ও জাতির সম্পূর্ণ ধ্বংস ডেকে আনে? কোনো দুর্ভাগ্যজনক যুদ্ধের ফল কি কখনো এমন হয়েছে? কেবল পরাজিত যুদ্ধই কি জাতিকে ধ্বংস করে? এই প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে দেওয়া যেতে পারে এই সত্যটির উল্লেখ করে যে, সামরিক পরাজয় হলো অভ্যন্তরীণ অবক্ষয়, কাপুরুষতা এবং চারিত্রিক দুর্বলতার ফল ও শাস্তি । যদি এমনটা না হতো, তবে সামরিক পরাজয় জাতির পুনর্জন্ম ঘটাতো এবং জাতিকে প্রচেষ্টার এক উচ্চতর স্তরে উন্নীত করত। সামরিক পরাজয় জাতীয় জীবনের সমাধিফলক নয় । এই বক্তব্যের সমর্থনে ইতিহাসে অগণিত উদাহরণ রয়েছে ।

দুর্ভাগ্যবশত, জার্মান সামরিক পরাজয়টি কোনো অন্যায্য বিপর্যয় ছিল না , বরং তা ছিল প্রাপ্যই ।
প্রতিশোধের চিরন্তন বিধান অনুসারে শাস্তি । এই পরাজয় আমাদের প্রাপ্যর চেয়েও বেশি ছিল ; কারণ এটি ছিল একগুচ্ছ অভ্যন্তরীণ ঘটনাপ্রবাহের মাঝে অবক্ষয়ের সর্ববৃহৎ বাহ্যিক লক্ষণ , যা লক্ষণীয় হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষের অলক্ষ্যে থেকে গিয়েছিল , যারা উটপাখির মতো মুখ লুকিয়ে থাকার কৌশল অবলম্বন করে কেবল তাই দেখত যা তারা দেখতে চাইত।

আসুন, সেই লক্ষণগুলো খতিয়ে দেখি যা জার্মানিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যখন জার্মান জাতি এই পরাজয় মেনে নিয়েছিল। এটা কি সত্যি নয় যে, কিছু মহলে পিতৃভূমির দুর্ভাগ্যকে অত্যন্ত লজ্জাজনকভাবে আনন্দের সাথে বরণ করে নেওয়া হয়েছিল? এমন মনোভাবের জন্য শাস্তির শিকার না হয়ে কে-ই বা এমন আচরণ করতে পারে ? এমন লোক কি ছিল না যারা দম্ভভরে বলেছিল যে, তারা এমনকি রণাঙ্গনকে দুর্বল করে দিয়ে এর পতন ঘটিয়েছে? এই লজ্জা আমাদের কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছিল শত্রুরা নয়, বরং আমাদের স্বদেশীরাই। পরবর্তীকালে যদি তারা দুর্ভাগ্যের শিকার হয়ে থাকে, তবে তা কি অন্যায্য ছিল? ইতিহাসে কোনো জাতি কি কখনো নিজের বিবেক ও জ্ঞানের বিরুদ্ধে গিয়েও কোনো যুদ্ধের দায়ভার গ্রহণ করেছে?

না, এবং আবারও না। পরাজয়ের প্রতি জার্মান জাতির প্রতিক্রিয়া দেখে আমরা বুঝতে পারি যে, এই পতনের আসল কারণ কেবল কিছু অবস্থানের নিছক সামরিক ক্ষতি বা আক্রমণের ব্যর্থতার মধ্যে নয়, বরং অন্য কোথাও খুঁজতে হবে । যদি রণাঙ্গন আত্মসমর্পণ করত এবং তার ফলে একটি জাতীয় বিপর্যয় নেমে আসত, তবে জার্মান জাতি এই পরাজয়কে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক মানসিকতায় মেনে নিত । তারা হয়তো আসন্ন দুর্ভাগ্যকে দাঁতে দাঁত চেপে বরণ করে নিত , অথবা শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ত। যে শত্রুর হাতে তারা পতিত হয়েছিল , তার বিরুদ্ধে তাদের হৃদয় শোক ও ক্রোধে পূর্ণ হয়ে যেত।

Machine Translated by Google

দৈবক্রমে বা নিয়তির বিধানে বিজয় অর্জিত হয়েছিল ; এবং এক্ষেত্রে, রোমান সিনেটের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে জাতি পরাজিত প্রত্যাবর্তনকারী সৈন্যদলের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের আত্মত্যাগের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত এবং সাম্রাজ্যের প্রতি আস্থা না হারানোর জন্য অনুরোধ করত। এমনকি আত্মসমর্পণপত্রটিও শান্ত যুক্তির প্রভাবে স্বাক্ষরিত হতো, আর হৃদয়গুলো আসন্ন প্রতিশোধের আশায় স্পন্দিত হতো ।

এই সামরিক পরাজয়কে যদি কেবল ভাগ্যের এক প্রতিকূল পরিহাস হিসেবেই গণ্য করা যেত , তবে এর উপলব্ধিটা এমনই হতো । কোনো উল্লাস বা নাচানাচি হতো না । কেউ কাপুরুষতার বড়াই করত না, পরাজয়কে পূজা করত না। রণাঙ্গন থেকে ফেরা সৈন্যদের উপহাস করা হতো না , এবং পতাকাগুলো ধুলোয় ঘষা খেত না। কিন্তু সর্বোপরি, সেই লজ্জাজনক পরিস্থিতি, যা একজন ব্রিটিশ অফিসার, কর্নেল রেপিংটনকে, অবজ্ঞার সাথে ঘোষণা করতে বাধ্য করেছিল: " প্রতি তিনজন জার্মানের মধ্যে একজন বিশ্বাসঘাতক!" না, তাহলে এই মহামারী কখনোই এক সত্যিকারের বন্যার রূপ নিত না, যা গত পাঁচ বছর ধরে বিশ্বজুড়ে জার্মান জাতির প্রতি শ্রদ্ধার শেষ চিহ্নটুকুও শ্বাসরুদ্ধ করে দিয়েছে ।

এটা স্পষ্ট যে, যুদ্ধে পরাজয়ই জার্মানির পতনের কারণ ছিল— এই দাবিটি কতটা মিথ্যা । না। সামরিক পরাজয়টি ছিল কেবল একগুচ্ছ বিকারগ্রস্ত উপসর্গ ও তার কারণসমূহের ফল, যা যুদ্ধ শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই জার্মান জাতির মধ্যে সক্রিয় ছিল। যুদ্ধটি ছিল সর্বসাধারণের কাছে দৃশ্যমান প্রথম বিপর্যয়কর প্রভাব, যা দেখিয়ে দিয়েছিল কীভাবে ঐতিহ্য ও জাতীয় নৈতিকতা বিষাক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি অধঃপতিত হয়েছিল। এগুলোই ছিল সেই মৌলিক কারণ, যা বহু বছর ধরে জাতি ও রাইখের ভিত্তিকে দুর্বল করে দিয়েছিল।

ইহুদি এবং তাদের যুদ্ধরত সহযোদ্ধা মার্ক্সবাদীদের চরম মিথ্যাচারের ফলেই পতনের দায় ঠিক সেইসব লোকদের উপর চাপানো সম্ভব হয়েছিল, যারা তাদের পূর্বানুমানকৃত মহাবিপর্যয় এড়াতে এবং জাতিকে চরম ধ্বংস ও অপমানের মুহূর্ত থেকে বাঁচাতে অতিমানবীয় ইচ্ছাশক্তি ও উদ্যম প্রদর্শন করেছিল। হেরে যাওয়া যুদ্ধের জন্য লুডেনডর্ফকে দোষারোপ করে , তারা সেই একমাত্র শত্রুর হাত থেকে নৈতিক যুক্তির অস্ত্রটি কেড়ে নিয়েছিল, যে কিনা পিতৃভূমির বিশ্বাসঘাতকদের বিচারের আওতায় আনতে পারত। সবকিছু এই নীতি অনুসারেই করা হয়েছিল — যা নিজে থেকেই বেশ সঠিক — যে একটি বড় মিথ্যার মধ্যেও সর্বদা এক কণা সত্য লুকিয়ে থাকে ; কারণ জাতির সাধারণ জনগণ সচেতনভাবে বা স্বেচ্ছায় বশীভূত হওয়ার চেয়ে তাদের আবেগগত প্রকৃতির গভীর স্তরে সর্বদা অনেক সহজে প্রতারিত হয়; এবং এইভাবে তাদের মনের আদিম সরলতা একটি ছোট মিথ্যার চেয়ে একটি বড় মিথ্যার কাছে সহজে শিকার হয় , কারণ তারা নিজেরা প্রায়শই ছোটখাটো বিষয়ে ছোট মিথ্যা বলে , কিন্তু বড় মাপের মিথ্যার কথা উল্লেখ করতে লজ্জিত বোধ করবে । বিশাল মিথ্যা কথা বানানোর কথা তাদের মনেও আসত না , এবং তারা বিশ্বাসই করত না যে কারও এত লজ্জাজনকভাবে সত্যকে বিকৃত করার দুঃসাহস থাকতে পারে ।

এমনকি যদি তা প্রমাণ করার জন্য তাদের সামনে সুস্পষ্ট তথ্যপ্রমাণও তুলে ধরা হতো , তবুও তাদের মনে সন্দেহ ও দ্বিধা থেকে যেত এবং তারা ভাবত যে এর অন্য কোনো ব্যাখ্যাও থাকতে পারে । একটি নির্লজ্জ মিথ্যা ধরা পড়ার পরেও তার চিহ্ন রেখে যায় , এবং তারা তা জানে।
পৃথিবীর সমস্ত মিথ্যাচারী বিশেষজ্ঞরা । এই লোকেরা সবচেয়ে জঘন্য উদ্দেশ্যে মিথ্যাকে কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তা খুব ভালো করেই জানে।
অনাদিকাল থেকে ইহুদিরা অন্য সবার চেয়ে ভালো জানত কীভাবে ব্যবহার করতে হয় ।
মিথ্যা ও অপবাদ। তাদের সমগ্র অস্তিত্ব কি একটি বিরাট মিথ্যার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি, আর তা হলো— তারা একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় , অথচ তারা একটি জাতি? আর কী জাতি! মানবজাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ একটি গভীর ও সম্পূর্ণ সত্য উক্তির মাধ্যমে ইহুদিদেরকে সর্বকালের জন্য চিহ্নিত করেছেন । তিনি (শোপেনহাওয়ার) ইহুদিকে "মিথ্যার মহান গুরু" বলে অভিহিত করেছেন। যদি কেউ এই উক্তির সত্যতা উপলব্ধি না করে , অথবা তা বিশ্বাস করতে অস্বীকার করে, তবে সে সত্যের বিজয়ে কখনোই অবদান রাখতে পারবে না ।

জার্মান জনগণের জন্য এটিকে প্রায় সৌভাগ্যজনক ভাগ্যবিপর্যয় হিসেবেই বিবেচনা করা যেতে পারে যে, দীর্ঘদিনের দুর্ভোগের একটি পর্ব হঠাৎ থেমে গিয়ে এমন এক ভয়াবহ বিপর্যয়ে রূপান্তরিত হয়েছিল। সবকিছু যদি আগের মতোই চলতে থাকত, তবে জাতিটি হয়তো আরও ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে ধ্বংসের মুখে পতিত হতো। রোগটি দীর্ঘস্থায়ী হয়ে যেত; পক্ষান্তরে, বিপর্যয়ের তীব্র রূপে তা অন্তত বহু পর্যবেক্ষকের কাছে স্পষ্টভাবে ও সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছিল।

Machine Translated by Google

অধ্যায় ১০ – দ্বিতীয় রাইখের পতন কেন হয়েছিল?

এটা কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয় যে মানুষ যক্ষ্মার চেয়ে ব্ল্যাক প্লেগের সঙ্গে বেশি সহজে মানিয়ে নিয়েছে। প্রথমটি মৃত্যুর ভয়াবহ ঢেউ হয়ে আবির্ভূত হয়েছিল যা সমগ্র মানবজাতিকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল, আর দ্বিতীয়টি অলক্ষ্যে অগ্রসর হয়েছিল ; প্রথমটি ভয়ের উদ্রেক করেছিল, দ্বিতীয়টি ধীরে ধীরে উদাসীনতা তৈরি করেছিল।
ফলস্বরূপ, মানুষ সর্বশক্তি দিয়ে পূর্বোক্তটির প্রতিরোধ করেছে , অপরদিকে যক্ষ্মার মোকাবিলা করেছে দুর্বল উপায়ে। এইভাবে , মানুষ ব্ল্যাক প্লেগকে বশীভূত করেছে, অপরদিকে যক্ষ্মা তার উপর আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে।

একটি দেশে মহামারীর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। মহামারী যদি ভয়াবহ রূপ না নেয়, তবে জনগণ ধীরে ধীরে এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং অবশেষে মারা যায়। তাই এটি এক প্রকার সৌভাগ্য —যদিও তা তিক্ত—যখন নিয়তি এই ধীর ক্ষয় প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং হঠাৎ করে আক্রান্ত ব্যক্তিকে রোগের চূড়ান্ত পর্যায়ের মুখোমুখি করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, এই বিপর্যয়ের ফলস্বরূপ চিকিৎসা শুরু হয় এবং পরম সংকল্পের সাথে তা চালিয়ে যাওয়া হয়।

কিন্তু এমন ক্ষেত্রেও, একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত হলো সর্বদা
এই মহামারীর অভ্যন্তরীণ কারণগুলো জানা।
অন্তর্নিহিত কারণ এবং তা থেকে উদ্ভূত প্রভাবের মধ্যে পার্থক্য করা জরুরি। এই কাজটি আরও কঠিন হয়ে ওঠে , যত বেশি দিন ধরে রোগের জীবাণু একটি জাতির দেহে থেকে যায় এবং যত বেশি দিন ধরে সেগুলোকে সেই দেহের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠতে দেওয়া হয়। সময়ের সাথে সাথে, মারাত্মক বিষাক্ত পদার্থগুলোকে আলাদা করা এতটাই কঠিন হয়ে পড়তে পারে যে, সেগুলো জাতিরই অংশ হিসেবে গৃহীত হয়ে যায়; অথবা সেগুলোকে এক অপরিহার্য মন্দ হিসেবে সহ্য করা হয়, যার ফলে এই বহিরাগত জীবাণুগুলোকে শনাক্ত করার জন্য কোনো পদক্ষেপই নেওয়া হয় না।

শেষ যুদ্ধের আগের দীর্ঘ শান্তিকালীন সময়ে এখানে-সেখানে অমঙ্গলের কিছু লক্ষণ দৃশ্যমান ছিল, কিন্তু কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া সেগুলোর উৎস উদঘাটনে প্রায় কোনো প্রচেষ্টাই করা হয়নি। আবারও, এই ব্যতিক্রমগুলো মূলত জাতির অর্থনৈতিক জীবনের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কিত ছিল, যা অন্যান্য বহু ক্ষেত্রে বিদ্যমান অমঙ্গলের চেয়ে ব্যক্তির কাছে বেশি দৃশ্যমান ছিল।

ক্ষয়ের অনেক লক্ষণ ছিল, যেগুলো গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন ছিল।

* * *

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় : যুদ্ধের আগে জার্মানির জনসংখ্যার অভূতপূর্ব
বৃদ্ধির ফলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তা ও কর্মকাণ্ডের সকল ক্ষেত্রে দৈনন্দিন খাদ্যের জোগান নিশ্চিত করার বিষয়টি ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিরা একমাত্র সঠিক সমাধানটি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং সহজতর উপায়ে তাদের লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করেন। নতুন ভূখণ্ড জয়ের ধারণা প্রত্যাখ্যান করে তার পরিবর্তে বাণিজ্যিক বিশ্বজয়ের উন্মাদ ধারণা গ্রহণ করা শেষ পর্যন্ত সীমাহীন ও ক্ষতিকর শিল্পায়নের দিকেই নিয়ে যেতে বাধ্য ছিল।

এই পথের প্রথম এবং সবচেয়ে ভয়াবহ প্রভাব ছিল কৃষির দুর্বলতা। শহরাঞ্চলে সর্বহারা জনগোষ্ঠীর বৃদ্ধির সাথে কৃষকদের দুর্বলতা সমানুপাতিক ছিল , অবশেষে ভারসাম্য সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়।

ধনী ও গরীবের মধ্যে বিশাল বিভেদ প্রকট হয়ে উঠল। বিলাসিতা ও দারিদ্র্য এতটাই ঘনিষ্ঠভাবে সহাবস্থান করত যে এর পরিণতি ভয়াবহ হতে বাধ্য ছিল। দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দেখা দিতে শুরু করল।
এতে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় এবং তারা অসন্তুষ্ট ও তিক্তমনা হয়ে পড়ে। ফলস্বরূপ, রাজনৈতিক শ্রেণিতে বিভাজন ঘটে। বাণিজ্যের রমরমা অবস্থা সত্ত্বেও অসন্তোষ বাড়তে থাকে। অবশেষে, পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায় যেখানে প্রত্যেকেই নিশ্চিত হয়ে যায় যে, "এভাবে আর চলতে পারে না ," যদিও আসলে কী ঘটছে তা কেউই নিশ্চিতভাবে বলতে পারছিল না।

অসন্তোষ কতটা গভীরে পৌঁছে গিয়েছিল , এগুলো ছিল তার সাধারণ ও দৃশ্যমান লক্ষণ। এর চেয়েও খারাপ ব্যাপার হলো—
তবে, দেশের শিল্পায়নের ফলে আরও কিছু প্রভাব ছিল যা ছিল সুস্পষ্ট ফলাফল।
বাণিজ্য যতখানি রাষ্ট্রের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করল , অর্থ ততখানিই দেবতায় পরিণত হলো , যার সামনে সকলে মাথা নত করতে ও সেবা করতে বাধ্য হলো। স্বর্গের দেবতারা ক্রমশ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়লেন, অবশেষে ম্যামনের (ধনসম্পদের) উপাসনার জন্য তাঁদের সরিয়ে দেওয়া হলো। আর এভাবেই শুরু হলো চরম অবক্ষয়ের এক যুগ , যা আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল এই কারণে যে, এটি এমন এক সময়ের সাথে মিলে গিয়েছিল যখন সরকারের চেয়ে রাষ্ট্রই বেশি ...

Machine Translated by Google

যারই একটি মহৎ ধারণার প্রয়োজন ছিল, কারণ সংকটময় মুহূর্তটি ইতিমধ্যেই ঘনিয়ে আসছিল। জার্মানদের উচিত ছিল শান্তিপূর্ণভাবে তাদের দৈনন্দিন আহার লাভের প্রচেষ্টাকে তরবারি দিয়ে রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত থাকা ।

দুর্ভাগ্যবশত, যেখানে অর্থের আধিপত্যের বিরোধিতা করা উচিত ছিল, সেখানেই তা সমর্থন ও অনুমোদন লাভ করেছিল । মহামান্য সম্রাট নতুন রাজধানীর প্রতিনিধিদের অভিজাত পদে উন্নীত করে একটি ভুল করেছিলেন। এটা সত্যি যে , এমনকি বিসমার্কও এই বিষয়ে হুমকিটি চিনতে ব্যর্থ হয়েছিলেন । কিন্তু বাস্তবে, সমস্ত আদর্শ অর্থের কাছে গৌণ হয়ে পড়েছিল , এবং এটা স্পষ্ট ছিল যে একবার আমরা এই পথে পা বাড়ালে , তরবারির আভিজাত্য খুব দ্রুতই অর্থের আভিজাত্যে পর্যবসিত হবে।

যুদ্ধের চেয়ে আর্থিক লেনদেনে সাফল্য লাভ করা সহজ ছিল । তাই, কোনো প্রকৃত বীর বা রাষ্ট্রনায়কের পক্ষে নিকটতম ইহুদি ব্যাংকারের সাথে যোগাযোগ রাখা আর আকর্ষণীয় ছিল না । প্রকৃত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা সস্তা সম্মাননা গ্রহণে আগ্রহী ছিলেন না এবং তা প্রত্যাখ্যান করতেন। কিন্তু জাতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে, এই ধরনের পরিবর্তন ছিল দুঃখজনক। অভিজাত শ্রেণী তাদের অস্তিত্বের শর্তস্বরূপ জাতিগত বৈশিষ্ট্যগুলো ক্রমশ হারাতে শুরু করে ; ফলস্বরূপ, অনেক ক্ষেত্রে 'অমার্জিত' শব্দটিই অধিকতর উপযুক্ত হয়ে ওঠে।

অর্থনীতির একটি গুরুতর বিপর্যয় ছিল বিনিয়োগকৃত মূলধনের ওপর ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণের ধীর বিলুপ্তি এবং সমগ্র অর্থনৈতিক কাঠামোর ক্রমান্বয়ে একীভূত যৌথ -মূলধনী কোম্পানিগুলোর হাতে হস্তান্তর।

এইভাবে, শ্রম বিবেকহীন শোষকদের হাতে ফটকাবাজির বস্তুতে পরিণত হয়ে অধঃপতিত হয়েছিল ।

সম্পত্তির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ব্যাপক হারে বাড়ছিল । অর্থলগ্নিকারীরা বিজয়ী হতে শুরু করল এবং ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে জাতির সমগ্র জীবনের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পথে অগ্রসর হচ্ছিল ।

যুদ্ধের আগেই জার্মানির অর্থনৈতিক কাঠামোর আন্তর্জাতিকীকরণ শুরু হয়ে গিয়েছিল ।
এক পরোক্ষ পথে – শেয়ার ইস্যু করার মাধ্যমে । এটা সত্যি যে কিছু জার্মান শিল্পপতি এই বিপদ এড়ানোর জন্য দৃঢ় প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা লোভী পুঁজিপতিদের সম্মিলিত আক্রমণের কাছে আত্মসমর্পণ করেন , যাদের এই লড়াইয়ে মার্ক্সবাদী আন্দোলনের অনুগত সমর্থকেরা সাহায্য করেছিল।

জার্মান 'ভারী শিল্পের' বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধটি ছিল মার্ক্সবাদীদের পরিকল্পিত জার্মান অর্থনৈতিক জীবনের আন্তর্জাতিকীকরণের দৃশ্যমান সূচনা। তবে, এই প্রক্রিয়াটি কেবল মার্ক্সবাদ ও বিপ্লবের বিজয়ের মাধ্যমেই তার চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করতে পারত। আমি যখন এই কথাগুলো লিখছি, তখন জার্মান রাষ্ট্রীয় রেলপথের ওপর একটি সাধারণ আক্রমণ অবশেষে সফল হয়েছে এবং সেগুলো এখন আন্তর্জাতিক পুঁজিপতিদের হাতে চলে যাচ্ছে। এভাবেই , 'আন্তর্জাতিক সামাজিক গণতন্ত্র' আবারও তার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য অর্জন করেছে।

জার্মান জাতির এই 'বাণিজ্যিকীকরণ' কতটা এগিয়ে গিয়েছিল তার সর্বোত্তম প্রমাণ এই ঘটনাতেই দেখা যায় যে , যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর জার্মান শিল্প ও বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান নেতা এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে, বাণিজ্যই একমাত্র শক্তি যা জার্মানিকে আবার নিজের পায়ে দাঁড় করাতে পারে ।

এইসব আজেবাজে কথা ঠিক তখনই পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছিল , যখন ফ্রান্স মানবিক বিদ্যার উপর ভিত্তি করে গণশিক্ষা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করছিল , এবং এর মাধ্যমে এই ধারণাটি ভেঙে দিচ্ছিল যে জাতির জীবন আদর্শ ও মূল্যবোধের পরিবর্তে বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল। স্টিনসের এই ঘোষণাটি সেই সময়ে বিশ্বে অবিশ্বাস্য বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল। এটি অবিলম্বে লুফে নেওয়া হয় এবং বিপ্লবের পর জার্মানিকে ধ্বংসকারী সমস্ত ভণ্ড ও প্রতারক—অর্থাৎ সেই " রাষ্ট্রনায়কদের" —পথপ্রদর্শক মূলমন্ত্রে পরিণত হয়।

* * *

Machine Translated by Google

যুদ্ধ-পূর্ব জার্মানিতে অবক্ষয়ের অন্যতম নিকৃষ্ট লক্ষণ ছিল কোনো কাজ অসম্পূর্ণ রাখার ব্যাপক অভ্যাস। এটি ছিল সাধারণ নিরাপত্তাহীনতাবোধের অন্যতম একটি প্রভাব। এর জন্য এই ও অন্যান্য কারণ থেকে উদ্ভূত এক ধরনের লাজুকতাকেও দায়ী করা যেতে পারে । শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে এই ব্যাধিটি লালিত হয়েছিল।

যুদ্ধের আগে জার্মান শিক্ষাব্যবস্থার অনেক দুর্বলতা ছিল । এটি কেবলমাত্র জ্ঞানচর্চার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং ব্যবহারিক দক্ষতার বিকাশের প্রতি তেমন মনোযোগ দেওয়া হতো না। ব্যক্তিগত চরিত্র গঠনের দিকে আরও কম মনোযোগ দেওয়া হতো , যদি তা আদৌ সম্ভব হতো। দায়িত্ববোধের বিকাশ, ইচ্ছাশক্তি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে শক্তিশালী করার দিকে প্রায় কোনো মনোযোগই দেওয়া হতো না । এই পদ্ধতির ফলস্বরূপ এমন বিদ্বান মানুষ তৈরি হয়েছিল যারা সবকিছু জানতে চাইত। যুদ্ধের আগে , আমাদের জার্মানদের এভাবেই দেখা হতো এবং বিচার করা হতো। জার্মানদের পছন্দ করা হতো কারণ...

তারা উপকারী ছিল ; কিন্তু চারিত্রিক দুর্বলতার কারণে তারা সম্মানিত ছিল না । যারা এটি সঠিকভাবে পড়তে পারেন, তাদের জন্য এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যে, সকল জাতির মধ্যে জার্মানরাই সর্বপ্রথম বিদেশে গিয়ে নিজেদের নাগরিকত্ব ত্যাগ করেছিল । সেই সময়ে প্রচলিত এই উক্তিটি, "হাতে টুপি নিয়ে আমরা সারা বিশ্ব ভ্রমণ করতে পারি ," অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ।

এই ধরনের আত্মসমর্পণ সত্যিই বিপর্যয়কর ছিল যখন এটি মোকাবেলার উপায় নির্ধারণ করে দিয়েছিল।
সম্রাট। কোনো আপত্তি নেই, বরং মহামান্য সম্রাট যা কিছু করেছেন, তার সবকিছুরই প্রশংসা করছেন।

দাসত্ব নয় , বরং মর্যাদার এক আন্তরিক প্রকাশ অপরিহার্য ছিল । রাজাদের সামনে দাসত্ব হয়তো পেশাদার চাটুকারদের জন্য এবং সেইসব অধঃপতিতদের জন্য ভালো হতে পারত, যারা সৎ নাগরিকদের চেয়ে সমাজের উচ্চস্তরে বেশি আনন্দ খুঁজে পেত । কিন্তু, এই "অসীম নম্র" জীবেরা তাদের প্রভু ও নিয়োগকর্তার সামনে নতজানু হয়ে অন্য সাধারণ মানুষের প্রতি সর্বদাই এক সীমাহীন ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করত , যা সবচেয়ে নির্লজ্জভাবে প্রকাশ পেত যখন তারা নিজেদের একমাত্র "রাজতন্ত্রবাদী" হিসেবে জাহির করত । এই নবনির্মিত অভিজাতদের মধ্যে , বা এমনকি যারা এখনো অভিজাত হয়ে ওঠেনি, কেবল এমন নীচ প্রকৃতির লোকেরাই এই ধরনের ধৃষ্টতা দেখাতে সক্ষম ছিল ।

আর ঠিক এই ধরনের লোকেরাই সবসময় রাজতন্ত্র ও রাজতান্ত্রিক আদর্শের পতনের পথ প্রস্তুত করে। এর অন্যথা হতে পারে না । যারা আদর্শের জন্য লড়াই করতে ইচ্ছুক, তারা কখনো কাপুরুষ দালাল হবে না । যে ব্যক্তি কোনো প্রতিষ্ঠানের রক্ষণাবেক্ষণ ও সমৃদ্ধি নিয়ে আন্তরিকভাবে ভাবে, সে তার প্রতিনিধিরা কিছু নির্দিষ্ট ত্রুটি বা দুর্বলতা প্রদর্শন করতে শুরু করলে সেই প্রতিষ্ঠানকে পরিত্যাগ করবে না । এবং সে অবশ্যই সেগুলো সমগ্র বিশ্বের কাছে ঘোষণা করবে না, যেমনটা রাজতন্ত্রের কিছু ভণ্ড গণতান্ত্রিক 'বন্ধুরা' করেছে, বরং সে এই ত্রুটিগুলোর গুরুত্ব সম্পর্কে রাজাকে সতর্ক করার চেষ্টা করবে ।

পরিস্থিতি বুঝিয়ে তাঁকে পদক্ষেপ নিতে রাজি করাবেন। অধিকন্তু , তিনি মহামান্য সম্রাটের সুবিধাজনক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবেন না , কারণ তা কেবল বিপর্যয়ই ডেকে আনবে।
আমি যে মানুষটির কথা ভাবছি, তিনি রাজতন্ত্রকে স্বয়ং রাজার হাত থেকে রক্ষা করাকে নিজের কর্তব্য বলে মনে করবেন , তা তার জন্য যতই ঝুঁকিপূর্ণ হোক না কেন । যদি রাজতন্ত্রের মূল্য কেবল রাজার উপরই নির্ভর করত, তবে তা হতো কল্পনাতীত নিকৃষ্টতম প্রতিষ্ঠান; কারণ আমরা মাঝে মাঝে অন্যরকম ভাবতে চাইলেও, রাজারা খুব কম ক্ষেত্রেই প্রজ্ঞা, যুক্তি এবং চরিত্রের সততার আদর্শ হয়ে থাকেন । এই সত্যটি পেশাদার চাটুকার এবং ভৃত্যদের জন্য হজম করা কঠিন । কিন্তু সকল বিবেকবান মানুষ , যারা জাতির মেরুদণ্ড , তারা এই অর্থহীন কল্পকাহিনী প্রত্যাখ্যান করেন যে সকল রাজাই জ্ঞানী , ইত্যাদি। এই ধরনের মানুষের কাছে ইতিহাস ইতিহাসই, এবং সত্য সত্যই, এমনকি যখন তা রাজাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়। কিন্তু যদি কোনো জাতি একজন মহান রাজা বা মহান মানুষ পাওয়ার মতো সৌভাগ্যবান হয়, তবে তাদের অনুভব করা উচিত...

অন্যান্য জাতি থেকে বিশেষভাবে স্বতন্ত্র ।

এটা স্পষ্ট যে, একটি রাজতন্ত্রের মূল্য ও তাৎপর্য কেবল শাসকের উপর নির্ভর করতে পারে না, যদি না দৈব বিধানে রাজমুকুট ফ্রেডরিক দ্য গ্রেটের মতো কোনো মহান বীরের, কিংবা প্রথম উইলিয়ামের মতো কোনো জ্ঞানী ব্যক্তির মস্তকে শোভিত হয়। এমনটা ঘটতে পারে ।
কয়েক শতাব্দীতে একবার, এর চেয়ে বেশি ঘন ঘন নয় । ব্যক্তির চেয়ে রাজার আদর্শকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, কারণ প্রতিষ্ঠানের অর্থ প্রতিষ্ঠানটির মধ্যেই নিহিত থাকা উচিত। সুতরাং , রাজাকে তাদের নিরিখে বিবেচনা করা যেতে পারে , যাদের সেবা করাই তাঁর কর্তব্য । তিনিও এই ব্যবস্থার একটি অংশ মাত্র।

Machine Translated by Google

এবং সেই হিসেবে তাকে অবশ্যই তার কর্তব্য পালন করতে হবে। তাকে মহৎ লক্ষ্য পূরণের জন্য নিজেকে মানিয়ে নিতে হবে । যদি ধারণাটির সাথেই অর্থটি সংযুক্ত না থাকত, এবং সবকিছু একজন "পবিত্র" ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতো, তবে এমন একজন রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করা কখনোই সম্ভব হতো না যিনি শেষ পর্যন্ত ...
নির্বোধ।

বর্তমান সময়ে এই সত্যের উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন, কারণ সম্প্রতি সেইসব ঘটনাপ্রবাহ পুনরায় দেখা দিয়েছে যা রাজতন্ত্রের পতনের জন্য বহুলাংশে দায়ী ছিল।
তাদের স্বভাবসুলভ ঔদ্ধত্য নিয়ে এই লোকেরা 'তাদের রাজা'র কথা বলে—অর্থাৎ, সেই ব্যক্তি যাকে তারা কয়েক বছর আগে তাদের সবচেয়ে সংকটময় মুহূর্তে লজ্জাজনকভাবে পরিত্যাগ করেছিল। যারা প্রত্যাখ্যান করে
যারা এই মিথ্যাচারের কোরাসে অংশ নেয় , তাদের 'খারাপ জার্মান' হিসেবে গণ্য করা হয় । যারা ভান করে
এই ধরনের অভিযোগ সেই একই শ্রেণীর হতভাগ্য কাপুরুষদের কাজ, যারা ১৯১৮ সালে পালিয়ে গিয়ে লাল ব্যাজ পরতে শুরু করেছিল। তারা ভাবত, বিচক্ষণতাই সাহসিকতার চেয়ে শ্রেয় । কাইজারের কী হলো, তা নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা ছিল না। তারা 'শান্তিপূর্ণ নাগরিক' সেজে লুকিয়ে ছিল এবং কোনো চিহ্ন না রেখেই উধাও হয়ে গিয়েছিল ।
হঠাৎ করেই, রাজতন্ত্রের এই রক্ষকদের আর কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। সতর্কতার সাথে, একে একে, রাজমুকুটের এই 'সেবক ও উপদেষ্টারা' আবার আবির্ভূত হতে শুরু করল , রাজতন্ত্রের প্রতি তাদের মৌখিক আনুগত্য বজায় রেখেই ; কিন্তু তার আগে অন্যরা তাদের হয়ে রাজতন্ত্র-বিরোধী আক্রমণগুলো থামিয়ে দিয়েছিল এবং বিপ্লবকে চূর্ণ করে দিয়েছিল । তারা ফিরে এসেছিল অতীতের জন্য আকুল হয়ে এবং রাজতন্ত্রের প্রতি ভক্তিতে প্রায় ফেটে পড়ার উপক্রম হয়ে। এই অবস্থা ততদিনই থাকবে, যতদিন না ' লালরা' আবার আবির্ভূত হয় । তারপর রাজতন্ত্রপ্রেমীদের এই পতনোন্মুখ দলটি আবারও বিড়ালের সামনে ইঁদুরের মতো ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে।

যদি রাজারা এসবের জন্য দায়ী না হতেন, তবে হয়তো তাদের প্রতি সহানুভূতি জাগত । কিন্তু তাদের বোঝা উচিত ছিল যে , এমন রক্ষক থাকলে সিংহাসন হারানো গেলেও , তা লাভ করা নিশ্চিতভাবেই সম্ভব নয় ।

এই সমস্ত ভক্তি ছিল একটি ভুল, এবং তা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ফল, যা এক্ষেত্রে এক বিশেষ কঠোর শাস্তি নিয়ে এসেছিল। এই শোচনীয় মূর্খতা রাজতন্ত্রের ক্রমাগত অবক্ষয়ের কারণ হয়েছিল । যখন এটি অবশেষে টলতে শুরু করল , তখন সবাই উধাও হয়ে গেল। অবশ্যই, চাটুকার ও প্রতারকরা তাদের প্রভুদের জন্য কখনো মরতে চায় না। রাজারা যে এই বিষয়টি কখনো উপলব্ধি করেননি , এবং প্রায় কখনোই পাত্তা দেননি , সেটাই সবসময় তাদের পতনের কারণ হয়েছে।

* * *

আমাদের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম দৃশ্যমান ফল হলো দায়িত্ব গ্রহণের ভীতি এবং এর ফলে অস্তিত্বের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলো সমাধানে দুর্বলতা ।

এই মহামারীর সূত্রপাত হয়েছিল সংসদে, যেখানে দায়িত্ব এড়ানোর প্রবণতা বিশেষভাবে প্রবল ছিল। দুর্ভাগ্যবশত, এই সংক্রমণ ধীরে ধীরে দৈনন্দিন জীবনের সকল ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে , কিন্তু এটি জনবিষয়াবলীকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। প্রত্যেকেই দায়িত্ব এড়িয়ে চলত , যার ফলে অপর্যাপ্ত বা দায়সারা পদক্ষেপ নেওয়া হতো, এবং ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছিল।

যদি আমরা পুরো সিরিজটির প্রতি বিভিন্ন সরকারের মনোভাবকে সত্যিই বিবেচনা করি
জনজীবনে বিপজ্জনক ঘটনাপ্রবাহের ক্ষেত্রে , আমরা এই অর্ধ-পদক্ষেপ নীতি এবং দায়িত্ব গ্রহণে সাহসের অভাবের ভয়াবহ তাৎপর্য অবিলম্বে উপলব্ধি করব । আমার জানা অসংখ্য উদাহরণের মধ্য থেকে আমি মাত্র কয়েকটি উদাহরণ দেব।

সাংবাদিক মহলে সংবাদমাধ্যমকে রাষ্ট্রের একটি 'মহাশক্তি' হিসেবে উল্লেখ করা একটি প্রচলিত রীতি । বস্তুত, এর গুরুত্ব অপরিসীম। এই গুরুত্বকে সহজে অতিরঞ্জিত করা যায় না, কারণ সংবাদমাধ্যম প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থাতেও তার শিক্ষামূলক কাজ চালিয়ে যায় । সাধারণত, সংবাদমাধ্যমের পাঠকদের তিনটি দলে ভাগ করা যায় : যারা যা পড়ে তার সবকিছুই বিশ্বাস করে; যারা আর কিছুই বিশ্বাস করে না; এবং যারা যা পড়ে তা
সমালোচনামূলকভাবে মূল্যায়ন করে এবং যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

Machine Translated by Google

সংখ্যাগতভাবে, এই প্রথম গোষ্ঠীটিই নিঃসন্দেহে সবচেয়ে শক্তিশালী; এটি দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে নিয়ে গঠিত। বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে, এটি দেশের সবচেয়ে সরল অংশ। একে পেশা অনুসারে শ্রেণিবদ্ধ করা যায় না , কেবল বুদ্ধিমত্তার মাত্রা অনুসারে করা যায়। এই শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত তারা সবাই , যারা নিজেরা চিন্তা করার ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়নি বা যারা তা শেখেনি , এবং যারা, আংশিকভাবে অযোগ্যতা ও আংশিকভাবে অজ্ঞতার কারণে, যা কিছু লেখা হয় তার সবকিছুই বিশ্বাস করে। এদের সাথে আমাদের সেই ধরনের অলস ব্যক্তিদেরও যোগ করতে হবে, যারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও, নিছক অলসতার কারণে অন্যের চিন্তাভাবনা করা সবকিছু কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করে এবং বিনয়ের সাথে বিশ্বাস করে যে তা নির্ভুলভাবে করা হয়েছে। সুতরাং, দেশের এই ব্যাপক জনগোষ্ঠী গঠনকারী সমস্ত মানুষের উপর সংবাদমাধ্যমের প্রভাব বিশাল। কোনো এক কারণে, তাদের যা পরিবেশন করা হয় তা তারা যাচাই-বাছাই করতে পারে না বা করতে চায় না ; তাই, দৈনন্দিন সমস্যাগুলির প্রতি তাদের সম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় পুরোপুরিই বাহ্যিক প্রভাবের ফল। এটি আন্তরিক ও সৎ ব্যক্তিদের দ্বারা জনসচেতনতার জন্য সুবিধাজনকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে , কিন্তু যখন এটি ব্যাপক ক্ষতি করে...

বদমাশ ও মিথ্যাবাদীরা কাজটি গ্রহণ করে।

দ্বিতীয় দলটি সংখ্যায় ছোট, যার একাংশ এমন মানুষদের নিয়ে গঠিত যারা আগে প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল , কিন্তু একের পর এক তিক্ত হতাশার পর তারা মুদ্রিত শব্দের ওপর থেকে পুরোপুরি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। তারা সব সংবাদপত্রকে ঘৃণা করে। তারা হয় সেগুলো একেবারেই পড়ে না, অথবা সেগুলোর বিষয়বস্তু নিয়ে চরমভাবে বিরক্ত হয় , যেগুলোকে তারা একরাশ মিথ্যা আর আজেবাজে কথা বলে মনে করে। এই পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে চলা কঠিন।
এই ধরনের লোকদের সাথে মেলামেশা করলে , তারা সত্যের ব্যাপারে সর্বদা সন্দিহান থাকবে। ফলে, তারা কোনো ইতিবাচক কাজের জন্য অকেজো।

তৃতীয় দলটি সবচেয়ে ছোট, যার মধ্যে রয়েছেন প্রকৃত বুদ্ধিজীবীরা, যাঁরা সহজাত প্রতিভা ও শিক্ষার বদৌলতে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারেন এবং সর্বত্র নিজেদের বিচার-বিবেচনা গঠনের চেষ্টা করেন , একই সাথে যা পড়েন তা সতর্কতার সাথে যাচাই-বাছাই করেন। তাঁরা নিজেদের বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার না করে একটিও সংবাদপত্র পড়েন না , এবং অবশ্যই, এটি প্রবন্ধ লেখার কাজকে অনেক বেশি কঠিন করে তোলে। সাংবাদিকরা এই ধরনের পাঠকের সাথে যথেষ্ট সতর্কতার সাথে আচরণ করেন।

সুতরাং, সংবাদপত্রগুলো যে আবর্জনা পরিবেশন করে , তা তৃতীয় এক শ্রেণির পাঠকের কাছে সবচেয়ে কম বিপজ্জনক। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে , এই পাঠকরা প্রত্যেক সাংবাদিককে এমন এক গুণ্ডা হিসেবে ভাবতে শিখেছে, যে কিনা মাঝে মাঝে সত্যি কথা বলে। দুর্ভাগ্যবশত, এই পাঠকদের মূল্য তাদের সংখ্যায় নয়, বরং বুদ্ধিমত্তায় নিহিত ; যা এমন এক সময়ে দুঃখজনক, যখন প্রজ্ঞার কোনো মূল্য নেই , আছে শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠতা। আজকাল, ভোটদানই নির্ণায়ক বিষয়; সিদ্ধান্তটি বৃহত্তম গোষ্ঠীর হাতে থাকে; আর সেই গোষ্ঠীটি হলো প্রথমটি—বোকা ও সরলমনা মানুষের ভিড়।

রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ এবং জাতীয় কর্তব্য হলো এটা নিশ্চিত করা যে, এই মানুষগুলো যেন ভণ্ড, অশিক্ষিত বা অকরুণ শিক্ষকদের হাতে না পড়ে। সুতরাং, সমাজের শিক্ষার তত্ত্বাবধান করা এবং একে সকল প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। সংবাদপত্রের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত , কারণ মানুষের উপর এর প্রভাব অপরিসীম এবং সবকিছুর মধ্যে সবচেয়ে কার্যকর, কেননা এর প্রভাব ক্ষণস্থায়ী নয় বরং স্থায়ী। এর অপরিসীম গুরুত্ব নিহিত রয়েছে এর শিক্ষার অভিন্ন ও অবিরাম পুনরাবৃত্তির মধ্যে। রাষ্ট্রকে কখনোই ভুললে চলবে না যে, সে যা-ই করুক না কেন, তাকে অবশ্যই হতে হবে...

এর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো তথাকথিত ‘ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা’র অলীক মোহে একে বিভ্রান্ত করা যাবে না, কিংবা এর কর্তব্য অবহেলা করতে এবং জাতিকে তার প্রয়োজনীয় জিনিস থেকে বঞ্চিত করতে প্ররোচিত করা যাবে না। নির্মম সংকল্পের সাথে রাষ্ট্রকে অবশ্যই সার্বজনীন শিক্ষার এই মাধ্যমটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং একে রাষ্ট্র ও জাতির সেবায় নিয়োজিত করতে হবে।

কিন্তু যুদ্ধের আগে জার্মান সংবাদমাধ্যম তার পাঠকদের কী পরিবেশন করত? সেটা কি সবচেয়ে মারাত্মক বিষ ছিল না? যখন অন্যরা ধীরে ধীরে জার্মানিকে আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখনই কি শান্তিবাদকে তার নিকৃষ্টতম রূপে গেঁথে দেওয়া হয়নি? সেই একই সংবাদমাধ্যম কি শান্তিকালীন সময়ে রাষ্ট্রের সার্বভৌম অধিকার নিয়ে মানুষের মনে সন্দেহ জাগিয়ে তোলেনি , যার ফলে রাষ্ট্র তার প্রতিরক্ষার উপায় বেছে নিতে বাধাগ্রস্ত হয়েছিল? জার্মান সংবাদমাধ্যমই কি জানত না কীভাবে "পশ্চিমা গণতন্ত্র" সম্পর্কিত সমস্ত আজেবাজে কথা আমাদের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য করে উপস্থাপন করতে হয়, যতক্ষণ না অবশেষে উৎসাহী জনগণ প্রস্তুত হয়েছিল...

Machine Translated by Google

তাদের ভবিষ্যৎ জাতিপুঞ্জের হাতে সঁপে দেওয়া? এই সংবাদমাধ্যম কি আমাদের জাতির নৈতিক অবক্ষয়ের হাতিয়ার ছিল না? আমাদের জনগণ অবশেষে 'আধুনিক' না হওয়া পর্যন্ত কি নৈতিকতা ও সততাকে উপহাস করে সেকেলে বলে আখ্যা দেওয়া হয়নি ? সংবাদমাধ্যম কি ক্রমাগত আক্রমণের মাধ্যমে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে এমনভাবে ক্ষুণ্ন করেনি যে, শেষ পর্যন্ত একটি আঘাতই এই টলমল প্রতিষ্ঠানটিকে মাটিতে নামিয়ে আনার জন্য যথেষ্ট ছিল ? সংবাদমাধ্যম কি তার সর্বশক্তি দিয়ে এর বিরোধিতা করেনি ?

রাষ্ট্রের প্রতিটি পদক্ষেপই ছিল রাষ্ট্রের প্রাপ্য পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে , এবং অবিরাম সমালোচনার মাধ্যমে সেনাবাহিনীর সুনাম ক্ষুণ্ন করা, সাধারণ বাধ্যতামূলক সামরিক সেবায় অন্তর্ঘাত করা, সামরিক ঋণ প্রদানে অস্বীকৃতির দাবি জানানো, ইত্যাদি — অবশেষে এই অভিযানের সাফল্য নিশ্চিত হয়েছিল?

তথাকথিত উদারপন্থী সংবাদমাধ্যমের কাজ ছিল জার্মান জনগণ ও রাইখের জন্য কবর খোঁড়া। মার্ক্সবাদী সংবাদমাধ্যমের মিথ্যাচার নিয়ে কথা বলার কোনো মানেই হয় না; তাদের কাছে মিথ্যা হলো...

জীবনের জন্য এটি ঠিক ততটাই অপরিহার্য, যতটা বিড়ালের জন্য ইঁদুর। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো জনগণের জাতীয় মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া, যার মাধ্যমে তাদেরকে আন্তর্জাতিক পুঁজি এবং তার মালিক— ইহুদিদের—দাস হওয়ার জন্য প্রস্তুত করা।

জাতির এই গণবিষক্রিয়া মোকাবেলায় রাষ্ট্র কী করেছিল? কিছুই না, একেবারে কিছুই না! এই মহামারীর স্বীকৃতি আদায়ের এটাই ছিল তাদের উপায়—তোষামোদ, সংবাদপত্রের "মূল্য" , তার "গুরুত্ব", তার "শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য" এবং এই জাতীয় সব বাজে কথার স্বীকৃতি। ইহুদিরা এক ধূর্ত হাসি আর ধন্যবাদসহকারে এসব মেনে নিয়েছিল ।

রাষ্ট্রের এই শোচনীয় ব্যর্থতার কারণ বিপদটি বুঝতে তার অনিচ্ছা নয় , বরং অনুপযুক্ত ও অকার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতি মোকাবেলায় তার চরম কাপুরুষোচিত পন্থা । কোনো জোরালো ও আমূল পদ্ধতি প্রয়োগ করার সাহস কারও ছিল না । প্রত্যেকেই কোনো না কোনোভাবে সময়ক্ষেপণ করেছে; এর মূলে আঘাত হানার পরিবর্তে তারা কেবল বিষধর সাপটিকে উত্যক্ত করেছে। ফলস্বরূপ, সবকিছু আগের মতোই রয়ে গেল, এবং যে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে লড়াই করা প্রয়োজন ছিল, তার ক্ষমতা প্রতি বছর আরও শক্তিশালী হয়ে উঠল।

সেই দিনগুলিতে, প্রধানত ইহুদি-নিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে সরকার যে লড়াই শুরু করেছিল , যা ধীরে ধীরে জাতিকে কলুষিত করছিল, তাতে কোনো দৃঢ়তা বা নির্দিষ্ট নীতির অভাব ছিল , কিন্তু সর্বোপরি, এর একটি সুস্পষ্ট লক্ষ্যের অভাব ছিল। এই লড়াইয়ের গুরুত্ব এবং পদ্ধতি নির্বাচন সম্পূর্ণরূপে ভুলভাবে বিচার করা হয়েছিল এবং কোনো সুস্পষ্ট পরিকল্পনাও প্রতিষ্ঠিত হয়নি । তারা কেবল সমস্যাটি নিয়ে নাড়াচাড়া করেছিল। কখনও কখনও, কামড় দেওয়ার পর, তারা এক বা একাধিক সাংবাদিক বিষধরকে সপ্তাহ বা মাসের জন্য কারারুদ্ধ করত, কিন্তু পুরো বিষাক্ত গোষ্ঠীটিকে শান্তিতে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হতো।

এটা স্বীকার করতেই হবে যে, এর পেছনে একদিকে ছিল ইহুদিদের অত্যন্ত ধূর্ত কৌশল এবং অন্যদিকে ছিল কর্তৃপক্ষের সুস্পষ্ট নির্বুদ্ধিতা বা অনভিজ্ঞতা। ইহুদিরা এতটাই চালাক ছিল যে তারা তাদের সমগ্র সংবাদমাধ্যমকে একই সাথে আক্রমণের শিকার হতে দেয়নি । না, এক পক্ষ অন্য পক্ষকে আড়াল করেছিল।

যখন মার্ক্সবাদী সংবাদপত্রটি অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে পবিত্র সবকিছুকে কলঙ্কিত করছিল , রাষ্ট্র ও সরকারের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালাচ্ছিল এবং সমাজের এক অংশকে অন্য অংশের বিরুদ্ধে উসকানি দিচ্ছিল, তখন বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক সংবাদপত্রগুলো, এমনকি ইহুদিদের হাতে থাকাগুলোও , বস্তুনিষ্ঠতার অনুকরণীয় উদাহরণ হিসেবে নিজেদের উপস্থাপন করতে জানত । তারা ইচ্ছাকৃতভাবে কঠোর ভাষা পরিহার করত, কারণ তারা খুব ভালো করেই জানত যে এই নির্বোধরা কেবল বাহ্যিক রূপ দেখেই বিচার করতে পারে এবং সমাজের অভ্যন্তরীণ কার্যপ্রণালীতে কখনোই প্রবেশ করতে পারবে না ।

যেকোনো কিছুর প্রকৃত গভীরতা ও অর্থ। তারা কোনো বস্তুর মূল্য তার বাইরের রূপ দিয়ে বিচার করে, ভেতরেরটা দিয়ে নয় । মানুষের এই দুর্বলতা সংবাদমাধ্যম সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করেছিল এবং ভালোভাবে বুঝেছিল।

এই শ্রেণীর নির্বোধরা ফ্রাঙ্কফুর্টার জাইটুংকে শালীনতার সারমর্ম হিসেবে মেনে নেবে ।

তারা সবসময় সতর্কভাবে বেলচাকে কোদাল বলা এড়িয়ে চলতেন। তারা যেকোনো ধরনের শারীরিক শক্তির ব্যবহারের নিন্দা করতেন এবং ক্রমাগত "বুদ্ধিবৃত্তিক" অস্ত্র দিয়ে লড়াই করার আহ্বান জানাতেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, এই লড়াই সবচেয়ে কম বুদ্ধিমান শ্রেণীর মধ্যেই সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল । এটি আমাদের অপর্যাপ্ত শিক্ষার অন্যতম একটি প্রভাব , যা তরুণদের তাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাদের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ জ্ঞান প্রবেশ করিয়েছে, কিন্তু তা বুঝতে তাদের নেতৃত্ব দিতে পারেনি । এই উদ্দেশ্যে, সহজাত বুদ্ধিমত্তা ব্যর্থ হলে অধ্যবসায় এবং সদিচ্ছা যথেষ্ট নয় । যে জ্ঞানের জন্য একজন ব্যক্তির চেষ্টা করা উচিত তা হলো সেইসব বিষয় বোঝা যা

সহজাতভাবেই বোঝা গিয়েছিল।

Machine Translated by Google

আমি ব্যাখ্যা করছি: একজন মানুষ এই ভ্রান্ত ধারণায় পড়তে পারে না যে , তাকে কখনো সেরকম হওয়ার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছিল । প্রকৃতির অধিপতি ও শাসক । একপেশে শিক্ষা এই ভ্রান্ত ধারণাকেই আরও দৃঢ় করে। মানুষকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে, আবশ্যিকতার মৌলিক নিয়মই প্রকৃতির সমগ্র পরিমণ্ডলকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং তার অস্তিত্ব চিরন্তন সংগ্রাম ও সংঘাতের নিয়মের অধীন। তখন সে অনুভব করবে যে, এমন এক জগতে মানুষের জন্য কোনো পৃথক নিয়ম থাকতে পারে না , যেখানে গ্রহ ও সূর্য নিজ নিজ কক্ষপথে আবর্তন করে , যেখানে চাঁদ ও গ্রহরা তাদের নির্ধারিত পথে চলে, যেখানে সবল সর্বদা দুর্বলের উপর শাসন করে এবং যেখানে এই নিয়মগুলোর অধীনদের তা মানতে হয়, নতুবা তারা ধ্বংস হয়ে যায় । মানুষকে অবশ্যই এই উচ্চতর প্রজ্ঞার চিরন্তন নীতিগুলোর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে । সে এগুলো বোঝার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু সে কখনোই মুক্ত হতে পারবে না।
তাদের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

আমাদের অর্ধ-বুদ্ধিমান শ্রেণীর জন্যই ইহুদিরা তথাকথিত "বুদ্ধিজীবী" পত্রিকায় লেখে।
ফ্রাঙ্কফুর্টার জাইটুং এবং বার্লিনার টাগেব্লাট তাদের জন্যই লেখা হতো, সেগুলোর সুর তাদের উপযোগী করে তৈরি করা হতো, এবং প্রকৃতপক্ষে এই সংবাদপত্রগুলো এই গোষ্ঠীগুলোর ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে, কঠোর ভাষা পরিহার করে , তারা তাদের পাঠকদের হৃদয়ে বিষ ঢালার জন্য অন্যান্য মাধ্যম ব্যবহার করত। মনোহর অভিব্যক্তির মিশ্রণে , তারা তাদের পাঠকদের এই বিশ্বাসে আচ্ছন্ন করে রাখে যে, জ্ঞানপ্রেম এবং নৈতিক নীতিই এই সংবাদপত্রগুলোর নীতি নির্ধারণের একমাত্র চালিকাশক্তি , অথচ বাস্তবে এগুলো ইহুদি এবং তাদের সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে যেতে পারে এমন যেকোনো বিরোধিতাকে নিরস্ত্র করার এক কপট উপায়।

তাদের এই ভদ্রতার ভান নির্বোধ পাঠকদের এটা বিশ্বাস করতে আরও উৎসাহিত করেছিল যে, অন্যান্য সংবাদপত্রের বাড়াবাড়িগুলো ছিল পরিমিত এবং এর জন্য তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন নেই । অবশ্যই, এই ধরনের পদক্ষেপ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা লঙ্ঘন করতে পারত—এটি ছিল একটি সুভাষণ , যার মাধ্যমে এই ধরনের সংবাদপত্রগুলো জনসাধারণকে প্রতারিত ও বিষিয়ে তোলার শাস্তি এড়াত । ফলে , তথাকথিত শ্রদ্ধেয় সংবাদমাধ্যমকে সঙ্গে সঙ্গে বিমুখ করার ভয়ে কর্তৃপক্ষ এই সাংবাদিক ডাকাতদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক ও ধীর ছিল । এই ভয় অমূলক ছিল না, কারণ যখনই কোনো ট্যাবলয়েডের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করা হতো , তখনই অন্য সবাই সঙ্গে সঙ্গে তার সাহায্যে ছুটে আসত; তার নীতি সমর্থন করার জন্য নয়, বরং শুধুমাত্র সংবাদপত্র ও জনমতের স্বাধীনতার নীতি রক্ষা করার জন্য । প্রতিবাদের এই কণ্ঠস্বরগুলো সবচেয়ে দৃঢ়চেতাদেরও পিছু হটতে বাধ্য করত ; কারণ সেগুলো আসত তথাকথিত শ্রদ্ধেয় সাংবাদিকদের মুখ থেকে।

আর এভাবেই এই বিষকে জাতীয় রক্তধারায় প্রবেশ করতে এবং জনজীবনকে কলুষিত করতে দেওয়া হয়েছিল, অথচ সরকার এই রোগ প্রতিরোধের জন্য কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি । যে হাস্যকর অর্ধ-পদক্ষেপগুলো নেওয়া হয়েছিল, সেগুলো নিজেরাই ছিল সেই অবক্ষয় প্রক্রিয়ার একটি লক্ষণ, যা ইতোমধ্যেই রাইখকে ভেঙে ফেলার হুমকি দিচ্ছিল । একটি প্রতিষ্ঠান কার্যত অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে যখন সে তার সমস্ত উপলব্ধ উপায় দ্বারা নিজেকে রক্ষা করতে আর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকে না । প্রতিটি অর্ধ-পদক্ষেপই হলো এক অভ্যন্তরীণ অবক্ষয় প্রক্রিয়ার বাহ্যিক প্রকাশ , যা শীঘ্র বা বিলম্বে পতনের দিকে নিয়ে যেতে বাধ্য।

আমি বিশ্বাস করি যে, আমাদের বর্তমান প্রজন্ম যদি সঠিকভাবে পরিচালিত হয়, তবে তারা এই বিপদ আরও সহজে মোকাবেলা করতে পারবে । তারা এমন নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছে যা তাদের মনোবলকে আরও দৃঢ় করেছে, যারা ভেঙে পড়েনি। সেই দিন নিশ্চয়ই আসবে যখন ইহুদিরা তাদের সংবাদপত্রে প্রচণ্ড প্রতিবাদ জানাবে, যখন তাদের প্রিয় নীড়ের উপর অবশেষে শাস্তিমূলক হাত নেমে আসবে , যখন এই কলঙ্কজনক সংবাদপত্রের অবসান ঘটানোর জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে , এবং যখন জনমত গঠনের এই মাধ্যমটি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আসবে এবং আর আমাদের জাতির শত্রুদের হাতে থাকবে না । আমি নিশ্চিত যে, এটা আমাদের পূর্বপুরুষদের চেয়ে আমাদের জন্য সহজতর হবে । ত্রিশ সেন্টিমিটারের একটি শ্র্যাপনেল হাজারো ইহুদি সংবাদপত্রের বিষধর সাপের চেয়েও জোরে হিসহিস করে । সুতরাং, তারা হিসহিস করুক।

* * *

যুদ্ধ-পূর্ব জার্মানিতে দেশের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানে দুর্বলতা ও দ্বিধার আরেকটি উদাহরণ হলো নিম্নরূপ:
রাজনৈতিক ও

Machine Translated by Google

জাতির নৈতিক সংক্রামণের পাশাপাশি , বহু বছর ধরে সমান মারাত্মক একটি প্রক্রিয়া জাতির স্বাস্থ্যকে আক্রমণ করেছিল। বিশেষ করে বড় শহরগুলোতে, দেশের প্রায় প্রতিটি অংশে সিফিলিস এবং যক্ষ্মা ক্রমবর্ধমান হারে প্রাণহানি ঘটাচ্ছিল ।

যদিও উভয় ক্ষেত্রেই ফলাফল উদ্বেগজনক ছিল, তবুও মনে হচ্ছিল যে কেউই পারছিল না
এই মহামারীগুলোর বিরুদ্ধে কোনো চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় না।

বিশেষ করে সিফিলিসের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের মনোভাব গ্রহণ করেছিল।
এই অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য গৃহীত পদক্ষেপের চেয়ে অনেক বেশি কঠোর ব্যবস্থা প্রয়োজন ছিল । একটি প্রশ্নবিদ্ধ নিরাময় পদ্ধতির আবিষ্কার এবং যে চমৎকার উপায়ে তা বাজারে আনা হয়েছিল, তা এই অভিশাপের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সামান্যই সাহায্য করেছিল। আবারও, এই রোগের লক্ষণ নয়, বরং কারণকে আক্রমণ করা প্রয়োজন ছিল । কিন্তু এক্ষেত্রে, মূল কারণটি ছিল বেশ্যাবৃত্তি। এমনকি যদি এটি সরাসরি এই ভয়াবহ রোগটি ডেকে না- ও আনত, তবুও জাতি এর মারাত্মক পরিণতি ভোগ করত , কারণ বেশ্যাবৃত্তির ফলে সৃষ্ট নৈতিক বিভ্রান্তিই জাতিকে ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট হতো। আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের ইহুদিকরণ এবং প্রজননের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অর্থলোভ শীঘ্র বা বিলম্বে আমাদের সকল সন্তানকে ধ্বংস করে দেবে। স্বাভাবিক অনুভূতিসম্পন্ন শক্তিশালী, সুস্থ সন্তানের পরিবর্তে আমরা অর্থনৈতিক হিসাবনিকাশ থেকে জন্ম নেওয়া মানবজাতির করুণ নমুনা দেখতে পাব , কারণ অর্থনৈতিক বিবেচনা ক্রমশ বিবাহের ভিত্তি এবং একমাত্র পূর্বশর্ত হয়ে উঠছে । আর ভালোবাসা অন্যত্র আশ্রয় খোঁজে ।

এখানেও, আর সব জায়গার মতোই, কিছু সময়ের জন্য প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাওয়া যায় , কিন্তু শীঘ্র বা বিলম্বে অবশ্যম্ভাবী প্রতিশোধ আসবেই। আর যখন কেউ এটা উপলব্ধি করে, ততক্ষণে সাধারণত অনেক দেরি হয়ে যায়।

একটি স্বাভাবিক বিবাহের মৌলিক পূর্বশর্তগুলো বুঝতে ক্রমাগত অস্বীকৃতির ফলে যে বিধ্বংসী পরিণতি ঘটে , তার একটি উদাহরণ আমাদের নিজেদের অভিজাত শ্রেণীই দেয় । এখানে আমরা এই প্রজননগত অভ্যাসের ফলাফল খোলাখুলিভাবে দেখতে পাই, যা একদিকে সামাজিক চাপ এবং অন্যদিকে আর্থিক বিবেচনার দ্বারা নির্ধারিত হয় । প্রথম পথটি বংশগত দুর্বলতার দিকে নিয়ে যায়, দ্বিতীয়টি রক্তের বিষক্রিয়ার দিকে; কারণ একটি ডিপার্টমেন্ট স্টোরের মালিকের সমস্ত ইহুদি কন্যাকেই মহামান্য সম্রাটের বংশবৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত বলে মনে করা হয় । এবং বংশধরদের মধ্যেও তারই প্রতিফলন দেখা যায়। এই সবকিছু চরম অধঃপতনের দিকে নিয়ে যায়। আজ, আমাদের বুর্জোয়া শ্রেণীও সেই একই পথ অনুসরণ করার চেষ্টা করছে । তাদের পরিণতিও একই হবে ।

এই অপ্রিয় সত্যগুলোকে দ্রুত এবং নির্বিকারভাবে উপেক্ষা করা হয় , যেন এতে কোনোভাবে পরিস্থিতি বদলে যেতে পারে । কিন্তু এটা অস্বীকার করা যায় না। এটা অস্বীকার করা যায় না যে, আমাদের বড় শহরগুলোর জনগণ তাদের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য ক্রমশই বেশ্যাবৃত্তির আশ্রয় নিতে ঝুঁকে পড়ছে এবং ফলস্বরূপ যৌনরোগের মহামারীতে ক্রমবর্ধমানভাবে সংক্রামিত হচ্ছে । এই গণসংক্রমণের প্রভাব একদিকে মানসিক হাসপাতালগুলোতে এবং অন্যদিকে, দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের বাড়ির শিশুদের মধ্যেও দেখা যায় । তারা আমাদের যৌন জীবনকে বিষিয়ে তোলা এই ক্রমবর্ধমান মহামারীর দুঃখজনক ও মর্মান্তিক সাক্ষী । তাদের এই দুর্ভোগ হলো তাদের পিতামাতার অন্যায়ের দৃশ্যমান ফল ।

এই অপ্রীতিকর ও ভয়াবহ সত্যটি মেনে নেওয়ার অনেক উপায় আছে ।
অনেকে কিছুই দেখে না, অথবা আরও সঠিকভাবে বললে, তারা কিছুই দেখতে চায় না। এটাই এখন পর্যন্ত সবচেয়ে সরল ও সহজ মনোভাব। অন্যরা শুচিবায়ুগ্রস্ততার এক পবিত্র আবরণের আড়ালে লুকিয়ে থাকে, যা হাস্যকর হওয়ার পাশাপাশি মিথ্যাও বটে। তারা পুরো পরিস্থিতিকে পাপপূর্ণ বলে বর্ণনা করে এবং যখন ভুক্তভোগীর মুখোমুখি হয় , তখন গভীরভাবে ক্ষুব্ধ হয় । এই অপবিত্রতার প্রতি তারা শ্রদ্ধেয় বিতৃষ্ণায় চোখ বন্ধ করে রাখে।
এই মহামারী এবং সর্বশক্তিমানের কাছে প্রার্থনা করা যে, তিনি যেন— সম্ভব হলে , তাদের মৃত্যুর পর— সদোম ও গোমোরা নগরীর মতো অগ্নি ও গন্ধক বর্ষণ করেন , এবং এভাবে নির্লজ্জ মানবজাতিকে আবারও একটি শিক্ষা দেন । এমন কিছু লোকও আছে যারা এই মহামারীর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন , কিন্তু তারা কেবল কাঁধ ঝাঁকায়, এই পূর্ণ বিশ্বাসে যে এই হুমকির বিরুদ্ধে তারা কিছুই করতে পারবে না । তাই সবকিছু চলতেই থাকে ।

এর নিজস্ব ট্র্যাক।

Machine Translated by Google

নিঃসন্দেহে, এই সবকিছু খুবই সহজ ও সুবিধাজনক, কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, কোনো বিষয়ে এমন সুবিধাজনক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের জাতির জীবনের জন্য ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে ।
অন্যান্য জাতিরা আমাদের চেয়ে ভালো করছে না— এই অজুহাত আমাদের পতনের বাস্তবতাকে বদলাতে পারে না; বরং বিপদগ্রস্ত অন্যান্য জাতির প্রতি সহানুভূতি আমাদের দুর্ভোগকে সহনীয় করে তোলে।
কিন্তু এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ওঠে : কোন জাতি এই মহামারী নিয়ন্ত্রণে প্রথম উদ্যোগ নেবে , এবং কোন জাতিগুলো এর কাছে নতি স্বীকার করবে? এটাই হবে পুরো পরিস্থিতির চূড়ান্ত পরিণতি। এটি একটি জাতির মূল্যবোধ পরীক্ষার সময় । যে জাতি এই পরীক্ষায় ব্যর্থ হবে, তারা কেবল বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং তাদের জায়গায় আরও সুস্থ ও শক্তিশালী জাতিরা আসবে, যারা এটিকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে ।
আরও বড় সমস্যা। যেহেতু এই সমস্যাটি প্রধানত আমাদের বংশধরদের সাথে সম্পর্কিত, তাই এটি সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, যে সম্পর্কে ভয়ঙ্কর যুক্তিসঙ্গতভাবে বলা হয় যে পূর্বপুরুষদের পাপ প্রতিফলিত হবে ।
তাদের বংশধরদের উপর দশম প্রজন্ম পর্যন্ত। রক্ত ও বর্ণের আইন লঙ্ঘনের পরিণতি এমনই ।

রক্ত ও বর্ণের বিরুদ্ধে পাপ একটি বংশগত পাপ এবং যে জাতিই এটি করে, তার জন্য তা বিপর্যয় ডেকে আনে।

যুদ্ধপূর্ব জার্মানিতে এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার প্রতি মনোভাব ছিল শোচনীয়। বড় শহরগুলোতে আমাদের যুবকদের মধ্যে সংক্রমণ সীমিত করতে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল? যৌন জীবনের কলুষতা ও অর্থলোভ বন্ধ করতে কী করা হয়েছিল ? আমাদের দেশজুড়ে সিফিলিসের বিস্তার রোধ করতে কী করা হয়েছিল ? কী করা উচিত ছিল, তা দেখানোর মাধ্যমেই এই প্রশ্নের উত্তরটি সবচেয়ে ভালোভাবে তুলে ধরা যায় ।

সমস্যাটির প্রতি এলোমেলোভাবে অগ্রসর না হয়ে , কর্তৃপক্ষের উপলব্ধি করা উচিত যে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুখ বা দুর্ভাগ্য এই সমাধানের উপরই নির্ভর করছে। কিন্তু এটি উপলব্ধি করতে হলে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা অপরিহার্য হবে । এর মূল শর্ত হবে এই ভয়াবহ বিপদের দিকে সমগ্র দেশের মনোযোগ নিবদ্ধ করা, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি এর বিরুদ্ধে লড়াই করার গুরুত্ব বুঝতে পারে। প্রায়শই সহ্য করা কঠিন এমন চূড়ান্ত বাধ্যবাধকতা চাপিয়ে দেওয়া এবং তা কার্যকর হবে বলে আশা করা বৃথা, যদি না জনগণকে এই বাধ্যবাধকতা আরোপ ও গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়। এর জন্য প্রয়োজন ব্যাপক ও পদ্ধতিগত জ্ঞানদান, এবং অন্যান্য সমস্ত দৈনন্দিন সমস্যা যা এই মহান কেন্দ্রীয় সমস্যা থেকে জনগণের মনোযোগ বিচ্যুত করতে পারে , সেগুলোকে পেছনে ঠেলে দিতে হবে।

যেসব ক্ষেত্রে আমরা জরুরি প্রয়োজন বা এমন কাজের সম্মুখীন হই যা কার্যকরভাবে সমাধান করা অসম্ভব বলে মনে হয় , সেখানে জনমতকে অবশ্যই...
একটিমাত্র সমস্যার উপর মনোনিবেশ করা এবং এর সমাধানকে জীবন- মরণের প্রশ্ন হিসেবে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা । কেবল এভাবেই জনস্বার্থ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছাবে যা মানুষকে এক বিরাট স্বেচ্ছাশ্রমে একত্রিত হতে এবং গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করতে উদ্বুদ্ধ করবে।

এই মৌলিক সত্যটি ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য , যতক্ষণ সে কোনো মহৎ লক্ষ্যের জন্য চেষ্টা করে । পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার আগে অবশ্যই একটি সীমিত অংশ সম্পন্ন করতে হবে এবং সেই অংশেই তাদের প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করতে হবে । যারা ধাপে ধাপে তাদের লক্ষ্য অনুসরণ করতে অস্বীকার করে এবং প্রতিটি পর্যায় অর্জনে তাদের শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে না , তারা কখনোই চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে না। এক পর্যায়ে তারা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং ভেঙে পড়বে। লক্ষ্য অর্জনের এই পদ্ধতিগত পন্থা নিজেই একটি শিল্প, এবং নির্ধারিত পথে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সর্বদা সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে হয়।

সুতরাং এই কঠিন পর্যায়টি অতিক্রম করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হলো, কর্তৃপক্ষকে জনগণকে এটা বোঝাতে সফল হতে হবে যে, যে লক্ষ্যের জন্য এখন এই সংগ্রাম চলছে, সেটিই একমাত্র মনোযোগের যোগ্য লক্ষ্য এবং সবকিছু এর উপরেই নির্ভর করে। ব্যাপক জনসাধারণ ক্লান্ত না হয়ে এবং কাজটি সম্পন্ন করার বিশ্বাস না হারিয়ে তাদের সামনে থাকা সম্পূর্ণ পথটি কখনোই স্পষ্টভাবে দেখতে পারবে না । কিছুটা হলেও তাদের মনে লক্ষ্যটি থাকবে , কিন্তু তারা হয়তো

পুরো পথটা শুধু ছোট ছোট অংশে হেঁটে যাওয়া , ঠিক সেই ভ্রমণকারীর মতো যে জানে তার যাত্রা কোথায় শেষ হবে।
তার যাত্রা, কিন্তু যে এই অন্তহীন পথ ভ্রমণ করেই তার সাথে অনেক ভালোভাবে মানিয়ে নেয়।

Machine Translated by Google

ধীরে ধীরে। কেবল এভাবেই সে চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে সংকল্পবদ্ধ থাকতে পারে।

সুতরাং, সকল প্রকার প্রচারণার সাহায্যে যৌনরোগ প্রতিরোধের সমস্যাটিকে জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে — জাতির কাজ হিসেবে নয়, বরং একটি প্রধান দায়িত্ব হিসেবে। এই অভিশাপের সত্যটি জনগণের মনে গেঁথে দেওয়ার জন্য সম্ভাব্য সকল উপায় অবলম্বন করতে হবে, যতক্ষণ না অবশেষে সমগ্র জাতি এই বিশ্বাসে উপনীত হয় যে, সবকিছু এই সমস্যার সমাধানের উপরই নির্ভর করছে —একটি সুস্থ ভবিষ্যৎ অথবা জাতির পতন।

কেবলমাত্র এই ধরনের প্রস্তুতির পরেই— প্রয়োজনে যা বহু বছর ধরে চলতে পারে —জনসাধারণের মনোযোগ সম্পূর্ণরূপে নিবদ্ধ হবে, এবং কেবল তখনই ভুল বোঝাবুঝির ঝুঁকি কিংবা সাধারণ ইচ্ছার আকস্মিক দুর্বলতা ছাড়াই গুরুতর ও চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হবে । এটা স্পষ্টভাবে বলা আবশ্যক যে, এই অভিশাপের বিরুদ্ধে একটি জোরালো লড়াইয়ের জন্য ব্যাপক ত্যাগ এবং বিপুল পরিমাণ পরিশ্রমের প্রয়োজন ।

সিফিলিসের বিরুদ্ধে লড়াই করার অর্থ হলো বেশ্যাবৃত্তি, কুসংস্কার ও পুরনো অভ্যাসের বিরুদ্ধে লড়াই করা। কামি, বর্তমান ফ্যাশন, জনমত এবং পরিশেষে কিছু মহলের ভণ্ড শুচিবোধ ।

রাষ্ট্র এই সবকিছুর বিরুদ্ধে লড়াই করার নৈতিক অধিকার দাবি করার আগে যে প্রথম মৌলিক শর্তটি অবশ্যই পূরণ করতে হবে, তা হলো পরবর্তী প্রজন্মে বাল্যবিবাহের সুযোগ করে দেওয়া । দেরিতে বিবাহ এমন একটি প্রথাকে বৈধতা দেয় , যা সর্বতোভাবে মানবতার জন্য একটি কলঙ্ক এবং তা - ই থাকবে।

পতিতাবৃত্তি মানবতার জন্য একটি কলঙ্ক এবং দাতব্য বা পাণ্ডিত্যপূর্ণ উপায়ে একে নির্মূল করা সম্ভব নয়। এর হ্রাস এবং চূড়ান্ত নির্মূলের জন্য একগুচ্ছ আনুষঙ্গিক পরিস্থিতি দূর করা অপরিহার্য । প্রথম প্রতিকার অবশ্যই হতে হবে বাল্যবিবাহের সুযোগের মতো শর্ত প্রতিষ্ঠা করা , বিশেষ করে তরুণদের জন্য —যেহেতু এই বিষয়ে নারীরা নিষ্ক্রিয় পক্ষ ।

আজকাল মানুষ যে কতটা ভুল পথে যাচ্ছে তার একটি উদাহরণ হলো এই যে , তথাকথিত "উচ্চবিত্ত" মহলের মায়েদেরকে তাদের মেয়েদের জন্য এমন স্বামী খুঁজে পেয়ে প্রকাশ্যে সন্তুষ্টি প্রকাশ করতে শোনাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, যারা ইতিমধ্যেই উচ্ছৃঙ্খল যৌবনে পা রেখেছে। যেহেতু এই ধরনের পুরুষের অভাব নেই , তাই বেচারি মেয়েরা সানন্দে তাদের বিয়ে করে নেয় , এবং এই ধরনের "বুদ্ধিমত্তার " মিলনের দৃশ্যমান ফল হিসেবে সন্তানের জন্ম হয় ।

ভেবে দেখলে, প্রজনন প্রক্রিয়া বন্ধ করার জন্য সবকিছু করা সত্ত্বেও এবং প্রকৃতিকে তার অধিকার থেকে একগুঁয়েভাবে বঞ্চিত করা সত্ত্বেও , কেবল একটি প্রশ্নই থেকে যায়: বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটি এখনও কেন টিকে আছে, এবং এর কাজগুলো কী ? এটা কি সত্যিই বেশ্যাবৃত্তির চেয়ে ভালো কিছু নয়? ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি আমাদের কর্তব্যের কি আর কোনো ভূমিকা নেই ? অথবা সম্ভবত মানুষ প্রকৃতির অন্যতম মৌলিক একটি নিয়মের প্রতি তাদের অপরাধমূলক নির্বোধ অবজ্ঞার দ্বারা নিজেদের এবং তাদের সন্তানদের উপর যে অভিশাপ ডেকে আনছে , তার স্বরূপ বোঝে না ? এভাবেই সভ্য জাতিগুলো অধঃপতিত হয় এবং ধীরে ধীরে পতন ঘটে।

বিবাহ নিজেই কোনো চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়, বরং এর একটি মহত্তর উদ্দেশ্য থাকতে হবে, আর তা হলো মানব প্রজাতি ও জাতির সম্প্রসারণ এবং বংশবিস্তার। এটাই এর একমাত্র অর্থ ও উদ্দেশ্য।

যদি আমরা এটি স্বীকার করি, তবে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটি তার উদ্দিষ্ট কাজগুলো কতটা ভালোভাবে সম্পন্ন করে, তার ভিত্তিতেই এর বিচার করতে হবে । অতএব, বাল্যবিবাহ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তরুণদের মধ্যে তখনও নির্মল শক্তি থাকে, যা অক্ষত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন সুস্থ সন্তানের উৎস। অবশ্যই, প্রথমে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা ছাড়া এটি সম্ভব নয় । অন্য কথায়, এই সমস্যাটির সমাধান , যা আপাতদৃষ্টিতে একটি ছোট সমস্যা বলে মনে হয়, তা কঠোর ব্যবস্থা প্রয়োগ ছাড়া অর্জন করা সম্ভব নয়। এর গুরুত্ব

এই পদক্ষেপগুলো খতিয়ে দেখা এবং যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা উচিত, বিশেষ করে এমন এক সময়ে যখন তথাকথিত "সামাজিক" প্রজাতন্ত্র আবাসন সমস্যা সমাধানে অক্ষম প্রমাণিত হয়েছে এবং এর ফলে অগণিত দম্পতিকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে বাধা দিয়েছে । এই ধরনের নীতি পতিতাবৃত্তির আরও প্রসারের পথ প্রশস্ত করে ।

বাল্যবিবাহ অসম্ভব হওয়ার আরেকটি কারণ হলো আমাদের মজুরি নিয়ন্ত্রণের অযৌক্তিক পদ্ধতি, যা ভরণপোষণের সমস্যার প্রতি অতি সামান্যই মনোযোগ দেয়।

Machine Translated by Google

পারিবারিক উন্মাদনা। সুতরাং, আমূল সামাজিক সংস্কারের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ সহজ করা হলেই কেবল পতিতাবৃত্তি মোকাবেলা করা সম্ভব হবে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য এটিই প্রথম পূর্বশর্ত।

দ্বিতীয়ত, আমাদের শিক্ষা ও শিশু-পালন ব্যবস্থা থেকে একগুচ্ছ ভ্রান্ত বিশ্বাস দূর করতে হবে —এমন একটি বিষয় যা নিয়ে এখন পর্যন্ত কেউ মাথা ঘামায়নি বলেই মনে হয়। প্রথমত, মানসিক ও শারীরিক বিকাশের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করা প্রয়োজন।

বর্তমানে যা জিমনেসিয়াম নামে পরিচিত, তা গ্রিক প্রতিষ্ঠানটির প্রতি একটি অপমান। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এই সত্যটি পুরোপুরি ভুলে গেছে যে, একটি সুস্থ দেহেই কেবল একটি সুস্থ মনের অস্তিত্ব থাকতে পারে।
কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া এই উক্তিটি বিশেষত জাতির ব্যাপক জনগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

যুদ্ধের আগে জার্মানিতে এই সত্যটি নিয়ে কেউ ভাবেনি। শারীরিক প্রশিক্ষণ চরমভাবে অবহেলিত ছিল এবং মনের একপেশে প্রশিক্ষণকেই জাতীয় মহত্ত্বের যথেষ্ট নিশ্চয়তা বলে মনে করা হতো। এই ভুলের প্রভাব প্রত্যাশার চেয়েও দ্রুত প্রকাশ পাওয়াটা অনিবার্য ছিল। এটা কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয় যে, বলশেভিক মতবাদ সেইসব অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে, যেখানে দুর্ভিক্ষ জনগণকে বিতাড়িত করেছে।
অধঃপতনের দিকে, যেমনটা দেখা যায় মধ্য জার্মানি, স্যাক্সনি এবং রুহর অঞ্চলে। এই অঞ্চলগুলিতে, এই ইহুদি মহামারীর বিরুদ্ধে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকেও কোনো গুরুতর প্রতিরোধের লক্ষণীয় অভাব ছিল। কারণটি সহজ: বুদ্ধিজীবীরা শারীরিকভাবে অধঃপতিত, দারিদ্র্যের কারণে নয়, বরং শিক্ষার কারণে। আমাদের উচ্চবিত্তদের মধ্যে প্রচলিত শিক্ষার বুদ্ধিবৃত্তিকতা তাদেরকে এমন এক যুগে টিকে থাকার জন্য লড়াই করতে অক্ষম করে তোলে, যেখানে মন নয়, শারীরিক শক্তিই প্রধান চালিকাশক্তি। অতএব, তারা টিকে থাকতে অক্ষম। শারীরিক অক্ষমতা প্রায় সবসময়ই কাপুরুষতার পূর্বসূরি।

শুধুমাত্র মানসিক শিক্ষার উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়া এবং শারীরিক প্রশিক্ষণের ধারাবাহিক অবহেলা অল্প বয়সেই যৌন চিন্তার জন্ম দিতে বাধ্য। যেসব ছেলেদের শরীর খেলাধুলা ও জিমন্যাস্টিকসের মাধ্যমে শক্তিশালী হয়েছে, তারা শুধুমাত্র মানসিক পুষ্টি পাওয়া ছেলেদের তুলনায় যৌন বিপদের প্রতি কম সংবেদনশীল। সঠিক শিক্ষা পদ্ধতি এই বিষয়টি উপেক্ষা করতে পারে না, এবং আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে একজন সুস্থ যুবকের নারীর প্রতি প্রত্যাশা, অপরিণত বয়সে বিপথগামী ও দুর্বল এক কিশোরের প্রত্যাশা থেকে ভিন্ন হবে।

সুতরাং, শিক্ষার প্রতিটি শাখায় দৈনন্দিন কার্যসূচি এমন হতে হবে, যাতে ছেলেটির অবসর সময় তার শারীরিক শক্তির কল্যাণকর বিকাশে কাজে লাগে। সে যেন তার যৌবন নষ্ট না করে এবং রাস্তায় ও সিনেমাহলে শান্তি বিঘ্নিত না করে; বরং দৈনন্দিন কাজ শেষ করার পর তার উচিত নিজের তরুণ শরীরকে শক্তিশালী করা, যাতে এই শক্তি কোনো অনুপযুক্ত উপায়ে প্রকাশ না পায়।
আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার কাজ শুধু জ্ঞান বিতরণ করা হওয়া উচিত নয়। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে অবশ্যই এই ধারণা থেকে মুক্ত হতে হবে যে, শরীরচর্চার কাজটি কেবল ব্যক্তির উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত। এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের এবং ফলস্বরূপ মানবজাতির বিরুদ্ধে পাপ করার স্বাধীনতা দিতে পারে না।

শারীরিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি মন বিষায়নের বিরুদ্ধে লড়াইও একযোগে চালাতে হবে। আমাদের আজকের সমগ্র জনজীবনকে একটি গ্রিনহাউসের সাথে তুলনা করা যেতে পারে যেখানে
যৌন চিন্তা ও উত্তেজনা। আমাদের সিনেমা ও থিয়েটারের প্রদর্শনীর দিকে একবার তাকালেই এটা প্রমাণ হয়ে যায় যে, এটি সঠিক পুষ্টি নয়, বিশেষ করে তরুণদের জন্য। বিলবোর্ড ও বিজ্ঞাপনগুলো সবচেয়ে কুরুচিপূর্ণ উপায়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যৌবনের আকাঙ্ক্ষার সাথে যার এখনও পুরোপুরি সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি, তিনি উপলব্ধি করবেন যে এর পরিণতি অবশ্যই খুব গুরুতর।

এই প্রলোভনময় ও ইন্দ্রিয়ঘন পরিবেশ তরুণ-তরুণীদের মনে এমন সব চিন্তাভাবনা গেঁথে দেয়, যা তাদের এই বয়সে অজানাই থাকা উচিত। দুর্ভাগ্যবশত, এই ধরনের শিক্ষার প্রভাব সবচেয়ে ভালোভাবে দেখা যায় আমাদের সমসাময়িক যুবকদের মধ্যে, যারা অপরিণত বয়সে বেড়ে উঠেছে এবং ফলস্বরূপ সময়ের আগেই বুড়ো হয়ে গেছে। আদালত মাঝে মাঝে আমাদের চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়সীদের আধ্যাত্মিক জীবনের উপর এক হতাশাজনক আলোকপাত করে। এই বয়সে তারা যে যৌনরোগের শিকার হবে, তাতে অবাক হওয়ার কী আছে? বড় শহরগুলোতে এত এত শারীরিকভাবে দুর্বল ও মানসিকভাবে বিকৃত তরুণ-তরুণীকে পতিতা নারীদের দ্বারা বিবাহের রহস্যের সাথে পরিচিত হতে দেখাটা কি এক ভয়ানক লজ্জার বিষয় নয়?

Machine Translated by Google

না; যারা পতিতাবৃত্তিকে গুরুত্বের সাথে মোকাবেলা করতে চান , তাদের সর্বাগ্রে এর পেছনের আধ্যাত্মিক ভিত্তিগুলো নির্মূল করতে হবে । এর ফলে যে কোনো ধরনের প্রতিবাদই উঠুক না কেন, তাদের অবশ্যই আমাদের নগরীর 'সংস্কৃতি'র নৈতিক কলুষতাকে নির্মমভাবে নির্মূল করতে হবে।
আমরা যদি তরুণদেরকে তাদের বর্তমান পঙ্কিল অবস্থা থেকে টেনে না তুলি, তবে তারা তাতে ডুবে যাবে । যারা এটা দেখতে চায় না, তারা জেনেশুনেই তাদেরকে উৎসাহিত করছে এবং ভবিষ্যতে পতিতাবৃত্তির প্রভাব ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য দোষী — কারণ ভবিষ্যৎ তরুণ প্রজন্মের। আমাদের "সংস্কৃতি" পরিশুদ্ধ করার প্রক্রিয়াটি কার্যত সকল ক্ষেত্রে সম্পন্ন করতে হবে। মঞ্চ, শিল্পকলা, সাহিত্য, চলচ্চিত্র, সংবাদপত্র, বিজ্ঞাপন—সর্বত্র থেকে দূষণের প্রতিটি চিহ্ন মুছে ফেলতে হবে এবং সাংস্কৃতিক ও জাতীয় আদর্শের সেবায় ব্যবহার করতে হবে । মানবজীবনকে আধুনিক কামোত্তেজনার শ্বাসরুদ্ধকর সুগন্ধ এবং কপটতার প্রতিটি অমানবিক ও রক্ষণশীল রূপ থেকে মুক্ত করতে হবে । এই সমস্ত বিষয়ে, আমাদের জাতীয় স্বাস্থ্য, দেহ ও আত্মার অস্তিত্ব রক্ষার শর্তগুলো সতর্কতার সাথে বিবেচনা করে লক্ষ্য ও পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে । ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার জাতির সুরক্ষার চেয়ে গৌণ ।

এই পদক্ষেপগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করার পরেই একটি চিকিৎসা অভিযান শুরু করা যেতে পারে ।
এই মহামারীর বিরুদ্ধে সাফল্যের আশায় । কিন্তু এখানেও আংশিক পদক্ষেপ নিষ্ফল হবে ।
সুদূরপ্রসারী ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে । একটি আংশিক সমাধান হবে মুমূর্ষু রোগীদের সুস্থ মানুষকে সংক্রমিত করার অনুমতি দেওয়া । মানবিক সমাধান হবে একজন ব্যক্তিকে কষ্ট থেকে বাঁচাতে শত শত মানুষের মৃত্যুকে মেনে নেওয়া। সংক্রামিত ব্যক্তিদের বংশবৃদ্ধি রোধ করার দাবির যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি রয়েছে এবং এর যথাযথ বাস্তবায়নই মানবজাতির সামনে সবচেয়ে মানবিক কাজ। লক্ষ লক্ষ মানুষ দুর্দশা ও অন্যায় দুর্ভোগ থেকে রক্ষা পাবে এবং ফলস্বরূপ, জাতির স্বাস্থ্যের ক্রমান্বয়ে উন্নতি ঘটবে । এইভাবে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন ।

একই সাথে , এটি যৌনরোগের আরও বিস্তার রোধ করবে । যদি সমস্ত মুমূর্ষু রোগীকে নির্মমভাবে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়োজন হয় , তবে তা তাদের কাছে বর্বর মনে হতে পারে, কিন্তু এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ হবে । এই শতাব্দীর সাময়িক যন্ত্রণা হয়তো ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দুর্ভোগ থেকে মুক্তি দেবে ।

সিফিলিস এবং যে বেশ্যাবৃত্তি এর পথ প্রশস্ত করে, তার বিরুদ্ধে লড়াই মানবজাতির অন্যতম মহৎ কর্তব্য ; কারণ এটি কেবল একটি সমস্যার সমাধান নয় , বরং এই মহামারীর জন্য দায়ী বহুবিধ কারণকে নির্মূল করার বিষয় । এক্ষেত্রে শারীরিক অসুস্থতা হলো অস্বাস্থ্যকর নৈতিক, সামাজিক এবং জাতিগত পরিস্থিতিরই ফল মাত্র।

কিন্তু যদি অলসতা বা কাপুরুষতার কারণে এই লড়াইয়ের অবসান ঘটে , তবে আমরা কল্পনা করতে পারি ৫০০ বছর পর পরিস্থিতি কেমন হবে । মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের সঙ্গে সামান্যই সাদৃশ্য অবশিষ্ট থাকবে ।

কিন্তু এই মহামারী মোকাবেলায় জার্মানিতে কী করা হয়েছিল? শান্তভাবে চিন্তা করলে , উত্তরটি হতাশাজনক । যদিও এই মহামারীর ভয়াবহ ক্ষতিকর প্রভাব সরকারি মহলে সুপরিচিত ছিল , আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাগুলো ছিল অকার্যকর এবং চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ। তারা কেবল উপসর্গের চিকিৎসা নিয়ে নাড়াচাড়া করেছিল, কিন্তু মহামারীর মূল কারণগুলোকে পুরোপুরি উপেক্ষা করেছিল। যৌনকর্মীদের পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করা হতো এবং সংক্রমণের লক্ষণ দেখা গেলে তাদের হাসপাতালে পাঠানো হতো। আপাতদৃষ্টিতে সুস্থ হয়ে ওঠার পর তাদের ছেড়ে দেওয়া হতো।

এটা সত্যি যে একটি "সুরক্ষামূলক আইন" চালু করা হয়েছিল, যা যৌনরোগে আক্রান্ত বা পুরোপুরি সুস্থ না হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে যৌন মিলনকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করত। এই আইনটি তত্ত্বে সঠিক ছিল, কিন্তু বাস্তবে এটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। প্রথমত, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, নারীরা তাদের স্বাস্থ্য কেড়ে নেওয়া পুরুষদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসেবে আদালতে হাজির হতে অস্বীকার করত। পুরুষদের তুলনায় নারীরা কটু মন্তব্যের শিকার হওয়ার অনেক বেশি ঝুঁকিতে থাকে , এবং কেউ কল্পনা করতে পারে যে তাদের স্বামীদের দ্বারা সংক্রমিত হলে তাদের অবস্থা কী হতে পারে । এমন ক্ষেত্রে একজন নারীর কি অভিযোগ দায়ের করা উচিত ?

পুরুষদের ক্ষেত্রে আরেকটি কারণ হলো, তারা প্রায়শই মদের প্রভাবে এই মহামারীর শিকার হয়। তখন তারা সেই 'মোহময়ী সৌন্দর্য' ঠিকমতো উপলব্ধি করতে পারে না , যেমনটা প্রত্যেক আক্রান্ত যৌনকর্মী ভালো করেই জানে , আর একারণেই তারা একা থাকতে পছন্দ করে।

Machine Translated by Google

এই অবস্থায় পুরুষেরা থাকে। ফলে, সেই হতভাগ্য লোকটি পরে আর মনে করতে পারে না তার 'পৃষ্ঠপোষিকা' কে ছিল, যা বার্লিন বা মিউনিখের মতো শহরে আশ্চর্যের কিছু নয়। অনেক ক্ষেত্রে, এরা ছিল মফস্বল থেকে আসা পর্যটক, যারা নগর জীবনের জাদুতে মুগ্ধ হয়ে সহজেই যৌনকর্মীদের খপ্পরে পড়ত ।

শেষ পর্যন্ত, কে বলতে পারে যে সে সংক্রমিত হয়েছে কি না?

এমন অসংখ্য ঘটনা কি ঘটেনি যেখানে আপাতদৃষ্টিতে সুস্থ হয়ে ওঠা মানুষ আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছে এবং অজান্তেই মন্দ কাজ করেছে ?

সুতরাং , বাস্তবে এই আইনগত পদক্ষেপগুলোর প্রভাব নেতিবাচকই হয়েছে। একই কথা পতিতাবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ এবং এমনকি চিকিৎসা পদ্ধতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যা বর্তমানে বিপজ্জনক ও প্রশ্নবিদ্ধ। কেবল একটি বিষয়ই নিশ্চিত: সমস্ত পদক্ষেপ সত্ত্বেও এই মহামারী আরও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে , এবং শুধুমাত্র এই একটি ঘটনাই এই পদক্ষেপগুলোকে অকার্যকর বলে বিবেচনা করার জন্য যথেষ্ট ।

গৃহীত অন্যান্য সমস্ত পদক্ষেপ যেমন অযৌক্তিক ছিল, তেমনই অকার্যকরও ছিল।

মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক বেশ্যাবৃত্তির কথা উল্লেখ করা হয়নি এবং এ বিষয়ে কোনো পদক্ষেপও নেওয়া হয়নি।

কিন্তু যারা এই সমস্যাটিকে গুরুতর বলে মনে করেন না, তারা যেন এই মহামারীর বিস্তার ও গত শতাব্দীতে এর বৃদ্ধির পরিসংখ্যান খতিয়ে দেখেন এবং এর ভবিষ্যৎ পরিণতি কী হতে পারে , তা বিবেচনা করেন । সাধারণ পর্যবেক্ষক, যদি না তিনি বিশেষভাবে নির্বোধ হন, পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করলে শিউরে উঠবেন ।

যুদ্ধ-পূর্ব জার্মানিতে এই ঘটনাটির প্রতি যে দুর্বলতা ও দ্বিধা দেখানো হয়েছিল, তাকে স্পষ্টতই জাতীয় অবক্ষয়ের দৃশ্যমান লক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। যখন নিজের স্বাস্থ্যের জন্য লড়াই করার সাহসই আর থাকে না , তখন এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকারও আর থাকে না ।

পুরাতন রাইখের পতনের অন্যতম দৃশ্যমান লক্ষণ ছিল সাংস্কৃতিক মানের ধীর অবনতি। কিন্তু "সংস্কৃতি" বলতে আমি এখনকার সভ্যতাকে বোঝাচ্ছি না , যাকে আবার জীবনের আধ্যাত্মিক মহিমার পরিপন্থী বলে গণ্য করা যেতে পারে ।

গত শতাব্দীর শেষের দিকে আমাদের জগতে একটি নতুন উপাদানের আবির্ভাব ঘটতে শুরু করে। এটি ছিল এমন এক উপাদান যা এ পর্যন্ত আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অজানা ও অপরিচিত ছিল। প্রাচীনকালেও রুচিবোধের বিরুদ্ধে অপরাধ অবশ্যই ছিল ; কিন্তু সেগুলো সাধারণত শিল্পের প্রথাগত নিয়মকানুন থেকে বিচ্যুতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল , এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হয়তো সেগুলোর মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য খুঁজে পেতে পারে। কিন্তু এই নতুন সৃষ্টিগুলো কেবল প্রচলিত রীতির শৈল্পিক বিচ্যুতিই ছিল না; সেগুলো ছিল আধ্যাত্মিকভাবেও অধঃপতিত। আসন্ন পতনের লক্ষণগুলো সর্বপ্রথম শিল্পজগতে দৃশ্যমান হতে শুরু করে।

শিল্পের বলশেভিকীকরণই হলো সাংস্কৃতিক জীবন ও আধ্যাত্মিক প্রকাশের একমাত্র রূপ , যা করতে বলশেভিজম সক্ষম।

এই বক্তব্যটি যার কাছে অদ্ভুত মনে হয়, তার উচিত বলশেভিকীকরণের শিকার হওয়া দেশগুলোর দিকে একবার তাকানো এবং উন্মাদ ও অধঃপতিত মানুষদের দ্বারা সৃষ্ট বীভৎস দানবীয় শিল্পকর্ম দেখে আতঙ্কিত হওয়া । এই শতাব্দীর শুরু থেকেই, কিউবিজম ও ডাডাইজম নামে পরিচিত শৈল্পিক বিচ্যুতিগুলো রাষ্ট্র কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত শিল্পের প্রকাশ হয়ে উঠেছে । বাভারিয়ান সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের স্বল্পস্থায়ী জীবনেও এই ঘটনাটি সুস্পষ্ট ছিল । তখন এটা সহজেই দেখা যেত যে, সমস্ত সরকারি পোস্টার, প্রচারমূলক ছবি এবং সংবাদপত্রগুলোতে কেবল রাজনৈতিক নয়, সাংস্কৃতিক অবক্ষয়েরও লক্ষণ ফুটে উঠত।

আজ থেকে প্রায় ষাট বছর আগে, আমরা বর্তমানে যে রাজনৈতিক অবক্ষয়ের সম্মুখীন হচ্ছি , তা ১৯০০ সাল থেকে কিউবিজম ও ফিউচারিজমে প্রকাশিত সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের মতোই অকল্পনীয় ছিল। ষাট বছর আগে, তথাকথিত দাদাবাদী "অভিজ্ঞতা" নিয়ে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা একটি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ধারণা বলে মনে হতো। এই ধরনের প্রদর্শনীর আয়োজকদের হয়তো কোনো মানসিক হাসপাতালে পাঠানো হতো , অথচ আজ তারা শিল্প সমিতির সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত হন । তাহলে এই মহামারীকে কখনোই ছড়াতে দেওয়া হতো না । জনমত এটি সহ্য করত না, এবং সরকারও নীরব থাকত না; কারণ মানুষকে মানসিক উন্মাদনা থেকে রক্ষা করাই সরকারের কর্তব্য । কিন্তু এই উন্মাদনা এই ধরনের শিল্পের গ্রহণযোগ্যতার ফলেই সৃষ্টি হয়েছে। এটি ছিল মানব ইতিহাসের অন্যতম ভয়াবহ পরিবর্তন ;

Machine Translated by Google

কারণ এর অর্থ ছিল মানব মস্তিষ্কে পশ্চাৎমুখী পরিবর্তনের সূচনা , যার চূড়ান্ত পর্যায় অকল্পনীয় ।

বিগত পঁচিশ বছরে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের গতিপথ পর্যালোচনা করলে আমরা অবাক হব যে, এই পশ্চাদপসরণের প্রক্রিয়ায় আমরা কতটা এগিয়ে এসেছি। সর্বত্রই আমরা এমন জীবাণু দেখতে পাই যা থেকে পরজীবীর জন্ম হয়, যা শীঘ্র বা বিলম্বে আমাদের সংস্কৃতিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে আসবেই। এখানে আমরা ধীর ক্ষয়ের সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখতে পাই; এবং সেই জাতিগুলোর জন্য দুর্ভোগ অপেক্ষা করছে, যারা এই অসুস্থ প্রক্রিয়াগুলোকে রুখতে পারবে না।

জার্মান সংস্কৃতি ও শিল্পের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এই অস্বাস্থ্যকর ঘটনাগুলো লক্ষ্য করা যায় । মনে হচ্ছে , সোনালী দিন শেষ হয়ে গেছে এবং দ্রুত পতন শুরু হয়েছে ।
শতাব্দীর শুরুতে, থিয়েটারগুলো অধঃপতিত হচ্ছিল বলে মনে হচ্ছিল এবং জাতীয় শিল্পের এই কলুষতার বিরোধিতা করা রাজকীয় থিয়েটারগুলো ছাড়া সেগুলো আর সাংস্কৃতিক উপাদান ছিল না ।
এই ব্যতিক্রমগুলো এবং আরও কয়েকটি ভালো প্রতিষ্ঠান ছাড়া, মঞ্চের পরিবেশনাগুলো এমন ছিল যে সেখানে মানুষের একেবারেই না যাওয়াই ভালো ছিল ।
অবক্ষয়ের একটি লক্ষণ ছিল এই যে, অনেক "আর্ট সেন্টার"-এর দরজায় একটি সাইনবোর্ড লাগানো থাকত: "শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য।"

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এই সতর্কতাগুলো এমন প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে গ্রহণ করতে হয়েছিল , যাদের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ছিল তরুণদের শিক্ষা দেওয়া, কেবল পরিশীলিত প্রাপ্তবয়স্কদের বিনোদন দেওয়া নয়। অতীতের মহান নাট্যকাররা এগুলো সম্পর্কে কী বলতেন, এবং সর্বোপরি , যে কারণগুলোর জন্য এগুলো গ্রহণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল, সে সম্পর্কেই বা তাঁরা কী বলতেন? শিলার কতই না বিরক্ত হতেন, আর গোয়েটে কতই না ক্রুদ্ধ হতেন!

কিন্তু নতুন জার্মান কবিতার নায়কদের তুলনায় শিলার, গোয়েটে এবং শেক্সপিয়র কে? তারা জীর্ণ ও সেকেলে, একেবারেই অপ্রচলিত। এটা এমন এক যুগের বৈশিষ্ট্য, যেখানে শুধু ভালো কিছুরই জন্ম হয় না, বরং এই আবর্জনার রচয়িতারা অতীতের সমস্ত সত্যিকারের মহান বিষয়কে কলঙ্কিত করে । এই ঘটনাটি এমন যুগের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কোনো নির্দিষ্ট যুগের মানুষ ও সৃষ্টি যত বেশি জঘন্য ও শোচনীয় হয় , তারা পূর্ববর্তী প্রজন্মের আদর্শ ও অর্জনকে তত বেশি ঘৃণা ও নিন্দা করে । এই লোকেরা সেগুলোকে ধ্বংস করতে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী।

অতীতের সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলা হয় , ফলে তাদের নিজেদের আঁকাআঁকিকে প্রকৃত শিল্পের সাথে তুলনা করার কোনো সম্ভাবনাই অবশিষ্ট থাকে না। তাই, প্রতিটি নতুন যুগের সৃষ্টি যত বেশি করুণ ও শোচনীয় হয় , ততই তা অতীতের সমস্ত স্মৃতিস্তম্ভকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করে। কিন্তু মানবতার কল্যাণে করা প্রতিটি প্রকৃত আবিষ্কার সর্বদা অতীতের শ্রেষ্ঠ কাজের সাথে নিজেকে তুলনা করতে পারে ; এবং প্রায়শই দেখা যায় যে, অতীতের এই স্মৃতিস্তম্ভগুলো স্বীকৃতির দাবিদার হয়ে ওঠে ।

সমসাময়িক সৃষ্টি। এমন কোনো ভয় নেই যে , অতীতের স্মৃতিস্তম্ভের পাশে প্রকৃত মূল্যবান সমসাময়িক সৃষ্টিগুলো ম্লান ও মূল্যহীন দেখাবে । মানব সংস্কৃতির ভান্ডারে যা এক সত্যিকারের সংযোজন, তা প্রায়শই অতীতের কৃতিত্বের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখে , যাতে সমসাময়িক মানুষ এই নতুন উপহারগুলোকে সঠিকভাবে বুঝতে পারে । কেবল তারাই সেই সবকিছুর বিরোধিতা করবে , যা ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে , যাদের পৃথিবীকে দেওয়ার মতো মূল্যবান কিছুই নেই।

এর অস্তিত্ব আছে এবং যেকোনো মূল্যে একে ধ্বংস করুন।

এটা শুধু নতুন সাংস্কৃতিক ঘটনার ক্ষেত্রেই নয়, রাজনৈতিক ঘটনার ক্ষেত্রেও সত্য। নতুন বিপ্লবী আন্দোলনগুলো যত খারাপ হবে , তারা পুরোনো রূপগুলোকে হেয় করার তত বেশি চেষ্টা করবে । এখানেও, নিজেদের সাধারণত্বকে মহান ও মৌলিক কৃতিত্ব হিসেবে উপস্থাপন করার আকাঙ্ক্ষা তাদেরকে অতীতের এবং নিজেদের কাজের চেয়ে উন্নত সবকিছুর প্রতি এক অন্ধ ঘৃণার দিকে চালিত করে। উদাহরণস্বরূপ, যতদিন ফ্রেডরিক দ্য গ্রেটের ঐতিহাসিক স্মৃতি টিকে থাকবে, ততদিন ফ্রেডরিক এবার্ট কেবল দুর্বল প্রশংসাই জাগাতে পারবেন । সাঁ সুসির নায়ক প্রাক্তন ব্রেমেন প্রজাতন্ত্রীদের কাছে ঠিক তেমনই, যেমন চাঁদের কাছে সূর্য ; চাঁদ কেবল সূর্যাস্তের পরেই আলো ছড়াতে পারে । তাই আমরা সহজেই বুঝতে পারি কেন মানব ইতিহাসের সমস্ত নতুন চাঁদ তারাদের ঘৃণা করেছে। রাজনীতিতে, যদি ভাগ্য ক্ষণিকের জন্য এই সাধারণদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেয় , তবে তারা কেবল অতীতকে সযত্নে কলুষিত ও কলঙ্কিতই করবে না , বরং একই সাথে নিজেদের কাজের সমালোচনা এড়ানোর জন্য সবরকম উপায় অবলম্বন করবে। নতুন জার্মানিতে প্রণীত প্রজাতন্ত্র রক্ষার আইনটিকে এই সত্যের একটি উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে ।

Machine Translated by Google

যেকোনো নতুন ধারণা, মতবাদ, দর্শন, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক আন্দোলন, যা অতীতের সমস্ত সৃষ্টিকে অস্বীকার করার বা সেগুলোকে নিকৃষ্ট ও মূল্যহীন হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করে, সে সম্পর্কে সন্দিহান হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে । মানবজাতির অগ্রগতিতে প্রকৃত অর্থে সহায়ক যেকোনো নবায়ন অবশ্যই সেই স্তর থেকে শুরু হতে হবে , যেখানে পূর্ববর্তী কাঠামোর শেষ ভিত্তিপ্রস্তরগুলো স্থাপন করা হয়েছিল । প্রতিষ্ঠিত সত্য ব্যবহার করতে লজ্জিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই ; মানব সংস্কৃতি, স্বয়ং মানবজাতির মতোই, এক দীর্ঘ বিকাশের ফল, যেখানে প্রতিটি প্রজন্ম এই সামগ্রিক কাঠামোতে তাদের নিজস্ব ইট সংযোজন করেছে । বিপ্লবের অর্থ ও উদ্দেশ্য পুরো ইমারতটি ভেঙে ফেলা নয়, বরং যা বেমানান বা অনুপযুক্ত ছিল তা অপসারণ করা , অবশিষ্ট শূন্যস্থান পূরণ করা এবং তারপর সমগ্র কাঠামোটিকে আরও প্রসারিত করা।

কেবল এই পথেই মানব প্রগতির কথা বলা সম্ভব হবে; অন্যথায় বিশ্ব কখনও বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্ত হবে না, কারণ প্রতিটি প্রজন্ম নতুন কাজ শুরু করার জন্য অতীতকে প্রত্যাখ্যান এবং তার সমস্ত অর্জনকে ধ্বংস করাকে একটি অপরিহার্য শর্ত হিসেবে বিবেচনা করবে ।

যুদ্ধের আগে আমাদের সমগ্র সভ্যতা যে অবস্থায় ছিল, তার সবচেয়ে দুঃখজনক বৈশিষ্ট্যটি হলো...
শিল্প ও সংস্কৃতিতে আমাদের সৃজনশীল শক্তির সম্পূর্ণ অবক্ষয় তো ঘটেছিলই, তার সাথে অতীতের মহান সৃষ্টিকর্মগুলোর স্মৃতিকে ঘৃণা করা এবং মুছে ফেলার চেষ্টাও দেখা দিয়েছিল । গত শতাব্দীর শেষে, মানুষ গুরুত্বপূর্ণ নতুন সৃষ্টিকর্ম—বিশেষ করে নাট্যকলা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে—সৃষ্টি করার চেয়ে অতীতের শ্রেষ্ঠ কাজগুলোকে হেয় প্রতিপন্ন করতে এবং সেগুলোকে নিকৃষ্ট ও সেকেলে হিসেবে উপস্থাপন করতে বেশি আগ্রহী ছিল। যেন সেই লজ্জাজনক অবক্ষয়ের যুগে কোনো মহান সৃষ্টি করার ক্ষমতা ছিল!

সমসাময়িক দৃষ্টি থেকে অতীতকে আড়াল করার প্রচেষ্টাগুলোই স্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছিল যে, ভবিষ্যতের এই দূতদের উদ্দেশ্য ছিল অসৎ। এই প্রকাশগুলো পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দিয়েছিল যে, তারা নতুন, যদিও মন্দ, সাংস্কৃতিক ধারণা নিয়ে চিন্তিত ছিল না, বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিল সভ্যতার মূল ভিত্তিকেই দুর্বল করে দেওয়া। পূর্বেকার সুস্থ শৈল্পিক অনুভূতিগুলো সম্পূর্ণরূপে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল, যা রাজনৈতিক বলশেভিজমের জন্য আধ্যাত্মিক পথ প্রস্তুত করেছিল। পেরিক্লিসের যুগের সৃজনশীল চেতনা যদি পার্থেননে প্রকাশিত হয়ে থাকে, তবে বলশেভিজমের যুগ নিজেকে প্রকাশ করেছিল এক কিউবিস্ট বিকট মুখভঙ্গিতে।

এই প্রসঙ্গে , আমাদের জাতির একটি অংশের প্রদর্শিত সাহসিকতার অভাবের দিকে আবারও দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন ; আর তা হলো সেইসব ব্যক্তিরা, যাঁরা তাঁদের শিক্ষা ও অবস্থানের কারণে এই সাংস্কৃতিক কলঙ্কের দৃঢ় বিরোধিতা করতে বাধ্য বোধ করতেন । কিন্তু তাঁরা গুরুতর প্রতিরোধ গড়ে তোলা থেকে বিরত ছিলেন এবং যা তাঁদের কাছে অনিবার্য বলে মনে হয়েছিল, তার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। তাঁদের এই পশ্চাদপসরণ ছিল নিছক কাপুরুষতার ফল – তাঁরা ভয় পেয়েছিলেন যে বলশেভিক দর্শনের প্রচারকরা হয়তো গোলমাল পাকিয়ে ফেলবে ; কারণ যাঁরা স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে, তাঁদের ওপর তারা সর্বদাই নৃশংসভাবে আক্রমণ করে।
তারা তাদের শৈল্পিক স্রষ্টা বলে নিন্দা করত এবং তাদের অমার্জিত ও সংকীর্ণমনা আখ্যা দিয়ে সমস্ত বিরোধিতা দমন করার চেষ্টা করত । লোকেরা ভয়ে কাঁপত যে এই ভণ্ডরা হয়তো তাদের বিরুদ্ধে শিল্পের প্রতি অনুরাগের অভাবের অভিযোগ আনবে , যেন এই বুদ্ধিবৃত্তিক অধঃপতিত ও চরম দস্যুদের সৃষ্টি বুঝতে ও তার প্রশংসা করতে না পারাটা একটা লজ্জার বিষয় । কিন্তু সংস্কৃতির এই দূতদের নিজেদের সৃষ্টিকে সর্বোচ্চ মানের শিল্পকর্ম হিসেবে উপস্থাপন করার একটি অত্যন্ত সহজ উপায় ছিল ।

তারা তাদের সমসাময়িকদের কাছে দুর্বোধ্য এবং সুস্পষ্টভাবে উন্মাদ সৃষ্টিকে তথাকথিত " অন্তঃস্থ অভিজ্ঞতা " হিসেবে উপস্থাপন করতেন। এর মাধ্যমে তারা তাদের বিরোধীদের সমস্ত সমালোচনার পূর্বাভাস দিয়েছিলেন । অবশ্যই, এই ধরনের অন্তঃস্থ অভিজ্ঞতার অস্তিত্ব নিয়ে কেউ কখনও সন্দেহ করেনি , কিন্তু প্রশ্ন ওঠা উচিত যে মানসিক বিকারগ্রস্ত বা দস্যুদের এই ধরনের বিভ্রম বাকি সুস্থ মানুষদের দেখানো উচিত কি না। মরিৎস ফন শভিন্ড বা বকলিনের কাজগুলোও ছিল অন্তঃস্থ অভিজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ , কিন্তু সেগুলো ছিল প্রতিভাবান শিল্পীদের অভিজ্ঞতা, ভাঁড়দের নয়।

এই পরিস্থিতি আমাদের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের করুণ কাপুরুষতা পর্যালোচনার এক উৎকৃষ্ট সুযোগ করে দিয়েছিল, যারা জাতির সুস্থ প্রবৃত্তির বিষপ্রয়োগের বিরুদ্ধে জোরালোভাবে প্রতিরোধ করার কর্তব্য থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছিলেন। এই দুঃসাহসিক মূর্খতার প্রতি জনগণের মনোভাব নির্ধারণের ভার তারা তাদের নিজেদের ওপরই ছেড়ে দিয়েছিলেন। শিল্প সম্পর্কে অজ্ঞ হিসেবে বিবেচিত হওয়া এড়াতে , তারা শিল্পের প্রতিটি ব্যঙ্গচিত্র মেনে নিয়েছিলেন, যতক্ষণ না অবশেষে তারা সুযোগটি হারিয়ে ফেলেন ।

কোনটা সত্যিকারের ভালো আর কোনটা সত্যিকারের মন্দ, তা বিচার করা।

Machine Translated by Google

সামগ্রিকভাবে, বিষাক্ত যুগ শুরু হওয়ার প্রচুর লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল ।

* * *

বিবেচনা করার মতো আরও কিছু গুরুতর লক্ষণ রয়েছে । উনিশ শতকে, আমাদের শহরগুলো সভ্যতার কেন্দ্র হিসেবে তাদের চরিত্র ক্রমশ হারাতে থাকে এবং ক্রমশ বসবাসের কেন্দ্রে পরিণত হয়। আমাদের বড় আধুনিক শহরগুলোতে, শ্রমিকশ্রেণী তাদের বাসস্থানের প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত নয়। এর কারণ হলো , তাদের বাসস্থান আকস্মিক, যা আবার সামাজিক পরিস্থিতির চাপে ঘন ঘন পরিবর্তনের ফল। যে শহরে তারা বাস করে, তার প্রতি অনুরক্ত হওয়ার মতো সময় তাদের থাকে না। কিন্তু আরেকটি কারণ হলো আমাদের আধুনিক শহরগুলোর সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্ব । মুক্তিযুদ্ধের সময়, জার্মান শহরগুলো কেবল জনসংখ্যাতেই ছোট ছিল না, আকারেও খুব সীমিত ছিল। অল্প কয়েকটি সত্যিকারের বড় শহরে রাজপুত্ররা বাস করতেন ; তাই, এই শহরগুলোর প্রায় সবসময়ই একটি নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক মূল্য ছিল। পঞ্চাশ হাজারের বেশি জনসংখ্যাবিশিষ্ট সেই অল্প কয়েকটি শহর , একই আকারের সমসাময়িক শহরগুলোর তুলনায়, বৈজ্ঞানিক ও শৈল্পিক সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল । যখন মিউনিখের জনসংখ্যা ষাট হাজারের বেশি ছিল না , তখন থেকেই এটি জার্মান শিল্পের অন্যতম প্রথম কেন্দ্র হয়ে ওঠার পথে ছিল। এখন, প্রায় প্রতিটি শিল্প শহরেই বাস্তব কোনো ভিত্তি ছাড়াই এত বিপুল সংখ্যক বাসিন্দা রয়েছে । এগুলো হলো বস্তিঘর আর ঘিঞ্জি আবাসনের সমষ্টি, এর বেশি কিছু নয় । এমন একটি অর্থহীন জায়গার প্রতি কারও আকৃষ্ট হওয়াটা এক অলৌকিক ঘটনাই বটে । এমন একটি জায়গার প্রতি কেউই আকৃষ্ট হতে পারে না , যা অন্য যেকোনো জায়গার মতোই সামান্য কিছু দেয় , যার নিজস্ব কোনো বৈশিষ্ট্য নেই , এবং যেখানে শিল্পের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ যেকোনো কিছুকে সযত্নে এড়িয়ে চলা হয় ।

কিন্তু এটাই সব ছিল না। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বড় শহরগুলোও প্রকৃত শিল্পকর্ম থেকে ক্রমশ বঞ্চিত হতে লাগল। তারা ক্রমশ এক নিরপেক্ষ মনোভাব গ্রহণ করল।
পরিবেশটি ছোট কারখানার শহরগুলোর মতোই ছিল এবং বৃহত্তর পরিসরে একই চিত্র তুলে ধরেছিল । আমাদের আধুনিক যুগ আমাদের বড় শহরগুলোর সভ্যতায় যা কিছু অবদান রেখেছে, তা একেবারেই অপর্যাপ্ত। সমস্ত শহর অতীতের গৌরব ও সম্পদের উপর টিকে থাকে । যদি আমরা আধুনিক মিউনিখ থেকে দ্বিতীয় লুডভিগের আমলে তৈরি সবকিছু সরিয়ে নিই, তবে শৈল্পিক সৃষ্টির প্রভাব কতটা নগণ্য ছিল তা দেখে আমরা আতঙ্কিত হব।

সেই সময়ে। বার্লিন এবং আমাদের বেশিরভাগ অন্যান্য বড় শহরগুলোর ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায় ।

নিম্নলিখিত বিষয়টি লক্ষ্য করা অপরিহার্য : আমাদের আধুনিক বৃহৎ শহরগুলিতে এমন কোনো বিশিষ্ট স্মৃতিস্তম্ভের অভাব রয়েছে যা একটি সম্পূর্ণ যুগের প্রতীক হয়ে শহরকে প্রভাবিত করে। প্রায় প্রতিটি প্রাচীন শহরের গৌরবে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয়েছে। প্রাচীন শহরগুলির স্বতন্ত্র শিল্পকলা ব্যক্তিগত ভবনে নয়, বরং সর্বজনীন স্মৃতিস্তম্ভে প্রকাশিত হয়েছিল, যা ক্ষণিকের জন্য নয় , বরং অনন্তকালের জন্য নির্মিত হয়েছিল। এর কারণ ছিল, সেগুলি কোনো একক নাগরিকের সম্পদকে নয়, বরং সম্প্রদায়ের মহিমা ও গুরুত্বকে তুলে ধরত। এই অনুপ্রেরণা থেকেই এমন স্মৃতিস্তম্ভের জন্ম হয়েছিল যা প্রত্যেক নাগরিককে তাদের শহরের সাথে এমনভাবে সংযুক্ত করেছিল, যা আজকের দিনে আমাদের কাছে প্রায়শই অবোধ্য। সাধারণ ব্যক্তিগত ভবন নয়, বরং সমগ্র সম্প্রদায়ের অন্তর্গত চিত্তাকর্ষক স্থাপত্যই সাধারণ নাগরিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করত । এর বিপরীতে , ব্যক্তিগত ভবনগুলির গুরুত্ব ছিল গৌণ ।

যখন আমরা এই প্রাচীন সরকারি ভবনগুলোর আকারের সাথে তুলনা করি
একই যুগের ব্যক্তিগত ভবনগুলো থেকে আমরা এর বিরাট গুরুত্ব বুঝতে পারি ।
এই নীতিই বহাল থাকবে যে, যেসব কাজ সমাজের জীবনকে প্রতিফলিত করে ও প্রভাবিত করে, সেগুলো অন্য সবকিছুর চেয়ে অগ্রাধিকার পাবে ।

প্রাচীন বিশ্বের ধ্বংসাবশেষে ঢাকা ভাঙা খিলান ও বিশাল প্রান্তরের মাঝে , যে বিপুল ঐশ্বর্য আজও আমাদের মুগ্ধ করে, তা আমাদের জন্য অবশিষ্ট থাকেনি।

Machine Translated by Google

তৎকালীন বাণিজ্যিক প্রাসাদগুলোর মাধ্যমে নয়, বরং দেবতাদের মন্দির এবং রাষ্ট্রের মালিকানাধীন সরকারি ভবনগুলোর মাধ্যমেই এর গুরুত্ব নির্ধারিত হতো। এই বিশাল অট্টালিকাগুলোর মালিক ছিল সমগ্র সমাজ । এমনকি রোমের অবক্ষয়ের যুগেও, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো দখল করেছিল ভিলা ও প্রাসাদগুলো নয়, বরং মন্দির , স্নানাগার, স্টেডিয়াম, সার্কাস, জলপ্রণালী, ব্যাসিলিকা ইত্যাদি, যেগুলো রাষ্ট্রের এবং ফলস্বরূপ সমগ্র জাতির মালিকানাধীন ছিল ।

মধ্যযুগীয় জার্মানিতে এই নীতিটির প্রয়োগ অব্যাহত ছিল, যদিও শৈল্পিক ধারণাটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রাচীনকালে যা অ্যাক্রোপলিস বা প্যান্থিয়নে প্রকাশ পেত, তা এখন গথিক ক্যাথেড্রালের রূপে মূর্ত হয়েছিল । মধ্যযুগীয় শহরগুলিতে, এই স্মারক স্থাপত্যগুলো কাঠ ও ইটের তৈরি অসংখ্য ছোট ছোট ভবনকে ম্লান করে দিত । এবং আজও এগুলো এই শহরগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে রয়ে গেছে, যদিও আবাসিক ভবনগুলির আড়ালে ক্রমশ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। এগুলো কোনো একটি স্থানের চরিত্র ও চেহারা নির্ধারণ করে। ক্যাথেড্রাল, টাউন হল, শস্য বিনিময় কেন্দ্র এবং প্রতিরক্ষা মিনার হলো এমন একটি ধারণার বাহ্যিক প্রকাশ , যার প্রতিরূপ কেবল প্রাচীন বিশ্বেই পাওয়া যায়।

আমাদের বর্তমান সরকারি ভবনগুলোর আকার ও গুণমান ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ভবনগুলোর তুলনায় শোচনীয়ভাবে কম । বার্লিনের ভাগ্য যদি রোমের মতো হয়, তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হয়তো ইহুদিদের ডিপার্টমেন্ট স্টোর ও কর্পোরেট হোটেলগুলোর ধ্বংসাবশেষকে আমাদের সময়ের সংস্কৃতির প্রতীকী উদাহরণ হিসেবে দেখবে।

খোদ বার্লিন শহরেই রাইখের মালিকানাধীন ভবন এবং বাণিজ্য ও অর্থায়নের মাধ্যমে নির্মিত ভবনগুলোর মধ্যে একটি লজ্জাজনক অসামঞ্জস্য রয়েছে ।

সরকারি ভবন নির্মাণের জন্য বরাদ্দ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অপর্যাপ্ত এবং রীতিমতো হাস্যকর। এগুলো দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয় না, বরং শুধুমাত্র প্রয়োজনের তাগিদেই নির্মাণ করা হয়। যারা এই ভবনগুলো নির্মাণের নির্দেশ দেন, কোনো মহৎ আদর্শ তাদের প্রভাবিত করে না ।

যখন বার্লিন দুর্গ নির্মিত হয়েছিল, তখন এর তাৎপর্য আজকের নতুন গ্রন্থাগারের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। একটিমাত্র যুদ্ধজাহাজের দাম ষাট মিলিয়ন মার্ক, অথচ রাইখস্ট্যাগের জন্য তার অর্ধেকেরও কম অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল; অথচ রাইখস্ট্যাগ হলো রাইখের জন্য নির্মিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভবন এবং এটি এমনভাবে তৈরি করা উচিত ছিল যেন তা শত শত বছর টিকে থাকে । অভ্যন্তরীণ সজ্জার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় , উচ্চকক্ষ পাথর ব্যবহারের বিরুদ্ধে ভোট দেয় এবং সিদ্ধান্ত নেয় যে দেয়ালগুলো প্লাস্টার দিয়ে ঢেকে দেওয়া হবে । এবার সংসদ সদস্যরা সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন : পাথরের দেয়ালের মধ্যে প্লাস্টারের তৈরি মাথা বেমানান লাগত ।

সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীসমাজের ধারণাটি আমাদের সমসাময়িক শহরগুলোর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য নয় , তাই স্থাপত্যে এর প্রতিফলন না থাকাটা আশ্চর্যের কিছু নয়। পরিশেষে, আমরা এক সত্যিকারের নগর-মরুভূমিতে উপনীত হব , যা দেশের প্রতি নাগরিকের সম্পূর্ণ উদাসীনতার মধ্যে প্রতিফলিত হয়।

এটাও সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ও সার্বিক পতনের একটি লক্ষণ। আমাদের এই সময়টা পুরোপুরি অর্থসেবায় নিমগ্ন । তাই এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, এমন প্রতিমার আরাধনা করতে গিয়ে বীরত্বের অনুভূতি পুরোপুরি উধাও হয়ে যায়। কিন্তু অতীত যা বপন করেছে, বর্তমান কেবল তারই ফল ভোগ করে ।

* * *

দ্বিতীয় রাইখের চূড়ান্ত পতনের পূর্বে দেখা দেওয়া এই সমস্ত লক্ষণ অবশ্যই এর কারণ হিসেবে একটি সুনিশ্চিত ও সর্বজনস্বীকৃত বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির অভাব এবং এই অভাব থেকে উদ্ভূত সাধারণ অনিশ্চয়তাকে দায়ী করা হয়। যখন বড় কোনো সমস্যার সমাধান এবং সুনিশ্চিত পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন পড়ত , তখন এই অনিশ্চয়তা প্রকট হয়ে উঠত । শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শুরু করে দায় এড়ানোর প্রবণতা, দায়িত্ব গ্রহণে অনীহা এবং অশুভকে কাপুরুষের মতো সহ্য করার মতো অর্ধ-পদক্ষেপ গ্রহণের অভ্যাসের জন্যও এই অভাব দায়ী , এমনকি যখন এটা স্বীকার করা হয়েছিল যে এর ধ্বংসাত্মক পরিণতি রয়েছে । দূরদর্শী মানবতাবাদ ফ্যাশনে পরিণত হয়েছিল । এইসব বিচ্যুতির কাছে নতি স্বীকার করে এবং ব্যক্তিবিশেষের অনুভূতিকে রেহাই দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের ভবিষ্যৎকে বলি দেওয়া হয়েছিল ।

Machine Translated by Google

যুদ্ধের পূর্ববর্তী ধর্মীয় পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে , বিভাজনের সাধারণ প্রক্রিয়াটি এই ক্ষেত্রেও বিস্তৃত ছিল । জাতির একটি বৃহৎ অংশের জীবন সম্পর্কে কোনো সুসংহত ও বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি বহু আগেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল । এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল ধর্মত্যাগী মানুষের সংখ্যা নয় , বরং ব্যাপক উদাসীনতা। খ্রিস্টধর্মের দুটি শাখা যখন নতুন ধর্মান্তরিতদের আকৃষ্ট করার জন্য এশিয়া ও আফ্রিকায় ধর্মপ্রচার কেন্দ্র পরিচালনা করছিল, তখন সেই শাখাগুলোই ইউরোপে লক্ষ লক্ষ অনুসারী হারাচ্ছিল। তাদের প্রাক্তন অনুসারীরা হয় ধর্মকে তাদের জীবনের চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করা বন্ধ করে দিয়েছিল, অথবা এর নিজস্ব ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছিল । এর পরিণতি বিশেষ করে জাতির নৈতিক জীবনে অনুভূত হয়েছিল । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে , বিদেশে ধর্মপ্রচার কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে খ্রিস্টধর্মের প্রসারে যে অগ্রগতি হয়েছিল , তা ইসলামের বিকাশের তুলনায় খুবই নগণ্য ছিল।

এ বিষয়টিও অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে যে, গির্জার শিক্ষার অন্তর্নিহিত মতবাদগত নীতিগুলোর ওপর আক্রমণ ক্রমাগত গতি লাভ করছে। ধর্মীয় বিশ্বাসের অস্তিত্ব ছাড়া আমাদের এই জগৎ অকল্পনীয় । দেশের বিশাল জনগোষ্ঠী দার্শনিক নন । তাদের জন্য, বিশ্বাসই কার্যত একটি নৈতিক বিশ্বদৃষ্টির একমাত্র ভিত্তি । বিভিন্ন প্রস্তাবিত বিকল্প বাস্তবে এমন কোনো ফল দিতে পারেনি যা সেগুলোকে বিদ্যমান ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর কার্যকর বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করার সুযোগ দেবে । কিন্তু যদি ধর্মীয় শিক্ষা ও বিশ্বাস একবার ব্যাপক জনগণের দ্বারা তাদের জীবনের প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে গৃহীত হয়, তবে বিশ্বাসের মতবাদের পরম কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হবে।

সকল বাস্তব প্রচেষ্টার ভিত্তি । এমন কয়েক লক্ষ মানুষ থাকতে পারেন যারা দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ মানদণ্ডের ওপর নির্ভর না করে প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে জীবনযাপন করতে পারেন , কিন্তু অন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ তা পারেন না। দৈনন্দিন জীবনের প্রথাগুলো রাষ্ট্রের আইন এবং ধর্মের গোঁড়া মতবাদের মতোই ভূমিকা পালন করে । একটি বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক ধারণা পরিবর্তনযোগ্য এবং এর অগণিত ব্যাখ্যা হতে পারে । শুধুমাত্র গোঁড়া মতবাদের মাধ্যমেই এটিকে একটি সুনির্দিষ্ট ও বাস্তব অর্থ প্রদান করা হয় ।

এমন একটি রূপ যা ছাড়া এটি একটি জীবন্ত বিশ্বাসে পরিণত হতে পারত না। অন্যথায়, আধ্যাত্মিক ধারণাটি কখনোই পূর্ণতা পেত না। এটি একটি অধিভৌতিক ধারণা, বা বলা ভালো, একটি দার্শনিক মতামত ছাড়া আর কিছুই নয় । তদনুসারে, মতবাদের উপর আক্রমণ রাষ্ট্রের ভিত্তিস্বরূপ আইনগুলোর উপর আক্রমণের সমতুল্য । এবং যদি এই ধরনের আক্রমণ সফল হয়, তবে এর চূড়ান্ত পরিণতি হবে পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক নৈরাজ্য; একইভাবে, ধর্মের উপর আক্রমণ একটি মূল্যহীন ধর্মীয় শূন্যতাবাদের জন্ম দেবে ।

একজন রাজনৈতিক নেতার উচিত নয় কোনো ধর্মের ত্রুটিবিচ্যুতি দিয়ে তার মূল্য বিচার করা , বরং তাঁর ভাবা উচিত তিনি এর চেয়ে ভালো কোনো বিকল্প খুঁজে পান কি না । যতক্ষণ না সেরকম কোনো বিকল্প পাওয়া যাচ্ছে , ততক্ষণ পর্যন্ত কেবল একজন বোকা ও দুর্বৃত্তই প্রচলিত কোনো ধর্মকে উৎখাত করার কথা চিন্তা করবে ।

নিঃসন্দেহে, বর্তমান অসন্তোষজনক ধর্মীয় পরিস্থিতির জন্য অনেকাংশেই দায়ভার তাদের ওপরই বর্তায় ।
এর জন্য দায়ী তারাই, যারা ধর্মীয় আদর্শকে নিছক জাগতিক বিষয় দিয়ে ভারাক্রান্ত করেছে এবং এর মাধ্যমে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ নিষ্ফল সংঘাতের সূচনা করেছে। এই সংঘাতে বিজয় প্রায় সবসময়ই বিজ্ঞানের পক্ষে যাবে, আর যারা বিজ্ঞানের উপরিভাগের চেয়ে গভীরে প্রবেশ করতে পারে না, তাদের চোখে ধর্ম মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

কিন্তু সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয় রাজনৈতিক ও
এইসব দুঃসাহসী ও মুখরা মিথ্যাবাদীরা, যারা সমগ্র বিশ্বের সামনে সকল সাধারণ মানুষের শোনার জন্য বজ্রকণ্ঠে এই বিশ্বাসের ঘোষণা দেয়, তারা প্রয়োজনে এর জন্য মরতেও রাজি নয় , কিন্তু তারা আরও ভালোভাবে বাঁচতে চায় । তারা তাদের সবকিছু বিক্রি করে দিতেও প্রস্তুত।
রাজনৈতিক লাভের জন্য ধর্মবিশ্বাস । দশটি সংসদীয় আসনের জন্য তারা মার্ক্সবাদীদের সাথে মিত্রতা করবে , যারা সকল ধর্মের ঘোর শত্রু। আর সরকারে একটি আসনের জন্য তারা বিয়ে করবে।
এমনকি শয়তানের সাথেও, যদি না তার মধ্যে শালীনতার কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে।
যুদ্ধ-পূর্ব জার্মানিতে বহু মানুষের ধর্মীয় জীবনের প্রতি যে বিমুখতা ছিল , তার কারণ হিসেবে তথাকথিত "খ্রিস্টান" দলটির করা ভুল এবং ক্যাথলিক ধর্মকে একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে এক করে দেখার তাদের নির্লজ্জ প্রচেষ্টাকেই দায়ী করতে হবে।

এই ভুয়া জোটটি ছিল বিপর্যয়কর। এটি এই দলগুলোকে কয়েকটি মূল্যহীন সংসদীয় আসন এনে দিলেও, চার্চ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

Machine Translated by Google

এই পরিস্থিতির পরিণতি সমগ্র জাতিকেই ভোগ করতে হয়েছিল ; ধর্মীয় জীবনে এই উচ্ছৃঙ্খলতা এমন এক সময়ে ঘটেছিল যখন সবকিছু ভেঙে পড়তে শুরু করেছিল এবং যখন নৈতিকতা ও নীতিশাস্ত্রের চিরাচরিত ভিত্তিগুলো ধ্বংসের হুমকিতে ছিল।

তথাপি আমাদের সামাজিক কাঠামোর এই ফাটল ও চিড়গুলোও হয়তো বিপজ্জনক হতো না, যদি এর ওপর গুরুতর বোঝা চাপানো না হতো ; কিন্তু সেগুলো ভয়াবহ হয়ে উঠল যখন আসন্ন ঘটনাবলীর ঝঞ্ঝা মোকাবেলায় জাতির অভ্যন্তরীণ সংহতিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়াল।

* * *

রাইখের রাজনৈতিক জীবন কিছু নির্দিষ্ট অসঙ্গতি দ্বারাও চিহ্নিত ছিল, যা সময়মতো যথাযথ পরিবর্তন বা সংশোধন না করা হলে বিপর্যয়ের পূর্বাভাস দিচ্ছিল । জার্মান অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির দিকনির্দেশনার অভাব যে কোনো অন্ধ ব্যক্তির কাছে স্পষ্ট ছিল । আপোস সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো যা বলা যায়, তা বিসমার্কের এই উক্তির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে হয় যে, "রাজনীতি হলো যা সম্ভব, তাকে সম্ভব করে তোলার শিল্প ।" কিন্তু বিসমার্ক তাঁর পরবর্তী চ্যান্সেলরদের থেকে কিছুটা ভিন্ন মানুষ ছিলেন । এই ভিন্নতাই পূর্বোক্ত ব্যক্তিকে এই সূত্রটিকে তাঁর নীতির সারমর্ম হিসেবে ব্যবহার করার সুযোগ করে দিয়েছিল, যেখানে অন্যদের মুখে এর অর্থ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিসমার্ক বোঝাতে চেয়েছিলেন যে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য , সমস্ত উপলব্ধ উপায় ব্যবহার করা উচিত , বা অন্তত চেষ্টা করা উচিত । কিন্তু তাঁর উত্তরসূরিরা এই বাক্যটিকে কেবল একটি ঘোষণা হিসেবে দেখতেন যে, রাজনৈতিক নীতির প্রয়োজন নেই, বরং নির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্যের প্রয়োজন। আবারও, তাদের প্রয়োজনীয় ভিত্তির অভাব ছিল – অর্থাৎ, একটি নির্দিষ্ট বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি – এবং রাজনৈতিক বিবর্তনের নিয়ম সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণার অভাব ছিল, যা একজন রাজনৈতিক নেতার জন্য একটি অপরিহার্য দক্ষতা ।

তৎকালীন সময়ে অনেকেই বিষয়টিকে নেতিবাচকভাবে দেখেছিলেন এবং রাইখের নীতিতে সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান ধারণা ও দিকনির্দেশনার অভাবের নিন্দা করেছিলেন। তারা এই নীতিগুলোর দুর্বলতা ও অর্থহীনতা বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু রাজনীতিতে এমন মানুষেরা কেবল গৌণ ভূমিকাই পালন করতেন। যারা দেশ শাসন করতেন, তারা হিউস্টন স্টুয়ার্ট চেম্বারলেইনের মতো চিন্তাবিদদের দ্বারা নির্ধারিত সামাজিক প্রজ্ঞার নীতিগুলোর প্রতি আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক নেতাদের মতোই উদাসীন ছিলেন। তারা নিজেরা চিন্তা করার জন্য এতটাই নির্বোধ ছিলেন এবং অন্যদের নির্দেশ গ্রহণ করার জন্য এতটাই অহংকারী ছিলেন। অক্সেনস্টিয়ার্না১৪) শাশ্বতকে প্রকাশ করেছেন
তিনি সত্যই বলেছিলেন যে , এই পৃথিবী কেবল এক কণা প্রজ্ঞা দ্বারাই পরিচালিত হয়। প্রায় প্রত্যেক সরকারি কর্মকর্তারই এই কণার একটি পরমাণু থাকা উচিত । কিন্তু জার্মানি প্রজাতন্ত্র হওয়ার পর থেকে সেই সামান্য অংশটুকুও অনুপস্থিত। তাই, তাদের ‘ প্রজাতন্ত্র সুরক্ষা আইন’ জারি করতে হয়েছিল, যা এই ধরনের মতামত পোষণ ও প্রকাশকে নিষিদ্ধ করে । অক্সেনস্টিয়ার্না ভাগ্যবান ছিলেন যে তিনি সেই সময়ে বাস করতেন, আমাদের এই আধুনিক, প্রজ্ঞাময় প্রজাতন্ত্রে নয়।

যুদ্ধের আগেও, যে প্রতিষ্ঠানটির রাইখের শক্তির প্রতীক হওয়ার কথা ছিল—রাইখস্ট্যাগ—সেটিকে সাধারণত এর সবচেয়ে দুর্বল সংযোগস্থল হিসেবে বিবেচনা করা হতো। সেখানে কাপুরুষতা এবং দায়িত্বের ভয় নিখুঁতভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল ।

আজকাল প্রায়শই যে অবিবেচনাপ্রসূত মন্তব্যটি করা হয় তা হলো, জার্মানির সংসদীয় ব্যবস্থা " বিপ্লবের পর থেকে আর কাজ করছে না।" এর থেকে কেউ হয়তো ধরে নিতে পারেন যে বিপ্লবের আগে পরিস্থিতি ভিন্ন ছিল। বাস্তবে, এই প্রতিষ্ঠানটি সবসময় কেবল দেশের জন্য ধ্বংসাত্মক উপায়েই কাজ করেছে। এবং এটি ঠিক ততটাই কার্যকরভাবে কাজ করেছে যখন অধিকাংশ মানুষ কিছুই দেখত না, বা বলা ভালো, কিছুই চাইত না। জার্মানির পতনের জন্য এই প্রতিষ্ঠানটিকে অনেকাংশেই দায়ী করা উচিত। এই বিপর্যয় যে আরও আগে ঘটেনি , তার কারণ সংসদ নয়, বরং তারাই যারা এই প্রতিষ্ঠানের প্রভাবের বিরোধিতা করেছিল; যে প্রতিষ্ঠানটি শান্তিকালীন সময়ে জার্মান জাতি এবং জার্মান রাইখের কবর খুঁড়ছিল।

সংসদের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত বিপুল পরিমাণ ধ্বংসাত্মক অশুভ শক্তির মধ্য থেকে আমি কেবল একটি উদাহরণ বেছে নিয়েছি, যা এই দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রতিষ্ঠানটির সবচেয়ে সাধারণ একটি রূপ। আমি রাইখের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে ভয়াবহ দুর্বলতা এবং সিদ্ধান্তহীনতার কথা বলছি। এর জন্য প্রধানত রাইখস্ট্যাগের কার্যকলাপকেই দায়ী করা যায় , যা ছিল রাজনৈতিক পরাজয়ের অন্যতম মৌলিক কারণ ।

Machine Translated by Google

সংসদের প্রভাবাধীন প্রতিটি কাজই দায়সারাভাবে করা হতো, কারণ যাই হোক না কেন।
এটির দিকে তাকানোর জন্য একটি বিন্দু।

মিত্রজোটের বিষয়ে রাইখের পররাষ্ট্রনীতি ছিল সিদ্ধান্তহীনতার একটি উদাহরণ।
তারা শান্তি বজায় রাখতে চেয়েছিল , কিন্তু তা করতে গিয়ে তারা সরাসরি যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল ।

পোল্যান্ডের প্রতি নীতিটিও দায়সারাভাবে পরিচালিত হয়েছিল। ফলে, কোনোটিই...
জার্মানরা জেতেনি , পোলরাও সন্তুষ্ট ছিল না, কেবল রাশিয়া বৈরী হয়ে উঠল।

তারা আংশিক সমাধানের মাধ্যমে আলসাস-লোরেন সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিল। ফরাসি বহুরূপী দানবের মস্তক চিরতরে ছেদন করে আলসাস-লোরেনকে অন্যান্য জার্মান রাজ্যগুলোর সমান অধিকার দেওয়ার পরিবর্তে, তারা এর কোনোটিই করেনি। কিন্তু যখন তাদের দলেই সেন্টার পার্টির হের ভেটারলের মতো দেশের সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকরা ছিল, তখন তারা তা করতে পারেনি ।

তবে, গৃহীত নীতির শিকার হলে দেশটি এই সবকিছুর সাথে মানিয়ে নিতে পারত।
কোনো প্রকার আংশিক পদক্ষেপ ছাড়া , যে শক্তির ওপর রাইখের অস্তিত্ব নির্ভর করত —অর্থাৎ সেনাবাহিনী—তার পতন ঘটেনি।

এই বিষয়ে তথাকথিত জার্মান রাইখস্ট্যাগ যে অপরাধ করেছে, তা জার্মান জাতির জন্য একে চিরতরে অভিশাপ দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। সামান্যতম অজুহাতে, সংসদীয় দালালরা জাতি থেকে চুরি করেছে এবং এর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য, এবং ফলস্বরূপ আমাদের জাতির স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য অপরিহার্য অস্ত্রশস্ত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে । ফ্ল্যান্ডার্সের মাঠের কবরগুলো যদি এখনও খোলা থাকত, তবে সেখান থেকে উঠে আসত রক্তরঞ্জিত অভিযোগকারীরা—লক্ষ লক্ষ সেরা জার্মান তরুণ, যাদের বিবেকহীন সংসদীয় ডাকাতরা মৃত্যুর কোলে ঠেলে দিয়েছিল , যারা তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য অপ্রস্তুত ছিল, বা হয়তো আংশিকভাবে প্রস্তুত ছিল। এই তরুণদের, এবং নিহত ও পঙ্গু হওয়া আরও লক্ষ লক্ষ মানুষকে, শুধুমাত্র এই কারণে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল যাতে কয়েকশ প্রতারক তাদের রাজনৈতিক কূটকৌশল চালিয়ে যেতে পারে এবং তাদের মতাদর্শগত তত্ত্বকে এগিয়ে নিতে পারে।

মার্ক্সবাদী ও গণতান্ত্রিক সংবাদপত্রের মাধ্যমে ইহুদিরা সারা বিশ্বে "জার্মান সামরিকবাদ"-এর বিরাট মিথ্যা ছড়িয়েছিল এবং সম্ভাব্য সব উপায়ে জার্মানির উপর দোষ চাপানোর চেষ্টা করেছিল , অথচ একই সময়ে মার্ক্সবাদী ও গণতান্ত্রিক দলগুলো আমাদের জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর যথাযথ প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলোতে সম্মত হতে অস্বীকার করেছিল। এই লোকগুলোর দ্বারা সংঘটিত ভয়াবহ অপরাধ যে কারো কাছেই স্পষ্ট হওয়া উচিত ছিল, যিনি আগে থেকেই অনুমান করতে পেরেছিলেন যে যুদ্ধের ক্ষেত্রে সমগ্র জাতিকে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে হবে এবং এই সম্মানিত "নির্বাচিত জাতি" (যেমনটা তারা নিজেদের বলত) -দের ধূর্ততার কারণে লক্ষ লক্ষ জার্মানকে অপ্রস্তুত ও অপর্যাপ্তভাবে প্রশিক্ষিত হয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে । কিন্তু এই সংসদীয় বদমাশদের প্রদর্শিত আদিম ও পাশবিক বিবেকহীনতার প্রভাব ছাড়াও এটা বেশ স্পষ্ট ছিল যে যুদ্ধের শুরুতে সুপ্রশিক্ষিত সৈন্যের অভাব অনিবার্যভাবে এর পরাজয়ের দিকে নিয়ে যাবে; এবং এই সম্ভাবনাটি বিশ্বযুদ্ধের সময় সবচেয়ে ভয়াবহভাবে প্রমাণিত হয়েছিল ।

সুতরাং, শান্তিকালীন সময়ে দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সংগঠন ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অনুসৃত কাপুরুষোচিত ও ভ্রান্ত নীতির কারণে জার্মান জনগণ তাদের দেশের স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে পরাজিত হয়েছিল ।

* * *

স্থলবাহিনীতে প্রশিক্ষিত নতুন সৈন্যের সংখ্যা ছিল খুবই কম; কিন্তু একই সিদ্ধান্তহীনতা নৌবাহিনীতেও প্রকাশ পেয়েছিল এবং জাতীয় আত্মরক্ষার এই অস্ত্রটিকে অকার্যকর করে তুলেছিল। দুর্ভাগ্যবশত, এমনকি নৌ কর্তৃপক্ষও এই সিদ্ধান্তহীনতার মনোভাব দ্বারা প্রভাবিত ছিল। ব্রিটিশদের দ্বারা সদ্য চালু করা জাহাজগুলোর চেয়ে সামান্য ছোট জাহাজ তৈরির প্রবণতাটি দূরদর্শী বা বুদ্ধিদীপ্ত কোনোটিই ছিল না। যে নৌবাহিনীর থাকতে পারে না

সম্ভাব্য শত্রু নৌবহরের সমান আকারের একটি নৌবহরকে অবশ্যই একটিমাত্র জাহাজের উন্নততর যুদ্ধশক্তি দিয়ে এই ঘাটতি পূরণ করতে হবে। এখানে যুদ্ধশক্তিই আসল, কোনো ধরনের প্রচলিত 'দক্ষতা' নয়। বর্তমানে, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এতটাই এগিয়েছে এবং সকল সভ্য দেশের মধ্যে এতটাই সুষমভাবে বণ্টিত হয়েছে যে, কোনো একটি দেশের পক্ষে এমন জাহাজ নির্মাণ করা কার্যত অসম্ভব , যার যুদ্ধশক্তি শত্রুপক্ষের জাহাজের চেয়ে বেশি হবে ।

Machine Translated by Google

একই আকারের অন্য কোনো দেশের। কিন্তু বড় জাহাজের চেয়ে বেশি যুদ্ধশক্তি সম্পন্ন ছোট জাহাজ তৈরি করা আরও বেশি অসম্ভব ।

বাস্তবে, জার্মান জাহাজগুলোর ছোট আকার কেবল গতি ও অস্ত্রশস্ত্রের বিনিময়েই বজায় রাখা সম্ভব ছিল । এই নীতিকে ন্যায্যতা দেওয়ার চেষ্টাই ছিল শান্তিকালীন সময়ে এই বিষয়গুলোর দায়িত্বে থাকা নৌ কর্মকর্তাদের যৌক্তিক চিন্তাভাবনার অভাবের প্রমাণ । তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, কার্যকর গোলাবর্ষণের ক্ষমতার দিক থেকে জার্মান ২৮-সেন্টিমিটার কামানগুলো ব্রিটিশ ৩০.৫-সেন্টিমিটার কামানের চেয়ে সুস্পষ্টভাবে উন্নত ছিল ।

কিন্তু একই কারণে আমাদের ৩০.৫-সেন্টিমিটার কামানও তৈরি করা উচিত ; এগুলোর উদ্দেশ্য হওয়া উচিত যুদ্ধশক্তিতে সমতা নয়, বরং শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা । যদি এমনটা না হতো, তবে স্থলবাহিনীকে ৪২-সেন্টিমিটার মর্টার দিয়ে সজ্জিত করার কোনো প্রয়োজনই থাকতো না, কারণ জার্মান ২১-সেন্টিমিটার মর্টার সমসাময়িক সবগুলোর চেয়ে অনেক বেশি উন্নত ছিল।

ফরাসি উচ্চ-গতিপথের কামান, এবং দুর্গগুলো ৩০.৫-এর সাহায্যে দখল করা হবে।
সেন্টিমিটার মর্টার। তবে, সেনা কমান্ড যুক্তিসঙ্গতভাবে চিন্তা করছিল , কিন্তু নৌ কমান্ড তা করছিল না। গোলন্দাজ বাহিনীর উন্নত কার্যকারিতা ও গতির প্রতি এই অবহেলার কারণ ছিল তাদের গৃহীত 'ঝুঁকির নীতি' -তে একটি মৌলিক ত্রুটি । নৌ কর্তৃপক্ষ, এমনকি শান্তিকালীন সময়েও, আক্রমণের সম্ভাবনাকে নাকচ করে দিয়েছিল এবং একারণে যুদ্ধের একেবারে শুরু থেকেই তাদের প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানে থাকতে হয়েছিল । এই মনোভাবের মাধ্যমে, তারা বিজয়ের সম্ভাবনাগুলোকেও প্রত্যাখ্যান করেছিল , যা অর্জন করা সম্ভব ছিল ।

শুধুমাত্র আক্রমণের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব হয়েছিল ।

একটি ধীরগতির ও কম শক্তিশালী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত জাহাজ একটি দ্রুততর ও শক্তিশালী শত্রুর হাতে ধ্বংস হয়ে যাবে, যে সাধারণত আরও বেশি দূর থেকে গুলি চালাতে পারে । এই কারণে অনেক ক্রুজার মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল । শান্তিকালীন সময়ে নৌ কর্তৃপক্ষের মধ্যে প্রচলিত মতামতের অযৌক্তিকতা যুদ্ধের সময় প্রমাণিত হয়েছিল। তারা পুরোনো জাহাজের অস্ত্রশস্ত্র পরিবর্তন করতে এবং যখনই সম্ভব নতুন জাহাজগুলোকে আরও উন্নত অস্ত্রে সজ্জিত করতে বাধ্য হয়েছিল। যদি স্ক্যাগেরাকের যুদ্ধে জার্মান জাহাজগুলো আকার , অস্ত্রশস্ত্র এবং গতিতে ইংরেজ জাহাজগুলোর সমান হতো , তবে ব্রিটিশ নৌবহরটি জার্মান ৩৮-সেন্টিমিটার গোলার ঘূর্ণিঝড়-গতির গুলিতে ডুবে যেত , যা ছিল আরও নির্ভুল ও কার্যকর।

না।

জাপান নৌ-উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি ভিন্ন নীতি গ্রহণ করেছিল। প্রতিটি নতুন জাহাজ এমনভাবে তৈরি করা হতো যাতে তা যেকোনো সম্ভাব্য শত্রুর যুদ্ধশক্তিকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। এই নীতির কারণে নৌবহরটিকে আক্রমণাত্মকভাবে ব্যবহার করা যেত ।

যদিও সেনা কর্তৃপক্ষ এই ধরনের মৌলিকভাবে ত্রুটিপূর্ণ ধারণাগুলো স্বীকার করতে অস্বীকার করেছিল, নৌবাহিনী—দুর্ভাগ্যবশত, সংসদে যাদের প্রতিনিধি সংখ্যা বেশি ছিল— প্রচলিত মনোভাবের কাছে নতি স্বীকার করেছিল। নৌবাহিনী একটি শক্তিশালী ভিত্তির উপর সংগঠিত ছিল না এবং ফলস্বরূপ এটিকে এলোমেলো ও সিদ্ধান্তহীনভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নৌবাহিনীর অমর গৌরবের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব অবশ্যই এর কর্মকর্তা ও নাবিকদের কর্মদক্ষতা, কার্যকারিতা এবং অতুলনীয় বীরত্বের প্রাপ্য। নৌবাহিনীর নেতৃত্ব যদি একই মেধার পরিচয় দিত, তবে এই সমস্ত আত্মত্যাগ বৃথা যেত না।

সম্ভবত শান্তিকালীন সময়ে নৌ কমান্ডারের সংসদীয় দক্ষতাই পরবর্তীকালে এই বিপর্যয়কর ব্যর্থতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল , কারণ নৌবাহিনীর সম্প্রসারণে তা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে শুরু করে।
সামরিক বিবেচনার চেয়ে সংসদীয় বিবেচনাগুলোই বেশি ভূমিকা পালন করেছিল। সংসদীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসূচক সিদ্ধান্তহীনতা, দুর্বলতা এবং যৌক্তিকভাবে সুসংহত নীতি গ্রহণে অক্ষমতা নৌ কর্তৃপক্ষকে কলুষিত করেছিল।

আমি আগেই যেমন জোর দিয়েছি, সেনা কর্তৃপক্ষ এমন একটি মৌলিকভাবে ভুল পথ অনুসরণ করতে নিজেদের অনুমতি দেয়নি । লুডেনডর্ফ, যিনি তখন জেনারেল স্টাফের একজন কর্নেল ছিলেন, রাইখস্ট্যাগের সেই অপরাধমূলক সিদ্ধান্তহীনতার বিরুদ্ধে একটি মরিয়া সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, যার মাধ্যমে তারা দেশের বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা মোকাবেলা করত এবং তিনি মূলত সেগুলোর বিপক্ষেই ভোট দিয়েছিলেন। যদি এই সংগ্রাম নিষ্ফল হয়ে থাকে, তবে তার দায় সংসদের এবং আংশিকভাবে রাইখ চ্যান্সেলর বেথম্যান-হোলওয়েগের শোচনীয় ও দুর্বল মনোভাবের ওপর বর্তায়।

তবে, জার্মানির পরাজয়ের জন্য যারা দায়ী ছিল, তারা দ্বিধা করেনি
দোষটা এমন একজনের কাঁধে বর্তায় যিনি এই অসম্মানজনক পদ্ধতির তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন।

Machine Translated by Google

কারণ এভাবেই দেশের কাজকর্ম পরিচালিত হতো। কিন্তু এই জন্মগত প্রতারকদের কাছে আরও একটি মিথ্যা কোনো পার্থক্য গড়ে দেয় না ।

যে কেউ এই দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তিদের অপরাধমূলক অবহেলার ফলে এই জাতিকে যে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে , সে কথা ভাবলে ; যে কেউ অকারণে নিহত ও পঙ্গু হওয়া মানুষের সংখ্যার কথা ভাবলে ; যে কেউ আমাদের উপর নেমে আসা কলঙ্ক এবং আমাদের জাতির নিমজ্জিত হওয়া অপরিমেয় দুর্দশার কথা ভাবলে— যে কেউ যদি বোঝে যে এই সবকিছু ঘটেছে যাতে বিবেকহীন সুযোগসন্ধানীরা সংসদে একটি আসন লাভ করতে পারে, তবে সে বুঝবে যে এই ধরনের প্রাণীদের কেবল বদমাশ, দস্যু এবং শয়তানই বলা যেতে পারে ; অন্যথায়, এই শব্দগুলোর কোনো অর্থ থাকত না। যারা জাতির স্বার্থের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, সেই বিশ্বাসঘাতকদের তুলনায় অন্য যেকোনো বদমাশই একজন সম্মানীয় ব্যক্তি।

* * *

পরিস্থিতির বিশেষত্ব ছিল এই যে, পুরোনো জার্মানির ভুলগুলো কেবল তখনই জনসমক্ষে আনা হতো , যখন এর দ্বারা জাতীয় সংহতি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকত। তখন অপ্রিয় সত্যগুলো ব্যাপক জনগণের কানে খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করা হতো, অথচ অন্য অনেক ক্ষেত্রে অন্যান্য অনেক বিষয়কে অপরাধমূলকভাবে স্তব্ধ করে দেওয়া হতো বা স্রেফ অস্বীকার করা হতো, বিশেষ করে যখন এই সমস্যাগুলো নিয়ে খোলামেলা আলোচনার ফলে...

এই ধরনের বিষয়ে প্রচারণার প্রকৃতি ও ব্যবহার সম্পর্কে উচ্চপদস্থ সরকারি কর্তৃপক্ষের প্রায় কোনো ধারণাই ছিল না। কেবল ইহুদিরাই জানত যে , প্রচারণার নিপুণ ও নিরন্তর ব্যবহারের মাধ্যমে স্বর্গকে মানুষের কাছে নরক হিসেবে এবং এর বিপরীতে, সবচেয়ে শোচনীয় জীবনকেও জান্নাত হিসেবে উপস্থাপন করা যায় । ইহুদিরা এটা জানত এবং সেই অনুযায়ী কাজ করত। কিন্তু জার্মান, বা বলা ভালো তার সরকারের, এ বিষয়ে কোনো ধারণাই ছিল না । যুদ্ধের সময় এই অজ্ঞতার জন্য মূল্য দিতে হয়েছিল ।
সর্বোচ্চ দাম।

* * *

যুদ্ধের আগে জার্মান জীবনকে প্রভাবিত করা এখানে উল্লিখিত অগণিত ত্রুটিগুলো ছাড়াও অনেক উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য ছিল। বস্তুনিষ্ঠভাবে দেখলে আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে , আমাদের অধিকাংশ ত্রুটিই অন্যান্য দেশ ও জনগোষ্ঠীর মধ্যেও অনেকাংশে বিদ্যমান ছিল এবং প্রায়শই আমাদের চেয়েও খারাপ রূপে ; আবার আমাদের এমন অনেক প্রকৃত সুবিধাও ছিল যা অন্যদের ছিল না।

জার্মানির মৌলিক সুবিধার কারণ হলো এই যে, প্রায় সকল ইউরোপীয় দেশের মধ্যে একমাত্র জার্মান জাতিই তার অর্থনৈতিক কাঠামোর জাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষায় সর্বাধিক প্রচেষ্টা চালিয়েছে এবং ফলস্বরূপ আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণের অধীন কম থেকেছে , যদিও এক্ষেত্রেও অনেক নেতিবাচক লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

এই সুবিধাটি অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল এবং পরবর্তীকালে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে প্রমাণিত হয় ।

কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাতীয় স্বাধীনতার এই সুবিধাকে যদি আমরা প্রত্যাখ্যানও করি , তবুও আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে নিশ্চয়ই অন্যান্য ইতিবাচক দিক ছিল।
তাদের প্রতিনিধিত্ব করত তিনটি প্রতিষ্ঠান, যেগুলো ছিল জাতীয় শক্তির অবিচ্ছিন্ন উৎস।
তাঁরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত ছিলেন।

প্রথমত, এটি ছিল রাষ্ট্রত্বের রূপ এবং আধুনিক কালে জার্মানিতে এর বিকাশের পদ্ধতি । অবশ্যই, আমাদের সেইসব রাজাদের বাদ দিতে হবে যারা মানুষ হিসেবে সেইসব দুর্বলতার শিকার হতেন যা তাদেরকে পীড়িত করেছিল। যদি আমরা এই বিষয়ে অসহিষ্ণু হই , তবে বর্তমান প্রজন্মের অবস্থা হবে আশাহীন; কারণ যদি আমরা আমাদের বর্তমান শাসনব্যবস্থার প্রতিনিধিদের দক্ষতা ও চরিত্র বিবেচনা করি, তবে এর চেয়ে সাধারণ মানের বুদ্ধিমত্তা ও নৈতিকতা কল্পনা করা কঠিন । যদি আমরা ১৯১৮ সালের নভেম্বর থেকে জার্মান জাতিতে নিয়ে আসা ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও দক্ষতার নিরিখে জার্মান বিপ্লবের "মূল্য" পরিমাপ করি , তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যে রায় দেবে তা ভেবে আমরা লজ্জিত হতে পারি ।

Machine Translated by Google

এইসব লোকদের সম্পর্কে, যখন প্রজাতন্ত্র সুরক্ষা আইন আর জনমতকে স্তব্ধ করতে পারবে না ।
ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অবশ্যই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে, আমাদের নতুন জার্মান নেতাদের বুদ্ধিমত্তা ও সততা ছিল তাদের দম্ভ ও দোষত্রুটির ব্যস্তানুপাতিক।

এটা স্বীকার করতেই হবে যে, রাজতন্ত্রের চেতনা বহু নাগরিকের কাছে, বিশেষ করে সাধারণ জনগণের কাছে, পরকীয় হয়ে উঠেছিল। এর কারণ ছিল এই যে, রাজারা সবসময় সর্বোচ্চ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ব্যক্তিদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন না —সহজ কথায় বলতে গেলে —এবং অবশ্যই সবসময় নির্মল চরিত্রের ব্যক্তিদের দ্বারাও নন।
দুর্ভাগ্যবশত, তাদের অনেকেই সৎ মানুষের চেয়ে তোষামোদকারীদের বেশি পছন্দ করত এবং তাদের কাছ থেকেই নিজেদের 'তথ্য' পেত। এটি ছিল এক মারাত্মক বিপদের কারণ , বিশেষ করে এমন এক সময়ে যখন বিশ্ব এক বিরাট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল এবং এই পরিবর্তনগুলো এমনকি রাজকীয় ঐতিহ্যকেও প্রভাবিত করছিল।

উদাহরণস্বরূপ, শতাব্দীর শুরুতে যখন একজন রাজকুমারী ইউনিফর্ম পরে ঘোড়ায় চড়ে সৈন্যদের কুচকাওয়াজ পরিচালনা করতেন , তখন সাধারণ মানুষ তাদের বুকের ভেতর জেগে ওঠা উচ্ছ্বাসের ঢেউ অনুভব করতে পারত না। উচ্চ মহলের কোনো ধারণাই ছিল না যে এই ধরনের কুচকাওয়াজ সাধারণ মানুষের উপর কী প্রভাব ফেলে; নইলে এমন দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা কখনোই ঘটত না। উচ্চ মহলে প্রচলিত ভাবপ্রবণ মানবতাবাদ—যা সবসময় আন্তরিক ছিল না— প্রায়শই আকর্ষণীয়ের চেয়ে বেশি বিকর্ষণীয় ছিল । উদাহরণস্বরূপ, যখন দশম রাজকুমারী কৃপা করে একটি দাতব্য রান্নাঘরের খাবার চেখে দেখতেন এবং সেটিকে চমৎকার বলে ঘোষণা করতেন , তখন এই ধরনের একটি অঙ্গভঙ্গি হয়তো অনেক আগে দারুণ প্রভাব ফেলত , কিন্তু এখন এর ফল হতো ঠিক তার বিপরীত। এমনকি যদি মহারানী নাও জানতেন যে সেদিনের খাবার সাধারণের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল, মানুষের জানার জন্য এটুকুই যথেষ্ট ছিল । এভাবেই এমনকি সেরা উদ্দেশ্যগুলোও উপহাস ও বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়াত ।

রাজপরিবারের বিখ্যাত বিনয়ের বর্ণনা , তাঁর খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠা এবং গভীর রাত পর্যন্ত সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করা , এবং বিশেষ করে তাঁর এই অবিরাম উদ্বেগ যে তিনি হয়তো ...
অপুষ্টি—এই সবকিছু অনেকের মনেই একটি খারাপ ধারণা তৈরি করেছিল। সম্রাট কী খেতেন বা পান করতেন, তা কেউ জানতে চাইত না। তাঁর আহার বা ঘুম নিয়েও কেউ আপত্তি করত না। সম্রাট যখন ব্যক্তি হিসেবে তাঁর পরিবার ও দেশের জন্য সম্মান বয়ে আনতেন এবং সার্বভৌম শাসক হিসেবে তাঁর কর্তব্য পালন করতেন , তখন সকলেই সন্তুষ্ট থাকত। প্রচলিত এই সমস্ত কিংবদন্তি তাঁর কোনো উপকারে আসেনি, বরং তাঁর অনেক ক্ষতিই করেছিল।

কিন্তু এগুলো সবই ছিল ছোটখাটো ব্যাপার। এর চেয়েও খারাপ ছিল দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়া এই ধারণা যে, সরকার সবকিছুর দেখভাল করছে এবং সাধারণ মানুষের দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। যতক্ষণ সরকার সত্যিই ভালো, বা অন্তত সদিচ্ছা নিয়ে কাজ করছে, ততক্ষণ সবকিছু ঠিকঠাক ।

কিন্তু দেশের ওপর বিপর্যয় নেমে আসাটা অবশ্যম্ভাবী ছিল, যখন অন্তত সদিচ্ছাসম্পন্ন পুরোনো সরকারের জায়গায় এমন এক নতুন শাসনব্যবস্থা এলো যা ততটা শোভন ছিল না । তখন নিষ্ক্রিয় আনুগত্য আর শিশুসুলভ বিশ্বাসই হয়ে উঠল কল্পনাতীত নিকৃষ্টতম অশুভ শক্তি ।

তবে নিঃসন্দেহে কিছু ইতিবাচক দিকও ছিল ।

সর্বোপরি, রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা জনবিষয়াদির পরিচালনায় স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করত এবং রাষ্ট্রীয় দপ্তরগুলোকে লোভী রাজনীতিবিদদের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করত। অধিকন্তু , এই প্রতিষ্ঠানের মর্যাদাপূর্ণ ঐতিহ্য রাজকীয় কর্তৃত্বের অনুভূতিকে উৎসাহিত করত। এছাড়াও, সমগ্র কর্মকর্তা-কর্মচারী সম্প্রদায়, বিশেষ করে সেনাবাহিনী, তাদের দায়িত্বের স্তর থেকে ঊর্ধ্বে উন্নীত ছিল।
দলীয় রাজনীতিবিদ। আরেকটি ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য ছিল যে, রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব রাজার হাতেই ন্যস্ত ছিল , যিনি একক ব্যক্তি হিসেবে দায়িত্বের প্রতীক হিসেবে কাজ করতে পারতেন এবং এই দায়িত্বকে রাজাকে যেকোনো নামহীন সংখ্যাগরিষ্ঠের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব সহকারে নিতে হতো।

জার্মান প্রশাসনের প্রসিদ্ধ সততা ও সংহতির মূল কারণ অবশ্যই এই ঘটনাটি। সর্বোপরি , রাজা বা রানী জার্মান জাতির মধ্যে এক বিরাট সাংস্কৃতিক ভূমিকা পালন করতেন, যা বহু ঘাটতি পূরণ করত। জার্মান রাজদরবারের শহরগুলো আজও এক শৈল্পিক চেতনার কেন্দ্র হিসেবে রয়ে গেছে, যা এখন বিলুপ্তির ঝুঁকিতে এবং ক্রমশ বস্তুবাদী হয়ে উঠছে। জার্মান রাজপুত্ররা শিল্প ও বিজ্ঞানকে ব্যাপকভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, বিশেষ করে ঊনবিংশ শতাব্দীতে। আমাদের বর্তমান সময় সেই সময়ের সঙ্গে তুলনীয় নয়।

* * *

Machine Translated by Google

সমগ্র সামাজিক ব্যবস্থার ক্রমাবনতিশীল ভাঙনের প্রক্রিয়ায় , যে শক্তিটি সবচেয়ে বড় প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল, তা ছিল সেনাবাহিনী। এটি ছিল জার্মান জাতির শিক্ষার সবচেয়ে শক্তিশালী উৎস। এই কারণেই, আমাদের শত্রুদের সমস্ত ঘৃণা জাতীয় আত্মরক্ষা ও স্বাধীনতার এই রক্ষকের দিকেই পরিচালিত হয়েছিল। এই অনন্য প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে সবচেয়ে জোরালো সাক্ষ্য হলো এই যে, এটিকে উপহাস ও ঘৃণা করা হলেও, এটি সমস্ত অযোগ্য শক্তির মনে ভয়ের সঞ্চার করেছিল। ভার্সাইয়ে সমবেত আন্তর্জাতিক ফটকাবাজরা, যারা জাতিগুলোকে আরও শোষণ ও লুণ্ঠন করার জন্য একত্রিত হয়েছিল, তারা যে তাদের শত্রুতা প্রাথমিকভাবে পুরোনো জার্মান সেনাবাহিনীর দিকেই পরিচালিত করেছিল, তা আবারও প্রমাণ করে যে, আন্তর্জাতিক আর্থিক শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের স্বাধীনতা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে অভিহিত হওয়ার যোগ্য এটি । সেনাবাহিনী যদি পাহারায় না থাকত, তবে ভার্সাইয়ের ফটকাবাজদের লক্ষ্যগুলো আরও অনেক দ্রুত অর্জিত হতো। জার্মান জাতি সেনাবাহিনীর কাছে কতটা ঋণী, তা প্রকাশ করার জন্য একটিই শব্দ আছে —সবকিছু!

এমন এক সময়ে সেনাবাহিনী মানুষের মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তুলেছিল, যখন এই গুণটি অত্যন্ত বিরল হয়ে পড়েছিল এবং যেকোনো দায়িত্ব এড়িয়ে চলার অভ্যাস ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়ছিল।
এই অভ্যাসটি গড়ে উঠেছিল সংসদের অশুভ প্রভাবে, যা নিজেই ছিল দায়িত্বহীনতার এক প্রতিরূপ। সেনাবাহিনী মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগত সাহস লালন করত এমন এক সময়ে, যখন কাপুরুষতার মহামারী দেখা দেওয়ার আশঙ্কা ছিল এবং যখন সাধারণের মঙ্গলের জন্য নিজের স্বার্থ বিসর্জন দেওয়ার মানসিকতাকে প্রায় উন্মাদনা বলে মনে করা হতো। এমন এক সময়ে, যখন কেবল তারাই বুদ্ধিমান বলে বিবেচিত হতো যারা নিজেদের স্বার্থ রক্ষা ও প্রসার করতে জানত , তখন সেনাবাহিনী ছিল এমন এক বিদ্যালয়, যেখানে প্রত্যেক জার্মান শিখত যে , কৃষ্ণাঙ্গ, জার্মান, চীনা, ফরাসি, ইংরেজ ইত্যাদির মধ্যে আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বের মিথ্যা আদর্শে নিজেদের জাতির মুক্তি খোঁজা উচিত নয় , বরং তাদের নিজেদের রাষ্ট্রের শক্তি ও ঐক্যের মধ্যেই তা নিহিত।

যখন জনগণের আচরণে সিদ্ধান্তহীনতা ও সংশয়ের মনোভাব বিরাজ করত , তখনই সেনাবাহিনী সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করেছিল। এমন এক সময়ে যখন সর্বত্র জ্ঞানী ব্যক্তিরাই পথনির্দেশ করতেন, তখন ' কোনো শৃঙ্খলা না থাকার চেয়ে যেকোনো শৃঙ্খলা থাকাই শ্রেয়'— এই নীতিকে সমুন্নত রাখতে সাহসের প্রয়োজন ছিল । এই একটিমাত্র নীতিই একটি সঠিক ও যুক্তিসঙ্গত চিন্তাধারার প্রতিনিধিত্ব করে , যার কোনো চিহ্নই জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে অবশিষ্ট থাকত না যদি সেনাবাহিনী ক্রমাগত এই নীতিকে পুনরুজ্জীবিত না করত । এর যথেষ্ট প্রমাণ আমাদের বর্তমান সরকারি কর্তৃপক্ষের ভয়াবহ সিদ্ধান্তহীনতার মধ্যেই পাওয়া যায় । জার্মান জনগণকে শোষণকারী একটি নতুন অধ্যাদেশে স্বাক্ষর করতে বাধ্য না করা পর্যন্ত তারা তাদের মানসিক ও নৈতিক জড়তা ঝেড়ে ফেলে কোনো চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে না। তখন তারা সমস্ত দায় অস্বীকার করে , এবং একই সাথে একজন পেশাদার স্টেনোগ্রাফারের মতো তৎপরতার সাথে যে কেউ তাদের যা কিছু স্বাক্ষর করতে বলে, তাতেই স্বাক্ষর করে দেয় । তাদের এই আচরণের ব্যাখ্যা দেওয়া সহজ — তাদের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করা হয় না; বরং সিদ্ধান্তটি তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়।

সেনাবাহিনী স্বদেশ ও তার মহত্ত্বের জন্য আদর্শবাদ এবং আত্মত্যাগের চেতনা শিখিয়েছিল , যখন অন্যান্য ক্ষেত্রে লোভ ও বস্তুবাদ বিরাজ করত। এটি শ্রেণীবিভক্ত মানুষকে জাতীয় ঐক্য শিখিয়েছিল, এবং সম্ভবত এর একমাত্র দুর্বলতা ছিল এক বছরের সামরিক সেবা , যা উচ্চশিক্ষিতদের জন্য একটি বিশেষ সুবিধা ছিল । এটি একটি দুর্বলতা ছিল কারণ...

এটি পূর্ণ সমতার নীতি লঙ্ঘন করেছিল এবং উচ্চশিক্ষিতদের সাধারণ সামরিক সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। যেহেতু উচ্চবিত্ত শ্রেণি দেশে কী ঘটছে সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল এবং সাধারণ মানুষ থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল, তাই এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে, সেনাবাহিনী যদি তার নিজেদের মধ্যে থাকা তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের আলাদা করে চিহ্নিত করা থেকে বিরত থাকত, তবে এটি একটি "আশীর্বাদ" হিসেবে কাজ করতে পারত। এমনটা না হওয়াটা একটা ভুল ছিল , কিন্তু এই পৃথিবীতে কি কোনো প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ ত্রুটিহীনভাবে পরিচালিত হয় ? তাছাড়া, সেনাবাহিনীর ভালো দিকগুলোই এমনিতেও বেশি ছিল , তাই এই অল্প কয়েকটি ভুল ছিল কেবলই মানবিক অপূর্ণতার ফল।

কিন্তু পুরাতন রাইখের সেনাবাহিনীর সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব এই যে, এমন এক সময়ে যখন ব্যক্তির মূল্যের কোনো মূল্যই ছিল না , বরং কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠের মূল্যই মুখ্য ছিল, তখন তারা সংখ্যাগরিষ্ঠের মূল্যবোধের ঊর্ধ্বে ব্যক্তির মূল্যবোধকে স্থান দিয়েছিল । ব্যক্তির প্রতি আস্থা বজায় রেখে সেনাবাহিনী বিরোধিতা করেছিল
সংখ্যার এক চিরাচরিত ইহুদি ও গণতান্ত্রিক পরাকাষ্ঠা। এরপর সেনাবাহিনী তাদের প্রশিক্ষণ দিত যাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল: প্রকৃত পুরুষদের। যখন মানুষ লাম্পট্যের শিকার হত,

Machine Translated by Google

কঠোরতা ও স্বেচ্ছাচারিতার কারণে প্রতি বছর ৩,৫০,০০০ প্রশিক্ষিত যুবক সেনাবাহিনী ত্যাগ করত। দুই বছরের প্রশিক্ষণের সময় তারা তাদের কোমলতা হারাত এবং তাদের শরীর ইস্পাতের মতো কঠিন হয়ে যেত। যে যুবকদের দুই বছর ধরে আনুগত্য শেখানো হয়েছিল, তারা শাসন করার যোগ্য ছিল। একজন প্রশিক্ষিত সৈনিককে তার পদক্ষেপ দেখে চেনা যায়।

এটি ছিল জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠ শিক্ষালয়; এবং সঙ্গত কারণেই এটি তাদের তীব্র ঘৃণার পাত্র হয়েছিল, যারা রাইখকে দুর্বল ও অরক্ষিত রাখতে চাইত, কারণ...
তারা এর মহত্ত্বকে ঈর্ষা করত এবং লোভ ও লালসার দ্বারা আবিষ্ট ছিল। বাকি বিশ্ব এমন একটি সত্য জানত যা অনেক জার্মান দেখতে অস্বীকার করত, হয় তারা বাস্তবতার প্রতি অন্ধ ছিল অথবা কেবল তা দেখতেই চাইত না। সত্যটি ছিল এই: জার্মান সেনাবাহিনী ছিল জার্মান জাতির স্বাধীনতার সংগ্রামে সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র এবং এর নাগরিকদের জীবনধারণ নিশ্চিত করার সর্বোত্তম নিশ্চয়তা।

* * *

রাজতন্ত্র ও সেনাবাহিনী ছাড়াও ইতিবাচক মূল্যসম্পন্ন তৃতীয় প্রতিষ্ঠানটি ছিল বেসামরিক সেবা।
সেটা।

অন্যান্য দেশের তুলনায় জার্মান প্রশাসন অধিকতর সুসংগঠিত ও সুপরিচালিত ছিল। কর্মকর্তাদের আমলাতান্ত্রিক গতানুগতিকতা নিয়ে কিছু আপত্তি থাকলেও, অন্যান্য দেশেও পরিস্থিতি একই রকম, এমনকি আরও খারাপ ছিল। জার্মানির মতো এই সংগঠনের অলৌকিক দৃঢ়তা অন্যান্য দেশে ছিল না, আর কর্মকর্তারাও ততটা সতর্ক ও সৎ ছিলেন না।

নিকৃষ্ট চরিত্রের একজন অতিমাত্রায় পরিশীলিত ও আধুনিক ব্যক্তির চেয়ে একজন সৎ ও অনুগত আমলা হওয়া অনেক ভালো, কারণ নিকৃষ্ট চরিত্রের মানুষেরা প্রায়শই অজ্ঞতা ও অদক্ষতার পরিচায়ক। আজ যদি এমন ইঙ্গিত করা হয় যে যুদ্ধ-পূর্ববর্তী জার্মান প্রশাসন হতে পারত...

আমলাতান্ত্রিক কৌশলে অত্যন্ত দক্ষ, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে অদক্ষ, আমি কেবল এই উত্তরই দিতে পারি: বিশ্বের আর কোন দেশে, উদাহরণস্বরূপ, জার্মান রাষ্ট্রীয় রেলওয়ের চেয়ে আরও সুসংগঠিত ও সুপরিচালিত প্রতিষ্ঠান ছিল?

বিপ্লবই এই সংগঠনটিকে ধ্বংস করেছিল, যখন এটিকে জাতির হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে জার্মান বিপ্লবের নেপথ্যের কারিগর আন্তর্জাতিক স্টক এক্সচেঞ্জের পুঁজিপতিদের সেবায় নিয়োজিত করার সময় এসেছিল।

বেসামরিক চাকরি এবং সমগ্র বেসামরিক প্রশাসনের সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্য ছিল সরকারের উত্থান-পতন থেকে এর স্বাধীনতা, যার রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা জার্মান বেসামরিক কর্মচারীদের মনোভাবের উপর কোনো প্রভাব ফেলত না। বিপ্লবের পর, এই পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গেল। দক্ষতা এবং যোগ্যতার স্থান নিল দলীয় আনুগত্যের পরীক্ষা; চরিত্রের স্বাধীনতা এবং উদ্যোগ আর বেসামরিক কর্মচারীর পক্ষে কথা না বলে বরং তার বিপক্ষে চলে গেল।

পুরাতন রাইখের অলৌকিক শক্তি ও ক্ষমতা রাজতন্ত্র, সেনাবাহিনী এবং প্রশাসনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল।
এই তিনটি ভিত্তির উপর এক বিরাট শক্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল যা এখন সম্পূর্ণ অনুপস্থিত: অর্থাৎ, রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব। রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব সংসদীয় অর্থহীন কথাবার্তার উপর, রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য প্রণীত আইনের উপর, কিংবা রাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে প্রশ্ন করার দুঃসাহসীদের ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আদালতের রায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, বরং তা কেবল প্রশাসনের দ্বারা জনগণের মধ্যে স্থাপিত সাধারণ নিশ্চয়তার উপরই নির্ভরশীল। এই নিশ্চয়তা, আবার, এই অটল অভ্যন্তরীণ বিশ্বাসের ফল ছাড়া আর কিছুই নয় যে, দেশের সরকার ও প্রশাসন নিঃস্বার্থ ও আন্তরিক সদিচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হয় এবং আইনের চেতনা ও জনগণের নৈতিক বিশ্বাসের মধ্যে এক ধরনের সামঞ্জস্যবোধ কাজ করে। দীর্ঘমেয়াদে, শাসনব্যবস্থা সন্ত্রাসের দ্বারা নয়, বরং যারা রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি পরিচালনা করেন তাদের যোগ্যতা ও আন্তরিকতার উপর জনগণের আস্থার দ্বারাই টিকে থাকে।

* * *

যদিও যুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়ে এমন অনেক অশুভ শক্তি ছিল যা জাতির অভ্যন্তরীণ শক্তিকে কলুষিত ও ক্ষয় করার প্রবণতা দেখাত, তবুও মনে রাখতে হবে যে অন্যান্য দেশও এগুলোর কারণে ভুগেছিল।

Machine Translated by Google

জার্মানির চেয়েও বেশি , এবং সংকট এলে এই অন্যান্য রাষ্ট্রগুলো ভেঙে পড়েনি। যদি আমরা মনে রাখি যে যুদ্ধ-পূর্ব জার্মানির এই ত্রুটিগুলো মহান ইতিবাচক মূল্যবোধ দ্বারা ছাপিয়ে গিয়েছিল, তবে পতনের কারণ খুঁজতে আমাদের অন্যত্র দৃষ্টিপাত করতে হবে। আর সেই কারণগুলো অন্যত্রই নিহিত।

জার্মানির পতনের চূড়ান্ত এবং সবচেয়ে গভীর কারণ হলো এই যে, জাতিগত সমস্যাকে উপেক্ষা করা হয়েছিল এবং জাতিসমূহের ঐতিহাসিক বিকাশে এর গুরুত্ব অনুধাবন করা হয়নি। জাতিসমূহের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো আকস্মিক নয় , বরং প্রজাতি ও বংশকে টিকিয়ে রাখা এবং প্রসারিত করার প্রচেষ্টার স্বাভাবিক ফল , যদিও মানুষ তাদের কর্মের পেছনের গভীরতর উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত না-ও থাকতে পারে।

পাদটীকা:

১৪) সুইডেনের চ্যান্সেলর যিনি গুস্তাভাস অ্যাডলফাসের মৃত্যুর পর সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

Machine Translated by Google

একাদশ অধ্যায়

জাতি ও রাষ্ট্র

কিছু সত্য জীবনের পথে এতটাই স্পষ্টভাবে বিরাজ করে যে মনে হয় প্রত্যেক পথচারীই তা দেখতে পায় । তবুও, এই স্পষ্টতার কারণেই অধিকাংশ মানুষ এই সত্যগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে, অথবা অন্তত পক্ষে এ সম্পর্কে অবগত থাকে না । মানুষ দৈনন্দিন জীবনের কিছু সহজতম সত্যের প্রতি এতটাই অন্ধ যে, যখন কেউ এমন কোনো বিষয়ে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যা সকলেরই জানা উচিত, তখন তারা খুব অবাক হয়। আমাদের চারপাশে লক্ষ লক্ষ কলম্বাসের ডিম ছড়িয়ে আছে ; কিন্তু কলম্বাসের মতো পর্যবেক্ষক খুব কমই আছে।

প্রকৃতির বাগানে ঘুরে বেড়ানোর সময় অধিকাংশ মানুষই নিজেদের অহংকারে মনে করে যে তারা সবকিছু জানে; কিন্তু প্রকৃতি তার কাজে যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি নীতি প্রয়োগ করে, সে বিষয়ে প্রায় সকলেই অজ্ঞ। এই নীতিটিকে অভ্যন্তরীণ বিচ্ছিন্নতা বলা যেতে পারে , এবং এটি পৃথিবীর প্রতিটি জীব প্রজাতির বৈশিষ্ট্য ।

এক ঝলক দেখলেই বোঝা যায় যে, জীবন যে অগণিত রূপে নিজেকে প্রকাশ করে, তা একটি মৌলিক নিয়মের অধীন— একে প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম বলা যেতে পারে—যা বিভিন্ন প্রজাতিকে তাদের প্রজাতি টিকিয়ে রাখতে ও বংশবিস্তার করতে নিজ নিজ জীবনধারার নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকতে বাধ্য করে। প্রতিটি প্রাণী কেবল তার নিজের প্রজাতির প্রাণীর সাথেই সঙ্গম করে । একটি টিট পাখি টিট পাখির সাথে, একটি সারস পাখি সারসের সাথে , একটি মাঠের ইঁদুর মাঠের ইঁদুরের সাথে, একটি ঘরের ইঁদুর ঘরের ইঁদুরের সাথে , একটি নেকড়ে একটি নেকড়ের সাথে , ইত্যাদি।

এই নিয়মের ব্যতিক্রম কেবল ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রেই ঘটে। এটি বিশেষত বন্দিদশায়, অথবা যখন অন্যান্য বাধা একই প্রজাতির প্রাণীদের মধ্যে প্রজননগত সংসর্গকে ব্যাহত করে , তখন ঘটে থাকে। কিন্তু তখন প্রকৃতি তার সর্বশক্তি দিয়ে এই ধরনের সংসর্গের বিরোধিতা করে; এর প্রতিবাদ এই ঘটনাতেই স্পষ্ট হয় যে সংকর প্রাণীটি বন্ধ্যা হয় অথবা তার বংশধরদের প্রজনন ক্ষমতা সীমিত থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, সংকর প্রাণী এবং তাদের বংশধররা রোগ বা বাহ্যিক আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজেদের রক্ষা করতে পারে না ।

এটি প্রকৃতির একটি সম্পূর্ণ যৌক্তিক নিয়ম। দুটি ভিন্ন প্রজাতির মধ্যে সংকরায়নের ফলে এমন একটি জীব উৎপন্ন হয় যা তার জনক দুটির মধ্যবর্তী একটি অবস্থান দখল করে । এর অর্থ হলো , জীবসত্তাটি জৈবিক ক্রমে নিম্নস্তরের জনকের চেয়ে উচ্চতর হবে , কিন্তু অপর জনকের মতো ততটা উচ্চতর হবে না। এই কারণে, উচ্চতর প্রজাতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাকে পরাজিত হতেই হয় । এই ধরনের সংমিশ্রণগুলো বিরোধিতা করে

প্রকৃতি এবং সামগ্রিকভাবে জীবনকে বেছে বেছে উন্নত করার তার ইচ্ছা। এই ধরনের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত হলো ভালো ও খারাপ ব্যক্তির একীভূত হওয়া নয় , বরং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সম্পূর্ণ বিজয়ী হতে দেওয়া। শক্তিশালীকে অবশ্যই আধিপত্য করতে হবে, দুর্বলের সাথে একীভূত হলে চলবে না , কারণ তার অর্থ হবে নিজের উচ্চতর প্রকৃতিকে বিসর্জন দেওয়া । কেবল জন্মগতভাবে দুর্বল ব্যক্তিই এই নীতিকে নিষ্ঠুর বলে মনে করবে , কারণ সে শারীরিকভাবে ভঙ্গুর এবং মানসিকভাবে সীমাবদ্ধ; যদি এই ধরনের কোনো নিয়ম বিবর্তনের প্রক্রিয়াকে পরিচালিত না করত, তবে জৈব জীবনের উচ্চতর বিকাশ সম্পূর্ণরূপে অচিন্তনীয় হয়ে থাকত ।

বিশুদ্ধ বংশধর বজায় রাখার এই প্রয়োজন , যা প্রাকৃতিক জগৎ জুড়ে একটি প্রচলিত ঘটনা , তার ফলে কেবল প্রজাতিগুলোর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্যই তৈরি হয় না , বরং প্রতিটি প্রজাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও অভ্যন্তরীণ সাদৃশ্য দেখা যায় । একটি শিয়াল শিয়ালই থাকে, একটি রাজহাঁস রাজহাঁসই থাকে , এবং একটি বাঘ বাঘই থাকে। একটি প্রজাতির মধ্যে একমাত্র যে পার্থক্য থাকতে পারে, তা হলো প্রতিটি সদস্যের শক্তি, বুদ্ধিমত্তা, সহনশীলতা ইত্যাদির বিভিন্ন মাত্রা । আপনি এমন কোনো শিয়াল খুঁজে পাবেন না যা রাজহাঁসের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ , কিংবা এমন কোনো বিড়াল যা ইঁদুরের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ ।

সুতরাং, বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে লড়াই পারস্পরিক শত্রুতা থেকে নয় , বরং ক্ষুধা ও ভালোবাসা থেকে উদ্ভূত হয়। উভয় ক্ষেত্রেই, প্রকৃতি শান্তভাবে তা দেখে এবং এমনকি ফলাফলে সন্তুষ্টও হয়। টিকে থাকার লড়াই সমস্ত দুর্বল ও অসুস্থদের নির্মূল করে দেয়; অপরদিকে পুরুষ ও নারীর মধ্যকার লড়াই সবচেয়ে শক্তিশালীকে তার প্রজাতিকে টিকিয়ে রাখার অধিকার দেয় ।

Machine Translated by Google

লড়াই হলো কোনো প্রজাতির স্বাস্থ্য ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা উন্নত করার একটি উপায়। সুতরাং, এটি তার ভবিষ্যৎ বিকাশের প্রক্রিয়ার অন্যতম অন্তর্নিহিত কারণ ।

যদি পরিস্থিতি ভিন্ন হতো এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেমে যেত, তাহলে হয়তো পশ্চাদপসরণও ঘটত । যেহেতু নিকৃষ্টেরা সবসময় উৎকৃষ্টের চেয়ে সংখ্যায় বেশি থাকে, তাই তারা সবসময় বংশবৃদ্ধি করত ।
বেঁচে থাকা ও বংশবৃদ্ধির জন্য সমান সুযোগ পেলে তারা আরও দ্রুত উন্নতি করত; কিন্তু পরিণামে, যোগ্যতরদের আড়ালে চলে যেতে হতো। তাই, তাদের অনুকূলে সংশোধনমূলক হস্তক্ষেপ প্রয়োজন ।
প্রকৃতি এমন কঠোর জীবনযাত্রার পরিস্থিতি তৈরি করে দেয় , যা তাদের অবশ্যই পূরণ করতে হয়।
এবং এইভাবে তাদের সংখ্যা সীমিত করে; কিন্তু যারা বেঁচে থাকে তারাও অবাধে বংশবৃদ্ধি করতে পারে না , কারণ শক্তি এবং স্বাস্থ্য অনুসারে নতুন নির্বাচন ঘটে ।

প্রকৃতি যদি না চায় যে দুর্বলতর জীবেরা উন্নততরদের সাথে মিলিত হোক , তবে সে আরও কমই চায় যে শ্রেষ্ঠ জাতি নিকৃষ্টতর জাতির সাথে আন্তঃবিবাহ করুক ; কারণ সেক্ষেত্রে বিবর্তনগতভাবে শ্রেষ্ঠ একটি জাতি প্রতিষ্ঠার জন্য লক্ষ লক্ষ বছর ধরে করা তার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে।
সারবস্তু নিষ্ফল হয়ে পড়বে ।

ইতিহাস আমাদের এই নিয়মটি প্রমাণ করার জন্য অগণিত উদাহরণ দেয় । এটি অত্যন্ত স্পষ্টতার সাথে দেখায় যে যখনই আর্যরা কোনো নিকৃষ্ট জাতির সাথে তাদের রক্ত মিশ্রিত করেছে , তখনই সেই জাতির পতন ঘটেছে যারা একটি উন্নত সংস্কৃতির পতাকাবাহক ছিল । উত্তর আমেরিকায়, যেখানে জনসংখ্যার অধিকাংশই টিউটোনিক এবং যেখানে এই উপাদানটি নিকৃষ্ট জাতিগুলোর সাথে খুব কমই মিশ্রিত হয়েছে , সেখানকার জনসংখ্যা ও সভ্যতার গুণমান মধ্য ও মধ্য আমেরিকার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন । এই দেশগুলিতে, অভিবাসীরা—যারা প্রধানত ল্যাটিন জাতির ছিল —আদিবাসীদের সাথে মিশ্রিত হয়েছিল , কখনও কখনও খুব বড় পরিমাণে। এক্ষেত্রে, জাতিগত মিশ্রণের পরিণতি কী হয় তার একটি স্পষ্ট এবং চূড়ান্ত উদাহরণ আমরা পাই। কিন্তু উত্তর আমেরিকায়, টিউটোনিক উপাদানটি, যা তার জাতিগত ঐতিহ্যকে বিশুদ্ধ রেখেছে এবং অন্য জাতিগুলোর সাথে মিশ্রিত হয়নি, আমেরিকান মহাদেশে আধিপত্য বিস্তার করেছে এবং যতক্ষণ না এটি তার নিজের রক্তের বিষক্রিয়ার শিকার হয় , ততক্ষণ এর শাসক থাকবে ।

সংক্ষেপে, জাতিগত মিশ্রণের প্রভাবগুলো সর্বদা নিম্নরূপ :

ক) শ্রেষ্ঠ জাতির স্তরের অবনতি ঘটে, খ) শারীরিক ও
মানসিক অবক্ষয় শুরু হয় , যা ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে জীবনীশক্তি শুকিয়ে যাওয়ার দিকে নিয়ে যায়।

যে কাজের ফলে এমন পরিণতি ঘটে, তা শাশ্বত সত্তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটি পাপ।
সৃষ্টিকর্তা। আর যেহেতু এটি পাপ, তাই এর প্রতিশোধ নেওয়া হবে।

প্রকৃতির অমোঘ যুক্তিকে অগ্রাহ্য করে কিছু গড়ার মানুষের প্রচেষ্টা তাকে সেইসব নীতির সাথে সংঘাতে জড়িয়ে ফেলে, যার ওপর তার অস্তিত্ব নির্ভরশীল । প্রকৃতির শক্তির বিরুদ্ধে কাজ করে সে ধ্বংসের পথ প্রস্তুত করে ।

এখানে আমরা আধুনিক শান্তিবাদীদের স্বভাবসুলভ নির্লজ্জ বিরোধিতার সম্মুখীন হই, এবং যা দ্বারা অনুপ্রাণিত ইহুদিদের দ্বারা । এই হলো তা: "মানুষ এমনকি প্রকৃতিকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ।"

লক্ষ লক্ষ মানুষ এই ইহুদি অর্থহীন কথাবার্তা পুনরাবৃত্তি করে এবং শেষ পর্যন্ত নিজেদেরকে প্রকৃতির বিজয়ী হিসেবে কল্পনা করতে শুরু করে । তাদের একমাত্র অস্ত্র হলো একটি ধারণা, এবং সেটিও এক অত্যন্ত উদ্ভট ধারণা; যদি আমরা তা মেনে নিই , তবে এই পৃথিবীর অস্তিত্ব কল্পনা করাই অসম্ভব হয়ে পড়ে ।

সত্যিটা হলো , মানুষ কোনো ক্ষেত্রেই প্রকৃতিকে জয় করতে ব্যর্থ হয়েছে তাই নয় , বরং বড়জোর সে তার চিরন্তন রহস্যের ওপর থাকা বিশাল পর্দাটি সরাতে পেরেছে। সে কখনো কিছু সৃষ্টি করে না। সে কেবল কিছু আবিষ্কার করতে পারে । সে প্রকৃতিকে শাসন করে না , কেবল জীবজন্তুদের শাসন করে, যাদের কাছে সেই জ্ঞান নেই যা সে প্রকৃতির কিছু নিয়ম ও রহস্যের গভীরে প্রবেশ করে অর্জন করেছে । তাছাড়া, একটি ধারণা কখনো দুর্বল করতে পারে না ।

মানবজাতির অস্তিত্ব ও বিকাশের জন্য অপরিহার্য শর্ত; কারণ ধারণাটি স্বয়ং মানুষের কাছ থেকেই আসে। মানুষ ছাড়া এই পৃথিবীতে কোনো মানবিক ধারণা থাকবে না। সুতরাং , এটি সর্বদা মানুষের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে, এবং সেই কারণে সেইসব নিয়মের উপরও নির্ভর করে যা মানুষের অস্তিত্বের সম্ভাবনা নিশ্চিত করে ।

Machine Translated by Google

এবং শুধু তাই নয়। কিছু ধারণা নির্দিষ্ট কিছু মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে । এই কথাটি বিশেষ করে সেইসব ধারণার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেগুলো বস্তুনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর ভিত্তি করে নয়, বরং অনুভূতির জগতে প্রোথিত। অন্য কথায়, বর্তমানে প্রচলিত একটি বাক্যাংশ ব্যবহার করতে গেলে যা এই সত্যটিকে ভালোভাবে প্রকাশ করে : সেগুলো প্রতিফলিত করে...
অন্তরের অভিজ্ঞতা। সেই সমস্ত ধারণা, যেগুলোর সাথে কঠোর যুক্তির কোনো সম্পর্ক নেই , বরং যা অনুভূতিরই বহিঃপ্রকাশ— যেমন নৈতিক ও চারিত্রিক ধারণা ইত্যাদি— মানব অস্তিত্বের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত । মানুষের কল্পনাশক্তির সৃজনশীল ক্ষমতার কাছেই এই ধরনের ধারণাগুলোর অস্তিত্ব ঋণী ।

এই ধরনের ধারণার টিকে থাকার জন্য নির্দিষ্ট কিছু জাতি এবং নির্দিষ্ট ধরনের মানুষের অস্তিত্ব অপরিহার্য । উদাহরণস্বরূপ , যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে যে বিশ্বে শান্তিবাদ জয়ী হওয়া উচিত, তার উচিত জার্মানিকে বিশ্বজয়ে সাহায্য করার জন্য সাধ্যমতো সবকিছু করা ; অন্যথায়, এমনও হতে পারে যে শেষ জার্মানটির সাথেই শেষ শান্তিবাদীও পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আমি এ কথা বলছি কারণ, দুর্ভাগ্যবশত, কেবল আমাদের জাতিই এর শিকার হয়েছে, অন্য কোনো জাতি নয়।

এই ধারণা। আপনি পছন্দ করুন বা না করুন, শান্তিবাদ বা অহিংসার আদর্শ অর্জন করতে চাইলে আপনাকে যুদ্ধ ভুলে যেতেই হবে। বিশ্বের আমেরিকান ত্রাণকর্তা উড্রো উইলসনের পরিকল্পনায় এর বাইরে আর কিছুই ছিল না। আমাদের স্বপ্নদ্রষ্টারা এটাই বিশ্বাস করতেন এবং তারা ভাবতেন যে তার পরিকল্পনার মাধ্যমেই তারা নিজেদের আদর্শ অর্জন করবেন ।

শান্তিবাদ ও মানবতাবাদের ধারণাটি তখনই সত্যিই খুব ভালো হয়ে উঠতে পারে , যখন মানবজাতির শ্রেষ্ঠ জাতি বিশ্বের উপর এমন ক্ষমতা অর্জন করবে যে তারাই পৃথিবীর একমাত্র শাসক হবে ।
এই ধারণাটির ক্ষতিকর পরিণতি কেবল তখনই হতে পারে , যখন এর প্রয়োগ কঠিন এবং পরিশেষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই প্রথমে সংগ্রাম, তারপর শান্তিবাদ। অন্যথায়, এর অর্থ হবে যে মানবতা তার গৌরবময় দিনগুলো ইতিমধ্যেই পার করে এসেছে , এবং সেই অনুযায়ী, যা ঘটবে তা কোনো নৈতিক আদর্শের বিজয় নয় , বরং বর্বরতা ও বিশৃঙ্খলার দিকে অধঃপতন । লোকেরা এতে হাসে ; কিন্তু আমাদের এই গ্রহটি লক্ষ লক্ষ বছর ধরে মানুষশূন্য অবস্থায় মহাকাশে বিচরণ করেছে , এবং একদিন এটি আবার তেমনই হতে পারে — যদি মানুষ ভুলে যায় যে তারা তাদের অস্তিত্বের এই স্তরে পৌঁছেছে কোনো উন্মাদ স্বপ্নদর্শীর ধারণা প্রয়োগ করে নয়, বরং প্রকৃতির অমোঘ নিয়মগুলো জেনে এবং কঠোরভাবে প্রয়োগ করে।

আজ পৃথিবীতে আমরা যা কিছু প্রশংসা করি —বিজ্ঞান, শিল্পকলা, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং আবিষ্কার— সে সবই এক ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর সৃজনশীল দক্ষতার ফসল, এবং সম্ভবত এগুলোর উৎস একটি একক জাতির মধ্যেই নিহিত । সভ্যতার স্থায়িত্ব একমাত্র এই মানুষদের উপরই নির্ভরশীল । যখন তারা বিলীন হয়ে যাবে, তখন এই পৃথিবীকে যা কিছু সুন্দর করে তুলেছে, তার সবকিছুই তারা কবরে সঙ্গে নিয়ে যাবে।

উদাহরণস্বরূপ, ভূমি মানুষের উপর যতই ব্যাপক প্রভাব ফেলুক না কেন, এই প্রভাব সর্বদা তাদের জাতির উপর নির্ভর করবে। ভূমির স্বল্পতা কোনো একটি জাতিকে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ও সর্বোচ্চ সাফল্য অর্জনে উদ্বুদ্ধ করতে পারে ; আবার অন্য কোনো জাতির জন্য, ভূমির স্বল্পতা দুর্দশা ও অপুষ্টি এবং তার সমস্ত পরিণতির কারণ হতে পারে । মানুষের অভ্যন্তরীণ গুণাবলীই সর্বদা নির্ধারণ করে যে বাহ্যিক পরিস্থিতি তাদের কীভাবে প্রভাবিত করবে । যা একটি জাতিকে অনাহারে রাখে , তা-ই অন্য একটি জাতিকে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে ।

অতীতের সকল মহান সভ্যতার পতন ঘটেছিল কারণ রক্ত দূষণের ফলে আদি সৃষ্টিকর্তা জাতি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল ।

এই পতনের গভীরতম কারণটি হলো , মানুষ এই নীতিটি উপেক্ষা করেছে যে সমস্ত সংস্কৃতি মানুষের উপর নির্ভরশীল, এর বিপরীতটা নয়। অন্য কথায়, একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতির টিকে থাকার জন্য, যারা এটি তৈরি করে সেই ধরনের মানুষদেরও টিকে থাকতে হবে । কিন্তু এই টিকে থাকা এক অমোঘ নিয়মের সাথে জড়িত যে, সবচেয়ে শক্তিশালীকেই জয়ী হতে হবে এবং কেবল সবচেয়ে শক্তিশালীরই টিকে থাকার অধিকার আছে।

যে বাঁচতে চায়, তাকে অবশ্যই লড়াই করতে হবে। এই নিরন্তর পৃথিবীতে যে লড়াই করতে চায় না ...
সংগ্রামই জীবনের নিয়ম , এর অস্তিত্ব থাকার কোনো অধিকার নেই।

কথাটা শুনতে কঠোর মনে হতে পারে ; কিন্তু আসলে , এটাই জগতের নিয়ম । তার চেয়েও কঠোর পরিণতি তার, যে মনে করে সে প্রকৃতিকে জয় করতে পারবে, অথচ বাস্তবে তাকে অপমান করে । যন্ত্রণা, দুর্দশা এবং মহামারী—এগুলোই তার উত্তর।

যে ব্যক্তি জাতির আইনকানুনকে অগ্রাহ্য বা অবজ্ঞা করে, সে তার কাঙ্ক্ষিত সুখ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে । সে শ্রেষ্ঠ জাতির বিজয়ের পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং এর মাধ্যমে তাদের অগ্রগতি ব্যাহত করে।

Machine Translated by Google

মানব প্রগতির মৌলিক শর্ত। মানবিক অনুভূতিতে ভারাক্রান্ত হয়েও সে তাদের স্তরে নেমে আসে, যারা আরও উঁচুতে উঠতে অক্ষম।

* * *

কোন জাতি বা জাতিসমূহ মানব সংস্কৃতির আদি ধারক ছিল এবং সেই সূত্রে মানবতা বলতে আমরা যা বুঝি তার প্রকৃত স্রষ্টা ছিল — এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা বৃথা। বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অনেক সহজ। এক্ষেত্রে উত্তরটি সরল ও সুস্পষ্ট। মানব সংস্কৃতির প্রতিটি প্রকাশ, শিল্পকলা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতিটি কাজ যা আমরা আজ দেখি, তা প্রায় একচেটিয়াভাবে আর্যদের সৃজনশীল শক্তিরই ফসল। এই সত্যটি এই উপসংহারকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করে যে, আর্যরাই এক উন্নততর মানবতার জন্ম দিয়েছিল ; সুতরাং, 'মানব' ধারণাটি বলতে আমরা যা বুঝি, আর্যরাই তার আদি রূপের প্রতিনিধিত্ব করে। সে মানবতার প্রমিথিউস, যার উজ্জ্বল ললাট থেকে প্রতিভার ঐশ্বরিক স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, যা জ্ঞানের রূপে সেই অগ্নিশিখাকে নিত্যপ্রয়োজনে প্রজ্বলিত করে, যা রাতের অন্ধকারকে আলোকিত করে, রহস্যের পর্দা সরিয়ে দেয় এবং মানুষকে সকল সৃষ্টির অধিপতি হওয়ার পথ দেখায়।

পৃথিবীতে। যদি এটি বিলুপ্ত হয়ে যায়, তবে পৃথিবী গভীর অন্ধকারে ছেয়ে যাবে; কয়েক হাজার বছরের মধ্যে মানব সংস্কৃতি বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং পৃথিবী মরুভূমিতে পরিণত হবে।

যদি আমরা মানবজাতিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করি—সংস্কৃতির স্রষ্টা, সংস্কৃতির ধারক এবং সংস্কৃতির ধ্বংসকারী—তবে কেবল আর্যদেরই প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। তারাই মানব সংস্কৃতির সমস্ত মহান সৌধের ভিত্তি স্থাপন করেছিল এবং প্রাচীর নির্মাণ করেছিল। এই কাঠামোগুলোর কেবল আকৃতি এবং রঙকেই বিভিন্ন জাতির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের ফল হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। আর্যরাই এই মহান সৌধগুলো নির্মাণ করেছিল এবং মানব প্রগতির পরিকল্পনা তৈরি করেছিল; কেবল সেগুলোর বাস্তবায়নের পদ্ধতিকেই স্বতন্ত্র জাতিগুলোর বৈশিষ্ট্যের ফল হিসেবে গণ্য করা যায়। কয়েক দশকের মধ্যেই সমগ্র পূর্ব এশিয়া একটি সংস্কৃতি আত্মসাৎ করে তাকে নিজেদের বলে দাবি করেছিল, অথচ এই সংস্কৃতির ভিত্তি ছিল গ্রিক চিন্তাধারা এবং টিউটোনদের দক্ষতা। কেবল এর বাহ্যিক রূপেই—অন্তত কিছুটা হলেও— এশীয় অনুপ্রেরণার ছাপ দেখা যায়। যেমনটা কেউ কেউ বিশ্বাস করেন, এটা সত্য নয় যে জাপান তার নিজস্ব সংস্কৃতিতে ইউরোপীয় প্রযুক্তি যুক্ত করেছিল। বরং সত্যটা হলো, ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাপানি সভ্যতার কিছু বৈশিষ্ট্য দ্বারা অলঙ্কৃত হয়েছিল।

জাপানের বর্তমান জীবনযাত্রার ভিত্তি মূল জাপানি সংস্কৃতি থেকে উদ্ভূত নয় , যদিও
এটি দেশটির বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে সংজ্ঞায়িত করে , যা তাদের মৌলিক ভিন্নতার কারণে ইউরোপীয় পর্যবেক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; আধুনিক জাপানি জীবনের প্রকৃত ভিত্তি হলো ইউরোপ ও আমেরিকার, অর্থাৎ আর্যদের, বিপুল বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সাফল্য। শুধুমাত্র এই ভিত্তিগুলো গ্রহণ করার মাধ্যমেই এশিয়ার বিভিন্ন জাতি বিশ্বের আধুনিক অগ্রগতিতে নিজেদের স্থান করে নিতে পারে। ইউরোপ ও আমেরিকার বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সাফল্য দৈনন্দিন জীবনধারণের উপকরণের জন্য সংগ্রামের ভিত্তি প্রদান করে। এগুলো এই সংগ্রামের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও সরঞ্জাম সরবরাহ করে এবং শুধুমাত্র এদের বাহ্যিক রূপগুলোই ক্রমান্বয়ে জাপানি জীবনধারার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া হয়েছে।

যদি আজ জাপানের উপর আর্য প্রভাব শেষ হয়ে যায় —এই ধরে নিয়ে যে ইউরোপ ও আমেরিকার পতন ঘটবে—তবে জাপানি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বর্তমান অগ্রগতি হয়তো অল্প কিছুদিন চলতে পারে; কিন্তু কয়েক দশকের মধ্যেই অনুপ্রেরণার উৎস শুকিয়ে যাবে, জাপানের মৌলিক বৈশিষ্ট্যই প্রাধান্য পাবে , এবং সমগ্র বর্তমান সভ্যতা স্থবির হয়ে সেই নিদ্রায় পুনরায় নিমজ্জিত হবে যেখান থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে আর্য সংস্কৃতির প্রভাবে এটি জেগে উঠেছিল। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে , ঠিক যেমন জাপানের বর্তমান বিকাশ আর্যদের প্রভাবের সাথে যুক্ত ছিল, তেমনি অনাদিকাল থেকেই বাহ্যিক প্রভাব ও হস্তক্ষেপ তৎকালীন জাপানি সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছিল। এই মতটি এই ঘটনা দ্বারা জোরালোভাবে সমর্থিত হয় যে প্রাচীন জাপানি সভ্যতা স্থবির ও প্রস্তরীভূত হয়ে গিয়েছিল। এই ধরনের প্রক্রিয়া কেবল তখনই ঘটতে পারে যখন কোনো জাতি তার সৃজনশীল জাতিগত মূল ভিত্তি হারায়, অথবা যখন সেই অঞ্চলে সাংস্কৃতিক বিকাশকে জাগিয়ে তোলা ও টিকিয়ে রাখা বাহ্যিক প্রভাব বন্ধ হয়ে যায়। যদি এটা দেখানো যায় যে কোনো জাতি তার সংস্কৃতির মৌলিক উপাদানগুলোর জন্য বিদেশী জাতিদের কাছে ঋণী, যাদেরকে তারা আত্মীকরণ ও বিকশিত করেছে, এবং

Machine Translated by Google

যদি বাহ্যিক প্রভাব শেষ হয়ে যাওয়ার পর এই সংস্কৃতি জীবাশ্মে পরিণত হয় , তবে এমন একটি জাতিকে সংস্কৃতির বাহক বলা যেতে পারে, কিন্তু কখনোই স্রষ্টা নয় ।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন জাতিকে কঠোর পরীক্ষার আওতায় আনলে দেখা যাবে যে, তাদের প্রায় কেউই নিজস্ব সংস্কৃতি সৃষ্টি করেনি, বরং প্রায় সকলেই অন্যত্র সৃষ্ট সংস্কৃতির প্রাপক ছিল।

এই বিকাশকে সর্বদা একটি অনুরূপ পদ্ধতিতে সংঘটিত হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে : আর্য উপজাতিরা, যারা সংখ্যায় প্রায়শই হাস্যকরভাবে ছোট ছিল, বিদেশী জাতিদের জয় করত এবং নতুন ভূমির জীবনযাত্রার পরিস্থিতি (জলবায়ু, উর্বরতা ইত্যাদি) দ্বারা উৎসাহিত হয়ে এবং নিকৃষ্ট জাতির দ্বারা প্রদত্ত প্রচুর শ্রমশক্তির সুবিধা নিয়ে , সেইসব বৌদ্ধিক ও সাংগঠনিক ক্ষমতার বিকাশ ঘটাত যা এই বিজয়ী উপজাতিদের মধ্যে এতদিন সুপ্ত ছিল । কয়েক হাজার বছর বা এমনকি কয়েক শতাব্দী ধরে , তারা এমন সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছিল যার মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি তাদের স্রষ্টাদের সাথে সম্পূর্ণরূপে মিলে যেত, যদিও তা সেই ভূমির বিশেষত্ব এবং বিজিত জনগণের বৈশিষ্ট্যের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া হয়েছিল। যাইহোক, পরিশেষে , বিজয়ী জাতি সেই নীতির বিরোধিতা করেছিল যে

তারাই সর্বপ্রথম নিজেদের জাতির বিশুদ্ধতা বজায় রাখার বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করেন এবং মিশ্রণ শুরু করেন। অধীনস্থ জাতিগুলোর সাথে । এইভাবে তারা তাদের পৃথক অস্তিত্বের অবসান ঘটায় ; স্বর্গে সংঘটিত আদি পাপের ফলস্বরূপ অপরাধীদের অবশ্যই বহিষ্কার করা হবে ।

হাজার বছর বা তারও বেশি সময় পরে, এই প্রাক্তন প্রভুদের শেষ দৃশ্যমান চিহ্নগুলি পাওয়া যায় আর্য রক্তের মাধ্যমে অধীনস্থ জাতির মধ্যে সঞ্চারিত ফ্যাকাশে গাত্রবর্ণে এবং আর্যদের একদা সৃষ্ট জীবাশ্মীভূত সংস্কৃতিতে । যখন একজন বিজয়ীর রক্ত, যিনি কেবল দেহে নয় , আত্মাতেও বিজয়ী ছিলেন, একটি নিকৃষ্ট জাতির রক্তে মিশে যায় , তখন মানব সংস্কৃতি ও অগ্রগতির মশালের জ্বালানি উবে যায়। যখন প্রাক্তন প্রভু জাতির রক্ত প্রতীক ও স্মৃতি হিসেবে বংশধরদের রক্তে এক সামান্য পরিবর্তন রেখে যায়, তখন সেই আদিম অগ্নির বাহকদের সৃষ্টিকর্ম থেকে বিকিরিত ক্ষীণ আলোয় সাংস্কৃতিক জীবনের আঁধার কিছুটা আলোকিত হয় । তাদের সেই দীপ্তি অধীনস্থ জাতির ফিরে যাওয়া বর্বরতার মাঝে জ্বলে ওঠে এবং প্রায়শই একজন সাধারণ পর্যবেক্ষককে এই বিশ্বাস করতে বাধ্য করে যে সে তার সামনে একটি সমসাময়িক জাতির প্রতিচ্ছবি দেখছে , যদিও বাস্তবে সে অতীতের প্রতিবিম্বিত একটি আয়নার দিকে তাকিয়ে থাকে ।

এমনটা হতে পারে যে, কোনো জাতি তার ইতিহাসে দ্বিতীয়বার, বা তারও বেশিবার, তার সংস্কৃতির আদি স্রষ্টাদের সংস্পর্শে আসবে এবং এই সুদূর অতীতের সংযোগের কথা হয়তো মনেও রাখবে না । সহজাত প্রবৃত্তিতে, পূর্ববর্তী প্রভু জাতির রক্তের অবশিষ্টাংশ এই নতুন ঘটনার জন্য সংগ্রাম করবে , এবং যা পূর্বে কেবল চাপের মুখে সম্ভব ছিল , তা এখন স্বেচ্ছায় অর্জন করা যাবে । সংস্কৃতির একটি নতুন ঢেউ জেগে ওঠে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত টিকে থাকে, যতক্ষণ না বিজিত জাতির সাথে আন্তঃপ্রজননের ফলে এর ধারকদের রক্ত কলুষিত হয়ে যায়।

যারা সভ্যতার বিশ্ব ইতিহাস অধ্যয়ন করেন, তাদের কাজ হবে বাহ্যিক তথ্যের প্রবল স্রোতে শ্বাসরুদ্ধ না হয়ে এই দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসকে পরীক্ষা করা; যেমনটা আমাদের বর্তমান ঐতিহাসিক বিজ্ঞানগুলোতে প্রায়শই দেখা যায়।

যেসব জাতি কেবল সংস্কৃতির ধারক, তাদের মধ্যে সংঘটিত পরিবর্তনের এই সংক্ষিপ্ত রূপরেখাটি বিশ্বের সংস্কৃতির প্রকৃত স্রষ্টা , অর্থাৎ আর্যদের, বিকাশ, কার্যকলাপ এবং বিলুপ্তির একটি চিত্রও তুলে ধরে।

যেমন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একজন প্রতিভাবানের প্রতিভা প্রকাশের জন্য একটি বিশেষ উপলক্ষ এবং কখনও কখনও একটি বিশেষ উদ্দীপনার প্রয়োজন হয়, তেমনি জাতিসমূহের জীবনেও এমনটাই ঘটে। দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমি ও গতানুগতিকতার মধ্যে , এমনকি বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও আর দশজনের মতোই সাধারণ বলে মনে হন এবং তাঁদের স্বদেশবাসীর গড় স্তর থেকে উপরে উঠতে পারেন না । কিন্তু যখন এই ধরনের মানুষেরা এমন কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে পড়েন যা অন্যদের বিচলিত ও অস্থির করে তোলে, তখন আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ গুণাবলীসম্পন্ন একজন বিনয়ী ব্যক্তি তাঁর প্রতিভা প্রকাশ করেন, যা প্রায়শই তাঁকে দৈনন্দিন জীবনে আগে থেকে চেনা মানুষদের অবাক করে দেয় । এই কারণেই একজন নবী তাঁর নিজের দেশে খুব কমই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন। যুদ্ধ এই ঘটনাটি পর্যবেক্ষণ করার এক চমৎকার সুযোগ করে দেয় । দুর্ভোগের সময়ে, যখন অন্যরা হতাশ হয়ে পড়ে, তখন আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ ছেলেরা হঠাৎ করেই নায়ক হয়ে ওঠে —সংকল্পে পূর্ণ, মৃত্যুর উপস্থিতিতেও নির্ভীক এবং এক অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শনকারী।

এই পরিস্থিতিতে শান্তভাবে বিচার করার ক্ষমতা । যদি সেই সময়টা না আসত

Machine Translated by Google

কেউই ভাবতে পারত না যে এই যুবকের দেহে একজন বীরের আত্মা সুপ্ত ছিল। প্রতিভাকে সামনে নিয়ে আসার জন্য প্রায় সবসময়ই একটি বিশেষ প্রেরণার প্রয়োজন হয়। ভাগ্যের হাতুড়ি, যা একজনকে এত সহজে চূর্ণ করে দেয় , অন্যজনকে আঘাত করার সময় হঠাৎ ইস্পাতের প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। যখন দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ খোলসটি ফেটে যায়, তখন ভেতরে লুকিয়ে থাকা মূল সত্তাটি এক বিস্মিত বিশ্বের চোখের সামনে নিজেকে প্রকাশ করে। চারপাশের জগৎ জেদ করে বিশ্বাস করতে চায় না যে, যা এত সাদৃশ্যপূর্ণ মনে হচ্ছিল, তা হঠাৎ এত ভিন্ন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছে। সম্ভবত যখনই কোনো অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে , তখনই এই প্রক্রিয়াটির পুনরাবৃত্তি হয়।

যদিও একজন উদ্ভাবক তাঁর আবিষ্কারকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার আগে বিখ্যাত হন না , তবুও এটা ভাবা ভুল যে তাঁর মধ্যে তার আগে সৃজনশীল প্রতিভার অস্তিত্ব ছিল না। প্রকৃত সৃষ্টির ক্ষমতা নিয়ে জন্মানো একজন ব্যক্তির মধ্যে জন্মের মুহূর্ত থেকেই প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ বাস করে। প্রকৃত প্রতিভা একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য। এটি কখনোই শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের ফল হতে পারে না।

আমি আগেই যেমন উল্লেখ করেছি, এই একই কথা শুধু ব্যক্তির ক্ষেত্রেই নয়, জাতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যে জাতিগুলো তাদের ইতিহাসের নির্দিষ্ট সময়ে সৃজনশীল ক্ষমতা প্রদর্শন করেছে, তারা স্বভাবতই সর্বদা সৃজনশীল ছিল, যদিও এই সত্যটি অগভীর পর্যবেক্ষকদের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়ে থাকতে পারে।
এখানেও, বাহ্যিক স্বীকৃতি হলো ব্যবহারিক সাফল্যের ফল। যেহেতু জগৎ প্রতিভাকে সরাসরি চিনতে পারে না, তাই এটি কেবল আবিষ্কার, উদ্ভাবন, ভবন, চিত্রকর্ম ইত্যাদির রূপে প্রতিভার দৃশ্যমান প্রকাশ দেখতে পায় ; কিন্তু এক্ষেত্রেও এই স্বীকৃতি আসতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। ঠিক যেমন প্রতিভাধর বা অন্তত বিপুল মেধাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি বিশেষ পরিস্থিতি না পাওয়া পর্যন্ত এই উপহারকে কাজে লাগাতে পারে না, তেমনি জাতিসমূহের জীবনেও সৃজনশীল ক্ষমতাকে প্রায়শই বিশেষ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়।

নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে উদ্দীপিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।

এই সত্যের সর্বোত্তম উদাহরণ হলো আর্য জাতি, যারা অতীতেও মানব প্রগতির ধ্বজাধারী ছিল এবং এখনও আছে। যখনই ভাগ্য তাদের বিশেষ পরিস্থিতিতে ফেলে, তাদের ক্ষমতা বিকশিত হতে শুরু করে এবং মূর্ত রূপ ধারণ করে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে তারা যে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য তৈরি করে, তা প্রায় সবসময়ই সেই ভূমি, জলবায়ু এবং জাতির উপর নির্ভর করে যাদের তারা বশীভূত করে। শেষোক্ত উপাদানটি—অর্থাৎ জাতির বৈশিষ্ট্য— সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

সভ্যতার কর্মকাণ্ড যে প্রযুক্তিগত পরিস্থিতিতে সংঘটিত হয়, তা যত বেশি আদিম হয় , যন্ত্রের পরিবর্তে সংগঠিত ও নিযুক্ত করা যায় এমন একটি শ্রমশক্তির অস্তিত্ব তত বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। যদি তারা তাদের বিজিত নিকৃষ্ট জাতিদের কাজে লাগাতে না পারত , তবে আর্যরা ভবিষ্যৎ সংস্কৃতির পথে কখনোই প্রথম পদক্ষেপ নিতে পারত না; ঠিক যেমন গৃহপালিত পশুর সাহায্য ছাড়া যন্ত্রের আবিষ্কার হতো না, যা শেষ পর্যন্ত পশুশক্তির প্রয়োজনীয়তা দূর করেছিল। "নিগ্রো তার কাজ শেষ করেছে, নিগ্রো এখন যেতে পারে ," এই প্রবাদটি দুর্ভাগ্যবশত পুরোপুরি সত্য। হাজার হাজার বছর ধরে ঘোড়া মানুষের বিশ্বস্ত সেবক হিসেবে মানব প্রগতির ভিত্তি স্থাপনে সাহায্য করেছে , যা পরবর্তীকালে ঘোড়াকে অপ্রয়োজনীয় করে তুলেছে। তবুও এটি ছাড়া মানুষ তার বিকাশের বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছাতে পারত না।

উন্নততর সভ্যতা সৃষ্টির অন্যতম অপরিহার্য পূর্বশর্ত হলো নিম্নতর জাতির সদস্যদের অস্তিত্ব। কেবল তারাই সেই অনুপস্থিত যন্ত্রগুলোর অভাব পূরণ করতে পারে, যা ছাড়া কোনো অগ্রগতি সম্ভব নয়। এটা নিশ্চিত যে, মানব সভ্যতার প্রথম পর্যায়গুলো গৃহপালিত পশুর ব্যবহারের চেয়ে নিম্নতর জাতির সদস্যদের কর্মসংস্থানের উপরই বেশি নির্ভরশীল ছিল।

কেবলমাত্র যখন পরাধীন জাতিদের দাস হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল, তখনই পশুদের অনুরূপ পরিণতি ঘটেছিল, এর উল্টোটা নয়, যেমনটা কেউ কেউ আমাদের বিশ্বাস করাতে চায়। প্রথমে বিজিত শত্রুকে লাঙলের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল, এবং কেবল পরে বলদ ও ঘোড়া তার স্থান নিয়েছিল। কেবলমাত্র শান্তিবাদীরাই একে মানব অধঃপতনের লক্ষণ বলে মনে করতে পারে। এই ধরনের লোকেরা বুঝতে ব্যর্থ হয় যে, মানুষ সভ্যতার যে স্তরে পৌঁছেছে , সেখানে পৌঁছানোর জন্য এই ধরনের বিবর্তন অপরিহার্য ছিল ; যে সভ্যতাকে তারা এখন নিজেদের বক্তব্যের প্রতি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টায় ব্যবহার করে।

মানব অগ্রগতিকে একটি অসীম মই বেয়ে ওঠার সাথে তুলনা করা যেতে পারে।
নিম্ন স্তরগুলো অতিক্রম না করা পর্যন্ত তুমি উচ্চ স্তরে পৌঁছাতে পারবে না। আর্যদের অবশ্যই-

Machine Translated by Google

তাকে যুক্তি ও বাস্তবতার দেখানো পথই অনুসরণ করতে হয়েছিল , তার স্বপ্নের পথ নয় ।
আধুনিক শান্তিবাদীরা। এই প্রকৃত পথটি কঠিন; কিন্তু কেবল এটিই শেষ পর্যন্ত সেই লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়, যা অন্যরা তাদের স্বপ্নে কল্পনা করে। কিন্তু সত্য হলো, এই স্বপ্নদ্রষ্টারা একজন ব্যক্তিকে তার লক্ষ্যের কাছে আনার পরিবর্তে দূরে সরিয়ে দেয়।

এটা কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না যে সভ্যতার প্রথম রূপগুলো সেখানেই গড়ে উঠেছিল যেখানে আর্যরা নিম্নতর জাতিদের সংস্পর্শে এসে তাদের বশীভূত করেছিল এবং বাধ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেছিল। এই নিম্নতর জাতিদের সদস্যরাই ক্রমবর্ধমান সভ্যতার সেবায় প্রথম হাতিয়ারে পরিণত হয়েছিল।

সুতরাং , আর্যদের একটি সুস্পষ্ট পথ অনুসরণ করতে হয়েছিল । বিজেতা হিসেবে, তিনি নিম্নতর জাতিদের বশীভূত করতেন এবং নিজের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য অনুসারে তাদের শারীরিক শক্তিকে নিজের নেতৃত্বে পরিচালিত করতেন। তাদেরকে কঠিন হলেও উপকারী শ্রমে বাধ্য করার মাধ্যমে , তিনি কেবল বিজিতদের জীবনই রক্ষা করেননি , বরং তথাকথিত "স্বাধীনতার" অবস্থায় তাদের জীবনকে আগের চেয়ে সম্ভবত আরও সহজ করে তুলেছিলেন। যদিও তিনি নির্মমভাবে তাদের প্রভু হিসেবে নিজের অবস্থান বজায় রেখেছিলেন , তিনি কেবল প্রভুই ছিলেন না, বরং সভ্যতাকে রক্ষা ও বিকশিতও করেছিলেন। এটি সম্পূর্ণরূপে তার সহজাত ক্ষমতার উপর এবং ফলস্বরূপ, আর্য জাতির অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল ছিল । কিন্তু, যেই মুহূর্তে তার প্রজারা তাদের বিজেতাদের সমপর্যায়ে পৌঁছাতে শুরু করল , এবং সম্ভবত তাদের ভাষা ব্যবহার করতে শুরু করল , প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যকার বিভেদরেখা ভেঙে পড়ল। আর্যরা জাতিগত বিশুদ্ধতাকে উপেক্ষা করেছিল এবং এর ফলে তাদের সৃষ্ট স্বর্গে বসবাসের অধিকার হারিয়েছিল । তারা জাতিগত মিশ্রণে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে এবং ধীরে ধীরে তাদের সাংস্কৃতিক সৃজনশীলতা হারাতে থাকে, যতক্ষণ না অবশেষে তারা কেবল মানসিকভাবেই নয় , শারীরিকভাবেও তাদের পূর্বপুরুষদের চেয়ে বশীভূত আদিবাসীদের মতো বেশি হয়ে ওঠে ।

কিছুকাল তিনি তখনও টিকে থাকা সংস্কৃতির রাজধানীতে বাস করতে পেরেছিলেন, কিন্তু শীঘ্রই স্থবিরতা এসে গেল এবং তিনি বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেলেন।

এভাবেই সংস্কৃতি ও সাম্রাজ্যের পতন ঘটে এবং নতুন সৃষ্টির পথ খুলে যায়।

সুতরাং, রক্তের মিশ্রণ এবং তার ফলস্বরূপ জাতিগত বিশুদ্ধতার অবক্ষয়ই প্রাচীন সভ্যতাগুলোর পতনের একমাত্র কারণ ; কেননা জাতি কখনো যুদ্ধের দ্বারা ধ্বংস হয় না, বরং প্রতিরোধ ক্ষমতা হারানোর ফলেই ধ্বংস হয়, যা বিশুদ্ধ জাতিগুলোর একচেটিয়া বৈশিষ্ট্য । এই পৃথিবীতে, যা কিছু জাতিগতভাবে বিশুদ্ধ নয়, তাই আবর্জনা। প্রতিটি ঐতিহাসিক ঘটনা ভালো বা মন্দ যাই হোক না কেন, আত্মরক্ষার জাতিগত প্রবৃত্তির প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

* * *

আর্যদের এই প্রভাবশালী গুরুত্বের কারণ কী, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যেতে পারে
এটি আর্যদের মধ্যে আত্মরক্ষার প্রবলতর প্রবৃত্তি থাকার বিষয়টির দিকে ততটা ইঙ্গিত করে না, বরং এটি যে নির্দিষ্ট উপায়ে নিজেকে প্রকাশ করে, সেদিকেই নির্দেশ করে । আত্মগত দৃষ্টিকোণ থেকে, বেঁচে থাকার ইচ্ছা সর্বত্রই সমানভাবে প্রবল, এবং কেবল এর প্রকাশের রূপগুলোই ভিন্ন ।
এটি প্রকাশ করে। সবচেয়ে আদিম জীবদের মধ্যে, আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি আত্ম-যত্নের বাইরে প্রসারিত হয় না । আত্মকেন্দ্রিকতা, যাকে আমরা এই চালিকাশক্তি বলতে পারি , এতটাই প্রভাবশালী যে এর মধ্যে একটি কালিক উপাদানও থাকে; অর্থাৎ, কেবল বর্তমান মুহূর্তটিই গুরুত্বপূর্ণ, এবং ভবিষ্যতের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। একটি প্রাণী কেবল নিজের জন্যই বাঁচে, কেবল ক্ষুধার্ত হলেই খাবার খোঁজে এবং কেবল নিজের জীবন রক্ষার জন্যই লড়াই করে । যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি একচেটিয়াভাবে এইভাবেই প্রকাশিত হয়, ততক্ষণ সমাজ গঠনের কোনো ভিত্তি থাকে না; এমনকি সবচেয়ে আদিম রূপ, অর্থাৎ পরিবারের ক্ষেত্রেও নয়।

নারী -পুরুষ দ্বারা গঠিত সমাজ , যুগল -বন্ধনের ঊর্ধ্বে , আত্মরক্ষার প্রবৃত্তির একটি সম্প্রসারণ দাবি করে, যেহেতু নিজের জন্য লড়াই করার ইচ্ছাকে সঙ্গীর ক্ষেত্রেও প্রসারিত করতে হয়েছিল । পুরুষ কখনও কখনও নারীর জন্য খাদ্যের জোগান দেয়, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পিতামাতা উভয়েই সন্তানের জন্য খাদ্যের জোগান দেয় । তারা প্রায় সবসময়ই একে অপরকে রক্ষা করতে প্রস্তুত থাকে ; সুতরাং এখানেই আমরা আত্মত্যাগের চেতনার প্রথম, যদিও অত্যন্ত সরল, প্রকাশ দেখতে পাই । যেই মুহূর্তে এই চেতনা সংকীর্ণ গণ্ডি ছাড়িয়ে প্রসারিত হয়...

Machine Translated by Google

পরিবারের কাঠামোর মধ্যে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় , যার মাধ্যমে বৃহত্তর সম্প্রদায় এবং অবশেষে রাষ্ট্রও গঠিত হতে পারে ।

মানবজাতির সর্বনিম্ন প্রজাতি এই ক্ষমতাটি কেবল অতি সামান্য মাত্রায় প্রকাশ করে, ফলে তারা প্রায়শই পারিবারিক সম্প্রদায় গঠনের বাইরে যেতে পারে না । নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে পেছনে ফেলার ক্রমবর্ধমান প্রবণতার সাথে সাথে তারা বিকশিত হয়...
আরও জটিল সম্প্রদায়গুলোকে সংগঠিত করার ক্ষমতা ।

অন্যের স্বার্থে নিজের কাজ এবং প্রয়োজনে জীবন উৎসর্গ করার মানসিকতা আর্য জাতির মধ্যে তার সর্বোচ্চ উন্নত রূপে প্রকাশিত হয়। আর্যদের মহত্ত্বের ভিত্তি হলো...
তার বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতার উপর নয়, বরং সমাজের সেবায় নিজের সমস্ত সামর্থ্য উৎসর্গ করার ইচ্ছার উপর। এখানেই আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি তার মহত্তম রূপ লাভ করে ।
আর্যরা স্বেচ্ছায় জনস্বার্থে নিজেদের সমর্পণ করবে এবং প্রয়োজনে সম্প্রদায়ের জন্য নিজের জীবনও উৎসর্গ করবে ।

আর্যদের গঠনমূলক ক্ষমতা এবং সংস্কৃতি নির্মাণে বিশেষ দক্ষতা শুধুমাত্র তার বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিভার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি। যদি তাই হতো, তবে সে কেবল ধ্বংস সাধনেই সক্ষম হতো এবং সংগঠনের ক্ষমতা তার কখনোই থাকত না ; কারণ এই ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে ব্যক্তির নিজের মতামত ও স্বার্থ ত্যাগ করে সেগুলোকে মানবগোষ্ঠীর সেবায় উৎসর্গ করার ইচ্ছার উপর। সাধারণ মঙ্গলের সেবা করার মাধ্যমেই সে তার পুরস্কার লাভ করে। উদাহরণস্বরূপ, সে সরাসরি নিজের জন্য কাজ করে না, বরং সে যে গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, সেই গোষ্ঠীর মধ্যেই কাজ করে, কেবল নিজের লাভের জন্য নয়, বরং সাধারণ মঙ্গলের জন্য। এই মনোভাবের চেতনা ‘কর্ম’ শব্দটির মাধ্যমে প্রকাশ পায় , যার অর্থ দৈনন্দিন জীবনধারণের উপায় নয় , বরং এমন উৎপাদনশীল কাজ যা সম্প্রদায়ের স্বার্থের সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে না। যখনই কোনো ব্যক্তির কার্যকলাপ শুধুমাত্র আত্মরক্ষার প্রবৃত্তির দিকে পরিচালিত হয় , তাকে বলা হয়

চুরি বা সুদখোরি, ডাকাতি বা সিঁধেল চুরি, ইত্যাদি।

এই মানসিক মনোভাব, যা আত্মস্বার্থকে জনস্বার্থের কাছে গৌণ করে দেয়, তা-ই যেকোনো ধরনের প্রকৃত মানব সভ্যতার প্রথম পূর্বশর্ত। কেবল এই চেতনা থেকেই মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলোর উদ্ভব হয়েছে , যার মূল কারিগররা প্রায় কোনো পারিশ্রমিকই পাননি , কিন্তু যা তাদের উত্তরসূরিদের জন্য প্রচুর লাভের উৎস হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে । কেবল এই চেতনাই ব্যাখ্যা করতে পারে কেন প্রায়শই এমন হয় যে , মানুষ একটি কঠিন কিন্তু সৎ জীবন সহ্য করতে পারে , যা তাদের শ্রমের বিনিময়ে একটি দরিদ্র ও নগণ্য জীবন ছাড়া আর কিছুই দেয় না। কিন্তু এই ধরনের জীবন সেই ভিত্তিগুলোকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে যার উপর সমাজ দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেক শ্রমিক, কৃষক, উদ্ভাবক, সরকারি কর্মচারী ইত্যাদি, যারা ভাগ্য বা ব্যক্তিগত সাফল্য অর্জন না করেই কঠোর পরিশ্রম করে , তারা এই ধারণারই প্রবক্তা, যদিও তারা হয়তো তাদের কাজের গভীর তাৎপর্য সম্পর্কে কখনোই সচেতন হন না ।

কাজ সম্পর্কে যা কিছু বলা যায় —যা খাদ্য নিশ্চিতকরণের মৌলিক শর্ত এবং মানব প্রগতির মূল উপায় —তা মানুষ ও তার সভ্যতার সুরক্ষার জন্য সম্পাদিত কাজের ক্ষেত্রে আরও বেশি সত্য। ত্যাগ

সম্প্রদায়ের নামে জীবন উৎসর্গ করাই সকল ত্যাগের চূড়ান্ত পরিণতি । একমাত্র এইভাবেই আমরা মানুষের গড়া প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করতে পারি এবং নিশ্চিত করতে পারি যে তা মানুষের হাতে বা প্রকৃতির দ্বারা ধ্বংস হবে না ।

জার্মান ভাষায় এমন একটি শব্দ আছে যা সকল কাজের এই অন্তর্নিহিত চেতনাকে নিখুঁতভাবে তুলে ধরে: Pflichterfullung, অর্থাৎ নিজের স্বার্থ বিবেচনা করার আগে জনস্বার্থে সেবা করা । এই ধরনের কার্যকলাপের অন্তর্নিহিত চেতনা স্বার্থপরতার বিপরীত এবং একে আদর্শবাদ বলা যেতে পারে । এই ধারণাটি সম্প্রদায়ের জন্য একজন ব্যক্তির আত্মত্যাগের ইচ্ছাকে বোঝায় ।

আমাদের নিজেদেরকে প্রতিনিয়ত মনে করিয়ে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি যে , ভাববাদ কেবল আবেগের একটি বাহ্যিক প্রকাশ নয়, বরং তা মানব সভ্যতার অস্তিত্বের জন্য এক অপরিহার্য শর্ত ছিল এবং থাকবে ; এই একই ধারণা থেকে 'মানুষ' শব্দটির উদ্ভব হয়েছে।
এই চিন্তাধারার কারণেই আর্যরা বিশ্বে তাদের অবস্থান লাভ করেছে । এবং ‘ মানবতা ’ ধারণার বিকাশের জন্য বিশ্বও আর্য মননের কাছে ঋণী ; কারণ একমাত্র এই চেতনা থেকেই মানবতার উদ্ভব হয়েছিল।

Machine Translated by Google

এক সৃজনশীল শক্তি যা শারীরিক শক্তি ও প্রথম শ্রেণীর বুদ্ধিমত্তার অনন্য সমন্বয় ঘটিয়ে মানব সভ্যতার স্মারকসমূহ সৃষ্টি করেছে।

ভাববাদ ছাড়া সকল মানসিক ক্ষমতা, এমনকি সবচেয়ে মেধাবীগুলোও, নিছকই অর্থহীন হয়ে পড়বে।
অন্তর্নিহিত মূল্যহীন বাহ্যিক ঘটনা , এবং তা কখনোই সৃজনশীল শক্তি হতে পারে না।

যেহেতু প্রকৃত ভাববাদ হলো ব্যক্তির স্বার্থ ও জীবনকে সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও জীবনের অধীন করা, এবং যেহেতু সম্প্রদায়ই আবার সকল প্রকার সংগঠনের পূর্বশর্ত , তাই ভাববাদ গভীরতম অর্থে প্রকৃতির পরম উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই অনুভূতিই মানুষকে স্বেচ্ছায় স্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ করে যে, শক্তি ও ক্ষমতা নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত, এবং এর মাধ্যমে সে মহাবিশ্বের সমগ্র শৃঙ্খলা যে কণাগুলো দ্বারা গঠিত , তার একটিতে পরিণত হয় ।

অবচেতনভাবে, বিশুদ্ধতম আদর্শবাদ সর্বদা গভীরতম জ্ঞানের সাথে যুক্ত থাকে। এই কথাটি কতটা সত্য, এবং কল্পনার অলীক সৃষ্টির সাথে প্রকৃত আদর্শবাদের সম্পর্ক কতটা কম, তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন আমরা একজন সুস্থ ও নিষ্পাপ বালককে তার মতামত জিজ্ঞাসা করি । সেই একই বালক, যে 'আদর্শবাদী' শান্তিবাদীদের বক্তৃতা না বুঝেই শোনে এবং প্রায়শই তা প্রত্যাখ্যান করে, সেই আবার তার জাতির আদর্শের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ।

অবচেতনভাবে তার প্রবৃত্তি এই জ্ঞানের সাথে একমত হবে যে, ব্যক্তিগত জীবনের বিনিময়ে হলেও প্রজাতির টিকে থাকা একটি মৌলিক প্রয়োজন , এবং সে সেইসব শান্তিবাদী বক্তাদের অলীক কল্পনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে যারা আদতে কাপুরুষ আত্মকেন্দ্রিক, যদিও
ছদ্মবেশে, যারা মানব বিকাশের নিয়মের বিরোধিতা করে। মানবজাতির বিকাশের জন্য ব্যক্তির মধ্যে বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য আত্মত্যাগের চেতনা জাগিয়ে তোলা প্রয়োজন, এবং এখানে সেইসব বদমাশদের বিকৃত চিন্তার কোনো স্থান নেই, যারা মনে করে তারা প্রকৃতির চেয়ে বেশি জানে এবং নির্লজ্জভাবে তার বিধানের সমালোচনা করে।

যখন আদর্শবাদ ম্লান হয়ে যায়, তখন সমাজ গঠন ও তা টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ফলস্বরূপ সভ্যতার অস্তিত্বও বিপন্ন হয়। যখন মানুষের মধ্যে স্বার্থপরতার মনোভাব প্রবল হয়ে ওঠে , তখন তারা ভেঙে পড়ে।

সামাজিক শৃঙ্খলার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মানুষ ব্যক্তিগত সুখের সন্ধানে স্বর্গ থেকে সরাসরি নরকে পতিত হয়।

ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাদের মনে রাখবে না যারা নিজেদের স্বার্থের পেছনে ছুটেছে, বরং সেই বীরদের প্রশংসা করবে যারা ব্যক্তিগত সুখ ত্যাগ করেছে।

* * *

আর্যদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিপরীত হলো ইহুদি। সম্ভবত পৃথিবীতে এমন আর কোনো জাতি নেই যারা তথাকথিত "নির্বাচিত জাতি"-র মতো টিকে থাকার প্রবৃত্তি এতটা প্রবলভাবে গড়ে তুলেছে। এই দাবির সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো এই সাধারণ সত্য যে, এই জাতিটি এখনও টিকে আছে। গত দুই হাজার বছরে ইহুদিদের মতো চিন্তা ও চরিত্রে এত সামান্য পরিবর্তন আসা অন্য কোনো জাতি আর কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে ? আর কোন জাতি ধারাবাহিকভাবে বড় বড় বিপ্লবে অংশ নিয়েছে? কিন্তু মানবতাকে গ্রাস করা সবচেয়ে ভয়াবহ বিপর্যয়গুলো পার করার পরেও , ইহুদিরা আগের মতোই রয়ে গেছে। কী অদম্য সাহস!

বেঁচে থাকার ও টিকে থাকার ইচ্ছাই আমাদের এই সত্যটি দেখিয়ে দেয়!

ইহুদিদের বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা হাজার হাজার বছর ধরে পরিমার্জিত হয়েছে । আজ ইহুদিকে 'চতুর' বলে মনে করা হয় ; এবং এক অর্থে , সে বহু শতাব্দী ধরেই তাই। তবে, তার মানসিক দক্ষতা কোনো অভ্যন্তরীণ বিবর্তনের ফল নয় , বরং অন্যদের কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষার দ্বারা তা গঠিত হয়েছে । আরও পদক্ষেপ না নিয়ে মানবাত্মা ঊর্ধ্বগমন করতে পারে না । প্রতিটি ঊর্ধ্বমুখী পদক্ষেপের জন্য প্রয়োজন একটি পূর্বনির্মিত ভিত্তি—অতীত —যা, সাধারণভাবে বলতে গেলে, কেবল সভ্যতার দ্বারাই স্থাপন করা সম্ভব। সমস্ত চিন্তাভাবনা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে খুব সামান্যই আহরণ করে। এর বেশিরভাগই অতীতের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে । সভ্যতার সাধারণ স্তর ব্যক্তিকে, যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই বিষয়টি সম্পর্কে অবগত নয় , প্রচুর পরিমাণে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার যোগান দেয়।

পূর্বজ্ঞান যা পরবর্তী পদক্ষেপগুলোকে আরও সহজ করে তোলে।

Machine Translated by Google

অগ্রগতি। উদাহরণস্বরূপ, আজকের ছেলে গত একশ বছরে অর্জিত বিপুল প্রযুক্তিগত সাফল্যের মাঝে বেড়ে ওঠে , তাই সে এমন অনেক কিছুকে স্বাভাবিক বলে ধরে নেয় যা এক শতাব্দী আগেও তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মনীষীদের কাছেও রহস্য ছিল । তবুও, যারা এই ক্ষেত্রে সাধিত অগ্রগতি বোঝেন এবং একে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে চান, তাদের জন্য এই বিষয়গুলোর বিশাল তাৎপর্য রয়েছে । ১৯২০-এর দশকের কোনো প্রতিভাবান ব্যক্তি যদি আজ কবর থেকে উঠে আসতেন, তবে গড় বুদ্ধিমত্তার একজন সমসাময়িক পনেরো বছর বয়সী কিশোরের চেয়ে আমাদের সময়কে বোঝা তার জন্য আরও কঠিন হতো। অতীত থেকে ফিরে আসা একজন প্রতিভাবানকে বিপুল পরিমাণ তথ্য দিয়ে নিজেকে সজ্জিত করতে হতো, যা আমাদের আধুনিক যুবসমাজ আধুনিক সভ্যতার সৃষ্টিকর্মের মধ্যে বেড়ে ওঠার সময় স্বাভাবিকভাবেই পেয়ে থাকে ।

যে কারণে আমি অবিলম্বে ব্যাখ্যা করব, ইহুদিদের কখনোই নিজস্ব কোনো সভ্যতা ছিল না, সেহেতু তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি সর্বদাই অন্যদের দ্বারা গঠিত হয়েছে। তাদের মন সর্বদাই তাদের কাছে উপলব্ধ সভ্যতার অর্জনগুলো ব্যবহার করে বিকশিত হয়েছে ।

এই প্রক্রিয়াটি কখনও বিপরীত করা হয়নি।

যদিও ইহুদিদের মধ্যে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি অন্যান্য জাতির তুলনায় দুর্বল ছিল না, বরং অনেক বেশি প্রবল ছিল , এবং যদিও তাদের পক্ষে এই ধারণা তৈরি করা সহজ ছিল যে ইহুদিদের মানসিক ক্ষমতা অন্তত অন্যান্য জাতির সমান, তবুও তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্তটির সম্পূর্ণ অভাব ছিল , আর তা হলো আদর্শবাদী চেতনা। ইহুদিদের মধ্যে, প্রস্তুতি

আত্মত্যাগ করা ব্যক্তিগত অস্তিত্ব রক্ষার সাধারণ প্রবৃত্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাদের ক্ষেত্রে, তারা যে জাতিগত সংহতির বোধ প্রদর্শন করে বলে মনে হয় , তা এই পৃথিবীর অন্যান্য জীবের মতোই এক অত্যন্ত আদিম পশুপালের প্রবৃত্তি । তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, এই পশুপালের প্রবৃত্তি জীবদের কেবল ততক্ষণই একে অপরকে রক্ষা করতে বাধ্য করে, যতক্ষণ এমন কোনো সাধারণ বিপদ থাকে যা পারস্পরিক সাহায্যকে প্রয়োজনীয় বা যুক্তিযুক্ত করে তোলে।

যে নেকড়ের দল এইমাত্র শিকার আক্রমণ করার জন্য একত্রিত হয় , ক্ষুধা মিটে গেলে তারাই আবার আলাদা হয়ে যায় । ঘোড়ার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য ; তারা আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য একত্রিত হয় , কিন্তু বিপদ কেটে গেলে আবার বিভক্ত হয়ে যায়।

ইহুদিদের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই । তাদের আত্মত্যাগের চেতনা অলীক। এটি কেবল ততক্ষণই প্রকাশ পায়, যতক্ষণ ব্যক্তিগত অস্তিত্বের জন্য তা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু যেইমাত্র সাধারণ শত্রু পরাজিত হয়, ব্যক্তিগত ইহুদিদের প্রতি হুমকি দূর হয় এবং পুরস্কার নিশ্চিত হয়, সেই আপাত সম্প্রীতি উধাও হয়ে যায় এবং সবকিছু আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসে । ইহুদিরা কেবল তখনই সম্প্রীতির সাথে কাজ করে, যখন তারা কোনো সাধারণ বিপদের সম্মুখীন হয় অথবা কোনো সাধারণ পুরস্কারের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

যখন এই দুটি উদ্দেশ্য বিলুপ্ত হয়ে যায়, তখন সবচেয়ে পাশবিক স্বার্থপরতা প্রকাশ পায় এবং যারা সম্প্রীতিতে একসাথে বাস করত , তারা নিজেদের মধ্যে হিংস্রভাবে লড়াইরত একদল ইঁদুরে পরিণত হয়।

যদি ইহুদিরাই পৃথিবীর একমাত্র জাতি হতো, তবে তারা নোংরা ও কাদায় ডুবে যেত , একে অপরকে শোষণ করত এবং এক ভয়াবহ সংগ্রামে পরস্পরকে নির্মূল করার চেষ্টা করত ; যদি না তাদের আত্মত্যাগের আদর্শের চরম অভাব —যা তাদের কাপুরুষতার মধ্যে প্রকাশিত —এই সংগ্রামকে বিকশিত হতে বাধা দিত।

সুতরাং, যখন ইহুদিদের অন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয় —কিংবা আরও স্পষ্টভাবে বললে, শোষণ করতে হয় —তখন তাদের পারস্পরিক সাহায্যকে আত্মত্যাগের এক আদর্শবাদী চেতনার প্রকাশ হিসেবে ব্যাখ্যা করা সম্পূর্ণ ভুল।

এখানেও ইহুদিরা ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা থেকেই কাজ করে । তাই, ইহুদি রাষ্ট্রের কোনো ভৌগোলিক সীমানা নেই, যদিও রাষ্ট্রটি হওয়া উচিত জাতির রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রসারের জন্য নিবেদিত একটি সংস্থা । একটি রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতার জন্য রাষ্ট্র গঠনকারী জাতির সদস্যদের মধ্যে এক বিশেষ আদর্শবাদ এবং বিশেষ করে কাজের ধারণার যথাযথ গ্রহণযোগ্যতা সর্বদা প্রয়োজন। কাজের প্রতি সাধারণ মনোভাব ইতিবাচক না হওয়া পর্যন্ত একটি ভৌগোলিকভাবে সীমাবদ্ধ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বা রক্ষণাবেক্ষণ করা যায় না । যদি এই মনোভাবের অভাব থাকে, তবে সভ্যতার জন্য প্রয়োজনীয় ভিত্তিরও অভাব দেখা দেয়।

সুতরাং, ইহুদি জনগণের আপাতদৃষ্টিতে বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, তাদের কোনো সংস্কৃতি নেই – বিশেষ করে তাদের নিজস্ব কোনো সংস্কৃতি তো নয়ই। আজকের ইহুদিদের যে সংস্কৃতি আছে...
এটি অন্যের শ্রমের ফল, এবং এই ফলটি একজন ইহুদির হাতে অবমূল্যায়িত হয়।

Machine Translated by Google

সামগ্রিকভাবে মানব সভ্যতায় ইহুদিদের স্থান সম্পর্কে একটি সঠিক বিচার করতে হলে , আমাদের এই গুরুত্বপূর্ণ সত্যটি মনে রাখতে হবে যে, ইহুদি শিল্পকলা বলে কখনোই কিছু ছিল না এবং বর্তমানেও সেরকম কিছুর ধারাবাহিক অস্তিত্ব নেই। আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, বিশেষ করে শিল্পের দুটি প্রধান ক্ষেত্র—স্থাপত্য ও সঙ্গীতে— ইহুদিরা কোনো সৃজনশীল কাজ করেনি। যখন কোনো ইহুদি শিল্পকলায় কিছু সৃষ্টি করে, তখন সে কেবল পূর্ব- বিদ্যমান কোনো কিছুকে সেন্সর করে অথবা অন্যের মেধা- শ্রম চুরি করে। সভ্যতার স্রষ্টা জাতিগুলোর বৈশিষ্ট্যসূচক দক্ষতা ইহুদিদের মধ্যে একেবারেই নেই।

ইহুদিরা অন্যদের গড়া সভ্যতাকে কতটা আত্মসাৎ করে—কিংবা আরও সঠিকভাবে বললে , একে বিকৃত করে —তা এই ঘটনা থেকেই বোঝা যায় যে, তারা প্রধানত সেইসব শিল্পকলার চর্চা করে যেগুলোর জন্য প্রয়োজন হয়
সৃজনশীল উদ্ভাবনের ক্ষুদ্রতম অংশ , অর্থাৎ নাট্যকলা। এবং এমনকি এখানেও তিনি কেবল এক ধরনের বাজিকর, অথবা আরও সঠিকভাবে বললে , একজন অনুকরণকারী; কারণ এই ক্ষেত্রেও
সত্যিকারের মহান শিল্পকর্ম সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় সৃজনশীলতার অভাব তার রয়েছে। এমনকি এক্ষেত্রেও, তিনি কোনো সৃজনশীল প্রতিভা নন, বরং একজন অগভীর অনুকরণকারী যিনি তার সমস্ত কৌশল ও কারসাজি সত্ত্বেও এই সত্যটি লুকাতে পারেন না যে তার সৃষ্টিতে অন্তরের প্রাণের অভাব রয়েছে। এখানেই ইহুদি সংবাদমাধ্যম ত্রাতা হিসেবে এগিয়ে আসে , এমনকি সবচেয়ে বড় ইহুদি আনাড়ির মাথার উপর দিয়েও "হোসেনা" ধ্বনি দিয়ে যায়, যতক্ষণ না বাকি বিশ্ব এটা ভাবতে বাধ্য হয় যে এত প্রশংসার পাত্রটি নিশ্চয়ই একজন সত্যিকারের শিল্পী, যদিও বাস্তবে তিনি হয়তো একজন দুর্বল ভানকারী মাত্র।

না; সভ্যতা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় সৃজনশীল ক্ষমতা ইহুদিদের নেই ; কারণ তাদের মধ্যে আদর্শবাদের চেতনা নেই এবং কখনো ছিলও না, যা মানবজাতির উচ্চতর বিকাশের জন্য একটি অপরিহার্য উপাদান। অতএব, ইহুদি মনন কখনো গঠনমূলক হতে পারে না , বরং সর্বদা ধ্বংসাত্মক। বড়জোর, কবির ভাষায়, এটি মাঝে মাঝে "এমন এক শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে যা চিরকাল মন্দ কামনা করে ভালো কাজ করে।" এই সাহায্যের কারণে নয়, বরং এই সাহায্য সত্ত্বেও মানবজাতির অগ্রগতি হয়।

যেহেতু ইহুদিদের কখনও ভূখণ্ডগত সীমানার উপর ভিত্তি করে কোনো রাষ্ট্র ছিল না, এবং সেই কারণে তাদের নিজস্ব কোনো সভ্যতাও ছিল না, তাই এই ধারণাটি জন্মায় যে আমরা যাযাবর নামক এক জনগোষ্ঠীর কথা বলছি। এটি একটি গুরুতর এবং বিদ্বেষপূর্ণ ভুল। একজন প্রকৃত যাযাবরের একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড থাকত যেখানে সে বাস করত। সে একজন স্থায়ী কৃষকের মতো সেখানে চাষাবাদ করত না, বরং তার পশুর পালের উৎপাদিত ফসল দিয়ে জীবনধারণ করত, যেগুলোকে নিয়ে সে তার ভূখণ্ড জুড়ে ঘুরে বেড়াত। এই ধরনের জীবনযাপনের স্বাভাবিক কারণ ছিল এই যে, ভূমি উর্বর ছিল না এবং বসতি স্থাপনের সুযোগ দিত না। তবে, এই স্বাভাবিক কারণের বাইরেও একটি আরও গভীর কারণ ছিল : তা হলো, কাছাকাছি এমন কোনো যান্ত্রিক সভ্যতা ছিল না যা সেই অঞ্চলের প্রাকৃতিক দারিদ্র্যের সাথে মানিয়ে নিতে পারত। এমন কিছু এলাকা আছে যেখানে আর্যরা তাদের হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে বিকশিত প্রযুক্তিগত উপায়ের মাধ্যমে বসতি স্থাপন করতে পারত, যদিও অন্যথায় এই অঞ্চলগুলো পরিত্যাগ করতে হতো , যদি না আর্যরা যাযাবরের মতো সেখানে ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছুক থাকত; কিন্তু তাদের প্রযুক্তিগত ঐতিহ্য এবং প্রযুক্তিগত উপায় ব্যবহারে শত শত বছরের অভিজ্ঞতা সম্ভবত যাযাবর জীবনকে তাদের কাছে অসহনীয় করে তুলত। আমাদের মনে রাখা উচিত যে আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপনের প্রথম পর্বে অনেক আর্য পশম সংগ্রহকারী, শিকারী এবং এই জাতীয় কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করত এবং প্রায়শই নারী ও শিশুদের সাথে বড় দলে ঘুরে বেড়াত, তাদের জীবনযাত্রা ছিল যাযাবরদের মতো। তবে, যেইমাত্র তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল এবং তারা আরও বেশি সম্পদ সংগ্রহ করতে সক্ষম হলো , তারা দেশটিকে পরিষ্কার করে আদিবাসীদের বিতাড়িত করল এবং একই সাথে বসতি স্থাপন করল, যা সারা দেশে দ্রুত বৃদ্ধি পেতে লাগল।

আর্যরা সম্ভবত প্রথমে যাযাবর ছিল এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বসতি স্থাপনকারী হয়ে ওঠে। কিন্তু একই কারণে সে কখনও ইহুদি ছিল না! ইহুদি যাযাবর নয়; কারণ 'কাজ' ধারণাটির প্রতি যাযাবরের একটি নির্দিষ্ট মনোভাব থাকে, এবং যখন প্রয়োজনীয় বৌদ্ধিক পরিস্থিতি উপস্থিত ছিল, তখন এই মনোভাবই পরবর্তী সাংস্কৃতিক বিকাশের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছিল। যাযাবরের মনোভাবের মধ্যে এক ধরনের আদর্শবাদের ভাণ্ডার রয়েছে, যদিও তা কিছুটা আদিম। তার সমগ্র চরিত্র আর্য চেতনার কাছে ভিন্ন হতে পারে , কিন্তু তা কখনও ঘৃণ্য হবে না। কিন্তু ইহুদির চরিত্রে আদর্শবাদের সামান্যতম চিহ্নও নেই। ইহুদি কখনও যাযাবর ছিল না, বরং সর্বদাই পরজীবী ছিল, অন্যের উপর ভর করে নিজেকে মোটাতাজা করত। যদি সে কখনও কখনও সেই অঞ্চলগুলি পরিত্যাগ করত যেখানে

Machine Translated by Google

সে এতদূর বেঁচে ছিল , স্বেচ্ছায় নয়। তাকে এতে বাধ্য করা হয়েছিল, কারণ এমন এক জাতি তাকে মাঝে মাঝে বাস্তুচ্যুত করত, যারা এই ধরনের অতিথিদের আতিথেয়তার অপব্যবহারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল । ইহুদিদের বিস্তার একটি পরজীবীসুলভ ঘটনা—কারণ ইহুদিরা সবসময় তাদের জাতির জন্য নতুন আশ্রয়দাতা খুঁজে বেড়ায় ।

কিন্তু এর সাথে যাযাবর জীবনের কোনো সম্পর্ক নেই ; কারণ ইহুদিরা একসময় যে ভূখণ্ডে বাস করত, তা ছেড়ে যাওয়ার কথা চিন্তাও করে না। তারা যেখানে আছে, তা এত দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকে যে, উচ্চতর শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করেও তাদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া কঠিন। তারা কেবল তখনই নতুন ভূখণ্ডে বিস্তার লাভ করে, যখন সেখানে তাদের অস্তিত্বের জন্য নির্দিষ্ট কিছু শর্ত নিশ্চিত হয় ; কিন্তু তখনও – যাযাবরের মতো নয় – তারা তাদের বাসস্থান পরিবর্তন করে না। তারা এক পরজীবী, এবং থাকবেও, যা এক বিপজ্জনক জীবাণুর মতো ক্রমাগত বিস্তৃত হতে থাকা এক অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে যখন কিছু

আকর্ষণীয় ভূখণ্ড তাকে আকর্ষণ করবে। তার উপস্থিতির প্রভাব অনেকটা ভ্যাম্পায়ারের মতো; সে যেখানেই যায় , যারা তাকে আতিথেয়তা দিয়েছে, তাদের শীঘ্র বা বিলম্বে রক্তক্ষরণে মৃত্যুবরণ করতে হয় । তাই, ইহুদিরা সর্বদাই অন্য জাতির অধীনস্থ রাষ্ট্রে বসবাস করেছে এবং এই রাষ্ট্রগুলোর ভেতরেই তারা 'ধর্মীয় সম্প্রদায়'-এর মুখোশের আড়ালে নিজেদের একটি রাষ্ট্র তৈরি করেছে , যতক্ষণ না বাহ্যিক পরিস্থিতি এই সম্প্রদায়ের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচনের সুযোগ করে দেয়। যখনই ইহুদিরা তাদের এই অবস্থান বজায় রাখার জন্য যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী বোধ করেছে...

ছদ্মবেশহীন অবস্থায় , তিনি তাঁর মুখোশ তুলে ফেললেন এবং হঠাৎ এমন এক রূপে আবির্ভূত হলেন, যাকে আগে অনেকেই বিশ্বাস করত না বা দেখতে চাইত না: একজন ইহুদি হিসেবে ।

ইহুদিদের জীবনযাত্রা হলো অন্যান্য জাতি ও রাষ্ট্রের ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠা এক পরজীবীসুলভ বিকাশ , যার ফলে এমন এক বিশেষ চরিত্রের উদ্ভব ঘটেছে, যে চরিত্রকে শোপেনহাওয়ার একবার ইহুদিদের 'মিথ্যার মহান গুরু' বলে বর্ণনা করেছিলেন । এই জীবনধারা ইহুদিদেরকে অনবরত মিথ্যা বলতে বাধ্য করে, ঠিক যেমন উত্তরের দেশগুলোর অধিবাসীদের গরম কাপড় পরতে হয়।

সে অন্য জাতি ও রাষ্ট্রের মধ্যে কেবল তখনই বসবাস করতে পারে , যতক্ষণ সে নিজেকে বোঝাতে সক্ষম হয়। তাদের মতে, ইহুদিরা কোনো পৃথক জাতি নয় , বরং একটি ধর্মের প্রতিনিধি, এবং এভাবেই তারা একটি বিশেষ ধরনের " ধর্মীয় সম্প্রদায়" গঠন করে ।

কিন্তু আদতে , এটাই তার বড় মিথ্যাগুলোর মধ্যে প্রথমটি।

তার পরজীবী জীবন চালিয়ে যাওয়ার জন্য তাকে নিজের চরিত্র ও জীবনধারা গোপন করতে হয় । জাতিসমূহের মধ্যে অস্তিত্ব । একজন ইহুদির বুদ্ধিমত্তা যত বেশি হবে , অন্যদের ধোঁকা দিতে সে তত বেশি সফল হবে । সে এমনকি এতটাই সফল হতে পারে যে, যারা তাকে আশ্রয় দিয়েছে তারা বিশ্বাস করবে যে তাদের মধ্যে থাকা ইহুদিটি একজন সত্যিকারের ফরাসি, ইংরেজ, গ্রিক বা ইতালীয়, যে কেবল সেই দেশগুলোর প্রভাবশালী ধর্মীয় সম্প্রদায়ের চেয়ে ভিন্ন একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

বিশেষ করে রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতার মহলে , যেখানে কর্মকর্তাদের সাধারণত ন্যূনতম ঐতিহাসিক সাধারণ জ্ঞানও থাকে না, সেখানে একজন ইহুদি তুলনামূলকভাবে সহজেই তার লজ্জাজনক মিথ্যা ছড়িয়ে দিতে পারে । এই মহলে, পদোন্নতির পদ্ধতি নির্ধারণকারী পবিত্র নিয়মাবলীর বিরুদ্ধে স্বাধীন চিন্তাভাবনাকে একটি পাপ হিসেবে গণ্য করা হয়। তাই এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, উদাহরণস্বরূপ, আজও বাভারিয়ার দপ্তরগুলোতে এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহও নেই যে ইহুদিরা একটি পৃথক জাতি এবং তারা নয়।

শুধুমাত্র "ধর্মের" অনুসারীরাই এর অন্তর্ভুক্ত, যদিও সামান্যতম বুদ্ধিসম্পন্ন যে কেউ ইহুদি মালিকানাধীন সংবাদপত্রের দিকে একবার তাকালেই এর বিপরীত যথেষ্ট প্রমাণ পেয়ে যায় । তবে, 'দ্য জিউইশ ইকো' কোনো সরকারি সংবাদপত্র নয় এবং সেই কারণে এই কর্মকর্তাদের চোখে এটি প্রামাণ্য নয় ।

ইহুদি সম্প্রদায় বরাবরই একটি সুনির্দিষ্ট জাতিগত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জাতি এবং তারা কখনোই শুধুমাত্র কোনো একটি নির্দিষ্ট ধর্মের প্রতি আনুগত্যের দ্বারা নিজেদের আলাদা করেনি । অনেক আগে, বিশ্বে একটি স্থান করে নেওয়ার আকাঙ্ক্ষায় চালিত হয়ে , ইহুদিরা তাদের জন্য অসুবিধাজনক মনোযোগ দূর করার উপায় খুঁজতে শুরু করে । একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধারণা ধার করে ব্যবহার করার চেয়ে অধিক কার্যকর এবং একই সাথে সন্দেহের ঊর্ধ্বে আর কী হতে পারে ? এখানেও, সবকিছুই নকল করা হয়, বা বলা ভালো, চুরি করা হয়; একজন ইহুদির কোনো কিছুর মালিকানা থাকতে পারে না ।

তার নিজস্ব চেতনার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ তার মধ্যে কোনো প্রকার ভাববাদের অভাব রয়েছে; যার ফলস্বরূপ, পার্থিব অস্তিত্বের অবসানের পর জীবনে বিশ্বাস তার কাছে এক অচেনা বিষয়। আর্য মন এমন কোনো ধর্মের কথা কল্পনা করতে পারে না, যেখানে এই বিশ্বাস অন্তর্ভুক্ত নয় যে মৃত্যুর পরেও কোনো না কোনো রূপে জীবনের ধারাবাহিকতা থাকবে।

Machine Translated by Google

মৃত্যু। প্রকৃতপক্ষে, তালমুদ এমন কোনো গ্রন্থ নয়, যেখানে পরকালের জীবনের জন্য প্রস্তুতির নিয়মকানুন রয়েছে। এতে কেবল এই পৃথিবীতে একটি বাস্তবসম্মত ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের জন্য নীতিমালা রয়েছে।

ইহুদিদের ধর্মীয় শিক্ষা মূলত কীভাবে বজায় রাখতে হয় সে সম্পর্কিত নির্দেশাবলীর একটি সমষ্টি। ইহুদি রক্তের বিশুদ্ধতা এবং ইহুদি ও বাকি বিশ্বের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ: অর্থাৎ, অ-ইহুদিদের সাথে তাদের সম্পর্ক। কিন্তু ইহুদি ধর্মীয় শিক্ষায় নৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় না। তারা বরং অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে, এবং তা খুবই বিস্তারিতভাবে। ইহুদিদের ধর্মীয় শিক্ষার নৈতিক মূল্য সম্পর্কে বলতে গেলে, এমন অনেক বিশদ রচনা আছে এবং সবসময়ই ছিল (তবে তা ইহুদিদের পক্ষ থেকে নয় ; কারণ এই বিষয়ে ইহুদিরা যা-ই লেখে তা সবসময়ই অত্যন্ত পক্ষপাতদুষ্ট হয়) যা ইহুদি ধর্মকে এক অত্যন্ত উদ্বেগজনক আবহে উপস্থাপন করে। এই ধর্মীয় শিক্ষা কিসের দিকে নিয়ে যায়, তার সর্বোত্তম উদাহরণ হলো স্বয়ং ইহুদি। এই পৃথিবীতে তার জীবন ও তার মানসিকতা খ্রিস্টধর্মের প্রকৃত চেতনার কাছে ততটাই পরকীয়, যতটা পরকীয় ছিল দুই হাজার বছর আগে মহান স্রষ্টার কাছে তার চরিত্র। খ্রিস্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ইহুদি জাতির প্রতি তাঁর বিচার গোপন করেননি। যখন তিনি প্রয়োজন মনে করেছেন, তখন তিনি মানবজাতির এই শত্রুদের ঈশ্বরের মন্দির থেকে বহিষ্কার করেছেন; কারণ তখনও, বরাবরের মতোই, তারা ধর্মকে তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহার করত। কিন্তু তারপর খ্রিস্টকে তাঁর ধর্মের জন্য ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়েছিল।

ইহুদিদের প্রতি মনোভাব ; অথচ আধুনিক খ্রিস্টানরা রাজনৈতিক দলে যোগ দেয় এবং নির্বাচন হলে তারা ইহুদিদের ভোটের জন্য ভিক্ষা করতেও নেমে আসে। তারা প্রবেশ করে
এমনকি নিজেদের খ্রিস্টান জাতির স্বার্থের বিরুদ্ধে নাস্তিক ইহুদি দলগুলোর সাথে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রেও লিপ্ত ছিল।

এই প্রথম ও মৌলিক মিথ্যার উপর ভিত্তি করেই পরবর্তী মিথ্যাগুলো গড়ে ওঠে , যার উদ্দেশ্য হলো মানুষকে এটা বিশ্বাস করানো যে ইহুদি ধর্ম কোনো জাতি নয়, বরং একটি ধর্ম। উদাহরণস্বরূপ, আরও একটি মিথ্যা একজন ইহুদির ভাষাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তার কাছে, ভাষা অন্তরের ভাবনা প্রকাশের মাধ্যম নয় , বরং তা গোপন করার একটি উপায়। যখন সে ফরাসি ভাষায় কথা বলে, তখন তার ভাবনা ইহুদিসুলভ ; যখন সে জার্মান ভাষায় ছড়া লেখে, তখন সে কেবল তার নিজের জাতির চরিত্রই প্রকাশ করে।

যতদিন ইহুদিরা অন্যান্য জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করতে সফল না হয়, ততদিন তারা ইচ্ছা করুক বা না করুক, তাদের ভাষায় কথা বলতে বাধ্য থাকে। কিন্তু যখন সমগ্র বিশ্ব ইহুদিদের দাস হয়ে যাবে, তখন তাদের অন্য কোনো ভাষা (যেমন, এস্পেরান্তো) শিখতে হবে , যাতে ইহুদিরা আরও সহজে সকলের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে।

এই জাতির সমগ্র অস্তিত্ব যে অবিরাম মিথ্যার উপর কতটা নির্ভরশীল, তা 'প্রোটোকলস অফ দ্য এল্ডার্স অফ জায়ন'-এর মাধ্যমে এক অনন্য উপায়ে প্রমাণিত হয় , যা ইহুদিরা নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যান করে। হাহাকার ও বিলাপ করতে করতে ফ্রাঙ্কফুর্টার জাইটুং বারবার বলে চলেছে যে এগুলো মিথ্যা। শুধু এটাই এদের সত্যতার প্রমাণ। বহু ইহুদি অবচেতনভাবে যা কামনা করে, তা এখানে স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। কোন ইহুদির মন থেকে এই প্রকাশনাগুলোর উৎপত্তি, তা জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন নেই ; কিন্তু যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হলো , এগুলো প্রায় ভীতিকর নির্ভুলতার সাথে ইহুদিদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মানসিকতা ও পদ্ধতি প্রকাশ করে , এবং এই লেখাগুলো বিভিন্ন দিকে ইহুদিদের অনুসৃত চূড়ান্ত লক্ষ্যগুলো ব্যাখ্যা করে। তবে, এই নথিগুলোর সত্যতা বিচার করার সর্বোত্তম উপায় হলো প্রকৃত ঘটনাগুলোর বিশ্লেষণ। যদি গত কয়েক শতাব্দীর ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোকে এই বইয়ের আলোকে পরীক্ষা করা হয়, তবে আমরা বুঝতে পারব কেন ইহুদি সংবাদমাধ্যম ক্রমাগত এগুলোকে প্রত্যাখ্যান ও নিন্দা করে। যখন মানুষ এই বইটি হাতে পাবে এবং এটি বুঝতে পারবে, তখনই ইহুদি হুমকি নিয়ন্ত্রণে আসবে।

* * *

ইহুদিকে সত্যিকার অর্থে বুঝতে হলে , বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে অন্যান্য জাতির মধ্যে সে যে পথ অনুসরণ করেছে তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। একটি সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরার জন্য একটি উদাহরণই যথেষ্ট হবে। যেহেতু সর্বযুগে তার নিয়তি একই ছিল—ঠিক যেমন সেই জাতিগুলোও একই রয়ে গেছে যাদের ক্ষতির বিনিময়ে সে বেঁচে থাকে —তাই প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণটি করার জন্য খতিয়ে দেখাই শ্রেয় হবে।

Machine Translated by Google

এর বিকাশের স্বতন্ত্র পর্যায়গুলো চিহ্নিত করুন । সরলতার জন্য, এই পর্যায়গুলোকে বর্ণমালার পরবর্তী অক্ষরগুলো দিয়ে চিহ্নিত করা হবে ।

রোমান আক্রমণের সময় প্রথম ইহুদিরা তৎকালীন জার্মানিয়ায় এসে পৌঁছায় ; এবং যথারীতি, তারা ব্যবসায়ী হিসেবেই এসেছিল। জার্মানীয় উপজাতিদের ব্যাপক অভিবাসনের ফলে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলার মধ্যে ইহুদিরা যেন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। তাই আমরা জার্মানদের প্রথম রাজনৈতিক সম্প্রদায় গঠনের সময়কালকে সেই প্রক্রিয়ার সূচনা হিসেবে বিবেচনা করতে পারি , যার মাধ্যমে মধ্য ও উত্তর ইউরোপ আবারও, এবং এবার স্থায়ীভাবে, ইহুদিকরণ হয়েছিল ।

যখনই এবং যেখানেই ইহুদিরা আর্যদের সংস্পর্শে এসেছে, তখনই এই বা অনুরূপভাবে এই বিকাশটি ঘটে এসেছে ।

* * *

(ক) প্রথম স্থায়ী বসতিগুলো স্থাপিত হওয়ার সাথে সাথেই ইহুদিদের হঠাৎ আবির্ভাব ঘটল । সে একজন বণিক হিসেবে এসেছিল এবং প্রথমদিকে নিজের জাতীয়তা গোপন করার কোনো চেষ্টাই করেনি। সে প্রকাশ্যে ইহুদি হিসেবেই পরিচিত ছিল, যার একটি কারণ ছিল ভাষার উপর তার জ্ঞান অত্যন্ত দুর্বল । সম্ভবত অন্য জাতির লোকেরা তার সাথে মিশতে রাজি ছিল না, তাই সে একজন বিদেশী বণিক ছাড়া অন্য কোনো পরিচয় ধারণ করতে পারত না। তার ধূর্ততা ও চতুরতা এবং সেইসাথে যাদের কাছে সে আশ্রয় পেয়েছিল তাদের অনভিজ্ঞতার কারণে , প্রকাশ্যে তার ইহুদি পরিচয় বজায় রাখা কোনো সমস্যা ছিল না । এমনকি এটি হয়তো তার জন্য সহায়কও হয়েছিল; বিদেশীকে সাদরে গ্রহণ করা হয়েছিল।

(খ) ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে , সে তার চারপাশের অর্থনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণ করতে শুরু করল; তবে উৎপাদক হিসেবে নয়, বরং কেবল একজন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে । হাজার হাজার বছরের আলোচনা ও মধ্যস্থতার মাধ্যমে অর্জিত তার বাণিজ্যিক বিচক্ষণতা তাকে এই ক্ষেত্রে আর্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ করে তুলেছিল, যারা তখনও ছিল অনভিজ্ঞ ও আনাড়ি এবং যাদের সততার কোনো সীমা ছিল না। শীঘ্রই, সমগ্র বাণিজ্য একটি ইহুদি একচেটিয়া আধিপত্যে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিল । ইহুদিরা চড়া সুদে টাকা ধার দেওয়া শুরু করল, যা ছিল তাদের নিয়মিত পেশা। ধার করা টাকার উপর সুদ চালু করা প্রথম ব্যক্তি ছিল সে । এই উদ্ভাবনের বিপদ তাৎক্ষণিকভাবে অনুধাবন করা যায়নি; অধিকন্তু, এই ধারণাটি আনন্দের সাথে গৃহীত হয়েছিল কারণ এটি সাময়িক সুবিধা প্রদান করত।

(গ) এই পর্যায়ে ইহুদিরা স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে; তারা শহরগুলোর বিশেষ অংশে বসবাস করত এবং তাদের নিজস্ব বাজার ছিল। এইভাবে , তারা ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের মধ্যে একটি রাষ্ট্র তৈরি করতে শুরু করে। তারা বাণিজ্য এবং সমস্ত আর্থিক লেনদেনকে একচেটিয়াভাবে তাদের নিজস্ব বিশেষাধিকার হিসাবে দেখত এবং নির্মমভাবে এর শোষণ করত।

(ঘ) এই পর্যায়ে, অর্থায়ন ও বাণিজ্য তার সম্পূর্ণ একচেটিয়া অধিকারে পরিণত হলো। অবশেষে, তার চড়া সুদের হার বিরোধিতার জন্ম দিল, ইহুদিদের ক্রমবর্ধমান ঔদ্ধত্য সাধারণ ক্ষোভ জাগিয়ে তুলল, আর তার সম্পদের প্রদর্শনী সর্বজনীন ঈর্ষার উদ্রেক করল। তার পাপের পাত্র কানায় কানায় পূর্ণ হলো যখন সে ভূমির মালিকানাকে তার পণ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত করল , এভাবে ভূমিকে একটি পণ্যের স্তরে নামিয়ে আনল। যেহেতু সে নিজে কখনো জমি চাষ করত না বরং একে কেবল শোষণের বস্তু হিসেবে দেখত , যেখানে কৃষকরা থাকতে পারত, কিন্তু কেবল এই শর্তে যে তারা বশ্যতা স্বীকার করবে ।

নতুন প্রভুর চরম নির্মম ঋণ আদায়ের কারণে ইহুদিদের প্রতি সাধারণ বিদ্বেষ ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং অবশেষে তা প্রকাশ্য শত্রুতায় পরিণত হয় । তার মাত্রাতিরিক্ত স্বৈরাচার জনগণের কাছে সম্পূর্ণ অসহনীয় হয়ে ওঠে, এবং তারা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ও শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করে। তারা এই বিদেশীকে আরও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করে এবং তার সহজাত ঘৃণ্য গুণাবলী আবিষ্কার করে, অবশেষে ইহুদি ও তাদের আশ্রয়দাতাদের মধ্যে এমন এক ব্যবধান তৈরি হয় , যার মধ্য দিয়ে পরবর্তী যোগাযোগ অসম্ভব হয়ে পড়ে ।

দারিদ্র্যের সময়ে সাধারণত ইহুদিদের বিরুদ্ধে জনরোষের ঢেউ উঠত ; জনসাধারণ আইন নিজেদের হাতে তুলে নিত ; তারা নিজেদের রক্ষার জন্য ইহুদিদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করত এবং তাদের সর্বনাশ করে দিত।

Machine Translated by Google

যাকে তারা ঈশ্বরের অভিশাপ বলে মনে করত। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইহুদিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়ায়, দারিদ্র্যের সময়ে লোকেরা তাদের উপস্থিতিকে প্লেগের সঙ্গে তুলনীয় এক জনহুমকি হিসেবে দেখত ।

(ঙ) কিন্তু তারপর সেই ইহুদি তার আসল চরিত্র প্রকাশ করতে শুরু করল । সে সরকারের তোষামোদ করত , দাসসুলভভাবে তাদের চাটুকারিতা করত, নিজের অর্থ ব্যবহার করে আরও তোষামোদ করত এবং এভাবেই তার শিকারকে শোষণ করার সুযোগ নিশ্চিত করত। যদিও এই চিরস্থায়ী ফটকাবাজের বিরুদ্ধে জনরোষ জ্বলে উঠেছিল এবং তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কয়েক বছর পর সে আবার সেই একই জায়গায় হাজির হত এবং আগের মতোই কাজ করত। কোনো তদন্তই তাকে অন্যদের শোষণ করা থেকে বিরত রাখতে পারেনি, এবং কোনো হয়রানিই তাকে চিরতরে নির্মূল করার জন্য যথেষ্ট কার্যকর ছিল না । সে অল্প সময়ের মধ্যেই সবসময় ফিরে আসত, এবং সবকিছু আগের মতোই হয়ে যেত।

সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য , ইহুদিদের সম্পদ অর্জন নিষিদ্ধ করে একটি আইন পাস করা হয়েছিল।
ভূমির মালিকানা ।

(চ) রাজা ও রাজপুত্রদের ক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে ইহুদিরা তাদের আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল । সে 'অধিকার' ও 'বিশেষ সুবিধা' ভিক্ষা করত, যা এই প্রভুরা, যারা সাধারণত আর্থিক সংকটে থাকতেন, বিনিময়ে উপযুক্ত অর্থ পেলে সহজেই মঞ্জুর করতেন । যদিও এর মূল্য ছিল চড়া, ইহুদিরা সফল হয়েছিল।
প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধাগুলোর মাধ্যমে, এমনকি সুদ ও চক্রবৃদ্ধি সুদসহও, কয়েক বছরের মধ্যেই এই টাকা পুনরুদ্ধার করা যেত । এটি এক সাক্ষাৎ জোঁকের মতো , যা হতভাগ্য শিকারের শরীরে এমনভাবে লেগে থাকে যে তাকে সরানো যায় না ; রাজপুত্ররা যখন আবারও প্রয়োজনে পড়লেন, তখন তাঁরা নিজ হাতেই তাদের শিরা থেকে রক্ত ঝরিয়ে নিলেন ।

এই খেলাটি অবিরাম চলতে থাকতো । যাদের 'জার্মান' বলা হতো, তাদের ক্ষেত্রে...
রাজপুত্ররা ইহুদিদের মতোই ঘৃণ্য ভূমিকা পালন করত। তারা তাদের জাতির জন্য এক সত্যিকারের অভিশাপ ছিল। তাদের মতো ব্যক্তিদের কিছু আধুনিক মন্ত্রণালয়েও খুঁজে পাওয়া যায় ।

জার্মান রাজপুত্রদের কারণেই জার্মান জাতি শেষ পর্যন্ত ইহুদি হুমকি থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারেনি । দুর্ভাগ্যবশত, পরবর্তীতেও পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন হয়নি । নিজেদের জাতির বিরুদ্ধে করা সমস্ত অপরাধের জন্য রাজপুত্ররা অবশেষে তাদের প্রাপ্য শাস্তি লাভ করে । তারা শয়তানের সাথে মৈত্রী স্থাপন করেছিল এবং পরবর্তীতে তারই কবলে পড়েছিল ।

(g) ইহুদিদের হাতে বন্দী হয়ে রাজপুত্ররা নিজেদের পতনের পথ প্রস্তুত করেছিল। প্রজাদের স্বার্থ রক্ষায় অক্ষমতার পাশাপাশি তাদের শোষণের ফলেও নিজ জাতির মধ্যে তাদের অবস্থান ধীরে ধীরে কিন্তু ক্রমাগত দুর্বল হয়ে পড়ছিল । ইহুদিরা নিখুঁতভাবে হিসাব কষেছিল কখন রাজপুত্রদের পতনের সময় ঘনিয়ে আসছে এবং তা ত্বরান্বিত করার জন্য সাধ্যমতো সবকিছু করেছিল। তারা ছলনা ও দাসসুলভ তোষামোদ দ্বারা রাজপুত্রদের জাতির প্রতি তাদের কর্তব্য পালনে বাধা দিয়ে, তাদের আরও অন্যায় কাজে বাধ্য করে তাদের আর্থিক সংকট বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং এভাবেই তাদের কাছে ক্রমশ অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। আর্থিক বিষয়ে তার ধূর্ততা, বা বলা ভালো, তার বিবেকহীনতার পূর্ণ অভাব তাকে প্রজাদের কাছ থেকে নতুন প্রভাব অর্জন করতে, তাদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করতে এবং যত দ্রুত সম্ভব তা ব্যয় করতে সাহায্য করেছিল। প্রতিটি রাজদরবারে তাদের নিজস্ব "রাজদরবারের ইহুদি " ছিল, এই উপদ্রবটি এই নামেই পরিচিত ছিল, যারা নিরীহ শিকারদের হতাশায় নিমজ্জিত না হওয়া পর্যন্ত নির্যাতন করত ; একই সময়ে ইহুদিরা সেই সম্পদ সরবরাহ করত যা রাজপুত্ররা নিজেদের ভোগবিলাসে অপচয় করত।

আশ্চর্যের কিছু নেই যে মানবজাতির এই অলঙ্কারগুলি প্রাতিষ্ঠানিক সম্মান লাভ করেছিল এবং এমনকি বংশগত অভিজাত পদও লাভ করেছিল, যার ফলে তারা কেবল প্রতিষ্ঠানটিকে উপহাসের পাত্রই বানায়নি , বরং ভেতর থেকে একে কলুষিতও করেছিল ।

অবশ্যই, ইহুদিটি এখন তার নব অর্জিত অবস্থানের সুযোগ নিয়ে আগের চেয়েও দ্রুত উন্নতি করতে পারত । অবশেষে, সে ব্যাপ্টিজম গ্রহণ করল এবং এর ফলে সে যে জাতির ওপর শোষণ চালাচ্ছিল, সেই জাতির সন্তানদের প্রাপ্য সমস্ত অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার দাবিদার বলে নিজেকে মনে করতে লাগল । এটি ছিল একটি চমৎকার কৌশল, এবং সে প্রায়শই এটি ব্যবহার করত, যা তার এই সাফল্যে গর্বিত চার্চের জন্য আনন্দের কারণ ছিল।

Machine Translated by Google

নব বিশ্বাসীদের এবং সেইসাথে ইস্রায়েলের আনন্দের কারণ হলো , যে কৌশলটি সফল হতে দেখে খুশি হয়েছিল ।

(h) এই পর্যায়ে, ইহুদি জগতে একটি রূপান্তর শুরু হয়েছিল । ততদিন পর্যন্ত , তারা ইহুদিই ছিল এবং অন্য কিছু হওয়ার ভান করার দিকে তেমন মনোযোগ দেয়নি ; তাছাড়া, অন্যান্য জাতি থেকে তাদের পৃথককারী পার্থক্যগুলি সহজে অতিক্রম করা সম্ভব ছিল না। এমনকি ফ্রেডরিক দ্য গ্রেটের সময়েও, কেউ ইহুদিদের বহিরাগত ছাড়া অন্য কিছু হিসেবে দেখত না, এবং গোয়েটে এর বিরোধিতা করেছিলেন।
খ্রিস্টান ও ইহুদিদের মধ্যে বিবাহ আইনত নিষিদ্ধ করার অসম্ভবতা । গোয়েটে নিশ্চিতভাবেই প্রতিক্রিয়াশীল বা সুবিধাবাদী ছিলেন না। তিনি যা বলেছিলেন তা বংশের কণ্ঠস্বর এবং যুক্তির কণ্ঠস্বরকেই অনুসরণ করেছিল। যদিও রাজদরবারের পরিমণ্ডলে এমন লজ্জাজনক ঘটনা ঘটত , জাতি সহজাতভাবেই বুঝত যে ইহুদিরা জাতির দেহে এক বহিরাগত, এবং এই সত্যটি উপলব্ধির ফলেই তাদের মনোভাব গড়ে উঠেছিল।

কিন্তু এখন একটি পরিবর্তন আসতে চলেছিল । হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে , ইহুদিরা তাদের আশ্রয়দাতাদের ভাষা এতটাই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে শিখেছিল যে তারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে তারা তাদের ইহুদি পরিচয় নিয়ে কম এবং তাদের 'জার্মান পরিচয়' নিয়ে বেশি কথা বলবে। যদিও প্রথম দৃষ্টিতে এটি হাস্যকর এবং অযৌক্তিক মনে হতে পারে , তবুও তারা নিজেদেরকে এই নামে ডাকার মতো যথেষ্ট সাহসী ছিল।
"টিউটনিক," যার অর্থ এক্ষেত্রে ছিল জার্মান। এভাবেই শুরু হয়েছিল কল্পনাতীত লজ্জাজনক এক প্রতারণা । ইহুদির মধ্যে জার্মান চরিত্রের বিন্দুমাত্র চিহ্নও ছিল না । অন্য কোনো জার্মান বৈশিষ্ট্য গ্রহণ না করে, সে কেবল জঘন্যভাবে নিজের স্বার্থে জার্মান ভাষাকে বিকৃত করার কৌশল জানত । সুতরাং , ভাষার জ্ঞানই ছিল তার জার্মান হওয়ার ভান করার একমাত্র ভিত্তি । কিন্তু, একটি জাতির সদস্যরা ভাষার বন্ধনে আবদ্ধ থাকে না, বরং কেবল রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। আর ইহুদিরা এই কথাটা অন্য সবার চেয়ে ভালো জানত, কারণ তারা নিজেদের ভাষা সংরক্ষণে খুব কমই মনোযোগ দিত , অথচ একই সাথে নিজেদের রক্তকে বিশুদ্ধ এবং অন্য জাতির রক্তের সাথে অমিশ্রিত রাখতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করত। একজন মানুষ খুব বেশি অসুবিধা ছাড়াই একটি নতুন ভাষা গ্রহণ ও ব্যবহার করতে পারে ; কিন্তু সে কেবল নতুন ভাষার মাধ্যমে পুরোনো ধারণাই প্রকাশ করে। তার ভেতরের প্রকৃতি অপরিবর্তিত থাকে। এর সর্বোত্তম প্রমাণ হলো স্বয়ং ইহুদি । সে হয়তো হাজারটা ভাষায় কথা বলতে পারে , কিন্তু তার ইহুদি প্রকৃতি সর্বদা একই থাকবে। দুই হাজার বছর আগে অস্টিয়ায় শস্য ব্যবসায়ী হিসেবে ল্যাটিন ভাষায় কথা বলার সময় তার যে বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল, আজও বিক্রি করার চেষ্টা করার সময় সেগুলো একই রকম।

তার জার্মান অর্থহীন বকবকানির সাহায্যে ময়দা দূষিত করেছিল । সে সবসময় একই ইহুদি। এমন একটি সুস্পষ্ট সত্য যে গড়পড়তা ঊর্ধ্বতন জার্মান কর্মকর্তা বা পুলিশ অফিসারের নজরে আসে না, তা সুস্পষ্ট এবং স্বাভাবিক; কারণ এমন অন্য কোনো শ্রেণীর মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে যাদের মধ্যে সমসাময়িক জার্মান কর্তৃপক্ষের নিযুক্ত কর্মকর্তাদের মতো প্রবৃত্তি এবং বুদ্ধিমত্তার অভাব রয়েছে ।

বর্ণিত পর্যায়ে ইহুদিটি কেন হঠাৎ নিজেকে জার্মান হিসেবে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তার কারণ খুঁজে বের করা কঠিন নয়। সে অনুভব করেছিল যে রাজপুত্রদের ক্ষমতা ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ছে, এবং সে দাঁড়ানোর জন্য একটি নতুন সামাজিক ভিত্তি খুঁজতে শুরু করেছিল। অধিকন্তু , অর্থনৈতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে তার আধিপত্য এতটাই বিশাল হয়ে উঠেছিল যে সে অনুভব করেছিল, পূর্ণ 'নাগরিক অধিকার' না পাওয়া পর্যন্ত সে এই বিশাল কাঠামোটি আর বজায় রাখতে বা বিকশিত করতে পারবে না । সে এটি বজায় রাখতে ও বিকশিত করতে সচেষ্ট হয়েছিল; সে যত উপরে উঠছিল, প্রাচীনকালে তাকে প্রতিশ্রুত পুরোনো লক্ষ্য, অর্থাৎ বিশ্ব আধিপত্য অর্জনের সম্ভাবনা তাকে তত বেশি প্রলুব্ধ করছিল । সে এর বাস্তবায়নের জন্য আর অপেক্ষা করতে পারছিল না , কারণ তার মনে হচ্ছিল সে ইতিমধ্যেই এটিকে এগিয়ে আসতে দেখছে । তাই, সে সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারসম্পন্ন একজন পূর্ণাঙ্গ নাগরিক হওয়ার দিকে তার সমস্ত প্রচেষ্টা নিবদ্ধ করেছিল ।

এই কারণেই তিনি ঘেটো থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন।

(i) ধীরে ধীরে রাজদরবারের ইহুদি একজন জাতীয় ইহুদিতে রূপান্তরিত হলেন । কিন্তু অবশ্যই তিনি উচ্চবিত্ত শ্রেণীর সাথে মেলামেশা বজায় রেখেছিলেন এবং এমনকি শাসক গোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ মহলে আরও গভীরভাবে প্রবেশ করার চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু একই সময়ে, তার জাতির অন্যান্য সদস্যরা চেষ্টা করছিল

Machine Translated by Google

জাতির আনুকূল্য লাভ করা। যদি আমরা স্মরণ করি বহু শতাব্দী ধরে ইহুদিরা জাতির সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে কী কী অপরাধ করেছে, কীভাবে তারা অবিরাম ও নির্মমভাবে তাদের শোষণ করেছে এবং তাদের অস্থিমজ্জা শুষে নিয়েছে, এবং যখন আমরা স্মরণ করি কীভাবে ধীরে ধীরে জাতি তাকে ঘৃণা করতে শুরু করে এবং অবশেষে তাকে একটি জন- উপদ্রব হিসেবে গণ্য করতে শুরু করে , তখন আমরা বুঝতে পারব ইহুদিদের জন্য এই চূড়ান্ত রূপান্তরটি কতটা কঠিন ছিল। যে অসহায় শিকারদের সে অঙ্গচ্ছেদ করত, তাদের চোখে নিজেকে 'মানবতার বন্ধু' হিসেবে উপস্থাপন করার জন্য তাকে তার সমস্ত শক্তি ব্যবহার করতে হয়েছিল।

ইহুদি লোকটি অতীতে মানুষের প্রতি করা অন্যায়গুলো প্রকাশ্যে শুধরে নেওয়ার মাধ্যমে তার রূপান্তর শুরু করেছিল। সে নিজেকে মানবজাতির 'হিতৈষী' হিসেবে উপস্থাপন করে তার পরিবর্তন শুরু করে। যেহেতু তার নতুন জনহিতকর নীতির একটি খুব নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল, তাই সে বাইবেলের বিধান অনুসরণ করতে পারেনি।
ডানপন্থীরা কী করছে সে সম্পর্কে বামপন্থীদের অন্ধকারে রাখতে তাকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। জনসাধারণের দুর্ভোগ তাকে কতটা গভীরভাবে ব্যথিত করে এবং তাদের সাহায্য করার জন্য তিনি যে মহান ব্যক্তিগত ত্যাগ স্বীকার করতে ইচ্ছুক , সে সম্পর্কে যত বেশি সম্ভব মানুষকে জানাতে তিনি এক ধরনের তাগিদ অনুভব করেছিলেন। একজন ইহুদির স্বভাবসুলভ সহজাত 'নম্রতা' নিয়ে তিনি বিশ্বের কাছে নিজের গুণাবলী ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করতে লাগলেন , অবশেষে বিশ্ব তাকে বিশ্বাস করতে শুরু করল। যারা এটা বিশ্বাস করতে অস্বীকার করেছিল , তাদের অন্যায়কারী বলে গণ্য করা হতো। তিনি শীঘ্রই পরিস্থিতিকে এমনভাবে ঘুরিয়ে দিতে শুরু করলেন যাতে মনে হয় , সবসময় তারই প্রতি অন্যায় করা হচ্ছে, উল্টোটা নয়। কিছু বিশেষ নির্বোধ লোক সেই বেচারা, হতভাগ্য ইহুদিটির জন্য করুণা অনুভব করতে শুরু করল।

উল্লেখ্য যে, ব্যক্তিগত ত্যাগ স্বীকারের ঘোষিত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ইহুদিরা কখনো দরিদ্র হননি। প্রয়োজন মেটানোর এক সহজাত প্রতিভা তাদের সবসময়ই ছিল। কখনো কখনো তাদের দানশীলতাকে মাটিতে সার ছড়ানোর সঙ্গে তুলনা করা যেত।

মাঠে, তাকে তাড়ানোর জন্য নয়, বরং ভবিষ্যতের ফসলের কথা মাথায় রেখে। তুলনামূলকভাবে অল্প সময়ের মধ্যেই বিশ্ব জানতে পারল যে, ইহুদিটি একজন সাধারণ হিতৈষী ও জনহিতৈষীতে পরিণত হয়েছে। কী এক রূপান্তর!

যা অন্য লোকেদের দ্বারা করা হলে কমবেশি স্বাভাবিক ছিল, তা একজন ইহুদির জন্য অত্যন্ত অস্বাভাবিক বলে বিবেচিত হওয়ায় বিস্ময়কর এবং কখনও কখনও প্রশংসার পাত্র হয়ে উঠত। তাই, তিনি তার দাতব্য কাজের জন্য একজন সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি স্বীকৃতি পেয়েছিলেন।
মরণশীল।

এবং আরও কিছু: ইহুদিটি হঠাৎ উদারপন্থী হয়ে উঠল এবং উৎসাহের সাথে কথা বলতে শুরু করল যে কীভাবে কিংবা মানব অগ্রগতিকে সমর্থন করতে। ক্রমান্বয়ে এটি এক নতুন যুগের অগ্রদূত হয়ে উঠল।

একই সময়ে, তিনি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি দুর্বল করতে থাকেন, যা থেকে জনগণই সবচেয়ে বেশি লাভবান হতো। তিনি বিভিন্ন জাতীয় উদ্যোগের শেয়ার কিনে নেন , যার ফলে জাতীয় উৎপাদনের উপর তার প্রভাব বিস্তার পায় এবং এটিকে স্টক এক্সচেঞ্জে কেনাবেচার একটি বস্তুতে , বা বলা ভালো, একটি আর্থিক দাবা খেলার ঘুঁটিতে পরিণত করেন। এর মাধ্যমে তিনি সেই ভিত্তিগুলোকেই ধ্বংস করে দেন, যার ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা সম্ভব ছিল। ইহুদিদের আগমনের ফলে মালিক ও কর্মচারীদের মধ্যে সম্পর্কের শীতলতা শুরু হয় , যা পরবর্তীতে রাজনৈতিক শ্রেণি সংগ্রামের জন্ম দেয়।

অবশেষে , শেয়ার বাজারে আধিপত্যের মাধ্যমে ইহুদিরা সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর ক্রমবর্ধমান প্রভাব অর্জন করে। তারা দেশের শ্রমশক্তির মালিকানা না হলেও , অন্তত নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করেছিল।

নিজের রাজনৈতিক অবস্থানকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে, তিনি নাগরিক ও বর্ণবৈষম্যের সেইসব প্রতিবন্ধকতা দূর করার দিকে মনোনিবেশ করেন, যা এ পর্যন্ত তাঁর অগ্রগতির পথে পদে পদে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্বভাবসুলভ দৃঢ়তার সাথে তিনি ধর্মীয় সহিষ্ণুতার এক প্রবক্তা হয়ে ওঠেন; ফ্রিম্যাসনদের সংগঠন, যা সম্পূর্ণরূপে তাঁর হাতে চলে আসে, তার মধ্যে তিনি নিজের লক্ষ্য অর্জনের জন্য এক চমৎকার অস্ত্র খুঁজে পান। ম্যাসনিক নেটওয়ার্কের কারসাজির মাধ্যমে সরকারি মহল এবং রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক বুর্জোয়া শ্রেণীর উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা তাঁর পরিকল্পনার শিকার হন , যদিও

কী ঘটছিল, সে ব্যাপারে তারা নিজেরাও সন্দেহ করেনি।

কেবলমাত্র জাতি হিসেবে, বা বলা ভালো, সাধারণ জনগণই—যারা সবেমাত্র নিজেদের শক্তি সম্পর্কে সচেতন হচ্ছিল এবং নিজেদের অধিকার ও স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে তা ব্যবহার করতে শুরু করেছিল— এখন পর্যন্ত ইহুদির কবল থেকে রক্ষা পেয়েছিল। অন্তত, জনগণের মধ্যে তার প্রভাব তখনও আরও গভীরে ও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েনি। এতে সে সন্তুষ্ট ছিল না। তাই তার নীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় ছিল নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা।

Machine Translated by Google

সারাদেশে। ইহুদিরা বুঝতে পারল যে স্বৈরাচারী হওয়ার প্রচেষ্টায় তাদের পথ প্রশস্ত করার জন্য একজন 'পথপ্রদর্শক'-এর প্রয়োজন হবে। এবং তারা ভেবেছিল যে বুর্জোয়া শ্রেণীর একটি যথেষ্ট বড় অংশকে বশীভূত করতে পারলে তারা এমন একজনকে খুঁজে পাবে। কিন্তু ফ্রিম্যাসনরি তা করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

দস্তানা-নির্মাতা ও তাঁতিরা তার চক্রে জড়িয়ে পড়ল। আরও কার্যকর একটি উপায় খুঁজে বের করা জরুরি হয়ে পড়ল। তাই, ফ্রিম্যাসনরি ছাড়াও তাদের আরেকটি অস্ত্র জোগাড় করতে হয়েছিল। সেটি ছিল সংবাদমাধ্যম। ইহুদিটি তা দখল করার জন্য তার সমস্ত দক্ষতা ও অধ্যবসায় কাজে লাগাল।

সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে তিনি ক্রমান্বয়ে সমগ্র জনজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করলেন। নিজের লক্ষ্য অর্জনের জন্য তিনি জনজীবনকে নিজের বেছে নেওয়া পথে পরিচালিত করতে লাগলেন ; কয়েক দশক আগের তুলনায় বর্তমানে 'জনমত' নামে অনেক বেশি পরিচিত একটি শক্তি তৈরি ও পরিচালনা করার ক্ষমতা তখন তাঁর ছিল।

একই সময়ে, ইহুদিরা জ্ঞানপিপাসু হয়ে উঠল। তারা অগ্রগতির প্রতিটি পর্যায়ের প্রশংসা করত, বিশেষ করে সেই পর্যায়গুলোর, যা অন্যদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেত; কারণ তারা সমস্ত অগ্রগতি ও উন্নয়নকে তাদের জাতির জন্য বয়ে আনা লাভের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করত। যদি কোনো লাভ না থাকত , তবে তারা জ্ঞানদীপ্তির ঘোর শত্রু হয়ে উঠত এবং সমস্ত প্রকৃত সংস্কৃতিকে ঘৃণা করত।

তিনি তার অর্জিত জ্ঞান শুধুমাত্র নিজ জাতির সেবায় ব্যবহার করেছিলেন।

আগের চেয়েও আরও বেশি সতর্কতার সাথে তিনি তাঁর ইহুদি পরিচয় রক্ষা করতেন। যদিও তিনি "জ্ঞানদীপ্তি ", "প্রগতি", "স্বাধীনতা", "মানবতা" ইত্যাদি প্রচার করতেন, কিন্তু তার প্রধান উদ্বেগ ছিল নিজের জাতির জাতিগত অখণ্ডতা রক্ষা করা। মাঝে মাঝে তিনি তার কোনো এক মেয়ের বিয়ে কোনো প্রভাবশালী খ্রিস্টানের সাথে দিতেন; কিন্তু তার পুরুষ বংশধরদের জাতিগত ঐতিহ্য সর্বদা অমিশ্রিত থাকত। তিনি অন্যদের রক্ত বিষাক্ত করতেন, কিন্তু নিজের রক্তকে অকলুষিত রাখতেন। একজন ইহুদি খুব কমই কোনো খ্রিস্টান মেয়েকে বিয়ে করে , কিন্তু একজন খ্রিস্টান একজন ইহুদি নারীকে গ্রহণ করে। এই দ্বিতীয় মিলনের ফলে সৃষ্ট সংকররা সর্বদা ইহুদিদের পক্ষ নেয়। ফলে, উচ্চ অভিজাত শ্রেণীর একটি অংশ সম্পূর্ণরূপে অধঃপতিত হয়ে গেল। ইহুদিরা এ বিষয়ে ভালোভাবে অবগত ছিল এবং প্রতিপক্ষ জাতির বুদ্ধিজীবী নেতাদের নিরস্ত্র করার জন্য পরিকল্পিতভাবে এই উপায়গুলো ব্যবহার করত। নিজের কৌশল গোপন করতে এবং শিকারদের বোকা বানাতে , তিনি জাতি বা গায়ের রঙ নির্বিশেষে সকল মানুষের সমতার কথা বলতেন। আর সরলমনা লোকেরা তাকে বিশ্বাস করতে শুরু করল।

যেহেতু তার সম্পূর্ণ স্বরূপ তখনও সাধারণ মানুষের কাছে এতটাই অপরিচিত ছিল যে তারা তার ফাঁদে পা দিতে পারেনি, তাই তিনি সংবাদমাধ্যমকে ব্যবহার করে নিজের এমন একটি প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছিলেন যা ছিল পুরোপুরি অসত্য, কিন্তু তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সুপরিকল্পিত। হাস্যরসাত্মক লেখায় ইহুদিদের একটি নিরীহ ক্ষুদ্র জাতি হিসেবে চিত্রিত করার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা চালানো হতো, যাদেরও অন্য সবার মতো নিজস্ব কিছু খামখেয়ালি স্বভাব ছিল। তাদের আচরণ কিছুটা অদ্ভুত মনে হলেও , হাস্যরসাত্মক লেখায় ইহুদিদের সম্মানীয় ও সজ্জন হিসেবে চিত্রিত করা হতো। সাধারণত, তাদের বিপজ্জনক হিসেবে নয়, বরং নগণ্য হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করা হতো।

বিকাশের এই পর্যায়ে ইহুদিদের প্রধান লক্ষ্য ছিল গণতন্ত্রের বিজয় , কিংবা বলা যায়, সংসদীয় ব্যবস্থার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা, যা ছিল তাদের গণতন্ত্র বিষয়ক ধারণারই মূর্ত প্রতীক।

এই প্রতিষ্ঠানটিই তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত; কারণ এখানে ব্যক্তিগত উপাদান নির্মূল করা হয়েছে এবং তার স্থলে আবির্ভূত হয়েছে এক নিস্তেজ সংখ্যাগরিষ্ঠতা, অদক্ষতা এবং পরিশেষে, দুষ্টতা।

অবশেষে, রাজতন্ত্রকে আজ হোক বা কাল হোক প্রত্যাখ্যান করতেই হতো।

(j) ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নয়ন জাতির সামাজিক কাঠামোকে রূপান্তরিত করেছে। ক্ষুদ্র কারিগর শ্রেণী ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যায় , এবং তাদের স্থলাভিষিক্ত কারখানার শ্রমিকদের নিজেদের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করার কোনো সুযোগই ছিল না, বরং তারা ক্রমশ দ্রুতগতিতে সর্বহারা শ্রেণীর স্তরে নেমে আসে। কারখানার শ্রমিকের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এমন কোনো স্বাধীন জীবিকার উৎস নিশ্চিত করতে না পারা , যা তাকে সারাজীবন ভরণপোষণ করতে পারবে। শব্দটির প্রকৃত অর্থে, সে " উত্তরাধিকারবঞ্চিত " হয়েছে। তার বার্ধক্য দুর্বিষহ এবং তাকে জীবন বলাই চলে না।

Machine Translated by Google

পূর্ববর্তী সময়েও এমন একটি পরিস্থিতি উদ্ভূত হয়েছিল যার জন্য জরুরি সমাধানের প্রয়োজন ছিল , এবং সেই সমাধানও পাওয়া গিয়েছিল। কৃষক ও কারিগরদের পাশাপাশি ক্রমান্বয়ে একটি নতুন শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে: সরকারি কর্মকর্তা ও রাষ্ট্রীয় কর্মচারী ।

তারাও ছিলেন প্রকৃত অর্থেই এক 'বঞ্চিত' শ্রেণী । কিন্তু রাষ্ট্র এই অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতির একটি সমাধান খুঁজে বের করে , আর তা হলো বার্ধক্যে স্বাবলম্বী নন এমন সরকারি কর্মচারীদের ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করা । একারণে একটি পেনশন ব্যবস্থা চালু করা হয় । বেসরকারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোও ধীরে ধীরে এর অনুসরণ করে; বর্তমানে, প্রত্যেক বেতনভুক্ত অ-শ্রমিক কর্মচারী বার্ধক্যে পেনশন পান, যদি তার কর্মস্থল একটি নির্দিষ্ট আকার অর্জন করে বা তা অতিক্রম করে।

নির্দিষ্ট কিছু সরকারি কর্মচারীকে তাদের বার্ধক্যে রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানের আশ্বাস দেওয়ার মাধ্যমেই যুদ্ধের পূর্বে জার্মান সরকারি কর্মচারীদের বৈশিষ্ট্যসূচক নিঃস্বার্থপরতা ও কর্তব্যবোধ এতটা ব্যাপক মাত্রায় বিকশিত হয়েছিল ।

এইভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তিহীন সমগ্র শ্রেণীটি দারিদ্র্য থেকে রক্ষা পেয়েছিল ।
একটি বিচক্ষণ পেনশন ব্যবস্থার মাধ্যমে এটি জাতির সামাজিক কাঠামোতে নিজের স্থান করে নিয়েছে।

এবার রাষ্ট্র ও জাতি যে সমস্যার সম্মুখীন, তা অনেক বেশি গুরুতর । শিল্পের বিকাশ ও প্রসারের সাথে সাথে লক্ষ লক্ষ মানুষ গ্রাম ছেড়ে বড় বড় কারখানায় কাজ নিতে চলে আসে। এই নতুন শ্রেণীকে যে পরিস্থিতিতে জীবনযাপন করতে বাধ্য করা হয়েছিল, তা ছিল শোচনীয়েরও ঊর্ধ্বে । কৃষক বা কারিগরদের পূর্ববর্তী কর্মপদ্ধতির কমবেশি যান্ত্রিক রূপান্তর অসম্ভব ছিল । কৃষক ও কারিগররা আগে যেভাবে কাজ করত , তা নতুন কারখানার শ্রমিকের কঠোর পরিশ্রমের সাথে তুলনীয় ছিল না । একসময় সময়ের কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল না , কিন্তু নতুন শিল্প ব্যবস্থায় এটি একটি মূল উপাদান হয়ে ওঠে ।

বিশাল শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে পুরোনো কর্মঘণ্টার স্থানান্তরের ভয়াবহ পরিণতি হয়েছিল। আগে একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ কাজ করা হতো তা তুলনামূলকভাবে কম ছিল, কারণ আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি তখন অজানা ছিল। ফলে , পুরোনো ব্যবস্থায় চৌদ্দ বা এমনকি পনেরো ঘণ্টার কর্মদিবস সহনীয় হলেও , নতুন ব্যবস্থায় তা মানুষের ক্ষমতার বাইরে চলে গিয়েছিল, কারণ প্রতিটি মিনিটকে সর্বোচ্চভাবে কাজে লাগানো হতো । নতুন শিল্প ব্যবস্থায় পুরোনো কর্মঘণ্টার এই অযৌক্তিক স্থানান্তর দুটি দিক থেকে বিপর্যয়কর প্রমাণিত হয়েছিল । প্রথমত, এটি শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নষ্ট করে দিয়েছিল; দ্বিতীয়ত, এটি উচ্চতর আইন ও ন্যায়বিচারের প্রতি তাদের বিশ্বাসকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। পরিশেষে , একদিকে শ্রমিক সামান্য মজুরি পেত, অন্যদিকে নিয়োগকর্তা আগের চেয়েও বেশি মুনাফা ভোগ করত। একারণেই উভয় পক্ষের জীবনযাত্রার মধ্যে এই সুস্পষ্ট পার্থক্য তৈরি হয়েছিল ।

গ্রামে কোনো সামাজিক সমস্যা থাকতে পারত না, কারণ মনিব ও ক্ষেতমজুর একই কাজ করত।
একই কাজ , এবং তারা তা একসাথে করত। তারা একসাথে খেত, কখনও কখনও একই বাটি থেকেও। কিন্তু এই এলাকায়, নতুন ব্যবস্থাটি মালিক ও কর্মচারীর মধ্যে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন সম্পর্কও তৈরি করেছিল ।

মালিক ও কর্মচারীর মধ্যে সৃষ্ট ব্যবধানটি জীবনের সর্বস্তরেই বিস্তৃত বলে মনে হয় । এই ইহুদিকরণের প্রক্রিয়াটি আমাদের জাতিকে কতটা প্রভাবিত করতে পেরেছে, তা এই ঘটনা থেকেই স্পষ্ট হয় যে, কায়িক শ্রম শুধু যে কোনো স্বীকৃতি পায় না তাই নয়, বরং একে মর্যাদাহানিকর বলে গণ্য করা হয়। এটি কোনো স্বাভাবিক জার্মান মনোভাব নয়। আমাদের জীবনে একটি বহিরাগত উপাদানের প্রবেশের ফলেই, এবং সেই বহিরাগত উপাদানটি হলো ইহুদি চেতনা, আমাদের কারিগরদের প্রতি একসময়ের উচ্চ সম্মান এই ধারণায় রূপান্তরিত হয়েছে যে, সমস্ত কায়িক শ্রমই নীচ ও অযোগ্য।

এইভাবে একটি নতুন সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে যা সম্মানিত নয় ; এবং এর অবশ্যই আগমন ঘটবে।
সেই দিন আসবে যখন আমাদের এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে যে, জাতি এই শ্রেণীটিকে সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ করে তুলতে পারবে কি না , নাকি বর্তমানে বিদ্যমান মর্যাদার পার্থক্যটি এই শ্রেণীকে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্নকারী এক অতল গহ্বর হয়েই থাকবে ।

একটি বিষয় নিশ্চিত: এই শ্রেণীর মধ্যে সমাজের নিকৃষ্টতম উপাদানগুলো নেই । বরং এর মধ্যেই রয়েছে জাতির সবচেয়ে উদ্যমী অংশ । তথাকথিত সভ্যতার ফলস্বরূপ যে পরিশীলন এসেছে, তা এখনও এই শ্রেণীর উপর তার বিভেদ সৃষ্টিকারী ও ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলতে পারেনি। এই নতুন নিম্ন শ্রেণীর বৃহত্তর জনসাধারণ , যা গঠিত...

Machine Translated by Google

কায়িক শ্রমিকদের নিয়ে গঠিত হওয়ায় , তারা এখনো শান্তিবাদ নামক রুগ্ন দুর্বলতার শিকার হয়নি ।
তারা এখনও সুস্থ ও সবল এবং প্রয়োজনে নির্মমও হতে পারে ।

যেখানে আমাদের বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই মারাত্মক সমস্যার প্রতি কোনো মনোযোগ দেয়নি এবং উদাসীনভাবে বিষয়টিকে তার নিজের গতিতে চলতে দিয়েছে , সেখানে ইহুদিটি ভবিষ্যতে এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার করেছিল । একদিকে যেমন সে পুঁজিবাদী শোষণকে চূড়ান্ত দক্ষতার পর্যায়ে সংগঠিত করেছিল, তেমনই অন্যদিকে সে তার নীতি ও ক্ষমতার শিকারদের সমর্থন চেয়েছিল এবং অল্প সময়ের মধ্যেই হয়ে উঠেছিল...

নিজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নেতা । এখানে "নিজের বিরুদ্ধে" কথাটা কেবলই একটি বাগধারা; এই "মিথ্যার মহাগুরু" জানে কীভাবে নিজেকে নির্দোষের ছদ্মবেশে অন্যের ওপর দোষ চাপাতে হয় । কারণ...
সে এতটাই বেপরোয়া ছিল যে , জনগণকে এমনভাবে নেতৃত্ব দিয়েছিল যে তারা এক মুহূর্তের জন্যও সন্দেহ করেনি যে তারা ইতিহাসের অন্যতম জঘন্যতম প্রতারণার শিকার হতে চলেছে। অথচ, ঠিক সেটাই ঘটেছিল।

সাধারণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি থেকে যখন একটি নতুন শ্রেণীর উদ্ভব ঘটল এবং সামাজিক ব্যবস্থায় তা আকার নিতে শুরু করল , তখন ইহুদিটি পরিষ্কার দেখতে পেল যে তার অগ্রযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় ‘অগ্রদূত’ সে কোথায় খুঁজে পাবে। প্রথমে সে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বুর্জোয়া শ্রেণীকে একটি আঘাতকারী যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছিল; এখন সে বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিকদের ব্যবহার করল । ঠিক যেমন সে বুর্জোয়া শ্রেণীর সুরক্ষায় নাগরিক অধিকার অর্জনে সফল হয়েছিল , তেমনি এখন সে আশা করল যে শ্রমিকদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে যোগ দিয়ে সে তাদের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে সক্ষম হবে ।

যখন সেই মুহূর্তটি আসবে, শ্রমিকদের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে ইহুদি জাতির ভবিষ্যতের জন্য লড়াই করা । নিজের অজান্তেই শ্রমিক সেই শক্তিরই সেবা করে , যার বিরুদ্ধে সে লড়াই করতে চায়।
সে পুঁজির বিরুদ্ধে লড়তে চায় এবং এর মাধ্যমে পুঁজিপতিদের স্বার্থে লড়াই করা পুঁজির জন্য সহজ করে দিতে চায় । আন্তর্জাতিক পুঁজির বিরুদ্ধে পরিকল্পিত প্রতিবাদগুলো আসলে জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর বিরুদ্ধেই পরিচালিত। এর লক্ষ্য হলো এই কাঠামোকে ধ্বংস করা এবং এর ধ্বংসাবশেষের উপর বিজয়ীর বেশে আন্তর্জাতিক স্টক এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠা করা । ইহুদিটি নিম্নোক্তভাবে অগ্রসর হয়েছিল : সে শ্রমিকের সামনে নতজানু হয়েছিল , ভণ্ডামিপূর্ণভাবে তার ও তার ভাগ্যের প্রতি সহানুভূতি দেখানোর ভান করেছিল, এমনকি শ্রমিককে যে দুর্দশা সহ্য করতে হয়, তাতে ক্ষোভও

প্রকাশ করেছিল। এইভাবে, ইহুদিটি শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্বাস

অর্জন করতে চেয়েছিল। সে বাস্তব বা কাল্পনিক বিভিন্ন অসুবিধা খতিয়ে দেখতে আগ্রহী ছিল এবং কিছু শ্রমিকের মধ্যে তাদের জীবনযাত্রার অবস্থার পরিবর্তনের জন্য একটি আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিল । ইহুদিটি চতুরতার সাথে ন্যায়বিচারের জন্য একটি সহজাত আকাঙ্ক্ষাকে প্রজ্বলিত করেছিল।

সামাজিক আকাঙ্ক্ষা, যা আর্যদের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য । এই আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হওয়ার পর , তা জীবনে অধিক ভাগ্যবানদের প্রতি ঘৃণায় রূপান্তরিত হয় । পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল সামাজিক ভুলত্রুটি দূর করার সংগ্রামে একটি দার্শনিক দিক যুক্ত করা । আর এভাবেই মার্ক্সবাদী মতবাদের জন্ম হয়।

সামাজিক চাহিদার সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করে নিজের মতবাদ উপস্থাপন করার মাধ্যমে ইহুদি ব্যক্তিটি তা আরও কার্যকরভাবে প্রচার করেছিলেন। কিন্তু একই সাথে, তিনি সজ্জন ব্যক্তিদের বিরোধিতার সম্মুখীন হন, যারা এমন সব দাবিতে রাজি হতে অস্বীকার করেছিলেন যা তাদের রূপ এবং ছদ্ম-দার্শনিক সংযোজনের কারণে অন্যায্য ও বাস্তবায়ন করা অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল। কারণ নিছক সামাজিক ধারণার আড়ালে শয়তানি উদ্দেশ্য লুকিয়ে থাকে । এই উদ্দেশ্যগুলো তাদের অসীম ঔদ্ধত্যের মধ্যেই সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা যায় । মার্ক্সবাদী মতবাদ হলো মানবিক যুক্তি এবং অযৌক্তিকতার এক মিশ্রণ; কিন্তু এই সংমিশ্রণটি তৈরি হয়েছিল

এমনভাবে যে এর কেবল অযৌক্তিক অংশটিই বাস্তবে প্রয়োগ করা যায় , যুক্তিসঙ্গত অংশটি কখনোই নয় । ব্যক্তি, জাতি ও বর্ণের ব্যক্তিগত মূল্যকে সুস্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে এই মতবাদ প্রতিটি সভ্যতার ভিত্তি ধ্বংস করে দেয়; কারণ সভ্যতা ঠিক এই উপাদানগুলোর উপরেই নির্ভরশীল। এটাই মার্ক্সবাদী বিশ্বদৃষ্টির প্রকৃত সারমর্ম, যদি কোনো দস্যুর মস্তিষ্কে জন্ম নেওয়া এই ভ্রান্তির ক্ষেত্রে 'বিশ্বদৃষ্টি' শব্দটি আদৌ প্রয়োগ করা যায় । ব্যক্তি ও বর্ণের ধারণার বিনাশ সমাজের নিম্নস্তরের উপাদান, অর্থাৎ ইহুদিদের দ্বারা সমাজের আধিপত্য বিস্তারের পথে প্রধান বাধাটি দূর করে দেয়।

Machine Translated by Google

মার্ক্সবাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক তত্ত্বগুলোর একই অযৌক্তিকতা এই মতবাদকে এক বিশেষ তাৎপর্য দান করেছে। এর ছদ্ম-যুক্তির কারণে বুদ্ধিমান লোকেরা একে সমর্থন করতে অস্বীকার করে, অপরদিকে যারা নিজেদের মানসিক ক্ষমতা ব্যবহারে কম অভ্যস্ত , বা অর্থনীতি সম্পর্কে যাদের কেবল প্রাথমিক ধারণা রয়েছে, তারা মার্ক্সবাদীদের সাথে তাদের পতাকা ওড়াতে যোগ দেয় । এই আন্দোলনের পেছনের বুদ্ধিমত্তা —কারণ এই আন্দোলনকে টিকে থাকতে হলে বুদ্ধিমত্তারও প্রয়োজন —সরবরাহ করে স্বয়ং ইহুদিরাই, অবশ্যই বিনামূল্যে, যা তাদের পক্ষ থেকে এক বিরাট ত্যাগ।

এভাবেই ইহুদিদের নেতৃত্বে শুধুমাত্র কায়িক শ্রমিকদের নিয়ে একটি আন্দোলন গড়ে ওঠে । বাহ্যিকভাবে, এই আন্দোলন শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি করতে চায় ; কিন্তু বাস্তবে, এর লক্ষ্য হলো সকল অ-ইহুদি জাতিকে দাসত্বে আবদ্ধ করা এবং ধ্বংস করা।

ফ্রিম্যাসনরা তথাকথিত বুদ্ধিজীবী মহলে যে প্রচার অভিযান চালাত এবং যার মাধ্যমে শান্তিবাদ আত্মরক্ষার জাতীয় প্রবৃত্তিকে অচল করে দিয়েছিল, তা সংবাদপত্রের মাধ্যমে শ্রমিক ও বুর্জোয়া শ্রেণীর ব্যাপক জনগণের কাছে প্রসারিত হয়েছিল, যা প্রায় সর্বত্রই ইহুদিদের হাতে ছিল। ধ্বংসের এই দুটি উপকরণের সাথে তৃতীয়, আরও একটি নির্মম উপকরণ যুক্ত হয়েছিল, আর তা হলো জনগণের সংগঠিত শারীরিক শক্তি । বিশাল বাহিনীতে আক্রমণ করে মার্ক্সবাদী সৈন্যরা সামাজিক ব্যবস্থার সেই অংশগুলিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল যা পূর্ববর্তী দুটি ধ্বংসাত্মক অভিযান চালানোর পরেও টিকে ছিল।

এই সমস্ত শক্তির সম্মিলিত কার্যকলাপ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পরিচালিত হয়েছিল। এবং এটা আশ্চর্যজনক হবে না যদি সেইসব প্রতিষ্ঠান, যেগুলোকে সবসময় কমবেশি ঐতিহ্যবাহী রাষ্ট্রশক্তির অঙ্গ বলে মনে হতো , মার্ক্সবাদের আক্রমণের মুখে ভেঙে পড়ে । আমাদের উচ্চপদস্থ ও সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে , খুব অল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, ইহুদিরা তাদের ধ্বংসাত্মক কাজে সবচেয়ে অনুগত সহযোগী খুঁজে পেয়েছে। 'ঊর্ধ্বতনদের' প্রতি দাসসুলভ মনোভাব এবং 'অধস্তনদের' প্রতি উদ্ধত ঔদ্ধত্য হলো এই শ্রেণীর মানুষের বৈশিষ্ট্য; সেইসাথে রয়েছে ভয়াবহ মাত্রার মূর্খতা এবং এক বিরাট আত্মম্ভরিতা যা ক্রমাগত বিস্ময়কর উচ্চতায় বিকশিত হচ্ছে ।

কিন্তু এই গুণগুলোই আমাদের কর্তৃপক্ষের সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে ইহুদিদের সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে । তাই, কর্মকর্তাদের মধ্যে এই গুণগুলোকেই সে সবচেয়ে বেশি মূল্য দেয় ।

এখন যে লড়াইটা শুরু হচ্ছে, তার একটা মোটামুটি রূপরেখা দিতে গেলে আমি বর্ণনা করব
এটা মোটামুটি এরকম:

বিশ্বের অর্থনৈতিক বিজয়ে অসন্তুষ্ট , কিন্তু এর উপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ লাভের আকাঙ্ক্ষী হয়ে , ইহুদি ব্যক্তিটি মার্ক্সবাদী শক্তিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেন; প্রতিটি ভাগই সেই চূড়ান্ত লক্ষ্যগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে , যেগুলোর জন্য ইহুদির নেতৃত্বে এই সংগ্রাম পরিচালিত হয়। বাহ্যিকভাবে , এগুলোকে দুটি স্বাধীন আন্দোলন বলে মনে হলেও, বাস্তবে এগুলো একটি অবিচ্ছেদ্য সত্তা গঠন করে। এগুলো হলো রাজনৈতিক আন্দোলন এবং ট্রেড ইউনিয়নসমূহ ।

ট্রেড ইউনিয়নগুলোর কাজ হলো নতুন সদস্য সংগ্রহ করা । জীবনধারণের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য শ্রমিকদের যে কঠিন সংগ্রাম করতে হয় , সেই সংগ্রামে তারা সাহায্য ও সুরক্ষা প্রদান করে।
অনেক শিল্পপতির লোভ ও সংকীর্ণ মানসিকতার কারণে। যতক্ষণ না শ্রমিকরা
মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের সমস্ত দাবি ত্যাগ করতে প্রস্তুত , এবং যতক্ষণ না তারা
যেসব নিয়োগকর্তার অনেক ক্ষেত্রেই মানবিক দায়িত্ববোধের অভাব রয়েছে এবং যারা মানুষের দারিদ্র্যের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন, তাদের হাতে নিজেদের ভাগ্য সঁপে দিতে প্রস্তুত শ্রমিককে তখন নিজের হাতেই সবকিছু তুলে নিতে হয়, যেহেতু সংগঠিত সমাজ —অর্থাৎ রাষ্ট্র—তার প্রয়োজনের প্রতি কোনো মনোযোগ দেয় না।

তথাকথিত জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি নিজেদের পার্থিব স্বার্থে অন্ধ হয়ে শ্রমিকদের এই জীবন - মরণ সংগ্রামের বিরোধিতা করে এবং তাদের পথে সবচেয়ে কঠিন বাধা সৃষ্টি করে। বুর্জোয়া শ্রেণি অমানবিক দীর্ঘ কর্মঘণ্টা কমানো, শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করা, নারীর নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং কর্মশালা ও বাড়ির স্বাস্থ্যকর অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে আইন প্রণয়নের সমস্ত প্রচেষ্টায় বাধা দেয় ।

শ্রমিক শ্রেণীর, এবং একই সাথে ইহুদিরা নির্যাতিতদের বিষয়গুলো নিজেদের হাতে তুলে নেয়।
তিনি ক্রমান্বয়ে একজন শ্রমিক নেতা হয়ে ওঠেন , যা তার জন্য একটি সহজ কাজ।
কারণ এটি আসলে সামাজিক সমস্যার সমাধান করতে চায় না : এটি কেবল একটি লক্ষ্য অনুসরণ করে,

Machine Translated by Google

অর্থাৎ, এমন সমর্থকদের একত্রিত ও সংহত করা, যারা তার নির্দেশে একটি সশস্ত্র শক্তি হিসেবে অর্থনৈতিক যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে জাতীয় অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ধ্বংস করবে। যেখানে একটি সুষ্ঠু সামাজিক নীতিকে একদিকে জনস্বাস্থ্য ও কল্যাণের একটি শালীন স্তর নিশ্চিত করা এবং অন্যদিকে জাতির স্বাধীন অর্থনৈতিক জীবন সুরক্ষিত করার— এই দুই মেরুর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়, সেখানে ইহুদিরা এই দুই মেরুর কোনোটিকেই মোটেই আমলে নেয় না। উভয়কে ধ্বংস করাই তার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

এটি জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করার পরিবর্তে ধ্বংস করবে।
সুতরাং, একজন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা হিসেবে তিনি নির্লজ্জভাবে এমন সব দাবি উত্থাপন করবেন যা শুধু আন্দোলনের ঘোষিত লক্ষ্যকেই ছাড়িয়ে যায় না, বরং জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামো ধ্বংস না করে বাস্তবায়নও করা যায় না। অন্যদিকে, একটি সুস্থ ও সবল জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার ব্যাপারে তার কোনো আগ্রহ নেই; বরং তিনি মানুষকে এমন এক নির্বোধ জনতায় অধঃপতিত হতে দেখে বেশি সন্তুষ্ট হবেন, যাদেরকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করা যায়। যেহেতু এগুলোই তার চূড়ান্ত লক্ষ্য, তাই তিনি সবচেয়ে অযৌক্তিক দাবিগুলোও করতে পারেন। তিনি খুব ভালো করেই জানেন যে এই দাবিগুলো কখনোই পূরণ করা যাবে না এবং তাই বর্তমান পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তনও আনতে পারবে না, কিন্তু এগুলো কেবল জনগণের মধ্যে অস্থিরতার মনোভাব জাগিয়ে তুলতে পারে। তার প্রচারণার উদ্দেশ্য ঠিক এটাই, সামাজিক অবস্থার প্রকৃত ও আন্তরিক উন্নতি নয়।

সুতরাং, জনগণের মধ্যে জ্ঞানার্জনের একটি অভিযান হাতে না নেওয়া পর্যন্ত ইহুদিরাই ট্রেড ইউনিয়নগুলোর অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে থাকবে; এই অভিযান অবশ্যই বিপুল ব্যয়ে পরিচালনা করতে হবে, যাতে তারা তাদের দুর্দশার কারণগুলো আরও ভালোভাবে বুঝতে পারে।
সরকারি কর্তৃপক্ষ যদি ইহুদি এবং তার কাজকে নির্মূল করে দিত, তাহলেও একই লক্ষ্য অর্জন করা যেত। যতদিন জনসাধারণ আজকের মতোই অজ্ঞ থাকবে, এবং যতদিন রাষ্ট্র তাদের ভাগ্যের প্রতি এখনকার মতোই উদাসীন থাকবে, ততদিন তারা এমন যেকোনো নেতাকে অনুসরণ করবে যে অর্থনৈতিক বিষয়ে তাদের সবচেয়ে অদ্ভুত সব প্রতিশ্রুতি দেবে। এই বিদ্যায় ইহুদিরা সেরাদের সেরা, এবং কোনো নৈতিক বিবেচনা তার কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না।

অবশ্যই, এই ক্ষেত্রে তার সকল প্রতিযোগীকে পরাজিত করে দৃশ্যপট থেকে বিতাড়িত করতে তার খুব বেশি সময় লাগবে না। তার স্বভাবের সাধারণ বর্বরতা ও লুণ্ঠনশীলতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, সে ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে শারীরিক সহিংসতার একটি সংগঠনে রূপান্তরিত করবে। যাদের সাধারণ জ্ঞান এ পর্যন্ত তাদেরকে ইহুদিদের নির্দেশ মেনে নেওয়া থেকে রক্ষা করেছে, তাদের প্রতিরোধ চূর্ণ হয়ে যেতে পারে।

সন্ত্রাসের দ্বারা বিধ্বস্ত। এ ধরনের কার্যকলাপের সাফল্য ব্যাপক।
এর পাশাপাশি রাজনৈতিক সংগঠনেরও অগ্রগতি ঘটছে। এটি ট্রেড ইউনিয়নগুলোর সাথে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করে, কারণ তারা জনগণকে রাজনৈতিক সংগঠনের জন্য প্রস্তুত করে এবং এমনকি বলপূর্বক তাদের সেখানে চালিত করে। রাজনৈতিক সংগঠনের বিশাল কাঠামো বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের উৎসও তারাই। ট্রেড ইউনিয়নগুলো হলো সেই অঙ্গ যা তার সদস্যদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে এবং সমস্ত বড় রাজনৈতিক সমাবেশে জনগণকে একত্রিত করে। অবশেষে, তারা অর্থনৈতিক স্বার্থের জন্য লড়াই করা বন্ধ করে দেয়, বরং আত্মসমর্পণ করে।

এর প্রধান অস্ত্র হলো কাজ চালিয়ে যেতে অস্বীকৃতি জানানো – যা সাধারণ ধর্মঘটের রূপ নেয় – এবং এটি রাজনৈতিক আন্দোলনের হাতে ন্যস্ত থাকে।
এমন এক সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে, যার বিষয়বস্তু সবচেয়ে অজ্ঞ পাঠকের উপযোগী করে তৈরি করা হয়, রাজনৈতিক সংগঠন ও শ্রমিক সংঘগুলো এমন একটি হাতিয়ার পায় যা দেশের সর্বনিম্ন স্তরের মানুষকে এক নির্মম ধ্বংসযজ্ঞের জন্য প্রস্তুত করে। এই সংবাদমাধ্যমের উদ্দেশ্য তার পাঠকদের এমন কোনো আদর্শে অনুপ্রাণিত করা নয় যা তাদের মনকে দৈনন্দিন জীবনের জঘন্য পরিস্থিতি থেকে ঊর্ধ্বে তুলতে সাহায্য করতে পারে; বরং এটি তাদের নিকৃষ্টতম প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেয়। জনগণের অলসমনা ও স্বার্থপর অংশের মধ্যে এটি লাভজনক প্রমাণিত হয়।

না।
মূলত এই সংবাদমাধ্যমই অপবাদের এক উগ্র প্রচারণা চালাচ্ছে, ধ্বংস করার চেষ্টা করছে।
যা কিছুকে জাতীয় স্বাধীনতার ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা যায় এবং যা সমস্ত সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে নস্যাৎ করে, সেইসাথে জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্বায়ত্তশাসনকে ধ্বংস করে।
তিনি বিশেষ করে সেইসব চরিত্রবান ব্যক্তিদের ওপর আক্রমণ চালান যারা প্রত্যাখ্যান করে।
রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার ইহুদি প্রচেষ্টার কাছে আত্মসমর্পণ করতে অথবা যারা

Machine Translated by Google

শুধুমাত্র তাদের উন্নত বুদ্ধিমত্তার কারণেই ইহুদিদের কাছে তাদের বিপজ্জনক বলে মনে হয় । একজন ইহুদির শত্রুতা উস্কে দেওয়ার জন্য কোনো প্রকাশ্য শত্রুতা দেখানোর প্রয়োজন নেই । এটাই যথেষ্ট যদি মনে করা হয় যে কেউ এখন বা ভবিষ্যতে একজন ইহুদির বিরোধিতা করতে সক্ষম , অথবা তার যোগ্যতা ও চরিত্র ব্যবহার করে এমন একটি জাতির শক্তি ও অবস্থানকে শক্তিশালী করতে পারে যাকে ইহুদিটি শত্রুভাবাপন্ন মনে করে। ইহুদিদের সহজাত প্রবৃত্তি, যা এই বিষয়গুলিতে কখনও ব্যর্থ হয় না, দৈনন্দিন জীবনে যাদের সাথে ইহুদিটির দেখা হয় তাদের প্রকৃত মানসিকতা

সহজেই বুঝতে পারে ; এবং যারা তার সাথে আধ্যাত্মিকভাবে সম্পর্কিত নয়, তারা অবশ্যই তার শত্রুদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে। যেহেতু ইহুদি নিজে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু নয় বরং সে নিজেই আক্রমণকারী, তাই সে কেবল তাদেরকেই শত্রু মনে করে না যারা তাকে আক্রমণ করে, বরং তাদেরও শত্রু মনে করে যারা তার প্রতিরোধ করতে পারে । এই ধরনের লোকদের, যারা হয়তো ভদ্র ও সৎ প্রমাণিত হতে পারে, তাদের মনোবল ভেঙে ফেলার জন্য সে যে উপায়গুলো ব্যবহার করে তা হলো প্রতারণা এবং অপবাদ।

সে কোনো কিছুতেই থামবে না । তার জঘন্য আচরণ এতটাই ভয়াবহ যে, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে জনমানসে ইহুদিকে শয়তানের অবতার এবং অশুভ শক্তির প্রতীক হিসেবে চিত্রিত করা হয়।

ইহুদির অন্তরের চরিত্র সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা এবং আমাদের উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে প্রবৃত্তি ও অন্তর্দৃষ্টির অভাব, এই কয়েকটি কারণের জন্যই বহু মানুষ ইহুদিদের দ্বারা পরিচালিত সুপরিকল্পিত প্রতারণার শিকার হয়।

উচ্চবিত্ত শ্রেণি তাদের সহজাত কাপুরুষতার কারণে প্রতারণা ও অপবাদের মাধ্যমে কোনো ইহুদির দ্বারা আক্রান্ত হলে মুখ ফিরিয়ে নেয়, অন্যদিকে সাধারণ মানুষ তাদের অজ্ঞতা বা সরলতার কারণে নির্বোধ হয় । সরকারি কর্তৃপক্ষ নীরব থাকে, কিন্তু প্রায়শই তারা ইহুদিদের সংবাদমাধ্যমের প্রচারণাকে ব্যাহত করার জন্য ইহুদি আক্রমণের শিকার ব্যক্তিদের পেছনে ঘোরে। অবিবেচক সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য , এই ধরনের আচরণ রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও জনশৃঙ্খলা বজায় রাখার নীতিরই একটি অংশ । ধীরে ধীরে, ইহুদিদের হাতে থাকা মার্ক্সবাদী অস্ত্র ভদ্র মানুষদের জন্য এক নিত্য আতঙ্কে পরিণত হয় । কখনও কখনও এই ভয় তাদের জন্য দুঃস্বপ্নে রূপ নেয় । মানুষ এই ভয়ংকর শত্রুর সামনে নত হতে শুরু করে এবং এভাবেই এর শিকারে পরিণত হয়।

(k) রাষ্ট্রের উপর ইহুদি আধিপত্য এতটাই সুনিশ্চিত বলে মনে হয় যে , রাষ্ট্রটি শুধু নিজেকে পুনরায় ইহুদি বলে পরিচয় দেওয়ার সামর্থ্যই রাখে না , বরং রাজনৈতিক ও জাতিগত বিষয়ে তাদের ধারণাগুলো কী , তা-ও খোলাখুলিভাবে স্বীকার করে নেয়। কিছু ইহুদি খোলাখুলিভাবে স্বীকার করে যে তারা বহিরাগত , কিন্তু এটাও আরেকটি ছলনা। জায়নবাদীরা যখন বাকি বিশ্বকে এটা বোঝানোর চেষ্টা করে যে ফিলিস্তিনে একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নতুন ইহুদি জাতীয় চেতনার তৃপ্তি ঘটবে, তখন ইহুদিরা সরলমনা অ-ইহুদিদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য অন্য একটি পদ্ধতি ব্যবহার করে। ফিলিস্তিনে বসবাসের জন্য একটি ইহুদি রাষ্ট্র গড়ার কোনো ইচ্ছাই তাদের নেই । তাদের আসল লক্ষ্য হলো তাদের আন্তর্জাতিক প্রতারণা ও জালিয়াতির জন্য একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা । একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে , এটিকে অন্য কোনো রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না । এভাবে , এটি ধরা পড়া প্রতারকদের জন্য একটি আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করতে পারে এবং একই সাথে, অন্য প্রতারকদের শিক্ষিত করার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও হতে পারে।

তাদের ক্রমবর্ধমান ঔদ্ধত্য এবং আত্ম-নিরাপত্তাবোধের নিদর্শনস্বরূপ , কেউ কেউ প্রকাশ্যে ও নির্লজ্জভাবে নিজেদের ইহুদি পরিচয় ঘোষণা করে, আবার অন্যরা ভণ্ডামির সাথে ভান করে যে তারা জার্মান, ফরাসি বা ইংরেজ। অন্য মানুষের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে তাদের নির্লজ্জ আচরণ পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দেয় যে, অদূর ভবিষ্যতে তারা তাদের বিজয়ের দিনটিকে কীভাবে দেখে ।

কালো চুলের এক তরুণ ইহুদি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে শয়তানি দৃষ্টিতে এক নিরীহ মেয়ের ওপর নজর রাখে ও গুপ্তচরবৃত্তি করে , যাকে সে প্রলুব্ধ করে তার রক্ত কলুষিত করার এবং নিজের জাতির গর্ভ থেকে কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করে। ইহুদিটি তার বিজিত জাতির জাতিগত ভিত্তি দুর্বল করার জন্য তার হাতের কাছে থাকা প্রতিটি উপায় ব্যবহার করে । মেয়ে ও নারীদের ধ্বংস করার এই সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টায়, সে সেই শেষ বাধাগুলোও ভেঙে ফেলার চেষ্টা করে যা তাকে অন্য জাতি থেকে আলাদা করে। ইহুদিরাই রাইনল্যান্ডে নিগ্রোদের নিয়ে আসার জন্য দায়ী ছিল, যাতে তারা যে শ্বেতাঙ্গ জাতিকে ঘৃণা করে তাকে শেষ পর্যন্ত কলুষিত করতে পারে এবং এর মাধ্যমে তাদের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক স্তরকে নামিয়ে আনতে পারে , যাতে ইহুদিরা শাসন করতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত জাতিটি জাতিগতভাবে বিশুদ্ধ থাকবে এবং তার রক্তের সম্পদ সম্পর্কে সচেতন থাকবে, ততক্ষণ কিছুই ঘটবে না।

Machine Translated by Google

কোনো ইহুদির দ্বারা পরাধীন হবে না। এই পৃথিবীতে কোনো ইহুদি কখনো সংকর জাতি ব্যতীত অন্য কোনো জাতির প্রভু হতে পারে না।

সুতরাং, ইহুদিরা ক্রমাগতভাবে জাতির জাতিগত গুণমানকে অবনমিত করার জন্য পরিকল্পিতভাবে চেষ্টা করে। এই জাতি গঠনকারী ব্যক্তিদের রক্তকে কলুষিত করা।

রাজনীতিতে তিনি গণতন্ত্রের ধারণাকে সর্বহারার একনায়কতন্ত্র দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে শুরু করেন। মার্ক্সবাদী পতাকাতলে সংগঠিত জনগণের মধ্যে তিনি এমন একটি অস্ত্র খুঁজে পেয়েছেন, যা তাকে গণতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করে পাশবিক শক্তির মাধ্যমে একনায়কসুলভ শাসন করার সুযোগ করে দেয়। বিপ্লব ঘটানোর জন্য তিনি পদ্ধতিগতভাবে দুটি দিকে কাজ করেন। এই দিকগুলো হলো অর্থনীতি এবং রাজনীতি।

আন্তর্জাতিক প্রভাবের সাহায্যে , তিনি তার চেয়ে শক্তিশালী প্রমাণিত দেশগুলোর চারপাশে শত্রুবলয় তৈরি করেন এবং ভেতর থেকে আসা আক্রমণ প্রতিহত করেন। তিনি বাধ্য করার চেষ্টা করবেন
তাদেরকে যুদ্ধে পাঠাবে এবং তারপর, তার পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজন হলে , সম্মুখ সমরে সৈন্যরা যুদ্ধরত অবস্থাতেই সে বিপ্লবের পতাকা উত্তোলন করবে।

অর্থনৈতিকভাবে, তিনি পরিকল্পিতভাবে সামাজিক উদ্যোগগুলোতে অন্তর্ঘাত ঘটিয়ে রাষ্ট্রের ধ্বংস ডেকে আনবেন, যতক্ষণ না সেগুলো এতটাই ব্যয়বহুল হয়ে ওঠে যে রাষ্ট্রের হাত থেকে সেগুলো সরিয়ে ইহুদি অর্থদাতাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। রাজনৈতিকভাবে, তিনি রাষ্ট্রকে তার অস্তিত্ব রক্ষার উপায় থেকে বঞ্চিত করতে , জাতীয় প্রতিরক্ষা ও প্রতিরোধের ভিত্তি দুর্বল করতে, সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা ধ্বংস করতে , অতীত ও ইতিহাসকে অপমান করতে এবং জাতীয় সবকিছুকে নর্দমায় নিক্ষেপ করতে কাজ করেন।

সাংস্কৃতিকভাবে এর কার্যকলাপের মধ্যে রয়েছে শিল্পকলা, সাহিত্য ও নাটকের ওপর সেন্সরশিপ আরোপ করা, জাতীয় অনুভূতির প্রকাশকে অবজ্ঞা করা , সকল আদর্শ, সৌন্দর্য ও মঙ্গলকে প্রত্যাখ্যান করা এবং পরিশেষে মানুষকে এর নিম্ন মানসিকতার স্তরে নামিয়ে আনা।

ধর্মকে উপহাস করা হয়। নৈতিকতা ও সততাকে সেকেলে কুসংস্কার হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় , এবং বৈশ্বিক অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে একটি জাতির যে ভিত্তির ওপর দাঁড়ানো অপরিহার্য, তাকেই দুর্বল করার জন্য একটি পরিকল্পিত আক্রমণ চলছে।

(I) এখন শুরু হয় মহান ও চূড়ান্ত বিপ্লব। যখন ইহুদি অবশেষে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করে , তখন সে তার পূর্ববর্তী বৈশিষ্ট্যগুলোকে আড়াল করে রাখা শেষ আবরণটুকুও খুলে ফেলে। গণতান্ত্রিক ইহুদি, অর্থাৎ 'জাতীয় ইহুদি'-র মধ্য থেকে আবির্ভূত হয় 'রক্তের ইহুদি', জাতিসমূহের স্বৈরশাসক। কয়েক বছরের মধ্যেই সে জাতীয় বুদ্ধিজীবী মহলের সকল প্রতিনিধিকে ধ্বংস করার জন্য সচেষ্ট হয়। জাতিকে তার বুদ্ধিজীবী নেতাদের থেকে বঞ্চিত করে সে তাকে দাসের ভূমিকায় নামিয়ে আনে।

এই ধরনের দাসত্বের সবচেয়ে ভয়াবহ উদাহরণ হলো রাশিয়া। এই দেশে, ইহুদিরা পাশবিক ধর্মান্ধতার বশে ত্রিশ মিলিয়ন মানুষকে হত্যা করেছে বা অনাহারে রেখেছে, যার একটি অংশ ছিল অমানবিক নির্যাতন। আর তারা এটা করেছিল যাতে একদল ইহুদি বুদ্ধিজীবী ও আর্থিক ডাকাত একটি মহান জাতিকে শাসন করতে পারে।

কিন্তু এর চূড়ান্ত ফল শুধু ইহুদি শাসনাধীন জাতির সমস্ত স্বাধীনতার বিলুপ্তিই নয় , বরং এই পরজীবীগুলোরও বিলুপ্তি। শিকারের মৃত্যু শীঘ্র বা বিলম্বে রক্তচোষারও মৃত্যু ঘটাবে।

* * *

জার্মান জাতির পতনে অবদান রাখা সমস্ত কারণের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে , এর গভীরতম ও সবচেয়ে নির্ণায়ক কারণটি হলো জাতিগত সমস্যা সম্পর্কে উপলব্ধির অভাব এবং বিশেষত, ইহুদি হুমকিকে চিনতে না পারা।

১৯১৮ সালের আগস্ট মাসের যুদ্ধক্ষেত্রের পরাজয়গুলো সহ্য করা সহজ হতো। আমাদের জাতির সামরিক বিজয়গুলোর তুলনায় সেগুলো কিছুই ছিল না। আমাদের পতন এই পরাজয়গুলোর ফল ছিল না; আমাদের ধ্বংস করেছিল এমন এক শক্তি, যারা এই পরাজয়গুলোর পরিকল্পনা করেছিল এবং কয়েক দশক ধরে সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করে সেই রাজনৈতিক প্রবৃত্তি ও নৈতিক দৃঢ়তাকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল , যা একটি জাতিকে টিকে থাকার জন্য লড়াই করতে এবং এর মাধ্যমে তার অস্তিত্বের অধিকার নিশ্চিত করতে সক্ষম করে।

আমাদের জাতীয় জীবনের জাতিগত ভিত্তি উপেক্ষা করে , পুরাতন রাইখ সেই একমাত্র আইনটি বিলুপ্ত করেছিল যা মানুষকে এই গ্রহে বেঁচে থাকার সুযোগ দেয়। যে জাতিগুলো

Machine Translated by Google

তারা সংকর সৃষ্টি করে বা মানুষকে সংকর হতে দেয়, যা শাশ্বত বিধাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাপ। অতএব, শক্তিশালী প্রতিপক্ষের কাছে তাদের পরাজয় কোনো অশুভ কাজ নয়, বরং এর বিপরীতে , তা হলো ন্যায়বিচারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। যদি কোনো জাতি প্রকৃতি প্রদত্ত এবং জাতিগত রক্তে প্রোথিত বৈশিষ্ট্যগুলোকে রক্ষা ও বজায় রাখতে অস্বীকার করে, তবে সেই জাতির তার পার্থিব অস্তিত্ব হারানোর বিষয়ে অভিযোগ করার কোনো অধিকার নেই।

এই পৃথিবীর সবকিছুকেই আরও ভালো কিছুতে রূপান্তরিত করা যায়। প্রতিটি পরাজয় ভবিষ্যতের বিজয়ের ভিত্তি হতে পারে। প্রতিটি পরাজিত যুদ্ধ পরবর্তী পুনর্জন্মের কারণ হতে পারে। প্রতিটি দুর্ভাগ্য মানবশক্তিতে নতুন প্রেরণা জোগাতে পারে। প্রতিটি নিপীড়ন থেকে এমন শক্তির উদ্ভব হতে পারে যা জাতীয় চেতনার পুনর্জন্ম ঘটাবে— যদি কেবল জাতিগত রক্তের বিশুদ্ধতা বজায় থাকে।

কিন্তু জাতিগত বিশুদ্ধতার বিনাশ অন্তরের সুখকে চিরতরে ধ্বংস করে দেয়। এটি মানুষকে চিরকালের জন্য অধঃপতিত করে। এর শারীরিক ও নৈতিক পরিণতি কখনোই দূর করা যায় না।

যদি এই অনন্য সমস্যাটিকে জীবনের অন্যান্য সমস্যার সাথে পরীক্ষা করে তুলনা করা হতো , তাহলে আমরা সহজেই দেখতে পেতাম যে তুলনামূলকভাবে সেগুলো কতটা নগণ্য। সেগুলোর সবই সময়সীমিত; কিন্তু জাতিগত বিশুদ্ধতা বজায় রাখা বা হারানোর সমস্যাটি ততদিনই থাকবে, যতদিন মানুষ থাকবে।

যুদ্ধের আগে থেকেই দৃশ্যমান অবক্ষয়ের সমস্ত লক্ষণের উৎস হলো
জাতিগত সমস্যা।

আমরা সাধারণভাবে আইনি বিষয়াবলী, বা অর্থনৈতিক জীবনের দানবীয় প্রবৃদ্ধি , বা সাংস্কৃতিক অবক্ষয় বা রাজনৈতিক অধঃপতন নির্দেশক ঘটনাপ্রবাহ , বা শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি, অথবা প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের উপর সংবাদমাধ্যমের নেতিবাচক প্রভাব—যে বিষয় নিয়েই বিবেচনা করি না কেন ,
জনসংখ্যা - সর্বদা এবং সর্বত্র এই ঘটনাগুলোর উৎস হলো, জাতি যে জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তাদের স্বার্থের প্রতি বিবেচনার অভাব, অথবা জাতির অভ্যন্তরে একটি ভিন্ন জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বকে অনুমতি দেওয়ার ফলে সৃষ্ট বিপদকে অনুধাবন করতে না পারা।

সুতরাং, সংস্কারের সমস্ত প্রচেষ্টা, সমস্ত সামাজিক কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান, সমস্ত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, সমস্ত অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং সাধারণ জ্ঞানের ভান্ডারের সমস্ত সুস্পষ্ট বৃদ্ধি—সবই নিষ্ফলতা এবং কোনো উল্লেখযোগ্য ফল উৎপাদনে অক্ষমতার শিকার হয়েছিল। জাতি, এবং যে সংগঠনটি এর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে —অর্থাৎ রাষ্ট্র— অভ্যন্তরীণ শক্তি ও স্থিতিশীলতা অর্জন করতে পারেনি; বরং তারা দৃশ্যত তাদের প্রাণশক্তি হারিয়েছিল। দ্বিতীয় রাইখের মিথ্যা জাঁকজমক এর অভ্যন্তরীণ দুর্বলতাকে ঢাকতে পারেনি। এবং একে পুনরুজ্জীবিত করার প্রতিটি প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল , কারণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটির সমাধান করা হয়নি।

এটা ভাবা ভুল হবে যে, জার্মান জাতিকে নিরাময় করার চেষ্টাকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থকেরা , এমনকি এই দলগুলোর নেতারাও, নিজেরা দুষ্ট ছিলেন বা তাদের অসৎ উদ্দেশ্য ছিল। তাদের কার্যকলাপ বড়জোর ব্যর্থ হতে বাধ্য ছিল, কারণ তারা একটি সাধারণ রোগের লক্ষণ ছাড়া আর কিছুই দেখেনি এবং রোগের আসল কারণগুলোকে উপেক্ষা করে শুধু সেই লক্ষণগুলোরই চিকিৎসা করার চেষ্টা করেছিল। যদি কেউ পদ্ধতিগতভাবে সেই গতিপথটি পরীক্ষা করে দেখত...

সতর্ক রাজনৈতিক বিশ্লেষণের পর এটা লক্ষ্য না করে পারা যায় না যে, পুরাতন রাইখের অভ্যন্তরীণ অবক্ষয়ের প্রক্রিয়া তখনই শুরু হয়ে গিয়েছিল, যখন ঐক্যবদ্ধ রাইখ গঠিত হয়েছিল এবং জার্মান জাতি দ্রুত বাহ্যিক উন্নতি করতে শুরু করেছিল। সুস্পষ্ট রাজনৈতিক সাফল্য এবং ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধি সত্ত্বেও, সার্বিকভাবে সবকিছুই পতনের দিকে ধাবিত হচ্ছিল। রাইখস্ট্যাগ নির্বাচনে ক্রমবর্ধমান মার্ক্সবাদী ভোট ইঙ্গিত দিচ্ছিল যে, অভ্যন্তরীণ ভাঙন এবং রাজনৈতিক পতন দ্রুত এগিয়ে আসছে। তথাকথিত বুর্জোয়া দলগুলোর সমস্ত বিজয়ই নিষ্ফল ছিল; শুধু এই কারণে নয় যে , বুর্জোয়া দলগুলো জয়ী হওয়ার সময়েও তারা মার্ক্সবাদী ভোটের সংখ্যাগত বৃদ্ধি ঠেকাতে পারেনি , বরং প্রধানত এই কারণে যে , তারা নিজেরাই অবক্ষয়ের জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত ছিল। যদিও তারা তা উপলব্ধি করতে পারেনি, বুর্জোয়া জগৎ ভেতর থেকে মার্ক্সবাদের মারাত্মক ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছিল।

তারা যে মাঝে মাঝে প্রকাশ্যে একে অপরের বিরোধিতা করত, তা বরং তাদের মধ্যকার ঝগড়ার দ্বারাই ব্যাখ্যা করা যায়।

Machine Translated by Google

উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজনৈতিক নেতাদের, বরং এমন প্রতিপক্ষদের মধ্যেকার কোনো মতপার্থক্যকে দায়ী না করে , যারা শেষ পর্যন্ত একে অপরের সাথে লড়াই করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল ।
এই সমস্ত বছর ধরে, কেবল ইহুদিরাই অটল অধ্যবসায় নিয়ে লড়াই করেছিল । ডেভিডের তারকা ক্রমাগত উঁচুতে উঠছিল, আর জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার ইচ্ছাশক্তি হ্রাস পাচ্ছিল।

এই কারণেই ১৯১৪ সালের আগস্ট মাসে এমন কোনো সুসংহত জাতীয় সৈন্যদল ছিল না, যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং সংহতিবোধ থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ত। বরং এটি ছিল মার্ক্সবাদী ও শান্তিবাদী মতবাদ থেকে উদ্ভূত পক্ষাঘাতের অগ্রগতির বিরুদ্ধে জাতীয় আত্মরক্ষার এক শেষ ঝলক , যা আমাদের জাতিকে হুমকির মুখে ফেলেছিল। এমনকি সেই দিনগুলিতেও, যখন আমাদের জাতির ভাগ্য ঝুঁকির মুখে ছিল , অভ্যন্তরীণ শত্রু অশনাক্তই থেকে গিয়েছিল; তাই, বাহ্যিক শত্রুকে প্রতিরোধের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য ছিল । বিধাতা বিজয়ী তরবারিকে কোনো পুরস্কার দেননি , বরং ন্যায়সঙ্গত প্রতিশোধের চিরন্তন বিধান অনুসারেই কাজ করেছেন । এই সবকিছুর গভীর উপলব্ধিই ছিল সেই নীতিগুলির উৎস, যা আমাদের নতুন আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল। আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে, কেবল এই সত্যগুলি উপলব্ধি করার মাধ্যমেই আমরা জার্মানির পতন থামাতে পারব এবং এমন একটি গ্রানাইটের ভিত্তি স্থাপন করতে পারব, যার উপর পুনরায় একটি রাষ্ট্র নির্মাণ করা সম্ভব হবে ; যা আমাদের জাতির জন্য অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ও স্বার্থে সৃষ্ট কোনো পরকীয় যন্ত্র হবে না , বরং হবে জাতির আত্মা থেকে সৃষ্ট এক জীবন্ত সত্তা।

জার্মান জাতির জার্মান রাষ্ট্র

Machine Translated by Google

অধ্যায় ১২

বিকাশের প্রথম পর্যায় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক জার্মান শ্রমিক দল

এই খণ্ডের শেষে আমি আমাদের আন্দোলনের বিকাশের প্রথম পর্ব বর্ণনা করব এবং সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করব। এই সময়কালে আমাদের যে সকল প্রতিকূলতার মোকাবিলা করতে হয়েছিল। তা করতে গিয়ে, আমাদের আন্দোলনের লক্ষ্যে পরিণত হওয়া আদর্শগুলো ব্যাখ্যা করার আমার কোনো ইচ্ছা নেই ; কারণ সেগুলো এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে সেগুলোর বর্ণনার জন্য একটি পৃথক খণ্ডের প্রয়োজন। তাই, আমি এই বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডটি উৎসর্গ করব ...
আমাদের আন্দোলনের কর্মসূচি গঠনকারী মূলনীতিগুলোর একটি বিশদ পর্যালোচনার পর আমি তুলে ধরার চেষ্টা করব। 'রাষ্ট্র' শব্দটি আমাদের কাছে কী অর্থ বহন করে, তার একটি চিত্র। যখন আমি 'আমরা' বলি, তখন আমি সেই লক্ষ লক্ষ মানুষকে বোঝাই যারা একই জিনিসের জন্য আকাঙ্ক্ষা করে , যদিও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে তারা তা পারে না।
তাদের সামনে থাকা রূপকল্পটি বর্ণনা করার জন্য সঠিক শব্দ খুঁজে বের করা । সকল মহান সংস্কারের একটি বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, শুরুতে একজন ব্যক্তি লক্ষ লক্ষ মানুষের পক্ষ থেকে কথা বলেন । একটি মহান সংস্কারের চূড়ান্ত লক্ষ্য প্রায়শই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষের গভীর আকাঙ্ক্ষার বস্তু হয়ে থাকে, যতক্ষণ না অবশেষে তাদের মধ্যে একজন এই জনতার ইচ্ছার বার্তাবাহক হিসেবে কাজ করেন এবং একটি পুরোনো আকাঙ্ক্ষার পতাকাবাহক হয়ে ওঠেন , যাকে তিনি এখন একটি নতুন ধারণার মাধ্যমে ফলপ্রসূ করেন ।

আমাদের লক্ষ লক্ষ দেশবাসী যে মনে মনে আমাদের বর্তমান অবস্থার আমূল পরিবর্তন কামনা করে, তার প্রমাণ মেলে তাদের মধ্যে বিদ্যমান গভীর অসন্তোষ থেকে। এই অনুভূতি হাজারো রূপে প্রকাশ পায় । কেউ কেউ তা হতাশা ও নৈরাশ্যের রূপে প্রকাশ করে । অন্যরা তা ক্রোধ, আক্রোশ ও ক্ষোভের মাধ্যমে প্রকাশ করে। কারও কারও মধ্যে গভীর অসন্তোষ উদাসীন মনোভাব তৈরি করে , আবার অন্যদের ক্ষেত্রে তা ক্রোধের হিংস্র প্রকাশে চালিত করে। এই অনুভূতির আরেকটি উদাহরণ দেখা যায় , একদিকে যারা ভোটদানে বিরত থাকে তাদের মনোভাবের মধ্যে , এবং অন্যদিকে, বিপুল সংখ্যক মানুষের উগ্র বামপন্থী চরমপন্থীদের দলে যোগ দেওয়ার মধ্যে।

সর্বোপরি, আমাদের নবীন আন্দোলনকে এই শেষোক্ত মানুষদের কাছে আবেদন জানাতে হতো। এটি সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্তদের জন্য কোনো সংগঠন ছিল না , বরং ছিল গভীর উদ্বেগে জর্জরিত ও শান্তি খুঁজে পেতে অক্ষম, অসুখী ও অসন্তুষ্ট সকলের জন্য। এর কাজ ছিল না জাতির উপরিভাগে ভেসে থাকা , বরং তাদের অন্তরে গভীর শিকড় গেড়ে বসা।

কিন্তু।

* * *

সম্পূর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে , ১৯১৮ সালের পরিস্থিতি ছিল নিম্নরূপ : জাতি দুই ভাগে বিভক্ত ছিল । এর এক অংশ, যা অন্য অংশের চেয়ে আকারে অনেক ছোট ছিল, তা গঠিত ছিল দেশের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে নিয়ে, যেখান থেকে কায়িক শ্রমের সাথে জড়িত সকলকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। বাহ্যিকভাবে, এই বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে জাতীয়তাবাদী বলে মনে হলেও, এই শব্দটি তাদের কাছে রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষার এক অত্যন্ত অস্পষ্ট ও দুর্বল ধারণা ছাড়া আর কিছুই বোঝাত না; যে স্বার্থকে তারা রাষ্ট্রের স্বার্থ বলত , তা আবার রাজবংশীয় শাসনের স্বার্থেরই সমার্থক বলে প্রমাণিত হয়েছিল । এই শ্রেণীটি তাদের আদর্শ রক্ষা করতে এবং লক্ষ্য অর্জন করতে এমন মানসিক অস্ত্র দিয়ে লড়াই করার চেষ্টা করেছিল যা কেবল মাঝে মাঝে ব্যবহার করা যেত এবং প্রতিপক্ষের পাশবিক পদ্ধতির বিরুদ্ধে যার প্রভাব ছিল কেবলই উপরিউক্ত, কারণ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মানসিক অস্ত্র অকার্যকর প্রমাণিত হতে বাধ্য ছিল । এক পাশবিক আঘাতে, যে শ্রেণীটি পূর্বে শাসন করত, তাকে নির্মূল করা হলো। সে ভয়ে কাঁপতে লাগল এবং নির্দয় বিজয়ীর চাপিয়ে দেওয়া প্রতিটি অপমান মেনে নিল ।

এই শ্রেণীর বিপরীতে ছিল কমবেশি উগ্র মার্ক্সবাদী প্রবণতাসম্পন্ন আন্দোলনে সংগঠিত শ্রমজীবী জনতা। এই সংগঠিত জনতা-

Machine Translated by Google

তারা পাশবিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে যেকোনো ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিরোধ গুঁড়িয়ে দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। তাদের কোনো জাতীয়তাবাদী প্রবণতা ছিল না এবং তারা ইচ্ছাকৃতভাবে বর্জন করেছিল
জাতির নিজস্ব স্বার্থ সমর্থন করার ধারণা। এর বিপরীতে, তারা বিদেশী আগ্রাসনকারীদের স্বার্থ রক্ষা করত। সংখ্যাগতভাবে, এই শ্রেণীটি ছিল জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ , এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এর মধ্যে জাতির সেই সমস্ত উপাদান অন্তর্ভুক্ত ছিল, যাদের সহযোগিতা ছাড়া জাতির পুনর্জন্ম কেবল কার্যত অসম্ভবই ছিল না, বরং তা ছিল একেবারেই অকল্পনীয়।

১৯১৮ সালেই একটি বিষয় পরিষ্কারভাবে বোঝা গিয়েছিল : বহির্বিশ্বের মোকাবিলা করার জন্য জাতির শক্তি পুনরুদ্ধার না করলে জার্মান জাতির পুনর্জন্ম অসম্ভব। এই উদ্দেশ্যে, অস্ত্রশস্ত্র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন ছিল না , যদিও আমাদের বুর্জোয়া 'রাষ্ট্রনায়করা' সবসময় তা-ই প্রচার করতেন; প্রয়োজন ছিল ইচ্ছাশক্তি। একটা সময় ছিল যখন জার্মান জাতির কাছে প্রয়োজনের চেয়েও বেশি সামরিক সরঞ্জাম ছিল। এবং তারপরেও, তারা তাদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে অক্ষম ছিল , কারণ তাদের মধ্যে আত্মরক্ষার জাতীয় প্রবৃত্তি এবং টিকে থাকার ইচ্ছা থেকে উৎসারিত শক্তির অভাব ছিল। সেরা অস্ত্রও প্রাণহীন এবং মূল্যহীন, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই চেতনার অভাব থাকে যা মানুষকে সেই অস্ত্র ব্যবহারে ইচ্ছুক ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে তোলে। জার্মানি অরক্ষিত হয়ে পড়েছিল অস্ত্রের অভাবে নয় , বরং জাতিকে টিকিয়ে রাখার জন্য সেগুলো ব্যবহার করার ইচ্ছাশক্তির অভাবে।

আজ, বিশেষ করে আমাদের বামপন্থী রাজনীতিবিদরা ক্রমাগত দাবি করে চলেছেন যে, জার্মানির নিরস্ত্রীকরণের কারণেই তাদের কাপুরুষোচিত ও দাসসুলভ পররাষ্ট্রনীতি তৈরি হয়েছে, অথচ বাস্তবে এটি বিশ্বাসঘাতকদের নীতি। এই ধরনের সমস্ত বক্তব্যের একটাই উত্তর হওয়া উচিত: না, আসলে ব্যাপারটা ঠিক তার উল্টো। আত্মসমর্পণের দিকে চালিত আপনাদের পদক্ষেপগুলো ছিল দেশের স্বার্থ বিসর্জন দেওয়ার এক দেশবিরোধী ও অপরাধমূলক নীতির দ্বারা চালিত। আর এখন আপনারা জনগণকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে, আপনাদের এই করুণ আর্তনাদ এই কারণে যে আপনাদের কাছে কোনো অস্ত্র নেই। আপনাদের আচরণের অন্য সবকিছুর মতোই , এটাও একটি মিথ্যা এবং প্রকৃত কারণের বিকৃতি।

কিন্তু ডানপন্থী রাজনীতিবিদরাও ঠিক একই তিরস্কারের যোগ্য। তাদের চরম কাপুরুষতার কারণেই ১৯১৮ সালে ক্ষমতায় আসা ইহুদি দস্যুরা লুটপাট করতে সক্ষম হয়েছিল।
জাতিকে তার অস্ত্র থেকে মুক্ত করা। রক্ষণশীল রাজনীতিবিদদের এই দাবি করার কোনো অধিকার বা কারণ নেই যে, নিরস্ত্রীকরণই তাদের বিচক্ষণতার (অর্থাৎ, কাপুরুষতার) নীতি গ্রহণে বাধ্য করেছে। এক্ষেত্রেও, সত্যটা ঠিক এর বিপরীত। নিরস্ত্রীকরণ হলো তাদের মনোবলহীনতার ফল।

সুতরাং জার্মান শক্তির পুনর্জন্মের সমস্যাটি ছিল না যে আমরা কীভাবে অস্ত্র উৎপাদন করতে পারি, বরং সমস্যাটি ছিল কীভাবে এমন এক চেতনা সৃষ্টি করা যায় যা মানুষকে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে সক্ষম করবে।
যখন কোনো জাতির মধ্যে এই চেতনা বিরাজ করে , তখন সে হাজারো পথ খুঁজে নেবে, যার প্রতিটিই প্রয়োজনীয় অস্ত্রের দিকে নিয়ে যাবে। কিন্তু একজন কাপুরুষ আক্রান্ত হলে একটিও গুলি চালাবে না, এমনকি তার কাছে দশটি পিস্তল থাকলেও। একজন সাহসী মানুষের হাতে থাকা একটি লাঠির চেয়েও সেগুলোর মূল্য তার কাছে কম হবে।

সুতরাং, আমাদের জাতির রাজনৈতিক শক্তি পুনরুদ্ধারের সমস্যাটি সর্বোপরি আত্মরক্ষার জাতীয় প্রবৃত্তি পুনরুদ্ধারের সমস্যা, কারণ পররাষ্ট্রনীতির প্রতিটি প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ এবং একটি রাষ্ট্রের মূল্যায়নের প্রতিটি বাহ্যিক মাপকাঠি সর্বদা রাষ্ট্রের অধিকারী অস্ত্রের বস্তুগত পরিমাণের উপর ভিত্তি করে হয় না, বরং একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের বিদ্যমান বা বিদ্যমান বলে অনুমিত নৈতিক প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে হয়। কোনো জাতি কাঙ্ক্ষিত মিত্র হবে কি না, সেই প্রশ্নটি মূলত তার জড় জনসমষ্টি দ্বারা নির্ধারিত হয় না।

অস্ত্রের দ্বারা নয়, বরং টিকে থাকার এক দৃঢ় জাতীয় সংকল্প এবং শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়াই করার বীরত্বপূর্ণ সাহসের সুস্পষ্ট উপস্থিতির মাধ্যমেই এই জোট গঠিত। এই জোট অস্ত্র দিয়ে নয়, বরং মানুষ দিয়ে গঠিত।
সুতরাং, ব্রিটিশ জাতিকে বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান মিত্র হিসেবে বিবেচনা করা হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার সরকারের প্রদর্শিত কঠোরতা ও অধ্যবসায় এবং জনগণের চেতনার ওপর যেকোনো শুরু হওয়া সংগ্রামকে বিজয়ে সমাপ্ত করার জন্য নির্ভর করা যায় — সেই সংগ্রাম যত দীর্ঘস্থায়ীই হোক , যত বড় ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজনই হোক , বা যে উপায়ই অবলম্বন করা হোক না কেন ; এমনকি যদি অন্যান্য জাতির তুলনায় তার বর্তমান সামরিক সরঞ্জাম সম্পূর্ণ অপর্যাপ্তও হয়।

Machine Translated by Google

যদি আমরা বুঝতে পারি যে জার্মানির পুনর্জন্ম রাজনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষার ইচ্ছার পুনর্জাগরণের উপর নির্ভরশীল, তাহলে আমরা পরিষ্কারভাবে দেখতে পাব যে, যারা ইতিমধ্যেই জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার অধিকারী , তাদের মন জয় করাই যথেষ্ট নয় , বরং ইচ্ছাকৃতভাবে জাতীয়তাবাদ-বিরোধী জনসাধারণকেও জাতীয় আদর্শে বিশ্বাসী হতে হবে।

জার্মানির পূর্ণ সার্বভৌম অধিকার পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে পরিচালিত এই নবীন আন্দোলনকে তাই তার প্রচার পরিকল্পনার একটি বিশেষ লক্ষ্য হিসেবে ব্যাপক জনগণকে নিজের পক্ষে আনার কাজটি অন্তর্ভুক্ত করতেই হবে । আমাদের তথাকথিত "জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি" সাধারণভাবে এতটাই করুণভাবে নিষ্ক্রিয় এবং তাদের জাতীয় চেতনা এতটাই দুর্বল বলে মনে হয় যে , আমরা নিশ্চিত থাকতে পারি তারা কোনো বলিষ্ঠ বৈদেশিক বা অভ্যন্তরীণ নীতির বিরুদ্ধে কোনো গুরুতর প্রতিরোধ গড়ে তুলবে না। এমনকি যদি সংকীর্ণমনা জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণি মুক্তির সন্ধিক্ষণে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের আশ্রয় নেয় , যেমনটা তারা বিসমার্কের সময়ে করেছিল, তবুও তাদের সুপরিচিত কাপুরুষতার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের পক্ষ থেকে সক্রিয় প্রতিরোধের কোনো আশঙ্কা নেই ।

আন্তর্জাতিকতাবাদী ধারণায় নিমজ্জিত আমাদের বিশাল জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন । তাদের স্বভাবের আদিম কঠোরতার কারণে , তারা সহিংসতার বিস্তার মেনে নিতে প্রস্তুত , অথচ একই সাথে তাদের ইহুদি নেতারা আরও বেশি পাশবিক ও নির্মম । তারা জার্মানির পুনর্জন্মের যেকোনো প্রচেষ্টাকে ধ্বংস করে দেবে, ঠিক যেমন তারা পেছন থেকে আঘাত হেনে জার্মান সেনাবাহিনীকে চূর্ণ করেছিল । সর্বোপরি, এই সংগঠিত জনতা সংসদীয় রাষ্ট্রে তাদের সংখ্যাধিক্যকে কেবল জাতীয় নীতিকে বাধাগ্রস্ত করতেই নয়, বরং জার্মানির রাজনৈতিক শক্তি এবং ফলস্বরূপ বিদেশে তার মর্যাদা পুনরুদ্ধারেও বাধা দিতে ব্যবহার করবে। এইভাবে , জার্মানি কাঙ্ক্ষিত মিত্রদের তালিকা থেকে বাদ পড়ে যায় । আমাদের মধ্যে থাকা এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ মার্ক্সবাদী, গণতন্ত্রবাদী, শান্তিবাদী এবং মধ্যপন্থী সমর্থকের বোঝা যে কেবল আমরা নিজেরাই স্বীকার করি তাই নয় , বিদেশি রাষ্ট্রগুলোও আমাদের এই বোঝা স্বীকার করে এবং আমাদের সাথে একটি সম্ভাব্য জোটের মূল্য বিবেচনা করার সময় তাদের গণনায় এটিকে অন্তর্ভুক্ত করে । এমন কোনো রাষ্ট্রের সাথে কেউই জোটে প্রবেশ করতে চাইবে না , যেখানে জনসংখ্যার একটি সক্রিয় অংশ অন্তত নিষ্ক্রিয়ভাবে যেকোনো বিচক্ষণ পররাষ্ট্রনীতির বিরোধিতা করে।

পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে এই কারণে যে, জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতার জন্য দায়ী দলগুলোর নেতারা পুনরুজ্জীবনের যেকোনো প্রচেষ্টার বিরোধিতা করতে প্রস্তুত , শুধুমাত্র এই কারণে যে তারা বর্তমানে যে পদগুলোতে অধিষ্ঠিত আছেন তা বজায় রাখতে চান । মানব ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রণকারী আইন অনুসারে।
এটা অকল্পনীয় যে, রাষ্ট্রের ধ্বংস ডেকে আনা পতনের কারণ ও পরিকল্পনাকারীদের প্রতি প্রতিশোধ না নিয়ে জার্মান জাতি তার পূর্বের স্থান পুনরুদ্ধার করতে পারবে । ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বিচারে, ১৯১৮ সালের নভেম্বর একটি সাধারণ বিদ্রোহ হিসেবে গণ্য হবে না, বরং দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে বিবেচিত হবে।

সুতরাং, সাধারণ ইচ্ছার শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনের মাধ্যমে জাতির অভ্যন্তরে একটি ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট পুনর্গঠন করা ছাড়া জার্মান সার্বভৌমত্ব ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের কথা ভাবা অসম্ভব ।

বাস্তবসম্মত উপায় ও পদ্ধতির দৃষ্টিকোণ থেকে , জার্মানিকে বিদেশি দাসত্ব থেকে মুক্ত করার কথা ভাবাটা অযৌক্তিক মনে হয় , যতক্ষণ পর্যন্ত দেশটির জনগণ স্বাধীনতার আদর্শকে সমর্থন করতে অনিচ্ছুক। সমস্যাটিকে নিছক সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে সতর্কতার সাথে বিবেচনা করলে , প্রত্যেকেই, এবং বিশেষ করে প্রত্যেক কর্মকর্তা, একমত হবেন যে বহিরাগত শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ হতে পারে না ।
ছাত্রদের একটি ব্যাটালিয়নের নেতৃত্বে; যে জাতির মেধার পাশাপাশি শারীরিক শক্তিরও প্রয়োজন। অধিকন্তু, এটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, যদি জাতির প্রতিরক্ষা কেবল তথাকথিত বুদ্ধিজীবী মহল দ্বারা পরিচালিত হয়, তবে জাতি তার অমূল্য সম্পদ হারাবে । তরুণ জার্মান বুদ্ধিজীবীরা যারা স্বেচ্ছাসেবী রেজিমেন্টে যোগ দিয়েছিলেন এবং শরৎকালে ফ্ল্যান্ডার্সের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারিয়েছিলেন।
১৯১৪ সালে, যেগুলোর জন্য পরবর্তীতে তীব্র অনুশোচনা করা হয়েছিল। সেগুলো ছিল জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং সেগুলোর ক্ষতি যুদ্ধের গতিপথের উপর কোনো ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারত না । আর শুধু যে যুদ্ধটাই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারত না, তা-ই নয়।
শ্রমিক জনসাধারণ আক্রমণকারী বাহিনীতে যোগ না দিলে তা সম্পন্ন করা যেত , কিন্তু জাতির ঐক্যবদ্ধ ইচ্ছা ছাড়া প্রয়োজনীয় কারিগরি প্রস্তুতি সম্পন্ন করা অসম্ভব ছিল। আমাদের জাতি, যাকে ভার্সাই চুক্তি দ্বারা নিযুক্ত সহস্র চক্ষুর তত্ত্বাবধানে নিরস্ত্র অবস্থায় থাকতে হবে, সে কোনো কারিগরি প্রস্তুতিই সম্পন্ন করতে পারে না ।

Machine Translated by Google

যতক্ষণ না দেশে নিযুক্ত গুপ্তচরদের সমগ্র বাহিনীকে কেবল তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হচ্ছে, যাদের সহজাত দুষ্টতা সামান্য ত্রিশটি রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে সবকিছু ও সবাইকে বিশ্বাসঘাতকতা করতে প্ররোচিত করে, ততক্ষণ আমরা স্বাধীনতা ও স্বনির্ভরতা পুনরুদ্ধার করতে পারব না। কিন্তু আমরা এমন লোকদের মোকাবিলা করতে পারি। তবে, রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে জাতীয় পুনরুজ্জীবনের যেকোনো প্রচেষ্টার বিরোধিতাকারী লক্ষ লক্ষ মানুষ এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে । এই প্রতিবন্ধকতা ততক্ষণ পর্যন্ত দুর্লঙ্ঘ্য থাকবে, যতক্ষণ না তাদের বিরোধিতার কারণ—যা হলো আন্তর্জাতিক মার্কসবাদ—তাকে পরাভূত করা হয় এবং এর শিক্ষা তাদের মন ও হৃদয় থেকে বিতাড়িত করা হয়।

যেকোনো দৃষ্টিকোণ থেকে , রাষ্ট্র ও জাতির স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা মূল্যায়ন করতে গেলে— তা সমস্যাটিকে পুনঃসশস্ত্রীকরণের প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকেই বিবেচনা করা হোক বা খোদ সংগ্রামের দৃষ্টিকোণ থেকেই হোক—আমাদের একই পূর্বশর্তের দিকে নিয়ে যায়। এই পূর্বশর্তটি হলো জাতীয় স্বাধীনতার ধারণার পক্ষে ব্যাপক গণসমর্থন অর্জন করা ।

যতক্ষণ না আমরা বাহ্যিক স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করছি, অভ্যন্তরীণ সংস্কারের প্রতিটি পদক্ষেপ বড়জোর আমাদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে, যা কেবল সেইসব জাতিরই উপকারে আসবে যারা আমাদের শোষণের জন্য একটি উপনিবেশ হিসেবে দেখে। প্রতিটি তথাকথিত উন্নতির ফলে সৃষ্ট উদ্বৃত্ত আমাদের আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রকদের হাতে চলে যাবে, এবং প্রতিটি সামাজিক উন্নতি বড়জোর আমাদের শ্রমের প্রভাবকে কেবল তাদেরই সুবিধার্থে বৃদ্ধি করবে।

এইসব মানুষের জন্য। জার্মান জাতির পক্ষে কোনো সাংস্কৃতিক অগ্রগতি সম্ভব হবে না, কারণ এই ধরনের অগ্রগতি দেশটির রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও মর্যাদার সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

অতএব , যেহেতু জাতীয় আদর্শের প্রতি জনগণের ব্যাপক সমর্থন অর্জনের মাধ্যমেই জার্মানির ভবিষ্যৎ সমস্যার একটি সন্তোষজনক সমাধান খুঁজে পাওয়া সম্ভব , তাই এই শিক্ষামূলক কাজটিকে এমন একটি আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হিসেবে গণ্য করতে হবে, যে আন্দোলন কেবল বর্তমানের চাহিদা মেটাতে চায় না, বরং যা কিছু করার সিদ্ধান্ত নেয় বা করা থেকে বিরত থাকে, তার প্রতিটি বিষয়কেই ভবিষ্যতের আলোকে পরীক্ষা করে দেখে।

১৯১৯ সালেই আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলাম যে , নতুন আন্দোলনের প্রথম ও সর্বপ্রধান লক্ষ্য অবশ্যই হবে জনগণের জাতীয়করণ । কৌশলগত দৃষ্টিকোণ থেকে, এই সিদ্ধান্ত আমাদের কাঁধে কিছু নির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পণ করেছিল ।

(1) জাতীয় পুনর্জন্মের জন্য জনগণের সমর্থন অর্জনের প্রচেষ্টায় কোনো সামাজিক ত্যাগই খুব বড় নয়।

জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে, শ্রমিকদের প্রতি আজ যে কোনো ছাড় দেওয়া হোক না কেন, তা সেই লাভের তুলনায় নগণ্য যা সমগ্র জাতি অর্জন করবে যখন এই ছাড়গুলো সাধারণ মানুষকে জাতির কোলে ফিরিয়ে আনবে। একমাত্র লোভ এবং দূরদৃষ্টির অভাবই— যা দুর্ভাগ্যবশত আমাদের নিয়োগকর্তাদের মধ্যে প্রচলিত বৈশিষ্ট্য— পারে ।

এই উপলব্ধিকে বাধাগ্রস্ত করা যে, দীর্ঘমেয়াদে কোনো অর্থনৈতিক উন্নতি এবং ফলস্বরূপ মুনাফার বৃদ্ধি সম্ভব হবে না , যতক্ষণ না আমাদের জাতি গঠনকারী জনগণের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সংহতি পুনরুদ্ধার করা হয় ।

যদি জার্মান ট্রেড ইউনিয়নগুলো যুদ্ধের সময় শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ আপসহীনভাবে রক্ষা করত ; যদি, এমনকি যুদ্ধ চলাকালীনও, তারা উচ্চতর লভ্যাংশের লোভে থাকা শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং যে শ্রমিকদের পক্ষে ইউনিয়নগুলো কাজ করত তাদের দাবি মেটাতে ধর্মঘটের অস্ত্র ব্যবহার করত ; যদি, একই সাথে, তারা নিজেদের দাবির মতোই দৃঢ়ভাবে দেশকে রক্ষা করত এবং দেশকে তার প্রাপ্য দিত — তাহলে যুদ্ধে তারা কখনোই হারত না। এই বিজয়ের বিপুল তাৎপর্যের সামনে সমস্ত অর্থনৈতিক ছাড়, এমনকি সবচেয়ে বড় ছাড়গুলোও, কতই না হাস্যকরভাবে নগণ্য বলে মনে হতো।

যে আন্দোলন জার্মান শ্রমিককে জার্মান জাতির কাছে ফিরিয়ে আনবে, তাকে অবশ্যই স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে যে এই ধরনের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ত্যাগ স্বীকার করা আবশ্যক ; তবে শর্ত হলো , তা যেন জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্বাধীনতা ও স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি না হয় ।

Machine Translated by Google

(2) জনগণের জাতীয় শিক্ষা শুধুমাত্র পরোক্ষভাবে, তাদের সামাজিক অবস্থার উন্নতির মাধ্যমেই সম্পন্ন করা যেতে পারে ; কারণ শুধুমাত্র এইভাবেই এমন অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি করা সম্ভব যা প্রত্যেককে জাতির সাংস্কৃতিক জীবনে অংশগ্রহণে সক্ষম করবে ।

(3) ব্যাপক জনগণের জাতীয়করণ কখনই আংশিক পদক্ষেপের মাধ্যমে অর্জন করা যায় না - অর্থাৎ, সমস্যার তথাকথিত বস্তুনিষ্ঠ দিকের উপর অবিশ্বাসের সাথে জোর দিয়ে - বরং শুধুমাত্র একটি লক্ষ্যের উপর নির্মমভাবে জোর দেওয়ার মাধ্যমেই তা অর্জন করা সম্ভব, যা অবশ্যই অর্জন করতে হবে । এর অর্থ হল , মানুষ আমাদের সমসাময়িক বুর্জোয়াদের দ্বারা এই শব্দটির জন্য নির্ধারিত অর্থে "জাতীয়তাবাদী" হতে পারে না - যেমন, অনেক শর্তযুক্ত জাতীয়তাবাদ - বরং শব্দটির পূর্ণ অর্থে উগ্র জাতীয়তাবাদী হতে হবে। বিষ

এর মোকাবিলা কেবল প্রতিষেধকের মাধ্যমেই করা সম্ভব , এবং কেবল অলস বুর্জোয়া মনই ভাবতে পারে যে আপোসের মাধ্যমে স্বর্গরাজ্য লাভ করা যায় ।

দেশের বৃহত্তর জনসাধারণ অধ্যাপক ও কূটনীতিকদের নিয়ে গঠিত নয়। যেহেতু জনসাধারণ বিমূর্ত ধারণায় তেমন পারদর্শী নয় , তাই তাদের প্রতিক্রিয়াগুলো আবেগীয় ক্ষেত্রে বেশি নিহিত থাকে , যেখানে তাদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক মনোভাবের উৎসগুলো অবস্থিত । তারা কেবল ইতিবাচক বা নেতিবাচক দিক থেকে স্পষ্টভাবে উদ্ভূত শক্তির প্রকাশেই সংবেদনশীল , কিন্তু এক মেরু থেকে অন্য মেরুতে দোদুল্যমান সিদ্ধান্তহীন অবস্থানে কখনোই নয়। তাদের মনোভাবের আবেগীয় ভিত্তিই তাদের অসাধারণ স্থিতিশীলতার কারণ। জ্ঞানের চেয়ে বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সফলভাবে লড়াই করা সর্বদা বেশি কঠিন। শ্রদ্ধার চেয়ে ভালোবাসার পরিবর্তন কম হয় । নিছক বিতৃষ্ণার চেয়ে ঘৃণা বেশিদিন টিকে থাকে। এই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবগুলোর চালিকাশক্তি কখনোই জনসাধারণের সমর্থনপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক শিক্ষা থেকে উদ্ভূত হয়নি, বরং সর্বদা সেই ধর্মান্ধতা ও উন্মাদনা থেকে এসেছে যা তাদেরকে কর্মে প্রবৃত্ত করেছিল।

যিনি জনগণের সমর্থন জিততে চান, তাকে অবশ্যই জানতে হবে কোন চাবি দিয়ে তাদের হৃদয়ের দরজা খোলা যাবে। তা বস্তুনিষ্ঠতা নয়, যা একটি আনাড়ি মনোভাব, বরং তা হলো এক অটল সংকল্প, প্রয়োজনে বলপ্রয়োগ দ্বারা সমর্থিত ।

(4) জনগণের মন জয় করা তখনই সম্ভব যখন এই লক্ষ্যের দিকে আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারীরা কেবল নিজেদের লক্ষ্যের জন্য লড়াই করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন না, বরং তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানো প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করতেও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন ।

লোকেরা যদি প্রতিপক্ষের ওপর কোনো আপসহীন আক্রমণ দেখে, তবে তারা সর্বদা এটিকে আক্রমণকারীর সঠিক হওয়ার প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা করবে ; কিন্তু যদি আক্রমণকারী অর্ধ-পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং প্রতিপক্ষকে মঞ্চ থেকে বিতাড়িত করতে ব্যর্থ হয়, তবে লোকেরা এটিকে এই লক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করবে যে আক্রমণকারী তার উদ্দেশ্যের ন্যায্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত নয় , এবং তার এই অর্ধ-মনোযোগী নীতিই হয়তো তার উদ্দেশ্যের অন্যায্যতাকে নিশ্চিত করে ।

জনসাধারণ প্রকৃতিরই অংশ । তাদের অনুভূতি এমন যে , যারা নিজেদের শত্রু বলে ঘোষণা করে , তাদের করমর্দন তারা বুঝতে পারে না । তারা চায় সবল জয়ী হোক এবং দুর্বল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক অথবা সবলের ইচ্ছার কাছে নিঃশর্তভাবে বশীভূত হোক ।

জাতির আত্মার সংগ্রামে জনগণের জাতীয়করণ কেবল তখনই কার্যকরভাবে অর্জন করা সম্ভব ।
যারা তাদের মধ্যে আন্তর্জাতিক মহামারী ছড়াবে, তাদের নির্মূল করা হবে ।

(5) আমাদের সময়ের সমস্ত বড় সমস্যাই ক্ষণস্থায়ী সমস্যা এবং নির্দিষ্ট কিছু কারণ থেকে উদ্ভূত হয়। এদের মধ্যে , কেবল একটিই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। এটি হলো একটি জাতির মধ্যে বংশের বিশুদ্ধতা রক্ষা করার সমস্যা । মানুষের শক্তি বা পতন রক্তের উপর নির্ভর করে। যে জাতিগুলো তাদের জাতিগত ঐতিহ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে অসচেতন, অথবা এর সংরক্ষণকে উপেক্ষা করে , তারা এমন মানুষের মতো যারা একটি পাগ কুকুরকে গ্রেহাউন্ডের কাজ করার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়ার চেষ্টা করে, এটা না বুঝে যে গ্রেহাউন্ডের গতি এবং পুডলের অনুকরণের ক্ষমতা উভয়ই সহজাত গুণ যা কোনো প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিকশিত করা যায় না । যে মানুষগুলো তাদের বংশের বিশুদ্ধতা রক্ষা করে না, তারা এর মাধ্যমে জাতীয় চেতনার ঐক্যকে তার সমস্ত প্রকাশে ধ্বংস করে দেয় । জাতীয় চেতনার ভাঙনই এর অনিবার্য পরিণতি ।

Machine Translated by Google

রক্তের বিয়োজন প্রক্রিয়া। একটি জাতির আধ্যাত্মিক ও সৃজনশীল ক্ষমতায় যে পরিবর্তন ঘটে , তা কেবল তার জাতিগত সত্তায় সংঘটিত পরিবর্তনেরই ফল ।

জার্মান জাতিকে যদি সকল দোষত্রুটি এবং তাদের মৌলিক বৈশিষ্ট্য থেকে উদ্ভূত নয় এমন আচরণবিধি থেকে মুক্ত করতে হয় , তবে আমাদের অবশ্যই জাতির দেহ থেকে সেইসব বহিরাগত জীবাণু দূর করতে হবে, যা দুর্বলতা ও ভ্রান্ত পথের কারণ ।

জাতিগত সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত জার্মান জাতির পুনর্জন্ম হবে না । এই জাতিগত সমস্যাটি কেবল মানব ইতিহাসই নয়, বরং সকল প্রকার মানব সংস্কৃতি বোঝার চাবিকাঠিও বটে।

(6) বর্তমানে আন্তর্জাতিক শিবিরে থাকা বিপুল সংখ্যক মানুষকে জাতীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে , আমরা বিভিন্ন কারুশিল্প এবং পেশার স্বার্থ রক্ষার নীতি পরিত্যাগ করতে চাই না । বিভিন্ন পেশাজীবী গোষ্ঠীর ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ বহির্ভূত নয় ।

এগুলো বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিভাজনের মতো নয় , বরং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির একটি অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য । পেশাগত বিভাজন জাতীয় সম্প্রদায়ের ধারণার সাথে সাংঘর্ষিক নয় , কারণ
এর অর্থ হলো জাতির জীবনকে প্রভাবিত করে এমন সকল সমস্যার ক্ষেত্রে জাতির ঐক্য ।

জাতীয় সম্প্রদায়ে, বা সহজভাবে বললে রাষ্ট্রে, একটি সামাজিক শ্রেণি গঠনকারী জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি উচ্চবিত্তদের অবস্থান অবনমনের মাধ্যমে ঘটতে পারে না , বরং নিম্নবিত্তদের অবস্থান উন্নত করার মাধ্যমেই তা সম্ভব । এই প্রক্রিয়ার নেতৃত্বদানকারী শ্রেণিটি কখনোই উচ্চবিত্ত শ্রেণি নয়, বরং সমান অধিকারের জন্য সংগ্রামরত নিম্নবিত্ত শ্রেণি । আজকের বুর্জোয়া শ্রেণি সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্ত হয়নি , বরং কেবল তাদের নিজেদের মধ্য থেকেই উদ্ভূত শক্তি ও নেতৃত্বের মাধ্যমেই তা সম্ভব হয়েছে।

মানব ভ্রাতৃত্বের কথা বলা ভণ্ডামিপূর্ণ সভার মাধ্যমে জার্মান শ্রমিককে তার বর্তমান স্তর থেকে উন্নীত করে জার্মান জাতির অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, বরং শ্রমিকের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনের পদ্ধতিগত উন্নতির মাধ্যমেই তা সম্ভব, যতক্ষণ না তার এবং অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যেকার বিশাল ব্যবধান ঘোচে যায়।

যে আন্দোলন এই লক্ষ্য অনুসরণ করে, তাকে প্রাথমিকভাবে শ্রমিক শ্রেণি থেকেই তার সমর্থক সংগ্রহ করতে হবে। এতে বুদ্ধিজীবী মহলের সদস্যদেরও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যদি তাঁরা আন্দোলনের আকাঙ্ক্ষিত আদর্শগুলোকে স্পষ্টভাবে বুঝে থাকেন এবং নিঃশর্তভাবে গ্রহণ করে থাকেন । এই রূপান্তর ও পুনঃসংযোগের প্রক্রিয়া দশ বা বিশ বছরে সম্পন্ন করা সম্ভব নয় ।

এই ধরনের আন্দোলনের ইতিহাস থেকে দেখা যায়, এতে বেশ কয়েক প্রজন্ম সময় লাগে।

আমাদের আধুনিক শ্রমিককে জাতীয় সম্প্রদায়ের সাথে পুনরায় সংযুক্ত করার সবচেয়ে বড় বাধা এই নয় যে সে তার সহকর্মীদের স্বার্থের জন্য লড়াই করে, বরং সে আন্তর্জাতিকতাবাদী ধারণায় নিমজ্জিত, যা স্বভাবতই জাতীয়তা ও পিতৃভূমির ধারণারই বিভিন্ন রূপ । জাতি ও পিতৃভূমির প্রতি এই বিদ্বেষ শ্রমিক শ্রেণীর নেতাদের দ্বারা প্রোথিত হয়। যদি শ্রমিকরা রাজনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণের সাথে সম্পর্কিত সকল বিষয়ে জাতির প্রতি নিষ্ঠার নীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হতো, তবে ট্রেড ইউনিয়নগুলো অর্থনৈতিক দাবির জন্য চলমান সংগ্রামে হস্তক্ষেপ না করেই লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে জাতীয় সম্প্রদায়ের সবচেয়ে মূল্যবান সদস্যে রূপান্তরিত করত ।

এমন একটি আন্দোলন শুরু করতে হবে যা আন্তরিকভাবে জার্মান শ্রমিককে জাতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে এবং তাকে আন্তর্জাতিকতাবাদের উন্মাদনা থেকে উদ্ধার করতে চায় ।
শিল্পপতিদের মধ্যে প্রচলিত কিছু মতামতের বিরুদ্ধে একটি জোরালো প্রচারণা ।
এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলোর মধ্যে একটি হলো এই যে, জাতীয় সম্প্রদায়ের ধারণা অনুসারে , কর্মচারীকে অবশ্যই নিয়োগকর্তার কাছে তার সমস্ত অর্থনৈতিক অধিকার ত্যাগ করতে হবে এবং উপরন্তু , শ্রমিকরা যদি তাদের বৈধ ও অত্যাবশ্যকীয় স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করে , তবে তারা জাতীয় সম্প্রদায়ের সাথে সংঘাতে জড়িয়ে পড়বে । যারা এই দৃষ্টিভঙ্গি ছড়ানোর চেষ্টা করে, তারা ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যাবাদী। জাতীয় সম্প্রদায়ের ধারণাটি এক পক্ষের উপর কোনো বাধ্যবাধকতা আরোপ করে না, যদি না একই সাথে অন্য পক্ষের উপর তা আরোপ করা হয় ।

কোনো শ্রমিক যদি জনগণের কল্যাণের কথা বিবেচনা না করে কেবল নিজের উদ্যোগে কাজ করে এবং অতিরঞ্জিত দাবি উত্থাপন করে, তবে সে অবশ্যই জাতীয় চেতনার পরিপন্থী কাজ করে ।

Machine Translated by Google

সাধারণ উদ্দেশ্য বা জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণ। কিন্তু শিল্পপতিও জাতীয় সম্প্রদায়ের চেতনার বিরুদ্ধে কাজ করেন, যদি তিনি অমানবিক শোষণের পদ্ধতি অবলম্বন করেন এবং শ্রমিকদের ঘামের বিনিময়ে নিজের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা আদায়ের উদ্দেশ্যে দেশের শ্রমশক্তিকে ব্যবহার করেন। নিজেকে 'জাতীয়তাবাদী' বলার বা জাতীয় সম্প্রদায়ের কথা বলার কোনো অধিকার তার নেই , কারণ তিনি কেবল একজন বিবেকহীন আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তি , যিনি সামাজিক অসন্তোষের বীজ বপন করেন এবং এমন সংঘাত উস্কে দেন যা শীঘ্র বা বিলম্বে দেশের স্বার্থের ক্ষতি করবেই।

যুব আন্দোলনের সদস্য প্রধানত শ্রমজীবী জনগণের মধ্য থেকে সংগ্রহ করতে হবে। এই জনগণকে আন্তর্জাতিকতাবাদী উন্মাদনার কবল থেকে উদ্ধার করতে হবে। তাদের সামাজিক সমস্যাগুলো নির্মূল করতে হবে । তাদেরকে এক উচ্চতর সাংস্কৃতিক স্তরে উন্নীত করতে হবে, কারণ তাদের বর্তমান অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, এবং জাতীয় ধারণা ও অনুভূতি দ্বারা অনুপ্রাণিত করে জাতীয় সম্প্রদায়ের এক বিচক্ষণ ও মূল্যবান অংশে রূপান্তরিত করতে হবে ।

জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বুদ্ধিজীবী মহলে যদি এমন কোনো মানুষ থাকেন যিনি সত্যিই দেশকে ভালোবাসেন ও জার্মানির ভবিষ্যতের দিকে তাকান এবং একই সাথে জনগণের মন জয়ের সংগ্রামের গুরুত্ব বোঝেন , তবে তাঁকে আমাদের আন্দোলনের সারিতে সাদরে গ্রহণ করা হবে, কারণ যে কাজ অবশ্যই করতে হবে, তাতে তিনি এক মূল্যবান বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারেন। কিন্তু এই আন্দোলনের লক্ষ্য কখনোই বুর্জোয়া ভোটারদের নির্বোধ জনতা থেকে সদস্য সংগ্রহ করা হতে পারে না । যদি তাই হতো, তবে আন্দোলনটি এমন এক বিশাল জনতার ভারে জর্জরিত হতো, যাদের মানসিকতা দেশের জনগণকে জয় করার আমাদের প্রচেষ্টাকে কেবল পঙ্গু করে দিত। তাত্ত্বিকভাবে, সুন্দরভাবে বলা যেতে পারে যে একটি একক আন্দোলনের কাঠামোর মধ্যে উচ্চ ও নিম্ন সামাজিক স্তরের সম্মিলিত নেতৃত্বের দ্বারা ব্যাপক জনগণকে প্রভাবিত করা উচিত ; তথাপি, বাস্তবতা হলো, যদিও জনসমাবেশের মাধ্যমে বুর্জোয়া শ্রেণীর উপর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ফেলা এবং এক ধরনের উৎসাহ, এমনকি বোধোদয়ও জাগানো সম্ভব , তাদের ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করা যায় না। অন্য কথায়, আমরা বুর্জোয়া শ্রেণি থেকে সেই অদক্ষতা ও অলসতা দূর করতে পারি না যা এক সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের অংশ । দুই গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক স্তরের পার্থক্য এবং আর্থ-সামাজিক বিষয়গুলির প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে এতটাই বিশাল যে, আমাদের বিক্ষোভের ফলে সৃষ্ট প্রাথমিক উদ্দীপনা কমে গেলেই তা আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত করবে ।

শেষ পর্যন্ত , আমাদের কর্মসূচির একটি অংশ হলো জাতীয় শিবিরকে পরিবর্তন করা নয়, বরং যাদের দৃষ্টিভঙ্গি দেশবিরোধী, তাদের মন জয় করা । এই দৃষ্টিকোণ থেকেই সমগ্র আন্দোলনের কৌশল নির্ধারণ করা উচিত ।

(7) আন্দোলনের প্রচারণায় একপাক্ষিক কিন্তু স্পষ্ট এবং চূড়ান্ত অবস্থান প্রদর্শন করতে হবে; প্রচারণা কার্যকর হওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য ।

যদি প্রচারণাকে আন্দোলনের স্বার্থে কাজে লাগাতে হয়, তবে তা কেবল এক পক্ষকেই উদ্দেশ্য করে করতে হবে; তা না হলে , এক শিবির তা বুঝবে না এবং অন্য শিবির তা সুস্পষ্ট ও নীরস সত্য বলে উড়িয়ে দিতে পারে ; কারণ দুই শিবিরের বৌদ্ধিক শিক্ষা অত্যন্ত ভিন্ন।

এমনকি কোনো কিছু উপস্থাপনের ধরণ এবং নির্দিষ্ট বিবরণের ওপর জোর দেওয়ার সুরও এই দুটি স্তরে একই প্রভাব ফেলতে পারে না , যারা সামাজিক কাঠামোর বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে। যদি প্রচারণা আদিম প্রকাশভঙ্গির ব্যবহার প্রত্যাখ্যান করে, তবে তা জনসাধারণের অনুভূতিকে নাড়া দেবে না । অন্যদিকে , যদি এটি তার শব্দ ও অঙ্গভঙ্গিতে জনসাধারণের সরল অনুভূতির সাথে খাপ খাইয়ে নেয়, তবে তা তার স্থূলতা ও অমার্জিততার কারণে বুদ্ধিজীবী মহলের কাছে ঘৃণ্য বলে মনে হবে । নিজেদের বক্তা বলে দাবি করা একশ জনের মধ্যে , এমন দশজনও নেই যিনি প্রতিদিন রাস্তার ঝাড়ুদার, তালাচাবিওয়ালা, অদক্ষ শ্রমিক এবং এই জাতীয় লোকদের সামনে কার্যকরভাবে কথা বলতে পারেন , এবং একই বিষয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রদের সামনে বলার মতোই সমান দক্ষতার সাথে তুলে ধরতে পারেন । হাজারো জনবক্তার মধ্যে, এমন একজনই থাকতে পারেন যিনি একই সভাকক্ষে তালাচাবিওয়ালা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের সামনে এমনভাবে কথা বলতে পারেন যে তার বক্তব্য উভয় গোষ্ঠীর কাছেই সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হয় এবং একই সাথে তিনি একটি শক্তিশালী প্রভাবও ফেলতে পারেন ।

Machine Translated by Google

কার্যকরী প্রভাব এবং উভয় পক্ষেই উৎসাহ জাগানো। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে , বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, একটি মহৎ তত্ত্বে মূর্ত সবচেয়ে সুন্দর ধারণাও সাধারণ মানুষের কাছে কেবল কম মেধাবীদের মাধ্যমেই পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। সুতরাং , গুরুত্বপূর্ণ হলো সেই মহান ধারণার স্রষ্টার দূরদৃষ্টি নয় , বরং এর প্রবক্তাদের দ্বারা সেই ধারণা জনসাধারণের মনে পৌঁছে দেওয়ার সাফল্য ।

সমাজতন্ত্র এবং সমগ্র মার্ক্সবাদী আন্দোলনের একটি বিশেষ ক্ষমতা ছিল দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীকে আকৃষ্ট করার, কারণ এটি যে শ্রোতাদের সম্বোধন করত তাদের মধ্যে একরূপতা ছিল। তাদের ধারণা ও যুক্তিগুলো যত বেশি সীমিত ও সংকীর্ণ ছিল, জনগণের পক্ষে সেগুলো অনুধাবন ও আত্মস্থ করা তত সহজ ছিল; কারণ এই ধারণা ও যুক্তিগুলো তাদের স্বল্প বুদ্ধিমত্তার স্তরের সঙ্গে ভালোভাবে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল।

এই বিবেচনাগুলো নতুন আন্দোলনটিকে একটি সুস্পষ্ট ও সরল নীতি গ্রহণে পরিচালিত করেছিল , যা ছিল নিম্নরূপ:
বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গি উভয় ক্ষেত্রেই
প্রচারণাকে জনগণের বুদ্ধিমত্তার স্তরে রাখতে হবে এবং এর মূল্য কেবল এর অর্জিত সাফল্যের দ্বারাই পরিমাপ করা যাবে ।

জনসভায় যেখানে বিপুল জনতা সমবেত হয় , সেখানে শ্রেষ্ঠ বক্তা তিনি নন, যাঁর বক্তব্য উপস্থাপনের ভঙ্গি উপস্থিত বুদ্ধিজীবীদের চেতনার সবচেয়ে কাছাকাছি পৌঁছায় , বরং তিনিই শ্রেষ্ঠ বক্তা যিনি জনগণের মন জয় করতে জানেন ।

উপস্থিত কোনো শিক্ষিত ব্যক্তি যদি কোনো বক্তৃতার বুদ্ধিবৃত্তিক স্তরকে অত্যন্ত নিম্ন বলে মনে করেন , যদিও তিনি দেখেছেন যে নিম্ন বুদ্ধিমত্তার গোষ্ঠীগুলোর ওপর এর প্রভাব কেমন , যাদের সমর্থন অর্জন করতে হবে, তবে তিনি পরিস্থিতি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অক্ষমতা প্রদর্শন করেন এবং এর মাধ্যমে নতুন আন্দোলনের জন্য নিজেকে চূড়ান্তভাবে অকেজো প্রমাণ করেন। কেবল সেইসব বুদ্ধিজীবীরাই কার্যকর হতে পারেন , যারা এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলো এত ভালোভাবে বোঝেন যে, তারা আমাদের প্রচার পদ্ধতির বিচার করতে শিখেছেন শুধুমাত্র অর্জিত সাফল্যের নিরিখে , নিজেদের ওপর এর প্রভাবের নিরিখে নয় । আমাদের প্রচারণার উদ্দেশ্য সেবা করা নয়।

যাদের দৃষ্টিভঙ্গি ইতিমধ্যেই জাতীয়তাবাদী , তাদের বিনোদনের জন্য এটি তৈরি , কিন্তু এর লক্ষ্য হলো তাদের সমর্থন আদায় করা, যারা এ পর্যন্ত জাতীয় আদর্শের শত্রু হলেও তথাপি আমাদেরই রক্ত ও জাতি থেকে এসেছে।

সামগ্রিকভাবে, 'যুদ্ধ প্রচারণা' অধ্যায়ে আমি যে বিষয়গুলো সংক্ষেপে তুলে ধরেছিলাম, সেগুলোই আমাদের অভিযানের জন্য পথনির্দেশক নীতিতে পরিণত হয়েছিল , যা নির্ধারণ করেছিল আমরা কী ধরনের প্রচারণা ব্যবহার করব এবং বাস্তবে তা কীভাবে প্রয়োগ করব । আমাদের অর্জিত সাফল্যই প্রমাণ করে যে আমাদের সিদ্ধান্তটি সঠিক ছিল।

(৪) প্রতিটি রাজনৈতিক সংস্কার আন্দোলন নিজের জন্য যে লক্ষ্য নির্ধারণ করে তা কখনই হতে পারে না
মানুষকে শিক্ষিত করার বা ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিদের প্রভাবিত করার চেষ্টার মাধ্যমে অর্জিত হয় , কিন্তু শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতা নিজেদের হাতে নেওয়ার মাধ্যমেই । যেকোনো ধারণা যা এগিয়ে যেতে চায়
এই ধারণাটি বাস্তবায়নের উপায় সুরক্ষিত করার অধিকার বিশ্বের কেবল আছে তাই নয়, বরং এর দায়িত্বও রয়েছে । এই বিশ্বে, কোনো উদ্যোগ সঠিক ছিল না ভুল, তা বিচার করার একমাত্র মাপকাঠি হলো সাফল্য । আর "সাফল্য" বলতে আমি কেবল ১৯১৮ সালের মতো ক্ষমতা দখলকেই বোঝাই না, বরং জাতির সাধারণ সমস্যাগুলোর কার্যকর সমাধানকে বোঝাই। একটি অভ্যুত্থানকে সফল বলে গণ্য করা যায় না , যেমনটা বর্তমানে জার্মানির অনেক নির্বোধ সরকারি আইনজীবী বিশ্বাস করেন , যদি বিপ্লবীরা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ দখল করতে সক্ষম হয় ; বরং কেবল তখনই সফল বলে গণ্য করা যায়, যখন পুরোনো শাসনের অধীনে থাকা অবস্থার তুলনায় জাতির ভাগ্যের উন্নতি ঘটে এবং যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে বিপ্লবটি হয়েছিল, তা বাস্তবে প্রয়োগ করা হয়। এই কথাটি জার্মান বিপ্লবের ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রযোজ্য নয় , যে আন্দোলনটি ১৯১৮ সালের শরৎকালে এই দস্যুদলকে ক্ষমতায় এনেছিল, তাকে এই নামেই ডাকা হয়।

কিন্তু যদি কোনো সংস্কার আন্দোলনের আদর্শের বাস্তবায়নের জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত হয়, তবে সংস্কারের লক্ষ্যে পরিচালিত প্রতিটি আন্দোলনকে তার অস্তিত্বের প্রথম দিন থেকেই নেতাদের দ্বারা বিবেচিত হতে হবে যে

Machine Translated by Google

এটি একটি গণ আন্দোলন, কোনো সাহিত্যিকদের চা-চক্র বা বোলিং খেলার জন্য জড়ো হওয়া অশিক্ষিতদের সমিতি নয় ।

(9) নতুন আন্দোলনের প্রকৃতি এবং অভ্যন্তরীণ সংগঠন সংসদ-বিরোধী। এর অর্থ হল এটি সাধারণভাবে এবং তার কাঠামোতে সেই সমস্ত নীতি প্রত্যাখ্যান করে, যে অনুসারে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং যে অনুসারে নেতা কেবল অন্যদের ইচ্ছা ও মতামতের কার্যনির্বাহক । আন্দোলনটি এই নীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত যে ছোট এবং বড় উভয় সমস্যায়ই একজন ব্যক্তির নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব থাকতে হবে এবং সম্পূর্ণ দায়িত্ব বহন করতে হবে।

দায়িত্ব।

আমাদের আন্দোলনে এই নীতির বাস্তব ফল নিম্নরূপ : স্থানীয় দলের সভাপতি তার চেয়ে এক স্তর উপরের দলের প্রধান কর্তৃক নিযুক্ত হন ।

এরপর তিনি এই গোষ্ঠীর দায়িত্বশীল নেতা হন । সমস্ত কমিটি তাঁর কর্তৃত্বের অধীন , এর বিপরীতটা নয়। এখানে ভোট দেওয়ার মতো কোনো কমিটি নেই, আছে শুধু কাজ করার কমিটি। দায়িত্বশীল নেতা, যিনি গোষ্ঠীর সভাপতি, তিনিই কাজ বণ্টন করেন। একই নীতি উচ্চতর সাংগঠনিক স্তর—বেজির্ক (জেলা), ক্রাইস (সার্কিট) এবং গাউ (কাউন্টি) -এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রতিটি ক্ষেত্রে, সভাপতিকে উপর থেকে নিযুক্ত করা হয় এবং তাঁকে পূর্ণ কর্তৃত্ব ও নির্বাহী ক্ষমতা প্রদান করা হয়। শুধুমাত্র সমগ্র দলের নেতাই সদস্যদের সাধারণ সভায় নির্বাচিত হন। তবে, তিনিই আন্দোলনের একমাত্র নেতা । সমস্ত কমিটি তাঁর কাছে জবাবদিহি করে , কিন্তু তিনি তাদের কাছে জবাবদিহি করেন না। তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত , কিন্তু সেগুলোর জন্য তিনিই সম্পূর্ণ দায়ভার বহন করেন । আন্দোলনের সদস্যরা নতুন নির্বাচনের আগে তাঁর কাছে ব্যাখ্যা চাইতে পারেন অথবা যদি তিনি আন্দোলনের নীতির বিরোধিতা করেন বা এর স্বার্থ যথাযথভাবে রক্ষা করতে ব্যর্থ হন, তবে তাঁকে পদ থেকে অপসারণ করার অধিকার রাখেন । তখন তাঁর জায়গায় আরও উপযুক্ত একজন ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হবে , যিনি একই ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবেন এবং একই দায়িত্ব বহন করতে বাধ্য থাকবেন।

এই আন্দোলনের অন্যতম সর্বোচ্চ কর্তব্য হলো এটি বাস্তবায়ন করা।
শুধু তাদের নিজেদের এলাকাতেই নয়, বরং সারা দেশ জুড়েই ফলের বাগান রয়েছে।

যিনি নেতা হন , তিনি সর্বোচ্চ ও অসীম ক্ষমতায় ভূষিত হন।
তবে তাকে সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে গুরুতর দায়িত্বও বহন করতে হবে ।

যে ব্যক্তির নিজের কাজের দায়িত্ব নেওয়ার সাহস নেই, সে নেতা হওয়ার অযোগ্য। কেবল একজন বীরের গুণাবলী সম্পন্ন ব্যক্তিকেই এমন কাজের জন্য আহ্বান করা যেতে পারে ।

মানব অগ্রগতি ও সংস্কৃতি জনতার দ্বারা সৃষ্ট হয় না। এগুলো একচেটিয়া শ্রমের ফসল।
ব্যক্তিগত প্রতিভা এবং ব্যক্তিগত কার্যকারিতা।

এই নীতির কারণে আমাদের আন্দোলনকে অবশ্যই সংসদ-বিরোধী হতে হবে, এবং যদি এটি সংসদীয় প্রতিষ্ঠানে অংশ নেয়ও, তবে তা কেবল ভেতর থেকে একে ধ্বংস করার লক্ষ্যেই করবে ; অন্য কথায়, আমরা এমন একটি প্রতিষ্ঠান থেকে মুক্তি পেতে চাই, যাকে মানবতার অবক্ষয়ের অন্যতম গুরুতর লক্ষণ হিসেবে গণ্য করা উচিত ।

(10) আন্দোলনটি তার রাজনৈতিক কাজের পরিধির বাইরে বা আমাদের কাছে মৌলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ নয় এমন বিষয়ে কোনও অবস্থান নিতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করে । এর উদ্দেশ্য ধর্মীয় সংস্কার করা নয় , বরং একটি রাজনৈতিক পুনর্গঠন করা।

আমাদের জাতির। এটি দুটি ধর্মীয় সম্প্রদায়কে আমাদের জাতির অস্তিত্বের জন্য সমান মূল্যবান ভিত্তি হিসেবে দেখে, এবং তাই সেই সমস্ত দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে যারা আমাদের জাতির ধর্মীয় ও নৈতিক স্থিতিশীলতার ভিত্তিকে অবমাননা করে দলীয় স্বার্থের হাতিয়ারে পরিণত করতে চায় ।

চূড়ান্তভাবে, এই আন্দোলনের লক্ষ্য কোনো ধরনের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা বা অন্য কোনো রাষ্ট্রকে ধ্বংস করা নয় , বরং সেই মৌলিক নীতিগুলোর প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করা, যা ছাড়া কোনো রাজতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র দীর্ঘকাল টিকে থাকতে পারে না । এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা বা প্রজাতন্ত্র বজায় রাখা নয়, বরং একটি জার্মান রাষ্ট্র গঠন করা ।

Machine Translated by Google

অধ্যায় ১২ – জাতীয় সমাজতান্ত্রিক জার্মান শ্রমিক দলের বিকাশের প্রথম পর্যায়

এই রাষ্ট্রের বাহ্যিক রূপ , অর্থাৎ এর চূড়ান্ত আকৃতি, মৌলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই সমস্যাটির সমাধান করতে হবে একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে যা বাস্তবসম্মত ও সঙ্গত , তার আলোকে ।

যখন কোনো জাতি একবার তার অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলো বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পারে... অস্তিত্বে, বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতার বিষয়টি কখনো অভ্যন্তরীণ সংঘাতের জন্ম দেবে না ।

(11) আন্দোলনের অভ্যন্তরীণ সংগঠনের সমস্যাটি নীতির উপর নয় বরং সুবিধার উপর ভিত্তি করে ।

সর্বোত্তম সংগঠন হলো সেটি, যা আন্দোলনের নেতৃত্ব ও স্বতন্ত্র অনুসারীদের মধ্যে কোনো বড় মধ্যস্থতাকারী স্থাপন না করে , বরং সম্ভাব্য ক্ষুদ্রতম মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমেই কার্যকরভাবে কাজ করে । এই সংগঠনের কাজ হলো একজন ব্যক্তির মনে জন্ম নেওয়া একটি ধারণাকে জাতির জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং বাস্তবে সেই ধারণাটি কীভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে তার তত্ত্বাবধান করা ।

সুতরাং , সব দিক থেকেই সংগঠন হলো এক অপরিহার্য আপদ মাত্র। বড়জোর, এটি নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য অর্জনের একটি মাধ্যম । সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি তখন হয়, যখন এটি নিজেই একটি লক্ষ্যে পরিণত হয়।

যেহেতু এই জগৎ বুদ্ধিমানের চেয়ে যান্ত্রিক বেশি এমন জীব সৃষ্টি করে , তাই সবসময়ই থাকবে একটি প্রতিষ্ঠানের বিষয়বস্তু, অর্থাৎ এটি যে ধারণাগুলো বাস্তবায়নের জন্য তৈরি, তা গড়ে তোলার চেয়ে এর কাঠামো গড়ে তোলা সহজতর ।

বাস্তব প্রয়োগের লক্ষ্যে সচেষ্ট যেকোনো ধারণার , এবং বিশেষ করে সংস্কারমূলক প্রকৃতির ধারণাগুলোর , অগ্রগতিকে মোটামুটিভাবে নিম্নরূপে উপস্থাপন করা যায় : একটি সৃজনশীল ধারণা এমন কোনো ব্যক্তির মনে রূপ নেয়, যিনি এই ধারণাটি বিশ্বের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এক ধরনের তাগিদ অনুভব করেন । তিনি তাঁর বিশ্বাসগুলো অন্যদের কাছে উপস্থাপন করেন এবং এইভাবে ধীরে ধীরে একটি নির্দিষ্ট পরিচিতি লাভ করেন ।
অনুসারীর সংখ্যা । সমসাময়িকদের মধ্যে নিজের ধারণা প্রচারের এই প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগত উপায়টিই সবচেয়ে স্বাভাবিক এবং সর্বোত্তম। কিন্তু আন্দোলনটি যখন বিকশিত হয় এবং বিপুল সংখ্যক অনুসারী লাভ করে, তখন যে মতবাদের উপর আন্দোলনটি প্রতিষ্ঠিত, তার স্রষ্টার পক্ষে অগণিত অনুসারীর মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে প্রচার চালানো এবং একই সাথে আন্দোলনের কার্যক্রম পরিচালনা করা ক্রমশ অসম্ভব হয়ে পড়ে।

অনুসারীর সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে নেতা ও স্বতন্ত্র অনুসারীদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই যোগাযোগগুলো আন্দোলনের কাঠামোর মধ্যে সৃষ্ট একটি মধ্যস্থতাকারী ব্যবস্থার মাধ্যমেই সম্পন্ন হতে হয় । ফলে , যোগাযোগের আদর্শ পরিস্থিতির অবসান ঘটে এবং সংগঠন একটি অপরিহার্য আপদ হয়ে দাঁড়ায় ।

ছোট ছোট সহায়ক দল গঠিত হয় , যেমন একটি রাজনৈতিক আন্দোলনে, যেখানে স্থানীয় দলগুলো সেই সেলগুলোর অনুরূপ হয় যেখান থেকে পরবর্তীতে সংগঠনটি বিকশিত হয় ।

কিন্তু আধ্যাত্মিক স্রষ্টার কর্তৃত্ব এবং তাঁর সৃষ্ট শিক্ষা নিঃশর্তে গ্রহণ না করা পর্যন্ত এই ধরনের ক্ষুদ্রতর গোষ্ঠীকে আন্দোলনে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। অন্যথায়, আন্দোলনটি ভিন্ন ভিন্ন মতবাদে বিভক্ত হওয়ার হুমকির সম্মুখীন হয়। আন্দোলনের সদর দপ্তর হিসেবে একটিমাত্র ভৌগোলিক কেন্দ্র থাকার গুরুত্ব অপরিসীম। শুধুমাত্র রোম বা মক্কার মতো এমন একটি স্থানের অস্তিত্বই, যার চারপাশে এক মায়াবী আকর্ষণ বিস্তৃত, আন্দোলনকে এক অবিচল চালিকাশক্তি প্রদান করতে পারে ; এই চালিকাশক্তি আসে আন্দোলনের অভ্যন্তরীণ ঐক্য এবং সেই শক্তির প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে একজন প্রধানের স্বীকৃতি থেকে ।

ঐক্য।

যখন কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রথম ভ্রূণকোষ তৈরি হয়, তখন সর্বদা জোর দেওয়া প্রয়োজন।
কোনো নির্দিষ্ট ধারণার উৎপত্তিস্থলের গুরুত্ব । সৃজনশীল, নৈতিক ও ব্যবহারিক মহত্ত্ব।
যে স্থান থেকে আন্দোলনটির উৎপত্তি এবং যা থেকে এটি পরিচালিত হয়, তাকে সর্বোচ্চ প্রতীকের মর্যাদায় উন্নীত করতে হবে এবং যখন আন্দোলনের প্রাথমিক শাখাগুলো এত অসংখ্য হয়ে উঠবে যে সাংগঠনিক কাঠামোতে সেগুলোকে বৃহত্তর এককে রূপান্তরিত করতে হবে , তখন তাকে আরও বেশি সম্মানিত করতে হবে ।

যখন সমর্থকের সংখ্যা এত বেড়ে যায় যে আন্দোলনের প্রধানের সাথে সরাসরি ব্যক্তিগত যোগাযোগ অসম্ভব হয়ে পড়ে , তখন প্রথম স্থানীয় গোষ্ঠীগুলো গঠন করা প্রয়োজন হয়।

Machine Translated by Google

এই গোষ্ঠীগুলির সংখ্যাবৃদ্ধির সাথে সাথে উচ্চতর সাংগঠনিক স্তর প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। রাজনৈতিক সংগঠনে এর উদাহরণ হলো জেলা (গাউ) এবং জেলা (বেজির্ক)।

ক্ষুদ্রতম গোষ্ঠীগুলোর ওপর মূল কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব বজায় রাখা সহজ হলেও , সৃষ্ট উচ্চতর সাংগঠনিক স্তরগুলোর ক্ষেত্রে তা করা অনেক বেশি কঠিন হবে। তবে এটি প্রয়োজনীয়, কারণ আন্দোলনের ঐক্য নিশ্চিত করা এবং এর আদর্শগুলোকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য এটি একটি অপরিহার্য শর্ত।

অবশেষে , যখন এই বৃহত্তর মধ্যবর্তী সংগঠনগুলোকে নতুন এবং আরও বড় এককের সাথে একীভূত করতে হবে , তখন সেগুলোকে কেন্দ্রীয় আন্দোলন ও তার শিক্ষার নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণে রাখা ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়বে।

ফলস্বরূপ, সাংগঠনিক কেন্দ্রের আধ্যাত্মিক কর্তৃত্ব ও আদর্শ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেই কেবল যান্ত্রিক সাংগঠনিক রূপ প্রবর্তন করা সম্ভব। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রায়শই এমন হতে পারে যে, এই কর্তৃত্ব কেবল তখনই বজায় রাখা যায় , যখন আন্দোলনটি দেশের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ লাভ করে।

এই সমস্ত বিষয় বিবেচনায় রেখে , নিম্নলিখিত নীতিগুলি আন্দোলনের অভ্যন্তরীণ কাঠামোর ভিত্তি তৈরি করেছিল :

(ক) সমস্ত কার্যকলাপের সূচনা একটি শহরে কেন্দ্রীভূত করা উচিত : অর্থাৎ, মিউনিখ। সেখানে সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত একদল সমর্থককে প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা উচিত, যা পরবর্তীতে আন্দোলনের আদর্শ প্রচারে সহায়তা করবে।

এই আন্দোলনের আরও বিকাশের স্বার্থে , এর মর্যাদা প্রথমে এই একটি স্থানেই সর্বোচ্চ সম্ভাব্য দৃশ্যমান ফলাফল অর্জনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করা উচিত।
আন্দোলন ও এর নেতার নাম ও খ্যাতি রক্ষা করা প্রয়োজন ছিল, শুধু একটি শহরে চমকপ্রদভাবে এই বিশ্বাসকে ধ্বংস করার জন্যই নয় যে মার্ক্সবাদী মতবাদ অজেয় , বরং এটি দেখানোর জন্যও যে একটি পাল্টা মতবাদ সম্ভব। (খ) নেতৃত্ব ও কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত স্থানীয় গোষ্ঠী গঠন করা উচিত নয়।

মিউনিখের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত হবে না।

(গ) জেলা, আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক গোষ্ঠী কেবল তখনই প্রতিষ্ঠা করা উচিত, যখন তাদের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং যখন কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্ব সন্তোষজনকভাবে নিশ্চিত হয়।

তদুপরি , এই অধীনস্থ জীবগুলির সৃষ্টি অবশ্যই নির্ভর করবে কিনা তার উপর।
এমন মানুষ থাকবেন যারা নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য উপযুক্ত প্রতিভাধর হবেন।

এখানে মাত্র দুটি সমাধান ছিল :

(ক) নেতৃত্বদানে সক্ষম মেধাবী ব্যক্তিদের আকৃষ্ট ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য আন্দোলনটির প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ করা উচিত। এর ফলে গঠিত ক্যাডারদের কৌশলগত পরিস্থিতি এবং কার্যকারিতার প্রয়োজন অনুসারে পদ্ধতিগতভাবে মোতায়েন করা যেতে পারে।

এই সমাধানটি ছিল সহজ ও সুবিধাজনক। তবে এর জন্য অধিক আর্থিক সংস্থানের প্রয়োজন ছিল; কারণ এই নেতৃবৃন্দ কেবল পারিশ্রমিক পেলেই আন্দোলনের জন্য কাজ করতে পারতেন।

(খ) যেহেতু আন্দোলনটি বেতনভুক্ত কর্মকর্তা নিয়োগের সামর্থ্য রাখে না, তাই একে অবৈতনিক সহায়তাকারীদের উপর নির্ভর করতে হয়। এই সমাধানটি অবশ্যই ধীর এবং অধিকতর কঠিন।

এর অর্থ হলো , আন্দোলনের নেতাদেরকে বিশাল এলাকা অনাবাদী ফেলে রাখতে হবে, যতক্ষণ না কোনো নির্দিষ্ট এলাকার সদস্যদের মধ্যে এমন কেউ পাওয়া যায় যিনি সেই এলাকায় আন্দোলনকে সংগঠিত ও নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের কাছে নিজেকে উপলব্ধ করতে সক্ষম ও ইচ্ছুক।

Machine Translated by Google

এমনটা হতে পারে যে , বড় কোনো অঞ্চলে সেরকম কোনো নেতা নেই , কিন্তু একই সময়ে অন্য অঞ্চলে প্রায় সমান দক্ষতাসম্পন্ন দুই বা এমনকি তিনজন ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে । এই পরিস্থিতি অত্যন্ত কঠিন এবং এটি কেবল বছরের পর বছর ধরেই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব ।

যেকোনো ধরনের সংগঠন প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বদা খুঁজে বের করা প্রয়োজন।
এমন একজন ব্যক্তি যিনি নেতার দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবেন ।

যেমন কর্মকর্তা ছাড়া একটি সেনাবাহিনী ও তার বিভিন্ন সাংগঠনিক ইউনিট অকেজো , তেমনি উপযুক্ত নেতা না থাকলে যেকোনো রাজনৈতিক সংগঠনও মূল্যহীন ।

যদি একটি স্থানীয় দলকে সংগঠিত ও নেতৃত্ব দেওয়ার মতো নেতৃত্বগুণসম্পন্ন সঠিক ব্যক্তিকে খুঁজে না পাওয়া যায়, তবে এমন একটি দল গঠন করার পর ব্যর্থতার ঝুঁকি নেওয়ার চেয়ে আন্দোলনটির জন্য তা গঠন করা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয় ।

নেতা হওয়ার ইচ্ছা থাকাই নেতা হওয়ার জন্য যথেষ্ট যোগ্যতা নয় ।
একজন নেতার অন্যান্য অপরিহার্য দক্ষতাও থাকতে হবে। সেগুলোর মধ্যে দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও কর্মশক্তি থাকা আবশ্যক।
একটি অসাধারণ মেধার চেয়ে বেশি উপকারী বলে বিবেচিত হতে পারে । সবচেয়ে মূল্যবান দক্ষতা হলো প্রতিভা, সংকল্প এবং অধ্যবসায়ের সমন্বয়।

(12) আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে নিষ্ঠা এবং এমনকি অসহিষ্ণুতার উপর যার সাথে
এর সদস্যরা তাদের আদর্শের জন্য লড়াই করে। তাদের অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে যে তাদের আদর্শই একমাত্র ন্যায়সঙ্গত এবং একই ক্ষেত্রের অন্যান্য অনুরূপ সংগঠনের বিরুদ্ধে তাদের অবশ্যই একে বিজয়ের দিকে নিয়ে যেতে হবে।

এটা বিশ্বাস করা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত যে, কোনো একটি আন্দোলনকে একই ধরনের অন্য আন্দোলনের সাথে যুক্ত করা হলে তার শক্তি অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে। এই ধরনের সংমিশ্রণের ফলে যে কোনো সম্প্রসারণ ঘটবে , তা অবশ্যই একটি বাহ্যিক বিকাশ ঘটাবে , যাকে বাহ্যিক পর্যবেক্ষকরা শক্তির বৃদ্ধি হিসেবে বিবেচনা করতে পারেন ; কিন্তু বাস্তবে, এর ফলে আন্দোলনটি এমন বাহ্যিক উপাদান গ্রহণ করে যা তার অভ্যন্তরীণ শক্তিকে দুর্বল করে দেয়।

যদিও মনে হতে পারে যে একটি আন্দোলন চরিত্রে অন্যটির অনুরূপ, বাস্তবে এমন কোনো সাদৃশ্য নেই। যদি তা থাকত, তবে দুটি আন্দোলন থাকত না, থাকত কেবল একটি। আর এই পার্থক্যগুলো যাই হোক না কেন, এমনকি যদি তা কেবল তাদের নেতাদের দক্ষতার পার্থক্যও হয় , তবুও সেই পার্থক্যগুলোর অস্তিত্ব রয়েছে। ভিন্নধর্মী সত্তার সঙ্গে বন্ধন স্থাপন করা সকল বিকাশের প্রাকৃতিক নিয়মের পরিপন্থী, সেইসাথে এই নিয়মেরও পরিপন্থী যে সবলকে অবশ্যই দুর্বলের উপর জয়ী হতে হবে , কারণ এই বিজয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সংগ্রামের মাধ্যমে বিজয়ীর অভ্যন্তরীণ শক্তি ও সামর্থ্য বৃদ্ধি পায় ।

মোটামুটি একই ধরনের রাজনৈতিক সংগঠনগুলোকে একত্রিত করা লাভজনক হতে পারে ।
কিছু তাৎক্ষণিক সুবিধা থাকলেও , দীর্ঘমেয়াদে এটি অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার উৎস হয়ে উঠবে , যার প্রভাব পরবর্তীতে অনুভূত হবে ।

একটি আন্দোলন তখনই মহান হতে পারে , যখন তার অভ্যন্তরীণ শক্তির অপ্রতিরোধ্য বিকাশ সুনিশ্চিত হয় এবং সকল প্রতিযোগীর উপর বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত তা ক্রমাগত শক্তিশালী করা হয়।

নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আন্দোলনের শক্তি ও তার অস্তিত্বের অধিকার কেবল তখনই বিকশিত হতে পারে , যখন তা এই নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ থাকবে যে, সংগ্রাম অগ্রগতির এক অপরিহার্য শর্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হলেই সর্বোচ্চ শক্তি লাভ করা যাবে।

সুতরাং, আন্দোলনকে তাৎক্ষণিক ও সাময়িক সাফল্যের জন্য নয়, বরং এমন এক দীর্ঘ সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে আপসহীন সহনশীলতার মনোভাব প্রদর্শন করতে হবে, যা এক দীর্ঘ অভ্যন্তরীণ বিকাশের সময়কাল নিশ্চিত করবে।

যেসব আন্দোলনের বিস্তার ঘটে সমজাতীয় সংগঠনগুলোর তথাকথিত একীভূতকরণের ফলে , যার অর্থ হলো আপস নীতির মাধ্যমে তাদের বাহ্যিক শক্তি অর্জিত হয়, সেগুলো হলো
যেন গ্রিনহাউসে জোর করে জন্মানো গাছ। এগুলো বাইরের দিকে উপরের দিকে বাড়ে, কিন্তু এদের নেই

Machine Translated by Google

তাদের মধ্যে সেই অভ্যন্তরীণ শক্তি রয়েছে, যা একটি সাধারণ উদ্ভিদকে এমন এক বৃক্ষে রূপান্তরিত করতে সক্ষম করে , যা শতাব্দীর ঝড়-ঝাপটা সহ্য করতে পারে।

কোনো সৃজনশীল ধারণাকে মূর্ত করে এমন যেকোনো সংগঠনের মহত্ত্ব নিহিত থাকে তার নিষ্ঠাপূর্ণ মনোভাব এবং অন্য সকলের প্রতি প্রদর্শিত অসহিষ্ণুতার মধ্যে, কারণ সে তার উদ্দেশ্যের ন্যায়পরায়ণতায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে । যদি ধারণাটি স্বয়ং ন্যায়সঙ্গত হয় এবং আমার উল্লিখিত যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র তার অধিকারী হয়, তবে সে এই পৃথিবীতে যুদ্ধ করবে; সে অপরাজেয় , এবং নিপীড়ন কেবল তার অভ্যন্তরীণ শক্তিই বৃদ্ধি করবে।

খ্রিস্টধর্মের মহত্ত্ব প্রাচীন বিশ্বে যাদের দার্শনিক মতামতের সাথে এর নিজস্ব মতবাদের কিছুটা সাদৃশ্য ছিল, তাদের সাথে আপোস করার প্রচেষ্টা থেকে আসে না , বরং এর নিজস্ব শিক্ষার নির্মম ও ধর্মান্ধ ঘোষণা এবং প্রতিরক্ষার ফল।

কোনো আন্দোলন যদি স্বাধীন থাকে এবং নিজের লক্ষ্যের জন্য লড়াই করে , তবে অন্য কোনো আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে সে যে আপাত অগ্রগতি লাভ করে, মতবাদ ও সংগঠনের শক্তির ক্রমাগত বৃদ্ধির কারণে তা সহজেই ম্লান হয়ে যেতে পারে বা ছাড়িয়ে যেতে পারে ।

(13) আন্দোলন তার সমর্থকদের মধ্যে এই নীতিটি স্থাপন করবে যে সংগ্রাম হওয়া উচিত নয়
একে প্রয়োজনীয় মন্দ হিসেবে গণ্য করা হলেও, এটি স্বভাবতই কাম্য। তাই, ভয় পাওয়া উচিত নয়।
তাদের প্রতিপক্ষরা তাদের প্রতি যে বিদ্বেষ প্রদর্শন করে, তাকে তাদের অস্তিত্বের সম্পূর্ণ অধিকারের জন্য একটি অপরিহার্য শর্ত হিসেবে গণ্য করতে হবে। যারা আমাদের জাতি ও জীবনদর্শনের শত্রু , তাদের দ্বারা ঘৃণিত হওয়া তারা এড়াতে পারে না , কিন্তু এই ঘৃণাকে তাদের সাদরে গ্রহণ করতে হবে । শত্রুরা তাদের তিক্ততা প্রকাশের জন্য যে পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করে, মিথ্যা ও অপবাদ তারই অংশ ।

যে ব্যক্তি ইহুদি সংবাদমাধ্যমের দ্বারা অপবাদ, অপমান ও কুৎসার শিকার হন না, তিনি অনুগত জার্মান নন এবং প্রকৃত জাতীয় সমাজতন্ত্রীও নন। তার বিশ্বাসের আন্তরিকতা , তার চরিত্র এবং তার ইচ্ছাশক্তি সবচেয়ে সহজে পরিমাপ করা যায় আমাদের জাতির ঘোর শত্রুদের মনে তার নাম যে বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলে , তা দিয়েই।

আন্দোলনের সমর্থকদের এবং সমগ্র জাতিকে বারবার মনে করিয়ে দিতে হবে যে, ইহুদি তার সংবাদপত্রের মাধ্যমে ক্রমাগত মিথ্যা ছড়ায়, এবং যদি সে মাঝে মাঝে সত্যি কথাও বলে, তা কেবল কোনো বৃহত্তর প্রতারণা ঢাকার জন্য, যা সুস্পষ্ট সত্যকে নির্জলা মিথ্যায় পরিণত করে। ইহুদি হলো মিথ্যার মহাগুরু। প্রতারণা ও ভণ্ডামিই তার যুদ্ধের অস্ত্র।

কোনো ইহুদির দ্বারা প্রকাশিত প্রতিটি অপবাদ ও কুৎসা আমাদের কমরেডদের জন্য সম্মানের প্রতীক । তারা যার সবচেয়ে বেশি অপবাদ দেয়, সে আমাদের হৃদয়ের সবচেয়ে কাছের , আর যাকে তারা চরমভাবে ঘৃণা করে, সে আমাদের সেরা বন্ধু।

যদি আমাদের কোনো কমরেড সকালে একটি ইহুদি সংবাদপত্র খোলেন এবং অপবাদের শিকার না হন, তার মানে হলো তিনি গতকালটা নিষ্ফলভাবে কাটিয়েছেন। যদি তিনি কোনো সাফল্য অর্জন করতেন, তবে তিনি নির্যাতিত, অপবাদিত, উপহাসিত এবং অপমানিত হতেন । যারা আমাদের জাতির এই মারাত্মক শত্রুর বিরুদ্ধে কার্যকরভাবে লড়াই করে, যে একই সাথে সকল আর্য এবং সকল সংস্কৃতিরও শত্রু, তারা কেবল এই জাতির কাছ থেকে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে পারে এবং অপবাদমূলক আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতে পারে ।

যখন এই সত্যগুলো আমাদের সদস্যদের রক্ত-মাংসের অংশ হয়ে উঠবে , তখন আন্দোলনটি হবে অটল ও অপরাজেয়।

(14) আন্দোলনকে অবশ্যই ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তোলার জন্য সকল উপলব্ধ উপায় ব্যবহার করতে হবে । এটা কখনই ভোলা যাবে না যে সমস্ত মানবিক মূল্যবোধ ব্যক্তিগত মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে তৈরি, এবং প্রতিটি ধারণা ও অর্জন একজন ব্যক্তির সৃজনশীল শক্তির ফল। কখনই না
আমরা ভুলতে পারি না যে, প্রতিটি মহান জিনিসের প্রতি মুগ্ধতা কেবল একজন সৃজনশীল ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নয়, বরং যারা এই মুগ্ধতা অনুভব করেন, তাঁরা এর মাধ্যমে এক অঙ্গীকারে আবদ্ধ হন।

ব্যক্তির কোনো বিকল্প নেই , বিশেষ করে যদি সেই ব্যক্তি যান্ত্রিকতার পরিবর্তে সাংস্কৃতিক সৃজনশীলতার প্রতীক হন। কোনো শিক্ষার্থীই তার স্থান নিতে পারে না।

Machine Translated by Google

তাঁর রেখে যাওয়া অসম্পূর্ণ চিত্রকে আয়ত্ত করে সম্পূর্ণ করা ; ঠিক তেমনি, কোনো মহান কবি বা চিন্তাবিদ, রাষ্ট্রনায়ক বা সেনাপতির স্থান কেউ নিতে পারে না। তাঁদের শক্তির উৎস শৈল্পিক সৃজনশীলতার জগতে নিহিত । এটি কখনো যান্ত্রিকভাবে অর্জন করা যায় না , কারণ এটি ঐশ্বরিক কৃপার এক সহজাত উপহার।

এই বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লব ও শ্রেষ্ঠ কীর্তি , এর শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক কীর্তি এবং মহান রাষ্ট্রনায়কদের অমর সৃষ্টি — সবই একটিমাত্র নামের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত , যা প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের প্রতীক হয়ে ওঠে । এই মহান সত্তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে অস্বীকার করা মানে সকল মহান ব্যক্তির স্মৃতিতে নিহিত শক্তির বিশাল উৎসকে অগ্রাহ্য করা। ইহুদিরা এটা সবচেয়ে ভালো জানে। তারা, যাদের মহান ব্যক্তিরা কেবল মানবতা ও তার সভ্যতাকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টাতেই মহান ছিলেন , তারা নিশ্চিত করে যে তাদের যেন মূর্তিপূজা করা হয়।

কিন্তু ইহুদিরা সেইসব জাতির সম্মান ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা করে, যারা তাদের মহান ব্যক্তিদের প্রশংসা করে। সে একে 'ব্যক্তিত্ব পূজা' বলে কলঙ্কিত করে।

যখনই কোনো জাতি এই নির্লজ্জ ইহুদি অপবাদের কাছে নতি স্বীকার করার মতো সাহস হারায়, তখন সে তার অভ্যন্তরীণ শক্তির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি উৎসকে প্রত্যাখ্যান করে । এই শক্তি জনসাধারণকে তোষামোদ করে আসতে পারে না, বরং তা কেবল সেইসব প্রতিভাবান ব্যক্তিদের সম্মান জানানোর মাধ্যমেই আসতে পারে, যাঁদের জীবন সমগ্র জাতিকে উন্নত ও মহিমান্বিত করেছে।

যখন মানুষের হৃদয় ভেঙে যায় এবং তাদের আত্মা হতাশার অতল গহ্বরে তলিয়ে যায়, তখন তাদের মহান পূর্বপুরুষেরা সুদূর অতীত থেকে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকেন —সেই পূর্বপুরুষেরা, যাঁরা ভয় ও দুঃখ, মানসিক দাসত্ব ও শারীরিক জবরদস্তি জয় করতে জানেন —এবং শোকসন্তপ্ত আত্মাদের সান্ত্বনা দিতে তাঁদের চিরন্তন হাত বাড়িয়ে দেন ।

ধিক সেই জাতিকে, যারা এই করমর্দন করতে লজ্জিত !

* * *

আমাদের আন্দোলনের শুরুর দিনগুলিতে সবচেয়ে বড় অসুবিধা ছিল এই যে, আমাদের কেউই পরিচিত ছিলাম না এবং আমাদের নামের কোনো মূল্য ছিল না, যা আমাদের মধ্যে কয়েকজনের জন্য চূড়ান্ত সাফল্যের সম্ভাবনাকে অনিশ্চিত করে তুলেছিল। তখন আমাদের সবচেয়ে কঠিন কাজ ছিল সদস্যদের দৃঢ়ভাবে বোঝানো যে আমাদের আন্দোলনের একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে এবং সেই বিশ্বাসকে বাঁচিয়ে রাখা ; সেই সময়ে আমাদের বক্তাদের কথা শুনতে মাত্র ছয়, সাত বা আটজন লোক আসতেন ।

একবার ভাবুন তো , মাত্র ছয় বা সাতজন সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষ একত্রিত হয়ে এমন একটি আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা সেই কাজটি করতে সফল হয়েছিল, যা করতে বড় বড় গণদলগুলো ব্যর্থ হয়েছিল : অর্থাৎ, আগের চেয়েও শক্তিশালী ও জাঁকজমকপূর্ণ একটি জার্মান রাইখ পুনর্গঠন করা।
আগে। আমাদের ওপর আক্রমণ করা হলে বা এমনকি উপহাস করা হলেও আমরা খুব খুশি হতাম ।
কিন্তু সবচেয়ে হতাশাজনক ব্যাপার ছিল যে, কেউই আমাদের দিকে মনোযোগ দিত না। আমাদের প্রতি এই চরম উদাসীনতাই সেই সময়ে আমাকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিয়েছিল।

যখন আমি এই ভদ্রলোকদের বৃত্তে যোগ দিয়েছিলাম, তখন কোনো দল বা আন্দোলনের প্রশ্নই ছিল না।
এই ছোট্টটির সংস্পর্শে প্রথম আসার পর আমার যে অনুভূতি হয়েছিল, তা আমি ইতিমধ্যেই বর্ণনা করেছি।
সংগঠন। পরে আমি এই তথাকথিত দলটির রূপ পরীক্ষা করার সময় ও সুযোগ পেয়েছিলাম , যা প্রথমবারের মতো আমার মনে এমন এক হতাশাজনক ছাপ ফেলেছিল। দৃশ্যটি সত্যিই হতাশাজনক এবং নিরুৎসাহজনক ছিল। সেখানে কিছুই ছিল না, একেবারে কিছুই না। ছিল শুধু দলটির নাম। আর দলের সকল সদস্যকে নিয়ে গঠিত একটি কমিটি। একদিক থেকে, এটি সেই জিনিসটির মতোই ছিল যার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করার কথা ছিল – একটি ক্ষুদ্র সংসদ। একটি ভোটিং ব্যবস্থা চালু ছিল । যেখানে বড় সংসদ গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছিল, সেখানে অন্তত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল – এখানে, একটি ছোট বৃত্তে, তারা যে চিঠিগুলো পেয়ে পরম আনন্দ পেত, সেগুলোর উত্তর কীভাবে দেওয়া যায় তা নিয়ে অন্তহীন আলোচনা চলত ।

বলাই বাহুল্য, লোকেরা এ ব্যাপারে কিছুই জানত না। মিউনিখে, হাতেগোনা কয়েকজন সদস্য ও তাদের অল্প কয়েকজন পরিচিতজন ছাড়া , এমন একটি দলের অস্তিত্বের কথা কেউই জানত না, এমনকি এর নামও শোনেনি।

Machine Translated by Google

প্রতি বুধবার কোনো একটি ক্যাফেতে তথাকথিত একটি কমিটি সভা অনুষ্ঠিত হতো এবং প্রতি সপ্তাহে একটি সান্ধ্যকালীন আলোচনার আয়োজন করা হতো। প্রথমদিকে, আন্দোলনের সকল সদস্যই কমিটিরও সদস্য ছিলেন, তাই একই ব্যক্তিরা সবসময় উভয় সভাতেই উপস্থিত থাকতেন। প্রথম প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ছিল এই ছোট পরিধিকে প্রসারিত করা এবং নতুন সদস্য সংগ্রহ করা, কিন্তু মূল প্রয়োজন ছিল আন্দোলনকে আরও ব্যাপকভাবে পরিচিত করার জন্য আমাদের হাতে থাকা প্রতিটি উপায় ব্যবহার করা।

আমরা নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলো বেছে নিয়েছিলাম: আমরা প্রতি মাসে একটি সভা করার সিদ্ধান্ত নিলাম, যেখানে আমরা লোকজনকে আমন্ত্রণ জানাব। কিছু আমন্ত্রণপত্র টাইপ করা ছিল, কিছু হাতে লেখা। প্রথম কয়েকটি সভার আগে, আমরা সেগুলো রাস্তায় বিলি করেছিলাম এবং কিছু বাড়িতে হাতে হাতে পৌঁছে দিয়েছিলাম। আমাদের প্রত্যেকেই নিজের বন্ধুদের উৎসাহিত করেছিলাম এবং আমাদের সভায় আসার জন্য তাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম। ফলাফল ছিল ভয়াবহ।

আমার এখনও মনে আছে, সেদিন সন্ধ্যায় আমি নিজে আশিটা নিমন্ত্রণপত্র পৌঁছে দিয়েছিলাম এবং প্রত্যাশিত জনসমাগমের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এক ঘণ্টা নিষ্ফল চেষ্টার পর, সভাপতিকে সভা শুরু করতে হলো। আবারও, সেখানে মাত্র সাতজন উপস্থিত ছিলেন—সেই পুরোনো পরিচিত সাতজন।

তারপর আমরা আমাদের পদ্ধতি পরিবর্তন করলাম। আমরা আমন্ত্রণপত্রগুলো টাইপ করে রেখেছিলাম।
মিউনিখের একটি স্টেশনারি দোকান থেকে আমরা সেগুলো পুনরুৎপাদন করেছি।

এর ফলে আমাদের পরবর্তী সভায় আরও কয়েকজন লোক এলেন। সংখ্যাটি ক্রমান্বয়ে বেড়ে এগারো থেকে তেরো, সতেরো, তেইশ এবং অবশেষে চৌত্রিশে পৌঁছাল। আমরা আমাদের পরিচিত মহলে অল্প কিছু অর্থ সংগ্রহ করলাম এবং এর ফলে আমাদের সভার বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য যথেষ্ট তহবিল তৈরি হলো 'মিউনিখেনার বেওবাখটার' পত্রিকায়, যেটি তখনও একটি স্বাধীন সংবাদপত্র ছিল।

এবার আমরা এক অভাবনীয় সাফল্য পেয়েছিলাম। আমরা আমাদের মিলনস্থল হিসেবে মিউনিখ হফব্রাউহাউস কেলারকে (মিউনিখ হফব্রাউহাউস ফেস্টসালের সাথে গুলিয়ে ফেলবেন না) বেছে নিয়েছিলাম। এটি একটি ছোট হল ছিল এবং এতে মাত্র ১৩০ জনের জায়গা হতো। তবে, আমার কাছে হলটি বেশ আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল।
বিশাল, এবং আমরা সবাই ভয়ে শিউরে উঠছিলাম যে সভার রাতে এই বিশাল হলঘরটি প্রায় খালিই থেকে যাবে।

সন্ধ্যা সাতটায় ১১১ জন উপস্থিত ছিলেন এবং সভা শুরু হলো। মিউনিখের অধ্যাপক প্রথম বক্তৃতা দিলেন এবং তাঁর পরে আমি কথা বললাম। এটাই ছিল আমার প্রথম জনসমক্ষে বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ। তৎকালীন দলীয় সভাপতি হের হ্যারারের কাছে পুরো ব্যাপারটি একটি অত্যন্ত দুঃসাহসিক উদ্যোগ বলে মনে হয়েছিল। তিনি একজন খুবই ভদ্র মানুষ ছিলেন; কিন্তু তিনি শুরু থেকেই নিশ্চিত ছিলেন যে, যদিও আমার অনেক ভালো গুণ থাকতে পারে, জনসমক্ষে বক্তৃতা দেওয়ার কোনো প্রতিভা আমার একেবারেই নেই। এমনকি পরেও তিনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন না।

সেই মতামত পরিবর্তন করতে। কিন্তু তিনি ভুল ছিলেন। আমাদের প্রথম জনসভায় আমার বক্তৃতার জন্য কুড়ি মিনিট বরাদ্দ ছিল।

আমি ত্রিশ মিনিট ধরে বক্তৃতা দিলাম, এবং যা আমি সবসময় মনে মনে অনুভব করতাম, যদিও তা যাচাই করতে পারিনি, তা সত্যি প্রমাণিত হলো: আমি ভালো বক্তৃতা দিতে পারি। সেই ত্রিশ মিনিট শেষ হতে না হতেই এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ওই ছোট হলঘরে উপস্থিত সকলের উপর আমি এক গভীর ছাপ ফেলেছি। আমি তাদের মধ্যে যে উদ্দীপনা জাগিয়েছিলাম, তার প্রতিফলন ঘটেছিল এই ঘটনায় যে, সভায় উপস্থিতদের কাছে আমার আবেদনের ফলে আমরা মোট তিনশো মার্ক অনুদান পেয়েছিলাম। এটা আমাদের জন্য এক বিরাট স্বস্তির বিষয় ছিল। সেই সময়ে আমাদের আর্থিক অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে, দলের প্রচারপত্র বা এমনকি প্রচারপত্র ছাপানোর সামর্থ্যও আমাদের ছিল না। এখন আমাদের কাছে অন্তত...

যে তহবিল আমরা সবচেয়ে জরুরি ও প্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় করতে পারতাম।

কিন্তু এই প্রথম বড় সভাটির সাফল্য অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমি কমিটিতে নতুন তরুণ সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দিতে শুরু করলাম। আমার দীর্ঘ সামরিক জীবনে আমি অনেক ভালো কমরেডের দেখা পেয়েছিলাম, যাঁদের আমি এখন আমাদের দলে যোগ দিতে রাজি করালাম। তাঁরা সকলেই ছিলেন শৃঙ্খলাপরায়ণ ও উদ্যমী যুবক, যাঁদের মধ্যে বছরের পর বছর সামরিক জীবন এই বিশ্বাস গেঁথে দিয়েছিল যে, কোনো কিছুই অসম্ভব নয় এবং ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়।

নতুন সদস্যদের সাথে কয়েক সপ্তাহ কাজ করার পর আমার কাছে নতুন রক্তের এই প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়ে উঠল। দলের সভাপতি হের হ্যারার পেশায় একজন সাংবাদিক ছিলেন।

Machine Translated by Google

এবং সেই হিসেবে তিনি ছিলেন একজন সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি। কিন্তু দলীয় নেতা হিসেবে তাঁর একটি বিশেষত্ব ছিল। একটি অত্যন্ত গুরুতর ত্রুটি: তিনি জনসমক্ষে কথা বলতে পারতেন না । যদিও তিনি পরিশ্রমী ছিলেন, তাঁর মধ্যে প্রয়োজনীয় চালিকাশক্তির অভাব ছিল , সম্ভবত কারণ তাঁর বাকপটুতার অভাব ছিল। হের ড্রেক্সলার, যিনি সেই সময়ে মিউনিখের স্থানীয় গোষ্ঠীর সভাপতি ছিলেন, একজন সাধারণ কর্মী ছিলেন। তিনিও ভালো বক্তা ছিলেন না। অধিকন্তু , তিনি সৈনিক ছিলেন না। তিনি কখনো সেনাবাহিনীতে কাজ করেননি, এমনকি যুদ্ধকালীন সময়েও নয়। সুতরাং , তিনি স্বভাবতই দুর্বল ও ভীরু ছিলেন এবং তিনি সেই একমাত্র শিক্ষালয়টি থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন যা দুর্বল ও ভীরু মানুষদের প্রকৃত মানুষে রূপান্তরিত করে।

সুতরাং, এই দুই ব্যক্তির কেউই এমন মাটি দিয়ে তৈরি ছিলেন না যা তাদেরকে উত্থাপন করতে সক্ষম করবে। আমাদের আন্দোলনের চূড়ান্ত বিজয়ের প্রতি এক গভীর ও অটল বিশ্বাস এবং নতুন ধারণার পথে আসা সমস্ত বাধাকে, প্রয়োজনে নির্মম নিষ্ঠুরতার সাথে, ক্রমাগত অতিক্রম করার মানসিকতা। এমন কাজ কেবল এমন একজন মানুষই সম্পন্ন করতে পারতেন, যার দেহ ও আত্মা সেইসব সামরিক গুণে প্রশিক্ষিত, যা একজন মানুষকে গ্রেহাউন্ডের মতো ক্ষিপ্র, চামড়ার মতো শক্তিশালী এবং ক্রুপ স্টিলের মতো কঠিন করে তোলে।

তখনও আমি একজন সৈনিক ছিলাম । ছয় বছরের চাকরিজীবনে শারীরিক ও মানসিকভাবে গঠিত হওয়ায় , প্রথমদিকে সেই মহলে আমাকে নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ অপরিচিত মনে হয়েছিল । সেনাবাহিনীতে আমার সহযোদ্ধাদের মতোই আমিও "এটা কাজ করবে না," "এটা অসম্ভব," বা "আমাদের এই ঝুঁকিটা নেওয়া উচিত নয় , এটা খুব বিপজ্জনক" - এই ধরনের কথাগুলো ভুলে গিয়েছিলাম।

পুরো উদ্যোগটাই ছিল স্বভাবতই বিপজ্জনক। সেই সময়ে জার্মানিতে এমন অনেক জায়গা ছিল, যেখানে সরাসরি জনগণের উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার সাহস দেখানো কোনো জাতীয় সভায় প্রকাশ্যে লোকজনকে আমন্ত্রণ জানানো একেবারেই অসম্ভব ছিল । যারা এই ধরনের সভায় যোগ দিত, তাদের সাধারণত মাথা থেঁতলে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হতো। এভাবে বিষয়গুলো সামলানোর জন্য নিশ্চিতভাবেই কোনো বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন ছিল না । সবচেয়ে বড় তথাকথিত বুর্জোয়া গণসভাগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে অভ্যস্ত ছিল, এবং যখন এক ডজন কমিউনিস্টের আবির্ভাব ঘটত, তখন অংশগ্রহণকারীরা কুকুরের ভয়ে খরগোশের মতো ছত্রভঙ্গ হয়ে যেত । রেডরা সেইসব বুর্জোয়া সংগঠনের প্রতি সামান্যই মনোযোগ দিত যারা কেবল বকবক করত। তারা তাদের সদস্যদের চেয়ে অনেক ভালোভাবে তাদের তুচ্ছতা বুঝত এবং মনে করত যে তাদের ভয় পাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই ।

তবে, নিজেদের স্বার্থের জন্য হুমকিস্বরূপ মনে হওয়া যেকোনো আন্দোলনকে চিরতরে ধ্বংস করার জন্য তারা নিজেদের হাতে থাকা প্রতিটি উপায় ব্যবহারে আরও বেশি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল । তাদের ব্যবহৃত সবচেয়ে কার্যকর উপায় ছিল সন্ত্রাস এবং নৃশংস শক্তি।

মার্ক্সবাদী নেতারা, যাদের কাজই ছিল জনগণকে ধোঁকা দেওয়া ও প্রতারণা করা, স্বাভাবিকভাবেই সেই আন্দোলনকে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করত, যার লক্ষ্য ছিল সেই জনগণের সমর্থন অর্জন করা, যারা এ পর্যন্ত কেবল আন্তর্জাতিকতাবাদী ইহুদি মার্ক্সবাদী দলগুলোরই সেবা করে এসেছে ।

'জার্মান শ্রমিক দল' নামটিই তাদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। এটা সহজেই অনুমান করা গিয়েছিল যে, প্রথম সুযোগেই আমাদের মার্ক্সবাদী স্বৈরশাসকদের মুখোমুখি হতে হবে , যারা তখনও ১৯১৮ সালের বিজয়ের নেশায় মত্ত ছিল।

সেই সময়ে আমাদের ছোট বৃত্তের লোকজন এই ধরনের সংঘাত নিয়ে কিছুটা অস্বস্তিতে ছিলেন। তারা যথাসম্ভব মুখ খুলতে চাইতেন না, এই ভয়ে যে তারা হয়তো আক্রান্ত ও মারধরের শিকার হবেন। তাদের মনে , আমাদের প্রথম প্রকাশ্য সভাটি ব্যাহত হতে দেখে তারা আশঙ্কা করেছিলেন যে আন্দোলনটি হয়তো চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাবে ।

আমার এই অবস্থানকে সমর্থন করা কঠিন ছিল যে, সংঘাত এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয় , বরং খোলামেলাভাবে তার মোকাবিলা করা উচিত। এর মোকাবিলা করতে হবে এবং পাশবিক শক্তির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য আমাদের সশস্ত্র হওয়া উচিত। সন্ত্রাসকে মানসিক অস্ত্র দিয়ে পরাজিত করা যায় না , কেবল সন্ত্রাস-বিরোধী পদক্ষেপের মাধ্যমেই তা সম্ভব। আমাদের প্রথম জনসভার সাফল্য আমার অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করেছিল। সদস্যরা আরও বড় পরিসরে একটি দ্বিতীয় সভা আয়োজন করতে উৎসাহিত হয়েছিলেন ।

১৯১৯ সালের অক্টোবর মাসের কোনো এক সময়ে এবার্ল -ব্রাউ কেলারে দ্বিতীয় একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আমাদের বক্তৃতার বিষয় ছিল "ব্রেস্ট -লিটোভস্ক ও ভার্সাই"। চারজন বক্তা ছিলেন। আমি প্রায় এক ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়েছিলাম এবং এর সাফল্য আমাদের প্রথম সভার চেয়েও বেশি চমকপ্রদ ছিল । ১৩০ জনেরও বেশি লোক এসেছিলেন। সভাটি ব্যাহত করার একটি প্রচেষ্টা সঙ্গে সঙ্গেই ব্যর্থ করে দেওয়া হয়েছিল।

Machine Translated by Google

আমার কমরেডদের দ্বারা। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের মাথায় আঘাতের চিহ্ন নিয়ে সিঁড়ি থেকে নিচে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

দুই সপ্তাহ পর, পরবর্তী সভাটি সেই একই হলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল । উপস্থিতির সংখ্যা বেড়ে ১৭০ জনেরও বেশি হওয়ায় হলটি বেশ পরিপূর্ণ ছিল। আমি আবার বক্তৃতা দিলাম, এবং এবারও সাফল্য আগের সভার চেয়ে বেশি ছিল ।

তখন আমি প্রস্তাব দিলাম যে আমাদের একটি বড় হল খুঁজে বের করা উচিত। আমরা শহরের অন্য প্রান্তে , ডাখাউয়ার স্ট্রাস-এ অবস্থিত 'ডয়েচেন রাইখ'-এ একটি হল খুঁজে পেলাম। এই নতুন জায়গায় প্রথম সভায় ১৪০ জনেরও কম লোক উপস্থিত হয়েছিল। কমিটির সদস্যরা হতাশ হতে শুরু করলেন , এবং যারা বরাবরই সন্দিহান ছিলেন, তারাও এখন নিশ্চিত হলেন যে উপস্থিতির এই হ্রাসের কারণ হলো আমরা খুব ঘন ঘন সভা করছিলাম । সেখানে প্রাণবন্ত আলোচনা হয়েছিল, যেখানে আমি আমার এই মত বজায় রেখেছিলাম যে সাত লক্ষ বাসিন্দার একটি শহর প্রতি দুই সপ্তাহে একটি সভা নয়, বরং সপ্তাহে দশটি সভা সহ্য করতে সক্ষম হওয়া উচিত । আমি জোর দিয়ে বলেছিলাম যে একটি আপেক্ষিক ব্যর্থতায় আমাদের হতাশ হওয়া উচিত নয় , আমরা যে কৌশল বেছে নিয়েছি তা সঠিক, এবং আমরা যদি দৃঢ়সংকল্প ও অধ্যবসায়ের সাথে আমাদের পথ অনুসরণ করি, তবে শীঘ্রই হোক বা দেরিতে হোক সাফল্য আমাদেরই হবে । ১৯১৯-১৯২০ সালের পুরো শীতকালটা ছিল একটানা ।

আন্দোলনকে সফল করার সামর্থ্যের ওপর আমাদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করার সংগ্রাম ,
এটি এমন এক জ্বলন্ত বিশ্বাসে পরিণত হবে যা পর্বতকেও নাড়িয়ে দিতে পারে ।

ছোট হলঘরে আমাদের পরবর্তী সভাটি আমার বিশ্বাসকে সঠিক প্রমাণ করেছিল। আমাদের শ্রোতার সংখ্যা ২০০ ছাড়িয়ে গিয়েছিল । জনসাধারণের ব্যাপক সমর্থন এবং আর্থিক সাফল্য ছিল অসাধারণ। আমি সাথে সাথেই আরেকটি সভা আয়োজনের জন্য জোর দিয়েছিলাম । দুই সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে সেটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং ২৭০ জনেরও বেশি লোক উপস্থিত ছিলেন। দুই সপ্তাহ পরে, আমরা আমাদের সপ্তম সভায় আমাদের সমর্থক এবং তাদের বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। সেই একই হলঘরে উপস্থিত সকলের জায়গা হতে প্রায় হচ্ছিল না। ৪০০ জনেরও বেশি লোক উপস্থিত হয়েছিলেন।

* * *

এই সময়ে আমাদের নবীন আন্দোলনটি তার অভ্যন্তরীণ রূপ গড়ে তুলছিল। মাঝে মাঝে আমাদের ছোট গণ্ডির মধ্যে কমবেশি উত্তপ্ত আলোচনা হতো। এই নবীন আন্দোলনকে একটি দল বলার ধারণার বিরুদ্ধে বিভিন্ন মহল থেকে আপত্তি উঠেছিল —যেমনটা এখনও ওঠে। আমি সবসময়ই এই ধরনের সমালোচনাকে সমালোচকদের অবাস্তবতা ও সংকীর্ণ মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করেছি । এই আপত্তিগুলো সবসময় এমন লোকেরাই তুলত, যারা বাহ্যিক রূপ আর অভ্যন্তরীণ শক্তির মধ্যে পার্থক্য করতে ব্যর্থ হয়েছিল, এবং তার বদলে আন্দোলনটিকে এর সঙ্গে জুড়ে থাকা জাঁকজমকপূর্ণ নামটি দিয়ে বিচার করার চেষ্টা করেছিল। এই উদ্দেশ্যে , তারা আমাদের পূর্বপুরুষদের শব্দভাণ্ডার ঘেঁটেছিল, যার ফল হয়েছিল দুর্ভাগ্যজনক ।

সেই সময়ে মানুষকে এটা বোঝানো খুব কঠিন ছিল যে , কোনো আন্দোলন তার আদর্শের চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত তা একটি দল । নিজেকে হাজারো অন্য নামে ডাকলেও তা একটি দলই থাকে।

যে কোনো ব্যক্তি যিনি এমন কোনো ধারণাকে বাস্তবে রূপ দিতে চান যার বাস্তবায়ন জাতির মঙ্গল বয়ে আনবে, তাকে প্রথমে এমন শিষ্যদের সন্ধান করতে হবে যারা তার নির্ধারিত লক্ষ্যের জন্য লড়াই করতে ইচ্ছুক । যদি এই লক্ষ্যগুলো দলীয় ব্যবস্থা ধ্বংস করা এবং এর মাধ্যমে ধ্বংসের প্রক্রিয়াকে থামানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তবে যারা এই আদর্শের দূত ও সমর্থক হিসেবে কাজ করেন , তারা তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন না করা পর্যন্ত দলেরই অংশ । যখন পুরোনো ধাঁচের তাত্ত্বিকরা, যাদের বাস্তব সাফল্য তাদের প্রজ্ঞার ব্যস্তানুপাতিক , মনে করেন যে তারা পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি আন্দোলনের চরিত্র পরিবর্তন করতে পারবেন, যে আন্দোলনটিও একটি দলই বটে।

এর নামটা, এটা কেবলই শব্দের খেলা এবং চুলচেরা বিশ্লেষণ।

পক্ষান্তরে , প্রাচীন জার্মানিক আমলের দূরবর্তী ও বিস্মৃত নামগুলো নিয়ে ক্রমাগত কথা বলা জাতির চেতনার সম্পূর্ণ পরিপন্থী , কারণ আমাদের সময়ে সেগুলোর কোনো প্রাসঙ্গিকতা নেই। সুদূর অতীত থেকে শব্দ ধার করার এই অভ্যাস মানুষকে এই ভেবে বিভ্রান্ত করে যে, আঙ্গিক অলঙ্করণ এই আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এটি সত্যিই একটি খারাপ অভ্যাস; কিন্তু আজকাল এটি বেশ প্রচলিত।

Machine Translated by Google

তখনও এবং পরেও, আমাকে অনুসারীদের এইসব ভবঘুরে পণ্ডিতদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত সতর্ক করতে হতো, যারা জার্মান লোককথা ছড়াতো এবং অতিরিক্ত অহংকারকে প্রশ্রয় দেওয়া ছাড়া কোনো বুদ্ধিদীপ্ত বা বাস্তবসম্মত কাজ কখনো সম্পন্ন করেনি। নতুন আন্দোলনকে অবশ্যই এমন লোকদের আগমন থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে, যাদের একমাত্র পরিচয় হলো বিগত ত্রিশ -চল্লিশ বছর ধরে একই আদর্শের জন্য লড়াই করার তাদের নিজেদের দাবি ।

যদি কোনো ব্যক্তি তার তথাকথিত একটি ধারণাকে বাস্তবে রূপ দিতে চল্লিশ বছর ধরে সংগ্রাম করে থাকেন, এবং যদি তার এই তথাকথিত প্রচেষ্টাগুলো শুধু কোনো ইতিবাচক ফলই না দিয়ে থাকে , এমনকি তার প্রতিপক্ষ দলের সাফল্যকেও ঠেকাতে ব্যর্থ হয়ে থাকে , তবে চল্লিশ বছরের এই নিষ্ফল প্রচেষ্টার কাহিনীই উক্ত ব্যক্তির অযোগ্যতার অকাট্য প্রমাণ দেয়।

এই ধরনের লোকেরা বিশেষভাবে বিপজ্জনক, কারণ তারা সাধারণ সদস্য হিসেবে আন্দোলনে অংশ নিতে চায় না । বরং, তারা বিশ্বাস করে যে তাদের অতীতের কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে কেবল নেতৃত্বের পদই তাদের জন্য উপযুক্ত হবে এবং তাহলেই তারা তাদের কাজ চালিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু নবীন আন্দোলনটির জন্য দুর্ভোগ অপেক্ষা করছে, যদি তা এমন লোকদের হাতে পড়ে । একজন ব্যবসায়ী, যিনি একটি বড় কোম্পানির দায়িত্বে ছিলেন এবং অব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেটিকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছেন, তিনি একটি নতুন কোম্পানি শুরু করার জন্য সঠিক ব্যক্তি নন । একটি জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।
যার সামান্যতম কাণ্ডজ্ঞান আছে, সেও এমন কাউকে ব্যবস্থাপনার পদে নিয়োগ দেবে না।
কোনো এক টিউটোনিক মেথুসেলাহর আন্দোলন, যিনি চল্লিশ বছর ধরে ব্যর্থভাবে একটি ধারণা প্রচার করেন , যতক্ষণ না অবশেষে তিনি এবং তার ধারণাটি বার্ধক্যজনিত অবক্ষয়ের পর্যায়ে প্রবেশ করে।

তাছাড়া , এই ধরনের মানুষের মধ্যে খুব অল্প শতাংশই নিঃস্বার্থভাবে কোনো নতুন আন্দোলনের লক্ষ্য পূরণে এবং এর নীতি প্রচারে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে তাতে যোগ দেয় । অধিকাংশই আসে কারণ তারা মনে করে যে , নতুন আন্দোলনের ছত্রছায়ায় তারা তাদের নতুন শ্রোতাদের ক্ষতি করে নিজেদের পুরোনো ধারণাগুলো প্রচার করতে পারবে । যাই হোক, সেই ধারণাগুলো আসলে কী , তা কেউই কখনো বর্ণনা করতে পারে না ।

এই ধরনের লোকদের স্বভাবই হলো অতীতের টিউটোনিক বীর, পাথরের কুঠার, বর্শা এবং ঢাল নিয়ে চিৎকার করা , অথচ বাস্তবে তারা কল্পনাতীতভাবে করুণ কাপুরুষ । অতএব, এই একই লোকেরা যারা প্রাচীন নকশায় যত্নসহকারে তৈরি টিউটোনিক পিউটারের তলোয়ার উঁচিয়ে ধরে, শক্ত ভালুকের চামড়ার পোশাক পরে এবং দাড়িওয়ালা মাথায় শিংওয়ালা শিরস্ত্রাণ ধারণ করে, তারাই দাবি করে যে সমস্ত আধুনিক সংঘাতের সমাধান কেবল এইভাবেই করা উচিত।

মানসিক অস্ত্র। আর তাই প্রথম কমিউনিস্ট লাঠিটা দেখা দিলেই তারা পালায়। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই বীর গ্ল্যাডিয়েটরদের নিয়ে নতুন কোনো মহাকাব্য লেখার সুযোগ পাবে না ।

আমি এই ধরনের এত লোক দেখেছি যে তাদের জঘন্য প্রহসনের প্রতি গভীর ঘৃণা অনুভব না করে পারি না । সাধারণ মানুষের কাছে তারা কেবলই উপহাসের পাত্র; কিন্তু এই কৌতুক অভিনেতাদের সম্মান করা এবং জার্মান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াইরত প্রকৃত মানুষদের চেয়ে এদেরকে প্রাধান্য দেওয়াই ইহুদিদের স্বার্থে । অধিকন্তু, এই কৌতুক অভিনেতারা নিজেদের নিয়ে খুব গর্বিত। তাদের চরম দুর্বলতা, যা সর্বজনবিদিত, তা সত্ত্বেও তারা সবকিছু জানার দাবি করে।

সবকিছুতেই অন্যদের চেয়ে ভালো; তাই তারা সকল আন্তরিক ও
প্রকৃত দেশপ্রেমিক, যাঁদের কাছে শুধু অতীতের বীরত্বই গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং যাঁরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করার জন্য নিজেদের কাজের দৃষ্টান্ত রেখে যেতেও দায়বদ্ধ বোধ করেন।

এইসব লোকদের মধ্যে এমনও অনেকে আছেন যাদের আচরণকে তাদের জন্মগত নির্বুদ্ধিতা ও অযোগ্যতা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় ; কিন্তু এমনও অনেকে আছেন যাদের সুস্পষ্ট গোপন উদ্দেশ্য রয়েছে। সাধারণত এই দুই দলের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন । আমার সাধারণত এই ধারণা হয়েছে, বিশেষ করে তথাকথিত ধর্মীয় সংস্কারকদের ক্ষেত্রে, যাদের বিশ্বাস পুরোনো জার্মানীয় রীতিনীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে , যে তারা আসলে তাদেরই ধর্মপ্রচারক ও পৃষ্ঠপোষক, যারা জার্মানিতে কোনো জাতীয় পুনর্জন্ম ঘটুক তা চায় না। তাদের সমস্ত কার্যকলাপ মানুষকে সাধারণ শত্রু, অর্থাৎ ইহুদিদের বিরুদ্ধে একটি সাধারণ লক্ষ্যে একত্রে লড়াই করার প্রয়োজনীয়তা থেকে বিচ্যুত করে। অধিকন্তু , এই ধরনের অর্থহীন বকবকানি মানুষের শক্তিকে সাধারণ লক্ষ্যের জন্য লড়াই করার পরিবর্তে তাদের নিজেদের দলের মধ্যেই অযৌক্তিক ও ধ্বংসাত্মক ধর্মীয় বিতর্কে ব্যয় করে। এই কারণেই আন্দোলনে কর্তৃত্ববাদের মূর্ত প্রতীক একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শক্তির আধিপত্য অপরিহার্য।

Machine Translated by Google

সক্রিয় নেতৃত্ব। কেবল এইভাবেই এই ধরনের ক্ষতিকর শক্তিকে প্রতিহত করা সম্ভব । আর এই কারণেই লোককথার এই অহশ্বেরুশেরা সেই সমস্ত আন্দোলনের শত্রু , যেখানে সদস্যরা একজন নেতা ও একটি অনুশাসনের অধীনে দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ থাকে । আমি যাদের কথা বললাম, তারা এই ধরনের আন্দোলনকে ঘৃণা করে, কারণ এগুলো তাদের চক্রান্তে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে ।

নতুন আন্দোলনের কর্মসূচি প্রণয়নের সময় আমরা যে 'জাতীয়' (volkisch) শব্দটি বাদ দিয়েছিলাম, তার পেছনে যথেষ্ট কারণ রয়েছে। 'জাতীয়' শব্দের সঙ্গে সম্পর্কিত ধারণাগুলো কাজে আসতে পারে না।
আন্দোলনের ভিত্তি হিসেবে , কারণ সেগুলো খুবই অস্পষ্ট ও সাধারণ। তাই, কেউ নিজেকে 'জাতীয়তাবাদী' বললে , সেটাকে কোনো নির্দিষ্ট দলীয় আনুগত্যের চিহ্ন হিসেবে বিবেচনা করা কঠিন ।

যেহেতু এই ধারণাটি ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত অস্পষ্ট , তাই এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা হতে পারে এবং ফলস্বরূপ মানুষ আরও সহজে এর উল্লেখ করতে পারে।
যখন একাধিক ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে এমন একটি অস্পষ্ট ধারণা কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন গ্রহণ করে, তখন তা প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলোর সুশৃঙ্খল সংহতিকে ভেঙে দিতে শুরু করে । যদি প্রত্যেক সদস্য নিজেরাই নির্ধারণ করতে পারে যে তারা কী বিশ্বাস করে এবং কী করতে চায়, তাহলে কোনো সংহতি থাকতে পারে না।

আজকাল যে ধরনের লোকেরা তাদের বোতামের ছিদ্রে জাতীয় প্রতীক নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, তা দেখলে লজ্জিত হতে হয়, এবং একই সাথে এটাও অবাক হতে হয় যে কত মানুষ এই প্রতীকের অর্থকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করে। বাভারিয়ার একজন সুপরিচিত অধ্যাপক, একজন বিখ্যাত প্রবীণ যোদ্ধা যিনি কেবল বুদ্ধির অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করেন এবং যিনি কাঁধে বুদ্ধির অস্ত্র নিয়ে বার্লিন অভিমুখে পদযাত্রা করার গর্ব করেন, তিনি বিশ্বাস করেন যে 'জাতীয়' শব্দটি 'রাজতন্ত্রবাদী' শব্দের সমার্থক। কিন্তু এই বিদ্বান ব্যক্তি এখনও ব্যাখ্যা করেননি যে, অতীতের জার্মান রাজাদেরকে কীভাবে 'জাতীয়' শব্দটি দিয়ে আমরা এখন যা বুঝি তার সাথে এক করে দেখা যায় । আমার আশঙ্কা, এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে তিনি বেশ অসুবিধায় পড়বেন । অধিকাংশ রাজতন্ত্রবাদী জার্মান রাষ্ট্রের চেয়ে কম জাতীয় কিছু কল্পনা করা কঠিন । যদি তা না হতো, তবে তারা বিলুপ্ত হতো না ; অথবা যদি তারা জাতীয় হতোই, তবে তাদের পতনের ঘটনাই হয়তো প্রমাণ করত যে জাতীয়তাবাদী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি ভ্রান্ত।

প্রত্যেকেই এই ধারণাটিকে নিজ নিজ উপায়ে ব্যাখ্যা করে । কিন্তু এমন ভিন্ন ভিন্ন মতামত টিকতে পারে না।
একটি সংগ্রামী রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিত্তি হয়ে উঠল ।

বিংশ শতাব্দীর এই অগ্রদূত ও ত্রাণকর্তাদের মধ্যে জীবনজ্ঞানের চরম অভাব , এবং বিশেষ করে জাতির আত্মাকে বোঝার অক্ষমতার কথা আলাদা করে বলার প্রয়োজন নেই । বামপন্থী দলগুলো এই লোকগুলোকে নিয়ে উপহাস করে যথেষ্ট মনোযোগ দিয়েছে ।
তাদেরকে। তারা তাদেরকে অসংলগ্ন কথা বলতে দেয় এবং তারপর উপহাস করে।

যারা নিজেদের শত্রুদের নিরুৎসাহিত করতে ব্যর্থ হয়েছে, তাদের সাথে বন্ধুত্বকে আমি মূল্যবান বলে মনে করি না। তাই, আমরা এমন লোকদের বন্ধুত্বকে আমাদের নবীন আন্দোলনের জন্য শুধু মূল্যহীনই নয় , বরং চূড়ান্ত বিপজ্জনক বলে মনে করতাম । এই মৌলিক কারণেই আমরা নিজেদেরকে একটি দল বলেছিলাম। আমরা আশা করেছিলাম যে, এমন একটি নাম দেওয়ার মাধ্যমে আমরা যেকোনো জাতীয়তাবাদী স্বপ্নদ্রষ্টাকে নিবৃত্ত করতে পারব। একই কারণে, আমরা আমাদের দলের নাম দিয়েছিলাম 'জাতীয় সমাজতান্ত্রিক জার্মান শ্রমিক দল ' ।

'দল' শব্দটিই অতীতে বসবাসকারী সেইসব স্বপ্নদ্রষ্টা , আড়ম্বরপূর্ণ নামকরণের অনুরাগী এবং যারা জাতীয় আদর্শের ঢাক পিটিয়ে বেড়ায় , তাদের দূরে রাখে । দলের পুরো নামটি সেই সমস্ত বীরদের ভীত করে দূরে সরিয়ে দেয়, যাদের অস্ত্র হলো আত্মার তরবারি, এবং সেই সমস্ত কাপুরুষদেরও , যারা তথাকথিত 'বুদ্ধিজীবী' মহলের আড়ালে ঢালের মতো লুকিয়ে থাকে ।

এটা প্রত্যাশিতই ছিল যে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা আমাদের আন্দোলনের উপর একটি ব্যাপক আক্রমণ চালাবে; কিন্তু অবশ্যই, তা কেবল কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ থাকবে, কারণ এই জাতীয়তাবাদী উলানদের একমাত্র অস্ত্র হলো পালকের কলম । এই কারণেই আমরা আমাদের একটি নীতিকে নিম্নরূপে সংজ্ঞায়িত করেছিলাম: " আত্মরক্ষার্থে আমরা সহিংসতার জবাব সহিংসতা দিয়েই দেব ।" অবশ্যই, এই নীতিটি কলমের বীরদের শান্তি বিঘ্নিত করেছিল। তারা আমাদের তীব্রভাবে তিরস্কার করেছিল, শুধু তাদের ভাষায় লাঠির আদিম উপাসনার জন্যই নয়, বরং তাদের মতে, আমাদের পক্ষে কোনো বুদ্ধিজীবী শক্তি ছিল না বলেও । এই ভণ্ডরা এক মুহূর্তের জন্যও ভাবেনি যে ডেমোস্থেনিসকে একটি গণসমাবেশে পঞ্চাশজন নির্বোধের চিৎকারে এবং তাদের অস্ত্র ব্যবহার করে চুপ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে ।

Machine Translated by Google

তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে মুষ্টিযুদ্ধ । ভণ্ড সাহিত্যিকদের সহজাত কাপুরুষতা তাদের এমন বিপদের সম্মুখীন হতে বাধা দেয়, কারণ তারা সর্বদা একটি নিরাপদ স্থানে কাজ করে এবং কখনও গোলমাল করার বা জনসমক্ষে আসার সাহস করে না।

আজও আমি আমাদের এই নবীন আন্দোলনের সদস্যদের কঠোরতম ভাষায় সতর্ক করে দিচ্ছি, যারা নিজেদের ‘ নীরব কর্মী’ বলে দাবি করে, তাদের ফাঁদে পা না দেওয়ার জন্য । এই ‘ নীরব কর্মীরা’ শুধু কাপুরুষই নয় , বরং অজ্ঞ ও অলসও বটে।

যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট কিছু ঘটনা সম্পর্কে সচেতন এবং জানে যে একটি নির্দিষ্ট বিপদ ঘনিয়ে আসছে , এবং একই সাথে এর বিরুদ্ধে ব্যবহারযোগ্য কিছু প্রতিকারও দেখতে পায়, তার কর্তব্য " নীরবে কাজ করা" নয় , বরং অশুভের বিনাশ এবং তার নিজের প্রতিকারের স্বীকৃতির জন্য প্রকাশ্যে ও জনসমক্ষে লড়াই করা। যদি সে তা না করে, তবে সে তার কর্তব্য এড়িয়ে যায় এবং দেখায় যে সে দুর্বল চরিত্রের এবং তার ভীরুতা, অলসতা বা অযোগ্যতার কারণে কাজ করতে অক্ষম । এই " নীরব কর্মীদের" বেশিরভাগই এমন ভান করে যেন তারা ঈশ্বরই জানেন কী জানে। তাদের কেউই কোনো কিছু সম্পন্ন করতে সক্ষম নয়, কিন্তু তারা তাদের ভাঁওতাবাজি দিয়ে ক্রমাগত বিশ্বকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করে। যদিও তারা অলস, তারা এমন একটি ধারণা তৈরি করার চেষ্টা করে যে তাদের "নীরব কাজ" তাদের কাছে খুব আকর্ষণীয়। সংক্ষেপে , তারা নিখাদ প্রতারক, রাজনৈতিক দালাল যারা এই কারণে তিক্ত যে আসল কাজটা অন্যরা করছে । যখন আপনি এই জাতীয়তাবাদী জনতার কাউকে তার 'নীরব কাজের' মূল্য নিয়ে শোরগোল করতে দেখবেন, তখন আপনি নিশ্চিত হতে পারেন যে আপনি এমন একজনের সংস্পর্শে এসেছেন যে আদৌ কোনো কাজের কাজ করে না , বরং কেবল অন্যের আসল পরিশ্রমের ফল চুরি করে।

এর পাশাপাশি, এই রক্ষণশীল অলস ব্যক্তিরা যে ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিক ধৃষ্টতার সাথে শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি নিয়ে অন্যের কাজের সমালোচনা করে তা ধ্বংস করার চেষ্টা করে এবং এর মাধ্যমে আমাদের জাতির ঘোর শত্রুকে সাহায্য করে, সেদিকেও জোর দেওয়া প্রয়োজন।

এমনকি সবচেয়ে সাধারণ সমর্থকও, যার সাহস আছে কোনো পানশালায় যেখানে তার শত্রুরা জড়ো হয়েছে , সেখানে একটি টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের কাছে সাহসিকতার সাথে ও খোলাখুলিভাবে নিজের মতামত তুলে ধরার, সেও এই ভণ্ডদের চেয়ে হাজার গুণ বেশি অর্জন করবে । অন্তত সে এক বা দুজনকে আমাদের আন্দোলনে যোগ দিতে রাজি করাতে পারবে। তার কাজ চোখে দেখা যায় এবং এর কার্যকারিতা বর্তমান ফলাফলের মাধ্যমে যাচাই করা যায়। কিন্তু এই চাটুকার ভণ্ডরা —যারা তাদের 'নীরব কাজের' প্রশংসা করে এবং নিজেদের রক্ষা করে...
পরিচয়হীনতার আড়ালে তারা প্রকৃত অর্থেই মূল্যহীন পরজীবী এবং জাতীয় নবজাগরণের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ অকেজো ।

* * *

১৯২০ সালের গোড়ার দিকে , আমি প্রথম গণসভা আয়োজনের প্রস্তাব দিই। এই প্রস্তাব নিয়ে আমাদের মধ্যে মতভেদ ছিল। কেউ কেউ মনে করতেন যে, এই ধরনের সভার সময় এখনও আসেনি এবং এর ফলাফল ক্ষতিকর হতে পারে । বামপন্থী সংবাদমাধ্যম আমাদের দিকে নজর দিতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে আমরা তাদের রোষের কারণ হয়ে দাঁড়াই। আমরা তাদের সভায় প্রশ্ন করতে বা বক্তাদের চ্যালেঞ্জ জানাতে হাজির হতে শুরু করি , যার ফলে স্বাভাবিকভাবেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের থামিয়ে দেওয়া হতো। কিন্তু তারপরেও আমরা আমাদের লক্ষ্য আংশিকভাবে অর্জন করেছিলাম । লোকেরা আমাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে শুরু করে এবং তারা আমাদের যত ভালোভাবে বুঝতে লাগল, তাদের অনিচ্ছা ও শত্রুতা ততই বাড়তে লাগল। এইভাবে , আমরা আমাদের প্রথম গণসভায় লাল শিবির থেকে এক বিশাল বন্ধুদলের উপস্থিতি আশা করতে পারতাম ।

আমি পুরোপুরি বুঝতে পারছিলাম যে আমাদের সমাবেশ সম্ভবত ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হবে । কিন্তু আমাদের এই লড়াইটা চালিয়ে যেতেই হতো ; এখন না হলেও , কয়েক মাসের মধ্যে। আমাদের অস্তিত্বের প্রথম দিন থেকেই, অন্ধ বিশ্বাস আর অদম্য সংকল্পের চেতনায় লড়াই করে এগিয়ে গিয়ে আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে হতো। যারা লাল শিবিরের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাদের মানসিকতা আমি ভালো করেই জানতাম , এবং আমি এটাও খুব ভালো করে জানতাম যে, যদি আমরা তাদের সর্বশক্তি দিয়ে বিরোধিতা করি, তবে আমরা কেবল তাদেরই প্রভাবিত করব না , বরং হয়তো নতুন সমর্থকও পেয়ে যাব। তাই , আমার মনে হয়েছিল যে আমাদের সক্রিয় বিরোধিতার পথই বেছে নিতে হবে।

সেই সময়ে হের হ্যারার আমাদের দলের সভাপতি ছিলেন । আমাদের প্রথম গণসভার উপযুক্ত সময় নিয়ে তিনি আমার মতের সঙ্গে একমত ছিলেন না। এই কারণে, তিনি মনে করতেন

Machine Translated by Google

একজন আন্তরিক ও সৎ মানুষ হিসেবে আমি আন্দোলনের নেতৃত্ব থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলাম। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন হের আন্তন ড্রেক্সলার। আমি প্রচার সংগঠনের দায়িত্ব নিজের হাতে রেখেছিলাম এবং কোনো আপোস করিনি ।

আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে ১৯২০ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি, পূর্বে অপরিচিত একটি আন্দোলনের ছত্রছায়ায় প্রথম বৃহৎ গণসভা অনুষ্ঠিত হবে ।

প্রস্তুতির দায়িত্ব আমি ব্যক্তিগতভাবে নিয়েছিলাম । এতে বেশি সময় লাগেনি । আমাদের নীতি অনুযায়ী দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমাদের সংগঠনের পুরো ব্যবস্থাটি সক্রিয় করা হয়েছিল । সমাবেশে উত্থাপিত বিষয়গুলোর ওপর কী অবস্থান নেওয়া হবে, তা আমাদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ঠিক করতে হয়েছিল। সমাবেশের ঘোষণাগুলো জনগণের কাছে তুলে ধরার কথা ছিল। এই উদ্দেশ্যে, আমাদের পোস্টার ও প্রচারপত্রের ওপর নির্ভর করতে হয়েছিল , যেগুলোর বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনার ধরণ নির্ধারণ করা হয়েছিল প্রচারণার বিষয়ে আমি ইতোমধ্যে যে নীতিগুলো আলোচনা করেছি, সে অনুযায়ী। সেগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল যা জনতাকে আকৃষ্ট করে। সেগুলোতে কয়েকটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছিল, যা ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি করা হতো। লেখা ছিল সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট, এবং আমরা সম্পূর্ণ গোঁড়া প্রকাশভঙ্গি ব্যবহার করেছিলাম। আমরা অদম্য সংকল্প নিয়ে এই পোস্টার ও প্রচারপত্রগুলো বিতরণ করেছিলাম।

শক্তি, এবং তারপর আমরা ধৈর্য ধরে তার প্রভাবের জন্য অপেক্ষা করলাম।

যেহেতু আমাদের প্রধান রঙ ছিল লাল, তা ছিল দৃষ্টি আকর্ষণকারী এবং সেই কারণেই এটি আমাদের প্রতিপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করতে ও তাদের বিরক্ত করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। তারা চাইুক বা না চাইুক, তাদের আমাদের লক্ষ্য করতেই হতো এবং তারা আমাদের ভুলতে পারত না।

আমাদের কৌশলের একটি প্রভাব ছিল বাভারিয়ায় মার্ক্সবাদী এবং মধ্যপন্থী দলের মধ্যেকার ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহযোগিতাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা । বাভারিয়ায় ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল, বাভারিয়ান ন্যাশনাল পার্টি (মধ্যপন্থী দলের সহযোগী) , "লাল" জনতার উপর আমাদের পোস্টারগুলোর প্রভাব প্রতিহত করার জন্য সম্ভাব্য সবকিছুই করেছিল ।

তারা আমাদের কার্যকলাপ সীমিত করতে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছিল। যদি পুলিশ খুঁজে না পেত
আমাদের পোস্টার নিষিদ্ধ করার একমাত্র কারণ ছিল এই দাবি করা যে, আমরা রাস্তার যান চলাচলে বাধা সৃষ্টি করছিলাম। আর এভাবেই তথাকথিত জার্মান ন্যাশনাল পার্টি তাদের "লাল" মিত্রদের তুষ্ট করার জন্য সেইসব পোস্টার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করে দেয়, যেগুলোতে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, আমরা আন্তর্জাতিক উস্কানিদাতাদের দ্বারা পথভ্রষ্ট এবং নিজ জনগণের বিরুদ্ধে উসকানি পাওয়া লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে জাতির কোলে ফিরিয়ে আনতে চাই। এই পোস্টারগুলো সেই তিক্ত সংগ্রামের সাক্ষী, যে সংগ্রামে আমাদের নবীন আন্দোলন তখন লিপ্ত ছিল। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই পোস্টারগুলোর মধ্যে আমাদের সংকল্প এবং আমাদের উদ্দেশ্যের ন্যায্যতার প্রমাণ খুঁজে পাবে । এই পোস্টারগুলো এও প্রমাণ করবে যে , কীভাবে তথাকথিত জাতীয় কর্মকর্তারা এমন একটি আন্দোলনকে কণ্ঠরোধ করতে স্বেচ্ছাচারী পদক্ষেপ নিয়েছিল যা তাদের পছন্দসই ছিল না, কারণ এটি জাতির বিশাল জনগোষ্ঠীকে জাতীয়করণ করে তাদের নিজ জাতির কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিল।

এই পোস্টারগুলো বাভারিয়ায় একটি জাতীয় সরকার থাকার তত্ত্বটিকেও খণ্ডন করতে সাহায্য করবে এবং এই মর্মে প্রামাণ্য দলিল উপস্থাপন করবে যে, ১৯১৯ থেকে ১৯২৩ সালের মধ্যে বাভারিয়া যদি জাতীয়তাবাদী মনোভাবাপন্ন থেকেও থাকে , তবে তা কোনো জাতীয় সরকারের কারণে নয়, বরং জনগণের মধ্যে জাতীয় চেতনা আরও গভীরভাবে প্রোথিত হয়েছিল এবং সরকারকে তাদের অনুভূতি অনুসরণ করতে হয়েছিল । সরকারি কর্তৃপক্ষ এই পুনর্জন্মের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত ও ব্যর্থ করার জন্য তাদের ক্ষমতার মধ্যে সবকিছুই করেছিল । কিন্তু এখানে দুজন কর্মকর্তার কথা সম্মানীয় ব্যতিক্রম হিসেবে উল্লেখ করা উচিত।

আর্নস্ট পোহনার তখন পুলিশ প্রধান ছিলেন। তাঁর বিশ্বস্ত উপদেষ্টা ছিলেন ডক্টর ফ্রিক, যিনি তাঁর সহকারীও ছিলেন। এই দুজনই ছিলেন একমাত্র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা যাঁদের সাহস ছিল।
দেশের স্বার্থকে নিজেদের স্বার্থের ঊর্ধ্বে রাখা – অর্থাৎ, নিজেদের চাকরি টিকিয়ে রাখা।
একমাত্র আর্নস্ট পোনারই জনতার তোষামোদ করতেন না, বরং তিনি জাতির প্রতি এক কর্তব্যবোধ অনুভব করতেন এবং তাঁর আন্তরিকভাবে ভালোবাসার জার্মান জাতির পুনর্জন্মে সাহায্য করার জন্য নিজের ব্যক্তিগত জীবিকাসহ সবকিছু ঝুঁকি নিতে ও উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিলেন। এই কারণে, তিনি একদল দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি কর্মকর্তার কাছে এক কাঁটা ছিলেন । তাদের কার্যকলাপ জাতির স্বার্থ কিংবা এর পুনর্জন্মের প্রয়োজনীয়তা দ্বারা পরিচালিত হতো না। তারা নিজেদের দৈনন্দিন রুটি- রুজির জন্য সরকারের ইচ্ছার সামনে নতজানু হতো, কিন্তু জাতির মঙ্গল যে তাদের তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত করা হয়েছে, সে বিষয়ে তাদের বিন্দুমাত্র ভাবনা ছিল না ।

Machine Translated by Google

সর্বোপরি, পোহনার ছিলেন সেইসব মানুষদের একজন, যারা আমাদের তথাকথিত রাষ্ট্রশক্তির রক্ষকদের বেশিরভাগের মতো দেশ ও জাতির বিশ্বাসঘাতকদের শত্রুতাকে ভয় পেতেন না , বরং একে সম্মান ও সততার চিহ্ন হিসেবে দেখতেন । এমন মানুষদের জন্য, ইহুদি ও মার্ক্সবাদীদের ঘৃণা এবং তাদের ছড়ানো মিথ্যা ও অপবাদই ছিল জাতীয় দুর্দশার মাঝে আনন্দের একমাত্র উৎস । পোহনার ছিলেন পাথরের মতো দৃঢ় আনুগত্যের একজন মানুষ। তিনি ছিলেন ধ্রুপদী যুগের তপস্বী চরিত্রদের মতো, এবং একই সাথে একজন সাধারণ জার্মান, যার কাছে "দাস হওয়ার চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো" কথাটি অন্তঃসারশূন্য ছিল না, বরং তা ছিল তাঁর আত্মার সারবস্তু ।

আমার মতে, সেই সময়ে বাভারিয়ার ক্ষমতার পদে থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে একমাত্র তিনিই এবং তাঁর সহকর্মী ডক্টর ফ্রিকই একটি বাভারীয় জাতি গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালনের দাবি করার অধিকার রাখেন।

আমাদের প্রথম গণসমাবেশ করার আগে, শুধু প্রচার সামগ্রীই প্রস্তুত রাখতে হয়নি, বরং আমাদের কর্মসূচির মূল বিষয়গুলোও ছাপিয়ে নিতে হয়েছিল।

এই বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে , আমাদের কর্মসূচির রূপরেখা প্রণয়নে আমরা যে নীতিগুলো অনুসরণ করেছিলাম , তা আমি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করব । এখানে আমি শুধু এটুকু বলব যে, আমাদের কর্মসূচিটি কেবল আমাদের আন্দোলনের লক্ষ্যগুলো প্রকাশ করার জন্যই নয়, বরং বৃহত্তর জনসাধারণের কাছে বোধগম্য হওয়ার জন্যও তৈরি করা হয়েছিল । তথাকথিত বুদ্ধিজীবী মহল একে উপহাস করেছিল এবং এর সমালোচনা করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আমাদের কর্মসূচির ফলাফল প্রমাণ করেছিল যে তৎকালীন ধারণাগুলো সঠিক ছিল।

এই দিনগুলিতে আমি ডজন ডজন নতুন আন্দোলনকে উঠতে ও চিহ্নহীনভাবে বিলীন হতে দেখেছি । কেবল একটি আন্দোলনই টিকে আছে। সেই আন্দোলনটি হলো জাতীয় সমাজতান্ত্রিক জার্মান শ্রমিক দল। আজ আমি আগের চেয়েও বেশি নিশ্চিত যে, যদিও তারা আমাদের বিরুদ্ধে লড়তে পারে এবং আমাদের আন্দোলনকে অচল করে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে , এবং যদিও উচ্চকণ্ঠ মন্ত্রীরা আমাদের কথা বলতে বারণ করতে পারে, তবুও তারা আমাদের আদর্শের বিজয়কে আটকাতে পারবে না । যখন রাষ্ট্র প্রশাসনের বর্তমান ব্যবস্থা এবং এমনকি এর প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলোর নামও ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মৌলিক কর্মসূচিই হবে সেই ভিত্তি যার উপর নতুন রাষ্ট্র নির্মিত হবে।

১৯২০ সালের জানুয়ারির আগে অনুষ্ঠিত সভাগুলোর মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রথম ব্রোশিওর, পোস্টার ও কর্মসূচিপত্র ছাপানোর জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলাম ।

আমাদের প্রথম গণসভার কথা উল্লেখ করে আমি এই বইয়ের প্রথম পর্ব শেষ করব , কারণ সেই সভাটি ছিল আমাদের ছোট দলটির তৎকালীন জনমতকে প্রভাবিত করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার ক্ষেত্রে একটি সন্ধিক্ষণ । সেই সময় , আমি সবচেয়ে বেশি চিন্তিত ছিলাম যে আমরা হয়তো পুরো হলটি পূরণ করতে পারব না এবং অনেক বেঞ্চ খালিই থেকে যাবে। ব্যক্তিগতভাবে, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতাম যে , যদি মানুষ আসে, তবে সেই দিনটি এই নবীন আন্দোলনের জন্য একটি বিরাট সাফল্য হবে । অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করার সময় আমার এমনই মনে হচ্ছিল ।

সেই মুহূর্ত আসবেই।

সমাবেশটি সাড়ে সাতটায় শুরু হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল । সমাবেশ শুরু হওয়ার পনেরো মিনিট আগে , আনন্দে বুক কাঁপিয়ে আমি মিউনিখের হফব্রাউহাউসের প্রধান হলঘর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। বিশাল হলঘরটি— তখন আমার কাছে বেশ বড়ই মনে হচ্ছিল—কানায় কানায় পূর্ণ ছিল। সেখানে প্রায় ২,০০০ মানুষ ছিল। আর সর্বোপরি, তারাই ছিল যাদের কাছে আমি সবসময় পৌঁছাতে চেয়েছিলাম। উপস্থিত জনতার অর্ধেকেরও বেশি ছিলেন কমিউনিস্ট বা স্বতন্ত্রপন্থী বলে মনে হওয়া ব্যক্তিরা । তারা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে আমাদের প্রথম বড় সমাবেশটি হঠাৎ করেই শেষ হয়ে যাবে।

কিন্তু ঘটনা অন্যরকম মোড় নিল । প্রথম বক্তার বক্তব্য শেষ হলে আমি বলতে শুরু করলাম। কয়েক মিনিট পর , আমাকে ক্রমাগত বাধা দেওয়া হচ্ছিল এবং সভাকক্ষে তুমুল সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেল। আমার কয়েকজন অনুগত যুদ্ধসঙ্গী এবং অন্য কিছু সমর্থক বাধা প্রদানকারীদের মুখোমুখি হলেন এবং কিছুক্ষণ পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনলেন । আমি আমার বক্তৃতা চালিয়ে যেতে সক্ষম হলাম । প্রায় আধ ঘণ্টা পর, করতালির শব্দে বাধা ও চিৎকার চাপা পড়তে শুরু করল । তারপর সেগুলো ধীরে ধীরে কমে গেল এবং তার জায়গায় করতালির শব্দ শোনা গেল। অবশেষে যখন আমি পঁচিশটি বিষয় ব্যাখ্যা করতে শুরু করলাম , সমবেত জনতার সামনে এক এক করে সেগুলো উপস্থাপন করলাম এবং প্রত্যেকটিকে তারা কীভাবে মূল্যায়ন করে তা জানতে চাইলাম , তখন একের পর এক বিষয় ক্রমবর্ধমান উৎসাহের সাথে গৃহীত হতে লাগল । যখন আমি পৌঁছালাম...

Machine Translated by Google

আমার সামনে সর্বশেষ যে বিষয়টি ছিল, তা হলো এক নতুন প্রত্যয়, নতুন বিশ্বাস এবং নতুন ইচ্ছাশক্তিতে ঐক্যবদ্ধ মানুষে পরিপূর্ণ একটি কক্ষ ।

প্রায় চার ঘণ্টা কেটে যাওয়ার পর হলটি খালি হতে শুরু করল। জনতা যখন ধাক্কাধাক্কি করে ও গুঁতোগুঁতি করতে করতে বেরোনোর পথ খুঁজছিল , আমি জানতাম যে এই আন্দোলন, যা এখন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে, তা আর কখনো ভোলা যাবে না।

এমন এক অগ্নি প্রজ্বলিত করা হয়েছিল, যেখানে সেই তরবারিটি নির্মিত হবে যা জার্মান সিগফ্রিডকে স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেবে এবং জার্মান জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করবে।

আসন্ন পুনর্জন্মের পাশাপাশি আমার এও মনে হচ্ছিল যে, প্রতিশোধের দেবী ১৯১৮ সালের ৯ই নভেম্বরের বিশ্বাসঘাতকতার হিসাব মেটানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

হলঘরটি খালি হয়ে গেল। আন্দোলনটি এগিয়ে চলল ।

Machine Translated by Google

দ্বিতীয় খণ্ড

জাতীয়

সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন

Machine Translated by Google

অধ্যায় ১

বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি এবং দল

১৯২০ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি, নতুন আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রথম গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মিউনিখের হফব্রাউহাউসের ভোজকক্ষে, নতুন দলের কর্মসূচি নিয়ে গঠিত পঁচিশটি প্রস্তাবনা প্রায় দুই হাজার লোকের দর্শকের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছিল এবং প্রতিটি প্রস্তাবনাই অত্যন্ত উৎসাহের সাথে গৃহীত হয়েছিল।

এর মাধ্যমে আমরা সেই মৌলিক নীতি ও কর্মপন্থাগুলো জনসমক্ষে প্রকাশ করেছিলাম, যার ভিত্তিতে একটি নতুন সংগ্রাম পরিচালিত হওয়ার কথা ছিল। এই সংগ্রামের উদ্দেশ্য ছিল সেকেলে ধারণা ও মতামতের জগাখিচুড়িকে উৎখাত করা, যা অস্পষ্টকারী এবং প্রায়শই ক্ষতিকর প্রবণতার জন্ম দিত । ভীরু ও দুর্বল বুর্জোয়াদের ঊর্ধ্বে একটি নতুন শক্তির উত্থান হওয়ার কথা ছিল । এই শক্তির কাজ ছিল মার্ক্সবাদীদের বিজয়যাত্রা থামানো এবং ভাগ্যের রথকে থামানো, যা তার লক্ষ্য অর্জনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল ।

এটা স্পষ্ট ছিল যে এই নতুন আন্দোলনটি জনসমর্থন ও গুরুত্ব লাভ করতে পারে যা ছিল
এই রকম একটি বিশাল লড়াই পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত কেবল তখনই পূরণ হবে, যদি তিনি একেবারে শুরু থেকেই তাঁর সমর্থকদের হৃদয়ে এই পবিত্র বিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে পারেন যে, এটি কোনো নতুন নির্বাচনী স্লোগান দেওয়ার বিষয় নয়, বরং মৌলিক গুরুত্বের এক সম্পূর্ণ নতুন বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করার বিষয়।

আসুন আমরা স্মরণ করার চেষ্টা করি সেইসব মতামতের জঘন্য জগাখিচুড়ি যা পাশাপাশি সাজিয়ে সাধারণ তথাকথিত দলীয় কর্মসূচি তৈরি করেছিল, এবং স্মরণ করি কীভাবে এই মতামতগুলো পর্যায়ক্রমে সতেজ বা পুনর্গঠিত হয়েছিল । এই কর্মসূচিমূলক কদাকার রূপগুলোকে যদি আমরা সঠিকভাবে বুঝতে চাই , তবে আমাদের অবশ্যই সাধারণ বুর্জোয়া 'কর্মসূচি কমিটি'-কে চালিত করা উদ্দেশ্যগুলো সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করতে হবে ।

তাদের কর্মসূচিতে নতুন কিছু যোগ করার সময় বা আগে থেকে অন্তর্ভুক্ত কোনো কিছুতে পরিবর্তন আনার সময় এই লোকগুলো সবসময় একই চিন্তায় চালিত হয়। তাদের চিন্তা থাকে পরবর্তী নির্বাচনের ফলাফলের দিকে । যখনই সংসদীয় শাসনের এই শিল্পীরা সামান্যতম সন্দেহের উদ্রেক করেন যে তাদের প্রিয় ভোটাররা হয়তো পুরনো দলীয় রথের জোয়াল থেকে মুক্ত হতে প্রস্তুত, তখনই তারা সেটিকে নতুন রঙে রাঙাতে শুরু করেন। এরপর আসেন দলের জ্যোতিষী ও রাশিফল পাঠকরা, তথাকথিত "অভিজ্ঞ ব্যক্তি" এবং "বিশেষজ্ঞরা"। তাদের বেশিরভাগই পুরনো সংসদ সদস্য, যাদের রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ তাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা দিয়েছে । জনগণের অধৈর্য হয়ে ওঠার অতীতের ঘটনাগুলো তাদের মনে আছে , এবং এখন তারা একই ধরনের পরিস্থিতির আসন্ন বিপদ নির্ণয় করতে পারেন । পুরনো প্রতিকার প্রয়োগ করে তারা একটি "কমিটি" গঠন করেন। তারা তাদের প্রিয় ভোটারদের ঘিরে ধরেন এবং তারা কী বলেন তা শোনেন ।

তারা সংবাদপত্রে নাক গলান এবং ধীরে ধীরে বুঝতে শুরু করেন যে জনসাধারণ কী চায় , কী প্রত্যাখ্যান করে এবং কীসের আশা করে। বিভিন্ন পেশাজীবী গোষ্ঠী, এমনকি অফিসকর্মীদেরও তাদের গভীরতম আকাঙ্ক্ষার জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখা হয় । বিরোধী পক্ষের হুমকিস্বরূপ ‘কপট স্লোগানগুলো’ হঠাৎ করেই পুনর্বিবেচনার যোগ্য বলে বিবেচিত হয় , এবং প্রায়শই এই স্লোগানগুলো, যারা প্রথম এগুলো তৈরি ও প্রচার করেছিল তাদের চরম বিস্ময়ের মধ্যে , বাস্তবে পরিণত হয়।

হঠাৎ নিরীহ হয়ে তারা নিজেদেরকে পুরনো দলগুলোর মতবাদের মধ্যে খুঁজে পায়।
তাই কমিটিগুলো পুরোনো কর্মসূচিটি পর্যালোচনা করতে এবং একটি নতুন কর্মসূচির খসড়া তৈরি করতে বৈঠকে বসে ।

এই মানুষদের জন্য বিশ্বাস পরিবর্তন করাটা ঠিক ততটাই সহজ, যতটা সহজ যুদ্ধে একজন সৈনিকের পুরোনো জামা পোকায় খেয়ে ফেললে তা বদলে ফেলা । নতুন এই কর্মসূচিতে প্রত্যেকেই যা চায়, তাই পায়। কৃষককে আশ্বাস দেওয়া হয় যে কৃষির স্বার্থ সুরক্ষিত থাকবে । শিল্পপতিকে আশ্বাস দেওয়া হয় যে তার পণ্য সুরক্ষিত থাকবে । ভোক্তাকে আশ্বাস দেওয়া হয় যে তার স্বার্থ সুরক্ষিত থাকবে ।
বাজারমূল্যের ক্ষেত্রে সুরক্ষিত থাকবে। শিক্ষক ও সরকারি কর্মচারীদের বেতন বাড়বে । বিধবা ও অনাথরা রাষ্ট্রের কাছ থেকে উদার সহায়তা পাবে । বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে।
শুল্ক কমানো হবে এবং করও, যদিও তা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করা সম্ভব নয়, তা কমানো হবে ।

Machine Translated by Google

মাঝে মাঝে এমনও হয় যে, তারা দেশের কোনো অংশের কথা ভুলে যায়, কিংবা জনগণের মধ্যে আলোচিত কোনো একটি দাবি দলের কানে পৌঁছায় না। তখন তা তড়িঘড়ি করে জুড়ে দেওয়া হয়।
শেষ পর্যন্ত তারা তাদের পাশে ছিল, যদিও তার কোনো সুযোগ ছিল না: অবশেষে তারা অনুভব করল যে , এই আশা করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, ফিলিস্তিনীয়দের সমগ্র জনতা, তাদের স্ত্রীদের সহ , তাদের ভয় শান্ত করবে এবং পুনরায় সন্তুষ্টি বিকিরণ করতে শুরু করবে । ঈশ্বরের মঙ্গলময়তার প্রতি বিশ্বাসে বলীয়ান এবং কঠিন হৃদয়ের
নির্বাচকদের মূর্খতা , তারা তথাকথিত ' রাইখের পুনর্গঠন' -এর জন্য লড়াই শুরু করতে পারে।

যখন নির্বাচন শেষ হয়ে যায় এবং সংসদ সদস্যরা আগামী পাঁচ বছরের জন্য তাঁদের শেষ জনসভা সেরে ফেলেন , যখন তাঁরা জনগণকে নিজেদের এজেন্ডা অনুযায়ী গড়ে তোলার চেষ্টা বন্ধ করে আরও মহৎ ও আনন্দদায়ক কাজে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারেন – তখন কর্মসূচি কমিটি বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং জনবিষয়াবলীর ক্রমান্বয়িক পুনর্গঠনের সংগ্রামটি আবারও তাঁদের দৈনন্দিন জীবিকা নির্বাহের বিষয়ে পরিণত হয় , যা সংসদ সদস্যদের জন্য কেবল উপস্থিত থাকারই নামান্তর।

তাঁর বেতন সংগ্রহ করা আবশ্যক । প্রতিদিন সকালে, মাননীয় সংসদ সদস্য সংসদ ভবনের দিকে রওনা হন, এবং যদিও তিনি সভাকক্ষে প্রবেশ করতে পারেন না , তিনি অন্তত সেই স্থানে পৌঁছান যেখানে তিনি হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করতে পারেন । এর অংশ হিসেবে
ভোটারদের প্রতি তাঁর কঠোর সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি সেখানে নিজের নাম নথিভুক্ত করেন এবং এর বিনিময়ে তাঁর অফুরন্ত ও ক্লান্তিকর কাজের যোগ্য পুরস্কার হিসেবে একটি সামান্য বেতন পান ।

যখন চার বছর কেটে যায়, অথবা এর মধ্যে যদি এমন কোনো সংকটপূর্ণ সপ্তাহ আসে যখন সংসদীয় পরিষদকে ভেঙে দেওয়ার হুমকির সম্মুখীন হতে হয়, তখন এই সম্মানিত ভদ্রলোকেরা হঠাৎ করেই কাজ করার এক অপ্রতিরোধ্য তাড়নায় আচ্ছন্ন হন। ঠিক যেমন একটি লার্ভা শুঁয়োপোকায় পরিণত না হয়ে পারে না , তেমনই এই সংসদীয় লার্ভাগুলোও বিদায় নেয় ।

পুতুলদের ঘর তাদের প্রিয় সমাজের মাঝে নতুন ডানা ঝাপটায়। তারা আবারও তাদের ভোটারদের উদ্দেশে ভাষণ দেয় , নিজেদের সম্পন্ন করা বিশাল কাজের বিবরণ দেয় এবং জোর দেয়...
তাদের প্রতিপক্ষের বিদ্বেষপূর্ণ একগুঁয়েমি। তারা সবসময় কৃতজ্ঞতাপূর্ণ করতালির মাধ্যমে অভ্যর্থনা পায় না ; কখনও কখনও নির্বোধ জনতা তাদের মুখের উপর অভদ্র ও অপ্রীতিকর মন্তব্য ছুঁড়ে দেয়। যখন জনসাধারণের এই অকৃতজ্ঞ মনোভাব একটি নির্দিষ্ট শিখরে পৌঁছায় , তখন পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার একটিই উপায় থাকে। দলের মর্যাদা পুনরায় উজ্জ্বল করতে হবে। কর্মসূচি পরিবর্তন করতে হবে। কমিটিকে আবার গঠন করা হয়। এবং পুরো প্রতারণাটি নতুন করে শুরু হয়। যখন আমরা আমাদের সমাজের অসীম মূর্খতা বুঝতে পারব, তখন এই ধরনের কৌশল কার্যকর প্রমাণিত হলে আমরা অবাক হব না । সংবাদপত্রের দ্বারা পরিচালিত এবং নতুন কর্মসূচির লোভনীয় রূপে অন্ধ হয়ে, বুর্জোয়া এবং সর্বহারা উভয় শ্রেণীর ভোটাররা বিশ্বস্তভাবে তাদের পুরানো জায়গায় ফিরে আসে এবং তাদের পুরানো প্রতারকদের পুনরায় নির্বাচিত করে । "জনগণের প্রার্থীরা" আবার পরিবর্তিত হতে পারে।

সংসদীয় শুঁয়োপোকায় পরিণত হবে, যা জনজীবনের বৃক্ষের পাতা খেয়ে আবার নিজেদের পুষ্ট করবে – কেবল আরও চার বছর পর পুনরায় এক ঝলমলে প্রজাপতিতে রূপান্তরিত হওয়ার জন্য ।

বাস্তবে এই প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করা এবং এই ক্রমাগত পুনরাবৃত্ত প্রতারণা দেখার চেয়ে হতাশাজনক আর কিছুই নেই । এই ধরনের আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বুর্জোয়া শক্তিগুলো মার্ক্সবাদের সংগঠিত শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জন করতে পারে না । বস্তুত, তারা বিষয়টি কখনো গুরুত্বের সাথে বিবেচনাও করেনি। যদিও শ্বেতাঙ্গ জাতির প্রতিনিধিত্বকারী এই সংসদীয় ভণ্ডদের সাধারণত দুর্বলমনা বলে মনে করা হয় , তবুও তারা এটা বোঝার মতো যথেষ্ট বিচক্ষণ যে, এমন একটি মতবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তারা পশ্চিমা গণতন্ত্রের অস্ত্র ব্যবহারের কথা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে পারে না, যে মতবাদটি পশ্চিমা গণতন্ত্রকে তার সমস্ত সরঞ্জামসহ নিজের অগ্রগতির মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে। মার্ক্সবাদীরা তাদের প্রতিপক্ষকে পঙ্গু করতে এবং নিজেদের পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য অবাধ স্বাধীনতা পেতে গণতন্ত্রকে ব্যবহার করে। যখন মার্ক্সবাদীদের একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী তাদের সমস্ত বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে সবাইকে বোঝাতে চায় যে তারা গণতন্ত্রের নীতির সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত , তখন এই বিষয়টি মনে রাখা ভালো যে, সংকটময় পরিস্থিতিতে এই ভদ্রলোকেরা পশ্চিমা গণতন্ত্রের ধারণানুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নীতির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে। এমনটাই ঘটেছিল যখন বুর্জোয়া সংসদ সদস্যরা তাঁদের চরম দূরদৃষ্টিহীনতার কারণে বিশ্বাস করতেন যে, রাইখের নিরাপত্তা নিশ্চিত ছিল।

Machine Translated by Google

তাদের পক্ষে ছিল বিপুল সংখ্যাধিক্য , এবং একদল অলস, দলত্যাগী, রাজনৈতিক সুযোগসন্ধানী ও ইহুদি শৌখিন ব্যক্তির সমর্থনে মার্ক্সবাদীরা ক্ষমতা দখল করতে দ্বিধা করেনি । এটি ছিল সেই গণতন্ত্রের প্রতি এক চরম অপমান, যেটিতে বহু সংসদ সদস্য বিশ্বাস করতেন।

বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রতিনিধিত্বকারী কেবলমাত্র নির্বোধ সংসদীয় জাদুকররাই বিশ্বাস করতে পারে যে, যাদের লক্ষ্য সারা বিশ্বে মার্ক্সবাদী মহামারী ছড়িয়ে দেওয়া—যার বাহক তারাই —তাদের পাশবিক সংকল্পকে এখন বা ভবিষ্যতে , এক মুহূর্তের জন্যও , নিয়ন্ত্রণে রাখা যেতে পারে। মার্ক্সবাদ গণতন্ত্রের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে চলবে, যতক্ষণ না এটি তার অপরাধমূলক উদ্দেশ্যের জন্য পরোক্ষভাবে তাদেরও সমর্থন আদায় করতে সফল হয় , যাদের মন জাতীয়তাবাদী এবং যাদেরকে মার্ক্সবাদ ধ্বংস করতে চায়। কিন্তু যদি মার্ক্সবাদীরা একদিন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্রের জাদুকরী কড়াই থেকে কোনো বিপদ আসতে পারে , এবং সংখ্যাধিক্যের মাধ্যমে এমন একটি আইন পাস করা হয় যা মার্ক্সবাদের বিরুদ্ধে একটি গুরুতর লড়াইয়ের সুযোগ দেবে , তাহলে এই পুরো সংসদীয় ভেলকিবাজির অবসান ঘটবে । গণতান্ত্রিক বিবেকের কাছে আবেদন করার পরিবর্তে , লাল আন্তর্জাতিকের পতাকাবাহীরা অবিলম্বে পাঠাবে...

সর্বহারা জনগণের প্রতি এক প্রচণ্ড ডাক দেওয়া হবে, এবং একটি সংগ্রাম শুরু হবে, সংসদের শান্ত পরিবেশে নয়, বরং কারখানা ও রাজপথে। তখন গণতন্ত্র নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এবং নির্বাচিত জনগণ সংসদে যা করতে ব্যর্থ হয়েছিল, তা সর্বহারার ক্ষুব্ধ জনগণের শাবল ও হাতুড়ি দিয়ে কার্যকরভাবে সম্পন্ন করা হবে —যেমনটা ঘটেছিল ১৯১৮ সালের শরৎকালে। তারা অবিলম্বে বুর্জোয়া বিশ্বকে জাগিয়ে তুলবে, যারা এই ধারণার মূর্খতা উপলব্ধি করবে যে, পশ্চিমা গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইহুদিদের বিশ্বজয়ের আকাঙ্ক্ষাকে কার্যকরভাবে প্রতিহত করা সম্ভব ।

আমি আগেই যেমন বলেছি, কেবল একজন অত্যন্ত নির্বোধ ব্যক্তিই খেলার নিয়ম মেনে চলার কথা ভাববে , যখন সে এমন একজন খেলোয়াড়ের মুখোমুখি হয় যার কাছে সেই নিয়মগুলো নিছকই একটি ধাপ্পাবাজি বা নিজের স্বার্থসিদ্ধির উপায় , যার অর্থ হলো, যখনই সেগুলো অকেজো হয়ে পড়বে, সে যেকোনো মুহূর্তে সেগুলো বাতিল করে দিতে পারে ।

তথাকথিত বুর্জোয়া নীতিতে বিশ্বাসী সকল দলই রাজনৈতিক জীবনকে সংসদে আসন লাভের সংগ্রাম হিসেবে দেখে । এই সংগ্রামে যখনই তাদের নীতি ও বিশ্বাস অকেজো হয়ে পড়ে, তখনই সেগুলোকে অপ্রয়োজনীয় ভারের মতো ছুড়ে ফেলা হয়। এই কাজটি সহজ করার জন্যই কর্মসূচি তৈরি করা হয় । কিন্তু এই চর্চা ফলস্বরূপ দলগুলোর ক্ষমতাকে দুর্বল করে দেয় । ব্যাপক জনগণকে আকর্ষণ করার মতো সেই চৌম্বকীয় শক্তির অভাব তাদের রয়েছে; কারণ এই জনগণ সর্বদা উপস্থাপিত আদর্শের প্রতি অটল বিশ্বাস এবং সেগুলোর জন্য লড়াই ও রক্ষার অদম্য শক্তির সমন্বয়ে সৃষ্ট অপ্রতিরোধ্য শক্তির প্রতি সাড়া দেয়।

যখন এক পক্ষ, জীবনের একটি সুসংবদ্ধ ধারণা থেকে উদ্ভূত লড়াইয়ের শক্তিতে সজ্জিত হয়ে — যদিও তা হাজার গুণ দস্যুসুলভ হয়—প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায়, তখন অপর পক্ষ প্রতিরোধ করতে পারে যদি তারা একটি নতুন বিশ্বাস থেকে শক্তি সঞ্চয় করে , যা আমাদের ক্ষেত্রে একটি রাজনৈতিক বিশ্বাস। এই বিশ্বাসকে অবশ্যই আত্মরক্ষার দুর্বল ও কাপুরুষোচিত আদেশকে প্রতিস্থাপন করতে হবে। এর পরিবর্তে, আমাদের অবশ্যই ক্রমাগত একটি সাহসী ও নির্মম আক্রমণের আহ্বান জানাতে হবে । বর্তমানে, আমাদের আন্দোলনকে , বিশেষ করে তথাকথিত জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া মন্ত্রীদের দ্বারা—উদাহরণস্বরূপ, কেন্দ্রের বাভারিয়ান প্রতিনিধিদের দ্বারা—বিপ্লবের চেষ্টা করার জন্য অভিযুক্ত করা হচ্ছে। এই রাজনৈতিক বামনদের জন্য আমাদের একটিই উত্তর আছে । আমরা তাদের বলি: আমরা চেষ্টা করছি।

যা তুমি তোমার অপরাধমূলক মূর্খতায় করতে ব্যর্থ হয়েছ, তা সম্পন্ন করতে । তোমার সংসদীয় প্রলাপের মাধ্যমে তুমি জাতিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে আসতে সাহায্য করেছ। কিন্তু আমরা, আমাদের আগ্রাসী নীতির মাধ্যমে, একটি নতুন বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা করছি , যা আমরা অটল নিষ্ঠার সাথে রক্ষা করব। এইভাবে, আমরা এমন পদক্ষেপ তৈরি করছি যার মাধ্যমে জাতি আবারও স্বাধীনতার মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবে ।

আমাদের আন্দোলন গড়ে তোলার প্রাথমিক পর্যায়ে আমাদের বিশেষ মনোযোগ দিতে হয়েছিল।
যেন একটি নতুন ও মহৎ রাজনৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামরত আমাদের সংগ্রামী গোষ্ঠীটি সংসদীয় স্বার্থ প্রচারকারী সমাজে অধঃপতিত না হয়।

Machine Translated by Google

এর মোকাবিলা করার প্রথম পদক্ষেপ ছিল এমন একটি কর্মসূচি তৈরি করা, যা এক বিশেষ নৈতিক মহত্ত্ব বিকাশের চেষ্টা করবে এবং আমাদের বর্তমান রাজনীতিবিদদের অধিকাংশই যে ক্ষুদ্র ও দুর্বল প্রকৃতির, তাদের নিরুৎসাহিত করবে ।

যেসব মারাত্মক ভুলের কারণে শেষ পর্যন্ত জার্মানির পতন ঘটেছিল, সেগুলোই সুস্পষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত কর্মসূচির লক্ষ্য নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তার ধারণাটি যে কতটা সঠিক ছিল, তার সর্বোত্তম প্রমাণ ।

উপরে উল্লিখিত ভুলগুলোর সাথে পরিচিত হওয়ার পর আমরা বুঝতে পেরেছি যে , রাষ্ট্রের একটি নতুন ধারণা তৈরি করা প্রয়োজন , যা আমাদের জীবনের সাধারণ নতুন ধারণার অংশ হয়ে উঠবে।

* * *

এই বইয়ের প্রথম খণ্ডে আমি ইতিমধ্যেই 'জাতীয়' (volkisch) শব্দটি নিয়ে আলোচনা করেছি এবং তখন বলেছিলাম যে, একটি সংহত সংগ্রামী সম্প্রদায় গঠনের কেন্দ্রবিন্দু হওয়ার মতো যথেষ্ট সুনির্দিষ্ট অর্থ এই শব্দটির নেই । এখন নানা ধরনের মানুষ, নানা রকম ভিন্ন ভিন্ন মতামত নিয়ে, তাদের ব্যানারে 'জাতীয়' শব্দটি নিয়ে শোভাযাত্রা করে। এনএসডিএপি-র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা শুরু করার আগে, আমি 'জাতীয়তা' ধারণাটির অর্থ কী তা স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করতে এবং আমাদের আন্দোলনের সাথে এর সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে চাই।

'জাতীয়' শব্দটি কোনো সুস্পষ্ট ধারণা প্রকাশ করে না। এটিকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা যায় এবং বাস্তব ব্যবহারে এটি 'ধর্মীয়' শব্দটির মতোই সাধারণ। তাত্ত্বিক ধারণা হিসেবে কিংবা বাস্তব জীবনের পথনির্দেশক নীতি হিসেবে , এই শেষোক্ত শব্দটির কোনো সুনির্দিষ্ট অর্থ দেওয়া কঠিন । 'ধর্মীয়' শব্দটি তখনই একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ লাভ করে, যখন এটিকে একটি স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট রূপের সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

এই ধারণাটি বাস্তবে প্রয়োগ করা । কাউকে "গভীরভাবে ধার্মিক" বলা হতে পারে
সুন্দর শব্দচয়ন; কিন্তু সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি আমাদের খুব সামান্যই বা কিছুই জানায় না। সম্ভবত তারা
এমন মানুষ আছেন যারা এই ধরনের অস্পষ্ট বর্ণনাতেই সন্তুষ্ট হবেন , এবং এমনও হতে পারে যে , এই শব্দগুলো বর্ণিত ব্যক্তিটির ভেতরের গুণাবলীর একটি কমবেশি সুনির্দিষ্ট চিত্র তুলে ধরে। কিন্তু যেহেতু দেশের সাধারণ মানুষ দার্শনিক বা সাধুদের নিয়ে গঠিত নয়, তাই এই ধরনের অস্পষ্ট ধর্মীয় ধারণা তাদের কাছে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব প্রবণতা অনুসারে চিন্তা ও কাজ করার ন্যায্যতা প্রতিপাদন করা ছাড়া আর কিছুই বোঝায় না । এটি ব্যবহারিক বিশ্বাসের দিকে পরিচালিত করবে না, যে বিশ্বাসে ভেতরের ধর্মীয় আকাঙ্ক্ষা কেবল তখনই রূপান্তরিত হয় যখন তা সাধারণ অধিবিদ্যামূলক ধারণার জগৎ ছেড়ে একটি নির্দিষ্ট মতবাদমূলক প্রত্যয়ে রূপ নেয় । এই ধরনের প্রত্যয় নিজে কোনো লক্ষ্য নয়, বরং লক্ষ্য অর্জনের একটি উপায়। তবে, এটি এমন একটি উপায় যা ছাড়া লক্ষ্যটি আদৌ অর্জন করা সম্ভব নয় । এই লক্ষ্যটি কিন্তু শুধু কোনো আদর্শিক বিষয় নয় ; এর গভীরে রয়েছে এমন কিছু।

অত্যন্ত বাস্তবসম্মত। আমাদের সর্বদা এই বিষয়টি মনে রাখতে হবে যে, সাধারণভাবে বলতে গেলে, সর্বোচ্চ আদর্শগুলো সবসময়ই কোনো গভীর মৌলিক প্রয়োজনের ফল ; ঠিক যেমন সবচেয়ে পরিশীলিত সৌন্দর্যের রূপগত মহত্ত্বের কারণ হলো এই যে, সবচেয়ে সুন্দর রূপটি হলো সেই রূপ যা তার উদ্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ।

মানুষকে নিছক পশুত্বের স্তর থেকে উপরে উঠতে সাহায্য করার মাধ্যমে , নিয়তি তাকে আত্মশক্তিতে শক্তিশালী হতে এবং তার অস্তিত্বকে সুরক্ষিত করতে সহায়তা করে। মানবতাকে বিবেচনা করে
বর্তমানে বিদ্যমান এবং এর দ্বারা প্রচারিত ধর্মীয় বিশ্বাসগুলো বিবেচনা করে , যেগুলো হলো
আমাদের শিক্ষাজীবন জুড়ে এই শিক্ষাগুলোকে এমনভাবে দৃঢ় করা হয়, যাতে সেগুলো বাস্তব জীবনে নৈতিক মানদণ্ড হিসেবে কাজ করে । এর থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, যদি আমরা ধর্মীয় শিক্ষা বিলুপ্ত করে দিই এবং তার পরিবর্তে সমমূল্যের কোনো মূল্যবান কিছু স্থাপন না করি , তবে তার ফল হবে এই যে, মানব অস্তিত্ব তার একেবারে ভিত্তি পর্যন্ত নড়বড়ে হয়ে যাবে। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মানুষ কেবল উচ্চতর আদর্শের সেবা করার জন্যই বেঁচে থাকে না , বরং এই আদর্শগুলোই ঘুরেফিরে মানুষ হিসেবে তার অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তগুলো সরবরাহ করে। আর এভাবেই চক্রটি সম্পূর্ণ হয়।

অবশ্যই, 'ধর্মীয়' শব্দটি কিছু মৌলিক ধারণা ও বিশ্বাসকে বোঝায়। এর মধ্যে রয়েছে আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস, অনন্তকালে এর ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব এবং বিশ্বাস ।
উচ্চতর সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস , ইত্যাদি। কিন্তু এই সমস্ত ধারণা, একজন ব্যক্তি যতই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করুক না কেন,

Machine Translated by Google

এগুলোতে বিশ্বাসকে প্রত্যেক ব্যক্তি সমালোচনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারে এবং গ্রহণ বা বর্জন করতে পারে , যতক্ষণ না সেই আবেগগত ধারণা বা আকাঙ্ক্ষা একটি সুস্পষ্ট মতবাদ দ্বারা পরিচালিত বিশ্বাসে রূপান্তরিত হয় । এই ধরনের বিশ্বাস ধর্মীয় অনুভূতি প্রকাশের জন্য একটি বাস্তব পথ খুলে দেয় এবং এর ফলে এর ব্যবহারিক প্রয়োগের পথ উন্মুক্ত হয় ।

এইটা।

সুস্পষ্ট বিশ্বাস ছাড়া ধর্মীয় অনুভূতিগুলো মানব অস্তিত্বের জন্য শুধু মূল্যহীনই হবে না, বরং এর অস্পষ্টতা ও প্রবণতার বৈচিত্র্যের কারণে তা সার্বিক বিশৃঙ্খলার কারণও হতে পারে।

'ধর্মীয়' শব্দটি সম্পর্কে আমি যা বলেছি, তা 'জাতীয়' শব্দটির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। এই শব্দটিও কিছু মৌলিক ধারণাকে ব্যক্ত করে। যদিও এই ধারণাগুলো নিঃসন্দেহে
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এগুলো এমন অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট রূপ ধারণ করে যে, কোনো রাজনৈতিক দলের কাঠামোর অংশ না হওয়া পর্যন্ত সেগুলোকে নিছক মতামতের চেয়ে বেশি মূল্যবান বলে গণ্য করা যায় না। একটি বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি থেকে উদ্ভূত আদর্শকে বাস্তব রূপ দিতে এবং সেই আদর্শের যৌক্তিক পরিণতিস্বরূপ উদ্ভূত দাবিগুলোর প্রতি সাড়া দিতে নিছক অনুভূতি ও অন্তরের আকুতি যথেষ্ট নয় , ঠিক যেমন স্বাধীনতার জন্য সার্বজনীন আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে তা অর্জন করা যায় না । না। কেবল তখনই জাতির জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা এক শক্তিশালী বাস্তবে রূপান্তরিত হতে পারে , যখন স্বাধীনতার আদর্শিক আকাঙ্ক্ষাকে এমনভাবে সংগঠিত করা হয় যা সামরিক শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এই আদর্শের জন্য লড়াইয়ের সুযোগ করে দেয় ।

কোনো বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি, তা মানবজাতির জন্য যতই সত্য ও উপকারী হোক না কেন, জাতিকে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে তার কোনো বাস্তব তাৎপর্য থাকবে না, যদি না তা কোনো সংগ্রামী আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। এই আন্দোলনও, ফলস্বরূপ, কেবল একটি দল হিসেবেই থেকে যাবে, যতক্ষণ না তা তার আদর্শের বিজয় অর্জন করে এবং তার মতবাদকে রাষ্ট্রের নতুন ভিত্তিমূলে রূপান্তরিত করে, যা পরিশেষে জাতীয় সমাজকে রূপ দেবে।

ভবিষ্যৎ উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে যদি কোনো সাধারণ বিমূর্ত ধারণাকে কাজ করতে হয় , তবে তার প্রথম পূর্বশর্ত হলো এই ধারণার প্রকৃতি ও পরিধি সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট বোধ তৈরি করা। কেবল এমন ভিত্তির উপরেই একটি আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব , যা তার নীতি ও বিশ্বাসের অভ্যন্তরীণ সংগতি থেকে সংগ্রামের শক্তি আহরণ করতে পারে । একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি অবশ্যই সাধারণ ধারণা থেকে নির্মিত হতে হবে , এবং সাধারণ বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্বাস দ্বারা চিহ্নিত হতে হবে । যেহেতু এই বিশ্বাসকে বাস্তবতার জগতে অর্জনযোগ্য লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করতে হবে , তাই একে কেবল সাধারণ আদর্শেরই সেবা করলে চলবে না , বরং সেই আদর্শের বিজয়ের জন্য যে উপায়গুলো অবলম্বন করতে হবে , সেগুলোকেও বিবেচনায় রাখতে হবে। এক্ষেত্রে, রাষ্ট্রনায়কের বাস্তব প্রজ্ঞাকে অবশ্যই সেই বিমূর্ত ধারণাকে সহায়তা করতে হবে, যা আদতে সঠিক। এইভাবে, শাশ্বত আদর্শ, যা মানবজাতির জন্য পথপ্রদর্শক নক্ষত্র হিসেবে অমর তাৎপর্য বহন করে, তাকে অবশ্যই মানবিক দুর্বলতার প্রয়োজনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হবে, যাতে সমগ্র মানবজাতির সাধারণ ত্রুটিগুলোর কারণে এর বাস্তব প্রভাব শুরু থেকেই অকার্যকর হয়ে না যায়। সত্যের প্রচারককে অবশ্যই জাতির আত্মা সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞানসম্পন্ন এমন ব্যক্তির সাথে হাতে হাত মিলিয়ে চলতে হবে, যাতে শাশ্বত সত্য ও আদর্শের পরিধি থেকে মানব প্রকৃতির সামর্থ্যের সঙ্গে যা সবচেয়ে উপযুক্ত তা নির্বাচন করা যায় এবং তা প্রদান করা যায়।

বাস্তব রূপ। সত্যের দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি থেকে উদ্ভূত বিমূর্ত ও সাধারণ নীতিসমূহকে গ্রহণ করে সেগুলোকে এমন এক সংগ্রামী সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত করা, যার সদস্যরা একই রাজনৈতিক বিশ্বাস ধারণ করে — এক মন ও এক ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন একটি সুনির্দিষ্ট , কঠোরভাবে সংগঠিত সম্প্রদায় —এই ধরনের রূপান্তরই হলো সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ; ধারণাগুলোকে কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের সম্ভাবনা এই কাজটি সফলভাবে সম্পন্ন করার উপরই নির্ভর করে। লক্ষ লক্ষ মানুষের সেই বাহিনী থেকে, যারা এই ধারণাগুলোর মধ্যে সত্যতা অনুভব করে , এমনকি কিছুটা বোঝেও, একজন মানুষের উত্থান হতে হবে। এই মানুষটির মধ্যে সাধারণ ধারণাগুলোকে একটি স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট রূপে ঘোষণা করার ক্ষমতা থাকতে হবে, এবং জনসাধারণের মনের সামনে ভেসে ওঠা অস্পষ্ট ধারণার জগৎ থেকে তাকে এমন নীতি প্রণয়ন করতে হবে যা গ্রানাইট পাথরের মতো স্বচ্ছ ও শক্তিশালী। তাকে এই নীতিগুলোর জন্য একমাত্র সত্য হিসেবে লড়াই করতে হবে , যতক্ষণ না বিভিন্ন ধারণার উত্তাল তরঙ্গ থেকে সাধারণ বিশ্বাস ও সাধারণ ইচ্ছার কঠিন শিলা জেগে ওঠে ।

Machine Translated by Google

প্রয়োজনের তাগিদেই কাজটি ন্যায্য হয় এবং ব্যক্তি তার সাফল্যের দ্বারা ন্যায্য বলে বিবেচিত হবে।

* * *

যদি আমরা 'জাতীয়' শব্দটির অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন করার চেষ্টা করি, তাহলে আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হব: বিশ্বের বর্তমান রাজনৈতিক ধারণাটি এমন

যে , রাষ্ট্রের একটি সৃজনশীল ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও...
সভ্যতা গড়ার সক্ষমতাসম্পন্ন একটি শক্তি হিসেবে রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে জাতিগত ধারণার কোনো সম্পর্ক নেই । বরং রাষ্ট্রকে অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা থেকে উদ্ভূত কিছু, অথবা বড়জোর রাজনৈতিক শক্তি ও প্রবৃত্তির ক্রিয়াকলাপের স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। রাষ্ট্রের ভিত্তি সম্পর্কে এই ধরনের ধারণা, তার সমস্ত যৌক্তিক পরিণতিসহ, কেবল রাষ্ট্রের অন্তর্নিহিত আদি জাতিগত শক্তিগুলোকেই উপেক্ষা করে না, বরং এমন এক রাজনীতির জন্ম দেয় যেখানে ব্যক্তির গুরুত্ব হ্রাস পায়। যদি আমরা অস্বীকার করি যে সংস্কৃতি সৃষ্টির ক্ষমতায় জাতিগুলোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে , তবে একই ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের মূল্যায়নকেও প্রভাবিত করবে ।

ব্যক্তিরা। সকল জাতি সমান— এই ধারণাটি রাষ্ট্র ও ব্যক্তিকেও সমান বলে ধরে নেয় । আন্তর্জাতিক মার্কসবাদ হলো ইহুদি কার্ল মার্কস কর্তৃক একটি বিশেষ রাজনৈতিক বিশ্বাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জীবনের একটি সাধারণ ধারণার প্রয়োগ ছাড়া আর কিছুই নয় ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সাধারণ ধারণাটি কার্ল মার্কসের অনেক আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল।

যদি এটি আগে থেকেই একটি ব্যাপক সংক্রামক ব্যাধি হিসেবে বিদ্যমান না থাকত , তবে মার্ক্সবাদী মতবাদের বিস্ময়কর রাজনৈতিক অগ্রগতি কখনোই সম্ভব হতো না । প্রকৃতপক্ষে, যা কার্ল মার্ক্সকে অন্য লক্ষ লক্ষ মানুষের থেকে আলাদা করেছিল তা হলো, ইতিমধ্যেই ক্রমিক অবক্ষয়ের দিকে ধাবমান এক বিশ্বে তিনি দূরদৃষ্টির মাধ্যমে অপরিহার্য বিষগুলো শনাক্ত করেছিলেন, তারপর সেগুলোকে পৃথক ও ঘনীভূত করে এমন এক মিশ্রণ তৈরি করেছিলেন যা বিশ্বের স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর দ্রুত ধ্বংস ডেকে আনবে । কিন্তু তিনি এই সবকিছুই করেছিলেন তাঁর জাতির সেবায় ।

সুতরাং , মার্ক্সবাদী মতবাদ হলো আজকের জীবন সম্পর্কে সাধারণ ধারণার অন্তর্নিহিত মানসিকতার এক ঘনীভূত নির্যাস । এই কারণে, এটা বিশ্বাস করা অর্থহীন, এমনকি হাস্যকর যে, আমরা যাকে বুর্জোয়া বিশ্ব বলি, তা নতুন কিছু শুরু করতে সক্ষম।

মার্ক্সবাদের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর সংগ্রাম সম্ভব নয়, কারণ এই বুর্জোয়া বিশ্বও একই বিষে পরিব্যাপ্ত , এবং জীবন সম্পর্কে এর সাধারণ ধারণা মার্ক্সবাদ থেকে কেবল সামান্য পরিমাণে ও এর অনুসারীদের বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ভিন্ন । বুর্জোয়া বিশ্ব মার্ক্সবাদী, কিন্তু তারা এই সম্ভাবনায় বিশ্বাস করে যে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী— বুর্জোয়া শ্রেণি— বিশ্বশক্তি অর্জন করতে পারে , যেখানে মার্ক্সবাদ সুপরিকল্পিতভাবে বিশ্বকে ইহুদিদের হাতে তুলে দেওয়ার লক্ষ্য রাখে।

এই সবকিছু সত্ত্বেও, বিশ্বের "জাতীয়" ধারণাটি স্বীকার করে যে মানবজাতির জন্য আদি জাতিগত উপাদানগুলোই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। নীতিগতভাবে, রাষ্ট্রকে শুধুমাত্র একটি লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয় , এবং এই লক্ষ্যটি হলো মানবজাতির জাতিগত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা। অতএব , "জাতীয়" নীতির ভিত্তিতে , আমরা স্বীকার করতে পারি না যে এক জাতি অন্য জাতির সমান।

অন্যদিকে, "জাতীয়তাবাদী" ধারণাটি মানবতাকে উত্তম ও নিকৃষ্ট বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জাতিতে বিভক্ত করে। এই স্বীকৃতির ভিত্তিতে, এটি মহাবিশ্বকে নিয়ন্ত্রণকারী শাশ্বত ইচ্ছার সাথে একমত পোষণ করে, যা উত্তম ও শক্তিশালীর বিজয় এবং নিকৃষ্ট ও দুর্বলের অধীনতা দাবি করে। এবং এইভাবে এটি এই সত্যকে সম্মান জানায় যে, প্রকৃতির সমস্ত কার্যকলাপের অন্তর্নিহিত এই নীতিটি প্রতিটি জীবকে প্রভাবিত করে । এটি জনসমষ্টি থেকে মূল্যবান ব্যক্তিদের নির্বাচন করে এবং এইভাবে একটি সংগঠক নীতি হিসাবে কাজ করে, যেখানে মার্কসবাদ একটি ধ্বংসাত্মক দ্রাবক হিসাবে কাজ করে। "জাতীয়তাবাদী" বিশ্বাস মনে করে যে মানবতার নিজস্ব আদর্শ থাকা আবশ্যক, কারণ আদর্শ হলো মানব অস্তিত্বের অপরিহার্য শর্ত। কিন্তু অন্যদিকে, এটি এই ধারণাকে অস্বীকার করে যে, কোনো নৈতিক আদর্শের প্রাধান্য পাওয়ার অধিকার আছে, যদি তা এমন একটি জাতির অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ফেলে, যারা উচ্চতর নৈতিক আদর্শের ধারক। সংকর ও কৃষ্ণাঙ্গদের দ্বারা গঠিত একটি বিশ্বে , মানব সৌন্দর্য ও মহত্ত্বের সমস্ত আদর্শ এবং মানবতার জন্য একটি আদর্শ ভবিষ্যতের সমস্ত আশা অপূরণীয়ভাবে হারিয়ে যাবে ।

Machine Translated by Google

এই গ্রহে মানব সংস্কৃতি ও সভ্যতা উপস্থিতির সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ।
আর্য। যদি তাকে নির্মূল বা পরাধীন করা হয়, তবে পৃথিবী অন্ধকারে ছেয়ে যাবে ।
নতুন বর্বর যুগ।

যারা বিশ্বাস করে যে জাতীয় আদর্শই মানব অস্তিত্বের ভিত্তি, তাদের দৃষ্টিতে মানব সংস্কৃতির স্রষ্টা ও রক্ষকদের ধ্বংস করে এর অস্তিত্বকেই ক্ষুণ্ণ করা একটি জঘন্য অপরাধ। সৃষ্টিকুলের মাঝে ঈশ্বরের এই শ্রেষ্ঠ প্রতিচ্ছবির বিরুদ্ধে যে - ই ধর্মদ্রোহী হাত তোলার দুঃসাহস দেখাবে, সে এই অলৌকিক সৃষ্টির দাতা স্রষ্টার বিরুদ্ধে পাপ করবে এবং জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হবে ।

এই দিক থেকে , বিশ্ব সম্পর্কে জাতীয় ধারণা প্রকৃতির ইচ্ছার সঙ্গে গভীরভাবে সঙ্গতিপূর্ণ ; কারণ এটি সেই শক্তিগুলোকে কর্মক্ষমতা ফিরিয়ে দেয়, যা মানবজাতিকে ধারাবাহিক শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে এক উন্নততর রূপে উন্নীত করবে, যতক্ষণ না অবশেষে মানবজাতির শ্রেষ্ঠ অংশ পৃথিবীর অধিকারী হবে এবং সারা বিশ্বের প্রতিটি ক্ষেত্রে কাজ করতে সক্ষম হবে , এমনকি লক্ষ্যে পৌঁছাতেও পারবে।
পৃথিবীর বাইরে অবস্থিত গোলকসমূহ ।

আমরা সকলেই বিশ্বাস করি যে সুদূর ভবিষ্যতে মানবজাতিকে এমন সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে , যা কেবল এক উন্নততর মানব জাতিই সমাধান করতে পারবে ।
অন্য সকল জাতির উপর শাসন করার জন্য নির্ধারিত , যার হাতে থাকবে সমগ্র বিশ্বের উপায় ও সম্পদ।

* * *

এটা স্পষ্ট যে, বিশ্ব সম্পর্কে একটি জাতীয় ধারণার সাথে সম্পর্কিত এমন একটি সাধারণ রূপরেখাকে সহজেই হাজারো ভিন্ন উপায়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে । বস্তুত, আমাদের বর্তমান প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক আন্দোলনই কোনো না কোনো পর্যায়ে এই বিশ্ব ধারণার উল্লেখ করে । কিন্তু অন্য সবকিছুর বিপরীতে এই বিশ্ব ধারণাটি যে এখনও একটি স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রেখেছে, তা প্রমাণ করে যে বিশ্বকে দেখার ক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুতরাং , সর্বোচ্চ কর্তৃত্বসম্পন্ন একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন দ্বারা পরিচালিত মার্ক্সবাদী ধারণার প্রতিপক্ষ হলো বিভিন্ন মতামতের এক জগাখিচুড়ি, যা প্রতিপক্ষের শক্তিশালী বাহিনীর তুলনায় নগণ্য বলে মনে হয়। এমন দুর্বল অস্ত্র দিয়ে জয়লাভ করা অসম্ভব । একমাত্র তখনই এক শিবিরের সংগ্রামের শক্তি সমান ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে অন্য শিবিরের সাথে মিলিত হতে পারবে ; এবং বিজয় হবে শাশ্বত সত্যের পক্ষে।

কিন্তু জীবনের কোনো সাধারণ ধারণা ততক্ষণ পর্যন্ত মূর্ত হতে পারে না , যতক্ষণ না তা সুনির্দিষ্ট ও চূড়ান্তভাবে প্রণীত হয়। ধর্মীয় বিশ্বাসে গোঁড়া মতবাদের ভূমিকা, একটি নির্মাণাধীন রাজনৈতিক দলের দলীয় নীতির ভূমিকার অনুরূপ। অতএব, জীবনের একটি জাতীয় ধারণার উপর ভিত্তি করে এমন একটি হাতিয়ার গড়ে তোলা প্রয়োজন, যা এই আদর্শের জন্য লড়াই করতে ব্যবহৃত হতে পারে; ঠিক যেমন মার্ক্সবাদী দল আন্তর্জাতিকতাবাদের পথ প্রশস্ত করে।

আর এটাই সেই লক্ষ্য যার জন্য জাতীয় সমাজতান্ত্রিক জার্মান শ্রমিক দল সচেষ্ট থাকে ।

সুতরাং, জাতীয় ধারণাটিকে সুস্পষ্টভাবে প্রণয়ন করতে হবে , যাতে তা দলের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে একীভূত হতে পারে। এই ধারণাটির সাফল্যের জন্য এটি একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত। এবং যারা এর বিরোধিতা করে, তাদের পরোক্ষ সমর্থনের মাধ্যমেই বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।
জাতীয় আদর্শের সঙ্গে দলীয় নীতির সমন্বয়। সেই একই মানুষ যারা কখনো ক্লান্ত হয় না।
এই কথা ক্রমাগত জোর দিয়ে বলার মাধ্যমে যে, জাতীয় আদর্শের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা জীবনদর্শন কখনোই কোনো একটি গোষ্ঠীর একচেটিয়া সম্পত্তি হতে পারে না, কারণ তা অগণিত হৃদয়ে সুপ্ত বা "জীবিত" থাকে, তারা তাদের নিজেদের বক্তব্যের মাধ্যমেই কেবল এটাই প্রমাণ করে যে , লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে এই ধারণাগুলোর সাধারণ উপস্থিতি শ্রেণী- সংগ্রামের নীতিকে কেন্দ্র করে সংগঠিত একটি রাজনৈতিক দল দ্বারা ঘোষিত বিরোধী মতাদর্শের বিজয়কে ঠেকানোর জন্য যথেষ্ট প্রমাণিত হয়নি । যদি তা না হতো, তাহলে জার্মান জাতি ইতিমধ্যেই এক বিরাট বিজয় অর্জন করত এবং অতল গহ্বরের দ্বারপ্রান্তে থাকত না । আন্তর্জাতিক মতাদর্শ সফল হয়েছে কারণ এটি

Machine Translated by Google

একটি সংগ্রামী রাজনৈতিক দলে সংগঠিত , সর্বদা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত। যদি এখন পর্যন্ত আন্তর্জাতিকতাবাদী ধারণার বিরোধী মতাদর্শগুলোকে এর সামনে পিছু হটতে হয়ে থাকে , তার কারণ হলো তাদের পক্ষে লড়াই করার জন্য কোনো ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট ছিল না। যে মতবাদ একটি নির্দিষ্ট বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে, তা তার সাধারণ শিক্ষার যথেচ্ছ ব্যাখ্যার সুযোগ দিয়ে লড়াই করে জিততে পারে না , বরং কেবল সেই শিক্ষাকে কিছু নির্দিষ্ট গোঁড়ামতে সংজ্ঞায়িত করার মাধ্যমেই তা সম্ভব, যা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে এবং সেগুলোকে একটি রাজনৈতিক সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমেই তা সম্ভব।

তাই আমি সেই সুবিশাল কিন্তু অস্পষ্ট সাধারণ বিশ্বদৃষ্টি থেকে মূল ধারণাগুলো আহরণ করে সেগুলোকে কমবেশি একটি মতবাদমূলক রূপ দেওয়াকে আমার বিশেষ কর্তব্য বলে মনে করেছিলাম ।
এদের সুনির্দিষ্টতা এবং সুস্পষ্ট অর্থের কারণে , এই ধারণাগুলো সেই সমস্ত মানুষকে একটি অভিন্ন ফ্রন্টে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব করে তোলে , যারা এই নীতিগুলো গ্রহণ করতে প্রস্তুত ।
অন্য কথায়: জাতীয় সমাজতান্ত্রিক জার্মান শ্রমিক দল জাতীয় ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা বিশ্বের একটি সাধারণ ধারণা থেকে মূল নীতিসমূহ আহরণ করে। এই নীতিগুলির উপর ভিত্তি করে , এটি এমন একটি রাজনৈতিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা করে যা আমাদের সময়ের বাস্তব পরিস্থিতি , তার প্রকৃতি, উপলব্ধ মানব সম্পদ এবং তার সমস্ত সীমাবদ্ধতাকে বিবেচনায় রাখে । এই রাজনৈতিক মতবাদ জনগণের বিশাল জনতাকে যথাসম্ভব কঠোরভাবে নির্মিত একটি সংগঠনে একত্রিত করা সম্ভব করে তোলে ।
এই আদর্শের চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য এরূপ সংগঠনই প্রধান পূর্বশর্ত ।

Machine Translated by Google

অধ্যায় ২

দেশ

১৯২০-১৯২১ সাল থেকেই , নারীসুলভ বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কিছু মহল আমাদের আন্দোলনকে আধুনিক রাষ্ট্রের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব গ্রহণের জন্য ক্রমাগত অভিযুক্ত করে আসছিল। এই কারণে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের এক বিচিত্র দল, যারা বিভিন্ন রাজনৈতিক মতামতের এক ভিন্নধর্মী সংমিশ্রণের প্রতিনিধিত্ব করত , তারা এই নবীন আন্দোলনের মুখপাত্রদের থামানোর জন্য সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করার অধিকার নিজেদের আছে বলে মনে করত, যে আন্দোলনটি একটি নতুন রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার করছিল । আমাদের বিরোধীরা ইচ্ছাকৃতভাবে এই সত্যটি উপেক্ষা করেছিল যে , রাষ্ট্র বলতে আসলে কী বোঝায় সে বিষয়ে বুর্জোয়া শ্রেণীর নিজেদেরই কোনো ঐক্যবদ্ধ মতামত ছিল না এবং বুর্জোয়াদের কাছে এই প্রতিষ্ঠানটির কোনো সুসংগত সংজ্ঞা ছিল না, এবং থাকতেও পারত না। যাদের ছিল

রাষ্ট্র বলতে আমরা কী বুঝি তা ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব তাদের উপর বর্তায় ; তারা রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে, সাধারণত সাংবিধানিক আইন বিভাগে, পদাধিকারী হন এবং এই বিশেষ ধরনের রাষ্ট্রের কমবেশি সুখী অস্তিত্বের জন্য ব্যাখ্যা ও ন্যায্যতা খুঁজে বের করাকে তাদের সর্বোচ্চ কর্তব্য বলে মনে করেন , যা তাদের দৈনন্দিন আহারের জোগান দেয়। রাষ্ট্রের রূপ যত বেশি অযৌক্তিক হয় , তার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার জন্য যে সংজ্ঞাগুলো দেওয়া হয় , সেগুলোও তত বেশি অস্পষ্ট, কৃত্রিম এবং দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে । উদাহরণস্বরূপ, একটি ইম্পেরিয়াল-রয়্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক এমন একটি দেশের রাষ্ট্রের অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে কী-ই বা লিখতে পারেন, যে দেশের রাষ্ট্রের রূপটি ছিল বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় দানবীয় রূপ ? এটা সত্যিই হবে

এটি একটি কঠিন কাজ, কারণ আজকের সাংবিধানিক আইনের অধ্যাপক সত্যের সেবা করার জন্য ততটা দায়বদ্ধ নন, বরং একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনে দায়বদ্ধ । আর সেই উদ্দেশ্যটি হলো, যেকোনো মূল্যে এই দানবীয় ব্যবস্থাটিকে রক্ষা করা, যাকে আমরা এখন রাষ্ট্র বলি।
এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে , রাষ্ট্রের সমস্যা নিয়ে আলোচনায় যথাসম্ভব সুনির্দিষ্ট বিষয় এড়িয়ে যাওয়া হয় এবং অধ্যাপকেরা "নৈতিক" ও "আদর্শগত" হিসেবে বর্ণিত বিমূর্ত মূল্যবোধ , কর্তব্য ও লক্ষ্যের চোরাবালিতে লুকিয়ে থাকার কৌশল অবলম্বন করেন।

মোটামুটিভাবে, এই তাত্ত্বিকদের তিনটি দলে ভাগ করা যায়:

১. যারা মনে করেন যে, রাষ্ট্র হলো মানুষের কমবেশি স্বেচ্ছামূলক একটি সংঘ, যারা কোনো কর্তৃপক্ষের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে এবং তার অধীন থাকতে সম্মতি দিয়েছে।

সংখ্যাগতভাবে এটিই বৃহত্তম গোষ্ঠী। এর মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা বর্তমানে আইনগত কর্তৃত্বের নীতিকে পূজা করে। তাদের চোখে, এই পুরো বিষয়ে জনগণের ইচ্ছার কোনো গুরুত্ব নেই । তাদের কাছে, রাষ্ট্রের অস্তিত্বই একে পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয় বলে বিবেচনা করার জন্য যথেষ্ট কারণ । মানব মস্তিষ্কের এমন একটি বিকৃতি মেনে নিতে হলে , একজনকে অবশ্যই হতে হবে...
রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব নামক ব্যবস্থার প্রতি কুকুরের মতো অনুগত । এই লোকদের মনে, এক চতুর কৌশলের মাধ্যমে , লক্ষ্যের বদলে উপায়কে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব জনগণের সেবা করার জন্য নয়, বরং জনগণের অস্তিত্ব রাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে আরাধনা করার জন্য , যা এর কার্যকর্তাদের, এমনকি সর্বনিম্ন পদস্থ কর্মকর্তাদের হাতেও ন্যস্ত। এই শান্ত ও আনন্দিত আরাধনা যাতে কোনোভাবে অশান্তিকর কিছুতে পরিণত না হয় , সেজন্য রাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে শৃঙ্খলা ও প্রশান্তি বজায় রাখার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে । তবে, এটি আর কোনো উপায় বা লক্ষ্য নয় । রাষ্ট্রকে অবশ্যই জনশান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে , এবং অন্যদিকে , শান্তি ও শৃঙ্খলাকেই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হবে । সমস্ত জীবনকে এই দুটি মেরুর মধ্যে দিয়ে চলতে হয়।
বাভারিয়ায়, এই দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখে বাভারিয়ান কেন্দ্রের ধূর্ত রাজনীতিবিদরা, যাদের বলা হয় "বাভারিয়ান পপুলিস্ট পার্টি "। অস্ট্রিয়ায় , কালো-হলুদ লেজিটিমিস্টরা একই ধরনের অবস্থান গ্রহণ করে । দুর্ভাগ্যবশত, রাইখে তথাকথিত রক্ষণশীল গোষ্ঠীগুলোও একই চিন্তাধারা অনুসরণ করে।

২. দ্বিতীয় দলটি সংখ্যায় কিছুটা ছোট। এতে তারা অন্তর্ভুক্ত যারা রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে অন্তত কিছু নির্দিষ্ট শর্তের ওপর নির্ভরশীল করে তোলে । তারা জোর দেন যে এটি কেবল প্রয়োজনীয়ই নয়

Machine Translated by Google

একটি একীভূত শাসনব্যবস্থা থাকা উচিত, তবে যখনই সম্ভব, শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত প্রশাসনিক কারণে হলেও একটি একক ভাষা ব্যবহার করা উচিত। রাষ্ট্রের অস্তিত্বের একমাত্র উদ্দেশ্য আর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব নয়। একে অবশ্যই তার নাগরিকদের মঙ্গলের জন্যও কাজ করতে হবে। এই গোষ্ঠীর মনে, "স্বাধীনতা"র ধারণা, যা মূলত শব্দটির অর্থের ভুল বোঝাবুঝির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, তা রাষ্ট্রের ধারণারই একটি অংশ। শুধুমাত্র অস্তিত্ব থাকার কারণেই কোনো শাসনব্যবস্থাকে আর অলঙ্ঘনীয় বলে মনে করা হয় না। একে অবশ্যই বাস্তব কার্যকারিতার পরীক্ষায় ফেলতে হবে। সমসাময়িক চাহিদার আলোকে সমালোচনার হাত থেকে পুরোনো বা সেকেলে ধারণা আর সুরক্ষা দেয় না। অধিকন্তু, এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্য হলো স্বতন্ত্র নাগরিকদের অর্থনৈতিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। সুতরাং, একে একটি বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে এবং অর্থনৈতিক লাভের ধারণার উপর ভিত্তি করে সাধারণ নীতি অনুসারে মূল্যায়ন করা হয়।

রাষ্ট্র সম্পর্কিত এই তত্ত্বের প্রধান প্রতিনিধিদের গড় জার্মান বুর্জোয়াদের মধ্যে, বিশেষ করে আমাদের উদারপন্থী গণতন্ত্রীদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়।

৩. তৃতীয় গোষ্ঠীটি সংখ্যাগতভাবে সবচেয়ে ছোট। রাষ্ট্রে, তারা জাতিগতভাবে সমগোত্রীয় ও একই ভাষাভাষী মানুষের পক্ষ থেকে ক্ষমতা-রাজনীতির ফলে উদ্ভূত প্রবণতাগুলোকে বাস্তবায়নের উপায় খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু যারা এটা বিশ্বাস করে, তারা ঠিক জানে না যে তারা কী বোঝাতে চাইছে।
" ক্ষমতা রাজনীতির ফলে উদ্ভূত প্রবণতা "। তারা একটি অভিন্ন ভাষার ধারণা দেয় শুধু এই কারণে নয় যে তাদের আছে
রাষ্ট্রকে তার নিজ সীমানার বাইরে ক্ষমতা সম্প্রসারণের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি প্রদানের আশায়, কিন্তু এই কারণেও যে তারা মনে করে —যদিও তা করতে গিয়ে তারা একটি মৌলিক ভুল করে — একটি অভিন্ন ভাষা তাদেরকে জাতীয়করণ প্রক্রিয়াটিকে একটি নির্দিষ্ট দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

গত শতাব্দীতে, আমি এইমাত্র যে মহলের কথা উল্লেখ করেছি, সেখানে "জার্মানীকরণ" শব্দটির অসতর্ক ব্যবহার যারা প্রত্যক্ষ করেছেন, তাদের জন্য তা ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক, যদিও এই চর্চা প্রায়শই সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত ছিল। আমার স্পষ্ট মনে আছে, আমার যৌবনে কীভাবে এই একই শব্দটি এমন সব মতামত প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হতো যা ছিল অবিশ্বাস্যরকম ভ্রান্ত। এমনকি সর্ব-জার্মানিক মহলেও এমন মতামত শোনা যেত যে, সরকার সহযোগিতা করতে রাজি হলে অস্ট্রিয়ান জার্মানরা অস্ট্রিয়ান স্লাভদের জার্মানীকরণে সফল হতে পারবে। এই লোকেরা বুঝত না যে, জার্মানীকরণ নীতি কেবল মানুষের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যেতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, তারা বিশ্বাস করত যে জার্মানীকরণ হলো অন্য জাতিদের জার্মান ভাষায় কথা বলতে বাধ্য করার একটি প্রক্রিয়া। কিন্তু এটা প্রায় অকল্পনীয় যে, কেউ কীভাবে এমন গুরুতর ভুল করতে পারে যে একজন নিগ্রো বা একজন চীনা জার্মান হয়ে যাবে।

কারণ সে জার্মান ভাষা শিখেছে এবং ভবিষ্যতে জার্মান ভাষায় কথা বলতে চায়, এমনকি একটি জার্মান রাজনৈতিক দলকে ভোটও দিতে চায়। আমাদের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীরা কখনোই স্পষ্টভাবে দেখেনি যে এই ধরনের জার্মানীকরণের প্রক্রিয়াটি আসলে অব-জার্মানীকরণ; কারণ একটি অভিন্ন ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতির মধ্যেকার অসামান্য ও দৃশ্যমান পার্থক্যগুলো যদি কাটিয়ে ওঠা এবং অবশেষে মুছে ফেলাও যেত, তবুও এর ফলে এমন এক বিকৃতির প্রক্রিয়া শুরু হতো, যার অর্থ এক্ষেত্রে জার্মানীকরণ নয়, বরং জার্মান উপাদানের বিনাশ। ইতিহাসে এমনটা বহুবার ঘটেছে যে বিজয়ীরা যারা সফল হয়েছিল

বিজিত জাতিগুলোকে তাদের বিজয়ীদের ভাষা ব্যবহারে বাধ্য করার হাজার বছর পর তারা পরিণত হলো
যারা সেই ভাষায় কথা বলত, তাদের দ্বারা বিজিত হবে।

একটি জাতি, বা আরও সঠিকভাবে বললে, একটি বর্ণকে যা সংজ্ঞায়িত করে তা ভাষা নয়, বরং রক্ত। সুতরাং, জার্মানীকরণের কথা কেবল তখনই বলা যেত, যদি এই প্রক্রিয়াটি অধীনস্থ জাতিগুলোর রক্তকে পরিবর্তন করতে পারত, যা স্পষ্টতই অসম্ভব। পরিবর্তন কেবল রক্তের মিশ্রণের মাধ্যমেই সম্ভব হতো, কিন্তু সেক্ষেত্রে উন্নত বর্ণের গুণমান হ্রাস পেত। এই ধরনের মিশ্রণের চূড়ান্ত ফল হবে সেইসব দক্ষতার ধ্বংস, যা বিজয়ী বর্ণকে নিকৃষ্ট জাতিগুলোর উপর জয়লাভ করতে সক্ষম করেছিল। বিশেষ করে, সাংস্কৃতিক সৃজনশীলতা বিলুপ্ত হয়ে যায় যখন একটি উন্নত বর্ণ একটি নিকৃষ্ট বর্ণের সাথে আন্তঃপ্রজনন করে, এমনকি যদি ফলস্বরূপ মিশ্র বর্ণটি একসময় উন্নত বর্ণের ভাষা বলতে হাজার গুণ পারদর্শীও হয়। কিছু সময়ের জন্য,

বিভিন্ন চিন্তাধারার মধ্যে সংঘাত দেখা দেবে, এবং এমনও হতে পারে যে ক্রমাগত অধঃপতনের পথে থাকা কোনো জাতি শেষ মুহূর্তে তার সাংস্কৃতিক শক্তিকে একত্রিত করে আবারও এই ক্ষমতার চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। কিন্তু এই প্রভাবগুলো শুধুমাত্র কার্যকলাপের ফলেই ঘটে থাকে।

Machine Translated by Google

উচ্চতর জাতি থেকে অবশিষ্ট উপাদান , অথবা প্রথম মিলনের ফলে সৃষ্ট সংকর , যাদের মধ্যে উচ্চতর জাতির রক্ত এখনও প্রবল থাকে এবং প্রকাশের চেষ্টা করে । কিন্তু এই ধরনের সংকরদের পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে এমনটা কখনও ঘটে না। তখন সর্বদা সাংস্কৃতিক পশ্চাদপসরণ ঘটে ।

আমাদের এটা সৌভাগ্যজনক বলেই বিবেচনা করতে হবে যে দ্বিতীয় জোসেফের পরিকল্পনা অনুযায়ী অস্ট্রিয়ার জার্মানীকরণ ব্যর্থ হয়েছিল । এর ফলে অস্ট্রিয়া সম্ভবত টিকে যেত, কিন্তু একই সাথে, একটি অভিন্ন ভাষার ব্যবহার জার্মান উপাদানের জাতিগত বৈশিষ্ট্যকে হ্রাস করত । শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, এক ধরনের পশুপালের প্রবৃত্তি হয়তো গড়ে উঠত, কিন্তু এই পশুর পালের গুণগত মান হ্রাস পেত । একটি জাতি-রাষ্ট্রের উদ্ভব হতে পারত , কিন্তু সাংস্কৃতিকভাবে সৃজনশীল জনগোষ্ঠী বিলুপ্ত হয়ে যেত।

জার্মান জনগণের জন্য এই মিশ্রণ প্রক্রিয়াটি না ঘটাই ভালো হয়েছিল, যদিও তা কোনো মহৎ কারণে প্রত্যাখ্যাত হয়নি , বরং কেবল এই কারণে যে...
হ্যাবসবার্গদের দূরদৃষ্টিহীন সংকীর্ণতা । যদি তা ঘটত, তবে জার্মান জাতিকে আর একটি সাংস্কৃতিক শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা যেত না।

তবে, শুধু অস্ট্রিয়াতেই নয় , রাইখের মধ্যেও এই তথাকথিত জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীগুলো একই ধরনের ভ্রান্ত ধারণা দ্বারা প্রভাবিত ছিল এবং এখনও আছে । দুর্ভাগ্যবশত, পোল্যান্ডের প্রতি যে নীতির লক্ষ্য ছিল পূর্বকে জার্মানীকরণ করা, তা একই ভ্রান্ত যুক্তির উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল এবং অনেকেই এর দাবি করেছিল। এখানেও বিশ্বাস করা হতো যে পোলদের জার্মান ভাষা ব্যবহারে বাধ্য করে জার্মানীকরণ করা যেতে পারে। এর পরিণতি হতো ভয়াবহ।

ভিন্ন জাতির মানুষদেরকে জার্মানদের কাছে অপরিচিত চিন্তাভাবনা প্রকাশ করার জন্য জার্মান ভাষা ব্যবহার করতে হবে, যার ফলে তাদের হীনতার দ্বারা আমাদের জাতির মর্যাদা ও মহত্ত্ব ক্ষুণ্ন হবে ।

এটা ভাবতেও ঘিনঘিনে লাগে যে, আমেরিকায় আসা ইহুদিদের জার্মান উপভাষা তাদেরকে জার্মান হিসেবে গণ্য করার সুযোগ করে দেয় , কারণ বহু আমেরিকান জার্মান বিষয়াবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ । এর ফলে জার্মানির মর্যাদার কতটা পরোক্ষ ক্ষতি হয়েছে । আমাদের মধ্যে কেউই পূর্ব থেকে আসা অস্বাস্থ্যকর অভিবাসীদেরকে শুধুমাত্র তারা প্রধানত জার্মান ভাষায় কথা বলে বলেই জার্মান জাতির সদস্য হিসেবে গণ্য করার কথা ভাববে না ।

ঐতিহাসিকভাবে, যে ভূমি আমাদের পূর্বপুরুষেরা তরবারির জোরে জয় করেছিলেন এবং চাষাবাদকারী জার্মানদের সাহায্যে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন, তা অনুকূলভাবে জার্মানীকৃত হয়েছে। এই উপনিবেশ স্থাপনের সময় তারা আমাদের জাতীয় সত্তায় যে পরিমাণে বিদেশী রক্ত প্রবেশ করিয়েছিল, তা ধ্বংস করতে সাহায্য করেছিল।
আমাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য, যার ফলস্বরূপ জার্মানদের মধ্যে অতি-ব্যক্তিবাদ দেখা দেয়, যদিও এই বৈশিষ্ট্যটি আজও প্রায়শই প্রশংসিত হয়।

এই তৃতীয় গোষ্ঠীতে এমন মানুষও অন্তর্ভুক্ত আছেন যারা কিছুটা হলেও রাষ্ট্রকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করেন । তাই , তারা এর টিকে থাকাকে মানব অস্তিত্বের অন্যতম সর্বোচ্চ লক্ষ্য বলে মনে করেন।

আমাদের বিশ্লেষণকে নিম্নরূপে সংক্ষিপ্ত করা যায় ।

এই সমস্ত মতামতের মধ্যে একটি সাধারণ মিল এবং একটি ত্রুটি রয়েছে: তা হলো, এই মতামতগুলো এই গভীর সত্যের স্বীকৃতির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি যে , সংস্কৃতি সৃষ্টির ক্ষমতা সর্বোপরি জাতিগত উপাদানের উপর নির্ভরশীল এবং এই বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ লক্ষ্য হলো এই জাতিকে রক্ষা করা ও উন্নত করা; কারণ মানব সভ্যতার সকল অগ্রগতির জন্য এটি একটি অপরিহার্য শর্ত।

সুতরাং , ইহুদি কার্ল মার্ক্স রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে এই ভ্রান্ত ধারণাগুলো থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হয়েছিলেন। সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য অন্য কোনো সূত্র খুঁজে না পেয়ে , রাষ্ট্রের ধারণা থেকে জাতির প্রতি রাষ্ট্রের কর্তব্য সম্পর্কিত সমস্ত চিন্তাকে বাদ দিয়ে বুর্জোয়া শিক্ষা এমন একটি মতবাদের পথ প্রস্তুত করেছিল যা রাষ্ট্রকে তার মূল রূপেই প্রত্যাখ্যান করে।

সুতরাং, আন্তর্জাতিকতাবাদী মার্ক্সবাদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া সংগ্রাম চূড়ান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। বুর্জোয়া শ্রেণি ইতোমধ্যেই এমন সব মৌলিক নীতি বিসর্জন দিয়েছে , যা তাদের চিন্তাধারার জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করতে পারত । তাদের ধূর্ত প্রতিপক্ষ এই ফাঁকগুলো চিহ্নিত করেছে এবং সেইসব অস্ত্র দিয়ে তাদের ওপর আঘাত হেনেছে , যা তারা অজান্তেই তার হাতে তুলে দিয়েছে ।

Machine Translated by Google

সুতরাং , বিশ্বের জাতিগত ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা যেকোনো নতুন আন্দোলনকে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ও যৌক্তিক মতবাদ উপস্থাপন করতে হবে।

মূল নীতিটি হলো এই যে, রাষ্ট্র নিজে কোনো লক্ষ্য নয়, বরং লক্ষ্য অর্জনের একটি মাধ্যম। এটি উন্নততর মানব সভ্যতার বিকাশের জন্য একটি মৌলিক শর্ত, কিন্তু এই ধরনের বিকাশের উৎস নয় । এই উৎস কেবল সাংস্কৃতিক সৃজনশীলতার উপহারে সমৃদ্ধ একটি জাতির অস্তিত্বের মধ্যেই খোঁজা যেতে পারে । পৃথিবীতে শত শত মহান রাষ্ট্র থাকতে পারে , কিন্তু যদি আর্যরা, যারা সভ্যতার স্রষ্টা ও রক্ষক, বিলুপ্ত হয়ে যায়, তবে বর্তমানে উচ্চতর জাতিগুলোর আধ্যাত্মিক চাহিদা মেটাতে সক্ষম এমন যেকোনো সংস্কৃতিও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আমরা আরও বলতে পারি যে, মানুষ রাষ্ট্র সৃষ্টি করে বলেই মানবজাতির বিলুপ্তির সম্ভাবনা থাকে না , কারণ যে জাতি এই ক্ষমতাগুলো বহন করত , সেই জাতি বিলুপ্ত হয়ে গেলে উচ্চতর বৌদ্ধিক ক্ষমতা ও অভিযোজন ক্ষমতাও হারিয়ে যাবে ।

উদাহরণস্বরূপ , যদি আজ কোনো ভূকম্পনের ফলে পৃথিবীর পৃষ্ঠ কেঁপে ওঠে
ভূমিকম্পে সমুদ্রের ঢেউ থেকে নতুন হিমালয় জেগে উঠবে , এই একটি বিপর্যয়ই মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট হবে। কোনো রাষ্ট্র আর টিকে থাকতে পারবে না । সমস্ত শৃঙ্খলা ধ্বংস হয়ে যাবে। হাজার হাজার বছর ধরে বিকশিত সংস্কৃতির সমস্ত চিহ্ন বিলীন হয়ে যাবে। জল ও কাদায় নিমজ্জিত মৃত্যু ও ধ্বংসের এক বিশাল প্রান্তর ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না । তবে , যদি একদল মানুষ এই ভয়াবহ বিপর্যয় থেকে বেঁচে যায়, এবং যদি এই মানুষগুলো হয়

সভ্যতা সৃষ্টির সহজাত ক্ষমতা সম্পন্ন এক জাতির কাছে, এই বিভ্রান্তি কেটে গেলে পৃথিবী আবারও মানব আত্মার সৃজনশীল শক্তির সাক্ষী হবে, এমনকি যদি তাতে হাজার বছরও লেগে যায়।
কেবলমাত্র সাংস্কৃতিক সৃজনশীলতার অধিকারী শেষ জাতিটির ধ্বংস এবং সেই জাতির সকল সদস্যের বিলুপ্তিই পৃথিবীকে মরুভূমিতে পরিণত করবে। অপরদিকে, আধুনিক ইতিহাস এমন উদাহরণ দেয় যা দেখায় যে, সৃজনশীল প্রতিভার অভাব রয়েছে এমন কোনো জাতির সদস্যদের দ্বারা সৃষ্ট রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো টেকসই উপাদানে তৈরি হয় না । বহু প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর মতো, যাদেরকে স্থান ছেড়ে দিতে হয়েছিল ।

যে স্থান অন্যের জন্য উন্মুক্ত এবং কোনো চিহ্ন রাখে না , সেই মানুষটিকেও সরে যেতে হবে যদি সে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র খুঁজে বের করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে ।

রাষ্ট্র নিজে কোনো নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক অগ্রগতি সাধন করে না । রাষ্ট্র কেবল সেই জাতিকেই রক্ষা করতে পারে , যারা এই ধরনের অগ্রগতির কারণ । রাষ্ট্র নিজে শত শত বছর ধরে অপরিবর্তিত থাকতে পারে , যদিও সাংস্কৃতিক সক্ষমতা এবং এই সক্ষমতা দ্বারা গঠিত জনগণের জীবনযাত্রায় গভীর পরিবর্তন আসতে পারে, কারণ রাষ্ট্র জাতিগত মিশ্রণের প্রক্রিয়াকে বাধা দেয়নি। উদাহরণস্বরূপ, বর্তমান রাষ্ট্র হয়তো সম্পূর্ণরূপে যান্ত্রিক রূপে টিকে থাকতে পারে , কিন্তু জাতির দেহে সঞ্চারিত সংমিশ্রণের বিষ সাংস্কৃতিক পরিবর্তন নিয়ে আসে।

অবক্ষয়, যা বিভিন্ন ক্ষতিকর উপসর্গের মাধ্যমে প্রকাশ পায় ।

সুতরাং, উন্নত মানের মানুষের অস্তিত্বের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত রাষ্ট্র নয়, বরং সেই জাতি যা এই উন্নত মানের মানুষ সৃষ্টি করতে সক্ষম।

এই ক্ষমতা সর্বদাই বিদ্যমান থাকে, যদিও বাহ্যিক পরিস্থিতি একে জাগিয়ে না তোলা পর্যন্ত তা সুপ্ত অবস্থায় থাকে । সাংস্কৃতিক সৃজনশীলতার ক্ষমতাসম্পন্ন জাতি বা বরং বর্ণসমূহ, যখন বাহ্যিক পরিস্থিতি প্রতিকূল থাকে এবং এই ক্ষমতার কার্যকর প্রকাশের সুযোগ দেয় না , তখন এই ক্ষমতাকে সুপ্ত রূপে ধারণ করে । অতএব, প্রাক-খ্রিস্টীয় জার্মানদের সভ্যতাহীন বর্বর হিসেবে আখ্যা দেওয়া চরম অন্যায়। তারা কখনোই তা ছিল না। কিন্তু তারা যে উত্তরাঞ্চলে বাস করত, সেখানকার কঠোর জলবায়ু এমন জীবনযাত্রার পরিস্থিতি তৈরি করেছিল যা তাদের সৃজনশীল ক্ষমতার ধীর বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করেছিল । যদি তারা কোনো আদি সংস্কৃতি ছাড়াই দক্ষিণের মৃদু জলবায়ুতে এসে পৌঁছাত এবং তাদের শ্রমশক্তি হিসেবে প্রয়োজনীয় মানব উপাদান—অর্থাৎ, একটি নিম্নতর বর্ণের মানুষ— পেতে পারত, তবে তাদের মধ্যে সুপ্ত সাংস্কৃতিক ক্ষমতা চমৎকারভাবে বিকশিত হতো, যেমনটা হয়েছিল, উদাহরণস্বরূপ, গ্রীকদের ক্ষেত্রে। কিন্তু এই আদি সাংস্কৃতিক ক্ষমতা শুধুমাত্র উত্তরের জলবায়ুর ফল ছিল না । ল্যাপ বা এস্কিমোদের যদি দক্ষিণে স্থানান্তরিত করা হতো, তবে তারা সংস্কৃতির স্রষ্টা হতে পারত না। না, এই অলৌকিক ক্ষমতা

Machine Translated by Google

সৃজনশীল ক্ষমতা আর্যদের উপর প্রদত্ত একটি বিশেষ উপহার, এবং প্রাকৃতিক পরিস্থিতি এর সক্রিয় প্রকাশের বিরোধিতা করে নাকি সহায়ক হয় , তার উপর নির্ভর করে এটি তাদের মধ্যে সুপ্ত থাকে বা সক্রিয় হয়ে ওঠে ।

এই তথ্যগুলো থেকে নিম্নলিখিত উপসংহার টানা যেতে পারে : রাষ্ট্র কেবল

একটি লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম। এর উদ্দেশ্য হলো শারীরিক ও আধ্যাত্মিকভাবে সম্পর্কিত জনগোষ্ঠীর সম্প্রদায়কে টিকিয়ে রাখা এবং তার প্রসার ঘটানো । সর্বোপরি, একে অবশ্যই জাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হবে, যার মাধ্যমে সেই জাতির মধ্যে সুপ্ত সকল শক্তির অবাধ বিকাশের জন্য মৌলিক শর্ত প্রদান করা হয় । এই সক্ষমতাগুলোর একটি বড় অংশকে সর্বদাই টিকিয়ে রাখতে হবে।
জাতির শারীরিক অস্তিত্ব নিশ্চিত করতে ব্যবহৃত হয়, এবং তাদের মধ্যে কেবল একটি ক্ষুদ্র অংশই কাজ করতে সক্ষম হবে।
বৌদ্ধিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে । কিন্তু বাস্তবে, এগুলো সর্বদা অবিচ্ছেদ্য বিষয়।

যেসব রাষ্ট্র এই উদ্দেশ্য পূরণ করে না, তাদের অস্তিত্বের কোনো যৌক্তিকতা নেই ।
নৃশংসতা। এগুলোর অস্তিত্ব ঠিক ততটাই ন্যায্যতা দিতে পারে, যতটা কোনো জলদস্যু দলের সফল অভিযানকে জলদস্যুতার ন্যায্যতা হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

আমরা, জাতীয় সমাজতন্ত্রীরা, যারা এক নতুন বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির জন্য সংগ্রাম করি, তারা কখনোই সেই বিখ্যাত 'বাস্তব ভিত্তি'-র উপর নির্ভর করতে পারি না, এবং বিশেষ করে ভ্রান্ত তথ্যের উপর তো নয়ই। যদি আমরা তা করি, তবে আমরা এক নতুন ও মহান ধারণার অগ্রদূত থাকা ছেড়ে বর্তমানে প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাসের দাসে পরিণত হব। আমাদের অবশ্যই পাত্র এবং তার ভেতরের বস্তুর মধ্যে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য করতে হবে। রাষ্ট্র হলো কেবলই পাত্র, এবং জাতি হলো তার ভেতরের বস্তু। পাত্রটির অর্থ কেবল তখনই থাকে যখন তা তার ভেতরের বস্তুকে রক্ষা ও সংরক্ষণ করে। অন্যথায়, তা মূল্যহীন।

সুতরাং , একটি জাতিগত রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ লক্ষ্য হলো সেইসব জাতিগত উপাদানকে রক্ষা ও সংরক্ষণ করা, যারা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাদের কর্মের মাধ্যমে এক উচ্চতর মানবতার পরিচায়ক সৌন্দর্য ও মর্যাদা সৃষ্টি করে। আর্য হিসেবে আমরা রাষ্ট্রকে কেবল একটি জীবন্ত সত্তা হিসেবেই বিবেচনা করতে পারি , যা শুধু জাতির অস্তিত্বকেই টিকিয়ে রাখে না , বরং বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক দক্ষতার বিকাশের মাধ্যমে জাতিকে সর্বোচ্চ স্বাধীনতার দিকে পরিচালিত করার জন্যও কাজ করে।

রাষ্ট্র হিসেবে তারা এখন আমাদের উপর যা চাপিয়ে দিতে চাইছে, তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কেবল এক দানবীয়তা; এক গভীর মানবিক বিচ্যুতির ফল , যা সঙ্গে করে নিয়ে আসে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ।

আমরা জাতীয় সমাজতন্ত্রীরা জানি যে, এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করার মাধ্যমে আমরা আজকের বিশ্বের প্রেক্ষাপটে একটি বিপ্লবী অবস্থান গ্রহণ করি এবং আমাদেরকে বিপ্লবী হিসেবে গণ্য করা হয় ।
কিন্তু আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যকলাপ সমসাময়িকদের অনুমোদন বা অসমর্থন দ্বারা নির্ধারিত হবে না, বরং কেবল আমাদের দ্বারা স্বীকৃত সত্যকে অনুসরণ করার কর্তব্য দ্বারাই তা পরিচালিত হবে।
এর মাধ্যমে আমাদের বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের বর্তমান কাজ শুধু বুঝতেই পারবে না , বরং একে যথাযথ হিসেবেও স্বীকৃতি দেবে এবং এর যথাযথ সম্মান প্রদান করবে।

* * *

এই নীতিগুলোর ওপর ভিত্তি করেই আমরা, জাতীয় সমাজতন্ত্রীরা, রাষ্ট্রের মূল্য নির্ধারণের মানদণ্ড স্থাপন করি । কোনো একটি জাতির দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এই মূল্য আপেক্ষিক , কিন্তু সমগ্র মানবজাতির দৃষ্টিকোণ থেকে তা পরম । অন্য কথায়, এর অর্থ হলো:

কোনো রাষ্ট্রের মহত্ত্ব তার সংস্কৃতির স্তর বা বহির্বিশ্ব তার ক্ষমতাকে কতটা গুরুত্ব দেয় , তা দিয়ে কখনো বিচার করা যায় না, বরং তার প্রতিষ্ঠানগুলো নিজ জাতির সেবায় কতটা নিয়োজিত, তার ভিত্তিতেই তা বিচার করতে হবে ।

একটি রাষ্ট্রকে কেবল তখনই একটি আদর্শ উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে, যদি তা কেবল তার প্রতিনিধিত্বকারী জাতির অত্যাবশ্যকীয় চাহিদাগুলোই যথাযথভাবে পূরণ না করে, বরং বাকি বিশ্বের চোখে সেই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সাংস্কৃতিক তাৎপর্য নির্বিশেষে, তার অস্তিত্বের মাধ্যমে সেই জাতির অস্তিত্বও নিশ্চিত করে । কারণ রাষ্ট্রের কাজ মানব সক্ষমতা সৃষ্টি করা নয় , বরং ইতোমধ্যে বিদ্যমান সক্ষমতাগুলোর বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করা । অন্যদিকে, একটি রাষ্ট্রকে অশুভ বলা যেতে পারে যদি , একটি উচ্চ-স্তরের রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও,

Machine Translated by Google

সাংস্কৃতিক স্তরে, এই সংস্কৃতির ধারকদের জাতিগত ঐক্য ধ্বংস করে তাদের বিলুপ্তির দিকে ঠেলে দেওয়া হয়। এই ধরনের নীতির বাস্তব ফল হবে এই সংস্কৃতির ধারাবাহিক অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তগুলোর ধ্বংস , যা রাষ্ট্র দ্বারা সৃষ্ট নয়, বরং যা জাতির সহজাত সৃজনশীল ক্ষমতার ফল, যার অস্তিত্ব রাষ্ট্রের জীবন্ত সত্তার মধ্যে ঐক্যের দ্বারা নিশ্চিত হয়। আমি আবারও জোর দিয়ে বলতে চাই যে, রাষ্ট্র নিজে বিষয়বস্তু নয় , বরং রূপ। অতএব , সাংস্কৃতিক স্তর সেই মানদণ্ড নয় যার দ্বারা আমরা সেই রাষ্ট্রের মূল্য বিচার করতে পারি যেখানে একটি জাতি বাস করে। এটা স্পষ্ট যে, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উচ্চ সৃজনশীল ক্ষমতা সম্পন্ন একটি জাতি নিগ্রোদের একটি গোষ্ঠীর চেয়ে বেশি মূল্যবান । যদিও কার্যকারিতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে পূর্বোক্তদের রাষ্ট্রীয় সংগঠন নিগ্রোদের চেয়েও খারাপ হবে । এমনকি সেরা রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোও মানুষের মধ্যে এমন ক্ষমতা বিকশিত করতে পারে না যা তাদের নেই এবং কখনও ছিলও না, কিন্তু একটি খারাপ রাষ্ট্র ধীরে ধীরে সেই ক্ষমতাগুলোকে ধ্বংস করতে পারে যা একসময় বিদ্যমান ছিল। যদি অনুমতি দেওয়া হয় তবে এটি ঘটতে পারে ।

যারা জাতিগত সংস্কৃতির বাহক, তাদের দমন করা।

সুতরাং, রাষ্ট্রের মূল্য কেবল একটি নির্দিষ্ট জাতির কল্যাণ সাধনে তা কতটা কার্যকর, সেই প্রশ্নের ভিত্তিতেই বিচার করা যেতে পারে , এবং অন্য কোন ভূমিকায় তা পালন করা হয়, তার ভিত্তিতে নয়।
বিশ্বে এর ভূমিকা রয়েছে । এর আপেক্ষিক মূল্য সহজে ও নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা যায় ; কিন্তু এর পরম মূল্য নির্ধারণ করা কঠিন, কারণ তা শুধু রাষ্ট্র দ্বারাই নয়, বরং একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের জনগণের দক্ষতা ও সাংস্কৃতিক স্তর দ্বারাও নির্ধারিত হয় ।

সুতরাং, যখন আমরা রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য নিয়ে কথা বলি , তখন আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে এই উদ্দেশ্যটি জাতিরও এবং রাষ্ট্রের কাজ হলো তার সাংগঠনিক শক্তি ব্যবহার করে জাতির সৃজনশীল ক্ষমতাকে অবাধে বিকশিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ তৈরি করা। আর যদি আমরা প্রশ্ন করি জার্মানির কী ধরনের রাষ্ট্র প্রয়োজন, তবে প্রথমেই আমাদের একটি সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে যে এই রাষ্ট্র কোন জাতিকে ধারণ করবে এবং কোন উদ্দেশ্য সাধন করবে।

দুর্ভাগ্যবশত, জার্মান জাতি কোনো অভিন্ন জাতিগত পরিচয়ের উপর ভিত্তি করে গঠিত নয়। মূল উপাদানগুলোকে একীভূত করে একটি পূর্ণাঙ্গ সত্তা তৈরির প্রক্রিয়াটি এতটা অগ্রসর হয়নি যে , একটি নতুন জাতির উদ্ভব হয়েছে— এই দাবিকে সমর্থন করা যায়। বরং , বিশেষ করে ত্রিশ বছরের যুদ্ধের পর থেকে যে বিষ জাতির দেহকে আক্রমণ করেছে, তা কেবল আমাদের রক্তের ঐক্যই নয়, আমাদের জাতীয় আত্মার ঐক্যকেও ধ্বংস করে দিয়েছে। আমাদের মাতৃভূমির উন্মুক্ত সীমান্ত, এই সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে অ-জার্মান বহিরাগত উপাদানগুলোর সাথে সম্পর্ক , এবং বিশেষ করে রাইখে বিদেশি রক্তের প্রবল প্রবাহ —এই বিভিন্ন উপাদানগুলোর সম্পূর্ণ আত্মীকরণকে বাধাগ্রস্ত করেছে , কারণ এই প্রবাহ ছিল অবিরাম।

এই মিশ্রণ থেকে কোনো নতুন জাতির উদ্ভব হয়নি। ভিন্ন ভিন্ন উপাদান এখনও পাশাপাশি বিদ্যমান। ফলে, বিশেষ করে সংকটের সময়ে, যখন জনতা সাধারণত একজোট থাকে, তখন জার্মানরা সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মৌলিক জাতিগত উপাদানগুলো শুধু বিভিন্ন জেলাতেই ভিন্ন নয় , বরং একটি জেলার মধ্যেও বিভিন্ন উপাদান রয়েছে । নর্ডিক ধরনের পাশাপাশি আমরা পূর্ব ইউরোপীয় ধরনেরও দেখতে পাই ; পূর্বাঞ্চলীয়দের পাশাপাশি ডিনারিক, তাদের সাথে মিশ্রিত পাশ্চাত্য এবং এই সবগুলোর সংকরও রয়েছে। এটি আমাদের জন্য একটি গুরুতর সমস্যা।

এই কারণে, জার্মানদের মধ্যে সেই শক্তিশালী পশুপালের প্রবৃত্তির অভাব রয়েছে যা রক্তের ঐক্য থেকে উদ্ভূত হয় এবং যা বিপদসংকুল ও সংকটময় সময়ে জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে; কারণ এমন পরিস্থিতিতে ছোটখাটো মতপার্থক্য বিলীন হয়ে যায় এবং একতাবদ্ধ একটি পশুপাল শত্রুর মোকাবেলা করে। আমরা যাকে অতি-ব্যক্তিবাদ বলি, তার উদ্ভব হয়েছে এই কারণে যে আমাদের আদি জাতিগত উপাদানগুলো কখনো ঐক্যবদ্ধ না হয়েই পাশাপাশি অবস্থান করেছে । শান্তিকালীন সময়ে এই পরিস্থিতি কিছু সুবিধা দিতে পারে, কিন্তু সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি আমাদের বিশ্ব আধিপত্য অর্জনে বাধা দিয়েছে । যদি তার ঐতিহাসিক বিকাশে জার্মান জাতির ঐক্য থাকত,

যে পশুপালের সহজাত প্রবৃত্তি অন্যান্য জাতিকে এত কিছু দিয়েছে, তা না থাকলে জার্মান রাইখ সম্ভবত আজ বিশ্ব শাসন করত । বিশ্ব ইতিহাস ভিন্ন পথে চলত , এবং সেক্ষেত্রে কেউ বলতে পারে না যে অনেক অন্ধ শান্তিবাদী আবেদন, আর্তনাদ ও কান্নার মাধ্যমে যা অর্জন করতে চায়, তা এইভাবেই অর্জিত হত কি না : অর্থাৎ, শান্তি জলপাইয়ের ডাল নাড়ানো বা বৃদ্ধাদের অশ্রুসিক্ত অভিযোগের উপর ভিত্তি করে নয়, বরং এমন এক জাতির বিজয়ী তরবারির দ্বারা নিশ্চিত, যে জাতি বিশ্ব শাসন করার এবং এক উন্নততর সভ্যতার সেবায় তা পরিচালনা করার ক্ষমতায় নিয়োজিত ।

Machine Translated by Google

আমাদের জাতি যে রক্তের ঐক্যের উপর ভিত্তি করে গঠিত নয়, তা আমাদের জন্য অবর্ণনীয় দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি অনেক ক্ষুদ্র জার্মান শাসককে বাসযোগ্য রাজধানী জোগান দিলেও, সমগ্র জার্মান জাতিকে বিশ্ব শাসনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে।

আজও আমাদের জাতি এই অভ্যন্তরীণ ঐক্যের অভাবে ভুগছে ; কিন্তু যা আমাদের অতীত ও বর্তমান দুর্ভাগ্যের কারণ হয়েছে, তা ভবিষ্যতে আমাদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে উঠতে পারে । একদিকে যেমন এটি একটি অসুবিধা যে আমাদের জাতিগত উপাদানগুলো একে অপরের সাথে মিশে যায়নি , যার ফলে একটি সমগোত্রীয় জাতিসত্তা গড়ে উঠতে পারেনি , অন্যদিকে এটি সৌভাগ্যের বিষয় যে আমাদের সেরা রক্তের অন্তত কিছু অংশ বিশুদ্ধ থেকেছে, যার জাতিগত গুণমান হ্রাস পায়নি।

সকল জাতিগত উপাদানের সম্পূর্ণ আত্তীকরণ নিঃসন্দেহে একটি সমসত্ত্ব জাতীয় সত্তা তৈরি করত; কিন্তু প্রতিটি জাতিগত মিশ্রণের ক্ষেত্রেই যেমন প্রমাণিত হয়েছে , সেরা মৌলিক উপাদানগুলো অক্ষতভাবে সংরক্ষিত থাকলে সভ্যতা সৃষ্টির যে সক্ষমতা থাকত, এই মিশ্রণ তার চেয়ে কম সক্ষম হতো । ব্যাপক আত্তীকরণ না হওয়ার সুবিধা আজও দেখা যায় , যখন আমাদের দেশে জার্মান নর্ডিকদের এমন বড় বড় গোষ্ঠী রয়েছে যাদের রক্ত অন্য জাতির রক্তের সাথে মিশ্রিত হয়নি । ভবিষ্যতে আমাদের এটিকে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। সকল জাতিগত আইনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করার সেই অন্ধকার যুগে, যখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে অন্য সকলের সমান বলে মনে করা হতো , তখন বিভিন্ন মৌলিক জাতিগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যেকার পার্থক্য স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যেত না। আজ আমরা জানি যে, জাতি গঠনকারী বিভিন্ন উপাদানের সম্পূর্ণ আত্তীকরণ...

জাতির উপর আস্থা হয়তো আমাদের বৃহত্তর বাহ্যিক ক্ষমতা দিতে পারে ; কিন্তু অন্যদিকে, মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্যগুলো অর্জিত হবে না , কারণ নিয়তি দ্বারা সুস্পষ্টভাবে নির্বাচিত একমাত্র মানবজাতি এই সংমিশ্রণে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য জাতিসমূহের সাধারণ মিশ্রণে হারিয়ে যাবে ।

কিন্তু আমাদের কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়াই এক সৌভাগ্যজনক ভাগ্যের কারণে এটি প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছিল, এবং এখন আমাদের নতুন জ্ঞানের আলোকে এটিকে অবশ্যই পুনর্বিবেচনা ও ব্যবহার করতে হবে।

যে কেউ যদি বলে যে এই পৃথিবীতে জার্মান জাতির একটি কর্তব্য পালন করার আছে, তবে তাকে অবশ্যই জানতে হবে যে এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করা ছাড়া সেই কর্তব্য পালন করা সম্ভব নয়, যার সর্বোচ্চ লক্ষ্য হবে আমাদের জাতির মহৎ উপাদানগুলোকে রক্ষা ও বিকশিত করা এবং সমগ্র মানবতাকে অক্ষুণ্ণ রাখা।

এইভাবে , প্রথমবারের মতো, রাষ্ট্রকে একটি অন্তর্নিহিত মহৎ উদ্দেশ্য অর্পণ করা হয়েছিল। এই হাস্যকর ধারণার আলোকে যে, রাষ্ট্রের কাজ কেবল জনশৃঙ্খলা ও শান্তির রক্ষক হিসেবে কাজ করা , যাতে প্রত্যেকে শান্তিপূর্ণভাবে অন্য সকলকে গ্রাস করতে পারে, এটি সত্যিই এক মহান কর্তব্য: সেই সর্বোত্তম মানবতাকে টিকিয়ে রাখা ও উৎসাহিত করা, যা দিয়ে দয়ালু স্রষ্টা এই পৃথিবীকে সমৃদ্ধ করেছেন । একটি মৃত যন্ত্র থেকে, যা নিজেই একটি লক্ষ্য হওয়ার জন্য তৈরি , এমন এক জীবন্ত সত্তার উদ্ভব হবে যা কেবল একটিই উদ্দেশ্য পূরণ করবে : এবং এই উদ্দেশ্যটি উচ্চতর আদর্শের অন্তর্গত ।

রাষ্ট্র হিসেবে জার্মান রাইখের উচিত সকল জার্মানকে অন্তর্ভুক্ত করা। এর কাজ শুধু আমাদের জাতির সবচেয়ে মূল্যবান অংশগুলোকে একত্রিত ও বিকশিত করাই নয় , বরং নেতৃত্ব দেওয়াও।
তাদেরকে ধীরে ধীরে বিশ্বে এক প্রভাবশালী অবস্থানে নিয়ে যাওয়া।

* * *

সুতরাং , স্থবিরতার একটি পর্বের পর আসে প্রচেষ্টার একটি পর্ব। এবং এখানেও, অন্য সব ক্ষেত্রের মতোই, এই প্রবাদটি সত্য যে, মিথ্যা বললে মরিচা ধরে; এবং তদুপরি , বিজয় সর্বদা আক্রমণকারীরই হয় । আমরা যে লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংগ্রাম করি তা যত বড় হয় , সাধারণ মানুষ তা তত কম বোঝে এবং সাফল্যও তত মহিমান্বিত হয়। ইতিহাস এটাই শিক্ষা দেয়। এবং এই অর্জন আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হবে যদি লক্ষ্যটি সঠিকভাবে অর্জিত হয় এবং সংগ্রামটি অবিচল অধ্যবসায়ের সাথে চালানো হয় । আজকের অনেক সরকারি কর্মকর্তা বিশ্বাস করেন যে, একটি নতুন ব্যবস্থার জন্য লড়াই করার চেয়ে বিদ্যমান ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য কাজ করা সহজ । তারা রাষ্ট্রকে এমন একটি যন্ত্র হিসেবে দেখা বেশি সুবিধাজনক মনে করেন যার উদ্দেশ্য হলো...

Machine Translated by Google

অস্তিত্ব রক্ষার কথা বলে এবং বলে যে "তাদের জীবন রাষ্ট্রের সম্পত্তি , " যেন একটি জাতির অভ্যন্তরীণ জীবন থেকে উদ্ভূত কোনো কিছুই জাতি ছাড়া অন্য কিছুর কাজে লাগতে পারে, এবং যেন মানুষকে তার নিজের মতো সত্তা ছাড়া অন্য কিছুর জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। অবশ্যই , যেমনটা আমি আগেই বলেছি, রাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে মানুষের আত্মরক্ষার প্রবৃত্তির সার্বভৌম মূর্ত প্রতীক হিসেবে না দেখে, নিছক একটি আনুষ্ঠানিক সাংগঠনিক ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা সহজতর। এই দুর্বলমনাদের কাছে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের ক্ষমতা কেবলই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ লক্ষ্য, অথচ আমাদের কাছে তা অস্তিত্ব রক্ষার মহান ও চিরন্তন সংগ্রামে এক কার্যকর অস্ত্র ; এমন এক অস্ত্র যা প্রত্যেককে গ্রহণ করতেই হবে, কারণ এটি কেবল একটি আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা নয়, বরং এটি আমাদের অস্তিত্বের সম্মিলিত ইচ্ছারই এক বহিঃপ্রকাশ।

সুতরাং, আমাদের নতুন ধারণার সংগ্রামে , যা জীবনের মূল অর্থের সাথে সম্পূর্ণরূপে সঙ্গতিপূর্ণ , আমরা এই সামাজিক ব্যবস্থায় খুব কম সঙ্গীই খুঁজে পাব যা পরিণত হয়েছে।
শুধু শারীরিকভাবেই নয়, মানসিকভাবেও দুর্বল। আমাদের জনসংখ্যার এই স্তরগুলো থেকে কেবল অসাধারণ ব্যক্তিরাই আমাদের সারিতে যোগ দেবে ; কেবল সেইসব বৃদ্ধ, যাদের হৃদয় তরুণ এবং সাহস এখনও অটুট; কিন্তু তারা নয়, যারা বর্তমান পরিস্থিতি বজায় রাখাকেই নিজেদের কর্তব্য বলে মনে করে।

আমাদের বিরুদ্ধে রয়েছে এক অগণিত বাহিনী , যারা দুষ্ট না হয়ে বরং বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে অলস ও উদাসীন এবং যাদের নিজেদের স্বার্থই বর্তমান পরিস্থিতি বজায় রাখতে চালিত করে। আমাদের এই মহান সংগ্রামের আপাত আশাহীনতার উপরেই এর মহত্ত্ব নির্ভর করে।

আমাদের কর্তব্য এবং সাফল্যের সম্ভাবনা। এমন এক রণহুঙ্কার যা শুরু থেকেই সকল সংকীর্ণমনা ব্যক্তিকে ভীত করে দূরে সরিয়ে দেবে, অথবা অন্তত নিরুৎসাহিত করবে, তা ইস্পাত-কঠিন মানসিকতার অধিকারী সকলের জন্য একটি সংকেত হয়ে উঠবে। এবং এটি পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে যে , যদি জাতি থেকে অত্যন্ত উদ্যমী ও সক্রিয় মানুষেরা উঠে এসে একটিমাত্র লক্ষ্যের সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং এর মাধ্যমে পরিশেষে জাতির নিষ্ক্রিয় জনতাকে ছাপিয়ে ওঠে, তবে এই ক্ষুদ্র দলটিই সমগ্রের অধিপতি হয়ে উঠবে। ইতিহাস

বিশ্ব সংখ্যালঘুদের দ্বারা গঠিত , এই অর্থে যে এই সংখ্যাগত সংখ্যালঘুরা সমগ্র জাতির ইচ্ছা , শক্তি এবং উদ্যোগের প্রতিনিধিত্ব করে।

যা অনেকের কাছে বাধা বলে মনে হয়, তা আসলে আমাদের বিজয়ের একটি পূর্বশর্ত। যেহেতু আমাদের কাজ অনেক বড় এবং বহু বাধা অতিক্রম করতে হবে , তাই কেবল সেরাদেরই আমাদের দলে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। এই বাছাই প্রক্রিয়াই আমাদের সাফল্যের নিশ্চয়তা।

* * *

প্রকৃতি সাধারণত প্রজাতি সংমিশ্রণের প্রভাব সংশোধন করার জন্য নির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সে সংকর প্রজাতির পক্ষ নেয় না। পরবর্তী সংকরায়নের ফল অবশ্যই
বিশেষ করে তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম প্রজন্মে তারা চরম দুর্ভোগের শিকার হয়। তারা শুধু প্রথম সংমিশ্রণে জড়িত পিতামাতার উন্নত গুণাবলী থেকেই বঞ্চিত হয় না , বরং তাদের রক্তের বৈশিষ্ট্যের সামঞ্জস্যের অভাবে তাদের মধ্যে দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি এবং জীবনীশক্তিরও অভাব দেখা যায়। সমস্ত সংকটময় মুহূর্তে, যখন একজন বিশুদ্ধ রক্তের ব্যক্তি সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়, অর্থাৎ এমন সিদ্ধান্ত যা সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অভিন্ন, তখন একজন মিশ্র রক্তের ব্যক্তি হয়ে উঠবে...

বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং অসংলগ্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ফলে আমরা দেখি যে , মিশ্র রক্তের জীবেরা শুধু বিশুদ্ধ রক্তের জীবদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্টই নয় , বরং তাদের বিলুপ্তিও আরও দ্রুত ঘটে। অগণিত ক্ষেত্রে, যখন বিশুদ্ধ প্রজাতিটি টিকে থাকে , তখন মিশ্র প্রজাতিটি ভেঙে পড়ে। এখানেই আমরা প্রকৃতির প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা দেখতে পাই। এটি প্রজননের সম্ভাবনাকে সীমিত করে, যার ফলে সংকর প্রজাতির উর্বরতা ব্যাহত হয় এবং তাদের বিলুপ্তি ঘটে।

উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো একটি জাতির একজন সদস্য তার রক্ত কোনো উন্নততর জাতির সদস্যের রক্তের সাথে মিশ্রিত করে, তবে এর প্রথম ফল হবে সেই জাতির স্তরের অবনতি , এবং অধিকন্তু, এই সংমিশ্রণের বংশধরেরা তাদের চারপাশের সেইসব মানুষের চেয়ে দুর্বল হবে যারা তাদের রক্তকে বিশুদ্ধ রেখেছে। যেখানে উন্নততর জাতির নতুন রক্ত সংকরদের বংশধারায় প্রবাহিত হয় না , এবং যেখানে এই সংকরেরা নিজেদের মধ্যে প্রজনন চালিয়ে যায় , সেখানে তারা হয় অপর্যাপ্ত প্রতিরক্ষা শক্তির কারণে বিলুপ্ত হয়ে যাবে —যা প্রকৃতির এক বিচক্ষণ ব্যবস্থা—অথবা সহস্রাব্দ ধরে—

Machine Translated by Google

এরা একটি নতুন সংকর জাতি তৈরি করবে , যেখানে মূল উপাদানগুলো এমনভাবে মিশে যাবে যে তাদের চিহ্ন আর চেনা যাবে না। এইভাবে , একটি নতুন জাতির বিকাশ ঘটবে , যাদের কিছু পশুপালের মতো আত্মরক্ষার ক্ষমতা থাকবে, কিন্তু এর বুদ্ধিবৃত্তিক মূল্য এবং সাংস্কৃতিক তাৎপর্য প্রথম সংকরদের তুলনায় মৌলিকভাবে নিকৃষ্ট হবে । কিন্তু এই ক্ষেত্রেও, সংকর জাতিটি সেই উন্নত জাতিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে পরাজিত হবে, যারা তাদের রক্তের বিশুদ্ধতা বজায় রেখেছে । এই সংকর জাতি হাজার হাজার বছর ধরে যে পশুপালের মতো সংহতি গড়ে তুলেছে, তা এই সংগ্রামের জন্য যথেষ্ট হবে না। আর এর কারণ হবে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে ও সাংস্কৃতিকভাবে উন্নত, সমগোত্রীয় রক্তের একটি জাতিকে পরাস্ত করার মতো নমনীয়তা এবং গঠনমূলক ক্ষমতার অভাব ।

সুতরাং , আমরা নিম্নলিখিত নীতিটিকে সত্য বলে বিবেচনা করতে পারি : যেকোনো প্রজাতির মিশ্রণ শীঘ্র বা বিলম্বে সেই মিশ্র পণ্যের অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে যাবে, যদি না সংকরায়নের উচ্চতর প্রজাতিগত স্তরটি একটি নির্দিষ্ট প্রজাতিগত সমরূপতা বজায় রাখে। সংকরদের জন্য বিপদ তখনই দূর হয়, যখন এই উচ্চতর স্তরটি—যা সমরূপ প্রজননের নির্দিষ্ট মান বজায় রেখেছে — তার বংশধারার প্রতি বিশ্বস্ততা হারিয়ে সংকরদের সাথে আন্তঃপ্রজনন করে।

এই নীতিটি একটি ধীর কিন্তু অবিচ্ছিন্ন পুনর্জন্মের উৎস, যার মাধ্যমে জাতিগত দেহে প্রবেশ করা সমস্ত বিষ ক্রমান্বয়ে নির্মূল হয়ে যায়, যতক্ষণ না পর্যন্ত জাতিগতভাবে বিশুদ্ধ উপাদানের এমন একটি মৌলিক ভাণ্ডার অবশিষ্ট থাকে যা পরবর্তী সংকরায়নকে প্রতিরোধ করে ।

যেসব দেশে জাতিগত প্রবৃত্তি প্রবল রয়েছে, সেখানে এই ধরনের প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুরু হতে পারে । এই ধরনের দেশগুলোর মধ্যে আমরা এমন কিছু উপাদান খুঁজে পেতে পারি, যা কোনো এক কারণে ,
জবরদস্তির মতো বিভিন্ন কারণে, তাদেরকে কঠোর জাতিগত ধারায় স্বাভাবিকভাবে প্রজনন করার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে । একবার এই জবরদস্তি দূর হয়ে গেলে, জাতিটির যে অংশ অক্ষত থাকে , তারা নিজেদের মধ্যেই প্রজনন করতে চায় এবং এর ফলে আরও মিশ্রণকে বাধা দেয় । এরপর সংকররা স্বাভাবিকভাবেই আড়ালে চলে যায় , যতক্ষণ না তাদের সংখ্যা এত বেড়ে যায় যে তারা তাদের জাতির বিশুদ্ধতা রক্ষাকারী উপাদানগুলোর বিরুদ্ধে মারাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে ।

যখন মানুষ তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হারিয়ে ফেলে এবং প্রকৃতি তার উপর যে কর্তব্য আরোপ করেছে তা উপেক্ষা করে, তখন যতক্ষণ না সেই হারানো প্রবৃত্তির বোধ পুনরুদ্ধার হয়, ততক্ষণ প্রকৃতি যা হারিয়েছে তা ফিরিয়ে দেবে এমন কোনো আশা থাকে না। তারপর যা হারিয়েছে তা পুনরুদ্ধারের কাজটি অবশ্যই সম্পন্ন করতে হবে । কিন্তু একটি গুরুতর আশঙ্কা রয়েছে যে, যারা একবার এই বিষয়ে অন্ধ হয়ে গেছে , তারা জাতিগত বাধাগুলো ভাঙতে থাকবে এবং অবশেষে তাদের ভেতরের শ্রেষ্ঠ গুণের শেষ চিহ্নটুকুও হারিয়ে ফেলবে । তখন কেবল সেই একঘেয়ে জগাখিচুড়িই অবশিষ্ট থাকবে, যার স্বপ্ন আমাদের স্বপ্নবিলাসীরা দেখে বলে মনে হয়। কিন্তু এই জগাখিচুড়ি দ্রুত সমস্ত আদর্শ ত্যাগ করবে। একটি বিশাল জনতা অবশ্যই তৈরি করা যেতে পারে ; কিন্তু এমন মিশ্রণ থেকে কোনো সভ্যতার উদ্ভব হবে না।

মানবজাতিকে শেষ হয়ে গেছে বলে গণ্য করা হবে ।

যারা এটি ঘটতে দিতে চান না, তাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে এই বিকৃতির প্রক্রিয়া থামানো বিশেষত জার্মান রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব ।

আমাদের বর্তমান প্রজন্মের দুর্বলচিত্তেরা স্বাভাবিকভাবেই এমন নীতির নিন্দা করবে এবং ঘ্যানঘ্যান করবে ।
এবং অভিযোগ করে যে এটি সবচেয়ে পবিত্র মানবাধিকারের লঙ্ঘন । কিন্তু সবচেয়ে পবিত্র অধিকার কেবল একটিই , যা সবচেয়ে পবিত্র কর্তব্যও বটে। এই অধিকার ও কর্তব্য হলো জাতির রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা , যাতে শ্রেষ্ঠ মানুষেরা সংরক্ষিত হতে পারে এবং এর মাধ্যমে মানবজাতির এক মহত্তর বিকাশ সম্ভব হয়।

রাষ্ট্রের উচিত অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবাহকে একটি অবিরাম জাতিগত কেলেঙ্কারির স্তর থেকে উন্নীত করা। রাষ্ট্রের উচিত একে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ও সাদৃশ্যে সত্তা সৃষ্টির জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে পবিত্র করা , মানুষ ও বানরের মিশ্রণে দানব তৈরির জন্য নয় । মানবতার নামে যে প্রতিবাদ করা হচ্ছে, তা এমন একটি প্রজন্মের জন্য অনুপযুক্ত, যারা সবচেয়ে অধঃপতিতদের বংশবৃদ্ধি করার অনুমতি দেয় , যার ফলে তারা তাদের নিজেদের এবং তাদের সমসাময়িকদের উপর অবর্ণনীয় দুর্ভোগ চাপিয়ে দেয় ; অথচ অন্যদিকে, গর্ভনিরোধক প্রতিটি ফার্মেসিতে এবং এমনকি রাস্তার হকারদের দ্বারাও অনুমোদিত ও বিক্রি হয় , যার ফলে আমাদের সবচেয়ে স্বাস্থ্যবান মানুষদের মধ্যেও সন্তানের জন্ম হয় না। আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রে , যার কাজ হলো...

শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় বাধা দেওয়াকে আমাদের জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি অপরাধ বলে মনে করে ।

Machine Translated by Google

সিফিলিস, যক্ষ্মা এবং অন্যান্য বংশগত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি, পঙ্গু ও নির্বোধদের প্রজনন প্রতিরোধ করা হয় । কিন্তু আমাদের লক্ষ লক্ষ শ্রেষ্ঠ মানুষের মধ্যে প্রজননের এই বাস্তবিক প্রতিরোধকে মন্দ বলে মনে করা হয় না, কিংবা এটি এই সামাজিক শ্রেণীর মহৎ নৈতিকতাকে আঘাত করে না ; বরং এটি তাদের দূরদৃষ্টির অভাব এবং মানসিক জড়তাকে আরও উস্কে দেয়। অন্যথায়, তারা তাদের মস্তিষ্ক ব্যবহার করে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজত যে, কীভাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পুষ্টি ও ভরণপোষণের জন্য এমন পরিবেশ তৈরি করা যায় , যারা আমাদের জাতির সুস্থ প্রতিনিধি হবে এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্মের জীবন ও ভরণপোষণের জন্যও পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

সমগ্র আধুনিক ব্যবস্থাটি কী ভীষণ আদর্শহীন ও লজ্জাজনক! ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির মর্যাদার উপর জোর দেওয়া অব্যাহত রেখেও , গির্জাগুলো যে সেই প্রতিমূর্তির বিরুদ্ধে এই পাপে সামিল হয় , তা তাদের বর্তমান কার্যকলাপের সঙ্গেই সামঞ্জস্যপূর্ণ। তারা আত্মার কথা বলে, কিন্তু অনুমতি দেয়...
যারা আধ্যাত্মিকতার প্রতিমূর্তি, তারাও অধঃপতিত হয়ে সর্বহারা শ্রেণীতে পরিণত হয়। পরবর্তীতে , তারা বিস্ময়ের সাথে দেখে যখন তারা উপলব্ধি করে যে তাদের নিজেদের দেশে খ্রিস্টধর্মের প্রভাব কত সামান্য এবং শারীরিক ও নৈতিকভাবে অধঃপতিত এই উচ্ছৃঙ্খল জনতা কতটা ঈশ্বরবিহীন ও অধঃপতিত।
অধঃপতিত। এই অবস্থার ক্ষতিপূরণ করতে, তারা হটেন্টট, জুলু এবং কাফিরদের ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করে এবং তাদের উপর গির্জার আশীর্বাদ বর্ষণ করে। অন্যদিকে, ইউরোপীয়রা, ঈশ্বরের কৃপায় , নৈতিক অধঃপতনের শিকার হিসেবে নিজেদের অবস্থায় থাকে , ধার্মিক মিশনারিরা ভান করে।
মধ্য আফ্রিকায় গিয়ে কৃষ্ণাঙ্গদের ধর্মান্তরিত করা । অবশেষে , সুস্থ ও বিচক্ষণ —যদিও আদিম ও পশ্চাৎপদ—মানুষ আমাদের "উচ্চতর সভ্যতার" নামে একদল অলস ও পাশবিক সংকর প্রাণীতে রূপান্তরিত হবে ।

এটা মহৎ মানবিক আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আরও বেশি সঙ্গতিপূর্ণ হতো যদি খ্রিস্টান সম্প্রদায় দুটি কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদেরকে তাদের অনাকাঙ্ক্ষিত ধর্মোপদেশ দিয়ে বিরক্ত করা বন্ধ করত ।
এবং তারা বোঝে না। এর চেয়ে ভালো হতো যদি তারা এই চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে শিক্ষকতা করার চেষ্টা করত।
ইউরোপের মানুষেরা সদয় ও শান্তভাবে বোঝেন যে, যদি কোনো অসুস্থ দম্পতি একজন গরীব অনাথকে ভালোবাসা দেখায় এবং তার বাবা-মা হয়ে ওঠে, তবে তা ঈশ্বরকে অনেক বেশি সন্তুষ্ট করে; এর চেয়ে যে , তারা এমন একজন অসুস্থ শিশুকে জীবন দেবে যে সকলের জন্য দুঃখ-কষ্ট ও দুর্দশার কারণ হবে।

এই ক্ষেত্রে, সকল পক্ষের দ্বারা এই সমস্যার বর্তমান অবহেলার ফলে সৃষ্ট ক্ষতি জাতি-রাষ্ট্রকে অবশ্যই মেরামত করতে হবে । জাতি-রাষ্ট্রের কাজ হবে জাতিগত পরিচয়কে সামাজিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করা। একে অবশ্যই জাতিগত বিশুদ্ধতা বজায় রাখা নিশ্চিত করতে হবে । একে অবশ্যই এই সত্য ঘোষণা করতে হবে যে, একটি শিশু একটি জাতির সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। একে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে কেবল সুস্থ মানুষই সন্তানের জন্ম দেবে; অসুস্থ বা বংশগত ত্রুটিযুক্ত পিতামাতার পক্ষে এই পৃথিবীতে সন্তান আনা একটি লজ্জার বিষয় , এবং এমন ক্ষেত্রে তা থেকে বিরত থাকা একটি বড় সম্মানের বিষয় । কিন্তু অন্যদিকে, বিরত থাকাকে অবশ্যই নিন্দনীয় বলে গণ্য করতে হবে।

জাতিকে একটি সুস্থ সন্তান উপহার দেওয়া থেকে। এই বিষয়ে, রাষ্ট্রকে অবশ্যই হাজার বছরের ভবিষ্যতের ট্রাস্টি হিসেবে কাজ করতে হবে , যার সামনে ব্যক্তির স্বার্থপর চাহিদার কোনো মূল্য নেই এবং অবশ্যই
রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের কাছে নতি স্বীকার করতে হবে । বাস্তবে এই বাধ্যবাধকতা পূরণের জন্য , রাষ্ট্রকে অবশ্যই আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের আবিষ্কারসমূহ ব্যবহার করতে হবে। দৃশ্যমান বংশগত রোগে আক্রান্ত বা এর বাহক এমন সকলকে রাষ্ট্রকে অবশ্যই সন্তান উৎপাদনের জন্য অযোগ্য ঘোষণা করতে হবে; এবং এই ব্যক্তিদের বন্ধ্যাকরণের জন্য বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে । অন্যদিকে, স্বাভাবিক প্রজননক্ষম নারীকে সহায়তা করা প্রয়োজন, যাতে তার প্রজনন ক্ষমতা এমন কোনো আর্থিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা সীমাবদ্ধ না হয়, যা সন্তান লাভের আশীর্বাদকে তার পিতামাতার জন্য অভিশাপ হিসেবে দেখে। বৃহৎ পরিবারের জন্য সামাজিক সুযোগ-সুবিধার সমস্যাটির প্রতি যে কাপুরুষোচিত এবং এমনকি অপরাধমূলক উদাসীনতা দেখানো হয় , রাষ্ট্রকে তার অবসান ঘটাতে হবে এবং অবশ্যই হতে হবে...

মানুষকে প্রদত্ত এই সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদের সর্বোচ্চ রক্ষক । তাঁর মনোযোগ ও যত্ন প্রাপ্তবয়স্কদের চেয়ে শিশুদের প্রতিই নিবদ্ধ থাকা উচিত।

যারা শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ, তারা নিজেদের কষ্ট সন্তানদের দেহে সঞ্চারিত করতে পারেন না । শিক্ষাগত দৃষ্টিকোণ থেকে, রাষ্ট্রের জন্য এটি একটি বিশাল দায়িত্ব । কিন্তু ভবিষ্যতে এই কাজটি আমাদের বর্তমান বুর্জোয়া যুগের বিজয়ী যুদ্ধগুলোর চেয়েও বৃহত্তর ও অধিক তাৎপর্যপূর্ণ হবে । শিক্ষার মাধ্যমে রাষ্ট্রকে অবশ্যই প্রত্যেক ব্যক্তিকে শেখাতে হবে যে, অসুস্থতা কোনো লজ্জার বিষয় নয় , বরং করুণার যোগ্য এক দুর্ভাগ্য ; কোনো অপরাধ নয়।

Machine Translated by Google

শুধুমাত্র স্বার্থপরতার বশে নিরীহ প্রাণীদের মধ্যে রোগ ও ত্রুটি ছড়িয়ে দিয়ে পরিস্থিতি আরও খারাপ করে তোলা একটি লজ্জাজনক ও অসম্মানজনক কাজ।

রাষ্ট্রকে অবশ্যই জনগণকে এই শিক্ষাও দিতে হবে যে, বংশগত রোগে নির্দোষভাবে আক্রান্ত কোনো ব্যক্তির সন্তান ধারণ থেকে বিরত থাকা এবং এমন এক অচেনা শিশুর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করা এক সত্যিকারের মহৎ ও প্রশংসনীয় মানবিক কাজ, যে শিশুটি তার স্বাস্থ্যের বদৌলতে একটি সুস্থ সমাজের বলিষ্ঠ সদস্য হয়ে উঠতে পারে। এই শিক্ষামূলক কাজটি সম্পাদনের মাধ্যমে রাষ্ট্র নৈতিক ক্ষেত্রে তার কর্মকাণ্ডকে সমন্বিত করে।

তার কাজ বোঝা যাবে বা ভুল ব্যাখ্যা করা হবে , নিন্দিত হবে বা প্রশংসিত হবে— তা নির্বিশেষে তাকে অবশ্যই এই নীতি অনুসারে কাজ করতে হবে।

যদি ৬০০ বছর ধরে শারীরিক অবক্ষয়গ্রস্ত বা মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিদের বন্ধ্যাকরণ করা হতো, তবে মানবজাতি কেবল বিরাট দুর্ভাগ্য থেকেই রক্ষা পেত না , বরং এমন এক সার্বিক স্বাস্থ্য ফিরে পেত যা এখন কল্পনা করাও কঠিন।

যদি জাতির সুস্থ অংশের উর্বরতাকে সচেতন ও পদ্ধতিগতভাবে কাজে লাগানো হতো, তাহলে অন্তত এমন একটি জাতির সূচনা হতো যেখান থেকে আমাদের নৈতিক ও শারীরিক অবক্ষয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ানো সমস্ত জীবাণু নির্মূল হয়ে যেত। যদি জাতি ও রাষ্ট্র জাতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে মূল্যবান জাতির মূল অংশের বিকাশের জন্য কাজ করত এবং এর উর্বরতা বৃদ্ধি করত, তাহলে সমগ্র জাতি সবচেয়ে মূল্যবান উপহারটি উপভোগ করত – সত্যিকারের মহৎ বংশধারার ভিত্তিতে সৃষ্ট একটি জাতির গুণাবলী । এটি অর্জনের জন্য, রাষ্ট্রের উচিত নয়, সর্বোপরি, নতুন অধিগ্রহণ করা অঞ্চলগুলোকে এলোমেলোভাবে উপনিবেশে পরিণত করা, বরং নির্দিষ্ট কিছু নীতি অনুসারে তা পরিচালনা করা উচিত। বিশেষ যোগ্য কমিটিগুলোর উচিত প্রতিটি ইউনিটকে উপনিবেশ স্থাপনের অনুমতি দিয়ে সনদপত্র প্রদান করা , এবং এই সনদপত্রগুলো ইউনিটগুলোর জাতিগত বিশুদ্ধতার নিশ্চয়তা দেবে। এইভাবে, ধীরে ধীরে এমন সীমান্ত উপনিবেশ তৈরি করা সম্ভব, যার বাসিন্দারা হবে জাতিগতভাবে সবচেয়ে বিশুদ্ধ এবং ফলস্বরূপ সর্বোত্তম জাতিগত বৈশিষ্ট্য ধারণ করবে । এই ধরনের উপনিবেশগুলো হবে

সমগ্র জাতির কাছে মূল্যবান । তাদের বিকাশ জাতির প্রতিটি নাগরিকের জন্য আনন্দ, আত্মবিশ্বাস এবং গর্বের উৎস হবে , কারণ তাদের মধ্যে সেই বিশুদ্ধ বীজ থাকবে যা শেষ পর্যন্ত জাতি এবং সমগ্র মানবজাতির মহান বিকাশের দিকে পরিচালিত করবে। যে বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি রাষ্ট্রকে জাতিগত ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে তোলে, তা শেষ পর্যন্ত

এক মহত্তর যুগের সূচনা করবে , যেখানে মানুষ আর কেবল বিশুদ্ধ জাতের কুকুর, ঘোড়া এবং বিড়ালের প্রজননের দিকে মনোযোগ দেবে না , বরং মানবজাতির উন্নতির জন্য সচেষ্ট হবে । এক শ্রেণীর মানুষের জন্য এটি হবে নীরবতা ও ত্যাগের যুগ, আর অন্যরা আনন্দের সাথে নিজেদের উৎসর্গ করবে ।

এই ধরনের মানসিকতা সম্ভব হতে পারে , যার প্রমাণ হলো শত শত ও হাজার হাজার মানুষ গির্জার নিয়ম ছাড়া অন্য কোনো কিছুর দ্বারা বাধ্য না হয়ে , নিজেদের ইচ্ছাতেই ব্রহ্মচর্যের নীতি গ্রহণ করে । তাহলে, এই ধরনের নীতির পরিবর্তে যদি তাদের বলা হতো যে, বংশবিধ্বংসী এই আদি পাপের অবসান ঘটানো উচিত , যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ক্রমাগত চলে আসছে , তবে কেন মানুষকে এই ত্যাগের জন্য রাজি করানো যেত না? অধিকন্তু, তাদের উপলব্ধি করা উচিত ছিল যে, সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তাকে তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট সত্তাসমূহ উৎসর্গ করা তাদের পবিত্র কর্তব্য ।

অবশ্যই, আমাদের এই হতভাগ্য আধুনিক অসভ্যদের সেনাবাহিনী এটা বুঝবে না। তারা
তারা তাদের সেই চিরন্তন অজুহাত নিয়ে বিদ্রূপ করে, কাঁধ ঝাঁকায় আর ঘ্যানঘ্যান করে : "অবশ্যই, এটা একটা দারুণ ধারণা, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এটা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয় ।" আর আমরা উত্তর দেব: "আপনাদের ক্ষেত্রে এটা আসলেই বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয় , কারণ আপনাদের জগৎ এই ধরনের ধারণার জন্য অক্ষম। আপনাদের একটাই চিন্তা, আর তা হলো আপনাদের নিজেদের অস্তিত্ব। আপনাদের ঈশ্বর একটাই, আর তা হলো টাকা।"
তবে, আমরা সাহায্যের জন্য তোমাদের দিকে ফিরি না , বরং তাদের সেই বিশাল বাহিনীর দিকে ফিরি, যারা এতটাই দরিদ্র যে নিজেদের অস্তিত্বকে পৃথিবীর সর্বোচ্চ মঙ্গল বলে মনে করে না। তারা টাকাকে বিশ্বাস করে না, বরং অন্য দেবতাদের ওপর ভরসা করে এবং তাদের হাতেই নিজেদের জীবন সঁপে দেয় । সর্বোপরি, আমরা তরুণ জার্মানদের সেই বিশাল বাহিনীর দিকেই তাকাই। তারা এক মহান যুগে বেড়ে উঠছে এবং তারা তাদের পিতাদের অলসতা ও উদাসীনতার কারণে সৃষ্ট অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করবে । অথবা এই তরুণ জার্মানরাই একদিন সৃষ্টি করবে...

Machine Translated by Google

জাতিগত ধারণার উপর ভিত্তি করে একটি নতুন রাষ্ট্র, নতুবা তারাই হবে বুর্জোয়া বিশ্বের সম্পূর্ণ পতন ও মৃত্যুর শেষ সাক্ষী।

যদি কোনো প্রজন্ম এমন সব ত্রুটিতে ভোগে যা তারা চেনে এবং স্বীকারও করে , তবুও আজকের বুর্জোয়া বিশ্বের মতো তারা বেশ আত্মতুষ্ট থাকে এবং এই সস্তা অজুহাত দেখায় যে পরিস্থিতির উন্নতির জন্য কিছুই করা সম্ভব নয়, তাহলে সেই প্রজন্ম বিপর্যয়ের দিকে ধাবিত হয়। আমাদের বুর্জোয়া বিশ্বের একটি স্পষ্ট বৈশিষ্ট্য হলো, এটি বিদ্যমান মন্দকে আর অস্বীকার করতে পারে না। একে স্বীকার করতেই হয় যে অনেক কিছুই মন্দ ও জঘন্য; কিন্তু এই মন্দের বিরুদ্ধে লড়াই করার সংকল্প নিতে এটি অক্ষম , যার অর্থ হবে ৬০ বা ৭০ মিলিয়ন মানুষকে একত্রিত করে এই হুমকির মোকাবিলা করা। এটি ঠিক তার উল্টোটা করে। যখন কোথাও এমন কোনো প্রচেষ্টা চালানো হয়, তখন এটি নির্বোধ মন্তব্যে মগ্ন থাকে এবং নিরাপদ দূরত্ব থেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে এই ধরনের উদ্যোগ তাত্ত্বিকভাবে অসম্ভব এবং ব্যর্থ হতে বাধ্য। নিজেদের অপ্রাসঙ্গিক মতামত এবং জঘন্য নৈতিক মনোভাবের স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য কোনো যুক্তিই খুব বেশি নির্বোধ নয়। উদাহরণস্বরূপ , যদি একটি গোটা মহাদেশ মানুষকে এই বিধ্বংসী মহামারী থেকে মুক্ত করার জন্য মদ্যপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তবে আমাদের বুর্জোয়া ইউরোপীয়রা বোকার মতো আড়চোখে তাকাবে, সন্দেহে মাথা নাড়বে এবং উদ্ধতভাবে তাচ্ছিল্য করে আন্দোলনটিকে নিয়ে হাসবে — এই হাস্যকর সমাজে এমনই মানসিকতা বিরাজ করে। কিন্তু যখন এই সমস্ত মূর্খতা মূল বিষয়টিকে এড়িয়ে যায় , এবং বিশ্বের কোনো অংশে এই মহৎ মনোভাব সফলভাবে বাস্তবায়িত হয় ও আন্দোলনটি সাফল্য অর্জন করে, তখন সেই সাফল্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয় বা তার বৈধতাকে খাটো করে দেখা হয়। এমনকি নৈতিক নীতিগুলোকেও এমন একটি আন্দোলনের বিরুদ্ধে এই অপপ্রচার অভিযানে ব্যবহার করা হয়, যার লক্ষ্য হলো অনৈতিকতার প্রধান উৎসকে রুখে দেওয়া।

না। এই বিষয়ে কোনো ভ্রান্ত ধারণায় প্রতারিত হওয়ার সামর্থ্য আমাদের নেই। আমাদের আধুনিক বুর্জোয়া জগৎ যেকোনো মহৎ মানবিক কাজের জন্য অকেজো হয়ে পড়েছে, কারণ এটি সমস্ত উচ্চতর মূল্যবোধ হারিয়েছে এবং এটি অশুভ; আমি মনে করি।
তবে, এর কারণ এই নয় যে মানুষ মন্দ চায়, বরং তারা এর বিরোধিতা করতে খুবই অলস। তাই , এই রাজনৈতিক ক্লাবগুলো, যারা নিজেদের ' বুর্জোয়া দল ' বলে,
কেবলমাত্র নির্দিষ্ট পেশাজীবী গোষ্ঠী ও শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষাকারী ইউনিয়নগুলোই তাদের কাজ। তাদের সর্বোচ্চ লক্ষ্য হলো সাধ্যমতো নিজেদের স্বার্থপর স্বার্থ রক্ষা করা। এটা স্পষ্ট যে, বুর্জোয়া রাজনীতিবিদদের নিয়ে গঠিত এমন একটি সংঘকে লড়াই করতে অক্ষম বলে গণ্য করা যেতে পারে , বিশেষ করে যখন প্রতিপক্ষ সতর্ক দোকানদার নয় , বরং চরমভাবে উত্তেজিত এবং সহিংসতা ব্যবহারে দ্বিধাহীন সর্বহারা জনসাধারণ।

যদি আমরা জাতির শ্রেষ্ঠ উপাদানগুলোর বিকাশকে রক্ষা ও উৎসাহিত করার মাধ্যমে জাতির সার্বিক কল্যাণ সাধন করাকে রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্য বলে বিবেচনা করি , তবে এর যৌক্তিক পরিণতি এই যে, এই কাজটি কেবল সেই জাতি ও দেশের নতুন সদস্যদের জন্য সংক্রান্ত পদক্ষেপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না , বরং রাষ্ট্রকে অবশ্যই মনোযোগ দিতে হবে ...

সেইসাথে শিক্ষা, যাতে প্রত্যেক নাগরিক জাতির ভবিষ্যৎ উন্নয়নে এক মূল্যবান উপাদান হয়ে ওঠে।

যেমনভাবে প্রত্যেক মানুষের মানসিক দক্ষতার জন্য জাতিগত বৈশিষ্ট্য সাধারণত একটি পূর্বশর্ত , তেমনি ব্যক্তির প্রশিক্ষণও প্রাথমিকভাবে একটি সুস্থ শরীর গঠনের দিকে পরিচালিত হওয়া উচিত। সাধারণ নিয়মটি হলো , একটি শক্তিশালী ও সুস্থ মন কেবল একটি শক্তিশালী ও সুস্থ শরীরেই পাওয়া যায়। প্রতিভাবান ব্যক্তিরা যে কখনও কখনও সুস্থ ও শক্তিশালী হন না, বা এমনকি দুর্বলচিত্ত হন , তা এই নীতির বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ নয়। এই ঘটনাগুলো কেবল ব্যতিক্রম, যা অন্য সব ক্ষেত্রের মতোই নিয়মটিকে প্রমাণ করে। কিন্তু যখন একটি জাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ শারীরিক দিক থেকে অধঃপতিতদের নিয়ে গঠিত হয়, তখন এমন করুণ জনতা থেকে একটি মহান চেতনার উদ্ভব খুব কমই ঘটে। এবং যাই হোক না কেন, এর প্রচেষ্টা খুব একটা সফল হবে না। অধঃপতিত জনতা হয় এটিকে একেবারেই বুঝতে পারবে না, অথবা তাদের ইচ্ছাশক্তি এতটাই দুর্বল হবে যে তারা এটিকে অনুসরণ করতে অক্ষম হবে।

জাতিগত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি রাষ্ট্র, যা এই সত্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করে, তার শিক্ষামূলক কার্যক্রমকে কেবল জ্ঞান বিতরণের উপর নয়, বরং শারীরিক প্রশিক্ষণ এবং সুস্থ দেহ গঠনের উপর ভিত্তি করে গড়ে তুলবে। বৌদ্ধিক গুণাবলীর গঠন গুরুত্বপূর্ণ।

Machine Translated by Google

গৌণ নয়। সর্বোপরি, চরিত্র, ইচ্ছাশক্তি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থাকে অবশ্যই দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তুতির মনোভাব জাগিয়ে তুলতে হবে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকে সর্বনিম্ন গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করতে হবে । তদনুসারে, জাতিগত ধারণার উপর ভিত্তি করে গঠিত একটি রাষ্ট্রকে অবশ্যই ধরে নিতে হবে যে, একজন শিক্ষিত ও মার্জিত দুর্বল ব্যক্তির চেয়ে , যার আনুষ্ঠানিক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তুলনামূলকভাবে সীমিত কিন্তু যিনি শারীরিকভাবে সুস্থ ও সবল, দৃঢ় ও সৎ চরিত্রের অধিকারী, সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রস্তুত ও সক্ষম এবং ইচ্ছাশক্তিতে সমৃদ্ধ , তিনি জাতীয় সম্প্রদায়ের একজন অধিকতর উপকারী সদস্য । শারীরিকভাবে দুর্বল , সিদ্ধান্তে দ্বিধাগ্রস্ত , ভীরু শান্তিবাদী শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত একটি জাতি এই পৃথিবীতে নিজেদের অস্তিত্বও নিশ্চিত করতে পারে না। যে তিক্ত সংগ্রাম একজন ব্যক্তির ভাগ্য নির্ধারণ করে , সেখানে জ্ঞানের অভাবে কোনো ব্যক্তির ব্যর্থ হওয়া অত্যন্ত বিরল । যারা ব্যর্থ হয়, তারা এই পরিণতিগুলোকে উপেক্ষা করার চেষ্টা করে এবং তা বাস্তবায়ন করতে ভয় পায় । মন ও শরীরের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ভারসাম্য থাকা আবশ্যক । একটি দুর্বল শরীরও ততটা সুন্দর দৃশ্য নয়, যদি তার মধ্যে একটি উজ্জ্বল আত্মা বাস করে। যারা শারীরিকভাবে বিকৃত ও পঙ্গু, যাদের ইচ্ছাশক্তি নেই এবং যারা কাপুরুষ, তাদের সর্বোচ্চ মানসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করলে আমরা ন্যায়সঙ্গত কাজ করব না । সৌন্দর্যের গ্রিক আদর্শ অমর, কারণ এটি অলৌকিকভাবে শারীরিক সৌন্দর্যের সাথে মন ও আত্মার মহত্ত্বকে একত্রিত করে।

মল্টকের এই উক্তিটি যে দীর্ঘমেয়াদে ভাগ্য কেবল কার্যকর জিনিসেরই সহায় হয়, তা দেহ ও আত্মার সম্পর্কের ক্ষেত্রে অবশ্যই সত্য । একটি সুস্থ দেহে সাধারণত একটি সুস্থ মনই বাস করে ।

তদনুসারে, জাতি-রাষ্ট্রে শারীরিক প্রশিক্ষণ কেবল একটি ব্যক্তিগত বিষয় নয়। কিংবা এটি এমন কোনো কর্তব্যও নয় যা প্রাথমিকভাবে পিতামাতার ওপর এবং দ্বিতীয় বা তৃতীয়ত রাষ্ট্রের ওপর বর্তায় ; বরং এটি রাষ্ট্র কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকৃত ও সুরক্ষিত জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য একটি অপরিহার্য বিষয়। ঠিক যেমনভাবে নিছক আনুষ্ঠানিক শিক্ষা এখন ব্যক্তির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং সম্প্রদায়ের অধিকারের সঙ্গে সাংঘর্ষিক, তেমনি এটি সম্মতি বা অসম্মতি নির্বিশেষে শিশুকে একটি বাধ্যতামূলক স্কুল ব্যবস্থার অধীনে আনার দাবি করে ।

অভিভাবকগণ। একইভাবে এবং আরও উচ্চ মাত্রায়, নতুন জাতি -রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব একদিন জাতীয় নিরাপত্তার সমস্যা বিষয়ে ব্যক্তিদের অজ্ঞতা ও ভুল বোঝাবুঝির উপর বিজয় লাভ করবে। একে তার শিক্ষামূলক কার্যক্রম এমনভাবে সংগঠিত করতে হবে, যা শৈশবকাল থেকে মানুষের শরীরকে পদ্ধতিগতভাবে প্রশিক্ষিত করবে , তাদের শক্তিশালী করবে এবং পরবর্তী জীবনে তাদের উপর আরোপিত চাহিদার জন্য প্রস্তুত করবে ।

সর্বোপরি, রাষ্ট্রকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যেন ঘরকুনো একটি প্রজন্ম গড়ে না ওঠে ।
নবজাতক মায়ের থেকেই শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিধির সূচনা হওয়া উচিত । কয়েক দশক ধরে অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে জন্মকালীন সংক্রমণ নির্মূল করা এবং প্রসবোত্তর জ্বরের ঘটনা তুলনামূলকভাবে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। সুতরাং , নার্স ও মায়েদের যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একেবারে শৈশব থেকেই শিশুকে প্রশিক্ষিত করার এমন একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, যা তার ভবিষ্যৎ বিকাশের জন্য একটি চমৎকার ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারে ।

রাষ্ট্রের উচিত বিদ্যালয়ে শারীরিক প্রশিক্ষণের জন্য আরও অনেক বেশি সময় বরাদ্দ করা। কচি মস্তিষ্কের উপর এমন বিপুল পরিমাণ তথ্য চাপিয়ে দেওয়া অর্থহীন, যা অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় , তারা খুব সামান্যই মনে রাখতে পারে এবং যার বেশিরভাগই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান নয় , বরং গৌণ ও অকেজো; কারণ কচি মন তার মধ্যে যা কিছু ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, তার মধ্য থেকে সঠিকটা বেছে নিতে অক্ষম।

আজকাল এমনকি উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমেও জিমন্যাস্টিকসের জন্য সপ্তাহে মাত্র দুই ঘণ্টা বরাদ্দ থাকে ; এবং আরও খারাপ ব্যাপার হলো, শিক্ষার্থীরা এতে অংশ নেবে কি না, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা পায়। এটি শিক্ষার এই শাখা এবং বিশুদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশিক্ষণের মধ্যে একটি গুরুতর অসামঞ্জস্য তুলে ধরে । এমন একটি দিনও থাকা উচিত নয় যেদিন একজন তরুণ শিক্ষার্থীর সকাল ও সন্ধ্যায় এক ঘণ্টা শারীরিক প্রশিক্ষণ থাকবে না; এর মধ্যে সব ধরনের খেলাধুলা ও জিমন্যাস্টিকস অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত ।
বিশেষ করে একটি খেলাকে সমর্থন করা উচিত, যদিও অনেকে এটিকে পাশবিক ও অশ্লীল বলে মনে করেন, আর সেটি হলো বক্সিং। এটা অবিশ্বাস্য যে কত ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে ।

Machine Translated by Google

"উন্নত" শ্রেণী। একজন যুবক যে ফেন্সিং শেখে এবং দ্বন্দ্বযুদ্ধে সময় কাটায়, তা বেশ স্বাভাবিক এবং সম্মানজনক বলে মনে করা হয় । কিন্তু বক্সিং নৃশংস। কেন? লড়াইয়ের মানসিকতা বিকাশের ক্ষেত্রে বক্সিংয়ের সমকক্ষ অন্য কোনো খেলা নেই , অন্য কোনো খেলায় এত দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতার প্রয়োজন হয় না , এবং অন্য কোনো খেলা শরীরকে খাঁটি ইস্পাতের মতো স্থিতিস্থাপকতা দেয় না। দুজন যুবকের জন্য তাদের বিবাদ মুষ্টি দিয়ে মেটানোটা , ধারালো ইস্পাতের টুকরো দিয়ে তা করার চেয়ে কোনোভাবেই বেশি অশোভন নয় ।

যে ব্যক্তি মুষ্টি দিয়ে আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করে, সে নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তির চেয়ে কম মানবিক কাজ করে না, যে পালিয়ে গিয়ে পুলিশের কাছে সাহায্য চায়। কিন্তু সর্বোপরি, একজন সুস্থ যুবককে অবশ্যই কঠিন আঘাত সহ্য করতে শিখতে হবে। এই নীতিটি আমাদের আধুনিক শাসকদের কাছে নিষ্ঠুর মনে হতে পারে , যারা কেবল মানসিক অস্ত্র দিয়েই যুদ্ধ করে। কিন্তু জাতি-রাষ্ট্রের লক্ষ্য সৌন্দর্যপিপাসু, শান্তিবাদী এবং শারীরিক অধঃপতিতদের উপনিবেশ তৈরি করা নয়। এই রাষ্ট্র কোনো সম্ভ্রান্ত অমার্জিত ব্যক্তি বা অবিবাহিতাকে আদর্শ মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে না , বরং পুরুষালি শক্তির এক সাহসী প্রতিমূর্তি এবং একজন মানবসন্তানের জন্মদানে সক্ষম নারীকে বিবেচনা করে ।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, খেলাধুলার কাজ শুধু ব্যক্তিকে শক্তিশালী, তীক্ষ্ণ ও সাহসী করে তোলাই নয়, বরং শরীরকে মজবুত করা এবং পরিবেশের প্রতিকূলতা মোকাবিলার জন্য তাকে প্রশিক্ষিত করাও।

যদি আমাদের উচ্চবিত্ত শ্রেণি এমন উন্নত শিক্ষা না পেয়ে তার বদলে মুষ্টিযুদ্ধ শিখত, তাহলে গুণ্ডা, পলাতক সৈন্য এবং অন্যান্য দুষ্কৃতকারীদের পক্ষে জার্মানিতে বিপ্লব চালানো কখনোই সম্ভব হতো না । এই বিপ্লবের সাফল্য এর উদ্যোক্তাদের সাহসী, উদ্যমী ও দুঃসাহসিক কার্যকলাপের কারণে নয়, বরং তৎকালীন জার্মানি শাসক এবং এর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শোচনীয় কাপুরুষতা ও সিদ্ধান্তহীনতার কারণে হয়েছিল। কিন্তু আমাদের শিক্ষিত নেতারা কেবল "বৌদ্ধিক" প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন এবং তাই যখন তাদের প্রতিপক্ষরা মানসিক অস্ত্রের পরিবর্তে লোহা ব্যবহার করেছিল , তখন তারা প্রতিরক্ষাহীন প্রমাণিত হয়েছিল। এই সবকিছু ঘটেছে শুধুমাত্র এই কারণে যে, আমাদের চমৎকার শিক্ষা ব্যবস্থা প্রকৃত মানুষ তৈরি করে না, বরং কেবল সরকারি কর্মকর্তা , প্রকৌশলী, প্রযুক্তিবিদ, রসায়নবিদ, লেখক, আইনজীবী এবং পরিশেষে অধ্যাপক তৈরি করে—যাতে বুদ্ধিজীবী শ্রেণি বিলুপ্ত না হয়ে যায়।

আমাদের নেতারা বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে বরাবরই অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন , কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ইচ্ছাশক্তির দিক থেকে তাঁরা সমালোচনার ঊর্ধ্বে নন ।

অবশ্যই, শিক্ষা কাপুরুষ স্বভাবের কাউকে সাহসী করে তুলবে না । কিন্তু যে ব্যক্তির মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা সাহস রয়েছে, সেও এই গুণটি বিকশিত করতে পারবে না, যদি তার অপর্যাপ্ত শিক্ষা তাকে শুরু থেকেই শারীরিক শক্তি ও ক্ষিপ্রতায় অন্যদের চেয়ে নিকৃষ্ট করে রাখে । সেনাবাহিনী এই সত্যের একটি প্রধান উদাহরণ যে, নিজের শারীরিক ক্ষমতা সম্পর্কে জ্ঞান সাহস এবং যুদ্ধ করার মানসিকতা তৈরি করে। সেনাবাহিনীতে অসাধারণ বীরের সংখ্যা কম, কিন্তু গড়পড়তা সবাই সাহসী । যুদ্ধের আগে জার্মান সৈন্যরা যে চমৎকার প্রশিক্ষণ পেয়েছিল, তা এই বিশাল বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের এমন এক দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, যা আমাদের শত্রুরা অসম্ভব বলে মনে করত । ১৯১৪ সালের গ্রীষ্মের শেষভাগ এবং শরৎকালে জার্মান সৈন্যরা একের পর এক বিজয়ের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় অদম্য সাহস ও বীরত্বের যে সমস্ত অমর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছিল , তা ছিল এই সুসংবদ্ধ প্রশিক্ষণেরই ফল। শেষ যুদ্ধের আগের দীর্ঘ শান্তির বছরগুলোতে, যে পুরুষরা প্রায় শারীরিকভাবে দুর্বল ছিল , তারাও অসাধারণ কীর্তি সম্পাদনে সক্ষম হয়ে ওঠে এবং তাদের মধ্যে যে আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠেছিল , তা সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধেও টলেনি।

বাকি বিশ্বের আঘাতে বিধ্বস্ত ও অরক্ষিত জার্মান জাতির আত্মবিশ্বাস থেকে আসা এই শক্তির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই আত্মবিশ্বাস আমাদের শিশুদের মধ্যে শৈশব থেকেই গেঁথে দিতে হবে । শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সমগ্র ব্যবস্থাটি শিশুর মধ্যে এই বিশ্বাস জাগিয়ে তোলার দিকে পরিচালিত হতে হবে যে, সে যে কোনো এবং সকলের মোকাবেলা করতে সক্ষম । যে জাতির সে অংশ, সেই জাতির অপরাজেয়তায় বিশ্বাস করার জন্য ব্যক্তিকে শারীরিক শক্তি ও সাহস পুনরুদ্ধার করতে হবে। পূর্বে, জার্মান সেনাবাহিনী বিজয়ের দিকে পরিচালিত হতো...

প্রতিটি ইউনিটের নিজেদের মধ্যে যে আত্মবিশ্বাস ছিল, এবং এই সমস্ত ইউনিটই তাদের কমান্ডে থাকা ব্যক্তিদের ওপর আস্থাশীল ছিল। জার্মান জাতির শক্তি পুনরুদ্ধার করতে হলে এই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন যে...

Machine Translated by Google

সে আবার তার স্বাধীনতার জন্য লড়তে পারে। কিন্তু এই দৃঢ় বিশ্বাস লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির মধ্যে এমন অনুভূতিরই চূড়ান্ত ফল হতে পারে। আর এখানেও আমাদের কোনো ভ্রান্ত ধারণা থাকতে পারে না।

আমাদের জাতির পতন সর্বব্যাপী হয়েছে, এবং এই দুর্ভাগ্য দূর করার প্রচেষ্টাও সর্বব্যাপী হতে হবে। এটা বিশ্বাস করা এক তিক্ত ও গুরুতর ভুল হবে যে, শৃঙ্খলা ও আনুগত্যের বর্তমান বুর্জোয়া প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমাদের জাতি আবার শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে। বর্তমান ব্যবস্থা, যা এখন পরাজয় মেনে নেওয়াকে অনুমোদন করে, তা পরিবর্তন করতে এবং আমাদের শত্রুদের মুখের উপর আমাদের দাসত্বের ভাঙা শেকল ছুঁড়ে ফেলতে হলে শুধু এটাই যথেষ্ট নয়। কেবলমাত্র জাতীয় শক্তির প্রাচুর্য এবং স্বাধীনতার জন্য এক প্রবল আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমেই আমরা যা হারিয়েছি তা পুনরুদ্ধার করতে পারি।

তরুণ-তরুণীদের পোশাক-পরিচ্ছদও এই লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত। এটা সত্যিই দুঃখজনক যে তরুণ-তরুণীরা ফ্যাশনের এমন উন্মাদনার শিকার হচ্ছে যা ' পোশাকই মানুষকে গড়ে তোলে'—এই পুরোনো প্রবাদটির অর্থকে বিকৃত করে দেয়।

বিশেষ করে তরুণদের শিক্ষায় পোশাকের ভূমিকা থাকা উচিত। যে ছেলে গ্রীষ্মকালে লম্বা, ঢিলেঢালা প্যান্ট পরে, গলা পর্যন্ত ঢাকা পোশাক পরে, সে শারীরিক ব্যায়ামের প্রতি কোনো আগ্রহ অনুভব করার ক্ষেত্রে কেবল তার পোশাকের কারণেই সীমাবদ্ধ থাকে। আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং সত্যি বলতে, এমনকি অহংকারকেও জাগিয়ে তুলতে হবে।

আমি সেই অহংকারের কথা বলছি না যা মানুষকে এমন সুন্দর পোশাক পরতে প্ররোচিত করে যা সবার সাধ্যের বাইরে, বরং আমি সেই অহংকারের কথা বলছি যা মানুষকে শারীরিক সৌন্দর্য বিকাশে চালিত করে। আর এক্ষেত্রে প্রত্যেকেই সাহায্য করতে পারে।

এটি পরবর্তী জীবনেও কাজে লাগবে। একজন তরুণীর শেখা প্রয়োজন।
তার প্রিয়তম। যদি আজ আমাদের নির্বোধ পোশাক-পরিচ্ছদের কারণে শারীরিক সৌন্দর্য পুরোপুরি আড়ালে চলে না যেত, তবে আমাদের হাজার হাজার মেয়ে তাদের বীভৎস বাঁকা চালের ইহুদি সংকরদের দ্বারা প্রতারিত হতো না। যারা শারীরিকভাবে সুন্দর, তাদের সামনে থাকাটাও জাতির স্বার্থে, যাতে জনগণের মধ্যে শারীরিক সৌন্দর্যের বিকাশকে উৎসাহিত করা যায়।

আজ আমাদের জন্য সামরিক প্রশিক্ষণ প্রশ্নাতীত, এবং একারণে এটিই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যা শান্তিকালীন সময়ে শারীরিক প্রশিক্ষণের অভাব অন্তত আংশিকভাবে পূরণ করে। তাই, আমি বিশ্বাস করি আমাদের সময়ে এর প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি। আমাদের পুরোনো সামরিক প্রশিক্ষণের সাফল্য কেবল ব্যক্তির শিক্ষাতেই নয়, বরং লিঙ্গ সম্পর্কের উপর এর প্রভাবেও সুস্পষ্ট ছিল। তরুণীরা সৈনিকদেরকেই বেশি পছন্দ করত, যারা সৈনিক ছিল না তাদের চেয়ে। জাতি-রাষ্ট্র সীমাবদ্ধ করতে পারে না

আনুষ্ঠানিক স্কুলজীবন পর্যন্ত শারীরিক প্রশিক্ষণের উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থাকতে পারে, কিন্তু স্কুল ছাড়ার পর, যখন তরুণ শরীর বিকাশমান থাকে, তখন ছেলেটিকে তার প্রশিক্ষণ চালিয়ে যাওয়ার দাবি অবশ্যই করতে হবে। পরবর্তী জীবনের সাফল্য অনেকাংশে সঠিক শারীরিক বিকাশের উপর নির্ভর করে। এটা ভাবা মূর্খতা যে, তরুণ নাগরিকদের শিক্ষার তত্ত্বাবধান করার রাষ্ট্রের অধিকার স্কুল ছাড়ার সাথে সাথে হঠাৎ করে শেষ হয়ে যায় এবং সামরিক চাকরির সময় তা পুনরায় শুরু হয়। এই অধিকার একটি বাধ্যবাধকতা, এবং সেই হিসেবে তা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে হবে।

সুস্থ মানুষ গড়ে তোলার প্রতি কোনো আগ্রহ না থাকা বর্তমান রাষ্ট্র এই কর্তব্যটি অপরাধমূলকভাবে অবহেলা করেছে। লাগাম হাতে নিয়ে যুবকদের শারীরিক প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখার পরিবর্তে, এটি আজকের যুবকদের রাস্তায় ও বেশ্যালয়ে কলুষিত হতে ছেড়ে দেয়।

সুস্থ পুরুষ ও মহিলা।

এই প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করার জন্য আপনি কোন পদ্ধতি বেছে নিচ্ছেন তা বিবেচ্য নয়।
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এটি অবশ্যই পরিচালনা করতে হবে এবং তা অর্জনের সর্বোত্তম উপায়গুলো প্রতিষ্ঠা করতে হবে। রাষ্ট্রকে স্কুল-পরবর্তী সময়ে যুবকদের শারীরিক প্রশিক্ষণকে মানসিক প্রশিক্ষণের মতোই একটি জনকর্তব্য হিসেবে বিবেচনা করা উচিত; এবং এই প্রশিক্ষণ অবশ্যই সরকারি প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত হতে হবে। এর সাধারণ লক্ষ্য হতে পারে পরবর্তী সামরিক সেবার জন্য প্রস্তুতি। তাহলে তরুণ নিয়োগপ্রাপ্তদের সবচেয়ে প্রাথমিক নীতিগুলো শেখানো আর সেনাবাহিনীর কাজ থাকবে না। বাস্তবে, সেনাবাহিনী তখন আর বর্তমান অর্থে নিয়োগপ্রাপ্তদের নিয়ে কাজ করবে না, বরং তাদের এমন তরুণদের সৈনিক হিসেবে রূপান্তরিত করতে হবে যাদের শারীরিক সক্ষমতা ইতিমধ্যেই প্রশিক্ষিত।

Machine Translated by Google

জাতি-রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীকে আর ছেলেদের হাঁটতে ও সোজা হয়ে দাঁড়াতে শেখাতে হবে না , বরং এটিই হবে দেশপ্রেমিক শিক্ষার চূড়ান্ত ও সর্বোচ্চ বিদ্যালয় । সেনাবাহিনীতে তরুণ সৈনিক অস্ত্র চালনার কলা শিখবে, কিন্তু একই সাথে পরবর্তী জীবনের অন্যান্য কর্তব্যের জন্যও প্রস্তুত হবে । সামরিক শিক্ষার সর্বোচ্চ লক্ষ্য অবশ্যই হতে হবে...

সর্বদা সেই নীতিটি অর্জন করা , যা প্রাচীন সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ মূল্যবোধ হিসেবে বিবেচিত হতো: অর্থাৎ, সামরিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একটি ছেলেকে পুরুষে রূপান্তরিত হতে হবে; তাকে শুধু আনুগত্যই শিখতে হবে না , বরং এমন ভিত্তিও অর্জন করতে হবে যা একদিন তাকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা দেবে। তাকে শুধু সঠিক তিরস্কারের সময়ই নয়, বরং ভুল তিরস্কারের সময়েও নীরব থাকতে শিখতে হবে ।

তাছাড়া , নিজের শক্তির সচেতনতার মাধ্যমে এবং অনুপ্রেরণাদায়ক চেতনার ভিত্তিতে
তাকে ও তার সঙ্গীদের অবশ্যই এই বিশ্বাসে উপনীত হতে হবে যে, সে অপরাজেয় জনগোষ্ঠীরই একজন।

সামরিক প্রশিক্ষণ শেষে একজন সৈনিককে দুটি সনদপত্র প্রদান করা হয়। প্রথমটি হলো নাগরিকত্বের সনদ, যা তাকে জনজীবনে অংশগ্রহণের অধিকার প্রদানকারী একটি আইনি দলিল। দ্বিতীয়টি হলো শারীরিক স্বাস্থ্যের সনদ, যা বিবাহের জন্য তার উপযুক্ততার নিশ্চয়তা দেয়।

রাষ্ট্রকে অবশ্যই ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের শিক্ষাও একই মৌলিক নীতি অনুসারে পরিচালনা করতে হবে। এক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত।
শারীরিক প্রশিক্ষণ, এবং কেবল তারপরেই মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে । একটি মেয়ের শিক্ষায় যে পরম লক্ষ্যটি সর্বদা মনে রাখতে হবে তা হলো , সে একদিন মা হবে।

দ্বিতীয়ত, জাতি-রাষ্ট্রকে অবশ্যই চরিত্র শিক্ষার উপর মনোযোগ দিতে হবে, ব্যবহার করে
এই উদ্দেশ্যে সকল উপলব্ধ উপায় ব্যবহার করে ।

অবশ্যই, একজন ব্যক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো তার শিক্ষাজীবন শুরু করার আগেই বিদ্যমান থাকে । যে ব্যক্তি স্বভাবগতভাবে স্বার্থপর, সে চিরকাল তাই থাকবে, এবং একজন আদর্শবাদী চিরকাল স্বভাবগতভাবে আদর্শবাদীই থাকবে। কিন্তু যাদের চরিত্র আগে থেকেই সুনির্দিষ্ট , তাদের বাইরেও এমন লক্ষ লক্ষ মানুষ আছে যাদের চরিত্র অসংজ্ঞায়িত এবং অস্পষ্ট।

জন্মগত অপরাধী চিরকালই অপরাধী থাকবে, কিন্তু অপরাধমূলক কাজ করার নির্দিষ্ট কিছু প্রবণতা থাকা সত্ত্বেও অনেকে যথাযথ শিক্ষা পেলে সমাজের উপকারী সদস্য হতে পারে ; অপরদিকে, শিক্ষা ব্যবস্থা খারাপ হলে দুর্বল ও অস্থির চরিত্রের মানুষ সহজেই খারাপ লোকে পরিণত হতে পারে।

যুদ্ধ চলাকালীন প্রায়শই অভিযোগ করা হতো যে আমাদের জাতির পর্যাপ্ত মজুদ নেই। এই ঘাটতির কারণে শত্রুর কাছ থেকে এমনকি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গোপনীয় বিষয়গুলোও গোপন রাখা খুব কঠিন হয়ে পড়েছিল ।
কিন্তু আসুন আমরা নিজেদেরকে প্রশ্ন করি: যুদ্ধ-পূর্ববর্তী সময়ে জার্মানির শিক্ষা ব্যবস্থা কী করত?
জার্মানদের বিচক্ষণতা শেখানো ? স্কুলজীবনে কি প্রায়শই এমনটা ঘটত না যে, চুপচাপ থাকা সঙ্গীদের চেয়ে একজন ছোটখাটো চোগলখোরকেই বেশি পছন্দ করা হতো ? এটা কি সত্যি নয় যে, তখনও যেমন, এখনও তেমনই, অন্যের নামে অভিযোগ করাকে প্রশংসনীয় 'আন্তরিকতা' বলে মনে করা হতো, আর শান্ত বিচক্ষণতাকে মনে করা হতো একগুঁয়েমি ? বিচক্ষণতা যে একটি মূল্যবান ও পুরুষোচিত গুণ, তা শেখানোর কোনো চেষ্টা কি করা হয়েছিল? না, কারণ আমাদের শিক্ষাবিদদের চোখে এই বিষয়গুলো তুচ্ছ । কিন্তু এই তুচ্ছ বিষয়গুলোর জন্য আমাদের রাষ্ট্রকে কোটি কোটি টাকা খরচ করতে হয়েছে; কারণ ৯০ শতাংশ মানহানির মামলা এবং এই জাতীয় অন্যান্য মামলা শুধুমাত্র বিচক্ষণতার অভাব থেকেই উদ্ভূত হয়।

দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে করা মন্তব্য নির্বিচারে মুখে মুখে পুনরাবৃত্ত হয় ; এবং এর ফলে উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিগুলো ফাঁস হয়ে যাওয়ায় আমাদের অর্থনৈতিক কল্যাণ ক্রমাগত ক্ষতিগ্রস্ত হয় । জাতীয় প্রতিরক্ষার গোপন প্রস্তুতিও প্রকাশ হয়ে পড়ে ।

অলীক, কারণ আমাদের লোকেরা কখনো নীরব থাকার কর্তব্য শেখেনি । তারা পুনরাবৃত্তি করে
তারা যা কিছু শোনে। যুদ্ধে, এই ধরনের কথা বলার অভ্যাস যুদ্ধের পরাজয়ের কারণ হতে পারে এবং ফলস্বরূপ একটি অসন্তোষজনক অভিযানের ফলাফলে অবদান রাখতে পারে। এখানে, অন্যান্য ক্ষেত্রের মতোই, আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে প্রাপ্তবয়স্করা তাদের যৌবনে যা শেখেনি তা করতে পারে না । একজন শিক্ষকের উচিত নয় ছেলেদের পরচর্চায় উৎসাহিত করে তাদের চালাকিগুলো জেনে ফেলা । তরুণরা নিজেদের মধ্যে এক ধরনের রাষ্ট্র গঠন করে এবং প্রাপ্তবয়স্কদের সাথে এক ধরনের সংহতি নিয়ে আচরণ করে । এটা খুবই স্বাভাবিক। যে বন্ধন দশ বছর বয়সীদের একসাথে বেঁধে রাখে।

Machine Translated by Google

প্রাপ্তবয়স্কদের সাথে সম্পর্কের চেয়ে ছেলেদের সাথে তাদের সম্পর্ক বেশি দৃঢ় এবং স্বাভাবিক। যে ছেলে তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে খবর দেয়, সে রাষ্ট্রদ্রোহিতা করে এবং চরিত্রের এমন এক দুর্বলতা প্রদর্শন করে যা, সত্যি বলতে, গুরুতর রাষ্ট্রদ্রোহিতাকারী একজন মানুষের মতোই। এমন ছেলেকে 'ভালো', 'দায়িত্বশীল' ইত্যাদি হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়, বরং এমন একজন হিসেবে বিবেচনা করা উচিত যার মধ্যে অবাঞ্ছিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। একজন শিক্ষকের পক্ষে তার কাজে সহায়তার জন্য এই ধরনের অযোগ্য প্রবণতা ব্যবহার করা সুবিধাজনক হতে পারে, কিন্তু এই ধরনের মনোভাব কচি হৃদয়ে মারাত্মক অভ্যাসের বীজ বপন করে যা একদিন প্রাণঘাতী পরিণতি ডেকে আনতে পারে।

প্রায়শই এমন হতো যে, একজন তরুণ তথ্যদাতা বড় মাপের এক বদমাশে পরিণত হতো।

এটি অনেক উদাহরণের মধ্যে মাত্র একটি। আমাদের বিদ্যালয়গুলোতে সুন্দর ও মহৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সচেতন চর্চা বর্তমানে প্রায় নেই বললেই চলে। ভবিষ্যতে শিক্ষার এই দিকটির উপর আরও অনেক বেশি জোর দেওয়া হবে। আনুগত্য, আত্মত্যাগ এবং বিচক্ষণতা হলো এমন কিছু মূল্যবোধ যা একটি মহান জাতির অবশ্যই থাকা উচিত। বিদ্যালয়ে এগুলোর প্রশিক্ষণ ও বিকাশ বর্তমানে পাঠ্যসূচিতে থাকা অন্যান্য অনেক বিষয়ের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আঘাত পেলে অভিযোগ করা, ঘ্যানঘ্যান করা এবং চিৎকার করার অভ্যাস থেকে শিশুদের মুক্ত করাও এই প্রশিক্ষণেরই একটি অংশ। যদি শিক্ষা ব্যবস্থা শৈশবে শিশুদের অভিযোগ না করে ব্যথা ও আঘাত সহ্য করতে না শেখায়, তবে আমরা অবাক হব না যদি পরবর্তী জীবনে, যখন একটি ছেলে পুরুষে পরিণত হয় এবং, উদাহরণস্বরূপ, নিজেকে পরিখায় খুঁজে পায়, তখন ডাকঘর কেবল বাড়িতে অশ্রুসিক্ত চিঠি পাঠানোর জন্যই ব্যবহৃত হয়। যদি আমাদের যুবসমাজকে কিছুটা কম জ্ঞান দিয়ে ঠাসা হতো, কিন্তু তাদের নিজেদের প্রভু হতে আরও ভালোভাবে শেখানো হতো, তবে তারা ১৯১৪-১৯১৮ সালগুলোতে আমাদের আরও ভালোভাবে সেবা করতে পারত।

জাতি-রাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থায় শারীরিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি চরিত্র গঠনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। যথাযথ শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের জাতীয় সত্তায় বর্তমানে দৃশ্যমান অধিকাংশ ত্রুটি সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা না গেলেও, অন্তত সীমিত করা যেতে পারে।

ইচ্ছাশক্তি ও কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার অভ্যাসের পাশাপাশি দায়িত্ব গ্রহণের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকার অভ্যাস গড়ে তোলার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

আমাদের পুরোনো সেনাবাহিনীতে এই নীতিটি প্রচলিত ছিল: কোনো আদেশ না থাকার চেয়ে যেকোনো আদেশই সর্বদা শ্রেয়। আমাদের যুবকদের জন্য এই নীতিটির রূপ হওয়া উচিত এই যে, কোনো উত্তর না দেওয়ার চেয়ে যেকোনো উত্তরই শ্রেয়। উত্তরটি অনুপযুক্ত হওয়ার ভয় থেকে সৃষ্ট উত্তর দেওয়ার ভয়কে ভুল উত্তরের চেয়েও বেশি অপমানজনক বলে গণ্য করা উচিত। এই সহজ ও আদিম ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই আমাদের যুবকদের কাজ করার সাহস অর্জনে শিক্ষিত করা উচিত।

প্রায়শই অভিযোগ করা হয় যে, ১৯১৮ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে সকল কর্তৃপক্ষ দিশেহারা হয়ে পড়েছিল এবং রাজা থেকে শুরু করে সর্বশেষ ডিভিশন কমান্ডার পর্যন্ত, নিজ দায়িত্বে সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো যথেষ্ট চারিত্রিক দৃঢ়তা কারও ছিল না। এই ভয়াবহ ঘটনাটি একটি গুরুতর বিষয়।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি এটি একটি তিরস্কার; কারণ বিপর্যয়ের মুহূর্তে যা ব্যাপক আকারে প্রকাশিত হয়েছিল, তা আমাদের সকলের মাঝেই ক্ষুদ্র পরিসরে ঘটছে। অস্ত্রের অভাব নয়, বরং ইচ্ছাশক্তির অভাবই আজ আমাদের কোনো জোরালো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে অক্ষম করে তুলেছে। এই ত্রুটি আমাদের জনগণের সর্বত্রই বিদ্যমান, এবং এটি ঝুঁকি নেওয়ার মুহূর্তে পদক্ষেপ নিতে বাধা দেয়, যেন ঝুঁকি ছাড়াই বড় কোনো কাজ করা সম্ভব। বেশ অপ্রত্যাশিতভাবেই, একজন জার্মান সেনাপতি ইচ্ছাশক্তির এই দুঃখজনক অভাব প্রকাশ করেছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন, "আমি কেবল তখনই কাজ করি যখন আমার সাফল্যের সম্ভাবনা ৫১ শতাংশ থাকে।" এই "৫১ শতাংশ সম্ভাবনাই" ছিল জার্মানির পতনের উৎস। যে ব্যক্তি ভাগ্যের কাছে সাফল্যের নিশ্চয়তা দাবি করে, সে ইচ্ছাকৃতভাবে বীরত্বপূর্ণ কাজের তাৎপর্যকে অস্বীকার করে।

এর তাৎপর্য এই যে, যদি পরিস্থিতি মারাত্মক বিপদের কারণ হয়, তবে এমন পদক্ষেপ নেওয়া হয় যা সাফল্যের দিকে নিয়ে যেতে পারে। একজন ক্যান্সার রোগী, যিনি জানেন যে অস্ত্রোপচার না করালে তাঁর মৃত্যু নিশ্চিত, তাঁর অস্ত্রোপচারের আগে সুস্থ হয়ে ওঠার ৫১ শতাংশ সম্ভাবনার প্রয়োজন নেই। এমনকি যদি অস্ত্রোপচার মাত্র ০.৫ বা ১ শতাংশ সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতিও দেয়।

Machine Translated by Google

সফল হলে, একজন সাহসী মানুষ এই ঝুঁকি নেবে এবং তা অকার্যকর প্রমাণিত হলেও কোনো অভিযোগ করবে না।
teczna.

সাধারণভাবে, আমাদের কৈশোরে প্রাপ্ত ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষার প্রধান পরিণতি হলো ইচ্ছাশক্তির কাপুরুষোচিত অভাব এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষমতা। এর ভয়াবহ প্রভাব আমাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। এই মর্মান্তিক পরিণতির শৃঙ্খলের একটি প্রধান উদাহরণ হলো আমাদের নেতাদের প্রদর্শিত নাগরিক সাহসের অভাব।

বর্তমানে যে কাপুরুষতা যেকোনো দায়িত্ব এড়ানোর প্রবণতা তৈরি করে , তার উৎসও একই। এটি আমাদের তরুণদের প্রাপ্ত শিক্ষারও একটি ত্রুটি। এই ত্রুটি জনজীবনের সকল ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত এবং সংসদীয় শাসনব্যবস্থার অধীনে পরিচালিত সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে এর চিরন্তন পূর্ণতা লাভ করে।

দুর্ভাগ্যবশত, এমনকি বিদ্যালয়েও, সরল ও আন্তরিক স্বীকারোক্তির চেয়ে ছোট পাপীদের পক্ষ থেকে "স্বীকারোক্তি ও অনুশোচনা" এবং "অনুশোচনাপূর্ণ ত্যাগ "-কে বেশি মূল্য দেওয়া হয়। কিন্তু আজকের অনেক শিক্ষকের চোখে, এই শেষোক্তটি সম্পূর্ণ সংশোধনের অযোগ্যতা এবং অধঃপতনের মনোভাবের পরিচায়ক। এবং যদিও
অবিশ্বাস্য মনে হলেও , অনেক ছেলেকে বলা হয় যে তাদের জন্য ফাঁসি অপেক্ষা করছে, কারণ তারা এমন কিছু গুণের অধিকারী যা সমগ্র জাতির জন্য অমূল্য হতে পারে।

ঠিক যেমন জাতি-রাষ্ট্রকে একদিন তার যুবসমাজের মধ্যে ইচ্ছাশক্তি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা বিকাশের দিকে মনোযোগ দিতে হবে, তেমনি তাকে শৈশব থেকেই তরুণ প্রজন্মের হৃদয়ে দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তুতি এবং খোলাখুলি ও সততার সাথে স্বীকারোক্তি করার সাহস জাগিয়ে তুলতে হবে। যদি এটি এই প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব উপলব্ধি করে , তবে অবশেষে —একশ বছরের শিক্ষামূলক কাজের পর— এটি এমন একটি জাতি গঠনে সফল হবে, যা আর সেইসব ত্রুটি প্রদর্শন করবে না , যা আমাদের বর্তমান পতনের জন্য এত মারাত্মকভাবে দায়ী।

জ্ঞানের আনুষ্ঠানিক হস্তান্তর, যা বর্তমানে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য, তা কিছু পরিবর্তনসহ জাতি-রাষ্ট্রের হাতে চলে যাবে। এই পরিবর্তনগুলো অবশ্যই তিনটি দিকে করতে হবে।

প্রথমত, তরুণদের মস্তিষ্ক এমন সব বিষয়ের ভারে জর্জরিত হতে পারে না , যার ৯৫ শতাংশই অকেজো এবং যা তারা ভুলে যাবে। বর্তমান প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম এক অদ্ভুত জগাখিচুড়ি। বিজ্ঞানের অনেক শাখায়, শেখার বিষয়বস্তু এতটাই বিশাল হয়ে গেছে যে তার খুব সামান্য অংশই মনে রাখা যায় , এবং বাস্তবে, জ্ঞানের এই বিশাল ভান্ডারের খুব সামান্য অংশই কাজে লাগানো যায়। অন্যদিকে, কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে চাইলে যা শেখা হয়েছে, তা যথেষ্ট নয়। উদাহরণস্বরূপ , একজন সাধারণ সরকারি কর্মচারীর কথা ভাবুন যিনি জুনিয়র হাই বা হাই স্কুল পাশ করেছেন, এবং ত্রিশ বা চল্লিশ বছর বয়সে তাকে জিজ্ঞাসা করুন যে, যে জ্ঞান এত কষ্ট করে তার মধ্যে ঢোকানো হয়েছিল, তার কতটা এখনও অবশিষ্ট আছে।

তার মস্তিষ্কে যা কিছু ঠাসা হয়েছিল, তার কতটা অবশিষ্ট আছে? তিনি নিশ্চয়ই উত্তর দেবেন, "আচ্ছা, যদি এত কিছু শেখানো হয়েই থাকে, তবে তা কেবল শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের জন্য জ্ঞানের এক বিশাল ভান্ডার তৈরি করে দেওয়ার জন্য ছিল না, বরং তাদের বোধশক্তি, স্মৃতিশক্তি এবং সর্বোপরি চিন্তন দক্ষতা বিকাশের জন্য ছিল।" এটা আংশিকভাবে সত্য।

তবে, তরুণ মস্তিষ্ককে এমন সব ধারণার বন্যায় ডুবিয়ে দেওয়ার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট বিপদ রয়েছে যা সে প্রায় বুঝতেই পারে না, এবং যে বন্যায় সে তার স্বতন্ত্র উপাদানগুলোর মূল্য চিনতে বা উপলব্ধি করতে অক্ষম হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে , এই জ্ঞানের সবচেয়ে অপরিহার্য অংশটিই বিস্মৃত ও বিসর্জিত হয় , গৌণ অংশটি নয়। সুতরাং, এই ব্যাপক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়, কারণ এর উদ্দেশ্য মস্তিষ্ককে শোষণের জন্য বিশাল ও বৈচিত্র্যময় উপাদান সরবরাহ করে শিক্ষিত করা হতে পারে না , বরং ব্যক্তিকে এমন এক জ্ঞানভাণ্ডার দিয়ে সজ্জিত করা যা তার পরবর্তী জীবনে প্রয়োজন হবে এবং যা সে সমাজের কল্যাণে ব্যবহার করতে পারবে।

তবে বাস্তবে এই লক্ষ্যটি অলীক, কারণ শৈশবে মাথায় অতিরিক্ত বিষয় ঠাসাঠাসি করে ঢুকিয়ে দেওয়ার ফলে একজন ব্যক্তি পরবর্তী জীবনে কিছুই মনে রাখতে পারে না, অন্তত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তো নয়ই। লক্ষ লক্ষ মানুষের ক্ষেত্রে এর কোনো কারণ নেই যে তারা মনে রাখতে পারে না।

Machine Translated by Google

স্কুল জীবনে মানুষের দুই বা তিনটি ভাষা শেখা উচিত, অথচ তাদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যকই পরবর্তী জীবনে এই ভাষাগুলো ব্যবহার করার সুযোগ পাবে এবং তাদের বেশিরভাগই যা শিখেছে তা পুরোপুরি ভুলে যাবে। একটি উদাহরণ নিন : ফরাসি ভাষা শেখা ১,০০,০০০ শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্ভবত ২,০০০ জনও পরবর্তী জীবনে এটি ব্যবহার করতে পারবে না , যেখানে ৯৮,০০০ জন তাদের যৌবনে যা শিখেছে তা বাস্তবে প্রয়োগ করার সুযোগ কখনোই পাবে না । তারা এমন একটি বিষয়ে হাজার হাজার ঘন্টা ব্যয় করেছে যা দীর্ঘমেয়াদে তাদের জন্য মূল্যহীন হবে । এটি মানসিক শিক্ষার একটি সাধারণ প্রক্রিয়ার কারণে ঘটে—এই যুক্তিটি ভুল। যদি এই সমস্ত মানুষ এই ভাষাগুলো ব্যবহার করতে পারত, তবে তা যুক্তিযুক্ত হতো।

পরবর্তী জীবনে শেখা । কিন্তু পরিস্থিতি যা দেখাচ্ছে, তাতে ৯৮,০০০ মানুষ ক্ষতির মুখে অকারণে নির্যাতিত হচ্ছেন।
তাদের মূল্যবান সময়, শুধুমাত্র সেই ২,০০০ জনের জন্য, যাদের জন্য এই ভাষাটি হয়তো কোনো একদিন কাজে লাগতে পারে ।

আমি উদাহরণ হিসেবে যে ভাষাটি বেছে নিয়েছি, তার শিক্ষাদান যৌক্তিক চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটায় বা বুদ্ধিবৃত্তিক প্রখরতা বৃদ্ধি করে—এমনটা বলা যায় না , যেমনটা ল্যাটিন ভাষা শেখানোর ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে । সুতরাং, শিক্ষার্থীদের কেবল এই ধরনের ভাষার সাধারণ রূপরেখা, বা তার চেয়েও ভালো, এর অভ্যন্তরীণ কাঠামো শেখানো অনেক শ্রেয় হবে : অর্থাৎ, তাদেরকে এই ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে পরিচিত হতে দেওয়া , অথবা ব্যাকরণ, উচ্চারণ, বাক্য গঠন, শৈলী ইত্যাদির মৌলিক বিষয়গুলোর সাথে পরিচিত করানো। গড়পড়তা শিক্ষার্থীদের জন্য এটাই যথেষ্ট হবে , কারণ

এটি সমগ্র বিষয়টির একটি সুস্পষ্ট চিত্র প্রদান করবে এবং আরও সহজে মনে রাখা যাবে । আর এটি একটি সম্পূর্ণ ভাষার বিশদ জ্ঞান তাদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়ার বর্তমান প্রচেষ্টার চেয়ে অনেক বেশি বাস্তবসম্মত হবে , যে ভাষা তারা কখনোই আয়ত্ত করতে পারবে না এবং যা তারা দ্রুত ভুলেও যাবে। যদি এই ধরনের একটি পদ্ধতি গ্রহণ করা হতো , তাহলে আমরা অতিরিক্ত উপাদান থেকে স্মৃতিতে কেবল খণ্ডাংশ থেকে যাওয়ার বিপদ এড়াতে পারতাম ; কারণ তরুণদের শিখতে হতো কোনটি মূল্যবান, এবং দরকারী ও অদরকারী বিষয়ের মধ্যে বাছাই আরও আগে করা যেত ।

বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর জন্য , ভাষাটির মৌলিক বিষয়গুলোর জ্ঞান ও বোঝাপড়া সারাজীবনের জন্য যথেষ্টরও বেশি হবে। যাদের সত্যিই ভাষাটির প্রয়োজন, তারা আরও বিস্তারিত অধ্যয়ন শুরু করার জন্য একটি ভিত্তি পাবে ।

এই ধরনের পাঠ্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে শারীরিক ব্যায়ামের পাশাপাশি পূর্বে উল্লিখিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরও নিবিড় প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সময় পাওয়া যাবে ।

ইতিহাস শিক্ষাদানের সমসাময়িক পদ্ধতিতে একটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার হওয়া প্রয়োজন । অন্য কোনো জাতি জার্মানদের মতো এত গভীরভাবে ইতিহাস শেখে না, এবং এই ঐতিহাসিক জ্ঞানের এত দুর্বল ব্যবহারও অন্য কোনো জাতি করে না। যদি রাজনীতির অর্থ হয় ইতিহাসে স্থান করে নেওয়া ঘটনা , তবে আমাদের রাজনীতি পরিচালনার পদ্ধতির কারণেই ইতিহাস শিক্ষাদানের পদ্ধতি ব্যর্থ হতে বাধ্য । কিন্তু আক্ষেপ করে লাভ নেই।

যতক্ষণ না আমরা আমাদের জাতিকে একটি উন্নততর রাজনৈতিক শিক্ষা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছি, ততক্ষণ আমাদের নীতিমালার শোচনীয় পরিণতির কথা ভুলে থাকতে হবে । ১০০টির মধ্যে ৯৯টি ক্ষেত্রেই আমাদের বর্তমান ইতিহাস শিক্ষার ফলাফল শোচনীয় । সাধারণত, স্মৃতিতে কেবল কয়েকটি তারিখ, জন্মসাল এবং নামই থেকে যায় , অথচ ঐতিহাসিক বিকাশের প্রধান ও সুস্পষ্ট ধারাগুলো সম্পর্কে জ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব থাকে। প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো স্পর্শও করা হয় না । তারিখ এবং কালানুক্রমিকভাবে সাজানো ঘটনার ভিড়ে অন্তর্নিহিত প্রেরণা খুঁজে বের করার দায়িত্ব ব্যক্তির কমবেশি প্রখর বুদ্ধিমত্তার উপরই ছেড়ে দেওয়া হয়।

এই অপ্রীতিকর বক্তব্যের বিরুদ্ধে যে কেউ যত খুশি তীব্র প্রতিবাদ করতে পারে । কিন্তু আমাদের সংসদ সদস্যরা একটি অধিবেশনে রাজনৈতিক সমস্যা, বিশেষ করে পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে যে বক্তৃতা দেন , তা মনোযোগ দিয়ে পড়লেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। মনে রাখতে হবে এই ভদ্রলোকেরা কারা , বা তাঁরা নিজেদের কীভাবে উপস্থাপন করেন —জার্মান জাতির অভিজাত শ্রেণী হিসেবে, যাঁদের অধিকাংশই উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকের আসনে বসেছেন এবং তাঁদের অনেকেই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পার করেছেন। তাহলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে যে এই মানুষগুলোর ঐতিহাসিক শিক্ষা কতটা অপর্যাপ্ত ছিল। যদি এই ভদ্রলোকেরা কখনো ইতিহাস না পড়েও জনবিষয়াদি বিষয়ে একটি সুদৃঢ় সহজাত প্রবৃত্তি রাখতেন, তাহলে পরিস্থিতি আরও ভালো হতো এবং জাতি ব্যাপকভাবে উপকৃত হতো।

সুবিধা।

Machine Translated by Google

ইতিহাসে যা পড়ানো হয় তা অবশ্যই সীমিত হতে হবে। এই শিক্ষার সবচেয়ে বড় মূল্য হলো ঐতিহাসিক বিকাশের প্রধান ধারাগুলো বোঝা। আমাদের ইতিহাস শিক্ষা যত বেশি এই কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে , আমরা তত বেশি আশা করতে পারি যে এটি ব্যক্তির জন্য এবং এর মাধ্যমে সমগ্র সমাজের জন্য উপকারী হবে । ইতিহাস কেবল অতীতে কী ঘটেছিল তা জানার জন্য অধ্যয়ন করা যায় না, বরং ভবিষ্যতের পথপ্রদর্শক হিসেবে এবং আমাদের জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কোন নীতিগুলো সবচেয়ে ভালো হবে তা শেখানোর জন্য অধ্যয়ন করা উচিত । এটাই প্রকৃত লক্ষ্য; এবং ইতিহাস শিক্ষা সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর একটি উপায় মাত্র। কিন্তু আবারও, আমাদের আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় উপায়ই লক্ষ্যকে ছাপিয়ে গেছে। লক্ষ্যটি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়েছে। ইতিহাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়নের জন্য বিস্তারিত অধ্যয়ন প্রয়োজন—এই যুক্তির কোনো মানে হয় না।

এই সমস্ত তারিখ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন , কারণ তা না হলে আমরা বিকাশের এই মহান ধারাগুলো প্রতিষ্ঠা করতে পারব না। এই কাজটি ইতিহাস অধ্যাপকদের। কিন্তু সাধারণ মানুষ ইতিহাস অধ্যাপক নন।

তার কাছে ইতিহাসের একটাই উদ্দেশ্য: নিজের দেশের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে একটি স্বাধীন মতামত গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক জ্ঞান তাকে প্রদান করা। যে ব্যক্তি ইতিহাসের অধ্যাপক হতে চায় , সে পরে খুঁটিনাটি বিষয়ে মন দিতে পারে । অবশ্যই, তাকে ক্ষুদ্রতম বিবরণগুলো নিয়েও কাজ করতে হবে । আমাদের সমসাময়িক ইতিহাস শিক্ষাদান এই সবকিছুর জন্য অপর্যাপ্ত। এর পরিধি সাধারণ শিক্ষার্থীর জন্য বড্ড বেশি বিস্তৃত এবং যে শিক্ষার্থী ইতিহাস বিশেষজ্ঞ হতে চায়, তার জন্য বড্ড বেশি সংকীর্ণ ।

চূড়ান্তভাবে , জাতি-রাষ্ট্রের কাজ হলো এমন এক বিশ্ব ইতিহাস রচনা করা, যেখানে জাতিগত সমস্যাটি প্রধান স্থান অধিকার করবে।

সারসংক্ষেপে: জাতি-রাষ্ট্রকে তার সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করে শুধু অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এছাড়াও, যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তাদের জন্য সেই সুযোগও প্রদান করতে হবে।

সেগুলিতে বিশেষায়িত হওয়া উচিত। একজন সাধারণ ব্যক্তির জন্য বিভিন্ন বিষয়ের মৌলিক বিষয়গুলির সাথে পরিচিত হওয়াই যথেষ্ট , যা সাধারণ শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে । একজন ব্যক্তির কেবল সেই বিষয়গুলিই পুঙ্খানুপুঙ্খ ও বিস্তারিতভাবে অধ্যয়ন করা উচিত, যা সে তার বাকি জীবন ধরে করতে চায় । সাধারণ শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত এবং বিশেষায়িত হওয়ার বিষয়টি ব্যক্তির পছন্দের উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত।

এইভাবে, পাঠ্যক্রম সংক্ষিপ্ত হবে এবং এমন কিছু সময় পাওয়া যাবে যা শারীরিক ব্যায়াম এবং চরিত্র, ইচ্ছাশক্তি, বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ইত্যাদির প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা, বিশেষ করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো, পরবর্তী জীবনে একজন কী পেশা গ্রহণ করবে সেদিকে যে তেমন মনোযোগ দেয় না, তার প্রমাণ মেলে এই ঘটনা থেকে যে, একই পেশায় আগ্রহী ব্যক্তিরা তিন ভিন্ন ধরনের বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হন ।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সাধারণ শিক্ষা, বিশেষায়িত জ্ঞান নয়। যখন বিশেষায়িত জ্ঞানের প্রয়োজন হয়, তখন বর্তমান মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো ও তাদের পাঠ্যক্রম তা প্রদান করতে পারে না।

সুতরাং, জাতি-রাষ্ট্রকে একদিন এর ব্যবহার বন্ধ করতে হবে ।
এই ধরনের অর্ধ-পদক্ষেপ।

রাষ্ট্র কর্তৃক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে যে দ্বিতীয় পরিবর্তনটি আনতে হবে তা নিম্নরূপ: আমাদের এই বস্তুবাদী যুগের বৈশিষ্ট্য হলো, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা বাস্তব ও ব্যবহারিক
বিষয়ের উপর জোর দেয়; যেমন, গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ইত্যাদি।

অবশ্যই, শিল্প প্রযুক্তি ও রসায়নের আধিপত্যে থাকা এই যুগে এগুলো প্রয়োজনীয় , যেখানে সর্বত্র দৈনন্দিন জীবনে এগুলোর অন্তত কিছু বাহ্যিক প্রকাশ দেখা যায় । কিন্তু এই বিষয়গুলোর জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে একটি জাতির সাধারণ সংস্কৃতি গড়ে তোলা বিপজ্জনক ।
পক্ষান্তরে , সাধারণ সংস্কৃতি সর্বদা আদর্শের দিকে পরিচালিত হওয়া উচিত । এর ভিত্তি হবে মানবিক জ্ঞানশাখাগুলো এবং এর লক্ষ্য হবে বিভিন্ন ব্যবহারিক বিজ্ঞানে আরও বিশেষায়িত শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করা । অন্যথায়, আমরা এই শক্তিগুলোকে বিসর্জন দেব ।

Machine Translated by Google

যা একটি জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যেকোনো প্রযুক্তিগত জ্ঞানের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাস থেকে প্রাচীন ইতিহাসকে বাদ দেওয়া উচিত নয়। রোমান ইতিহাস শুধু আমাদের সময়েই নয়, ভবিষ্যতেও শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ছিল এবং থাকবে। হেলেনিক সংস্কৃতির আদর্শগুলোকে তাদের সমস্ত মহিমান্বিত সৌন্দর্যসহ সংরক্ষণ করা উচিত। ব্যক্তিবিশেষের মধ্যকার পার্থক্য যেন আমাদের সেই জাতিগত সম্প্রদায়কে স্বীকৃতি দেওয়া থেকে বিরত না রাখে, যা তাদেরকে এক উচ্চতর স্তরে একত্রিত করে। আমাদের সময়ের সংঘাত মহান লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হচ্ছে। একটি সভ্যতা অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রাম করছে। এই সভ্যতা হাজার হাজার বছরের ঐতিহাসিক বিকাশের ফল, এবং গ্রীক ও জার্মান উভয়ই এর অংশ।

সাধারণ সংস্কৃতি এবং এর বিশেষ শাখাগুলোর মধ্যে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য অবশ্যই করতে হবে। বর্তমানে, এই বিশেষ শাখাগুলো ক্রমবর্ধমানভাবে নিজেদেরকে একচেটিয়াভাবে অর্থের সেবায় উৎসর্গ করার হুমকি দিচ্ছে। এই প্রবণতাগুলোর প্রতিষেধক হিসেবে, সাধারণ সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করা উচিত, অন্তত তার আদর্শ রূপে। এটি ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি ও জোর দিয়ে বলা উচিত যে, শিল্প ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, বাণিজ্য এবং অর্থনীতি কেবল তখনই বিকশিত হতে পারে, যখন একটি সম্প্রদায় বিদ্যমান থাকবে।
যাঁর সাধারণ চিন্তাধারা আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত, কারণ আমি যে প্রচেষ্টাগুলোর কথা বলেছি, সেগুলোর বিকাশের জন্য এটিই পূর্বশর্ত। এই শর্তটি বস্তুবাদী আত্মকেন্দ্রিকতার মনোভাব দ্বারা পূরণ হয় না, বরং আত্মত্যাগের মনোভাব এবং অন্যের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার আনন্দের দ্বারা পূরণ হয়।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য হলো তরুণদের মধ্যে এমন জ্ঞান সঞ্চার করা যা তাদের জীবনে মানিয়ে চলতে সাহায্য করবে। এই লক্ষ্যটি নিম্নলিখিত বাক্যে প্রকাশ করা হয়: "একজন তরুণকে একদিন মানব সমাজের একজন উপকারী সদস্য হতে হবে।" এই বাক্য দ্বারা তারা বোঝায় দৈনন্দিন জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সততার সাথে অর্জন করার ক্ষমতা। একজন ভালো নাগরিকের কর্তব্য সম্পর্কে যে অগভীর শিক্ষা তরুণরা দৈবক্রমে লাভ করে, তার ভিত্তি খুবই দুর্বল। রাষ্ট্র নিজেই কেবল একটি রূপ, এবং তাই মানুষকে এই রূপটিকে এমন একটি আদর্শ হিসেবে দেখতে শেখানো কঠিন, যার সেবা তাদের করতে হবে এবং যার জন্য তাদের দায়িত্বশীল হতে হবে। এই রূপটি খুব সহজেই ভেঙে যেতে পারে। কিন্তু, যেমন আমরা দেখেছি, রাষ্ট্র সম্পর্কে আজকের ধারণা স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত কোনো কিছুর প্রতিনিধিত্ব করে না। তাই, গতানুগতিক গতানুগতিক "দেশপ্রেমিক" প্রশিক্ষণ ছাড়া আর কিছুই নেই। পুরোনো জার্মানিতে, ক্ষুদ্রতম এবং এমনকি ক্ষুদ্রতম ক্ষমতাধরদের ঐশ্বরিক অধিকারের উপর সর্বাধিক জোর দেওয়া হয়েছিল। এই ঐশ্বরিক আইন যেভাবে প্রণয়ন ও উপস্থাপন করা হয়েছিল তা কখনোই খুব বিচক্ষণ ছিল না, এবং প্রায়শই খুব নির্বোধের মতো ছিল। তাঁদের বিপুল সংখ্যার কারণে, জার্মান জাতির ইতিহাসে আলো ছড়ানো প্রকৃত মহান ব্যক্তিত্বদের জীবনী যথাযথভাবে উপস্থাপন করা কখনোই সম্ভব হয়নি। ফলে, সাধারণ মানুষ জার্মান ইতিহাস সম্পর্কে অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা লাভ করেছে। এখানেও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহ অনুপস্থিত।

এটা স্পষ্ট যে, এভাবে কোনো প্রকৃত জাতীয় উদ্দীপনা জাগানো সম্ভব নয়। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের অসংখ্য ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের মধ্য থেকে এমন কয়েকজন ব্যক্তির নাম বেছে নিতে অক্ষম প্রমাণিত হয়েছে, যাঁদেরকে জার্মান জাতি গর্বের সাথে স্মরণ করতে পারে। তাহলেই এই অভিন্ন ঐতিহ্যের জ্ঞান-সূত্রে সমগ্র জাতি ঐক্যবদ্ধ হতে পারত। জার্মান ইতিহাসের সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের সমসাময়িক প্রজন্মের সামনে তুলে ধরা হয়নি। একটি অভিন্ন জাতীয় চেতনা জাগানোর জন্য সমগ্র জাতির মনোযোগ তাঁদের উপর নিবদ্ধ করা হয়নি। আলোচিত বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে, শিক্ষার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা এমন বিষয় নির্বাচন করতে পারেননি যা জাতীয় সম্মানের জন্য সবচেয়ে গৌরব বয়ে আনে এবং জাতীয় উদ্দীপনা জাগানোর জন্য একে গড়পড়তা স্তর থেকে উপরে তুলতে পারে।

এমন মহৎ দৃষ্টান্তের আলোকে গর্ব। সেই সময়ে, অবশ্যই, এই ধরনের কাজকে উগ্র জাতীয়তাবাদ বলে গণ্য করা হতো, যার কোনো সুখকর গন্ধ ছিল না। জাতীয় গর্বের প্রজ্জ্বলিত আগুনের চেয়ে ক্ষুদ্র রাজবংশীয় দেশপ্রেম বেশি গ্রহণযোগ্য এবং সহজে সহনীয় ছিল। প্রথমটিকে সবসময় জোর করে বশে আনা যেত, অপরদিকে দ্বিতীয়টি একদিন প্রভাবশালী শক্তি হয়ে উঠতে পারত। রাজতান্ত্রিক দেশপ্রেমের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল প্রবীণ সৈনিকদের সমিতিতে, অপরদিকে প্রবল জাতীয় দেশপ্রেম পথ খুলে দিতে পারত।

সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। জাতীয় দেশপ্রেম দুর্দান্ত মেজাজের একটি উৎকৃষ্ট জাতের ঘোড়ার মতো।

Machine Translated by Google

এর মানে এই নয় যে সব আরোহী স্যাডলে বসে এটি সহ্য করতে পারবেন। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে বেশিরভাগ লোকেরা এই ধরনের বিপদ এড়িয়ে চলতেই পছন্দ করত । কেউ ভাবতেও পারেনি যে একদিন এমন এক যুদ্ধ আসতে পারে যা কামানের গোলাবর্ষণ আর বিষাক্ত গ্যাসের আক্রমণের মুখে এই ধরনের দেশপ্রেমের লড়াইয়ের স্পিরিটকে পরীক্ষা করবে। কিন্তু যখন তা এল, আমাদের দেশপ্রেমের অভাব ভয়াবহভাবে আমাদের ওপরই উল্টো ফল দিল । সাম্রাজ্যবাদী ও রাজকীয় শাসকদের জন্য কেউ মরতে চায়নি; অন্যদিকে, অধিকাংশ সৈনিকের কাছেই 'জাতি' বলে কিছু ছিল না ।

জার্মানিতে বিপ্লবের সূত্রপাত এবং তার ফলস্বরূপ রাজতন্ত্রপন্থী দেশপ্রেমের দমনের পর থেকে, ইতিহাস শিক্ষাদানের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানের ভান্ডার বৃদ্ধি করা।
বর্তমান রাষ্ট্রের দেশপ্রেমিক উদ্দীপনার কোনো প্রয়োজন নেই ; কিন্তু এটি যা সত্যিই আকাঙ্ক্ষা করে, তা কখনোই অর্জন করতে পারবে না। যখন জাতীয়তাবাদের নীতি প্রচলিত ছিল, তখন যদি বংশীয় দেশপ্রেম প্রতিরোধের চূড়ান্ত শক্তি সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়ে থাকে , তবে প্রজাতান্ত্রিক উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলা আরও কম সম্ভব হবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, জার্মান জনগণ 'প্রজাতন্ত্রের জন্য' এই স্লোগানে সাড়ে চার বছর ধরে যুদ্ধক্ষেত্রে নামত না, আর যারা এই মহান প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাদের জন্য তো নয়ই।

প্রকৃতপক্ষে, এই প্রজাতন্ত্রটি শান্তিপূর্ণভাবে টিকে থাকতে পেরেছে শুধুমাত্র ব্যতিক্রমহীনভাবে সকলের কাছে প্রতিশ্রুতি দিতে , অপরিচিতদের ক্ষতিপূরণ দিতে এবং সব ধরনের ভূখণ্ড ত্যাগের চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে ইচ্ছুক থাকার কারণেই । বাকি বিশ্ব একে সহানুভূতির চোখে দেখে, ঠিক যেমন একজন দুর্বল ব্যক্তি জোর খাটাতে চাওয়াদের প্রতি সবসময় বেশি সহানুভূতিশীল হয়।

তাকে কঠিন ধাতুতে গড়া মানুষের চেয়ে নিজের লক্ষ্য পূরণে বেশি উৎসাহিত করে । কিন্তু শত্রুরা যে এই ধরনের শাসনব্যবস্থা পছন্দ করে, সেটাই এর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। তারা প্রজাতন্ত্রকে ভালোবাসে ।
জার্মানদের অস্তিত্বকে মেনে নেওয়া এবং সহ্য করা, কারণ আমাদের জনগণকে দাসত্বে রাখার জন্য এর চেয়ে ভালো কোনো হাতিয়ার তাদের কাছে নেই । এই মহৎ প্রতিষ্ঠানটি শুধুমাত্র এই কারণেই টিকে আছে । আর একারণেই এটি যেকোনো সত্যিকারের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে এবং যখন রাইখের পতাকার বীরেরা জয়ধ্বনি দেয়, তখন সন্তুষ্টি লাভ করে।

তাদের উল্লাস, কিন্তু বাস্তবে এই বীরেরাই খরগোশের মতো পালাবে যদি তাদের নিজেদের রক্ত দিয়ে এই পতাকা রক্ষা করার জন্য ডাকা হয় ।

জাতি-রাষ্ট্রকে তার অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম করতে হবে । ডাওয়েস প্ল্যানের মতো দলিলে স্বাক্ষর করে সে তার অস্তিত্ব অর্জন বা সুরক্ষিত করতে পারবে না । বরং তার অস্তিত্ব ও প্রতিরক্ষার জন্য ঠিক সেই জিনিসগুলোরই প্রয়োজন হবে , যা আমাদের বর্তমান ব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করে। তার রূপ এবং অভ্যন্তরীণ জাতীয় অস্তিত্ব যত বেশি মূল্যবান হবে, তার বিরোধীদের ঈর্ষা ও বিরোধিতাও তত বাড়বে । তার শ্রেষ্ঠ প্রতিরক্ষা হবে তার অধিকৃত অস্ত্র নয়, বরং তার নাগরিকেরা। সে দুর্গ বা ঘাঁটি দ্বারা রক্ষা পাবে না , বরং তার দেশপ্রেমের জ্বলন্ত অনুভূতি এবং জাতীয় দেশপ্রেমের প্রবল চেতনায় পরিপূর্ণ নারী-পুরুষদের জীবন্ত প্রাচীর দ্বারা রক্ষা পাবে।

সুতরাং, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যে তৃতীয় বিষয়টি অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে তা হলো: জাতি-রাষ্ট্রকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে বিজ্ঞানও জাতির মধ্যে গর্ববোধ জাগিয়ে
তুলতে পারে। শুধু বিশ্ব ইতিহাসই নয় , সামগ্রিকভাবে সভ্যতার ইতিহাসও হতে হবে

এই নীতির আলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে । উদ্ভাবককে শুধু একজন উদ্ভাবক হিসেবেই নয়, তার চেয়েও বেশি, জাতির একজন সদস্য হিসেবে মহান হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে। একটি মহান কৃতিত্বের চিন্তায় যে মুগ্ধতা জাগে, তাকে এই গর্ব ও সন্তুষ্টিতে রূপান্তরিত করতে হবে যে, আমাদের জাতির একজন মানুষকে এই কৃতিত্বের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। জার্মান ইতিহাসের অসংখ্য মহান নামের মধ্য থেকে সর্বশ্রেষ্ঠদের নির্বাচন করে আমাদের তরুণ প্রজন্মের কাছে এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে, যাতে তাঁরা এমন স্তম্ভে পরিণত হন যার উপর জাতীয় চেতনা নির্ভর করবে ।

এই নীতিটি মাথায় রেখে বিষয়বস্তু পদ্ধতিগতভাবে সাজানো উচিত ।
শিক্ষাদান এমনভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত যাতে ছেলেমেয়েরা স্কুল ছাড়ার পর অর্ধ-শান্তিবাদী, গণতন্ত্রবাদী বা এই জাতীয় কিছু না হয়ে, বরং অন্তরের অন্তঃস্থলে জার্মান হয়। যাতে এই জাতীয় অনুভূতিগুলো একেবারে শুরু থেকেই আন্তরিক হয় এবং কৃত্রিম না হয়ে ওঠে।

Machine Translated by Google

কেবল বাহ্যিক রূপের পরিবর্তে, তরুণ মন যখন সংবেদনশীল থাকে, তখনই তাদের অন্তরে নিম্নলিখিত মৌলিক ও অটল নীতিটি গেঁথে দেওয়া উচিত : যে ব্যক্তি তার দেশকে ভালোবাসে, সে দেশের কল্যাণের জন্য আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকার মাধ্যমেই কেবল সেই অনুভূতির আন্তরিকতা প্রমাণ করতে পারে ।
নিজ স্বার্থে পরিচালিত জাতীয়তাবোধ বলে কিছু নেই । কিংবা শুধু নির্দিষ্ট কিছু শ্রেণীকে অন্তর্ভুক্ত করে এমন জাতীয়তাবাদ বলেও কিছু নেই ।
'হুররে!' ধ্বনি প্রমাণ করে না যে...
যদি এই স্লোগানগুলোর পেছনে দেশের সমৃদ্ধি বজায় রাখার কোনো আন্তরিক উদ্দেশ্য না থাকে, তবে এগুলোর কোনো অর্থ নেই এবং এগুলো কাউকে নিজেকে জাতীয়তাবাদী বলার অধিকার দেয় না । নিজের দেশ নিয়ে তখনই গর্ববোধ করা যায়, যখন লজ্জার কোনো শ্রেণিই থাকে না । যখন একটি জাতির অর্ধেক সদস্য দুঃখ-কষ্টে নিমজ্জিত থাকে , কিংবা অধঃপতিত বা বিপথগামী হয়, তখন সেই জাতি এমন এক অনাকর্ষণীয় চিত্র তুলে ধরে যে, তার অংশ হতে পেরে কেউ গর্ববোধ করতে পারে না। যখন একটি জাতির সকল সদস্য শারীরিক ও নৈতিকভাবে সুস্থ থাকে , কেবল তখনই সেই জাতির অংশ হওয়ার আনন্দ তীব্রতর হয়ে সেই উচ্চতর অনুভূতিতে পরিণত হয়, যাকে আমরা জাতীয় গর্ব বলি । কিন্তু এই গর্ব তার সর্বোচ্চ রূপে কেবল তারাই অনুভব করতে পারে, যারা তাদের জাতির মহত্ত্ব সম্পর্কে অবগত।

তরুণদের হৃদয়ে জাতীয়তাবাদের চেতনা ও সামাজিক ন্যায়বোধকে একীভূত করতে হবে। তাহলেই সেই দিন আসবে, যখন অভিন্ন ভালোবাসা ও অভিন্ন গর্বে ঐক্যবদ্ধ এক অজেয় ও অবিনশ্বর জাতি জেগে উঠবে।

সর্বদা।

উগ্র জাতীয়তাবাদের ভয়, যা আমাদের সময়ের একটি উপসর্গ, তা তাদের অক্ষমতারই লক্ষণ। যেহেতু আমাদের যুগে শুধু যে উদ্যমী শক্তির অভাব তাই নয়, বরং এই ধরনের প্রকাশকে অপ্রীতিকরও মনে করা হয়, তাই ভাগ্য কোনো মহৎ লক্ষ্য অর্জনের জন্য একে কখনো বেছে নেবে না। এই পৃথিবীতে যে সর্বশ্রেষ্ঠ পরিবর্তনগুলো ঘটেছে, তা অকল্পনীয়ই থেকে যেত যদি সেগুলো তীব্র এমনকি উন্মত্ত অনুভূতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হতো ; কিন্তু তা ঘটেছে কেবল শান্তি ও শৃঙ্খলার মতো বুর্জোয়া সদ্গুণের দ্বারা।

একটি বিষয় নিশ্চিত: আমাদের বিশ্ব এক বিরাট বিপ্লবের সম্মুখীন হবে । প্রশ্ন শুধু একটাই, এর ফল মানবজাতির আর্য অংশের জন্য অনুকূল হবে , নাকি চিরন্তন ইহুদিরা এর থেকে লাভবান হবে।

তরুণ প্রজন্মকে সঠিক পথে শিক্ষিত করার মাধ্যমে জাতিরাষ্ট্র তৈরি করবে
মানবজাতির এমন এক প্রজন্ম যারা বিশ্বের ভাগ্য নির্ধারণকারী এই সর্বোচ্চ সংগ্রামের জন্য উপযুক্ত।
যে জাতি সর্বপ্রথম এই পথ অবলম্বন করবে, তারাই জয়ী হবে ।

জাতি-রাষ্ট্র যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সমগ্র কাঠামো গড়ে তুলবে, তার প্রধান কাজ হিসেবে তরুণদের হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে জাতিগত প্রবৃত্তি এবং জাতিগত ধারণার বোধ জাগিয়ে তোলাকে অবশ্যই গণ্য করতে হবে। কোনো ছেলে বা মেয়ে জাতিগত বিশুদ্ধতার অর্থ এবং জাতির নির্মল রক্ত বজায় রাখার গুরুত্ব স্পষ্টভাবে না বুঝে বিদ্যালয় ত্যাগ করতে পারবে না । এভাবেই আমাদের জাতির অস্তিত্ব রক্ষার প্রথম অপরিহার্য শর্তটি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এভাবেই আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ সাংস্কৃতিক অগ্রগতি নিশ্চিত হবে।

শেষ পর্যন্ত, সমস্ত শারীরিক ও মানসিক প্রশিক্ষণই বৃথা যাবে, যদি না তা এমন কোনো ব্যক্তির কাজে লাগে যিনি নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে এবং স্বতন্ত্র গুণাবলী রক্ষা করতে প্রস্তুত ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

যদি এর অন্যথা হয়, তবে এমন কিছু ঘটবে যার জন্য আমরা জার্মানরা ইতিমধ্যেই অনুশোচনা করেছি , সম্ভবত এখন পর্যন্ত এই ট্র্যাজেডির মাত্রা উপলব্ধি না করেই। ভবিষ্যতেও আমরা সভ্যতার জন্য কেবল সার হয়ে থাকতে বাধ্য হব। এবং তা আমাদের সমসাময়িক বুর্জোয়া মানসিকতার সেই মামুলি অর্থে নয় , যারা আমাদের জাতির একজন হারানো সদস্যকে কেবল একজন হারানো নাগরিক হিসেবেই দেখে , বরং এমন এক অর্থে যা আমরা সবাই যন্ত্রণাদায়কভাবে অনুভব করব : অর্থাৎ, আমাদের জাতিগত রক্ত বিলুপ্ত হতে বাধ্য হবে। অবিরাম মিশ্রণের মাধ্যমে ।

অন্যান্য জাতিদেরকে আমরা হয়তো তাদের পূর্বের নিম্ন স্তর থেকে সভ্যতার উচ্চতর স্তরে উন্নীত করতে পারি, কিন্তু আমরা নিজেরা যে উচ্চতায় পৌঁছেছি সেখান থেকে আমাদের নিজেদেরকে চিরতরে নেমে আসতে হবে ।

Machine Translated by Google

অবশেষে, জাতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে, এই প্রশিক্ষণের চূড়ান্ত পরিণতি অবশ্যই ঘটতে হবে। সামরিক সেবায়। একজন সাধারণ জার্মান যে স্বাভাবিক প্রশিক্ষণ লাভ করে, সামরিক সেবা অবশ্যই তার শেষ পর্যায় হতে হবে।

যদিও জাতি-রাষ্ট্র শারীরিক ও মানসিক প্রশিক্ষণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়, তবুও তাকে এমন মানুষ বাছাই করার কাজটিও সমান গুরুত্বপূর্ণভাবে বিবেচনা করতে হবে যারা স্বয়ং রাষ্ট্রের সেবা করবে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে বর্তমানে হালকাভাবে দেখা হয়। সাধারণত, যে বাবা-মায়েরা বর্তমানে ভালো অবস্থানে আছেন, তাদের সন্তানদের উচ্চশিক্ষার যোগ্য বলে মনে করা হয়। এক্ষেত্রে প্রতিভার ভূমিকা কম। কিন্তু প্রতিভাকে কেবল আপেক্ষিকভাবেই বিচার করা যায়। যদিও সাধারণ সংস্কৃতিতে সে একজন শহরের সন্তানের চেয়ে নিকৃষ্ট হতে পারে , একজন কৃষকের ছেলে এমন একটি পরিবারের ছেলের চেয়ে বেশি প্রতিভাবান হতে পারে যারা বহু প্রজন্ম ধরে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত। কিন্তু একজন শহরের সন্তানের উন্নত সংস্কৃতির সাথে বেশি বা কম প্রতিভার কোনো সম্পর্ক নেই ; এই সংস্কৃতির মূলে রয়েছে আরও বৈচিত্র্যময় শিক্ষা এবং শিশুটি যে পরিবেশে বাস করে, তার ফলে প্রাপ্ত প্রচুর পরিমাণে অভিজ্ঞতা। যদি একজন বুদ্ধিমান কৃষকের ছেলে শৈশব থেকে একই রকম পরিবেশে শিক্ষিত হতো, তবে তার বুদ্ধিবৃত্তিক অর্জন সম্পূর্ণ ভিন্ন হতো। আমাদের সময়ে, এমন একটিই ক্ষেত্র আছে যেখানে একজন ব্যক্তির জন্মগত পরিবারের চেয়ে তার সহজাত প্রতিভা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সেটি হলো শিল্পকলার ক্ষেত্র। এখানে একজন ব্যক্তি কেবল 'শিখতে' পারে না , বরং তার একটি সহজাত প্রতিভা থাকতে হবে যা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যায়।

কমবেশি সৌভাগ্যজনক বিকাশ (অর্থাৎ যা বিদ্যমান তার বিচক্ষণ বিকাশ), অর্থ এবং পিতামাতার অবস্থান এখানে অপ্রাসঙ্গিক। এটি একটি জোরালো প্রমাণ যে প্রতিভা আবশ্যিকভাবে উচ্চ সামাজিক মর্যাদা বা সম্পদের সঙ্গে যুক্ত নয়। প্রায়শই সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীরা দরিদ্র পরিবার থেকে এসেছেন। এবং প্রায়শই গ্রামের এক ছেলে অবশেষে একজন বিখ্যাত শিল্পী হয়ে উঠেছেন।

আমাদের সময়ের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রজ্ঞা সম্পর্কে এটা বিশেষ কিছু বলে না যে, সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনে এই সত্যটি বিবেচনায় নেওয়া হয় না। যুক্তি দেওয়া হয় যে এই নীতিটি, যদিও
শিল্পকলার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে সত্য হলেও, ফলিত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তা সত্য নয়।
এটা সত্যি যে একজন মানুষকে একটি নির্দিষ্ট মাত্রার যান্ত্রিক দক্ষতায় প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে , ঠিক যেমন একজন জ্ঞানী গুরু একটি পুডল কুকুরকে অবিশ্বাস্য কৌশল শেখাতে পারেন। কিন্তু এই ধরনের প্রশিক্ষণ প্রাণীটিকে সেই কৌশলগুলো সম্পাদনের জন্য তার বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করতে শেখায় না। একই কথা মানুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। একজন মানুষকে , সে প্রতিভাবান হোক বা না হোক, কিছু নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক কাজ করতে শেখানো যেতে পারে , কিন্তু সেক্ষেত্রে ফলাফল একটি প্রাণীর মতোই প্রাণহীন এবং যান্ত্রিক হয়। একজন গড় বুদ্ধিমত্তার মানুষকে কঠোর মানসিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গড় পরিমাণের চেয়ে বেশি জ্ঞান অর্জন করতে বাধ্য করা যেতে পারে ; কিন্তু এই জ্ঞান নিষ্ফলই থেকে যাবে। এর ফলস্বরূপ এমন একজন মানুষ তৈরি হবে যে হয়তো জ্ঞানের এক চলমান বিশ্বকোষ , কিন্তু জীবনের প্রতিটি সংকটময় মুহূর্তে এবং যেখানেই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে , সেখানেই সে ব্যর্থ হবে।

এই ধরনের লোকদের প্রতিটি নতুন, এমনকি তুচ্ছ কাজের জন্যও বিশেষ প্রশিক্ষণ দিতে হয়, এবং তারা মানবজাতির সামগ্রিক অগ্রগতিতে কখনোই কোনো অবদান রাখতে পারবে না। মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত জ্ঞান বড়জোর আমাদের বর্তমান শাসনব্যবস্থায় তাদেরকে সরকারি পদের জন্য যোগ্য করে তুলতে পারে।

বলা বাহুল্য, একটি জাতি গঠনকারী সমগ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিভাবান ব্যক্তিদের খুঁজে পাওয়া যায়। এটাও খুবই স্বাভাবিক যে, জ্ঞানের নিষ্প্রাণ ভাণ্ডারকে যখন কোনো ব্যক্তির সহজাত প্রতিভা দ্বারা প্রাণবন্ত করে তোলা হয় , তখন সেই জ্ঞানের মূল্যও তত বৃদ্ধি পায়। এই ক্ষেত্রে সৃজনশীল কাজ কেবল জ্ঞান ও প্রতিভার সমন্বয়েই সম্পন্ন করা সম্ভব।

আমাদের আধুনিক বিশ্ব কতটা ভুল, তা দেখানোর জন্য একটি উদাহরণই যথেষ্ট।
এই প্রসঙ্গে, সময়ে সময়ে আমাদের সচিত্র সংবাদপত্রগুলো জার্মান অশিক্ষিতদের জ্ঞানার্জনের জন্য এই খবর প্রকাশ করে যে , পৃথিবীর কোনো এক অংশে , কোনো এক নির্দিষ্ট স্থানে প্রথমবারের মতো একজন নিগ্রো আইনজীবী, শিক্ষক, যাজক, একজন বিখ্যাত অপেরা গায়ক বা এই জাতীয় কিছু হয়েছেন। অথচ কট্টরপন্থী বুর্জোয়া শ্রেণি আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির সাফল্য কতখানি বিস্ময়কর, তা জানিয়ে লেখা একটি প্রতিবেদনের দিকে বিস্মিত প্রশংসায় তাকিয়ে থাকে...

Machine Translated by Google

বিশেষত, ধূর্ত ইহুদি এই ঘটনাটির মধ্যে তার তত্ত্বে ব্যবহার করার জন্য নতুন প্রমাণ খুঁজে পায়, যা এটি সমাজকে এই ধারণা দিয়ে সংক্রমিত করতে চায় যে সকল মানুষ সমান । বুর্জোয়াদের অন্ধকার মনে এটা কখনোই উদয় হয় না যে , জন্মগতভাবে কেবল নরবানরসদৃশ কোনো সত্তাকে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া যুক্তির বিরুদ্ধে পাপ, এক অপরাধমূলক উন্মাদনা , যতক্ষণ না সে রূপান্তরিত হয়ে একজন আইনজীবীতে পরিণত হওয়ার ভান করতে পারে ; অথচ অন্যদিকে, সবচেয়ে সভ্য জাতিগুলোর লক্ষ লক্ষ মানুষকে তাদের সাংস্কৃতিক স্তরের অযোগ্য পদে থাকতে হয়। বুর্জোয়া মন এটা বোঝে না যে, লক্ষ লক্ষ অত্যন্ত প্রতিভাবান মানুষকে সর্বহারার দুর্দশার পাঁকে থাকতে দেওয়া এবং একই সাথে হটেন্টট ও জুলুদের বুদ্ধিবৃত্তিক পেশায় স্থান করে নেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া চিরন্তন স্রষ্টার বিরুদ্ধে পাপ । কারণ এখানে আমরা কেবল একটি প্রশিক্ষণ কৌশলের ফল দেখতে পাই, যেমন একটি কুকুর কৌশল দেখায়। যদি বুদ্ধিমান জাতিগুলোর মধ্যে একই পরিমাণ যত্ন ও প্রচেষ্টা প্রয়োগ করা হতো , তবে প্রতিটি ব্যক্তি এই বিষয়গুলিতে হাজার গুণ বেশি সক্ষম হতো ।

এই পরিস্থিতি অসহনীয় হয়ে উঠবে যদি এমন দিন আসে যখন এটি ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া বন্ধ হয়ে যায় । কিন্তু পরিস্থিতি ইতিমধ্যেই অসহনীয়, যদি উচ্চশিক্ষার অধিকার লাভের যোগ্যতা নির্ধারণে প্রতিভা এবং সহজাত দক্ষতাকে নির্ণায়ক উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা না হয় । এটা ভাবা সত্যিই অসহনীয় যে, বছরের পর বছর ধরে বিন্দুমাত্র প্রতিভা না থাকা সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণীকে উচ্চশিক্ষার যোগ্য বলে গণ্য করা হয় , অথচ সহজাত ক্ষমতা সম্পন্ন আরও লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণীকে কোনো ধরনের উচ্চশিক্ষা ছাড়াই থাকতে হয় । এভাবে জাতির যে বাস্তব ক্ষতি হয় তা হলো...

গণনা করা অসম্ভব । যদি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমেরিকায় গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে, তার একটি কারণ হলো, এই দেশে সর্বনিম্ন সামাজিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত প্রতিভাবান ব্যক্তিদের মধ্যে যারা উচ্চশিক্ষা লাভ করেছেন, তাদের সংখ্যা ইউরোপের তুলনায় আনুপাতিকভাবে অনেক বেশি ।

মস্তিষ্কে সঞ্চিত জ্ঞানের পরিমাণ নতুন কিছু আবিষ্কার করার জন্য যথেষ্ট নয়। যা গুরুত্বপূর্ণ একমাত্র সহজাত প্রতিভা দ্বারা উদ্ভাসিত জ্ঞানই সম্ভব। কিন্তু আমাদের দেশে এমন প্রতিভার কদর নেই। শুধু স্কুলের ভালো ফলাফলই গণ্য হয় ।

রাষ্ট্রের জন্য আরও একটি শিক্ষামূলক দায়িত্ব অপেক্ষা করছে । এর কাজ কোনো নির্দিষ্ট সামাজিক শ্রেণীর প্রভাবশালী আধিপত্য নিশ্চিত করা হবে না , বরং এর কর্তব্য হবে সমগ্র জাতি থেকে সবচেয়ে যোগ্য মেধাবীদের একত্রিত করে উপযুক্ত পদে উন্নীত করা। রাষ্ট্রের কর্তব্য শুধু সাধারণ শিশুকে একটি নির্দিষ্ট প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করাই নয়, বরং এই প্রতিভার জন্য সঠিক পথের দিশা তৈরি করে দেওয়াও । এবং সর্বোপরি, সামাজিক শ্রেণী নির্বিশেষে সকল প্রকার প্রতিভার জন্য উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত রাখতে হবে । এটি একটি জরুরি প্রয়োজন, কারণ কেবল এইভাবেই প্রতিভাবান জননেতা তৈরি করা সম্ভব হবে ।

রাষ্ট্রের এইভাবে অগ্রসর হওয়ার আরও একটি কারণ আছে । আমাদের বুদ্ধিজীবী মহল, বিশেষ করে জার্মানিতে, এতটাই বিচ্ছিন্ন ও অনমনীয় যে নিম্নবর্গের সাথে তাদের কোনো জীবন্ত যোগাযোগ নেই। এর দুটি খারাপ পরিণতি হয়: প্রথমত, বুদ্ধিজীবী মহল সাধারণ জনগণকে বোঝেও না, তাদের প্রতি সহানুভূতিশীলও নয়। তারা এত দীর্ঘ সময় ধরে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন যে, তাদের বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় মনস্তাত্ত্বিক বন্ধন এখন আর তাদের মধ্যে নেই । তারা জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে । দ্বিতীয়ত, তাদের প্রয়োজনীয় ইচ্ছাশক্তির অভাব রয়েছে; এই ক্ষমতা জাতির আদিম জনগণের তুলনায় বিচ্ছিন্নভাবে বসবাসকারী পরিশীলিত মহলে সর্বদা দুর্বল থাকে । ঈশ্বর জানেন, জার্মানদের বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির প্রাচুর্যের কোনো অভাব কখনোই ছিল না, কিন্তু আমাদের ইচ্ছাশক্তি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার সবসময়ই অভাব ছিল । উদাহরণস্বরূপ, আমাদের রাষ্ট্রনায়করা যত বেশি "বুদ্ধিজীবী" ছিলেন, তাদের বাস্তব সাফল্যের অভাব ততই বেশি ছিল । যুদ্ধের জন্য আমাদের রাজনৈতিক প্রস্তুতি এবং প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম।

ত্রুটিপূর্ণ ছিল , অবশ্যই এই কারণে নয় যে জাতি শাসনকারী মনগুলো স্বল্পশিক্ষিত ছিল, বরং এই কারণে যে আমাদের জনবিষয়াদি পরিচালনাকারী ব্যক্তিরা ছিলেন অতি শিক্ষিত, জ্ঞান ও বুদ্ধিতে পরিপূর্ণ , কিন্তু বিচক্ষণতার অভাব ছিল তাদের মধ্যে।

Machine Translated by Google

শক্তিও ছিল না, সাহসিকতারও স্পৃহা ছিল না। আমাদের জাতির ট্র্যাজেডি ছিল অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম, যখন একজন দ্বিধাগ্রস্ত দার্শনিক চ্যান্সেলর ছিলেন । বেথম্যান ভন হোলওয়েগের পরিবর্তে যদি আমাদের নেতা জনগণের একজন সাধারণ মানুষ হতেন, তবে গ্রেনেডিয়ারদের বীরত্বপূর্ণ রক্ত বৃথা যেত না। আমাদের নেতাদের যে অতি-বুদ্ধিমান উপাদান দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল, তা শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হলো...

নভেম্বর বিপ্লব সংঘটনকারী সকল দুষ্কৃতকারীর শ্রেষ্ঠ মিত্র হওয়া । এই বুদ্ধিজীবীরা ঝুঁকি না নিয়ে সংযতভাবে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করেছিলেন এবং এভাবেই অন্যদের সফল হওয়ার পথ তৈরি করে দিয়েছিলেন।

এক্ষেত্রে ক্যাথলিক চার্চ একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ দেয়। ব্রহ্মচর্য চার্চকে তার নিজের মধ্য থেকে নয়, বরং ক্রমাগত সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে যাজক নিয়োগ করতে বাধ্য করে। ব্রহ্মচর্যের তাৎপর্য খুব কম লোকই উপলব্ধি করে। অথচ ঠিক এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে শক্তির সেই অফুরন্ত উৎস, যা এই প্রাচীন প্রতিষ্ঠানটির বৈশিষ্ট্য। দেশের নিম্নবর্গ থেকে ক্রমাগত যাজকীয় পদাধিকারী নিয়োগের মাধ্যমে চার্চ কেবল সহজাত বোঝাপড়ার উপর ভিত্তি করে সাধারণ মানুষের সাথে একটি সুসম্পর্কই বজায় রাখে না , বরং সাধারণ মানুষের মধ্যে বিদ্যমান শক্তির উৎসকে কাজে লাগানোর সক্ষমতাও নিশ্চিত করে । এই কারণেই এই বিশাল সত্তাটির বিস্ময়কর তারুণ্য , মানসিক নমনীয়তা এবং ইস্পাত-কঠিন ইচ্ছাশক্তি বিদ্যমান।

জাতি-রাষ্ট্রের কাজ হবে শিক্ষাব্যবস্থাকে এমনভাবে সংগঠিত ও পরিচালনা করা, যাতে নিম্নবর্গ থেকে আসা নতুন প্রতিভাদের দ্বারা বুদ্ধিজীবী মহল ক্রমাগত সমৃদ্ধ হয়। রাষ্ট্রকে অবশ্যই জাতির বিশাল জনগোষ্ঠী থেকে সহজাত প্রতিভাধরদের সতর্কতার সাথে বাছাই করে সমাজের সেবায় নিয়োজিত করতে হবে । কারণ রাষ্ট্র নিজে বা তার বিভিন্ন দপ্তর বিশেষ শ্রেণীর সদস্যদের আয়ের জোগান দেওয়ার জন্য নয়, বরং...

তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে হবে । তবে, এটি কেবল তখনই সম্ভব হবে যদি রাষ্ট্র এই পদগুলো গ্রহণের জন্য নির্দিষ্টভাবে ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ দেয় । এই ধরনের ব্যক্তিদের থাকতে হবে
অপরিহার্য মৌলিক দক্ষতা এবং ইচ্ছাশক্তি । এই নীতিটি কেবল সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রেই নয় , বরং দেশের বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক নেতৃত্বে অংশগ্রহণকারী সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তারা যে ক্ষেত্রেই কাজ করুন না কেন। একটি জাতির মহত্ত্ব আংশিকভাবে নির্ভর করে সেরা মেধাবীদের জনসেবার সেইসব শাখার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়ার সাফল্যের উপর , যেগুলোর জন্য তাদের মধ্যে স্বাভাবিক প্রবণতা প্রকাশ পায় এবং তাদেরকে এমন পদে স্থাপন করার উপর, যেখানে তারা সমাজের কল্যাণে সর্বোত্তম অবদান রাখতে পারে। যদি সমান শক্তি ও গুণমানের দুটি জাতি একে অপরের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হয় , তবে যে জাতি তার সেরা প্রতিভাদের হাতে বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক নেতৃত্ব অর্পণ করবে, সেই জাতিই জিতবে; এবং যে জাতিতে সরকার কেবল সুবিধাভোগী গোষ্ঠী ও শ্রেণীর খাদ্যে পরিণত হয় এবং যেখানে ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ প্রতিভা ব্যবহৃত হয় না, সেই জাতি পরাজিত হবে।

ব্যবহৃত।

অবশ্যই, আমাদের আজকের বিশ্বে এমন সংস্কার অসম্ভব বলে মনে হয়।
সঙ্গে সঙ্গেই এই নিয়ে আপত্তি উঠবে যে , উদাহরণস্বরূপ, একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তার ছেলেকে কেন কায়িক শ্রম করতে হবে, শুধুমাত্র এই কারণে যে অন্য একজন , যার বাবা -মা শ্রমিক শ্রেণীর, তাকে সরকারি চাকরিতে বেশি সক্ষম বলে মনে করা হয় । এই যুক্তিটি ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধ হতে পারে , যতক্ষণ পর্যন্ত কায়িক শ্রমকে এখনকার মতোই দেখা হয়।

সুতরাং, জাতি-রাষ্ট্রকে কায়িক শ্রমের প্রতি তার বর্তমান মনোভাব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করতে হবে। প্রয়োজনে , কায়িক শ্রমকে একটি লজ্জাজনক পেশা হিসেবে দেখার আজকের মূর্খতাপূর্ণ অভ্যাসকে নির্মূল করার লক্ষ্যে একটি স্থায়ী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে ।

একজন ব্যক্তির মূল্য বিচার করা উচিত সে কী ধরনের কাজ করে তা দিয়ে নয়, বরং সে কীভাবে কাজটি করে এবং সমাজের জন্য তার উপযোগিতা দিয়ে । এই কথাটি এমন এক যুগে ভয়ংকর মনে হতে পারে , যখন সবচেয়ে নির্বোধ সংবাদপত্র কলামিস্টও সবচেয়ে দক্ষ মেকানিকের চেয়ে বেশি সম্মানিত, শুধুমাত্র এই কারণে যে তিনি কলম দিয়ে কাজ করেন। কিন্তু আমি আগেই যেমন বলেছি, এই ভ্রান্ত মূল্যায়নগুলো বাস্তবতার প্রতিফলন নয় । এগুলো কৃত্রিমভাবে প্রবর্তন করা হয়েছিল, এবং এমন সময়ও ছিল যখন এগুলোর কোনো অস্তিত্বই ছিল না। বর্তমান এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতি আমাদের বস্তুবাদী যুগ থেকে উদ্ভূত সাধারণ অস্বাস্থ্যকর ঘটনাগুলোর মধ্যে অন্যতম। প্রত্যেক ধরনের কাজেরই দ্বৈত মূল্য রয়েছে: বস্তুগত এবং আদর্শগত। বস্তুগত মূল্য

সম্প্রদায়ের জীবনে এই কাজের বাস্তব গুরুত্বের উপর নির্ভর করে । যত বেশি সংখ্যক মানুষ সহযোগিতা করবে...

Machine Translated by Google

এই শ্রম থেকে একজন ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যত বেশি উপকৃত হন , তার বস্তুগত মূল্যও তত বৃদ্ধি পায়। এই মূল্যায়নটি ব্যক্তির কাজের জন্য প্রাপ্ত বস্তুগত পারিশ্রমিকের মাধ্যমে প্রকাশ পায় । এই বিশুদ্ধ বস্তুগত মূল্যের বিপরীতে রয়েছে আদর্শগত মূল্য। এখানে, সম্পাদিত কাজের মূল্যায়ন তার বস্তুগত গুরুত্ব দ্বারা নয়, বরং তা প্রয়োজনীয়তার সাথে কতটা সঙ্গতিপূর্ণ, সেই মাত্রা দ্বারা করা হয়। নিঃসন্দেহে, একটি আবিষ্কারের বস্তুগত উপযোগিতা একজন শ্রমিকের দৈনিক কাজের চেয়ে বেশি হতে পারে ; কিন্তু এটাও নিশ্চিত যে, সমাজের এই দৈনিক শ্রমিকদের প্রত্যেককে উচ্চতর পরিষেবার মতোই প্রয়োজন । বস্তুগত দৃষ্টিকোণ থেকে, বিভিন্ন কাজকে সমাজের জন্য তাদের উপযোগিতা অনুসারে ভাগ করা যেতে পারে , এবং এই বিভাজনটি মজুরির একটি মাপকাঠিতে প্রকাশ পায় ; কিন্তু আদর্শ পরিস্থিতিতে, প্রত্যেক শ্রমিক তখনই সমান হয়ে ওঠে যখন সে তার নিজের কাজে সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করে , সে যে কাজই করুক না কেন। এইভাবে, একজন ব্যক্তির মূল্য তার প্রাপ্ত মজুরি দ্বারা নয়, বরং তার প্রাপ্ত মজুরি দ্বারা নির্ধারণ করতে হবে ।

একটি বিচক্ষণভাবে শাসিত রাষ্ট্রে , প্রত্যেক ব্যক্তি যেন তার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ পায়, তা নিশ্চিত করার জন্য যত্ন নিতে হবে । অন্য কথায়, মানুষকে তাদের স্বাভাবিক প্রবণতা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে ; কিন্তু এই প্রবণতাগুলো সহজাত এবং কোনো প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জন করা যায় না; এগুলো প্রকৃতির দান, মানুষের যোগ্যতা নয়। অতএব, সহনাগরিকদের দ্বারা মানুষের সাথে কেমন আচরণ করা হবে, তা তারা কী ধরনের কাজ করে তার উপর ভিত্তি করে হতে পারে না , কারণ কাজ ব্যক্তিকে অর্পণ করা হয়। যেহেতু একজন ব্যক্তি কী ধরনের কাজ করবে তা তার সহজাত ক্ষমতা এবং সম্প্রদায় থেকে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের উপর নির্ভর করে, তাই সম্প্রদায় কর্তৃক তাকে অর্পিত কাজ সে কীভাবে সম্পাদন করে, তার ভিত্তিতেই তাকে বিচার করতে হবে । একজন ব্যক্তি যে কাজ করে তা তার অস্তিত্বের শেষ নয়, বরং একটি মাধ্যম মাত্র । জীবনে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো একজন মানুষ হিসেবে উচ্চতর স্তরে উন্নীত হওয়া; কিন্তু সে এটি কেবল সেই সম্প্রদায়ের মাধ্যমেই করতে পারে যার সাথে সে সাংস্কৃতিক জীবন ভাগ করে নেয় । এবং এই সম্প্রদায়কে অবশ্যই সেই ভিত্তির উপর টিকে থাকতে হবে যার উপর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত । তাকে অবশ্যই এই ভিত্তিগুলো বজায় রাখতে অবদান রাখতে হবে । এই অবদানের রূপ প্রকৃতিই নির্ধারণ করে। ব্যক্তির কর্তব্য হলো, সমাজ তাকে যা দিয়েছে, তা সততা ও নিষ্ঠার সাথে সমাজকে ফিরিয়ে দেওয়া ।

যিনি এই কাজটি করেন, তিনি সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদার যোগ্য। বস্তুগত পারিশ্রমিক সমাজের প্রতি উপযোগিতার প্রতিফলন হতে পারে ; কিন্তু আদর্শ পারিশ্রমিক হলো সেই সম্মান, যা এমন ব্যক্তিকে দেওয়া হয় যিনি প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত এবং জাতীয় সমাজ থেকে পাওয়া প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিকশিত সমস্ত শক্তি দিয়ে তাঁর জাতির সেবা করেন । তখন একজন সৎ কারিগর হওয়া আর অসম্মানজনক থাকবে না ; কিন্তু একজন অকার্যকর সরকারি কর্মচারী হওয়া হবে লজ্জার বিষয় , যে কিনা একটি সৎ জাতির সময় নষ্ট করে এবং তাদের দৈনন্দিন আহার কেড়ে নেয় । তখন এমন লোকদের এই ধরনের পদ না দেওয়াটাই স্বাভাবিক হবে, যাদের স্বভাব তাদের কর্তব্য পালনে বাধা দেয় ।

অধিকন্তু , এই ব্যক্তিগত কার্যকারিতাই হবে রাষ্ট্রের সাধারণ কার্যকলাপে সমানভাবে অংশগ্রহণের অধিকারের একমাত্র মাপকাঠি ।

বর্তমান যুগ নিজের ধ্বংসের দিকেই এগিয়ে চলেছে। এটি সার্বজনীন ভোটাধিকার চালু করেছে, সমান অধিকার নিয়ে বড় বড় কথা বলে, কিন্তু এই সমতার কোনো ভিত্তি খুঁজে পায় না। এটি বস্তুগত মজুরিকে বিবেচনা করে
মানবিক মূল্যবোধের প্রকাশ হিসেবে এবং এর মাধ্যমে বিদ্যমান মহত্তম সমতার ভিত্তি ধ্বংস করে দেয় । সমতা কোনো ব্যক্তির সম্পাদিত কাজের উপর নির্ভর করে না এবং করতেও পারে না , বরং তা নির্ভর করে প্রত্যেক ব্যক্তি তাকে অর্পিত নির্দিষ্ট কাজটি কীভাবে সম্পাদন করে তার উপর । কেবল এইভাবেই দৈবচয়ন কোনো ব্যক্তির কাজ নির্ধারণ করবে না, এবং কেবল এইভাবেই প্রত্যেকে তার নিজের সামাজিক মূল্যবোধের স্থপতি হয়ে উঠবে ।

এই যুগে, যখন মানুষের পুরো গোষ্ঠী শুধুমাত্র তাদের প্রাপ্ত বেতনের ভিত্তিতে একে অপরের যোগ্যতা বিচার করে, তখন এই সবকিছুর কোনো বোঝাপড়া থাকবে না । কিন্তু তাই বলে এই ধারণাগুলো প্রচার করা বন্ধ করার কোনো কারণ নেই। বরং উল্টোটা: অভ্যন্তরীণভাবে অসুস্থ ও ভেঙে পড়া এই যুগে , যে কেউ একে সারিয়ে তুলতে চায় , তাকে প্রথমে এটিকে উন্মোচন করার সাহস রাখতে হবে।
এই রোগের প্রকৃত মূল। এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে এই দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতে হবে। তাকে ক্ষুদ্র বুর্জোয়াদের ঊর্ধ্বে উঠে সোচ্চার হতে হবে এবং সমন্বয় সাধন করতে হবে।
এমন সব শক্তি যা একটি নতুন বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক হতে পারে।

Machine Translated by Google

* * *

অবশ্যই এই আপত্তি উঠবে যে, কাজের বস্তুগত ও আদর্শগত মূল্যকে আলাদা করা কঠিন এবং কায়িক শ্রমের সাথে যুক্ত নিম্ন মর্যাদার কারণ হলো এই ধরনের কাজের জন্য কম মজুরি। তারা বলবে যে, কম মজুরির কারণেই কায়িক শ্রমিকের দেশের সংস্কৃতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ কম থাকে; ফলে , মানব সংস্কৃতির আদর্শগত দিকটি তার কাছে কম উন্মুক্ত থাকে, কারণ এর সাথে তার দৈনন্দিন কাজের কোনো সংযোগ নেই । তারা হয়তো

এ কথাও যোগ করা উচিত যে, শারীরিক কাজ করতে অনীহার পেছনে এই যুক্তিটি দেওয়া হয় যে, কম বেতনের কারণে কায়িক শ্রমিকদের সাংস্কৃতিক স্তর অবশ্যই নিম্ন হতে হবে, এবং এটিই আবার শারীরিক কাজের নিম্ন মর্যাদার একটি কারণ।

এসবের মধ্যে কিছুটা সত্যতা আছে । কিন্তু একই কারণে , আমাদের বিশ্বাস করা উচিত যে ভবিষ্যতে বেতন কাঠামোতে এত বড় বৈষম্য থাকা উচিত নয় । এমন পরিস্থিতিতে নিম্নমানের কাজ করা হবে, একথা বলবেন না । যদি কেবল উচ্চ মজুরির মাধ্যমেই উন্নততর বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ পাওয়া যেত, তবে তা হতো অবক্ষয়ের সবচেয়ে দুঃখজনক প্রকাশ । যদি এমন দৃষ্টিভঙ্গি প্রচলিত থাকত, তবে মানবজাতি তার সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কখনোই অর্জন করতে পারত না । সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার, উদ্ভাবন, সবচেয়ে বৈপ্লবিক বৈজ্ঞানিক কাজ, মানব সংস্কৃতির সবচেয়ে চমৎকার নিদর্শনগুলো কখনোই অর্থের কারণে বা অর্থের বাধ্যবাধকতায় পৃথিবীতে আসেনি । বরং ঠিক তার উল্টো: প্রায়শই এগুলোর উৎস ছিল সম্পদের দ্বারা প্রদত্ত পার্থিব সুখকে প্রত্যাখ্যান করা ।

অর্থ হয়তো এখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে । কিন্তু এমন এক সময় আসবে যখন মানুষ আবারও উচ্চতর দেবতাদের কাছে মাথা নত করবে। বর্তমানে আমাদের যা কিছু আছে, তার বেশিরভাগেরই অস্তিত্ব অর্থ ও সম্পত্তির আকাঙ্ক্ষার কারণেই সম্ভব হয়েছে; কিন্তু এর খুব সামান্য অংশই অনুপস্থিত থাকলে পৃথিবী দরিদ্র হয়ে পড়বে ।

আমাদের আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য হলো এমন এক সময়ের আশা জাগানো, যখন ব্যক্তিরা বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু পাবে এবং অন্যদিকে, মানুষ কেবল জাগতিক সুখের জন্য বাঁচবে না। এই নীতিটি একটি আরও যুক্তিসঙ্গত মজুরি কাঠামোর মাধ্যমে প্রতিফলিত হবে , যা প্রত্যেককে—এমনকি সবচেয়ে সাধারণ কর্মীকেও, যিনি নিষ্ঠার সাথে নিজের কর্তব্য পালন করেন— ব্যক্তি ও নাগরিক হিসেবে একটি মর্যাদাপূর্ণ ও শোভন জীবনযাপনের সুযোগ দেবে। আসুন আমরা এই ধারণায় বিশ্বাসী না হই যে, এটি কেবল একটি আদর্শের স্বপ্ন, এই বিশ্ব বাস্তবে এটিকে কখনও সহ্য করবে না এবং এটি অর্জন করা অসম্ভব ।

আমরাও এতটা নির্বোধ নই যে বিশ্বাস করব এমন কোনো সময় আসবে যখন কোনো পাপ থাকবে না। কিন্তু এর জন্য চিহ্নিত ত্রুটিগুলো দূর করা , বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করা এবং আদর্শের জন্য সংগ্রাম করার দায়িত্ব থেকে আমরা মুক্তি পাই না। প্রতিটি ক্ষেত্রেই, যে কঠোর বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয় , তা আমাদের আকাঙ্ক্ষার উপর অনেক সীমাবদ্ধতা আরোপ করে । কিন্তু ঠিক এই কারণেই, মানুষকে অবশ্যই পরম লক্ষ্যের সেবায় অবিরাম চেষ্টা করে যেতে হবে , এবং কোনো বাধাই তাকে তার উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত করতে পারে না ; ঠিক যেমন আমরা আইনি ত্রুটি ঘটে বলে বিচার ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারি না , এবং ঠিক যেমন আমরা চিকিৎসাকে তুচ্ছ করতে পারি না কারণ এর অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও অসুস্থতা সবসময়ই থাকবে ।

আদর্শের শক্তিকে অবমূল্যায়ন করা উচিত নয় । এখানে যদি এমন কেউ থাকেন যারা বর্তমান পরিস্থিতিতে হতাশ বোধ করছেন, এবং যদি তারা সৈনিক হিসেবে কাজ করে থাকেন , তবে আমি তাদের সেই সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যখন তাদের বীরত্বই ছিল আদর্শিক প্রেরণার অন্তর্নিহিত শক্তির সবচেয়ে জোরালো উদাহরণ । দৈনন্দিন আহারের চিন্তা মানুষকে জীবন উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করেনি , বরং দেশের প্রতি ভালোবাসা , এর মহত্ত্বের প্রতি বিশ্বাস এবং জাতীয় সম্মানের অনুভূতিই তা করেছিল।

কেবল তখনই জার্মান জাতি বিপ্লবের বস্তুগত প্রতিশ্রুতি অনুসরণ করতে গিয়ে এই আদর্শগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, কেবল তখনই যখন তারা পিঠে ঝোলা ঝোলা কাঁধে তুলে নেওয়ার জন্য নিজেদের অস্ত্র ত্যাগ করেছিল, কেবল তখনই— পৃথিবীতে স্বর্গে প্রবেশ করার পরিবর্তে —তারা সাধারণ অবজ্ঞা এবং একই সাথে সাধারণ দারিদ্র্যের নরকে নিমজ্জিত হয়েছিল।

অতএব, বস্তুবাদী প্রজাতন্ত্রের হিসাবকারীদের মোকাবিলা করার জন্য আমাদের অবশ্যই বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে আদর্শবাদী রাইখ।

Machine Translated by Google

অধ্যায় ৩

রাষ্ট্রের নাগরিক ও প্রজারা

যে প্রতিষ্ঠানটিকে এখন ভুলবশত রাষ্ট্র বলা হয়, সেটি সাধারণত মানুষকে মাত্র দুটি ভাগে ভাগ করে: নাগরিক এবং প্রবাসী। নাগরিক তারাই, যারা জন্মসূত্রে অথবা স্বাভাবিকীকরণের মাধ্যমে পূর্ণ সামাজিক অধিকার ভোগ করে। প্রবাসী তারাই, যারা কোনো না কোনোভাবে একই অধিকার ভোগ করে।
অন্য একটি অবস্থা। এই দুটি বিভাগের মধ্যে এমন সত্তা রয়েছে যা সাদৃশ্যপূর্ণ
উল্কাপিণ্ড। এরা এমন মানুষ যাদের কোনো রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব নেই এবং সেই কারণে কোথাও তাদের কোনো জনস্বার্থের অধিকারও নেই ।

বর্তমানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে , একজন ব্যক্তি কোনো রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে জন্মগ্রহণ করার মাধ্যমে নাগরিক অধিকার লাভ করেন । তার জাতি বা জাতীয়তা ভিন্ন হতে পারে।
এর কোনো ভূমিকা নেই । কোনো কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তির সন্তান, যিনি একসময় জার্মানির কোনো আশ্রিত রাজ্যে বাস করতেন এবং এখন জার্মানিতে থাকেন, তিনি বিশ্বের চোখে স্বয়ংক্রিয়ভাবে 'জার্মান নাগরিক' হয়ে যান । একইভাবে, যেকোনো ইহুদি, পোল, আফ্রিকান বা এশীয় ব্যক্তির সন্তানও স্বয়ংক্রিয়ভাবে জার্মান নাগরিক হতে পারেন ।

রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে জন্মসূত্রে প্রাপ্ত নাগরিকত্ব ছাড়াও , পরবর্তীতে আরও এক ধরনের নাগরিকত্ব লাভ করা যায় । এই প্রক্রিয়ার জন্য বিভিন্ন পূর্বশর্ত প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, একটি হলো, সম্ভব হলে আবেদনকারীকে চোর বা রাস্তার গুণ্ডা হওয়া চলবে না। তার রাজনৈতিক মতামত যেন উদ্বেগের কারণ না হয়, তা আবশ্যক ; অন্য কথায়, রাজনৈতিক বিষয়ে তাকে একজন নিরীহ নির্বোধ হতে হবে। তিনি যে রাষ্ট্রের নাগরিক হতে চান, সেই রাষ্ট্রের উপর যেন বোঝা না হন , সেটাও আবশ্যক। আমাদের এই বাস্তবসম্মত যুগে, এর অর্থ অবশ্যই আর্থিক বোঝা না হওয়া । যদি আবেদনকারীকে একজন ভালো করদাতা বলে মনে হয় , তবে এটি তাকে আরও দ্রুত নাগরিকত্ব পেতে সাহায্য করার ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

জাতিগত বিষয়টির কোনো ভূমিকা নেই।

নাগরিকত্ব পাওয়ার পুরো প্রক্রিয়াটি , উদাহরণস্বরূপ, একটি অটোমোবাইল ক্লাবে যোগ দেওয়ার থেকে খুব একটা আলাদা নয় । একজন ব্যক্তি একটি আবেদনপত্র জমা দেন। সেটি পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা হয়। এবং একদিন, তিনি একটি কার্ড পান যা তাকে জানায় যে তিনি নাগরিক হয়েছেন।
তথ্যটি হাস্যরসাত্মকভাবে উপস্থাপন করা হয়। পূর্বে জুলু বা কাফির ছিলেন এমন একজন আবেদনকারীকে বলা হয় : "এখন থেকে, আপনি একজন জার্মান নাগরিক।"

রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি এই জাদু করতে পারেন । স্বয়ং ঈশ্বর যা করতে পারেননি, তা কোনো এক সরকারি কর্মকর্তা (থিওপ্রাস্টাস প্যারাসেলসাস১৬) হাতের ইশারায় সম্পন্ন করেন। শুধু কলমের একটি আঁচড়ই যথেষ্ট, এবং একজন মঙ্গোলীয় দাস একজন সত্যিকারের জার্মান হয়ে যায়। নতুন নাগরিকের জাতি সম্পর্কে তো জিজ্ঞাসাই করা হয় না ; এমনকি তার শারীরিক স্বাস্থ্য নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয় না । তার শরীর সিফিলিসে জর্জরিত হতে পারে ; কিন্তু তাকে বর্তমান রাষ্ট্রে স্বাগত জানানো হবে, যদি না সে আর্থিক বোঝা বা রাজনৈতিক হুমকি হয়ে ওঠে।

এইভাবে, বছর পর বছর ধরে, রাষ্ট্র নামক জীবগুলো বিষাক্ত পদার্থ সংগ্রহ করে।
এমন বিষয় যা তারা অতিক্রম করতে পারে না।

একজন নাগরিক এবং একজন বিদেশীর মধ্যে আরেকটি পার্থক্য হলো, নাগরিক সকল সরকারি ভবনে প্রবেশাধিকার পায়, সেনাবাহিনীতে কাজ করতে পারে এবং নির্বাচনে সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয়ভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার রাখে। এগুলোই তার প্রধান সুযোগ-সুবিধা। ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বাধীনতার ক্ষেত্রে, একজন বিদেশী নাগরিকের মতোই সুরক্ষা পায়, এবং প্রায়শই তার চেয়েও ভালো। অন্তত, আমাদের বর্তমান জার্মান প্রজাতন্ত্রে বিষয়টি এমনই ।

আমি পুরোপুরি বুঝতে পারছি যে এই ধরনের কথা কেউ শুনতে পছন্দ করে না । কিন্তু কিছু খুঁজে পাওয়া কঠিন ।
আমাদের আধুনিক নাগরিকত্ব আইনের চেয়েও বেশি অযৌক্তিক বা উদ্ভট ।

Machine Translated by Google

বর্তমানে, একটি রাষ্ট্র এই সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য অন্তত সামান্য প্রচেষ্টা দেখাচ্ছে । তবে এটি জার্মান প্রজাতন্ত্র নয়, বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যেখানে অন্তত আংশিকভাবে সাধারণ জ্ঞান অনুসারে কাজ করার চেষ্টা করা হচ্ছে । অসুস্থ অভিবাসীদের প্রবেশে বাধা দিয়ে এবং নির্দিষ্ট কিছু জাতিগোষ্ঠীকে নাগরিকত্ব লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে , তারা এমন সব নীতি প্রবর্তন করতে শুরু করেছে যা আমরা জাতি-রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করতে চাই।

একটি জাতি-রাষ্ট্র তার জনসংখ্যাকে তিনটি গোষ্ঠীতে শ্রেণীবদ্ধ করবে : নাগরিক, রাষ্ট্রের প্রজা এবং বিদেশী।

নীতিটি হলো এই যে, রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে জন্ম শুধুমাত্র প্রজা হিসেবে মর্যাদা প্রদান করে। এটি রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো পদ ধারণ করার বা এর রাজনৈতিক জীবনে, যেমন ভোটদানে, সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার অধিকার প্রদান করে না। আরেকটি নীতি হলো এই যে, রাষ্ট্রের প্রত্যেক প্রজার জাতি ও জাতীয়তা অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে। একজন প্রজা যেকোনো সময় প্রজা থাকা ত্যাগ করে সেই দেশের নাগরিক হতে পারেন , যে দেশের তিনি জাতীয়তা সূত্রে অন্তর্ভুক্ত। একজন বিদেশী এবং রাষ্ট্রের একজন প্রজার মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হলো এই যে, বিদেশী অন্য একটি দেশের নাগরিক।

জার্মান রাষ্ট্রের প্রজা হিসেবে প্রত্যেক জার্মান নাগরিকের জন্য বাধ্যতামূলক স্কুল শিক্ষা সম্পন্ন করা তার জন্য আবশ্যক । এর মাধ্যমে সে এমন একটি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যায় যা তাকে তার জাতি ও জাতীয় সম্প্রদায়ের একজন সচেতন সদস্য হিসেবে গড়ে তোলে। স্কুল ছাড়ার পর তাকে অবশ্যই রাষ্ট্রের শারীরিক প্রশিক্ষণের শর্তাবলী পূরণ করতে হয় ; অবশেষে, সে সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। সামরিক প্রশিক্ষণ সাধারণ প্রকৃতির। এটি প্রত্যেক জার্মানকে অবশ্যই প্রদান করতে হয় এবং এটি তাকে সামরিক চাকরির জন্য শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতা পূরণে সক্ষম করে তোলে। সামরিক চাকরির মেয়াদ শেষে যার স্বাস্থ্য ও চরিত্র ভালো বলে নির্ধারিত হয়, এমন প্রত্যেক তরুণ-তরুণীকে নাগরিকত্বের অধিকার প্রদান করা হয় । নাগরিকত্ব প্রদানের এই প্রক্রিয়াটি একটি আনুষ্ঠানিক সম্বন্ধে সম্পন্ন হওয়া উচিত । নাগরিকত্ব প্রদানকারী সনদটি তরুণ-তরুণীর সারাজীবন একটি অত্যন্ত মূল্যবান দলিল হিসেবে সংরক্ষণ করা উচিত। এটি তাকে নাগরিকত্বের সমস্ত অধিকার এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সুযোগ-সুবিধার অধিকারী করে তোলে । রাষ্ট্রকে অবশ্যই তাদের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট সীমারেখা টানতে হবে , যারা জাতির সদস্য হিসেবে এর ভিত্তি এবং এর অস্তিত্ব ও মহিমাকে টিকিয়ে রাখে, এবং তাদের থেকে যারা কেবল এই রাষ্ট্রে বাস করে ও এখানেই তাদের জীবিকা নির্বাহ করে ।

নাগরিকত্বের সনদ লাভ করার সময় নবনাগরিককে জাতীয় সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের এক পবিত্র শপথ গ্রহণ করতে হয়। এই সনদটি অবশ্যই এমন একটি বন্ধন হতে হবে যা জাতির সকল শ্রেণী ও অংশকে একত্রিত করে। কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের রাজা হওয়ার চেয়ে, এমনকি একজন রাস্তা ঝাড়ুদার হয়েও, রাইখের নাগরিক হওয়া অধিকতর সম্মানের বিষয় হওয়া উচিত।

একজন নাগরিকের এমন কিছু বিশেষাধিকার রয়েছে যা বিদেশীদের নেই। তিনি রাইখের অধিপতি। কিন্তু এই সম্মানের সাথে কিছু বাধ্যবাধকতাও জড়িত। যারা সম্মান বা চরিত্রহীন, অপরাধী অথবা রাইখের প্রতি বিশ্বাসঘাতক হিসেবে প্রমাণিত হয় , তাদের নাগরিক অধিকার যেকোনো সময় কেড়ে নেওয়া যেতে পারে । এর ফলে তারা রাষ্ট্রের নিছক প্রজায় পরিণত হবে ।

একজন জার্মান মেয়ে রাষ্ট্রের প্রজা , কিন্তু বিয়ের পর সে নাগরিকত্ব লাভ করে । জার্মানির প্রজা হলে , যে নারীরা স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহ করেন , তাদের নাগরিকত্ব অর্জনের অধিকার রয়েছে।

পাদটীকা:

১৬) সর্বশেষ এবং সবচেয়ে বিখ্যাত মধ্যযুগের আলকেমিস্ট। তিনি আনুমানিক ১৪৯০ সালে বাসেলে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৪১ সালে সালজবুর্গে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি শিক্ষা দিতেন যে, সকল ধাতুকে তাদের সকলের মধ্যে সাধারণ একটি আদিম উপাদানের মাধ্যমে রূপান্তরিত করা যেতে পারে । তিনি এই উপাদানটির নাম দেন "আল-কাহেস্ট"। যদি এটি আবিষ্কৃত হতো, তবে এটি হতো পরশপাথর, একটি সর্বজনীন ঔষধ এবং দ্রাবক। তাঁর শিক্ষার অনেক দিক আজ আর ততটা অলৌকিক বলে বিবেচিত হয় না , যতটা সেই সময়ে হতো।

Machine Translated by Google

চতুর্থ অধ্যায়

ব্যক্তিত্ব এবং জাতি-রাষ্ট্রের আদর্শ

যদি জাতীয় সমাজতান্ত্রিক জাতি-রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্য হয় রাষ্ট্রের গঠনকারী উপাদানগুলোর শিক্ষা প্রদান এবং তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা , তবে এই জাতিগত উপাদানগুলোকে সমর্থন করা, শিক্ষিত করা এবং পরিশেষে বাস্তব জীবনের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়াই যথেষ্ট হবে না , বরং রাষ্ট্রকে এই কাজের চাহিদা মেটাতে তার সংগঠনকেও খাপ খাইয়ে নিতে হবে।

সকল মানুষ সমান—এই মার্ক্সবাদী নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে , অথচ নিজেদের নীতিকে তার চূড়ান্ত পরিণতিতে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত না নিয়ে, একজন মানুষের মূল্য তার জাতি দিয়ে বিচার করাটা হবে এক অযৌক্তিক কাজ। যদি আমরা রক্তের গুরুত্ব স্বীকার করি, অর্থাৎ, যদি আমরা জাতিকেই সেই মৌলিক উপাদান হিসেবে স্বীকার করি যার উপর সকল জীবন নির্ভর করে , তবে আমাদের অবশ্যই এই নীতির যৌক্তিক পরিণতি ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করতে হবে। সাধারণভাবে, জাতিসমূহের মূল্য অবশ্যই সেই বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর নিরিখে বিচার করতে হবে যেখান থেকে তাদের উদ্ভব হয়েছে, এবং একটি জাতির মধ্যে থাকা ব্যক্তির মূল্যকেও পৃথকভাবে চিহ্নিত করতে হবে। এক মানুষ আরেকজনের সমান নয়— এই নীতিটি একটি জাতীয় সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র সদস্যদের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ, কোনো মস্তিষ্কই অন্যটির সমান নয়; কারণ একই রক্তের অন্তর্ভুক্ত উপাদানগুলো হাজারো সূক্ষ্ম বিষয়ে ভিন্ন হয় , যদিও তাদের মৌলিক গঠন একই ।

একই গুণমান।

এই ঘটনার প্রথম পরিণতিটি তুলনামূলকভাবে সহজ। তা হলো, একটি জাতীয় সম্প্রদায়ের যে উপাদানগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম জাতিগত গুণাবলী রয়েছে , তাদের বংশবৃদ্ধির জন্য অন্যদের চেয়ে বেশি উৎসাহিত করা উচিত ।

এই কাজটি তুলনামূলকভাবে সহজ, কারণ এটিকে প্রায় যান্ত্রিকভাবেই চিহ্নিত ও সম্পাদন করা যায়। অসংখ্য মানুষের মধ্য থেকে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলীসম্পন্ন ব্যক্তিদের নির্বাচন করা এবং তাঁদের এমন একটি কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ করে দেওয়া অনেক বেশি কঠিন, যা কেবল তাঁদের অসাধারণ প্রতিভার সঙ্গেই সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না, বরং যেখানে তাঁদের কর্মের মূল উদ্দেশ্য হবে জাতির কল্যাণ সাধন করা। যোগ্যতা ও কার্যকারিতার ভিত্তিতে এই নির্বাচন যান্ত্রিকভাবে করা যায় না । এই কাজটি কেবল দৈনন্দিন জীবনে নিরন্তর সংগ্রামের মাধ্যমেই সম্পন্ন করা সম্ভব ।

যে বিশ্বদৃষ্টি সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের গণতান্ত্রিক নীতিকে প্রত্যাখ্যান করে এবং এই বিশ্বকে মানবজাতির শ্রেষ্ঠদের হাতে তুলে দেওয়ার লক্ষ্য রাখে , তাকে অবশ্যই একই অভিজাততন্ত্র প্রয়োগ করতে হবে ।
জাতীয় সম্প্রদায় গঠনকারী ব্যক্তিদের জন্য একটি নীতি । এটি অবশ্যই নিশ্চিত করবে যে নেতা এবং সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা সেই সম্প্রদায়ের সেরা সদস্য হবেন। সুতরাং , এটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ধারণার উপর ভিত্তি করে নয় , বরং ব্যক্তিত্বের উপর ভিত্তি করে গঠিত।

যে কেউ যদি বিশ্বাস করে যে, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কেবল যান্ত্রিকভাবে— তার অর্থনৈতিক জীবনের উন্নততর কাঠামোর মাধ্যমে, অর্থাৎ দারিদ্র্য ও সম্পদের মধ্যে উন্নততর ভারসাম্যের মাধ্যমে , অথবা অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ব্যাপক জনগণের হাতে তুলে দেওয়ার মাধ্যমে , অথবা ন্যায্য মজুরির মাধ্যমে , কিংবা বেতন কাঠামোর বিশাল বৈষম্য দূর করার মাধ্যমে — অন্যদের থেকে নিজেকে আলাদা করবে, তবে সে আমাদের আন্দোলনের কেবল বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলোই বোঝে এবং আমরা যখন আমাদের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির কথা বলি, তখন তার অর্থ কী, সে সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই। পূর্বোক্ত সমস্ত বৈশিষ্ট্য আমাদের ধারাবাহিক অস্তিত্বের নিশ্চয়তা দিতে পারে না এবং এগুলো অবশ্যই মহত্ত্বের শর্ত নয় । যে জাতি বাহ্যিক সংস্কার নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারে , বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যকার সাধারণ জীবন - মরণের সংগ্রামে তার কোনো সুযোগই থাকে না। যে আন্দোলন তার লক্ষ্যকে কেবল নিশ্চিতভাবে সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত বিধি-বিধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে , তা বিদ্যমান ব্যবস্থার কোনো সুদূরপ্রসারী বা গভীর সংস্কার সাধন করতে পারবে না । এই পদক্ষেপগুলোর সম্পূর্ণ প্রভাব বাহ্যিক বিষয়েই সীমাবদ্ধ থাকবে । এগুলো জাতিকে সেই নৈতিক অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করবে না , যা তাকে আজকের এই দুর্বলতাগুলো কার্যকরভাবে কাটিয়ে উঠতে সক্ষম করবে।

Machine Translated by Google

এই দৃষ্টিভঙ্গিটি স্পষ্ট করার জন্য , প্রকৃত উৎসগুলো পুনরায় খতিয়ে দেখা প্রয়োজন এবং
মানবজাতির সাংস্কৃতিক বিবর্তনের কারণসমূহ।

যে প্রথম পদক্ষেপটি দৃশ্যত মানবজাতিকে পশুদের থেকে পৃথক করেছিল , সেটিই প্রথম আবিষ্কারের দিকে পরিচালিত করে। এই আবিষ্কারের উৎস নিহিত রয়েছে সেইসব ছলনা ও কৌশলের মধ্যে, যা মানুষ অন্যান্য প্রাণীর বিরুদ্ধে টিকে থাকার সংগ্রামে নিজেদের সাহায্য করার জন্য ব্যবহার করত এবং যা প্রায়শই সেই সংগ্রামে সাফল্য অর্জনের জন্য তাদের একমাত্র উপায় হয়ে উঠত । এই প্রথম, অত্যন্ত আদিম আবিষ্কারগুলোকে কোনো একক ব্যক্তির কৃতিত্ব হিসেবে গণ্য করা যায় না ; পরবর্তী কোনো পর্যবেক্ষক, ধরা যাক কোনো আধুনিক পর্যবেক্ষক, এগুলোকে একটি সম্মিলিত ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করেন।

প্রাণীদের মধ্যে কিছু নির্দিষ্ট কৌশল ও কার্যকর পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায় যা বেশ চমকপ্রদ।
পর্যবেক্ষকের চোখে এগুলো সর্বত্র দৃশ্যমান প্রতিষ্ঠিত সত্য ; মানুষ আর এদের মূল কারণ আবিষ্কার বা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম নয় এবং এই ধরনের ঘটনাকে 'প্রবৃত্তিগত' বলেই সন্তুষ্ট থাকে।

আমাদের ক্ষেত্রে এই পরিভাষাটির কোনো অর্থ নেই। কারণ, জীবজগতের উচ্চতর বিবর্তনে বিশ্বাসী যে কোনো ব্যক্তিকেই স্বীকার করতে হবে যে, বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা এবং টিকে থাকার সংগ্রামের প্রতিটি প্রকাশেরই একটি নির্দিষ্ট সূচনা অবশ্যই আছে , ঠিক সেই সময়ে যখন প্রদত্ত ঘটনাটির আবির্ভাব ঘটেছিল।
প্রথমবারের মতো। তারপর এটি বারবার পুনরাবৃত্তি হতে থাকল; এটি আরও বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল যতক্ষণ না
অবশেষে , এটি প্রজাতির প্রতিটি সদস্যের অবচেতন মনে প্রবেশ করে, যেখানে এটি 'প্রবৃত্তি' হিসেবে প্রকাশিত হয়। মানুষের ক্ষেত্রে এটি বোঝা এবং

বিশ্বাস করা সহজ। অন্যান্য প্রাণীদের সাথে লড়াই করার ক্ষেত্রে তার প্রথম দক্ষ কৌশলগুলো নিঃসন্দেহে বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন প্রাণীদের নির্দেশ দেওয়ার মাধ্যমেই উদ্ভূত হয়েছিল ।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সেই সময়ে সকল সিদ্ধান্ত ও সাফল্যের ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বই ছিল একমাত্র নিয়ামক , যা পরবর্তীকালে সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করেছিল। এর একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় মৌলিক সামরিক নীতিগুলোর মধ্যে, যা এখন সকল যুদ্ধ কৌশলের ভিত্তি হয়ে উঠেছে। এগুলোর উদ্ভব হয়েছিল প্রাথমিকভাবে কোনো এক ব্যক্তির মস্তিষ্কে, এবং বহু বছর, এমনকি হয়তো হাজার হাজার বছর ধরে , সেগুলো সর্বজনস্বীকৃত হয়ে সার্বজনীন বৈধতা লাভ করে।

মানুষ দ্বিতীয় একটি আবিষ্কারের মাধ্যমে তার প্রথম আবিষ্কারটি সম্পন্ন করেছিল । অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে , সে অন্য জীবকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখেছিল , যাতে তারা তার অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে সহায়ক হয় । আর এভাবেই মানবজাতির প্রকৃত সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের সূচনা হয়েছিল, যা আমরা এখন আমাদের চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। এই উদ্ভাবনগুলো, যা শুরু হয়েছিল অস্ত্র হিসেবে পাথরের ব্যবহার দিয়ে , এরপর পশুপালন, কৃত্রিম উপায়ে আগুন উৎপাদন এবং অবশেষে অলৌকিক আবিষ্কারগুলোর মধ্য দিয়ে এগিয়েছে।

আমাদের সময়ের আবিষ্কারগুলো স্পষ্টভাবে দেখায় যে প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যক্তিই ছিলেন স্রষ্টা । আমরা আমাদের সময়ের যত কাছাকাছি আসি এবং আবিষ্কারগুলো যত বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও বৈপ্লবিক হয়ে ওঠে , ততই আমরা এই উক্তির সত্যতা স্পষ্টভাবে দেখতে পাই । আমাদের চারপাশে আমরা যে সমস্ত আবিষ্কার দেখি, তার সবই ব্যক্তির সৃজনশীল শক্তি ও সামর্থ্য দ্বারা সৃষ্ট । আর এই সমস্ত ব্যক্তিরাই মানুষকে পশু জগৎ থেকে আরও উচ্চতর স্তরে উঠতে এবং এই জগৎ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করতে সাহায্য করে । অতএব , তারা মানবতার স্তরকে উন্নত করতে এবং ক্রমাগত অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে ভূমিকা রাখে । আদিম অরণ্যে শিকার করার সময় অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে সবচেয়ে আদিম কৌশলটি মানুষকে যে সাহায্য করেছিল , আজ সেই একই সাহায্য প্রদান করে ব্যক্তিরা।

অলৌকিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যা তাকে জীবনের জন্য লড়াই করতে এবং ভবিষ্যতের যুদ্ধের জন্য অস্ত্র তৈরি করতে সাহায্য করে।
পরিশেষে, সমস্ত মানবিক চিন্তা ও আবিষ্কার এই গ্রহে মানবতাকে তার অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে সাহায্য করে, যদিও তার তথাকথিত ব্যবহারিক উপযোগিতা রয়েছে।
কোনো আবিষ্কার, উদ্ভাবন বা গভীর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের তাৎপর্য প্রথম দর্শনে স্পষ্ট নাও হতে পারে । সবকিছুই মানুষকে তার চারপাশের অন্যান্য সকল প্রাণীর স্তর থেকে আরও উচ্চতর স্তরে উন্নীত করতে অবদান রাখে, যার ফলে তার অবস্থান আরও শক্তিশালী ও স্থায়ী হয় ; এভাবেই পৃথিবীতে শাসক হিসেবে সে সর্বদিকে আরও বেশি করে বিকশিত হয় ।

সুতরাং , সকল আবিষ্কারই ব্যক্তির সৃজনশীল ক্ষমতার ফল । এবং এই সকল ব্যক্তি, তাঁরা পছন্দ করুন বা না করুন, ক্ষুদ্রে -বড় নির্বিশেষে মানবজাতির হিতৈষী ।

Machine Translated by Google

তাদের কাজের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ ও কোটি কোটি মানুষকে তাদের সংগ্রাম সহজ করার উপকরণ দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে। বেঁচে থাকার জন্য।

সুতরাং, আজকের এই সমৃদ্ধ বস্তুগত সভ্যতার উৎসে আমরা সর্বদা স্বতন্ত্র ব্যক্তিদেরই দেখতে পাই। তারা একে অপরের পরিপূরক, এবং প্রত্যেকেই অন্যের কাজের উপর ভিত্তি করে নিজের কাজ গড়ে তোলে। এই আবিষ্কার ও উদ্ভাবনগুলোর বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। উৎপাদনের সমস্ত পদ্ধতিই উদ্ভাবন এবং সেই কারণে তা ব্যক্তির সৃজনশীল ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল । এমনকি বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক কাজ, যা নির্ভুলভাবে পরিমাপ করা যায় না এবং যা পরবর্তী সমস্ত প্রযুক্তিগত আবিষ্কারের পূর্ববর্তী, তাও একটিমাত্র মস্তিষ্কের একচেটিয়া সৃষ্টি। জনসাধারণ উদ্ভাবন করে না, সংখ্যাগরিষ্ঠরা সংগঠিত হয় না বা চিন্তা করে না; এই কাজগুলো সর্বদা ব্যক্তিই করে থাকে।

তদনুসারে, একটি মানব সমাজ তখনই সুসংগঠিত হয়, যখন তা ব্যক্তির সৃজনশীল ক্ষমতাকে সর্বোত্তমভাবে সমর্থন করে এবং তার শ্রমকে সমাজের কল্যাণে ব্যবহার করে। বস্তুগত বাস্তবতার জগতেই হোক বা বিমূর্ত ধারণার জগতেই হোক, কোনো আবিষ্কারের সবচেয়ে মূল্যবান উপাদান হলো স্বয়ং আবিষ্কারকের ব্যক্তিত্ব । একটি সংগঠিত জাতীয় সমাজের প্রথম এবং মৌলিক কর্তব্য হলো উদ্ভাবককে এমন স্থানে স্থাপন করা, যেখানে তিনি সকলের সর্বোত্তম সেবা করতে পারেন । প্রকৃতপক্ষে, সংগঠনের মূল উদ্দেশ্যই হলো এই নীতিকে বাস্তবে প্রয়োগ করা । কেবল এইভাবেই যান্ত্রিকতার অভিশাপ এড়ানো যায় এবং জীবন্ত সত্তা হিসেবে টিকে থাকা সম্ভব। চিন্তাশীল মানুষদের ভিড়ের ঊর্ধ্বে তুলে ধরা এবং ভিড়কে তাদের অধীনস্থ করার প্রচেষ্টা সংগঠনের মধ্যে মূর্ত হতে হবে ।

সুতরাং , কোনো প্রতিষ্ঠানের এই মানুষদের ভিড়ের ঊর্ধ্বে উঠতে বাধা দেওয়ার কোনো অধিকার নেই , বরং এর বিপরীতে , এই উত্থানকে যথাসম্ভব সক্ষম ও সহজতর করার জন্য তার ক্ষমতা ব্যবহার করা উচিত। এই নীতি দিয়ে শুরু করতে হবে যে, মানবজাতির জন্য আশীর্বাদ কখনো সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আসে না , বরং আসে সৃজনশীল ব্যক্তিদের মস্তিষ্ক থেকে, এবং তারাই মানবজাতির প্রকৃত হিতৈষী । সৃজনশীল মনকে নির্ণায়ক প্রভাব দেওয়া এবং তাদের কাজকে সহজতর করা সকলের স্বার্থেই । ভিড়কে শাসন করতে দিলে এই সাধারণ স্বার্থ কোনোভাবেই পূরণ হয় না , কারণ তারা চিন্তা করতে অক্ষম , অকার্যকর এবং কোনোভাবেই প্রতিভাবান বলা যায় না । কেবলমাত্র যাদের সহজাত নেতৃত্বের ক্ষমতা আছে, তাদেরই শাসন করা উচিত ।

যেমনটা আমি আগেই বলেছি, এই ধরনের মানুষ প্রাথমিকভাবে টিকে থাকার এক কঠিন সংগ্রামের মাধ্যমেই নির্বাচিত হন । এই সংগ্রামে অনেকেই ঝরে পড়েন এবং এভাবেই প্রমাণ করেন যে সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য ভাগ্য তাদের ডাকেনি ; এবং খুব অল্প কয়েকজনই টিকে থাকেন যাদের নির্বাচিত বলে গণ্য করা যায় । চিন্তা ও শৈল্পিক সৃষ্টির ক্ষেত্রে , এমনকি অর্থনীতির জগতেও একই নির্বাচন প্রক্রিয়া ঘটে , কিন্তু—বিশেষ করে অর্থনীতির ক্ষেত্রে—এর প্রভাব অত্যন্ত সীমিত। রাষ্ট্রের প্রশাসন এবং দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংগঠিতকারী মন্ত্রণালয়ও একই নির্বাচন নীতি দ্বারা পরিচালিত হয় । সর্বত্রই ব্যক্তিত্বের ধারণা , অধস্তনদের উপর ব্যক্তির কর্তৃত্ব এবং ঊর্ধ্বতনদের প্রতি ব্যক্তির দায়িত্ববোধ বিরাজ করে । শুধুমাত্র রাজনৈতিক জীবনেই এই অতি স্বাভাবিক নীতিটি সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হয়েছে। যদিও

সমগ্র মানব সভ্যতা কেবলমাত্র ব্যক্তির সৃজনশীল ক্ষমতা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে ; ' সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে জনসমষ্টিই গুরুত্বপূর্ণ' — এই নীতিটি বিশেষত জাতীয় প্রশাসনের উচ্চ স্তরেই প্রকাশ পায়; এবং এখান থেকেই বিষ ধীরে ধীরে জাতীয় জীবনের সকল শাখায় ছড়িয়ে পড়ে প্রকৃত বিচ্ছিন্নতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জাতীয় সত্তার বিভিন্ন অংশে ইহুদিবাদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের কারণ হিসেবে তাদের আশ্রয়দাতা জাতিগুলোর মধ্যে ব্যক্তিত্বের গুরুত্বকে খর্ব করার এবং তার জায়গায় গণমানুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার নিরন্তর প্রচেষ্টাকে দায়ী করা যেতে পারে । এভাবেই আর্যদের গঠনমূলক নীতি ইহুদিদের ধ্বংসাত্মক নীতি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় । তারা বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের মধ্যে 'ক্ষয়ের কারণ' এবং বৃহত্তর অর্থে, মানব সভ্যতার ধ্বংসকারী হয়ে ওঠে ।

মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের প্রভাবশালী ভূমিকা নির্মূল করে তার পরিবর্তে গণমানুষের সংখ্যাগত শক্তি প্রতিষ্ঠার ইহুদি প্রচেষ্টার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো মার্কসবাদ। রাজনীতিতে, সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা এই প্রচেষ্টারই একটি বহিঃপ্রকাশ।

আমরা এর ভয়াবহ পরিণতি সর্বত্র দেখতে পাচ্ছি ; ক্ষুদ্রতম প্যারিশ পরিষদ থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ পর্যন্ত।

Machine Translated by Google

জাতির শাসকগোষ্ঠী। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা এমন ট্রেড ইউনিয়ন দেখতে পাই, যা শ্রমিকদের প্রকৃত স্বার্থ নয় , বরং আন্তর্জাতিক ইহুদিবাদের ধ্বংসাত্মক লক্ষ্য পূরণ করে। জাতির অর্থনৈতিক জীবন থেকে ব্যক্তিত্বের নীতি যতখানি বাদ পড়ে এবং তার পরিবর্তে গণমানুষের কার্যকলাপ দ্বারা প্রভাবিত হয়, ঠিক ততখানিই জাতীয় অর্থনীতি—যার সমগ্র সম্প্রদায়ের সেবা করা উচিত— তার সৃজনশীল ক্ষমতায় ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। কারখানা কমিটিগুলো, যারা শ্রমিকদের স্বার্থের যত্ন নেওয়ার পরিবর্তে উৎপাদন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে চায় , তারাও একই ধ্বংসাত্মক উদ্দেশ্য সাধন করে। তারা উৎপাদনের সামগ্রিক ব্যবস্থার ক্ষতি করে এবং ফলস্বরূপ শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিরও ক্ষতিসাধন করে। দীর্ঘমেয়াদে , শুধুমাত্র মহৎ তত্ত্বের মাধ্যমে গণমানুষের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়। এই চাহিদাগুলো কেবল দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মেটানো পণ্য সরবরাহের মাধ্যমেই পূরণ করা যেতে পারে এবং এর দ্বারা এই বিশ্বাস তৈরি করা সম্ভব যে , জাতীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে উৎপাদনশীল সহযোগিতার মাধ্যমে ব্যক্তির স্বার্থ পূরণ হচ্ছে।

এমনকি যদি মার্ক্সবাদ তার গণতন্ত্রের ভিত্তিতে বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে গ্রহণ ও বিকশিত করতে সক্ষমও হতো, তাতেও কোনো অর্থ থাকত না। মার্ক্সবাদী মতবাদ সঠিক কি না, সেই প্রশ্নের নিষ্পত্তি এমন কোনো পরীক্ষার মাধ্যমে করা যায় না যা দেখাবে যে এটি ভবিষ্যতে আজকের বিদ্যমান ব্যবস্থাকে পরিচালনা করতে পারবে কি না; বরং এর নিষ্পত্তি কেবল এই প্রশ্নের মাধ্যমেই করা যায় যে, তার নিজস্ব নীতি অনুসারে, বর্তমান বিদ্যমান ব্যবস্থার সমতুল্য একটি সভ্যতা গড়ে তোলার সৃজনশীল ক্ষমতা তার আছে কি না। এমনকি যদি মার্ক্সবাদ বর্তমান অর্থনৈতিক জীবনকে গ্রহণ করে মার্ক্সবাদী নির্দেশনায় তা চালু রাখতে হাজার গুণ বেশি সক্ষমও হতো, এমন সাফল্য কিছুই প্রমাণ করে না; কারণ, তার নীতি অনুসারে, মার্ক্সবাদ কখনোই এমন কিছু সৃষ্টি করতে পারবে না যা আজকের বিদ্যমান ব্যবস্থার স্থান নিতে পারে।

মার্ক্সবাদ নিজেই প্রমাণ করেছিল যে এটি তা করতে অক্ষম। এটি কেবল কোথাও নিজস্ব সাংস্কৃতিক বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তৈরি করতে অক্ষম ছিল তাই নয় ; বরং হাতের কাছে তৈরি অবস্থায় পাওয়া সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেও নিজের নীতি অনুসারে বিকশিত করতে পারেনি। একে আপোস করতে হয়েছিল , কোনো না কোনোভাবে ব্যক্তিত্বের নীতিতে ফিরে যেতে হয়েছিল , কারণ নিজের সংগঠনে এই নীতি ছাড়া এর কোনো অস্তিত্ব ছিল না।

জাতিগত বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি মার্ক্সবাদী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন , কারণ এটি জাতির গুরুত্ব এবং সেই সূত্রে ব্যক্তির মূল্যকে স্বীকার করে এবং তাদেরকে এর কাঠামোর স্তম্ভ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। এই বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গিতে এগুলোই সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ উপাদান।

যদি জাতীয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন এই মূল নীতির মৌলিক তাৎপর্য অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়, যদি এটি কেবল বর্তমান রাষ্ট্রকে বাহ্যিকভাবে প্রকাশ করে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতার নীতি গ্রহণ করে , তবে এটি মার্ক্সবাদের নিজস্ব ময়দানে তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ছাড়া আর কিছুই করবে না। এই কারণে, নিজেকে একটি বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি বলার কোনো অধিকার তার থাকবে না। যদি এই আন্দোলনের সামাজিক কর্মসূচিতে ব্যক্তিত্বের বিলোপ এবং তার পরিবর্তে জনতাকে প্রতিষ্ঠা করা অন্তর্ভুক্ত থাকে, তবে জাতীয় সমাজতন্ত্র মার্ক্সবাদের বিষে কলুষিত হবে , ঠিক যেমন আমাদের জাতীয় বুর্জোয়া দলগুলো হয়েছে।

জাতি-রাষ্ট্রকে অবশ্যই সর্বাবস্থায় ব্যক্তির মূল্যের গুরুত্ব স্বীকার করার মাধ্যমে এবং অর্থনৈতিক জীবনের সকল শাখায় সর্বোচ্চ উৎপাদনশীল দক্ষতার পথ প্রস্তুত করার মাধ্যমে তার নাগরিকদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে হবে, যার ফলস্বরূপ মোট উৎপাদনে ব্যক্তির জন্য সর্ববৃহৎ সম্ভাব্য অংশ সুরক্ষিত হবে।

সুতরাং, জাতি-রাষ্ট্রকে অবশ্যই নির্মমভাবে এই নীতিটি অপসারণ করতে হবে।
সংসদীয় ব্যবস্থা অনুযায়ী , সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা জনগণের হাতে থাকে। এর পরিবর্তে ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ পুনরুদ্ধার করা প্রয়োজন।

এর থেকে নিম্নলিখিত উপসংহারগুলি উদ্ভূত হয় : সর্বোত্তম সংবিধান
এবং সর্বোত্তম শাসনব্যবস্থা হলো সেটি, যা সমাজে শ্রেষ্ঠ মেধাবীদের প্রভাবশালী ও গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হওয়াকে স্বাভাবিক বলে বিবেচনা করে।

ঠিক যেমন অর্থনীতির ক্ষেত্রে অসাধারণ প্রতিভাধর কোনো ব্যক্তিকে উপর থেকে বেছে নেওয়া যায় না, বরং তাঁকে নিজের প্রচেষ্টার মাধ্যমেই নিজেকে প্রমাণ করতে হয় , ঠিক যেমন শিক্ষার এক অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া ক্ষুদ্রতম দোকান থেকে বৃহত্তর উদ্যোগে নিয়ে যায়, এবং ঠিক যেমন

Machine Translated by Google

জীবন নিজেই একটি বিদ্যালয় যা শিক্ষা দেয়, তাই রাজনৈতিক অঙ্গনে হঠাৎ করে রাজনৈতিক প্রতিভা 'আবিষ্কার' করা যায় না। প্রতিভাকে অন্য মানুষের মতো একই মানদণ্ডে বিচার করা যায় না।

সংগঠনে রাষ্ট্রকে অবশ্যই ব্যক্তিত্বের নীতি অনুসারে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দেশের ক্ষুদ্রতম কোষাগার থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ সরকার পর্যন্ত।

সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নয়, বরং শুধুমাত্র দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের দ্বারাই গৃহীত হয়। এবং 'পরিষদ' শব্দটি তার মূল অর্থে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। দায়িত্বশীল পদে থাকা প্রত্যেক ব্যক্তির পাশে উপদেষ্টা থাকেন, কিন্তু সিদ্ধান্তটি এককভাবে সেই ব্যক্তিই গ্রহণ করেন।

যে নীতি প্রুশীয় সেনাবাহিনীকে জার্মান জাতির এক প্রশংসনীয় হাতিয়ারে পরিণত করেছিল, সেই নীতিই আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি হতে হবে; অর্থাৎ, প্রত্যেক নেতার তার অধস্তনদের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকবে এবং তিনি তার ঊর্ধ্বতনদের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন।

তবুও, আমরা এখন যাকে সংসদ বলি, তা ছাড়া চলতে পারব না। কিন্তু এটি একটি সত্যিকারের পরিষদ হবে, এই অর্থে যে এটি পরামর্শ দেবে। দায়িত্ব একজন ব্যক্তির উপরই বর্তাতে পারে এবং অবশ্যই বর্তাবে, যাঁকে কর্তৃত্ব ও আদেশ দেওয়ার অধিকার দেওয়া হবে।

সংসদ হিসেবে এর প্রয়োজন রয়েছে, কারণ একমাত্র এটিই নেতাদেরকে পর্যায়ক্রমে এমন ব্যক্তিদের নিয়োগ করার সুযোগ করে দেয়, যাঁদেরকে পরবর্তীতে দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করা হবে।

ভবিষ্যৎ সংগঠনের রূপরেখা নিচে উপস্থাপন করা হলো: নগর প্রশাসন থেকে শুরু করে রাইখ সরকার পর্যন্ত, এই জাতি-রাষ্ট্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কোনো প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা থাকবে না। এখানে কেবল উপদেষ্টা পরিষদ থাকবে, যারা নির্বাচিত নেতাকে সহায়তা করবে এবং নেতা তাদের বিভিন্ন দায়িত্ব অর্পণ করবেন। নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে, প্রয়োজনে, তারা যেকোনো বৃহত্তর কর্পোরেশনের নেতা বা সভাপতির পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবে।

নীতিগতভাবে, রাষ্ট্রকে অবশ্যই কিছু নির্দিষ্ট রাজনৈতিক সমস্যা—যেমন অর্থনীতি—সম্পর্কে এমন ব্যক্তিদের পরামর্শ গ্রহণ নিষিদ্ধ করতে হবে, যারা এই বিষয়গুলিতে বিশেষ প্রশিক্ষণ ও বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাবে সম্পূর্ণ অযোগ্য। ফলস্বরূপ, রাষ্ট্রকে তার প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থাগুলিকে একটি রাজনৈতিক কক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট পেশা ও ব্যবসার প্রতিনিধিত্বকারী একটি প্রাতিষ্ঠানিক কক্ষে বিভক্ত করতে হবে।

এই দুটি সংস্থার মধ্যে কার্যকর সহযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য, এদের উপরে একটি বিশেষ সিনেট স্থাপন করা হবে। কক্ষ বা সিনেটে কোনো ভোট গ্রহণ করা হবে না। এগুলো হবে কাজের জন্য তৈরি সংস্থা, ভোটযন্ত্র নয়। স্বতন্ত্র সদস্যদের পরামর্শমূলক ভোট দেওয়ার অধিকার থাকবে, কিন্তু তাদের কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকবে না। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা শুধুমাত্র সভাপতির হাতে থাকবে, যিনি আলোচ্য বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন।

নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও নিরঙ্কুশ দায়িত্বের সমন্বয়ের নীতি ক্রমান্বয়ে একদল নির্বাচিত নেতার উত্থান ঘটাবে; যা আমাদের বর্তমান দায়িত্বজ্ঞানহীন সংসদীয় যুগে সম্পূর্ণ অকল্পনীয়।

এইভাবে জাতির রাজনৈতিক কাঠামো সেই আইনগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে যে জাতি তার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মহত্ত্বের জন্য ঋণী।

* * *

বাস্তবে এই নীতিগুলো বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে, সংসদীয় গণতন্ত্রের নীতি, যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তা সবসময় বিশ্বকে শাসন করেনি। বরং, তা ইতিহাসের কেবল স্বল্পস্থায়ী কিছু সময়েই প্রচলিত ছিল এবং সেই সময়গুলো সবসময়ই জাতি ও রাষ্ট্রগুলোর পতনের সময় ছিল।

Machine Translated by Google

তবে, এমনটা ভাবা উচিত নয় যে, এমন একটি আমূল পরিবর্তন শুধুমাত্র তাত্ত্বিক উপায়ে এবং উপর থেকে চাপিয়ে দিয়ে অর্জন করা সম্ভব ; আমি যে পরিবর্তনের কথা বলছি তা কেবল রাষ্ট্রের সংবিধান সংশোধনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না , বরং তা আইন প্রণয়ন এবং নাগরিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করবে । এই ধরনের বিপ্লব কেবল এমন একটি আন্দোলনের মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হতে পারে যা এই নীতি অনুসারে সংগঠিত এবং যার মধ্যে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের বীজ নিহিত রয়েছে ।

অতএব, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে অবশ্যই এই নীতিমালাগুলোর সাথে সম্পূর্ণরূপে পরিচিত হতে হবে এবং সেগুলোকে তার নিজস্ব সংগঠনে প্রয়োগ করতে হবে, যাতে তা কেবল ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের জন্য পথপ্রদর্শক হিসেবেই কাজ না করে , বরং পরবর্তীতে তার নিজস্ব সংগঠনই রাষ্ট্রের স্থানে অধিষ্ঠিত হতে পারে।

Machine Translated by Google

অধ্যায় ৫

বিশ্বদৃষ্টি এবং সংগঠন

আমি যে জাতি-রাষ্ট্রের রূপরেখা দেওয়ার চেষ্টা করেছি, তা কেবল এর অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তগুলো জানলেই বাস্তবে পরিণত হবে না। এই ধরনের একটি রাষ্ট্র কোন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবে, তা জানাই যথেষ্ট নয়। এর উদ্ভবের সমস্যাটি আরও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এটা আশা করা যায় না যে, বর্তমানে বিদ্যমান এবং বর্তমান রাষ্ট্র থেকে লাভবান হওয়া পক্ষগুলো শাসনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন আনবে অথবা তারা স্বেচ্ছায় তাদের মনোভাব পরিবর্তন করবে। এটা আরও বেশি অসম্ভব , কারণ রাষ্ট্র পরিচালনার ভার ইহুদিদের হাতে এবং ইহুদিরা সর্বত্র বিরাজমান। যদি আমরা বর্তমান এই বিকাশকে বিনা বাধায় চলতে দিই, তবে তা সেই ইহুদি ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতা ঘটাবে যে একদিন ইহুদিরা গ্রাস করে নেবে।

অন্যান্য জাতিসমূহ এবং তারা পৃথিবীর শাসক হয়ে উঠবে।

লক্ষ লক্ষ 'বুর্জোয়া' ও 'সর্বহারা' জার্মানদের মতো নয় , যারা মূলত ভীরুতা, অলসতা এবং মূর্খতার কারণে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে, ইহুদিরা অবিচলভাবে তাদের লক্ষ্য অনুসরণ করে এবং সর্বদা তাদের ভবিষ্যৎ লক্ষ্যকে মাথায় রাখে। তারা যে দলেরই নেতৃত্ব দিক না কেন , কেবল নিজেদের স্বার্থের জন্যই লড়াই করতে পারে , এবং তাদের স্বার্থের সাথে আর্য জাতিগুলোর স্বার্থের নিশ্চিতভাবেই কোনো সম্পর্ক নেই।

যদি আমরা জাতিরাষ্ট্রের আমাদের আদর্শ রূপকে বাস্তবায়িত করতে চাই , তবে আমাদের অবশ্যই সেই শক্তিগুলো থেকে স্বাধীন হতে হবে যারা এখন জনজীবন নিয়ন্ত্রণ করে এবং এমন নতুন শক্তির সন্ধান করতে হবে যা ...
এই আদর্শের জন্য লড়াই করতে প্রস্তুত ও সক্ষম। এমন এক লড়াই যা আসতেই হবে, কারণ এর মূল লক্ষ্য কোনো জাতি-রাষ্ট্র গঠন করা হবে না , বরং বর্তমানে বিদ্যমান ইহুদি রাষ্ট্রকে ধ্বংস করা। ইতিহাসে যেমনটা প্রায়শই ঘটে, সবচেয়ে কঠিন কাজ হলো নতুন কোনো ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা নয়, বরং তার ভিত্তি স্থাপনের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। কুসংস্কার ও স্বার্থপরতা একত্রিত হয়ে নতুন এই ধারণার বিরুদ্ধে একটি সাধারণ জোট গঠন করে এবং সর্বতোভাবে এর বিজয়কে ঠেকানোর চেষ্টা করে, কারণ এটি তাদের কাছে অগ্রহণযোগ্য অথবা তাদের অস্তিত্বের জন্যই হুমকিস্বরূপ।

সুতরাং, নতুন কোনো ধারণার প্রবক্তা গঠনমূলকভাবে কাজ করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, দুর্ভাগ্যবশত বিদ্যমান ব্যবস্থাকে উৎখাত করার জন্য প্রথমে একটি ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ করতে বাধ্য হন।

যে মতবাদের মূলনীতিগুলো আমূল নতুন এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাকে অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে
কঠোর সমালোচনাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়, যদিও অনেক সমর্থক এর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করতে পারেন।

ঐতিহাসিক বিকাশ সম্পর্কে তাদের অত্যন্ত অগভীর বোঝাপড়ার প্রমাণ হলো এই যে , তথাকথিত জাতীয়তাবাদীরা বারবার জোর দিয়ে বলে যে তারা কোনো অবস্থাতেই নেতিবাচক সমালোচনা ব্যবহার করবে না এবং কেবল গঠনমূলক কাজেই নিযুক্ত থাকবে। এটা নিছকই শিশুসুলভ প্রলাপ, যা সকল জাতীয়তাবাদীরই বৈশিষ্ট্য। এটি আরও প্রমাণ করে যে আমাদের সময়ের ইতিহাস তাদের মনকে প্রভাবিত করেনি। মার্কসবাদেরও অর্জনের জন্য নিজস্ব লক্ষ্য রয়েছে এবং এটিও গঠনমূলক কাজকে স্বীকৃতি দেয়, যদিও এর দ্বারা এটি কেবল আন্তর্জাতিক ইহুদি অর্থায়নের স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠাকেই বোঝায়। তা সত্ত্বেও, সতেরো বছর ধরে এর প্রধান কার্যকলাপ সমালোচনার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। আর কী বিধ্বংসী সমালোচনাই না ছিল সেটা! সমালোচনা বারবার পুনরাবৃত্তি হতে থাকল, যতক্ষণ না সেই ক্ষয়কারী অ্যাসিড পুরোনো রাষ্ট্রকে এমনভাবে ক্ষয় করে দিল যে অবশেষে তা টুকরো টুকরো হয়ে গেল। কেবল তখনই মার্কসবাদের তথাকথিত "গঠনমূলক" কার্যকলাপ শুরু হয়েছিল। এবং এটি ছিল স্বাভাবিক, যথাযথ এবং যৌক্তিক। একটি নতুন ব্যবস্থা ঘোষণা করে এবং তার ওপর জোর দিয়ে বিদ্যমান ব্যবস্থাকে উৎখাত করা যায় না। এই আশা করার কোনো মানে হয় না যে , নিজেদের স্বার্থে আবদ্ধ বিদ্যমান ব্যবস্থার সমর্থকেরা শুধু নতুন কিছুর প্রয়োজনীয়তা দেখিয়ে দিলেই নতুন আন্দোলনের পক্ষে চলে আসবে। বরং , সহজেই এমনটা হতে পারে যে দুটি ভিন্ন ব্যবস্থা পাশাপাশি সহাবস্থান করবে , এবং একটি বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি একটি দলে রূপান্তরিত হবে, যার পরে তা আর উচ্চতর অবস্থানে উঠতে পারবে না। এই বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি অসহিষ্ণু এবং অন্যটির সাথে পাশাপাশি থাকতে পারে না। এটি একচেটিয়া ও অনন্য হিসেবে স্বীকৃতি এবং এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি সম্পূর্ণ রূপান্তর দম্ভভরে দাবি করে।

Machine Translated by Google

জনজীবনের সকল ক্ষেত্রে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। তিনি কখনোই পূর্ববর্তী ব্যবস্থাকে পাশাপাশি চলতে দিতে পারেন না।

একই সত্য ধর্মের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

খ্রিস্টধর্ম কেবল নিজস্ব বেদি নির্মাণ করেই সন্তুষ্ট ছিল না । প্রথমে তাকে পৌত্তলিক বেদিগুলো ধ্বংস করতে হয়েছিল। কেবল এই তীব্র অসহিষ্ণুতার মাধ্যমেই একটি কর্তৃত্ববাদী ধর্মমতের উদ্ভব হতে পেরেছিল। এই ধরনের ধর্মমতের বিকাশের জন্য অসহিষ্ণুতা একটি অপরিহার্য শর্ত।

এখানে এই আপত্তি তোলা যেতে পারে যে , বিশ্ব ইতিহাসে আমরা যে ঘটনাটি দেখতে পাই , তা মূলত একটি নির্দিষ্ট ইহুদি চিন্তাধারা থেকে উদ্ভূত এবং ধর্মান্ধতা ও অসহিষ্ণুতা হলো ইহুদি মানসিকতার সাধারণ লক্ষণ । এই কথাটি হাজার গুণ সত্য হতে পারে ; এবং এই ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক । মানব ইতিহাসে অসহিষ্ণুতা ও ধর্মান্ধতা দুঃখজনক হতে পারে এবং মানব প্রকৃতির পরিপন্থী বলে বিবেচিত হতে পারে , কিন্তু এটি কোনোভাবেই আজকের বিদ্যমান পরিস্থিতিকে পরিবর্তন করে না। যারা জার্মান জাতিকে তার বর্তমান অবস্থা থেকে মুক্ত করতে চান, তাদের এই ভেবে মাথা ঘামানো উচিত নয় যে, অমুক বা তমুকের অস্তিত্ব না থাকলে কতই না ভালো হতো। তাদের অবশ্যই বর্তমানে যা বিদ্যমান, তাকে উৎখাত করার উপায় ও পদ্ধতি খুঁজে বের করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। অসহিষ্ণুতার নরকীয় চেতনার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা জীবনদর্শনকে কেবল এমন একটি মতবাদই প্রত্যাখ্যান করতে পারে , যার মধ্যে সমান প্রচণ্ড চেতনা রয়েছে এবং যা একটি নতুন, বিশুদ্ধ ও পরম সত্য ধারণার জন্য সমান দৃঢ়তার সাথে লড়াই করতে সক্ষম ।

আজ আমাদের প্রত্যেকেই হয়তো এই ভেবে অনুশোচনা করি যে খ্রিস্টধর্মের আগমনই ছিল প্রথম
প্রাচীনকালের অনেক বেশি মুক্ত বিশ্বে আধ্যাত্মিক সন্ত্রাস প্রবর্তনের একটি সুযোগ ছিল , কিন্তু এটা অস্বীকার করা যায় না যে সেই সময় থেকে বিশ্ব এই ধরনের বলপ্রয়োগ দ্বারা পরিব্যাপ্ত ও প্রভাবিত হয়েছে, এবং সহিংসতাকে কেবল সহিংসতা দিয়েই ভাঙা যায়, আর সন্ত্রাসকে সন্ত্রাস দিয়েই।
কেবল তখনই গঠনমূলক কাজের মাধ্যমে একটি নতুন শাসনব্যবস্থা তৈরি করা সম্ভব । রাজনৈতিক দলগুলো আপোস করতে চায় ; কিন্তু একটি বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি এতে কখনো রাজি হবে না । একটি রাজনৈতিক দল তার বিরোধীদের জায়গা করে দিতে নিজের শিক্ষাকে মানিয়ে নিতে পারে , কিন্তু একটি বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি তার অভ্রান্ততা ঘোষণা করে।

উৎপত্তির দিক থেকে রাজনৈতিক দলগুলোরও প্রায় সবসময়ই নিজেদের জন্য একচেটিয়া ও স্বৈরাচারী আধিপত্য নিশ্চিত করার উদ্দেশ্য থাকে । তাদের মধ্যে বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার প্রবণতা সবসময়ই দুর্বল থাকে। কিন্তু তাদের কর্মসূচির সীমিত প্রকৃতিই তাদেরকে সেই বীরত্বপূর্ণ চেতনা থেকে বঞ্চিত করার জন্য যথেষ্ট , যা একটি বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির জন্য প্রয়োজন। যে মীমাংসার চেতনা তাদের ইচ্ছাকে উজ্জীবিত করে...
এটি এমন ক্ষুদ্রমনা ও কাপুরুষ লোকদের আকর্ষণ করে যারা কোনো অভিযানের জন্য অযোগ্য । তাই, তারা প্রায়শই তাদের যাত্রার একেবারে শুরুতেই এই করুণ ক্ষুদ্রতার জালে আটকে পড়ে ।
তারা তাদের আদর্শের জন্য লড়াই করা বন্ধ করে দেয় এবং তথাকথিত 'ইতিবাচক সহযোগিতা'-র মাধ্যমে তারা চেষ্টা করে
বিদ্যমান ব্যবস্থার কোনো এক কোণে যত দ্রুত সম্ভব নিজেদেরকে গুঁজে দিয়ে সেখানে যথাসম্ভব বেশিদিন থাকা । তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা সেখানেই শেষ হয়ে যায় । আর যদি প্রতিযোগিতা তাদের আরও নৃশংসভাবে সাধারণ আশ্রয় থেকে ছিনিয়ে নেয় , তবে তাদের একমাত্র পরিকল্পনা হলো আবার নতুন করে চেষ্টা করা।
তার কাছে, বলপ্রয়োগে বা ছলচাতুরীর মাধ্যমে, একই রকম লোভী অন্য একদল লোকের সাহায্যে , এমনকি তাদের সবচেয়ে পবিত্র বিশ্বাসকে বিসর্জন দিয়েও । এরাই রাজনৈতিক শিয়াল ।

সাধারণ বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি কখনোই অন্য কোনোটির সাথে স্থান করে নেবে না । তাই, এটি যা কিছুর নিন্দা করে, তার সাথে সহযোগিতা করতে কখনো রাজি হবে না। বরং , এটি পুরাতন ব্যবস্থা এবং সেই ব্যবস্থার অন্তর্গত সমগ্র চিন্তাজগতের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং এর ধ্বংসের পথ প্রস্তুত করতে সর্বপ্রকার উপায় অবলম্বন করতে নিজেকে দায়বদ্ধ মনে করে।

এই সম্পূর্ণ ধ্বংসাত্মক কৌশল, যার বিপদ শত্রু খুব সহজেই উপলব্ধি করতে পারে এবং সাধারণ প্রতিরক্ষার জন্য এর বিরুদ্ধে একটি ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠন করে , এবং সেইসাথে গঠনমূলক কৌশল, যা নতুন ভাবজগতের সাফল্য অর্জনের জন্য অবশ্যই আক্রমণাত্মক হতে হবে —সংগ্রামের এই উভয় পর্যায়ের জন্যই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যোদ্ধার প্রয়োজন। জীবনের প্রতিটি নতুন দর্শন তার ভাবধারার বিজয় কেবল তখনই আনতে পারে , যখন তার যুগ ও জাতির সবচেয়ে সাহসী এবং সক্রিয় উপাদানগুলো তার পতাকার নিচে একটি শক্তিশালী সংগ্রামী সংগঠনে একত্রিত হয়। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য , মতবাদের সাধারণ ব্যবস্থা থেকে এমন কিছু ধারণা নির্বাচন করা একান্ত প্রয়োজন , যা এই ধরনের ব্যক্তিদের কাছে আবেদন রাখে এবং যা সুনির্দিষ্ট আকারে প্রকাশিত হয়ে জনগণের নতুন গোষ্ঠীর মূলনীতি হিসেবে কাজ করবে । যদিও সাধারণ কর্মসূচী...

Machine Translated by Google

রাজনৈতিক দল হলো পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে সফল ফলাফল তৈরির একটি কৌশল মাত্র ; এমন একটি বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি যা বিদ্যমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, বর্তমান পরিস্থিতির বিরুদ্ধে, সংক্ষেপে —প্রতিষ্ঠিত বিশ্বদৃষ্টির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ।

তবে, নতুন মতবাদের জন্য সংগ্রামরত প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে আন্দোলনের নেতাদের চূড়ান্ত ধারণা ও পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে বোঝা আবশ্যক নয় । তার জন্য শুধু এটুকুই যথেষ্ট যে , মৌলিক ধারণাগুলো সম্পর্কে তার একটি সুস্পষ্ট ধারণা এবং কয়েকটি সবচেয়ে মৌলিক নীতি সম্পর্কে একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান থাকবে, যাতে সে আন্দোলন ও তার মতবাদের সাফল্যের জন্য এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে। সাধারণ সৈনিক কৌশলগত পরিকল্পনার বিষয়ে অবগত থাকে না।

কিন্তু তাকে অবশ্যই কঠোর শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে , তার উদ্দেশ্যের ন্যায্যতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে গভীরভাবে নিশ্চিত হতে হবে এবং এতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করতে হবে। একইভাবে, আন্দোলনের একজন সমর্থককে এর সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য, আন্দোলনকে অনুপ্রাণিতকারী শক্তিশালী ইচ্ছাশক্তি এবং এর মহান উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে।
ভবিষ্যৎ।

যদি সেনাবাহিনীর প্রত্যেক সৈনিকই সেনাপতি হতেন এবং তাঁদের যথাযথ প্রশিক্ষণ ও যোগ্যতা থাকত, তবে সেই সেনাবাহিনী যুদ্ধের একটি কার্যকর হাতিয়ার হতে পারত না । একইভাবে, একটি রাজনৈতিক আন্দোলনও বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির সংগ্রামে খুব একটা কার্যকর হতো না, যদি তা কেবল বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে গঠিত হতো। না, সাধারণ সৈনিকদেরও প্রয়োজন আছে । তাঁদের ছাড়া কোনো শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

স্বভাবতই, একটি সংগঠন কেবল তখনই টিকে থাকতে পারে , যখন উচ্চ বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন নেতাদের অধীনে একদল বৃহৎ ও আবেগগতভাবে নিবেদিতপ্রাণ মানুষ থাকে । দীর্ঘমেয়াদে , দুইশতজন সমান বুদ্ধিমান ও সক্ষম মানুষের একটি দলে শৃঙ্খলা বজায় রাখা, একশত নব্বইজন কম সক্ষম ও দশজন উচ্চশিক্ষিত মানুষের একটি দলের চেয়ে অনেক বেশি কঠিন ।

এই সত্যটি উপলব্ধি করে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা অনেক লাভবান হয়েছে । তারা সদ্য সামরিক সেবা সম্পন্ন করা এবং শৃঙ্খলা মেনে চলতে শেখা বিপুল সংখ্যক মানুষকে নিয়ে এই বিষয়টিকে অধীনস্থ করেছে।
সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক সংগঠনের শৃঙ্খলার অধীনে থাকা জনতা, যা সামরিক চাকরির চেয়ে কোনো অংশে কম কঠোর ছিল না । সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক সংগঠনটি ছিল অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যে বিভক্ত একটি সেনাবাহিনী। সামরিক চাকরি শেষ করা একজন জার্মান শ্রমিক এই সেনাবাহিনীতে একজন সাধারণ সৈনিক হতেন , অন্যদিকে একজন ইহুদি বুদ্ধিজীবী হতেন অফিসার। জার্মান ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকর্তাদের নন-কমিশনড অফিসারদের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। একটি বিষয় যা আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণি সবসময় উদাসীনতার সাথে দেখেছে – যে কেবল তথাকথিত অশিক্ষিত শ্রেণিই এতে যোগ দিয়েছিল।

মার্ক্সবাদীদের কাছে—এটাই ছিল এই দলের সাফল্যের কারণ । যেখানে মূলত বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে গঠিত বুর্জোয়া দলগুলো ছিল দায়িত্বজ্ঞানহীন ও শৃঙ্খলাহীন ব্যক্তিদের দল, সেখানে মার্ক্সবাদী নেতারা অনেক কম বুদ্ধিমান মানব উপাদান থেকে দলীয় যোদ্ধাদের এমন এক বাহিনী গঠন করেছিলেন, যারা তাদের ইহুদি প্রভুদের আদেশ ঠিক ততটাই অন্ধভাবে পালন করত, যতটা তারা আগে জার্মান অফিসারদের আদেশ পালন করত। জার্মান মধ্যবিত্ত শ্রেণি, যারা মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা নিয়ে কখনও মাথা ঘামায়নি কারণ তারা এসব বিষয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করত, তারা এই ঘটনার গভীর তাৎপর্য এবং এর মধ্যে লুকিয়ে থাকা বিপদ নিয়ে ভাবার প্রয়োজন মনে করেনি । তারা বিশ্বাস করত যে, যে রাজনৈতিক আন্দোলনের সমর্থকরা শুধুমাত্র বুদ্ধিজীবী মহল থেকে আসে, সেই আন্দোলনের তাৎপর্য ও সাফল্যের ভিত্তি অবশ্যই অজ্ঞ জনসাধারণকে নিয়ে গঠিত দলের চেয়ে বেশি হবে, এমনকি ক্ষমতা গ্রহণের সম্ভাবনাও বেশি থাকবে । তারা এই সত্যটি উপলব্ধি করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল যে, একটি রাজনৈতিক দলের শক্তি তার সদস্যদের বুদ্ধিমত্তা ও স্বাধীন চেতনার মধ্যে নিহিত থাকে না, বরং সেই অধীনতার মনোভাবের মধ্যে থাকে, যার সাথে তারা তাদের বুদ্ধিজীবী নেতাদের অনুসরণ করে। নেতৃত্ব নিজেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ । যখন দুই দল সৈন্য একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তখন জয় সেই পক্ষের হবে না যার প্রত্যেক সৈন্য রণকৌশলের মূলনীতিগুলো নিখুঁতভাবে বোঝে, বরং জয় হবে সেই পক্ষের, যাদের রয়েছে সেরা নেতা এবং একই সাথে সবচেয়ে সুশৃঙ্খল, অন্ধভাবে অনুগত ও প্রশিক্ষিত সৈন্য।

একটি বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গিকে বাস্তব বাস্তবে রূপ দেওয়ার সম্ভাবনা বিবেচনা করার সময় এই মৌলিক জ্ঞানটি সর্বদা মনে রাখতে হবে ।

Machine Translated by Google

যদি আমরা একমত হই যে একটি বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নের জন্য তাকে একটি সংগ্রামী আন্দোলনের মধ্যে মূর্ত করতে হবে , তবে এর যৌক্তিক পরিণতি হলো, সেই আন্দোলনের কর্মসূচিতে তার হাতে থাকা মানবসম্পদকে অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে। ঠিক যেমন একটি আন্দোলনের চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্য এবং তার মৌলিক নীতিসমূহকে অবশ্যই সম্পূর্ণ স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন হতে হবে , তেমনি প্রচার কর্মসূচিকেও এমনভাবে সুনিপুণভাবে তৈরি করতে হবে যাতে তা তাদের উপর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ফেলতে পারে, যাদের সাহায্য ছাড়া মহত্তম ধারণাগুলো চিরন্তন ভাবনার জগতেই থেকে যেতে বাধ্য ।

জাতিরাষ্ট্রের ধারণা , যা এখন একটি অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা মাত্র, যদি কোনো একদিন সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট সাফল্য অর্জন করতে হয়, তবে চিন্তার এই অস্পষ্ট ও বিশাল স্তূপ থেকেই একটি সমাধান বেরিয়ে আসতে হবে ।
কিছু নির্দিষ্ট নীতি, যা তার প্রকৃতি ও বিষয়বস্তুর কারণেই ব্যাপক সংখ্যক সমর্থককে আকৃষ্ট করতে সক্ষম ; অন্য কথায়, এমন একদল মানুষ যারা এই নীতিগুলোর জন্য লড়াই করার নিশ্চয়তা দিতে পারে । এই দলটিই হলো জার্মান শ্রমিকেরা ।

সুতরাং, নতুন আন্দোলনের কর্মসূচিকে পঁচিশটি মৌলিক প্রতিজ্ঞায় সংক্ষেপিত করা হয়েছে। এগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য হলো সাধারণ মানুষকে আন্দোলনের লক্ষ্যগুলোর একটি মোটামুটি রূপরেখা দেওয়া । এগুলোকে বলা যেতে পারে এক প্রকার বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি, যার উদ্দেশ্য একদিকে আন্দোলনের প্রতি সমর্থকদের আকৃষ্ট করা এবং অন্যদিকে সেই সমর্থকদের ঐক্যবদ্ধ করা।

এইসব বিষয়ে, আমাদের নিম্নলিখিত বিষয়টি কখনোই ভুলে গেলে চলবে না : একটি আন্দোলনের কর্মসূচি ততক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ বৈধ, যতক্ষণ তার চূড়ান্ত লক্ষ্যগুলো বিবেচনা করা হয় ; কিন্তু এর প্রণয়নের ক্ষেত্রে কিছু মনস্তাত্ত্বিক বিষয় অবশ্যই আমলে নেওয়া উচিত । সুতরাং , সময়ের সাথে সাথে এমন মতামতের উদ্ভব হতে পারে যে, কিছু নির্দিষ্ট নীতি ভিন্নভাবে প্রকাশ করা উচিত বা আরও ভালোভাবে প্রণয়ন করা যেতে পারে । কিন্তু ভিন্ন কোনো প্রণয়নের প্রচেষ্টা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিপর্যয়কর হয়। যা স্থির ও অলঙ্ঘনীয় হওয়া উচিত, তা আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। যেই মুহূর্তে কোনো একটি বিষয়কে গোঁড়ামিপূর্ণ নিশ্চয়তার পরিধি থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়, সেই আলোচনা আর অধিকতর সংগতিপূর্ণ কোনো নতুন ও উন্নততর প্রণয়নের দিকে নিয়ে যায় না , বরং তা অন্তহীন বিতর্ক এবং সাধারণ বিভ্রান্তির জন্ম দিতে পারে ।

এইসব ক্ষেত্রে, সর্বদা সতর্কতার সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন যে, একটি নতুন ও অধিকতর উপযুক্ত সূত্র অধিকতর শ্রেয় হবে কি না, যদিও তা আন্দোলনের অভ্যন্তরে বিতর্ক সৃষ্টি করতে পারে; নাকি পুরোনো সূত্রটিই ধরে রাখা শ্রেয় হবে , যা হয়তো সর্বোত্তম না হলেও একটি দৃঢ় এবং অভ্যন্তরীণভাবে সমসত্ত্ব সত্তার প্রতিনিধিত্ব করে। সকল অভিজ্ঞতা এটাই দেখায় যে, দ্বিতীয় বিকল্পটিই অধিকতর শ্রেয়। যতক্ষণ পর্যন্ত এই পরিবর্তনগুলো কেবল বাহ্যিক রূপের সাথে সম্পর্কিত থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই ধরনের সংশোধন সর্বদা কাম্য এবং সম্ভব বলে মনে হয় । কিন্তু চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, অধিকাংশ মানুষই বাহ্যিকভাবে চিন্তা করে , এবং তাই এই বিরাট আশঙ্কা থাকে যে, কর্মসূচির যা কেবল একটি বাহ্যিক রূপ, তাকেই আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করা হবে। এইভাবে, আদর্শের সেবায় সংগ্রাম করার ইচ্ছা ও শক্তি দুর্বল হয়ে পড়বে , এবং যে শক্তি বহির্বিশ্বের দিকে পরিচালিত হওয়া উচিত ছিল, তা আন্দোলনের অভ্যন্তরে কর্মসূচি সংক্রান্ত আলোচনায় অপচয়িত হবে ।

যে মতবাদ তার মৌলিক নীতিতে সঠিক , তার ক্ষেত্রে সেগুলোকে উন্নত করার চেষ্টার চেয়ে এমন সূত্রগুলোকে বজায় রাখা কম বিপজ্জনক, যা হয়তো আর পুরোপুরি উপযুক্ত নয় । কারণ, উন্নত করার চেষ্টা করলে আন্দোলনের মৌলিক নীতিগুলো, যা আগে গ্রানাইটের মতো কঠিন বলে বিবেচিত হতো , তা সাধারণ আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়াতে পারে, যার দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি হতে পারে । এটি অবশ্যই পরিহার করতে হবে, বিশেষ করে যখন আন্দোলনটি ক্রমাগত বিজয়ের জন্য সংগ্রাম করছে । কারণ, যদি কোনো মতবাদের বাহ্যিক সূত্রায়নে ক্রমাগত পরিবর্তনের ফলে সন্দেহ ও অনিশ্চয়তা উস্কে দেওয়া হয়, তবে তার সত্যতার প্রতি মানুষকে অন্ধ বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত করা কীভাবে সম্ভব ?

কোনো মতবাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তার বাহ্যিক সূত্রাবলীতে নয় , বরং কেবল তার অন্তর্নিহিত অর্থেই খোঁজা উচিত। আর এই অর্থ অপরিবর্তনীয়। বিজয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ঐক্যবদ্ধ শক্তি বজায় রাখার লক্ষ্যে, বিভেদ ও অনিশ্চয়তার দিকে পরিচালিত করে এমন সবকিছু নির্মূল করাই আন্দোলনের স্বার্থে ।

আবারও, আমরা ক্যাথলিক চার্চ থেকে শিখতে পারি। যদিও কখনও কখনও, এবং সাধারণত বেশ অপ্রয়োজনীয়ভাবেই, এর মতবাদ ব্যবস্থা নির্ভুল বিজ্ঞান ও আবিষ্কারের সাথে সাংঘর্ষিক হয়।

Machine Translated by Google

বৈজ্ঞানিক নীতি অনুসারে, তিনি তাঁর শিক্ষার একটি অক্ষরও পরিবর্তন করেন না। তিনি ভালোভাবেই বুঝেছিলেন যে, সাময়িক বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের সাথে সঙ্গতি রেখে বড় বা ছোট মতবাদগত পরিবর্তন আনলে তাঁর প্রতিরোধের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়বে , কারণ বাস্তবে সেই সিদ্ধান্তগুলো সর্বদা পরিবর্তনশীল । এই কারণে, তিনি প্রতিষ্ঠিত মতবাদগুলোকে কঠোরভাবে মেনে চলেন , যা সমগ্র ব্যবস্থাটিকে বিশ্বাসের রূপ দেয়। আর এই কারণেই তিনি এখন আগের চেয়েও বেশি শক্তিশালী। এটা অনুমান করা যায় যে, তাঁর চারপাশের ঘটনাপ্রবাহ যত দ্রুত পরিবর্তিত হবে, বিশ্বজনীন অস্থিরতার মাঝে এক স্থির মেরু হিসেবে তিনি তত বেশি অন্ধভাবে অনুগত মানুষকে আকর্ষণ করবেন ।

সুতরাং, জাতিরাষ্ট্রের ধারণার বিজয় আন্তরিকভাবে কামনা করেন এমন যে কাউকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে , এই বিজয় কেবল একটি সংগ্রামী আন্দোলনের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব এবং এই আন্দোলনের শক্তিকে অবশ্যই একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও সুসংহত কর্মসূচির অটল ভিত্তির ওপর স্থাপন করতে হবে ।
এর সূত্রের ক্ষেত্রে, একে অবশ্যই সময়ের চেতনার কাছে কখনো নতি স্বীকার করতে হবে না, বরং একবার সঠিক বলে প্রতিষ্ঠিত রূপটিকেই বজায় রাখতে হবে; অন্তত যতক্ষণ না বিজয় এর প্রচেষ্টাকে পূর্ণতা দেয় । এই লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার আগে , কর্মসূচির এই বা সেই বিষয়ের উপযুক্ততা নিয়ে আলোচনার যেকোনো প্রচেষ্টা আন্দোলনের স্থায়িত্ব এবং সংগ্রাম করার ক্ষমতাকে ভেঙে দিতে পারে, যদি এর সমর্থকেরা এমন অভ্যন্তরীণ বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। আজ প্রবর্তিত কিছু "সংশোধনী" হয়তো আগামীকাল সমালোচনামূলক মূল্যায়নের সম্মুখীন হবে , এবং তার পরদিনই আরও ভালো কিছু দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে । একবার বাধা অতিক্রম করা গেলে, পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়, এবং আমরা কেবল তার শুরুটাই জানি, কিন্তু জানি না তা কোন অনন্ত সাগরে গিয়ে শেষ হতে পারে ।

এই অপরিহার্য নীতিটি জাতীয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সদস্যদের দ্বারা একেবারে শুরু থেকেই বাস্তবে স্বীকৃত হতে হবে। তার পঁচিশ-দফা কর্মসূচিতে, এনএসডিএপি এমন একটি ভিত্তি স্থাপন করেছে যা অবশ্যই অটল থাকতে হবে। আন্দোলনের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয় সদস্যকেই এই মূলনীতিগুলো সমালোচনামূলকভাবে পর্যালোচনা করার জন্য কখনো বাধ্য বোধ করা উচিত নয় , বরং সেগুলোকে হুবহু বাস্তবে প্রয়োগ করার জন্য দায়বদ্ধ বোধ করতে হবে । অন্যথায়, পরবর্তী প্রজন্ম আন্দোলনের জন্য নতুন সমর্থক সংগ্রহ করে এর শক্তি বৃদ্ধি করার পরিবর্তে দলের মধ্যে নিছক আনুষ্ঠানিক কাজে শক্তি অপচয় করবে । আমাদের অধিকাংশ সমর্থকের কাছে , আন্দোলনের সারমর্ম আমাদের মূলনীতিগুলোর কথায় নয়, বরং আমরা সেগুলোকে যে অর্থ প্রদান করি, তার মধ্যেই নিহিত ।

এইসব বিবেচনার ফলেই নতুন আন্দোলনটির নামকরণ হয়েছে এবং এর পরবর্তী কর্মসূচিও সে অনুযায়ীই তৈরি করা হয়েছে। এগুলোই আমাদের প্রচারণার ভিত্তি । জাতি-রাষ্ট্রের ধারণার বিজয় নিশ্চিত করার জন্য একটি সার্বজনীন দল প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য ছিল , যা কেবল বুদ্ধিজীবী নেতাদের নিয়েই নয়, বরং সাধারণ শ্রমিকদের নিয়েও গঠিত হবে। একটি সংগ্রামী সংগঠনের সমর্থন ছাড়া এই তত্ত্বগুলোকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার যেকোনো প্রচেষ্টা আজ ব্যর্থ হতে বাধ্য, যেমনটি অতীতেও ব্যর্থ হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও ব্যর্থ হতে বাধ্য। অতএব, আমাদের আন্দোলন নিজেকে এই ধারণাগুলোর রক্ষক ও প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচনা করার জন্য কেবল ন্যায্যই নয়, বরং দায়বদ্ধও । জাতীয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মৌলিক নীতিগুলো জাতীয় ধারণার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত, এবং জাতীয় ধারণাই হলো জাতীয় সমাজতান্ত্রিক। জাতীয় সমাজতন্ত্রের যদি বিজয় লাভ করতে হয়, তবে তাকে এই সত্যকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে হবে , এবং আবারও এটি কেবল অধিকারই রাখে না, বরং কর্তব্যও পালন করে যে, এনএসডিএপি-র বাইরে জাতীয় ধারণার প্রতিনিধিত্ব করার যেকোনো প্রচেষ্টা নিষ্ফল এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রতারণামূলক — এই বিষয়টি যথাসম্ভব জোরালোভাবে তুলে ধরা ।

যদি আমাদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে জাতীয় ধারণাকে 'একচেটিয়া' করে নেওয়ার অভিযোগ ওঠে , তবে এর একটাই উত্তর হতে পারে।
আমরা শুধু জাতীয় ধারণাকেই একচেটিয়া করিনি , বরং কার্যত তা তৈরিও করেছি ।

পূর্বে এই নামে যা কিছু বিদ্যমান ছিল, তা আমাদের জাতির ভাগ্যকে প্রভাবিত করতে সম্পূর্ণ অক্ষম ছিল , কারণ এই সমস্ত ধারণার কোনো রাজনৈতিক ও সুসংহত রূপায়ণ ছিল না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, সেগুলো ছিল কমবেশি সঠিক বিচ্ছিন্ন ও অসংলগ্ন মতামত মাত্র। প্রায়শই, সেগুলো পরস্পরের বিরোধিতা করত এবং কোনো সামঞ্জস্য ছিল না।

Machine Translated by Google

তাদের মধ্যে কোনো অভ্যন্তরীণ সংহতি ছিল না। আর এই অভ্যন্তরীণ সংহতি যদি থেকেও থাকে, তা এতটাই দুর্বল ছিল যে কোনো আন্দোলনের ভিত্তি গড়ে উঠতে পারেনি।

একমাত্র জাতীয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনই এই কাজটি সম্পন্ন করতে সক্ষম বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

আমাদের।

* * *

ছোট -বড় সব ধরনের সংঘ ও গোষ্ঠী 'জাতীয়' শব্দটির ওপর নিজেদের দাবি জানায়। এটি জাতীয় সমাজতন্ত্রের কাজের অন্যতম একটি ফল। এই কাজ ছাড়া, এই দলগুলোর কোনোটিই 'জাতীয়' শব্দটি গ্রহণ করার কথা চিন্তাও করত না। শব্দটি তাদের কাছে অর্থহীন হয়ে যেত এবং বিশেষ করে তাদের নেতারা এই ধারণার সঙ্গে কখনোই কোনো সম্পর্ক রাখতেন না।

যতক্ষণ না জাতীয় সমাজতান্ত্রিক জার্মান শ্রমিক দলের কার্যকলাপ এই ধারণাটিকে সর্বস্তরের মানুষের মুখে প্রাধান্য দিয়েছিল। সর্বোপরি, আমাদের দল তার প্রচারণামূলক সাফল্যের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী ভাবনার শক্তি প্রদর্শন করেছিল; ফলে, অনুসারী লাভের চেষ্টায় থাকা অন্যরাও অন্তত কথায় আমাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছিল।

এ পর্যন্ত তারা যেমন নিজেদের তুচ্ছ নির্বাচনী স্বার্থে সবকিছু ব্যবহার করেছে, ঠিক তেমনি আজ তারা 'জাতীয়' শব্দটি ব্যবহার করছে শুধুমাত্র একটি লোকদেখানো ও অন্তঃসারশূন্য কৌশল হিসেবে, যা দিয়ে তারা অন্য দলগুলোর সদস্যদের ওপর এনএসডিএপি-র প্রভাবের শক্তিকে প্রতিহত করতে চায়। শুধুমাত্র নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার আকাঙ্ক্ষা, সার্বজনীন তাৎপর্যপূর্ণ একটি বিশ্বদৃষ্টির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা আমাদের আন্দোলনের বিজয়ের ভয় এবং আমাদের আন্দোলনের একচেটিয়া প্রকৃতি তাদের জন্য হুমকিস্বরূপ —শুধুমাত্র এই কারণেই তারা শব্দটি ব্যবহার করে।

যেসব শব্দ তারা আট বছর আগে প্রত্যাখ্যান করেছিল, সাত বছর আগে উপহাস করেছিল, ছয় বছর আগে বোকার মতো মনে করেছিল, পাঁচ বছর আগে বিরোধিতা করেছিল, চার বছর আগে ঘৃণা করেছিল, এবং অবশেষে, দুই বছর আগে, তাদের বর্তমান রাজনৈতিক শব্দভাণ্ডারে অন্তর্ভুক্ত করে নিজেদের সংগ্রামে রণধ্বনি হিসেবে ব্যবহার করেছে।

এবং এখনও এই সত্যটির প্রতি আবারও দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন যে, জার্মান জনগণের কী প্রয়োজন সে সম্পর্কে এই দলগুলোর কোনোটিরই বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো, তারা 'জাতীয়' শব্দটি অত্যন্ত অগভীরভাবে ব্যবহার করে।

যারা অর্ধ-জাতীয়তাবাদী হিসেবে ঘুরে বেড়ায় এবং উদ্ভট কর্মসূচি প্রণয়ন করে, তারাও কম বিপজ্জনক নয়। এই কর্মসূচিগুলো সাধারণত এমন কোনো ধারণার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয় যা হয়তো নিজে থেকে সঠিক, কিন্তু একটি বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি হওয়ায় একটি বৃহৎ ও সমজাতীয় যোদ্ধা গোষ্ঠী তৈরিতে এর কোনো প্রয়োগ নেই এবং কোনোভাবেই এর সংগঠনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারে না। এই লোকেরা, যারা আংশিকভাবে নিজেদের ধারণা এবং আংশিকভাবে অন্যের কাছ থেকে নেওয়া ধারণা, যা তারা কোথাও পড়েছে, তা দিয়ে কর্মসূচি তৈরি করে, তারা সাধারণত জাতীয়তাবাদী ধারণার ঘোষিত বিরোধীদের চেয়েও বেশি বিপজ্জনক। সর্বোত্তম ক্ষেত্রে, তারা নিষ্ফল তাত্ত্বিক, কিন্তু প্রায়শই তারা বিদ্বেষবশত মানুষের মনকে বিভ্রান্ত করে। তারা বিশ্বাস করে যে লম্বা দাড়ি রেখে এবং প্রাচীন জার্মান অঙ্গভঙ্গি করে তারা তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক অসারতা, প্রচেষ্টার নিষ্ফলতা এবং মানসিক অস্থিরতা ঢাকতে পারবে।

এই সমস্ত ব্যর্থ প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে, সেই সময়গুলোকে স্মরণ করা প্রাসঙ্গিক যখন নতুন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন তার সংগ্রাম শুরু করেছিল।

Machine Translated by Google

ষষ্ঠ অধ্যায়

আমাদের সংগ্রামের প্রথম পর্ব

১৯২০ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি হফব্রাউহাউসফেস্টসাল-এ অনুষ্ঠিত আমাদের প্রথম মহান সভার রেশ তখনও কাটেনি, এর মধ্যেই আমরা পরবর্তী সভার প্রস্তুতি শুরু করে দিলাম। ততদিন পর্যন্ত, মিউনিখের মতো একটি শহরে আমাদের প্রতি মাসে একটি ছোট সভা , বা বড়জোর প্রতি দুই সপ্তাহে একবার সভা করার কথা সতর্কতার সাথে ভাবতে হতো ; কিন্তু এখন আমরা প্রতি সপ্তাহে গণসভা করার সিদ্ধান্ত নিলাম। বলাই বাহুল্য , আমরা প্রতিটি সুযোগে উদ্বিগ্নভাবে নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করতাম : লোকেরা কি আসবে এবং শুনবে ? ব্যক্তিগতভাবে , আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতাম যে, যদি তারা আসে, তবে তারা থেকে যাবে এবং শুনবে ।

এই সময়ে, মিউনিখের হফব্রাউহাউস আমাদের, অর্থাৎ নাৎসিদের কাছে এক ধরনের পৌরাণিক তাৎপর্য লাভ করেছিল। প্রতি সপ্তাহে একটি সভা হতো , প্রায় সবসময়ই এই হলে, এবং প্রতিবারই হলটি কানায় কানায় পূর্ণ থাকত , আর শ্রোতার সংখ্যাও ছিল অনেক বেশি।
সতর্ক।

' যুদ্ধের দায়'—এই বিষয়টি দিয়ে শুরু করে , যা নিয়ে সে সময় কারও কোনো মাথাব্যথা ছিল না, এবং এরপর শান্তিচুক্তিগুলো নিয়ে আলোচনা করে, আমরা এমন প্রায় সবকিছুই তুলে ধরেছিলাম যা আমাদের শ্রোতাদের মনকে উদ্দীপ্ত করতে এবং আমাদের ভাবনার প্রতি তাদের আগ্রহী করে তুলতে পারে। আমরা শান্তিচুক্তিগুলোর ওপরই মনোযোগ দিয়েছিলাম । এই বিশাল জনসমাবেশের সামনে নতুন আন্দোলনটি যা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, তার প্রায় প্রতিটি খুঁটিনাটিই সত্যি হয়েছিল । আজ এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলা ও লেখা সহজ । কিন্তু সেই সময়ে গণসভাগুলোতে ক্ষুদ্র বুর্জোয়ারা নয়, বরং আন্দোলনকারীদের দ্বারা উস্কানিপ্রাপ্ত সর্বহারা শ্রেণীর মানুষেরা উপস্থিত থাকত, এবং ভার্সাই চুক্তির সমালোচনা করার অর্থ ছিল প্রজাতন্ত্রের ওপর আক্রমণ এবং প্রতিক্রিয়াশীল, এমনকি রাজতন্ত্রপন্থী প্রবণতার প্রমাণ । ভার্সাই চুক্তি নিয়ে সমালোচনার প্রথম শব্দটি উচ্চারিত হওয়ার মুহূর্তেই যে কাউকে ক্ষমা করে দেওয়া যেত।

একটি তাৎক্ষণিক, প্রায় গতানুগতিক প্রতিক্রিয়া আশা করা যেত : "আর ব্রেস্ট -লিটোভস্ক?" "ব্রেস্ট -লিটোভস্ক!" তারপর জনতা গুঞ্জন শুরু করত , এবং সেই গুঞ্জন ধীরে ধীরে এক আর্তনাদে পরিণত হতো, যতক্ষণ না বক্তা তাদের বোঝানোর চেষ্টা বন্ধ করতেন। ব্যাপারটা ছিল ইটের দেওয়ালে মাথা ঠোকার মতো। এই লোকেরা শুনত না বা বুঝত না যে ভার্সাই ছিল একটি কেলেঙ্কারি ও কলঙ্ক , এবং এই নির্দেশটি ছিল আমাদের জাতির বিরুদ্ধে দিনের আলোয় ডাকাতির শামিল। মার্ক্সবাদীদের করা ধ্বংসাত্মক কাজ এবং বহিরাগত শত্রুর বিষাক্ত প্রচারণা এই লোকদের বিবেক কেড়ে নিয়েছিল। এবং অভিযোগ করার মতো কিছুই ছিল না। এদিককার অপরাধ ছিল বিশাল। এই ভয়াবহ বিভাজনের অভিযান থামাতে , এর বিরোধিতা করতে, এবং মার্ক্সবাদীদের দেওয়া ব্যাখ্যার চেয়ে পরিস্থিতির আরও ভালো ও সঠিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে সত্যের জ্ঞানের পথ খুলে দিতে জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণি কী করেছিল ? একেবারেই কিছু না। তখন আমি তাদের দেখিনি, যারা এখন এই জাতির মহান প্রেরিতপুরুষ। সম্ভবত তারা নিজেদের ছোট ছোট গোষ্ঠীর চা-চক্রে নির্দিষ্ট কিছু দলের সঙ্গে কথা বলত; কিন্তু যেখানে তাদের থাকার কথা , যেখানে নেকড়েরা সক্রিয় ছিল, সেখানে নেকড়েদের সঙ্গে গর্জন করার সুযোগ না পেলে তারা উপস্থিত হওয়ার ঝুঁকি নিত না।

আমার কথা বলতে গেলে, আমি তখন পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছিলাম যে, আমাদের আন্দোলন গঠনকারী সেই ক্ষুদ্র দলটির জন্য, ঐতিহাসিক সত্যের আলোকে যুদ্ধাপরাধের প্রশ্নটি স্পষ্ট করা অপরিহার্য ছিল । আমাদের আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সাফল্যের মূল শর্ত ছিল জনগণকে শান্তিচুক্তিগুলোর গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করা। জনগণের মতে, শান্তিচুক্তিগুলোর অর্থ ছিল গণতন্ত্রের সাফল্য। সুতরাং, বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করা এবং শান্তিচুক্তিগুলোর শত্রু হিসেবে জনগণের মনে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন ছিল; যাতে পরবর্তীতে, যখন এই জঘন্য প্রতারণার নগ্ন সত্য তার সমস্ত ভয়াবহতা নিয়ে প্রকাশিত হবে, তখন মানুষ মনে রাখে যে...

আমাদের তৎকালীন অবস্থান এবং তারা আমাদের সমর্থন করেছিল।

ইতিমধ্যেই সেই সময়ে আমি সেইসব গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়ে অবস্থান নিয়েছিলাম , যেগুলোতে সামগ্রিকভাবে জনমত ভুল ছিল । আমি জনপ্রিয়তা বা ঘৃণা নির্বিশেষে এই ভ্রান্ত বিশ্বাসগুলোর বিরোধিতা করেছিলাম এবং লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত ছিলাম ।
জাতীয়-

Machine Translated by Google

সমাজতান্ত্রিক জার্মান শ্রমিক দলের কাজ হলো জনমতের নিয়ন্ত্রক হওয়া, কোনো গ্রাম্য কর্মকর্তা নয় । এটি জনগণের সেবা করতে পারে না , বরং তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে হবে।

যেকোনো আন্দোলনে , বিশেষ করে তার সংগ্রাম পর্যায়ে, প্রতিপক্ষের রণকৌশলের সাথে নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার এবং একই স্লোগান ব্যবহার করার একটি স্বাভাবিক প্রলোভন জাগে, যদি সেই কৌশলগুলো মানুষকে উদ্ভট সিদ্ধান্তে উপনীত করতে বা কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে ভুল মনোভাব গ্রহণে উৎসাহিত করতে কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়। এই প্রলোভনটি আরও প্রবল হয় যখন কেউ খুঁজে পায়...
এমন উদ্দেশ্যসমূহ, যা সম্পূর্ণ অলীক হলেও, নবীন আন্দোলনটির কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যগুলোর দিকেই নির্দেশ করে বলে মনে হয় ।
মানুষের কাপুরুষতা আরও সহজে সেই যুক্তিগুলো মেনে নেবে, যা...
তার প্রতিপক্ষের অনুসৃত নিন্দনীয় নীতিমালায় অংশগ্রহণের পক্ষে "তার দৃষ্টিকোণ থেকে" ন্যায্যতার আভাস।

আমি এমন বেশ কয়েকটি ঘটনার সাক্ষী হয়েছি, যখন কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট সাধারণ স্রোতের সাথে আমাদের আন্দোলনকে চলতে বাধা দেওয়ার জন্য সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করতে হয়েছিল। সর্বশেষ এমন ঘটনাটি ঘটেছিল যখন আমাদের জার্মান সংবাদমাধ্যম, জার্মান জাতির অস্তিত্বকেই ক্ষুণ্ন করে, উত্তর টাইরল প্রশ্নটিকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল যা জার্মান জাতির স্বার্থের জন্য গুরুতর হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল । কার স্বার্থ রক্ষা করছে তা বিবেচনা না করেই, বেশ কিছু তথাকথিত "জাতীয়তাবাদী", বিভিন্ন দল ও সমিতি এতে যোগ দিয়েছিল।

সাধারণ চিৎকারে সাড়া দিয়ে, শুধুমাত্র ইহুদিদের দ্বারা উস্কে দেওয়া জনমতের ভয়ে , এবং নির্বোধের মতো সেই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যোগ দিয়েছে , যেটিকে আমাদের জার্মানদের, বিশেষ করে আজকাল, এই উন্মাদ পৃথিবীতে একমাত্র আলোর রশ্মি বলে মনে করা উচিত । যখন আন্তর্জাতিক ইহুদিবাদ ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে আমাদের শ্বাসরোধ করছে, তখন আমাদের তথাকথিত দেশপ্রেমিকরা এমন একজন ব্যক্তি এবং একটি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চিৎকার করছে, যারা বিশ্বের অন্তত একটি অংশে জুডিও-ম্যাসনারির শৃঙ্খল থেকে নিজেদের মুক্ত করার সাহস দেখিয়েছিল এবং এই আন্তর্জাতিক বিষের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিরোধের শক্তি তৈরি করেছিল। কিন্তু দুর্বল চরিত্রের মানুষেরা বাতাসের সাথে ভেসে যাওয়ার এবং জনমতের চিৎকারে আত্মসমর্পণ করার প্রলোভনে বশীভূত হয়। কারণ এটি সত্যিই ছিল আত্মসমর্পণ।

তারা মিথ্যায় এতটাই অভ্যস্ত এবং নৈতিকভাবে এতটাই নীচ যে , তারা তা নিজেদের কাছেও স্বীকার করবে না , কিন্তু সত্যটা হলো এটা কেবলই কাপুরুষতা এবং জনমতের ভয়।
ইহুদিদের কারণে সৃষ্ট জনরোষ কিছু লোককে এই হট্টগোলে যোগ দিতে প্ররোচিত করেছিল।
নিজেদের অপরাধ সম্পর্কে সচেতন দোষী পক্ষগুলোর দেওয়া অন্য সব ব্যাখ্যাই ছিল নিতান্তই করুণ অজুহাত।

সুতরাং, জাহাজটিকে পাথরের দিকে এগিয়ে যাওয়া থেকে আটকাতে হাল শক্ত করে ধরা প্রয়োজন ছিল । অবশ্যই, সেই সময়ে এমন গতিপথ পরিবর্তনের চেষ্টা কোনো জনপ্রিয় কৌশল ছিল না, কারণ জনমতের সমস্ত প্রধান শক্তি সক্রিয় ছিল এবং জনঅনুভূতির প্রবল শিখা কেবল এক দিকেই আলো ফেলছিল। এই ধরনের সিদ্ধান্ত যিনি নেওয়ার সাহস করেন, তাঁর জন্য প্রায় সবসময়ই অসম্মান বয়ে আনে । ইতিহাস জুড়ে এমন অনেকেই আছেন যাঁরা এমন কিছু করার জন্য পাথর ছোড়ার শিকার হয়েছেন, যার জন্য উত্তরসূরিরা তাঁদেরকে নতজানু হয়ে ধন্যবাদ জানিয়েছে।

কিন্তু একটি আন্দোলনকে ভবিষ্যতের ওপর নির্ভর করতে হবে, আন্দোলনের নিজের প্রশংসার ওপর নয়। হতে পারে এমন মুহূর্তে কিছু ব্যক্তিকে কষ্ট সহ্য করতে হবে ; কিন্তু তাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে মুক্তির মুহূর্ত আসবে, এবং যে আন্দোলনের লক্ষ্য বিশ্বকে বদলে দেওয়া, তাকে ভবিষ্যতের সেবা করতে হবে, ক্ষণস্থায়ী মুহূর্তের নয়।

এই পর্যায়ে এ কথা জোর দিয়ে বলা যেতে পারে যে, ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ও দীর্ঘস্থায়ী সাফল্যগুলো সাধারণত সেগুলোই ছিল, যেগুলো শুরুতে সবচেয়ে কম বোঝা গিয়েছিল , কারণ সেগুলো তৎকালীন জনমত, তার দৃষ্টিভঙ্গি এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়েছিল ।

আমাদের প্রথম জনসমক্ষে উপস্থিতির সময় আমরা এই অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম । সত্যটা হলো...
বলা বাহুল্য, আমরা দর্শকদের মন জয় করতে পারিনি , কিন্তু এক উন্মত্ত আক্রমণের সৃষ্টি করেছিলাম ।
সেই দিনগুলোতে, আমি প্রায় সবসময়ই এমন একদল লোকের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতাম, যারা আমি যা বলতে চাইতাম তার ঠিক বিপরীত বিশ্বাস করত এবং আমি যা বিশ্বাস করতাম, তার ঠিক বিপরীতটাই চাইত । আমাকে কয়েক ঘণ্টা ধরে দুই-তিন হাজার মানুষকে তাদের আগের ধারণা ত্যাগ করতে রাজি করাতে হতো; সেই ধারণাগুলোর ভিত্তি এক এক করে ভেঙে দিয়ে, এবং অবশেষে তাদেরকে আমাদের নিজেদের বিশ্বাস ও বিশ্বদৃষ্টির ভূমিতে ফিরিয়ে আনতে হতো ।

Machine Translated by Google

তখন আমি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিখেছিলাম : শত্রুর পাল্টা অস্ত্র তার হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া। আমি দ্রুতই লক্ষ্য করলাম যে আমাদের প্রতিপক্ষরা, বিশেষ করে যারা আলোচনা পরিচালনা করছিল, তাদের কাছে একগুচ্ছ নির্দিষ্ট যুক্তি ছিল, যেখান থেকে তারা আমাদের দাবির বিরুদ্ধে বারবার আপত্তি তুলত। এই পদ্ধতির অভিন্নতা একটি সুসংবদ্ধ ও সমন্বিত প্রশিক্ষণের ইঙ্গিত দিচ্ছিল। এভাবেই আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে শত্রুপক্ষের প্রচারকরা কী অবিশ্বাস্য উপায়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল, এবং আজ আমি গর্বিত যে আমি শুধু এই প্রচারণাকে অকার্যকর করার উপায়ই আবিষ্কার করিনি , বরং এর নির্মাতাদের তাদের নিজেদের সম্পদ দিয়েই পরাজিত করেছি। দুই বছর পর, আমি এই শিল্পে একজন ওস্তাদ হয়ে উঠেছিলাম।

আমার প্রতিটি বক্তৃতায়, আলোচনায় সম্ভাব্য কী ধরনের ও কী বিষয়বস্তুভিত্তিক পাল্টা যুক্তি আসতে পারে, তা আগে থেকেই বিবেচনা করা জরুরি ছিল , যাতে বক্তৃতা চলাকালীন সেগুলোর জবাব দেওয়া ও খণ্ডন করা যায় । এ উদ্দেশ্যে, সমস্ত সম্ভাব্য আপত্তির কথা উল্লেখ করা এবং সেগুলোর অসংগতি তুলে ধরা প্রয়োজন ছিল; যে যুক্তিগুলো তাদের মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল, সেগুলো স্মৃতি থেকে মুছে দিলে সমর্থক জোগাড় করা সহজ হতো , তাই আমরা তাদের পাল্টা যুক্তিগুলো আগে থেকেই অনুমান করে নিতাম । তারা যা জেনেছিল , তা উল্লেখ করার সুযোগ পাওয়ার আগেই খণ্ডন করা হতো , এবং এর ফলে তারা আমার কথা আরও মনোযোগ দিয়ে শুনত।

তাই, আমার রেজিমেন্টে রাজনৈতিক প্রশিক্ষক থাকাকালীন সৈন্যদের উদ্দেশ্যে ভার্সাই চুক্তি বিষয়ে আমার প্রথম বক্তৃতা দেওয়ার পর, আমি শিরোনাম ও বিষয় পরিবর্তন করে দিই এবং তখন থেকে " ব্রেস্ট -লিটোভস্ক ও ভার্সাই শান্তি চুক্তি" নিয়ে কথা বলতে শুরু করি । আমার প্রথম বক্তৃতার পরবর্তী আলোচনা থেকে আমি দ্রুতই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, প্রকৃতপক্ষে , মানুষ ব্রেস্ট -লিটোভস্ক চুক্তি সম্পর্কে কিছুই জানত না এবং দলীয় প্রচারণা এই চুক্তিটিকে বিশ্ব ইতিহাসের অন্যতম কলঙ্কজনক সহিংস কর্মকাণ্ড হিসেবে উপস্থাপন করতে সফল হয়েছিল।

জনসাধারণের কাছে এই মিথ্যাটি বারবার ও জেদের সাথে পুনরাবৃত্তি করার ফলে , লক্ষ লক্ষ জার্মান ভার্সাই চুক্তিকে ব্রেস্ট -লিটোভস্কে আমাদের করা অপরাধের নিছক একটি শাস্তি হিসেবে দেখেছিল । তাই, তারা ভার্সাইয়ের যেকোনো বিরোধিতাকে অন্যায় বলে মনে করত এবং অনেক ক্ষেত্রে, এই ধরনের আচরণের প্রতি একটি প্রকৃত নৈতিক বিতৃষ্ণা ছিল । এই কারণেই জার্মানিতে "ক্ষতিপূরণ" নামক নির্লজ্জ ও ভয়ংকর শব্দটি সাধারণ ব্যবহারে চলে আসে। আমাদের লক্ষ লক্ষ হতাশ দেশবাসীর কাছে এই ভণ্ডামিপূর্ণ মিথ্যাটি এক উচ্চতর ন্যায়বিচারের পরিপূর্ণতা বলে মনে হয়েছিল।

এটা একটা ভয়ংকর চিন্তা, কিন্তু এটাই ছিল সত্যি। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ ছিল প্রচারণা।
আমি ব্রেস্ট -লিটোভস্ক চুক্তি ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে ভার্সাইয়ের বিরুদ্ধে আমার প্রচারণা শুরু করেছিলাম । আমি চুক্তি দুটিকে দফায় দফায় তুলনা করে দেখিয়েছিলাম যে , অন্যটির অমানবিক বর্বরতার বিপরীতে একটি কতটা সত্যিকারের মানবিক ছিল । এর প্রভাব ছিল বিস্ময়কর। যখন আমি দুই হাজার লোকের সমাবেশে এ বিষয়ে কথা বলতাম , আমি প্রায়শই দেখতাম তিন হাজার ছয়শ' বিদ্বেষপূর্ণ চোখ আমার দিকে স্থির হয়ে আছে। এবং তিন ঘণ্টা পরে, আমার সামনে ন্যায়সঙ্গত ক্ষোভ ও আক্রোশের এক বিশাল ঢেউ আছড়ে পড়ছিল। হাজার হাজার মানুষের হৃদয় ও মন থেকে সেই বিরাট মিথ্যাকে উপড়ে ফেলা হয়েছিল , এবং তার জায়গায় দাঁড়িয়েছিল...

সত্য।
'বিশ্বযুদ্ধের কারণসমূহ ' এবং ' ব্রেস্ট -লিটোভস্ক ও ভার্সাই শান্তিচুক্তিসমূহ' —এই দুটি বক্তৃতাকেই আমি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতাম । তাই, আমি প্রতিবারই সেগুলোকে নতুন অর্থ দিয়ে বহুবার পুনরাবৃত্তি করেছি , যতক্ষণ না অবশেষে সেইসব মানুষের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট ও সর্বসম্মত মতামত প্রতিষ্ঠিত হয় , যাদের মধ্য থেকে আমাদের আন্দোলন তার প্রথম সদস্য সংগ্রহ করেছিল।

তাছাড়া , এই সভাগুলোর সুবাদে আমি ধীরে ধীরে গণসভায় একজন বক্তা হয়ে উঠছিলাম এবং হাজার হাজার মানুষের সমাগম হয় এমন বড় বড় হলঘরে প্রয়োজনীয় আবেগ ও অঙ্গভঙ্গির অনুশীলন লাভ করছিলাম।

আমি যে ছোট ছোট গোষ্ঠীগুলোর কথা উল্লেখ করেছি, সেগুলো ছাড়া সেই সময়ে আমি এমন কোনো দল খুঁজে পাইনি যারা মানুষকে এইভাবে বিষয়গুলো বোঝাতো। আজকের সেইসব দলগুলোর কোনোটিই নয়।

Machine Translated by Google

তিনি এমনভাবে কথা বলেন যেন তিনিই জনমতে পরিবর্তন এনেছেন; অথচ সেই সময়ে তিনি সক্রিয় ছিলেন না। যদি কোনো রাজনৈতিক নেতা নিজেকে জাতীয়তাবাদী বলে দাবি করে এই বিষয়ে আলোচনা শুরু করতেন, তবে তিনি তা কেবল সেইসব মহলেই করতেন যারা মূলত তার বিশ্বাসের সঙ্গে একমত ছিল , এবং প্রধানত তাদের সেই বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করার জন্যই করতেন। কিন্তু তখন সেটার প্রয়োজন ছিল না। প্রয়োজন ছিল প্রচারণার মাধ্যমে জয়ী হওয়া এবং তাদের বোঝানো, যাদের মতামত ও মানসিকতা তাকে বিরোধী শিবিরে ধরে রেখেছিল।

এই প্রচারণায় সহায়তার জন্য আমরা এক পাতার একটি প্রচারপত্র ব্যবহার করেছিলাম।
যখন আমি সৈনিক ছিলাম , তখন ব্রেস্ট -লিটোভস্ক চুক্তির সঙ্গে ভার্সাই চুক্তির তুলনা করে একটি প্রচারপত্র লিখেছিলাম । এই প্রচারপত্রটি ছাপা হয়ে প্রচুর সংখ্যায় বিতরণ করা হয়েছিল। পরে আমি এটি দলের জন্য ব্যবহার করি, এবং ঠিক ততটাই কার্যকরভাবে। আমাদের প্রথম সভাগুলোর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল সব ধরনের প্রচারপত্র ও পুস্তিকায় ঢাকা টেবিল । কিন্তু আমরা প্রধানত মৌখিক কথার ওপরই নির্ভর করতাম । আর সত্যি বলতে, একটি মহান বিপ্লব শুরু করার এটাই একমাত্র উপায় , যা মনস্তাত্ত্বিক নীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে ।

প্রথম খণ্ডে আমি আগেই বলেছি যে, বিশ্বের চেহারা পাল্টে দেওয়া সমস্ত প্রভাবশালী ঘটনা লিখিত শব্দের ওপর ভিত্তি করে নয়, বরং কথিত শব্দের ওপর ভিত্তি করেই ঘটেছিল। সংবাদমাধ্যমে এই বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল, যখন আমাদের চতুর বুর্জোয়া শ্রেণি আমার তত্ত্বের তীব্র বিরোধিতা করেছিল । কিন্তু এই মনোভাবের কারণটি সংশয়বাদীদের হতবাক করে দিয়েছিল। বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা আমার অবস্থানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল, কারণ কথিত শব্দের মাধ্যমে জনসাধারণকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা বা সামর্থ্য তাদের নিজেদেরই ছিল না; কারণ তারা সবসময় একচেটিয়াভাবে লেখকদের সাহায্যের ওপর নির্ভর করে এসেছে এবং জনগণকে জাগিয়ে তোলার জন্য বক্তা হিসেবে কখনো মঞ্চে ওঠেনি । এই পরিস্থিতি এমন এক অবস্থার দিকে নিয়ে যেতে বাধ্য ছিল যা এখন বুর্জোয়া শ্রেণির বৈশিষ্ট্য: জনসাধারণকে প্রভাবিত করার মনস্তাত্ত্বিক প্রবৃত্তির বিলুপ্তি ।

বক্তা যাদেরকে সম্বোধন করছেন তাদের কাছ থেকে ক্রমাগত ইঙ্গিত পান। এটি তাকে তার বক্তৃতার গতিপথ উন্নত করতে সাহায্য করে; তিনি শ্রোতাদের মুখের দিকে তাকিয়েই সবসময় বলতে পারেন যে তারা তাকে কতটা অনুসরণ করছে ও বুঝতে পারছে এবং তার কথাগুলো উদ্দিষ্ট ফল দিচ্ছে কি না । কিন্তু লেখক তার পাঠককে মোটেই চেনেন না। তাই, একেবারে শুরু থেকেই তিনি তার সামনে থাকা কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে সম্বোধন করেন না , বরং তাকে সাধারণভাবেই লিখতে হয়। সুতরাং

মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্মতা এবং নমনীয়তার ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যর্থ হতেই হবে । সাধারণভাবে বলতে গেলে , একজন মহান বক্তা একজন মহান লেখকের বলার চেয়ে ভালো লেখেন , যদি না লেখক ক্রমাগত জনসমক্ষে বক্তৃতা দেওয়ার অনুশীলন করেন। এটাও মনে রাখতে হবে যে জনতা মানসিকভাবে নিষ্ক্রিয়, তারা পুরোনো অভ্যাসের সাথে লেগে থাকে এবং তাদের পূর্ব- ধারণার সাথে দ্বিমত পোষণ করে এমন কিছু পড়তে তারা স্বাভাবিকভাবে আগ্রহী হয় না , যদি না সেই লেখায় জনতা যা খুঁজে পেতে চায় তা থাকে। অতএব , কিছু নির্দিষ্ট লেখা সাধারণত কেবল তারাই পড়েন যারা সেগুলোর সাথে একমত। শুধুমাত্র একটি প্রচারপত্র বা পোস্টারই, তার সংক্ষিপ্ততার কারণে, আবেগ জাগিয়ে তুলতে পারে ।

যাদের মতামত ভিন্ন , তাদের প্রতি ক্ষণিকের আগ্রহ। চলচ্চিত্রসহ সকল রূপে ছবির সম্ভাবনা আরও ভালো। এক্ষেত্রে, বুদ্ধিমত্তার প্রতি বিস্তারিত আবেদনের প্রয়োজন কম। সংক্ষিপ্ত লেখাই যথেষ্ট, কারণ দীর্ঘ বিবরণ পড়ার চেয়ে অনেকেই একটি চিত্ররূপী উপস্থাপনা গ্রহণ করতে অনেক বেশি প্রস্তুত । অনেক কম সময়ে, বলা যেতে পারে চোখের পলকে, মানুষ এমন কিছুর একটি চিত্ররূপী পুনঃউপস্থাপনা বুঝে ফেলবে , যা অন্যথায় দীর্ঘ ও শ্রমসাধ্য পাঠের প্রয়োজন হতো।

তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, লিখিত বিষয়বস্তুটি শেষ পর্যন্ত কার হাতে পৌঁছাবে তা আগে থেকে জানা যায় না , তাই বিষয়টি উপস্থাপনের ধরণ একই থাকা আবশ্যক। সাধারণত, উপস্থাপনার ধরণ যখন পাঠকের বুদ্ধিবৃত্তিক স্তর ও স্বভাবের সাথে মেলে, তখন এর প্রভাব বেশি হয়। সুতরাং, সাধারণ মানুষের জন্য লেখা একটি বইকে শুরু থেকেই বুদ্ধিজীবীদের জন্য লেখা বই থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন শৈলী এবং ভাবনার স্তরের মাধ্যমে প্রভাব সৃষ্টি করতে হবে।

কেবল এই অভিযোজন ক্ষমতার মাধ্যমেই লিখিত শব্দের শক্তি মৌখিক বক্তৃতার কাছাকাছি পৌঁছায় । একজন বক্তা একটি বইয়ের মতো একই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারেন ; কিন্তু যদি তাঁর মধ্যে একজন মহান ও জনপ্রিয় বক্তার প্রতিভা থাকে, তবে তিনি একই যুক্তি বা একই কথার পুনরাবৃত্তি করবেন না।

Machine Translated by Google

তিনি পরপর দুবার একই বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন। তিনি সবসময় এমনভাবে কথা বলবেন যে, শ্রোতাদের জীবন্ত আবেগ থেকে সঠিক শব্দটি বের করে নিতে পারবেন , যা সরাসরি তাদের হৃদয়ে গিয়ে লাগবে। যদি তিনি সামান্য ভুলও করেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে তা শুধরে নিতে পারেন। যেমনটা আমি বলেছি, তিনি তার শ্রোতাদের মুখের অভিব্যক্তি পড়তে পারেন—প্রথমত , তারা তার কথা বুঝতে পারছে কি না; দ্বিতীয়ত, তারা তার যুক্তি গ্রহণ করছে কি না ; এবং তৃতীয়ত, তারা তা থেকে কতটা দূরে আছে।

তিনি যা উপস্থাপন করেন, তার বৈধতা সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত থাকেন। প্রথমত, যদি তিনি দেখেন যে তাঁর শ্রোতারা তাঁকে বুঝতে পারছেন না , তবে তিনি তাঁর ব্যাখ্যাগুলোকে এতটাই সহজ ও স্পষ্ট করে দেবেন যে, সবচেয়ে দুর্বল ব্যক্তিটিও তা বুঝতে পারবে। দ্বিতীয়ত, যদি তিনি অনুভব করেন যে তারা তাঁকে অনুসরণ করতে পারছে না , তবে তিনি ধীরে ধীরে ও শান্তভাবে একের পর এক ধারণা ব্যাখ্যা করতে থাকবেন, যতক্ষণ না সবচেয়ে কম বুদ্ধি সম্পন্ন শ্রোতাটিও তা বুঝতে পারে। তৃতীয়ত, যখনই তিনি অনুভব করেন যে তাঁর যুক্তি উপস্থাপনের পদ্ধতির বৈধতা সম্পর্কে তারা নিশ্চিত নয় , তখন তিনি বারবার সেগুলো পুনরাবৃত্তি করবেন, সর্বদা নতুন নতুন উদাহরণ দেবেন, এবং তিনি নিজেই তাদের অব্যক্ত আপত্তিগুলো ব্যাখ্যা করে দেবেন।

তিনি এই আপত্তিগুলো বারবার উত্থাপন করবেন, সেগুলোর মোকাবিলা করবেন ও খণ্ডন করবেন , যতক্ষণ না অবশেষে বিরোধীদের শেষ দলটি তাদের আচরণের মাধ্যমে তাঁকে দেখিয়ে দেয় যে, তারা তাঁর উপস্থাপনার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

প্রায়শই , বদ্ধমূল কুসংস্কারগুলো মূলত অচেতন এবং যুক্তির চেয়ে অনুভূতির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। ভ্রান্ত বা অনুপযুক্ত জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা মতামত সংশোধন করার চেয়ে সহজাত বিতৃষ্ণা, আবেগজনিত ঘৃণা এবং আগাম বিরোধিতার বাধা অতিক্রম করা হাজার গুণ বেশি কঠিন। ভ্রান্ত ধারণা এবং অজ্ঞতাকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জয় করা যায় , কিন্তু আবেগজনিত প্রতিরোধকে নয়। এক্ষেত্রে, কেবল এই লুকানো শক্তিগুলোর প্রতি আবেদনই সাহায্য করতে পারে। আর এই আবেদন কোনো লেখক কখনোই করতে পারেন না। কেবল একজন বক্তাই তা করতে পারেন।

এর একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ হলো এই যে, যদিও আমাদের একটি বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যম ছিল যা অনেক ক্ষেত্রে সুলিখিত এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে প্রচারিত হতো , তা ব্যাপক জনসাধারণকে বুর্জোয়াদের অদম্য শত্রুতে পরিণত হওয়া থেকে আটকাতে পারেনি। বুদ্ধিজীবী মহল কর্তৃক প্রতি বছর প্রকাশিত সংবাদপত্র ও বইয়ের স্রোত নিম্নবর্গের লক্ষ লক্ষ মানুষের উপর কাঁচের উপর জলের মতো বয়ে যেত। এটি প্রমাণ করে যে দুটি বিষয়ের মধ্যে একটি অবশ্যই সত্য: হয় বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যম যা পরিবেশন করত তা মূল্যহীন ছিল, অথবা শুধুমাত্র লিখিত শব্দের মাধ্যমে ব্যাপক জনসাধারণের হৃদয়ে পৌঁছানো অসম্ভব। অবশ্যই, দ্বিতীয়টি আরও বেশি সত্য যদি লিখিত শব্দ এই ক্ষেত্রে যেমনটা করেছিল, তেমন সামান্য মনস্তাত্ত্বিক প্রবৃত্তি প্রদর্শন করে।

এখানে এই বলে আপত্তি করার কোনো মানে হয় না , যেমনটা জাতীয়তাবাদী প্রবণতাসম্পন্ন বার্লিনের কিছু বড় সংবাদপত্র করার চেষ্টা করেছে, যে এই বক্তব্যটি এই সত্য দ্বারাই খণ্ডন করা হয় যে মার্ক্সবাদীরা তাদের সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছিল লিখিত শব্দের মাধ্যমে, বিশেষ করে তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লেখাগুলোর মাধ্যমে।
কার্ল মার্ক্স কর্তৃক প্রকাশিত একটি বই। এর চেয়ে অগভীর যুক্তি খুব কমই একটি ভ্রান্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েছে। জনগণের ওপর মার্ক্সবাদীদের অসাধারণ প্রভাব ইহুদি ভাবধারা থেকে উদ্ভূত লিখিত রচনার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি, বরং দশ বছর ধরে জনগণের মধ্যে পরিচালিত এক বিশাল মৌখিক প্রচারণার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। এক লক্ষ জার্মান শ্রমিকের মধ্যে, বড়জোর একশ জন মার্ক্সের বইটি সম্পর্কে জানে। নিম্নবর্গের আন্দোলনের সাধারণ সমর্থকদের চেয়ে বুদ্ধিজীবী মহল, বিশেষ করে ইহুদিরা, বইটি অনেক বেশি অধ্যয়ন করত। এই কাজটি জনগণের জন্য লেখা হয়নি, বরং শুধুমাত্র বিশ্বজয়ের ইহুদি যন্ত্রের বুদ্ধিজীবী নেতাদের জন্য লেখা হয়েছিল। এর কলকাঠি নাড়ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু: সংবাদপত্র। বুর্জোয়া সংবাদপত্র এবং মার্ক্সবাদী সংবাদপত্রের মধ্যে পার্থক্য হলো এই যে, মার্ক্সবাদী সংবাদপত্র লেখে আন্দোলনকারীরা, আর বুর্জোয়া সংবাদপত্র তার আন্দোলন চালাতে চায় পেশাদার লেখকদের মাধ্যমে। সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক সাংবাদিক, যিনি প্রায় সবসময়ই সভা থেকে সংবাদপত্রের অফিসে ফিরতেন, তিনি তার কাজকে হাতের মুঠোয় অনুভব করতেন। কিন্তু বুর্জোয়া লেখক, যিনি তাঁর লেখনী ছেড়ে জনতার মাঝে উপস্থিত হয়েছিলেন, ভিড়ের দুর্গন্ধে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়লেন এবং তাঁর লেখা সবই নিষ্ফল হয়ে গেল।

লক্ষ লক্ষ শ্রমিক মার্ক্সবাদী আদর্শকে সমর্থন করেছিল মার্ক্সবাদী লেখকদের কর্তৃত্বপূর্ণ লেখনীর কারণে নয়, বরং হাজার হাজার অক্লান্ত আন্দোলনকারীর ব্যাপক প্রচার কাজের কারণে। অধিকন্তু , লক্ষ লক্ষ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল যেখানে—

Machine Translated by Google

ধোঁয়াটে পানশালায় টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে তাদের বক্তারা জনগণের মাথায় নিজেদের ধারণাগুলো গেঁথে দিত, এবং এর মাধ্যমে তারা যে মানব উপাদান নিয়ে কাজ করত, সে সম্পর্কে প্রশংসনীয় মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন করত। এইভাবে, তারা জনমতের দুর্গে আঘাত হানার জন্য সেরা অস্ত্রগুলো বেছে নিতে পারত। এই সবকিছুর পাশাপাশি, বিশাল গণ-সমাবেশ ও মিছিল হতো, যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ অংশগ্রহণ করত। এই সবকিছুর উদ্দেশ্য ছিল সংকীর্ণমনা ব্যক্তিদের মনে এই গর্বিত বিশ্বাস জাগিয়ে তোলা যে, যদিও তারা ক্ষুদ্র কীট মাত্র, তবুও তারা...

কিন্তু একই সাথে এগুলো সেই মহাদানবেরও কোষ, যা একদিন তার অগ্নি দ্বারা বুর্জোয়াদের ঘৃণিত জগতকে ধ্বংস করবে এবং সর্বহারার একনায়কতন্ত্র চূড়ান্ত বিজয় লাভ করবে।

এই ধরনের প্রচারণা মানুষকে এমনভাবে প্রভাবিত করেছিল যে তা তাদেরকে সামাজিক গণতান্ত্রিক সংবাদপত্র পড়তে উৎসাহিত করত এবং এর শিক্ষার জন্য তাদের মনকে প্রস্তুত করত। এই সংবাদপত্রটি আবার লিখিত শব্দের চেয়ে কথ্য শব্দের বাহন ছিল। যেখানে বুর্জোয়া অধ্যাপক, শিক্ষিত লেখক এবং তাত্ত্বিকরা কথা বলার চেষ্টা করতেন, সেখানে মার্ক্সবাদী শিবিরে প্রকৃত বক্তারা লেখার চেষ্টা করতেন। আর এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন সেই ইহুদি । তাঁর প্রখর তর্কশাস্ত্রীয় দক্ষতা এবং নিজের স্বার্থে সত্যকে বিকৃত করার প্রতিভার কারণে তিনি একজন কার্যকর লেখক ছিলেন, কিন্তু বাস্তবে তাঁর ব্রত ছিল একজন বিপ্লবী বক্তা হওয়া।

এই কারণে বুর্জোয়া সাংবাদিকদের জগৎ , এই সত্যটি ছাড়াও যে এখানেও একজন ইহুদির হাতে চাবুক ছিল এবং এই কারণে এই সংবাদমাধ্যম ব্যাপক জনসাধারণকে শিক্ষিত করতে আগ্রহী ছিল না, দেশের ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত মতামতের উপর সামান্যতম প্রভাব ফেলতেও অক্ষম ছিল।

আবেগগত কুসংস্কার, মনস্তাত্ত্বিক মনোভাব, অনুভূতি ইত্যাদি দূর করে সেগুলোর জায়গায় অন্য কিছু স্থাপন করা কঠিন । এক্ষেত্রে সাফল্য এমন সব পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে, যা আগে থেকে অনুমান করা কঠিন।
কেবলমাত্র সবচেয়ে সংবেদনশীল বক্তাই এই সবকিছু মূল্যায়ন করতে পারেন । এমনকি বক্তৃতাটি দিনের কোন সময়ে দেওয়া হচ্ছে, তারও এর প্রভাবের উপর একটি উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে। একই বক্তা একই বিষয়ে একই বক্তৃতা দিলে, সেটি সকাল দশটায় , বিকেল তিনটেয়, বা সন্ধ্যায় দেওয়া হলে তার প্রভাব খুব ভিন্ন হবে। আমি যখন প্রথম জনসমক্ষে বক্তৃতা দেওয়ার সাথে যুক্ত হই , তখন আমি সকালে সভা আয়োজন করতাম, এবং আমার বিশেষভাবে মনে আছে মিউনিখের কিন্ডল কেলারে অনুষ্ঠিত একটি বিক্ষোভের কথা , যার শিরোনাম ছিল "জার্মান জেলাগুলির নিপীড়নের বিরুদ্ধে"। সে সময় এটি ছিল মিউনিখের সবচেয়ে বড় হল, এবং আমাদের এই উদ্যোগের দুঃসাহস ছিল অসাধারণ। আমাদের আন্দোলনের সকল সদস্য এবং অন্য যারা আসতে পারেন তাদের কাছে সভার সময়টিকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য, আমি রবিবার সকাল দশটায় এটি নির্ধারণ করেছিলাম। এর প্রভাব ছিল হতাশাজনক, কিন্তু এটি খুব শিক্ষণীয়ও ছিল। হলটি কানায় কানায় পূর্ণ ছিল। প্রভাবটি ছিল গভীর, কিন্তু সামগ্রিক অনুভূতি ছিল বরফের মতো শীতল। কেউই যেন উষ্ণ হচ্ছিল না, এবং আমি, একজন বক্তা হিসেবে, গভীরভাবে অসুখী বোধ করছিলাম কারণ আমি আমার শ্রোতাদের সাথে সামান্যতম সংযোগও স্থাপন করতে পারিনি । আমার মনে হয় না আমি আগের চেয়ে খারাপ কিছু বলেছিলাম, কিন্তু এর প্রভাবটা পুরোপুরি নেতিবাচক বলেই মনে হলো । আমি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।

খুবই অসন্তুষ্ট ছিলাম, কিন্তু এও মনে হয়েছিল যে আমি একটি নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি । পরে আমি একই পরীক্ষাটি আবার করেছিলাম, কিন্তু ফলাফল সবসময় একই আসত।

অবাক হওয়ার কোনো কারণ ছিল না । যদি কেউ থিয়েটারে দুপুরের শো দেখতে যায় এবং তারপর একই নাটকের সন্ধ্যার শো দেখতে যায়, তবে সৃষ্ট অনুভূতির পার্থক্যে সে অবাক হবে । একজন সংবেদনশীল ব্যক্তি এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারবে যে, দুপুরের এবং সন্ধ্যার শো দুটির কারণে সৃষ্ট মানসিক অবস্থা ভিন্ন । সিনেমার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য । এই দ্বিতীয় বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ; থিয়েটারের ক্ষেত্রে বলা যায় যে

হয়তো একজন অভিনেতা বিকেলে যতটা পরিশ্রম করেন, সন্ধ্যায় ততটা করেন না। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই বলতে পারবেন না যে, বিকেলবেলা আর সন্ধ্যা নয়টায় সিনেমা ভিন্ন। না, এখানে সময় এক ভিন্ন আবহ তৈরি করে, ঠিক যেমন ঘর মানুষের মনে ভিন্ন ভিন্ন ছাপ ফেলে। এমন কিছু ঘর আছে যা কোনো ছাপই ফেলে না, যার কারণ ব্যাখ্যা করা কঠিন।

এমন কিছু জায়গা আছে যেখানে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা অসম্ভব । তাছাড়া , মানুষের মনে প্রতিচ্ছবি হয়ে থাকা কিছু স্মৃতি ও ঐতিহ্য নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে ।

Machine Translated by Google

প্রাপ্ত অনুভূতির উপর প্রভাব। বায়রয়েথে পার্সিফালের একটি পরিবেশনা বিশ্বের অন্য কোনো অংশে একই অপেরার পরিবেশনার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রভাব ফেলবে।

এই সমস্ত ক্ষেত্রে, আমরা একজন ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছাকে প্রভাবিত করার সমস্যা নিয়ে কাজ করছি। এটি বিশেষত সভা-সমাবেশে গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে জনগণের ইচ্ছা বক্তার বিরোধিতা করে এবং তাদের একটি নতুন চিন্তাধারা গ্রহণ করতে হয়। সকালে এবং দিনের বেলায়, মানুষের ইচ্ছাশক্তি অন্যের প্রভাব বিস্তারের যেকোনো প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সবচেয়ে প্রবলভাবে বিদ্রোহ করে বলে মনে হয়। অন্যদিকে, সন্ধ্যায়, এটি সহজেই একটি শক্তিশালী ইচ্ছার আধিপত্যের কাছে নতি স্বীকার করে। কারণ এই ধরনের সভাগুলো, বাস্তবে, দুটি বিরোধী শক্তির মধ্যে একটি প্রতিযোগিতা।

একজন মানুষের স্বতন্ত্র বাগ্মিতা নতুন চিন্তাধারা প্রবর্তনে তাদের চেয়ে বেশি কার্যকর হবে, যারা নিজেদের ইচ্ছাশক্তি ও বৌদ্ধিক শক্তির পূর্ণ অধিকারী এবং স্বভাবতই তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ার ঝুঁকিতে থাকে।

ক্যাথলিক গির্জাগুলোর রহস্যময় কৃত্রিম গোধূলিও এই উদ্দেশ্য পূরণ করে, যেখানে মোমবাতি, ধূপ ইত্যাদি জ্বালানো হয়।

বক্তা ও তার প্রতিপক্ষকে নিজ পক্ষে রাজি করানোর এই দ্বন্দ্বে, প্রচারণার মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব সম্পর্কে এই বিস্ময়কর সংবেদনশীলতা একজন লেখক প্রায় কখনোই অর্জন করতে পারেন না। সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন লেখকের কাজের প্রভাব আগে থেকে বিদ্যমান কোনো মানসিকতার ভিত্তিকে সংরক্ষণ, শক্তিশালী এবং গভীর করতে সাহায্য করে। সমস্ত মহান ঐতিহাসিক বিপ্লব লিখিত শব্দের কাজ ছিল না। বড়জোর, এটি সেগুলোর সহায়ক ছিল।

এটা ভাবা অযৌক্তিক যে, ফরাসি বিপ্লব দার্শনিক তত্ত্বের সাহায্যে সংঘটিত হতে পারত, যদি না তারা জাঁকজমকপূর্ণভাবে জননেতাদের নেতৃত্বে একদল আন্দোলনকারী বাহিনী খুঁজে পেত। এই জননেতারা জনগণের সেইসব অনুভূতিকে আরও উস্কে দিয়েছিল যা আগে থেকেই প্রজ্বলিত হচ্ছিল, অবশেষে এক আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত পুরো ইউরোপকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। সম্প্রতি রাশিয়ায় সংঘটিত বিশাল বলশেভিক বিপ্লবের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছিল। এটি লেনিনের লিখিত রচনার কারণে ঘটেনি, বরং যারা এই মতবাদ প্রচার করেছিল তাদের বাগ্মিতার কারণে ঘটেছিল।

এই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী অসংখ্য ছোট-বড় বক্তাদের প্রতি ঘৃণা ও ধন্যবাদ।

নিরক্ষর রুশ জনগণের মধ্যে বিপ্লবী উদ্দীপনা কার্ল মার্ক্সের তত্ত্ব পাঠের মাধ্যমে প্রজ্বলিত হয়নি, বরং সেই আদর্শের সেবায় নিয়োজিত হাজার হাজার আন্দোলনকারীর দ্বারা জনগণকে দেওয়া স্বর্গীয় প্রতিশ্রুতির মাধ্যমেই তা প্রজ্বলিত হয়েছিল।

সবসময় এমনই ছিল এবং সবসময় এমনই থাকবে।

আমাদের সেইসব একগুঁয়ে বুদ্ধিজীবীদের এটা একটা সাধারণ স্বভাব, যারা বাস্তব জগৎ থেকে এতটাই বিচ্ছিন্ন যে তারা মনে করেন লেখক নিশ্চয়ই বক্তার চেয়ে বুদ্ধিমত্তায় শ্রেষ্ঠ। এই দৃষ্টিভঙ্গিটি একবার একটি জাতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি সমালোচনার মাধ্যমে নিখুঁতভাবে চিত্রিত হয়েছিল, যার কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি, যেখানে বলা হয়েছিল যে একজন প্রখ্যাত বক্তার মুদ্রিত বক্তৃতা পড়ার সময় প্রায়শই হতাশ হতে হয়। এটি আমাকে যুদ্ধের সময় আমার হাতে আসা আরেকটি প্রবন্ধের কথা মনে করিয়ে দেয়। এটি তৎকালীন যুদ্ধাস্ত্র মন্ত্রী লয়েড জর্জের বক্তৃতা নিয়ে লেখা হয়েছিল এবং সমালোচনামূলক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে রেখে সেগুলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। লেখক চমৎকারভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে এই বক্তৃতাগুলো নিম্নমানের বুদ্ধিমত্তা ও শিক্ষার পরিচায়ক এবং উপরন্তু, সেগুলো ছিল মামুলি ও গতানুগতিক। আমি একটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত এই বক্তৃতাগুলোর একটি অনুলিপি সংগ্রহ করেছিলাম এবং এই ভেবে হাসতে বাধ্য হয়েছিলাম যে গড়পড়তা জার্মান কলমবাজরা গণপ্রভাব সৃষ্টিকারী এই মনস্তাত্ত্বিক শ্রেষ্ঠ রচনাগুলো বুঝতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। এই লোকটি শুধুমাত্র তার ক্লান্ত মনের উপর পড়া ছাপের জন্যই এই বক্তৃতাগুলোর সমালোচনা করেছিলেন, অথচ সেই মহান ব্রিটিশ জননেতা তার শ্রোতাদের উপর এবং ফলস্বরূপ, সমগ্র ব্রিটিশ জনগণের উপর এক শক্তিশালী প্রভাব ফেলেছিলেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, এই ইংরেজের বক্তৃতাগুলো ছিল অলৌকিক কীর্তি, কারণ সেগুলো জাতির ব্যাপক জনগোষ্ঠীর আত্মার গভীরে এক বিস্ময়কর অন্তর্দৃষ্টি প্রকাশ করেছিল। এই কারণে, সেগুলোর প্রভাব ছিল সত্যিই মর্মভেদী। বেথম্যান-হোলওয়েগের নিষ্ফল তোতলামির সাথে সেগুলোর তুলনা করুন। বাহ্যিকভাবে, তার বক্তৃতাগুলো নিঃসন্দেহে আরও বেশি বুদ্ধিবৃত্তিক ছিল, কিন্তু সেগুলো জনগণের সাথে কথা বলার ক্ষেত্রে তার অক্ষমতা প্রকাশ করেছিল, যা তিনি সত্যিই পারতেন না। তা সত্ত্বেও, একজন জার্মান লেখকের গড়পড়তা, নির্বোধ মনের জন্য, যিনি অবশ্যই শিক্ষায় ধন্য ছিলেন, বক্তৃতাগুলোকে বিচার করাটা ছিল খুবই স্বাভাবিক।

Machine Translated by Google

ইংরেজ মন্ত্রী—যেগুলো জনসাধারণকে প্রভাবিত করার জন্য লেখা হয়েছিল — সেগুলোকে তিনি তাঁর নিজের বিমূর্ত শিক্ষায় অনমনীয় হয়ে যাওয়া মনের ওপর সৃষ্ট ছাপের মাধ্যমে বিচার করতেন। এবং এই ছাপের আলোকে , তাঁর পক্ষে সেগুলোকে জার্মান রাষ্ট্রনায়কের উজ্জ্বল কিন্তু নিষ্ফল বক্তৃতাগুলোর সাথে তুলনা করা আরও স্বাভাবিক ছিল , যেগুলো অবশ্যই লেখকের মনে অনেক বেশি অনুকূল প্রভাব ফেলেছিল। লয়েড জর্জের প্রতিভা যে শুধু বেথম্যান-হোলওয়েগের সমানই ছিল না, বরং হাজার গুণ বেশি ছিল, তা এই ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি তাঁর বক্তৃতার জন্য এমন একটি রূপ ও প্রকাশভঙ্গি খুঁজে পেয়েছিলেন যা তাঁর জাতির হৃদয়কে উন্মুক্ত করেছিল এবং সেই জাতিকে তাঁর ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে পূরণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এই বক্তৃতাগুলোর আদিমতা , প্রকাশের মৌলিকত্ব , সরল ও স্পষ্ট দৃষ্টান্তের নির্বাচন এই ইংরেজের উন্নত রাজনৈতিক দক্ষতার প্রমাণ দেয়। কারণ কোনো রাষ্ট্রনায়কের একটি জাতির উদ্দেশে দেওয়া বক্তৃতাকে কখনোই একজন বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপকের মনে সৃষ্ট ছাপ দিয়ে বিচার করা যায় না , বরং জাতির উপর তার সৃষ্ট প্রভাব দিয়েই বিচার করতে হয়। আর এটাই বাগ্মিতার প্রতিভার একমাত্র মাপকাঠি।

* * *

কয়েক বছর আগে শূন্য থেকে জন্ম নেওয়া এবং আজ আমাদের জাতির সকল অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শত্রুদের দ্বারা নির্যাতিত আমাদের আন্দোলনের এই বিস্ময়কর অগ্রগতির কারণ অবশ্যই এই নীতিগুলির অবিরাম স্বীকৃতি এবং বাস্তব প্রয়োগ।

আমাদের আন্দোলনে লিখিত বিষয়বস্তুও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল ; কিন্তু আমি যে পর্যায়ের কথা লিখছি, সেই সময়ে তা আমাদের প্রতিপক্ষের জনগণকে ধর্মান্তরিত করার চেয়ে, আন্দোলনের উচ্চ ও নিম্ন উভয় স্তরের নেতাদের সমান ও অভিন্নভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজেই বেশি ব্যবহৃত হয়েছিল । খুব বিরল ক্ষেত্রেই কোনো দৃঢ়প্রত্যয়ী ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সমাজতান্ত্রিক বা কমিউনিস্ট আমাদের কোনো পুস্তিকা বা বই পড়ে আমাদের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে পেরেছেন অথবা তাঁর বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা অধ্যয়ন করেছেন। এমনকি কোনো সংবাদপত্রও খুব কমই পড়া হয়, যদি না তাতে দলীয় পরিচয়ের ছাপ থাকে । অধিকন্তু, সংবাদপত্র পড়া খুব একটা সহায়ক নয়; কারণ একটিমাত্র সংখ্যা থেকে প্রাপ্ত সামগ্রিক চিত্র এতটাই অসংলগ্ন এবং এমন একটি খণ্ডিত ধারণা তৈরি করে যে তা সাধারণ পাঠককে সত্যিই প্রভাবিত করে না । আর যদি কাউকে প্রতিটি পয়সা হিসেব করে খরচ করতে হয় , তবে শুধুমাত্র বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের জন্য তার বিরোধী কোনো সংবাদপত্রের নিয়মিত পাঠক হওয়ার আশা করা যায় না ।

তার মতামত। যারা ইতিমধ্যে আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন, তারা নিয়মিতভাবে সেই আন্দোলনের দলীয় মুখপত্র পড়বেন, বিশেষ করে আন্দোলনে কী ঘটছে সে সম্পর্কে অবগত থাকার জন্য।

মৌখিক প্রচারপত্রের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিশেষ করে যদি এটি বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়, তবে বিভিন্ন মানুষ এটি গ্রহণ করবে , এবং এর শিরোনাম যদি সেই সময়ে সবার মুখে মুখে থাকা কোনো বিষয়কে নির্দেশ করে, তবে তারা আরও বেশি আগ্রহের সাথে তা গ্রহণ করবে। সম্ভবত, এই ধরনের একটি প্রচারপত্র পড়ার পর পাঠক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা লাভ করবেন এবং একটি নতুন আন্দোলনের প্রতি মনোযোগ দেবেন। কিন্তু সর্বোত্তম ক্ষেত্রেও, এটি কেবল একটি ক্ষুদ্র প্রেরণা যা কোনো দৃঢ় প্রত্যয় তৈরি করতে পারে না ; কারণ প্রচারপত্রটি কেবল কোনো কিছুর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে এবং তা হতে পারে ...

তা কেবল তখনই কার্যকর হয় , যখন তা পাঠককে এমন এক পরিস্থিতিতে নিয়ে যায় যেখানে তিনি আরও ভালোভাবে অবহিত ও নির্দেশিত হন। এই ধরনের শিক্ষাদান সর্বদা গণসমাবেশে হওয়া আবশ্যক।

গণসভাগুলোও প্রয়োজনীয় , কারণ সেগুলোতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে ব্যক্তি নতুন আন্দোলনে যোগ দিতে চায়, সে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ও ভীত অনুভব করতে শুরু করে।

একা থাকলে সে প্রথমবারের মতো একটি বৃহৎ সম্প্রদায়ের চিত্র দেখতে পায়, যা অধিকাংশ মানুষের উপর শক্তিদায়ক ও উৎসাহব্যঞ্জক প্রভাব ফেলে। একটি কোম্পানি বা ব্যাটালিয়নের অংশ হিসেবে , সহযোদ্ধাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে, সে একা মার্চ করার চেয়ে অনেক হালকা মনে আক্রমণে যাবে । ভিড়ের মধ্যে সে নিজেকে একরকম সুরক্ষিত বোধ করে, যদিও বাস্তবে এই অনুভূতির বিপক্ষে হাজারো কারণ রয়েছে ।

বৃহৎ আকারের গণবিক্ষোভ শুধু ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তিকেই শক্তিশালী করে না , বরং তাকে আন্দোলনের কাছাকাছি নিয়ে আসে এবং এর সংহতি গড়ে তুলতে সাহায্য করে । যে ব্যক্তি তার কারখানা বা কর্মক্ষেত্রে একটি নতুন মতবাদের প্রতিনিধি হিসেবে আবির্ভূত হন, তাকে অবশ্যই বিব্রত বোধ করতে হয় এবং

Machine Translated by Google

তার এই বোধ থেকে আসা শক্তিবৃদ্ধি প্রয়োজন যে সে একটি বৃহত্তর সম্প্রদায়ের সদস্য। আর একমাত্র একটি গণসমাবেশই তাকে তার সম্প্রদায়ের মহত্ত্ব সম্পর্কে উপলব্ধি করাতে পারে । যদি সে কোনো দোকান বা বড় কারখানা ছেড়ে , যেখানে সে নিজেকে খুব ক্ষুদ্র মনে করে, প্রথমবারের মতো কোনো বড় সমাবেশে এসে তার চারপাশে একই মতাদর্শের হাজার হাজার মানুষকে দেখে ; যদি সে তখনও নিজের পথ খুঁজে বেড়ায়, তবে তাকে জোর করে ধরে ফেলা হবে।

তার আশেপাশে থাকা আরও তিন-চার হাজার মানুষের উৎসাহ থেকে উদ্ভূত গণপ্রেরণা ; যদি এর প্রকাশ সফল হয় এবং হাজার হাজার মানুষের সম্মতি নতুন মতবাদটির সত্যতা ও বৈধতাকে নিশ্চিত করে , এবং প্রথমবারের মতো তার পূর্ববর্তী মতামতের সত্যতা নিয়ে তার মনে সন্দেহ জাগে , তবে সে গণপ্রেরণা নামক এই আকর্ষণের কাছে বশীভূত হবে । হাজার হাজার মানুষের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা এবং শক্তি প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যেই নিহিত থাকে ।

যে ব্যক্তি সন্দেহ ও দ্বিধা নিয়ে এমন সভায় আসে, সে সেখান থেকে ভেতর থেকে আরও শক্তিশালী হয়ে বেরিয়ে যায় ; সে সম্প্রদায়ের একজন সদস্য হয়ে ওঠে ।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের এই কথা কখনো ভোলা উচিত নয় এবং সেইসব বুর্জোয়া নির্বোধদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়, যারা মনে করে যে তারা সব জানে।
সবকিছু, কিন্তু তারা নির্বোধের মতো একটি মহান রাষ্ট্রের পাশাপাশি নিজেদের অস্তিত্ব ও আধিপত্যও হারিয়েছিল।
তাদের নিজস্ব শ্রেণী। তাদের সামর্থ্যের প্রাচুর্য রয়েছে; তারা সবকিছু করতে পারে এবং সবকিছু জানে । কিন্তু একটি কাজ তারা করতে জানে না, আর তা হলো জার্মান জাতিকে মার্ক্সবাদের কবলে পড়া থেকে রক্ষা করা । এই ক্ষেত্রে তারা শোচনীয়ভাবে অক্ষম প্রমাণিত হয়েছে । সুতরাং , নিজেদের সম্পর্কে তাদের বর্তমান ধারণা কেবল তাদের ঔদ্ধত্যের সমান । তাদের গর্ব এবং মূর্খতা হলো...

একই গাছের ফল।

আজ যদি এই লোকেরা কথ্য ভাষার গুরুত্বকে খাটো করার চেষ্টা করে , তবে তারা তা-ই করছে
শুধুমাত্র এই কারণে যে, তারা বুঝতে পেরেছিল— ঈশ্বরকে ধন্যবাদ —তাদের কথাবার্তা কতটা নিষ্ফল ছিল।

Machine Translated by Google

অধ্যায় ৭

লাল বাহিনীর সাথে সংঘাত

১৯১৯-২০ সালে, এবং ১৯২১ সালেও, আমি কিছু বুর্জোয়া সভায় যোগ দিয়েছিলাম। শৈশবে বাধ্যতামূলকভাবে ক্যাস্টর অয়েল খাওয়ার ব্যাপারে আমার যেমন অনুভূতি হতো, এই সভাগুলো সম্পর্কেও আমার ঠিক তেমনই অনুভূতি হতো। এটা খেতেই হতো কারণ তা প্রয়োজনীয় ছিল, কিন্তু এর স্বাদ ছিল নিঃসন্দেহে বিশ্রী। যদি জার্মানদের বেঁধে এই বুর্জোয়া সভাগুলোতে জোর করে টেনে নিয়ে যাওয়া যেত , তাদের লোহার শিকের দরজার পেছনে আটকে রাখা যেত এবং সভা শেষ হওয়ার আগে কাউকে পালাতে না দেওয়া যেত , তাহলে হয়তো কয়েক শত বছর পরেও এই পদ্ধতিটি কার্যকর বলে প্রমাণিত হতো। আমার নিজের কথা বলতে গেলে, আমাকে সততার সাথেই স্বীকার করতে হবে যে, এমন পরিস্থিতিতে আমি জীবনকে অর্থহীন মনে করতাম ; এবং আমি নিশ্চিতভাবেই আর জার্মান থাকতে চাইতাম না। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তা অসম্ভব। আর এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, বিবেকবান জনসাধারণ এই "বুর্জোয়া গণসভা" গুলোকে এমনভাবে এড়িয়ে চলে , যেমনভাবে শয়তান পবিত্র জল এড়িয়ে চলে।

আমি বুর্জোয়া বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম , এবং যা দেখেছিলাম তাতে আমি বিস্মিত হইনি। আমি শেখাতাম কারণ আমি জানতাম যে তারা কথ্য কথার প্রতি তেমন মনোযোগ দিত না।
এই সময়ে আমি গণতন্ত্রবাদী, জার্মান জাতীয়তাবাদী, জার্মান পিপলস পার্টি এবং বাভারিয়ান পিপলস পার্টির সভায় যোগ দিয়েছিলাম। শ্রোতাদের অভিন্নতা দেখে আমি সঙ্গে সঙ্গেই অবাক হয়েছিলাম। তারা প্রায় সবসময়ই শুধুমাত্র দলের সদস্যদের নিয়ে গঠিত ছিল। পুরো ব্যাপারটিকে, কোনো বড় ধরনের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাওয়া মানুষের সমাবেশের চেয়ে, তাস খেলতে খেলতে হাই তোলার মতো বেশি মনে হচ্ছিল।
বিপ্লব। বক্তারা এই শান্ত পরিবেশ বজায় রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা কোনো চমকপ্রদ অভিব্যক্তি এড়িয়ে, একটি বুদ্ধিজীবী সংবাদপত্রের নিবন্ধ বা পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধের ঢঙে তাঁদের বক্তৃতা আবৃত্তি করছিলেন, বা বলা ভালো, পড়ছিলেন। এখানে-সেখানে ছিল
অধ্যাপকসুলভ একটি দুর্বল রসিকতা, যার পরে টেবিলে বসে থাকা লোকেরা হাসতে বাধ্য হলো — উচ্চস্বরে নয়, বরং উৎসাহব্যঞ্জকভাবে এবং কিছুটা জাতিগত সংযম নিয়ে।

আর টেবিলে সবসময় এই ধরনের লোকজন থাকত। আমি একবার মিউনিখের ওয়াগনার হলে একটি সভায় গিয়েছিলাম। এটি ছিল লাইপজিগের যুদ্ধের বার্ষিকী উপলক্ষে একটি সমাবেশ। ১৭) বক্তৃতাটি দিচ্ছিলেন, বা বলা ভালো, পড়ছিলেন কোনো এক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক। কমিটি একটি উঁচু মঞ্চে বসেছিল: বাঁদিকে একজনের চোখে মনোকল, ডানদিকে আরেকজনের চোখে মনোকল, এবং মাঝখানে মনোকল ছাড়া একজন ভদ্রলোক। তিনজনই অত্যন্ত যত্নসহকারে মর্নিং কোট পরেছিলেন , এবং আমার এমন অনুভূতি হচ্ছিল যেন আমি এক বিশেষ মুহূর্তে আছি।
মৃত্যুদণ্ড ঘোষণার অপেক্ষায় থাকা কোনো আদালতের সামনে , অথবা কোনো দীক্ষাস্নান বা অন্য কোনো মর্যাদাপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে। তথাকথিত সেই বক্তৃতা, যা ছাপার অক্ষরে পড়াও কঠিন হতো, তার এক মারাত্মক প্রভাব পড়েছিল। পৌনে এক ঘণ্টা পর, শ্রোতারা এক ধরনের সম্মোহনী আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে , যা কেবল হল থেকে কারও বেরিয়ে যাওয়ার শব্দে ভাঙছিল— হয় পরিচারিকাদের খটখটে আওয়াজে , অথবা ঘুমিয়ে পড়া লোকেদের বাড়তে থাকা হাই তোলার শব্দে। আমি তিনজন কর্মীর পেছনে দাঁড়িয়েছিলাম, যারা হয় কৌতূহলবশত উপস্থিত ছিল , অথবা তাদের পক্ষ থেকে সেখানে পাঠানো হয়েছিল। মাঝে মাঝে তারা খোলাখুলি মুখভঙ্গি করে একে অপরের দিকে তাকাচ্ছিল, কাঁধ দিয়ে একে অপরকে খোঁচা দিচ্ছিল, এবং তারপর নিঃশব্দে হল ছেড়ে চলে যাচ্ছিল। অনুষ্ঠানটিতে বাধা দেওয়ার কোনো ইচ্ছাই তাদের ছিল না ; আর তা প্রয়োজনীয়ও ছিল না। অবশেষে, অনুষ্ঠানটি শেষের দিকে এগোতে শুরু করল। অধ্যাপক, যাঁর কণ্ঠস্বর ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছিল, অবশেষে তাঁর বক্তৃতা শেষ করার পর , মনোকলবিহীন ভদ্রলোক সমবেত "জার্মান ভাই ও বোনদের" উদ্দেশে এক উদ্দীপনামূলক বক্তৃতা শুরু করলেন। শ্রোতাদের এবং নিজের পক্ষ থেকে, তিনি অধ্যাপক এক্স-এর দেওয়া চমৎকার বক্তৃতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং জোর দিয়ে বলেন যে অধ্যাপকের কথা সকলকে কতটা গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। যদি বক্তৃতাটি নিয়ে কোনো সাধারণ আলোচনা হয়, তবে তা ধর্মদ্রোহিতার শামিল হবে, তাই তিনি উপস্থিত সকলের মতামত প্রকাশ করে বলেন যে এই ধরনের আলোচনা হওয়া উচিত নয়। অতঃপর তিনি শ্রোতাদের উঠে দাঁড়িয়ে দেশাত্মবোধক গান , " Wir sind ein einig Volk von Brüdern" গাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

'ডয়েচলান্ড উবার আলেস' জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।

Machine Translated by Google

তারপর সবাই গান গাইতে শুরু করল। দ্বিতীয় স্তবকে পৌঁছে আমার মনে হলো যে কণ্ঠের আওয়াজ কমে গেছে, এবং কেবল যখন গানের মূল অংশটি এলো, তখনই তারা আবার মুখ খুলল । তৃতীয় স্তবকে পৌঁছে আমার সন্দেহ সত্যি প্রমাণিত হলো যে, উপস্থিতদের অনেকেই গানের কথাগুলো খুব ভালোভাবে জানত না।

কিন্তু তাতে কী আসে যায়, যখন এমন একটি গান প্রবল আবেগ ও উদ্দীপনার সাথে গাওয়া হয় জার্মান জাতীয়তাবাদীদের সমাবেশ?

এরপর সভা শেষ হয়ে গেল এবং সবাই তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেল, একজন এক পাইন্ট বিয়ারের জন্য, অন্যজন... অন্যরা কফির জন্য, আবার কেউ কেউ শুধু একটু তাজা বাতাসের জন্য।

তাজা বাতাস ! আমারও ঠিক তাই মনে হচ্ছিল। আর এভাবেই কি আমরা সেই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামকে সম্মান জানাবো , যেখানে লক্ষ লক্ষ প্রুশিয়ান ও জার্মান লড়েছিল? জাহান্নামে যাক এসব!

এই ধরনের বিষয়কে সরকার " শান্তিপূর্ণ" সভা হিসেবে বিবেচনা করতে পারত। আইনশৃঙ্খলার দায়িত্বে থাকা মন্ত্রীকে এই ভয় করতে হতো না যে, উৎসাহ হঠাৎ করে জন শালীনতাকে ছাপিয়ে যাবে এবং এই লোকেরা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়বে ; এবং বিয়ার হল বা ক্যাফেতে ছড়িয়ে পড়ার পরিবর্তে, তারা শহরের রাস্তায় চারজন করে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে "জার্মানি সম্মানের সাথে" গান গাইতে গাইতে মিছিল করবে, যা পুলিশ বাহিনীর জন্য কিছুটা অস্বস্তির কারণ হবে, কারণ তাদের বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল।

না। এই ধরনের নাগরিকের কারোরই প্রয়োজন নেই।

* * *

অপরদিকে, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক সভাগুলো মোটেই 'শান্তিপূর্ণ' ছিল না।
দুটি পরস্পরবিরোধী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি একে অপরের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে লড়ছিল, এবং এই বৈঠকগুলো শেষ হয়নি।
একঘেয়ে দেশাত্মবোধক গানের যান্ত্রিক পরিবেশনা , কিন্তু সার্বজনীন জাতীয় অনুভূতির এক উত্তপ্ত বহিঃপ্রকাশ ।

শুরু থেকেই আমাদের সভাগুলোতে কঠোর শৃঙ্খলা প্রবর্তন করা এবং সভাপতির নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন ছিল । আমাদের লক্ষ্য বুর্জোয়া কথাবার্তার চটকদার মিশ্রণ পরিবেশন করা ছিল না ; আমরা যা বলতে চেয়েছিলাম, তার উদ্দেশ্য ছিল আমাদের সভাগুলোতে উপস্থিত বিরোধীদের উত্তেজিত করা ! কতবারই না তারা দলে দলে হাজির হতো, তাদের মধ্যে কয়েকজন উস্কানিদাতাও থাকত , এবং তাদের মুখের ভাব দেখে মনে হতো , তারা আমাদের চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দিতে প্রস্তুত ।

হ্যাঁ, কতবারই না এই লাল পতাকার সমর্থকরা বিপুল সংখ্যায় হাজির হতো , যাদেরকে সবসময় আগে থেকেই নির্দেশ দেওয়া থাকতো সবকিছু চিরতরে উড়িয়ে দিতে এবং এই সভাগুলোর অবসান ঘটাতে ।
একাধিকবার সবকিছু ঝুঁকির মুখে ছিল, এবং কেবল সভাপতির অদম্য সংকল্প ও আমাদের মার্শালদের প্রতি কঠোর আচরণই প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিয়েছিল। আর তাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণও ছিল।

আমাদের পোস্টারের জন্য লাল রঙ বেছে নেওয়াই তাদের আমাদের সভায় আকৃষ্ট করার জন্য যথেষ্ট ছিল । সাধারণ বুর্জোয়ারা এটা দেখে হতবাক হয়েছিল যে আমরাও বলশেভিজমের প্রতীকী লাল রঙ বেছে নিয়েছি এবং এটিকে তারা দ্ব্যর্থক বলে মনে করেছিল । ফিসফিস করে বলা হতো যে জার্মান জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীগুলো মার্ক্সবাদেরই আরেকটি রূপ , সম্ভবত উপযুক্ত ছদ্মবেশে থাকা মার্ক্সবাদী, অথবা আরও ভালো করে বললে, সমাজতন্ত্রী। সমাজতন্ত্র ও মার্ক্সবাদের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য আজও এই লোকদের কাছে এক রহস্য হয়ে আছে। মার্ক্সবাদের অভিযোগটি প্রমাণিত হয়েছিল যখন জানা গেল যে আমাদের সভায় আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে "ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ" শব্দটির পরিবর্তে "স্বদেশবাসী" শব্দটি ব্যবহার করতাম এবং একে অপরকে "কমরেড" বলে সম্বোধন করতাম। আমরা সেই বোকা ও ভীরু বুর্জোয়াদের এবং আমাদের উৎস, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য উদঘাটনের তাদের প্রচেষ্টাকে দেখে অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছিলাম।

বামপন্থীদের বিরক্ত করা, তাদের আগ্রহ জাগানো এবং আমাদের সভায় তাদের আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে—শুধুমাত্র তাদের মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য—যাতে আমরা তাদের সাথে কথা বলার সুযোগ পাই, আমরা অত্যন্ত সতর্ক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবেচনার পর আমাদের পোস্টারের জন্য লাল রঙ বেছে নিয়েছিলাম ।

Machine Translated by Google

এই বছরগুলোতে ক্রমাগত পরিবর্তনশীল বিষয়গুলো অনুসরণ করা এক দারুণ অভিজ্ঞতা ছিল। আমাদের হতবাক ও ক্ষমতাহীন প্রতিপক্ষের কৌশল। প্রথমত, তারা তাদের অনুসারীদের কাছে আবেদন করেছিল আমাদের উপেক্ষা করতে এবং আমাদের সভা থেকে দূরে থাকতে। সাধারণত, এই আবেদনে কর্ণপাতও হয়েছিল। কিন্তু সময় গড়ানোর সাথে সাথে, তাদের আরও বেশি সংখ্যক অনুসারী ধীরে ধীরে আমাদের কাছে আসতে শুরু করে এবং আমাদের মতবাদ গ্রহণ করে। তখন নেতারা উদ্বিগ্ন ও অস্থির হয়ে পড়েন। তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এই ধরনের ঘটনা চিরকাল উপেক্ষা করা যায় না এবং সন্ত্রাসের মাধ্যমে এগুলোকে থামাতে হবে।

তারপর তারা 'শ্রেণী-সচেতন সর্বহারাদের' প্রতি আহ্বান জানালো যেন তারা দলে দলে আমাদের সভায় যোগ দেয় এবং 'রাজতন্ত্রবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনের' প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে সর্বহারার মুষ্টিবদ্ধ হাত দিয়ে ধর্মঘট করে।

আমাদের সভাগুলো নির্ধারিত সময়ের পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগেই হঠাৎ করে শ্রমিকদের ভিড়ে ভরে গেল। এই সভাগুলোকে যেন বিস্ফোরিত হওয়ার অপেক্ষায় থাকা একটি বারুদভর্তি পাত্রের মতো মনে হচ্ছিল। যেকোনো মুহূর্তে বিস্ফোরিত হতে পারত ; ফিউজটা হাতের কাছেই ছিল। কিন্তু ঘটনাগুলো সবসময় অন্যরকম ঘটত। লোকেরা শত্রু হিসেবে এসেছিল এবং তারা চলে গেল, হয়তো আমাদের সাথে যোগ দিতে প্রস্তুত না হয়েই , কিন্তু নিজেদের মতবাদের সত্যতা নিয়ে চিন্তাশীল ও সমালোচনামূলক হয়ে। ধীরে ধীরে, আমার তিন ঘণ্টার বক্তৃতার সময়, সমর্থক ও বিরোধীরা একযোগে একটি উৎসাহী দলে পরিণত হলো। সভা ভেঙে দেওয়ার প্রতিটি সংকেত ব্যর্থ হলো। ফলে, বিরোধী নেতারা ভীত হয়ে পড়লেন এবং আবারও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে শ্রমিকদের আমাদের সভায় যোগদান নিষিদ্ধ করা উচিত।

তারপর তারা আসা বন্ধ করে দিল, কিংবা শুধু ছোট ছোট দলে আসত। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই পুরো খেলাটা আবার নতুন করে শুরু হয়ে গেল। আমাদের থেকে দূরে থাকার আদেশ অমান্য করা হলো, কমরেডরা ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় আসতে লাগল, অবশেষে উগ্রপন্থী কৌশলের সমর্থকরা জয়ী হলো। আমাদের চূর্ণবিচূর্ণ হওয়ার কথা ছিল।

কিন্তু তারপর, দুই, তিন এবং অবশেষে আটটি বৈঠকের পর, তারা বুঝতে পারল যে এই বৈঠকগুলো ভেঙে দেওয়ার চেয়ে এ বিষয়ে কথা বলা সহজ এবং এর প্রত্যেকটির ফলেই লাল মিলিশিয়ারা উল্লেখযোগ্যভাবে দুর্বল হয়ে পড়ছে, এবং হঠাৎ একটি নতুন স্লোগান আবির্ভূত হলো: "সর্বহারা, কমরেডগণ, নাৎসি আন্দোলনকারীদের এড়িয়ে চলুন।"

লাল গণমাধ্যমের ক্ষেত্রেও একই রকম সদা পরিবর্তনশীল কৌশল লক্ষ্য করা যেত। তারা আমাদের চুপ করানোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা যে ব্যর্থ , তা তারা বুঝতে পারল। পরে, তারা ঠিক তার উল্টো কৌশল অবলম্বন করল। শ্রমিক শ্রেণীর চোখে আমাদেরকে পুরোপুরি উপহাসের পাত্র বানানোর উদ্দেশ্যেই প্রতিদিন আমাদের নিয়ে নানা 'উল্লেখ' করা হতো। কিছুদিন পর , এই ভদ্রলোকেরা নিশ্চয়ই অনুভব করেছিলেন যে তারা আমাদের কোনো ক্ষতি করেননি, বরং উল্টোটা হয়েছে ; কারণ মানুষ প্রশ্ন করতে শুরু করল যে, তথাকথিত একটি উদ্ভট বিষয়ে কেন এত মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। মানুষ কৌতূহলী হয়ে উঠল। হঠাৎ করেই কৌশল বদলে গেল , এবং কিছু সময়ের জন্য আমাদেরকে মানবতার বিরুদ্ধে সত্যিকারের অপরাধী হিসেবে গণ্য করা হলো। একের পর এক প্রবন্ধে আমাদের অপরাধমূলক উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা হলো এবং যা বলা হচ্ছিল, তার সমর্থনে নতুন নতুন প্রমাণ হাজির করা হলো। মানুষের মন বিষিয়ে তোলার জন্য আগাগোড়া মনগড়া কেলেঙ্কারির গল্প প্রকাশ করা হলো। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই এই আক্রমণগুলোও নিষ্ফল প্রমাণিত হলো; আদতে, এগুলো ব্যাপক মনোযোগ আকর্ষণ করে আমাদের সাহায্যই করেছিল।

তখন আমি এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলাম যে, তারা আমাদের নিয়ে হাসাহাসি করুক বা আমাদের কলঙ্কিত করুক , আমাদের বোকা বা অপরাধী বলুক, তাতে কিছু যায় আসে না; আসল কথা হলো , তারা আমাদের প্রতি মনোযোগ দেয়। এবং শ্রমিক শ্রেণীর চোখে আমরাই আত্মরক্ষায় সক্ষম একমাত্র শক্তি হিসেবে বিবেচিত। আমি নিজেকে বলেছিলাম যে ইহুদি সংবাদমাধ্যমের সমর্থকেরা আমাদের এবং আমাদের লক্ষ্যগুলো সম্পর্কে সত্যটা জানতে পারবে।

তারা যে আমাদের সভাগুলো কখনো ভেঙে দেয়নি, তার একটি কারণ নিঃসন্দেহে ছিল বিরোধী নেতাদের প্রদর্শিত চরম কাপুরুষতা। প্রতিটি সংকটময় মুহূর্তে, তারা নোংরা কাজগুলো অন্যদের ওপর ছেড়ে দিয়ে নিজেরা ফলাফলের জন্য বাইরে অপেক্ষা করত।

আমরা আমাদের প্রতিপক্ষদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অত্যন্ত ভালোভাবে অবগত ছিলাম, শুধু এই কারণে নয় যে আমরা বাস্তবসম্মত কারণে দলের বেশ কয়েকজন সদস্যকে লাল সংগঠনগুলোর সদস্য থাকতে দিয়েছিলাম , বরং এই কারণেও যে , সৌভাগ্যবশত লাল চক্রান্তকারীরা

Machine Translated by Google

সৌভাগ্যবশত, তারা এমন এক বাচালতায় আক্রান্ত ছিল যা দুর্ভাগ্যবশত জার্মানদের মধ্যে এখনও খুব ব্যাপকভাবে প্রচলিত। তারা নিজেদের দেওয়া নির্দেশ মেনে চলতে পারত না এবং প্রায়শই কোনো বড় ঘটনা ঘটার আগেই খিলখিল করে হাসতে শুরু করত । তাই, লাল আন্দোলনকারীরা প্রায়শই বুঝতেই পারত না যে তারা সভা থেকে বিতাড়িত হওয়ার কত কাছাকাছি চলে এসেছিল।

এই পরিস্থিতি আমাদের সভাগুলোর নিরাপত্তা নিজেদের হাতে তুলে নিতে বাধ্য করেছিল। আমরা সরকারি নিরাপত্তার ওপর ভরসা করতে পারতাম না। বরং উল্টোটা; অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, এই ধরনের নিরাপত্তা বাহিনী সবসময় গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের পক্ষই নিত। পুলিশের হস্তক্ষেপের একমাত্র বাস্তব পরিণতি ছিল সভাটি ভেঙে দেওয়া , অর্থাৎ বন্ধ করে দেওয়া। আর ঠিক এটাই আমাদের প্রতিপক্ষরা চেয়েছিল।

সামগ্রিকভাবে, এর ফলে পুলিশ এমন একটি পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল যা , সহজ ভাষায় বলতে গেলে, সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহারের সবচেয়ে লজ্জাজনক উদাহরণ ছিল । যখন তারা খবর পেত যে অমুক বা তমুক সভা ভেঙে দেওয়া হবে , তখন সম্ভাব্য দাঙ্গাকারীদের গ্রেপ্তার করার পরিবর্তে তারা রূঢ়ভাবে ঘোষণা করত যে সভাটি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পুলিশ এটিকে " আইনশৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে একটি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা " হিসেবে বর্ণনা করেছিল ।

সৎ মানুষদের রাজনৈতিক কাজ ও কর্মকাণ্ড সবসময়ই এমন বেপরোয়া দুর্বৃত্তদের দ্বারা বাধাগ্রস্ত হতে পারে , যাদের হাতে প্রয়োজনীয় সম্পদ রয়েছে। আইনশৃঙ্খলার নামে রাষ্ট্রকর্তৃপক্ষ এই দুর্বৃত্তদের কাছে নতি স্বীকার করেছে এবং অন্যদেরকে তাদের উস্কানি না দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।
যখন জাতীয় সমাজতন্ত্রীরা নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় সভা করতে চাইত এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলো তার বিরোধিতা করত , তখন এই চাঁদাবাজদের গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ করা হয়নি । না। পুলিশ আমাদের সভা নিষিদ্ধ করে দিত। এই আইনগত কর্তৃপক্ষ, অবর্ণনীয় ঔদ্ধত্যের সাথে , অগণিতবার লিখিতভাবে এমনটা করেছে। এই ধরনের ঘটনা এড়ানোর জন্য, সভা ব্যাহত করার যেকোনো প্রচেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা নিশ্চিত করা প্রয়োজন ছিল। এটাও বিবেচনা করা প্রয়োজন ছিল যে , পুলিশি সুরক্ষার উপর নির্ভরশীল যেকোনো সভা জনগণের চোখে এর সংগঠকদের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করবে। যে সভাগুলো কেবল পুলিশ বাহিনীর সাহায্যেই করা যায় , তা কাউকেই বোঝাতে পারে না; কারণ নিম্নবর্গের সমর্থন পেতে হলে নিজের শক্তি প্রদর্শন করা প্রয়োজন। একজন সাহসী পুরুষ একজন সাধারণ পুরুষের চেয়ে সহজে একজন নারীর স্নেহ লাভ করতে পারে।

কাপুরুষ, ঠিক যেমন পুলিশি সমর্থনের ওপর নির্ভরশীল একটি দুর্বল আন্দোলনের চেয়ে একটি বীরত্বপূর্ণ আন্দোলন জনগণের মন জয় করতে বেশি কার্যকর হবে ।

বিশেষ করে এই দ্বিতীয় কারণটির জন্যই, আমাদের নবীন আন্দোলনকে প্রতিরক্ষার মাধ্যমে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা এবং লাল বিরোধীদের নির্মূল করার লক্ষ্যে কার্যকলাপ পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ।

আমাদের সভাগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর
ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল : ১. সভা পরিচালনার একটি উদ্যমী ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে সঠিক পদ্ধতি।
২. শৃঙ্খলা বজায় রাখে এমন একটি সংগঠিত দল ।

সেই দিনগুলিতে, আমাদের সভাগুলিতে পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ কেবল আমাদের হাতেই ছিল, অন্য কারও হাতে নয়, এবং আমরা প্রতিটি সুযোগে এই বিষয়টির উপর জোর দিতাম । আমাদের বিরোধীরা ভালোভাবেই জানত যে , যেকোনো উস্কানিই হবে তাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে বের করে দেওয়ার সুযোগ। সভাগুলিতে, বিশেষ করে মিউনিখের বাইরে, পনেরো-ষোলজন জাতীয় সমাজতন্ত্রীর বিপরীতে আমাদের পাঁচ থেকে আটশো বিরোধী থাকত ; কিন্তু আমরা কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা সহ্য করতাম না; আত্মসমর্পণ করার চেয়ে আমরা মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত ছিলাম । একাধিকবার, মুষ্টিমেয় কয়েকজন পার্টি সদস্য সেই ক্ষিপ্ত ও নৃশংস লাল জনতার বিরুদ্ধে বীরোচিত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। ঐ পনেরো-বিশজন লোক শেষ পর্যন্ত নিশ্চিতভাবেই পিষ্ট হয়ে যেত , কিন্তু বিরোধীরা জানত যে তার চেয়ে তিন-চারগুণ বেশি লোকের মাথায় প্রথমে আঘাত করা হতো । তারা সেই ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিল না। আমরা সভা পরিচালনার মার্ক্সবাদী ও বুর্জোয়া পদ্ধতি অধ্যয়নের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম, এবং আমরা অবশ্যই কিছু শিখেছিলাম ।

মার্ক্সবাদীরা বরাবরই অত্যন্ত কঠোর শৃঙ্খলা বজায় রেখেছে , তাই বুর্জোয়া মহলে তাদের সভা ভেঙে দেওয়ার প্রশ্নই উঠতে পারত না । এটাই রেডদের এইভাবে কাজ করার আরও বেশি কারণ জুগিয়েছিল। সময়ের সাথে সাথে, তারা কেবল এই শিল্পে পারদর্শীই হয়ে ওঠেনি , বরং রাইখের বিশাল এলাকা জুড়ে তারা এতটাই এগিয়ে গিয়েছিল যে অ-মার্ক্সবাদী সভাগুলোকে সর্বহারার প্রতি উস্কানি হিসেবে ঘোষণা করেছিল । এই বিষয়টি বিশেষভাবে প্রযোজ্য ছিল যখন কারসাজি করা হতো।

Machine Translated by Google

লোকগুলো সন্দেহ করেছিল যে এই ধরনের একটি সভা তাদের নিজেদের অপরাধের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে এবং এর ফলে তাদের বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা প্রকাশ হয়ে যেতে পারে। তাই যখনই কোনো সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার ঘোষণা দেওয়া হতো , সভা অনুষ্ঠিত হতেই, লাল গণমাধ্যম থেকে ক্রোধের গর্জন ফেটে পড়ল । আইনের এই সমালোচকরা প্রায় সবসময়ই প্রথমে কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে "আইনশৃঙ্খলার স্বার্থে" এই "সর্বহারা উস্কানি" বন্ধ করার জন্য ভীতিপ্রদভাবে দাবি জানাতেন । তাদের ভাষা এমনভাবে তৈরি করা হতো যা তারা যে আমলাতান্ত্রিক নির্বোধের সাথে কথা বলছিলেন তার গুরুত্বের সাথে মানানসই ছিল, এবং এভাবেই সাফল্য নিশ্চিত ছিল। যদি ঘটনাক্রমে সেই কর্মকর্তা একজন সত্যিকারের জার্মান হতেন—শুধু নামমাত্র প্রধান নন—এবং এই দুঃসাহসিক দাবি প্রত্যাখ্যান করতেন, তাহলে "সর্বহারা উস্কানি" বন্ধ করার চিরাচরিত আবেদন জানানো হতো, সাথে একটি নির্দিষ্ট দিনে পূর্ণ শক্তিতে এই সভায় উপস্থিত হওয়ার আদেশও দেওয়া হতো , যাতে " সর্বহারা মুষ্টি দিয়ে বুর্জোয়াদের লজ্জাজনক চক্রান্ত বন্ধ করা যায়।"

এই বুর্জোয়া সভাগুলো যে কী করুণ ও ভীরু ভঙ্গিতে পরিচালিত হতো , তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন ছিল। প্রায়শই, এই হুমকিগুলোই সভাটি সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল । ভয়ের অনুভূতি এতটাই প্রকট ছিল যে, আটটার পরিবর্তে সভা খুব কমই নয়টার আগে শুরু হতো। সভাপতি তাঁর সাধ্যমতো চেষ্টা করতেন, 'বিরোধী দলের ভদ্রলোকদের' প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে এটা দেখানোর জন্য যে, যারা আগে তাদেরই বিরোধী ছিল, তাদের এই আগমনে তিনি এবং উপস্থিত সকলে কতটা খুশি হয়েছেন (যা ছিল এক সুস্পষ্ট মিথ্যা)।

শুধুমাত্র যৌথ আলোচনার (তাৎক্ষণিক ঐকমত্যের) মাধ্যমেই পরস্পরকে ভালোভাবে বোঝা সম্ভব । অধিকন্তু, সভাপতি তাদের এও আশ্বাস দেন যে, এই সভার উদ্দেশ্য তাদের ঘোষিত কোনো বিশ্বাসে আঘাত হানা নয়। নিশ্চয়ই নয়। প্রত্যেকেরই নিজস্ব রাজনৈতিক মতামত গঠন ও প্রকাশ করার অধিকার আছে , কিন্তু অন্যদেরও তা করার সুযোগ দেওয়া উচিত । তাই তিনি বক্তাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে তাঁর ভাষণ দেওয়ার অনুমতি চাইলেন – ভাষণটি নিশ্চয়ই দীর্ঘ হবে না । তিনি আরও বলেন, তাহলে বিদেশের মানুষ বিবেচনা করবে না

এই সভাটি জার্মানিতে চলমান তিক্ত ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের আরেকটি লজ্জাজনক উদাহরণ। এবং এভাবেই চলতে থাকে।

বামপন্থী ভাইদের এ ধরনের কথাবার্তার প্রতি বিন্দুমাত্রও বোধগম্যতা ছিল না ; বক্তা সবে শুরু করেছিলেন, এমন সময় চিৎকার করে তাঁকে থামিয়ে দেওয়া হলো। মাঝে মাঝে এমন ধারণা হতো যে, এই বক্তারা তাঁদের আত্মত্যাগের এই চূড়ান্ত বাধাদানে কৃতজ্ঞ ছিলেন । এই বুর্জোয়া ষাঁড়যোদ্ধারা প্রচণ্ড হট্টগোলের মধ্যে আখড়া ছেড়ে যেত , যদি না তাদের মাথা থেঁতলে সিঁড়ি থেকে নিচে ফেলে দেওয়া হতো, যা প্রায়শই ঘটত।

এই কারণেই জাতীয় সমাজতন্ত্রীদের সভা আয়োজনের পদ্ধতি মার্ক্সবাদীদের কাছে কিছুটা অদ্ভুত ছিল। তারা আমাদের সভায় এই বিশ্বাস নিয়ে আসত যে, তারা নিজেরা যে খেলাটা এতবার খেলেছে, আমাদের ক্ষেত্রেও তারই পুনরাবৃত্তি ঘটবে । "আজ আমরা ওদের শেষ করে দেব।" সভাকক্ষে ঢোকার সময় তারা কতবারই না একে অপরের উদ্দেশ্যে এই কথা গর্জন করে বলত , কিন্তু কথাটা পুনরাবৃত্তি করার আগেই তাদের তৎক্ষণাৎ বের করে দেওয়া হতো ।

প্রথমত, আমাদের সভা পরিচালনার পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমরা কথা বলার জন্য কাকুতি-মিনতি করিনি , কিংবা সবাইকে সঙ্গে সঙ্গে অন্তহীন আলোচনায় মেতে ওঠার অধিকারও দিইনি । আমরা রূঢ়ভাবে স্পষ্ট করে দিয়েছিলাম যে, এই সভার কর্তা আমরাই এবং আমাদের ইচ্ছেমতোই কাজ করব , আর যে কেউ এতে বিঘ্ন ঘটানোর দুঃসাহস দেখাবে , তাকে অসম্মানজনকভাবে বের করে দেওয়া হবে । এই ধরনের আচরণের শিকার হওয়া কারও জন্য আমরা কোনো দায়ভার নিতে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করেছিলাম । সময় পেলে আলোচনা হবে । এখন আমাদের দলীয় সহকর্মী তাঁর বক্তব্য শুরু করবেন... কথা বলার এই ভঙ্গিই মার্ক্সবাদীদের বিস্মিত করার জন্য যথেষ্ট ছিল ।

দ্বিতীয়ত, আমাদের সভাগুলোতে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আমাদের হাতে সুপ্রশিক্ষিত ও সংগঠিত লোকবল ছিল । অপরদিকে, বুর্জোয়া দলগুলো 'উশার' নামে পরিচিত কিছু লোকের সাহায্যে তাদের সভা রক্ষা করত , যারা নিজেদের বয়সের কারণে কর্তৃত্ব ও সম্মানের অধিকারী বলে মনে করত। কিন্তু যেহেতু মার্কসবাদ এই বিষয়ে কোনো মনোযোগ দেয়নি, তাই এই বুর্জোয়া সভাগুলোর পর্যাপ্ত আত্মরক্ষার বিষয়টি কার্যত অস্তিত্বহীন ছিল।

যখন আমাদের রাজনৈতিক সভাগুলো প্রথম শুরু হয়েছিল , আমি একটি বিশেষ আকর্ষণ তৈরি করেছিলাম।
প্রধানত তরুণদের নিয়ে গঠিত উপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংগঠিত করার প্রতি মনোযোগ । কিছু

Machine Translated by Google

তাদের মধ্যে তিনজন ছিলেন আমার সহযোদ্ধা, যারা আমার সাথে সক্রিয় দায়িত্বে ছিলেন ; অন্যরা ছিলেন পার্টির তরুণ সদস্য, যাদের একেবারে শুরু থেকেই শেখানো হয়েছিল যে, কেবল সন্ত্রাসই সন্ত্রাসকে ধ্বংস করতে পারে —এই পৃথিবীতে কেবল সাহসী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোকেরাই সফল হতে পারে —এবং পরিশেষে , আমরা এমন এক মহৎ আদর্শের জন্য লড়ছিলাম যার জন্য আমাদের রক্তের শেষ বিন্দুটিও উৎসর্গ করা যায়। এই তরুণদের এটা বুঝিয়ে বড় করা হয়েছিল যে, কোনো সমস্যার সমাধানে যেখানে সাধারণ জ্ঞানের জায়গায় বলপ্রয়োগ করা হয় , সেখানে সেরা প্রতিরক্ষা হলো আক্রমণ, এবং আমাদের রক্ষাকারী বাহিনীর সুনামই আমাদের পরিচয় দেবে এক সংগ্রামী রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে, কোনো বিতর্ক সভা হিসেবে নয় ।

যুদ্ধকালীন প্রজন্মের এই ছেলেরা যে কী অসাধারণ তীব্রতার সাথে এই আদেশে সাড়া দিয়েছিল, তা ছিল বিস্ময়কর । বুর্জোয়াদের গৃহীত শোচনীয় পদ্ধতির কারণে তাদের তীব্রভাবে হতাশ ও ক্ষুব্ধ হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল ।

এইভাবে সকলের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, শুধুমাত্র বুর্জোয়া সরকারের জঘন্য পদ্ধতির কারণেই বিপ্লব সম্ভব হয়েছিল । সেই সময়ে , বিপ্লব দমন করার মতো লোকের কোনো অভাব ছিল না, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, দৃঢ় মানসিক শক্তির চরম অভাব ছিল। যখন আমি তাদের কাছে এর সাথে জড়িত অত্যাবশ্যকীয় কাজগুলো ব্যাখ্যা করতাম, তখন এই তরুণদের চোখ কতবারই না উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠত ।
আমি তাদের কাজকর্মের সাথে পরিচিত হলাম , এবং আমি তাদের বারবার আশ্বস্ত করলাম যে , শক্তি দ্বারা সমর্থিত না হলে সমস্ত পার্থিব জ্ঞানই অকেজো , শান্তির কোমল দেবী কেবল যুদ্ধদেবতার সাথেই হাত মেলাতে পারেন , এবং শান্তির প্রতিটি মহান কাজকে অবশ্যই শক্তি দ্বারা সুরক্ষিত ও সমর্থিত হতে হবে। এইভাবে , সামরিক সেবার ধারণাটি তাদের কাছে অনেক বেশি বাস্তব হয়ে উঠল — একটি মৃত রাষ্ট্রের মৃত কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্মরত দুর্বল কর্মকর্তাদের জড় পদার্থ হিসেবে নয় , বরং দেশকে বাঁচানোর জন্য প্রত্যেক মানুষের জীবন উৎসর্গ করার কর্তব্যের জীবন্ত উপলব্ধি হিসেবে ।

এই তরুণ-তরুণীরা কী চমৎকারভাবে তাদের কাজ করেছে!
হুলওয়ালা বোলতার ঝাঁকের মতো, তারা সংখ্যায় বেশি হওয়া সত্ত্বেও, ক্ষত ও রক্তপাতের প্রতি উদাসীন থেকে , আমাদের আন্দোলনের পবিত্র লক্ষ্যের জন্য একটি পথ তৈরি করার মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের সভাগুলোতে গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের মোকাবিলা করেছিল ।
১৯২০ সালের গ্রীষ্মকালেই আমাদের সভাগুলোতে শৃঙ্খলা বজায় রাখার দলগুলোর সংগঠন ধীরে ধীরে আকার নিতে শুরু করে । ১৯২১ সালের বসন্তের মধ্যে, এই লোকদের একশ জনের দলে ভাগ করা হয়েছিল, যেগুলোকে আবার ছোট ছোট দলে বিভক্ত করা হয়।
এই বিষয়টি নিয়ে জরুরি ভিত্তিতে কাজ করা প্রয়োজন ছিল, কারণ ইতিমধ্যে আমাদের সভার সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছিল। আমরা তখনও মিউনিখের হফব্রাউহাউসে প্রায়ই মিলিত হতাম , কিন্তু শহরের বড় সভাকক্ষগুলোতে আরও বেশি করে মিলিত হতাম । ১৯২০-১৯২১ সালের শরৎ ও শীতকালে, মিউনিখের বুর্গারব্রাউ এবং কিন্ডলব্রাউতে আমাদের সভাগুলো বিশাল আকার ধারণ করে এবং সবসময় একই চিত্র তুলে ধরত; অর্থাৎ, এনএসডিএপি (জাতীয় সমাজতান্ত্রিক জার্মান শ্রমিক দল)-এর সভাগুলোতে সবসময় এত ভিড় থাকত যে পুলিশ সভা বন্ধ করে দিতে এবং দ্রুত দরজা খুলে দিতে বাধ্য হতো।

সভা শুরু হওয়ার অনেক আগেই দরজাগুলো খোলা থাকে ।

* * *

আমাদের সভাগুলোতে শৃঙ্খলা রক্ষাকারী নিরাপত্তা সংস্থা একটি অত্যন্ত কঠিন সমস্যার সমাধান করে দিল । ততদিন পর্যন্ত আন্দোলনটির কোনো দলীয় প্রতীক বা পতাকা ছিল না। এই প্রতীকগুলোর অভাব শুধু সেই সময়েই একটি সমস্যা ছিল না, বরং ভবিষ্যতেও তা অগ্রহণযোগ্য হতো। মূল সমস্যাটি ছিল এই যে, দলীয় সদস্যদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধকারী অন্তর্ভুক্তির কোনো বাহ্যিক প্রতীক ছিল না , এবং এটা ছিল সম্পূর্ণ অকল্পনীয় যে ভবিষ্যতে তারা এমন কিছু ছাড়া থাকবে যা আন্দোলনকে প্রতীকায়িত করবে এবং 'ইন্টারন্যাশনাল'-এর বিরোধিতা করতে পারবে ।

আমার যৌবনে একাধিকবার এই ধরনের প্রতীকের মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, এবং আবেগগত দৃষ্টিকোণ থেকে তা যুক্তিযুক্তও ছিল। যুদ্ধের পর বার্লিনে, আমি রাজপ্রাসাদের সামনে এবং লুস্টগার্টেনে মার্ক্সবাদীদের একটি গণ-সমাবেশে উপস্থিত ছিলাম। লাল পতাকা, লাল বাহুবন্ধনী এবং লাল ফুলের এক বিশাল সমুদ্রই প্রায় ১,২০,০০০ মানুষের সেই বিশাল সমাবেশকে শক্তির এক বাহ্যিক প্রকাশ দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম

Machine Translated by Google

অনুভব করুন ও বুঝুন, কত সহজে একজন সাধারণ মানুষ এমন একটি জমকালো নাট্য উপস্থাপনার সম্মোহনী জাদুর কাছে আত্মসমর্পণ করে।

বুর্জোয়া শ্রেণি, যারা দল হিসেবে কোনো নির্দিষ্ট বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করত না বা তার জন্য সংগ্রামও করত না, তাদের কোনো একক পতাকা ছিল না। তাদের দল গঠিত ছিল সেইসব 'দেশপ্রেমিক'দের নিয়ে, যারা রাইখের পতাকার রঙে নিজেদের প্রদর্শন করত। যদি এই রঙগুলো কোনো নির্দিষ্ট বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির প্রতীক হয়ে থাকে, তবে ধরে নেওয়া যায় যে রাষ্ট্রের শাসকেরা এই পতাকাকে তাদের নিজেদের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গিরই একটি প্রকাশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল।

কিন্তু বাস্তবে ব্যাপারটা ভিন্ন ছিল।

জার্মান বুর্জোয়াদের সাহায্য ছাড়াই রাইখকে একত্রিত করা হয়েছিল , এবং পতাকাটির জন্ম হয়েছিল যুদ্ধের সময়; তাই এটি ছিল কেবল একটি রাষ্ট্রীয় পতাকা, যার কোনো বিশেষ আদর্শিক উদ্দেশ্যের নিরিখে কোনো বৈধতা ছিল না ।

জার্মান-ভাষী অঞ্চলগুলোর কেবল একটি অংশেই —জার্মান অস্ট্রিয়াতে— বুর্জোয়া পতাকার মতো কিছু ছিল । এখানে, জাতীয় বুর্জোয়াদের একটি অংশ ১৮৪৮ সালের রংগুলোকে (কালো, লাল এবং সোনালি) তাদের দলীয় পতাকা হিসেবে বেছে নিয়েছিল এবং এর মাধ্যমে এমন একটি প্রতীক তৈরি করেছিল যা, অন্ততপক্ষে
বিশ্বদৃষ্টির দৃষ্টিকোণ থেকে এর কোনো তাৎপর্য ছিল না , কিন্তু জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এর একটি বিপ্লবী চরিত্র ছিল। এই পতাকার সবচেয়ে বড় বিরোধীরা—যে বিষয়টি আজ ভুলে যাওয়া উচিত নয়— ছিল সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট এবং খ্রিস্টান সোশ্যালিস্ট বা যাজকতন্ত্রীরা। বিশেষ করে, তারাই এই রঙগুলোকে ঠিক সেভাবেই অপমান ও হেয় করেছিল, যেভাবে তারা ১৯১৮ সালে কালো, সাদা এবং লালকে একেবারে তলানিতে টেনে নামিয়েছিল। অবশ্যই, পুরোনো অস্ট্রিয়ার জার্মান দলগুলোর কালো, লাল এবং সোনালি রঙ ছিল ১৮৪৮ সালের রঙ: যে সময়কালকে কিছুটা দূরদর্শী বলে মনে করা হয়, কিন্তু এটি ছিল সৎ জার্মানদের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা একটি সময়, যদিও ইহুদিরা অদৃশ্য চক্রান্তকারী হিসেবে নেপথ্যে লুকিয়ে ছিল। রাষ্ট্রদ্রোহিতা এবং জার্মান ভূখণ্ডের লজ্জাজনক দাসত্বই এই রঙগুলোকে মার্ক্সবাদী এবং মধ্যপন্থী দলের কাছে এত আকর্ষণীয় করে তুলেছিল; যার ফলে আজ তারা এগুলোকে তাদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হিসেবে পূজা করে এবং যে পতাকাকে তারা একসময় জঘন্যভাবে অপবাদ দিয়েছিল, তাকে রক্ষা করার জন্য নিজেদের ব্যানারে এগুলো ব্যবহার করে ।

তবে আসল সত্য হলো, ১৯২০ সাল পর্যন্ত মার্ক্সবাদীদের মতো তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের প্রতীক হিসেবে কোনো পতাকা ছিল না। যদিও ১৯১৮ সালের পর জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণীর উন্নত রাজনৈতিক মহল হঠাৎ আবিষ্কৃত কালো, লাল ও সোনালি রংকে তাদের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক ছিল, তবুও তারা নতুন প্রবণতাগুলোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নিজস্ব কোনো কর্মসূচি দিয়ে এর মোকাবিলা করতে পারেনি । বড়জোর, তারা পুরোনো রাইখ পুনর্গঠনের কথা ভেবেছিল।

আর এই চিন্তাধারার কাছেই পুরাতন রাইখের কালো, সাদা ও লাল রঙ তাদের মর্যাদা ঋণী ।
আমাদের তথাকথিত জাতীয় বুর্জোয়া দলগুলোর পতাকা হিসেবে পুনরুত্থান।

এটা স্পষ্ট ছিল যে, অসম্মানজনক পরিস্থিতিতে মার্ক্সবাদীদের কাছে পরাজিত একটি শাসনের প্রতীক সেই পতাকারূপে ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্য ছিল না, যার অধীনে সেই একই মার্ক্সবাদকে ধ্বংস করা হবে। যদিও অনেক সজ্জন জার্মান সেই পুরোনো রঙগুলোকে ভালোবাসতে ও শ্রদ্ধা করতে পারতেন , যা তারুণ্যের সতেজতায় পাশাপাশি প্রদর্শিত হলে গৌরবময় লাগত , কিন্তু যখন তারা এর অধীনে যুদ্ধ করেছিল এবং বহু প্রাণের আত্মত্যাগ দেখেছিল , তখন ভবিষ্যতের লড়াইয়ে এই পতাকার মূল্য ছিল সামান্যই ।

আমাদের আন্দোলনে আমি সবসময় এই মত পোষণ করে এসেছি যে , জার্মান জাতির জন্য এটি একটি প্রকৃত আশীর্বাদ যে তারা তাদের পুরনো পতাকাটি হারিয়েছে । ১৮) আমার দৃষ্টিভঙ্গি বুর্জোয়া রাজনীতিবিদদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। প্রজাতন্ত্র তার পতাকার নিচে কী করে, তা আমাদের কাছে অপ্রাসঙ্গিক হতে পারে।
কিন্তু ভাগ্যের প্রতি আমরা গভীরভাবে কৃতজ্ঞ থাকি , কারণ সে অত্যন্ত কৃপাপূর্বক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ যুদ্ধ পতাকাকে এক জঘন্য ছিন্নবস্ত্রে পরিণত হওয়া থেকে আমাদের রক্ষা করেছে । আজকের এই রাইখ, যা নিজেকে ও তার জনগণকে বিক্রি করে দেয়, তা কখনোই কালো, সাদা ও লালের মতো সম্মানজনক এবং বীরত্বপূর্ণ রঙ ধারণ করতে পারে না।

যতদিন নভেম্বরের এই উন্মাদনা চলবে , ততদিন এটি তার বাহ্যিক প্রতীক বহন করে যেতে পারে , কিন্তু গৌরবময় অতীত থেকে তা চুরি করতে পারে না। আমাদের বুর্জোয়া রাজনীতিবিদদের উপলব্ধি করা উচিত যে, যে কেউ এই দেশকে কালো, সাদা এবং লাল রঙে রাঙাতে চায় , সে অতীতের চোর। পুরোনো পতাকাটি কেবল পুরোনো রাইখের জন্যই উপযুক্ত ছিল, এবং সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ যে , প্রজাতন্ত্রটি নিজের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত রঙগুলোই বেছে নিয়েছিল।

Machine Translated by Google

এই কারণেই আমরা নাৎসিবাদীরা বিশ্বাস করতাম যে, পুরনো পতাকা বহন করা আমাদের বিশেষ লক্ষ্যের প্রতীক হতে পারে না; কারণ আমরা নিজেদের ভুলের দ্বারা ধ্বংস হয়ে যাওয়া পুরনো রাইখকে পুনরুজ্জীবিত করতে চাইনি , বরং একটি নতুন রাষ্ট্র গড়তে চেয়েছিলাম ।

আজ যে আন্দোলন মার্কসবাদের বিরুদ্ধে লড়ছে, তাকে অবশ্যই তার পতাকায় নতুন রাষ্ট্রের প্রতীক স্থাপন করতে হবে ।

নতুন পতাকা, তার আকৃতি এবং রূপ কেমন হবে— এই প্রশ্নটি সেই সময়ে আমাদের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় ছিল। সব দিক থেকে প্রস্তাব এসেছিল, কিন্তু সেগুলো সুচিন্তিত হওয়া সত্ত্বেও বাস্তবে প্রয়োগ করা কমবেশি অসম্ভব ছিল। নতুন পতাকাটিকে কেবল একটি পতাকাই নয়, বরং আরও অনেক কিছু হতে হতো।
এটি ছিল আমাদের সংগ্রামের একটি প্রতীক, কিন্তু অন্যদিকে, একটি বড় পোস্টার হিসেবে এটিকে কার্যকর করাটা জরুরি ছিল। মানুষের রুচি সম্পর্কে অবগত সকলেই এই আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ বিষয়গুলোর তাৎপর্য বুঝবেন এবং তার কদর করবেন । লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে, একটি সত্যিকারের আকর্ষণীয় প্রতীকই কোনো আন্দোলনের প্রতি আগ্রহ জাগানোর প্রথম কারণ হতে পারে।

এই কারণে, আমরা এই ধারণা প্রত্যাখ্যান করেছি যে, সাদা পতাকার মাধ্যমে আমাদের আন্দোলন পুরোনো রাষ্ট্রের সাথে, কিংবা বরং সেইসব ক্ষয়িষ্ণু দলের সাথে একাত্ম হবে , যাদের একমাত্র রাজনৈতিক লক্ষ্য হলো পুরোনো ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা । অধিকন্তু, সাদা এমন কোনো রঙ নয় যা মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ ও কেন্দ্রীভূত করতে সক্ষম । এই রঙটি কেবল যুবতীদের সংগঠনের জন্যই উপযুক্ত , কোনো বিপ্লবী সময়ে সংস্কারকামী আন্দোলনের জন্য নয়।

কালো রঙেরও প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল – যা নিঃসন্দেহে সেই সময়ের জন্য বেশ উপযুক্ত ছিল , কিন্তু আমাদের আন্দোলনের পেছনের ইচ্ছার তাৎপর্য প্রকাশ করছিল না। তাছাড়া, কালো রঙ আকর্ষণ করতে সক্ষম নয়।
স্বার্থ।

সাদা ও নীল, তাদের প্রশংসনীয় নান্দনিক গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও, জার্মানির একটি ফেডারেল রাজ্যের রঙ হিসেবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল— দুর্ভাগ্যবশত, রাজ্যটির বিশেষ সংকীর্ণ রাজনৈতিক অবস্থানের কারণে দুর্নাম ছিল । সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই রঙগুলো দিয়ে আমাদের আন্দোলনের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা কঠিন হতো । সাদা-কালোর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য ।

কালো, লাল এবং সোনালী রঙের কোনো প্রশ্নই ছিল না।

পূর্বেই উল্লিখিত কারণগুলোর জন্য কালো, সাদা এবং লালের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য ছিল । অন্তত এখন পর্যন্ত ব্যবহৃত রূপে নয় । কিন্তু এই তিনটি রঙের কার্যকারিতা অন্যগুলোর তুলনায় অনেক বেশি, এবং এটি নিঃসন্দেহে সবচেয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ সংমিশ্রণ।

আমি সবসময় পুরোনো রংগুলো ধরে রাখার পক্ষে ছিলাম, শুধু এই কারণে নয় যে, একজন সৈনিক হিসেবে আমি সেগুলোকে আমার সবচেয়ে পবিত্র সম্পদ বলে মনে করতাম, বরং এই কারণে যে সেগুলোর নান্দনিক আবেদন অন্য যেকোনো কিছুর চেয়ে আমার ব্যক্তিগত রুচির সঙ্গে বেশি মানানসই ছিল। সেই অনুযায়ী, নতুন আন্দোলনের জন্য প্রস্তাবিত অগণিত পরামর্শ ও নকশা আমাকে প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছিল, যেগুলোর অনেকগুলোতে স্বস্তিকার সঙ্গে পুরোনো রংগুলোর সমন্বয় ছিল । নেতা হিসেবে আমি আমার নকশাটি জনসমক্ষে আনতে চাইনি , কারণ এমনটা হতে পারত যে অন্য কেউ আমার নকশার মতোই, এমনকি তার চেয়েও ভালো কোনো নকশা জমা দিয়ে দিতে পারে । প্রকৃতপক্ষে, স্টার্নবার্গের একজন দন্তচিকিৎসক আমার নকশার প্রায় অনুরূপ একটি ভালো নকশা জমা দিয়েছিলেন, যাতে কেবল একটিই ভুল ছিল: তার গোলাকার কোণাবিশিষ্ট স্বস্তিকাটি ছিল একটি সাদা পটভূমিতে।

অসংখ্য চেষ্টার পর আমি চূড়ান্ত নকশাটি স্থির করলাম : একটি লাল কাপড়ের পতাকা, যার মাঝখানে একটি সাদা চাকতি এবং তার কেন্দ্রে ছিল একটি কালো স্বস্তিকা। অনেক চেষ্টার পর আমি পতাকা, মাঝখানের সাদা চাকতি এবং স্বস্তিকার আকারের মধ্যে সঠিক অনুপাতটি খুঁজে পেলাম । আর তখন থেকেই এটি সেভাবেই রয়ে গেছে।

একই সময়ে, আমরা সভায় শৃঙ্খলা বজায় রাখা আমাদের কর্মীদের জন্য অবিলম্বে লাল কাপড়ের তৈরি , মাঝখানে একটি সাদা চাকতি এবং চারপাশে একটি কালো আর্মব্যান্ডের অর্ডার দিয়েছিলাম।
এর মধ্যে স্বস্তিকা চিহ্ন রয়েছে। মিউনিখের স্বর্ণকার হের ফুস প্রথম ব্যবহারিক ও দীর্ঘস্থায়ী নকশাটি প্রদান করেন।

Machine Translated by Google

১৯২০ সালের গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময়ে নতুন পতাকাটি জনসমক্ষে উন্মোচিত হয়। এটি আমাদের আন্দোলনের জন্য ছিল এক অসাধারণ মানানসই প্রতীক—এটি ছিল নতুন এবং নবীন। এর আগে কেউ এই পতাকা দেখেনি ; এর প্রভাব ছিল অনেকটা জ্বলন্ত মশালের মতো । যে মহিলাদের ওপর আমরা পতাকাটি তৈরির দায়িত্ব দিয়েছিলাম , তাঁদের মধ্যে একজন যখন অবশেষে সেটি আমাদের হাতে তুলে দিলেন , তখন আমরা নিজেরাও প্রায় বালসুলভ আনন্দে অভিভূত হয়েছিলাম । কয়েক মাস পরেই মিউনিখে আমাদের কাছে এই ধরনের ছয়টি পতাকা ছিল। আমাদের রক্ষীবাহিনীর ক্রমবর্ধমান শক্তি এই প্রতীকটিকে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে একটি প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল ।

এবং প্রকৃতপক্ষে এটি একটি প্রকৃত প্রতীক ছিল।

শুধু এই কারণেই নয় যে, এতে ছিল সেইসব পূজনীয় রং যা জার্মান জাতির জন্য অশেষ সম্মান বয়ে আনা গৌরবময় অতীতের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা প্রকাশ করত , বরং এই প্রতীকটি ছিল আন্দোলনের পেছনের ইচ্ছারও এক বলিষ্ঠ অভিব্যক্তি । আমরা, জাতীয় সমাজতন্ত্রীরা, আমাদের পতাকাকে দলের কর্মসূচির মূর্ত প্রতীক বলে মনে করতাম । লাল রং আন্দোলনের অন্তর্নিহিত সামাজিক চিন্তাধারাকে প্রকাশ করত । সাদা রং, জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারাকে। আর স্বস্তিকা আমাদের নির্ধারিত লক্ষ্যের প্রতীক ছিল— আর্য মানবতার বিজয়ের জন্য সংগ্রাম এবং সৃজনশীল কাজের আদর্শের জয়, যা ইহুদি-বিদ্বেষী এবং চিরকাল তাই থাকবে।

দুই বছর পর, যখন আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী অনেক আগেই দুর্ধর্ষ বাহিনীতে পরিণত হয়েছিল, তখন এই নবীন বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির রক্ষাকারী সংগঠনটিকে বিজয়ের একটি বিশেষ প্রতীক দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিল: একটি ব্যানার। আমি এর নকশা করলাম এবং এর তৈরির দায়িত্ব অর্পণ করলাম দলের এক পুরোনো কমরেড, হের গার-এর ওপর, যিনি একজন স্বর্ণকার ছিলেন। তখন থেকেই এই ব্যানারটি জাতীয় সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রতীক হয়ে উঠল।

* * *

বিশেষ করে ১৯২০ সালে আমাদের সভাগুলোর প্রতি ক্রমবর্ধমান আগ্রহের কারণে, কখনও কখনও আমাদের সপ্তাহে দুটি সভা করতে হতো। আমাদের পোস্টারগুলোর চারপাশে ভিড় জমতো ; শহরের বড় বড় হলগুলো সবসময় হাজার হাজার মানুষে পরিপূর্ণ থাকত , যারা মার্ক্সবাদের মতবাদে পথভ্রষ্ট হয়ে আমাদের কাছে আসত এবং রাইখের মুক্তির সংগ্রামে সাহায্য করত। মিউনিখের লোকেরা আমাদের চিনত। তারা আমাদের নিয়ে কথা বলত। "জাতীয় সমাজতন্ত্রী" শব্দটি অনেকের কাছে একটি সাধারণ বিষয় হয়ে উঠেছিল এবং তাদের কাছে এটি একটি নির্দিষ্ট দলীয় কর্মসূচির প্রতীক ছিল।

আমাদের সমর্থক এবং এমনকি সদস্যদের পরিধি ক্রমাগত বাড়ছিল, যার ফলে ১৯২০-২১ সালের শীতে আমরা হয়েছিলাম মিউনিখে শক্তিশালী দল ।

সেই সময়ে মিউনিখে মার্ক্সবাদীরা ছাড়া এমন কোনো দল ছিল না—বিশেষ করে কোনো জাতীয়তাবাদী দল তো একেবারেই নয়—যারা আমাদের মতো গণ-বিক্ষোভের নেতৃত্ব দিতে পারত। মিউনিখের কিন্ডল হল, যেখানে ৫,০০০ লোকের ধারণক্ষমতা ছিল, প্রায়শই কানায় কানায় পূর্ণ থাকত, এবং তখনও পর্যন্ত সার্কাস ক্রোন নামে কেবল একটিই হল ছিল, যেখানে আমরা প্রবেশ করার সাহস করিনি ।

১৯২১ সালের জানুয়ারির শেষে জার্মানিতে আবারও বড় ধরনের উদ্বেগের কারণ দেখা দেয়। প্যারিস চুক্তি, যেখানে জার্মানি একশো বিলিয়ন স্বর্ণ মার্কের মতো বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রদানের অঙ্গীকার করেছিল, তা লন্ডন আল্টিমেটামের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়।

মিউনিখের তথাকথিত জাতীয়তাবাদী দলগুলোর প্রতিনিধিত্বকারী একটি দীর্ঘদিনের কমিটি একটি প্রকাশ্য প্রতিবাদ সভা ডাকা সমীচীন মনে করেছিল । যখন দেখলাম অনেক সময় নষ্ট হয়েছে এবং কিছুই করা হয়নি, তখন আমি উদ্বিগ্ন ও অস্থির হয়ে পড়লাম। প্রথমে সভাটি কনিগ প্লাৎসে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল; পরে এই প্রস্তাবটি বাতিল করা হয়, কারণ কেউ একজন আশঙ্কা করেছিল যে রেডরা এটি ভেঙে দিতে পারে । আরেকটি পরিকল্পনা ছিল ফেল্ডহের্নে হলের সামনে একটি বিক্ষোভের, কিন্তু সেটিও ব্যর্থ হয়। অবশেষে , মিউনিখের কিন্ডল হলে একটি যৌথ সভার প্রস্তাব দেওয়া হয় । এদিকে , দিনের পর দিন কেটে গেল; প্রধান দলগুলো এই ভয়াবহ ঘটনাটিকে পুরোপুরি উপেক্ষা করল, এবং কমিটি বিক্ষোভের জন্য কোনো চূড়ান্ত তারিখ ঠিক করতে পারল না।

মঙ্গলবার, ১লা ফেব্রুয়ারি, আমি একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য জরুরি অনুরোধ করেছিলাম । সেটি বুধবার পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছিল । সেদিন , সভাটি আদৌ অনুষ্ঠিত হবে কি না এবং কখন হবে, তা আমাকে স্পষ্টভাবে জানাতে আমি দাবি করেছিলাম। উত্তরটি আবারও ছিল অনিশ্চিত ও এড়িয়ে যাওয়ার মতো; তারা আমাকে জানায় যে ওই সপ্তাহে একটি বিক্ষোভ সমাবেশ আয়োজন করার "ইচ্ছা " তাদের রয়েছে।

Machine Translated by Google

অবশেষে , আমি ধৈর্য হারিয়ে নিজেই প্রতিবাদ সমাবেশটি আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নিলাম । বুধবার দুপুরে, আমি দশ মিনিটের মধ্যে পোস্টারের লেখাটি বলে দিলাম এবং একই সাথে পরের দিন, ৩রা ফেব্রুয়ারির জন্য সার্কাস ক্রোন হলটি ভাড়া করে ফেললাম।

সেই দিনগুলোতে এটা একটা বিরাট ঝুঁকি ছিল। শুধু এই বিশাল হলটি পূর্ণ হওয়ার অনিশ্চয়তার কারণেই নয়, বরং সভাটি ভেস্তে যাওয়ার ঝুঁকির কারণেও।

এই বিশাল হলটির জন্য আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী সংখ্যায় যথেষ্ট ছিল না। সভায় কোনো বিঘ্ন ঘটলে কী করতে হবে, সে ব্যাপারেও আমি নিশ্চিত ছিলাম না —বিশাল সার্কাস ভবনটির আকৃতি একটি সাধারণ সভাকক্ষের চেয়ে ভিন্ন ছিল। কিন্তু ঘটনাপ্রবাহ প্রমাণ করল যে আমার আশঙ্কা অমূলক ছিল; বরং ঠিক তার উল্টোটাই ঘটেছিল। একটি সংকীর্ণ হলের চেয়ে এই বিশাল ভবনে একদল গোলযোগ সৃষ্টিকারীকে সামলানো আরও সহজ হতো ।

একটি বিষয় নিশ্চিত ছিল: ব্যর্থতা আমাদের দীর্ঘ সময়ের জন্য পিছিয়ে দেবে। যদি একটি সভাও ব্যাহত হয়, তবে আমাদের মর্যাদা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং আমাদের প্রতিপক্ষরা তাদের সাফল্যের পুনরাবৃত্তি করতে উৎসাহিত হবে । এর ফলে পরবর্তী সভাগুলোতে আমাদের কাজে অন্তর্ঘাত ঘটবে এবং তা কাটিয়ে উঠতে কয়েক মাসের কঠিন সংগ্রামের প্রয়োজন হবে ।

আমাদের কাজ গুছিয়ে নেওয়ার জন্য মাত্র একদিন সময় ছিল , বৃহস্পতিবার। দুর্ভাগ্যবশত, সেদিন সকালে বৃষ্টি হয়েছিল এবং আশঙ্কা করার যথেষ্ট কারণ ছিল যে, বৃষ্টি ও তুষারপাতের মধ্যে তাড়াহুড়ো করে সভায় যাওয়ার চেয়ে অনেকেই বাড়িতে থাকাই শ্রেয় মনে করবে , বিশেষ করে যখন সহিংসতা ও রক্তপাতের আশঙ্কা ছিল।

আর সত্যি বলতে, সেই বৃহস্পতিবার সকালে হঠাৎ আমার মনে এই ভয়টা জেগে উঠল যে হলটা হয়তো ভর্তি হবে না , যা আমাকে কমিটির চোখে হাস্যকর করে তুলবে। আমি সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রচারপত্র লিখিয়ে, সেগুলো ছাপিয়ে নিয়ে সেদিন বিকেলে বিলি করে দিলাম । অবশ্যই, সেগুলোতে সভার একটি আমন্ত্রণও ছিল।

আমি দুটো ট্রাক ভাড়া করেছিলাম, প্রত্যেকটি যতটা সম্ভব লাল রঙে মোড়ানো , প্রতিটিতে আমাদের নতুন পতাকা লাগানো এবং আমাদের দলের পনেরো-বিশজন সদস্য দিয়ে ভর্তি। দলের সদস্যদের রাস্তায় আন্দোলন করতে, প্রচারপত্র বিলি করতে এবং আজ রাতে অনুষ্ঠিতব্য একটি গণসভার জন্য প্রচার চালাতে আদেশ দেওয়া হয়েছিল । প্রথমবারের মতো, মার্ক্সবাদীদের দ্বারা চালিত নয় এমন পতাকা লাগানো ট্রাক রাস্তায় চলছিল । লোকেরা এই লাল- মোড়ানো ট্রাকগুলোর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল , এবং আরও প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে, শ্রমজীবীর প্রতি এই নতুন 'উস্কানি'র বিরুদ্ধে ক্রোধে মুষ্টিবদ্ধ হাত উঠছিল । শুধু কি মার্ক্সবাদীরাই সভা করতে এবং ট্রাক চালাতে পারবে না ?

সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ সার্কাস হলে মাত্র কয়েকজন জড়ো হয়েছিল। প্রতি দশ মিনিট পর পর আমাকে ফোনে জানানো হচ্ছিল , আর আমি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছিলাম। সাধারণত সাতটা নাগাদ বা তার সোয়া সাতটার মধ্যেই আমাদের সভাকক্ষটি অর্ধেক ভর্তি হয়ে যেত ; কখনও কখনও তো একেবারে ঠাসাঠাসি হয়ে থাকত। কিন্তু আমি দ্রুতই আমার উদ্বেগের কারণ খুঁজে পেলাম। এই নতুন সভাস্থলটির বিশাল আকারের কথা আমি পুরোপুরি ভুলেই গিয়েছিলাম। হফব্রাউহাউসে হাজার হাজার মানুষ বেশ চিত্তাকর্ষক একটি দৃশ্য ছিল, কিন্তু সার্কাস ভবনে একই সংখ্যক মানুষ তার বিশালতার মধ্যে বিলীন হয়ে যেত এবং তাদের উপস্থিতি প্রায় চোখেই পড়ত না। কিছুক্ষণ পরেই আমি আরও আশাব্যঞ্জক খবর পেলাম, এবং পৌনে আটটার সময় আমাকে জানানো হলো যে হলটি তিন-চতুর্থাংশ ভর্তি হয়ে গেছে, এবং টিকিট কাউন্টারের সামনে তখনও প্রচুর ভিড় জমে আছে। তারপর আমি সভার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

আমি আটটা বেজে দুই মিনিটে সার্কাসের ভবনে পৌঁছালাম। তখনও বাইরে একদল লোক দাঁড়িয়ে ছিল ; তাদের মধ্যে কিছু কৌতূহলী মানুষ এবং অনেক বিরোধী ছিল, যারা এরপর কী ঘটে তা দেখার জন্য বাইরেই অপেক্ষা করতে চেয়েছিল।

বিশাল হলঘরে প্রবেশ করতেই আমার ঠিক সেই আনন্দ হচ্ছিল, যা এক বছর আগে মিউনিখের হফব্রাউ ব্যাঙ্কোয়েট হলে আমাদের প্রথম বৈঠকে হয়েছিল; কিন্তু মানুষের ভিড় ঠেলে মঞ্চে ওঠার পরেই আমি আমাদের সাফল্যটা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারলাম। হলঘরটা আমার সামনে একটা বিশাল ঝিনুকের মতো হাজার হাজার মানুষে পরিপূর্ণ ছিল। এমনকি আখড়াটিও লোকে লোকারণ্য ছিল।
৫,৬০০-এর বেশি টিকিট বিক্রি হয়েছিল এবং বেকার, গরীব ছাত্রছাত্রী ও আমাদের নিজস্ব দাঙ্গা পুলিশসহ ভিড়ের সংখ্যা নিশ্চয়ই ৬,৫০০ ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

আমার বক্তৃতার বিষয় ছিল "ভবিষ্যৎ নাকি পতন", এবং এই দৃঢ় বিশ্বাসে আমি আনন্দে পরিপূর্ণ ছিলাম যে , আমি যাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছিলাম, তারাই ভবিষ্যতের প্রতিনিধিত্ব করছে ।

ক্যামেরা।

Machine Translated by Google

আমি প্রায় আড়াই ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়েছিলাম। প্রথম আধ ঘণ্টার পরেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে সভাটি দারুণ সফল হবে। আমি সঙ্গে সঙ্গেই সেই হাজার হাজার মানুষের মন ছুঁয়ে গিয়েছিলাম। প্রথম ঘণ্টা শেষে বক্তৃতাটি স্বতঃস্ফূর্ত করতালিতে মুখরিত হয়েছিল, কিন্তু দ্বিতীয় ঘণ্টার পর এক গম্ভীর নিস্তব্ধতা নেমে আসে; এমন নিস্তব্ধতা যা আমি পরে এই একই সভাকক্ষে প্রায়শই অনুভব করতাম, এবং যা উপস্থিত প্রত্যেকেই চিরকাল মনে রাখবে । কোনো কিছুই এই অসাধারণ নিস্তব্ধতাকে ভাঙতে পারেনি , এবং কেবল শেষ কথাটি বলার পরেই শ্রোতারা জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেছিল ।

পরবর্তী বিশ মিনিট ধরে আমি দেখলাম বিশাল হলঘরটি ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ছে।
খালি হয়ে গেল, এবং কেবল তখনই আমি এক সুখী মানুষ হিসেবে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বাড়ি ফিরে গেলাম।

মিউনিখের সার্কাস ক্রোনে এই প্রথম সাক্ষাতের সময় ছবি তোলা হয়েছিল।
এই বিক্ষোভের সাফল্য বর্ণনা করতে গিয়ে তারা কথার চেয়েও জোরালোভাবে নিজেদের কথা তুলে ধরেছেন । বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলো এই ছবিগুলো পুনঃমুদ্রণ করে সমাবেশটিকে নিছক "জাতীয়" প্রকৃতির বলে বর্ণনা করেছিল; তাদের স্বভাবসুলভ বিনয়ের সাথে তারা এর আয়োজকদের কোনো উল্লেখই করেনি।

এইভাবে, প্রথমবারের মতো, আমরা একটি সাধারণ পার্টির পরিধিকে বহুদূর ছাড়িয়ে গিয়েছিলাম । আমাদেরকে আর উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না । সভাটি যে একটি এককালীন সাফল্য ছিল, এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ দূর করার জন্য, আমি পরের সপ্তাহেই সার্কাস হলে আরেকটি সভার আয়োজন করলাম , এবং আবারও আমরা সমানভাবে সফল হলাম। আবারও, বিশাল হলটি কানায় কানায় পূর্ণ ছিল।
লোকজনের উপস্থিতিতে আমি পরের সপ্তাহে তৃতীয় একটি সভা করার সিদ্ধান্ত নিই , যা একইভাবে সফল হয়েছিল ।

এই প্রাথমিক সাফল্যগুলোর পর , ১৯২১ সালের গোড়ার দিকে আমি মিউনিখে আমাদের কার্যক্রম আরও বাড়িয়ে দিই। সভাগুলো শুধু সপ্তাহে একবারই নয়, কখনও কখনও সপ্তাহে দুবার এবং গ্রীষ্ম ও শরৎকালে প্রায়শই তিনবার অনুষ্ঠিত হতো । আমরা সার্কাস হলে সমবেত হতাম, এবং প্রতিটি সভাই একইরকম সাফল্যে শেষ হতে দেখে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্টি লাভ করতাম।

এর প্রভাব আমাদের সমর্থক ও সদস্যদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় দৃশ্যমান ছিল।
পার্টি।

* * *

অবশ্য, এই সাফল্য আমাদের প্রতিপক্ষদের নিশ্চিন্তে ঘুমাতে দেয়নি । শুরুতে, তারা আমাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস ও নীরবতা ব্যবহারের মধ্যে দোদুল্যমান ছিল।
তখন তারা উপলব্ধি করল যে, সন্ত্রাস কিংবা নীরবতা—কোনোটিই আমাদের আন্দোলনের অগ্রগতি থামাতে পারবে না। তারা এক অভূতপূর্ব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের আশ্রয় নিতে বাধ্য হলো , যার উদ্দেশ্য ছিল আমাদের সভা-সমাবেশ কার্যক্রমের চূড়ান্ত অবসান ঘটানো।

এই ধরনের কর্মকাণ্ডের অজুহাত হিসেবে তারা ল্যান্ডট্যাগের একজন সদস্য, এরহার্ড আউয়েরের ওপর একটি অত্যন্ত রহস্যময় হামলা চালায়। ঘোষণা করা হয়েছিল যে, এক সন্ধ্যায় কেউ এই লোকটিকে লক্ষ্য করে বেশ কয়েকটি গুলি চালিয়েছে। এর অর্থ ছিল যে, তাকে গুলি করা হয়নি, বরং কেউ তাকে গুলি করার চেষ্টা করেছিল। সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক নেতাদের অসাধারণ উপস্থিত বুদ্ধি এবং বীরোচিত সাহসিকতা কেবল এই ধর্মদ্রোহী উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত হওয়া থেকে বিরতই রাখেনি , বরং সেই উন্মাদ সম্ভাব্য হত্যাকারীদেরও তাদের কাপুরুষোচিত স্বভাব অনুযায়ী পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছিল ।

তারা ছিল। তারা এত দ্রুত এবং এত দূরে পালিয়ে গিয়েছিল যে পুলিশ পরে তাদের সামান্যতম চিহ্নও খুঁজে পায়নি। এই রহস্যময় ঘটনাটিকে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির মুখপত্র আমাদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে জনমত উস্কে দেওয়ার জন্য ব্যবহার করেছিল এবং এর মাধ্যমে তারা দেখিয়ে দিয়েছিল যে পরেরবার তারা কোন পুরোনো কৌশল ব্যবহার করতে চায় । তাদের লক্ষ্য ছিল এটা নিশ্চিত করা যে আমাদের আন্দোলন যেন প্রসারিত না হয়, বরং সর্বহারার শক্তিশালী বাহু দ্বারা তা সমূলে উৎপাটিত হয় ।

কয়েক দিন পর আসল আক্রমণটি এলো । শেষ পর্যন্ত, মিউনিখের হফব্রাউহাউসে অনুষ্ঠিতব্য আমাদের একটি সভা ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় , যেখানে আমার বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল।

Machine Translated by Google

১৯২১ সালের ৪ঠা নভেম্বর, সন্ধ্যা ছয়টা থেকে সাতটার মধ্যে , আমি প্রথম সুনির্দিষ্ট তথ্য পাই যে সভাটি ভেঙে দেওয়া হবে এবং এই কাজটি সম্পন্ন করার জন্য আমাদের প্রতিপক্ষরা নির্দিষ্ট কিছু 'লাল' কারখানায় কর্মরত বিপুল সংখ্যক শ্রমিককে সভায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার কারণে আমরা এই খবরটি আগে পাইনি ।
সেদিন আমরা মিউনিখের স্টারনেকার গাসে-তে আমাদের পুরোনো অফিস ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলাম ; অথবা আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে , আমরা পুরোনো অফিসটা ছেড়েছিলাম , আর নতুনটা তখনও চালু হয়নি। আগের ভাড়াটেরা টেলিফোন সংযোগটি কেটে দিয়েছিল এবং সেটি তখনও পুনরায় সংযুক্ত করা হয়নি। তাই, আমাদের সান্ধ্যকালীন সভাটি ভেঙে দেওয়ার পরিকল্পিত খবরটি ফোনে জানানোর জন্য বেশ কয়েকবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও, সেই খবর আমাদের কাছে পৌঁছায়নি।

ফলস্বরূপ, এই সভায় আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী পর্যাপ্ত সংখ্যায় উপস্থিত ছিল না। মাত্র একটি দল উপস্থিত ছিল, এবং তাতে স্বাভাবিক একশ জনের পরিবর্তে মাত্র ছেচল্লিশ জন সদস্য ছিল । অধিকন্তু, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে আমাদের নিরাপত্তা বাহিনীর যথেষ্ট সংখ্যক সদস্যকে সতর্ক করার মতো পর্যাপ্ত টেলিফোন সংযোগও আমাদের ছিল না । আরও উল্লেখ্য যে, আমাদের আগেও বেশ কয়েকবার সতর্ক করা হয়েছিল , কিন্তু উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটেনি। সেই পুরোনো প্রবাদটি, "যে বিপ্লবের ঘোষণা দেওয়া হয়, তা প্রায় কখনোই বাস্তবায়িত হয় না," এ পর্যন্ত আমাদের ক্ষেত্রে সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

সম্ভবত এই কারণেই সেদিন আমাদের সভা ভেঙে দিতে চাওয়া প্রতিপক্ষের পাশবিক সংকল্প মোকাবেলা করার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

তাছাড়া, আমরা বিশ্বাস করিনি যে আমাদের প্রতিপক্ষরা মিউনিখের হফব্রাউহাউসে এই কৌশলটি ব্যবহার করতে পারবে । আমরা বরং বড় হলগুলোতে, বিশেষ করে ক্রোন সার্কাসে, এ নিয়ে অনেক বেশি ভীত ছিলাম। কিন্তু সেই সন্ধ্যায় আমরা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা লাভ করেছিলাম । পরবর্তীতে আমরা পুরো বিষয়টি বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করে এমন কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম যা ছিল একাধারে আকর্ষণীয় ও অবিশ্বাস্য, এবং যা পরবর্তীকালে আমাদের আক্রমণকারী বাহিনীর সংগঠন ও রণকৌশলকে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে মৌলিক নিয়ামক হয়ে ওঠে।

সেদিন সন্ধ্যা ৭:৪৫-এ যখন আমি হফব্রাউহাউসের প্রবেশকক্ষে পৌঁছালাম , আমি বুঝতে পারলাম যে রেডদের উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই । হলটি লোকে লোকারণ্য ছিল, এবং সেই কারণে পুলিশ প্রবেশপথগুলো তালাবদ্ধ করে রেখেছিল। আমাদের বিরোধীরা, যারা অনেক আগেই এসে পড়েছিল, তারা হলের ভেতরে ছিল, আর আমাদের সমর্থকেরা বেশিরভাগই বাইরে ছিল । প্রবেশপথে একজন ছোট প্রহরী আমার জন্য অপেক্ষা করছিল । আমাকে মূল হলের দিকে যাওয়ার দরজাগুলো বন্ধ করতে হলো এবং আমি পঁয়তাল্লিশ - ছয়জন লোককে এগিয়ে আসার আদেশ দিলাম। আমি তাদের কাছে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করলাম যে, সম্ভবত সেদিন সন্ধ্যায়ই প্রথমবার তাদের আন্দোলনের প্রতি তাদের অবিচল ও অটল আনুগত্য প্রদর্শন করতে হবে , এবং আমাদের মৃত অবস্থায় বের করে না আনা পর্যন্ত আমরা কেউই হল ছেড়ে যাব না । আমি আরও বললাম যে আমি হলের ভেতরেই থাকব এবং আমি বিশ্বাস করি না যে তাদের কেউ আমাকে ছেড়ে যাবে , এবং যদি আমি তাদের কাউকে কাপুরুষের মতো আচরণ করতে দেখি, আমি ব্যক্তিগতভাবে তাদের বাহুবন্ধনী এবং ব্যাজ ছিঁড়ে ফেলব । আমি তাদের পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানালাম।

যদি তারা আমাদের সভায় অন্তর্ঘাতের সামান্যতম লক্ষণও দেখে , তবে তাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে আক্রমণই হলো সর্বোত্তম প্রতিরক্ষা ।

তিনটি 'হাইল' ধ্বনি দিয়ে আমাকে স্বাগত জানানো হলো, যেগুলোর আওয়াজ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি কর্কশ ও রুক্ষ ছিল।

হলঘর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় আমি নিজের চোখে পরিস্থিতিটা পর্যবেক্ষণ করলাম । আমাদের প্রতিপক্ষরা একসাথে জড়ো হয়ে বসেছিল, তাদের দৃষ্টি যেন আমাকে বিদ্ধ করতে চাইছিল। ঘৃণা আর ক্রোধে জ্বলজ্বলে অসংখ্য মুখ আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে ছিল, আর অন্যরা মুখ বিকৃত করে সমস্বরে আমার দিকে চিৎকার করছিল। "ওরা আমাদের শেষ করে দেবে। আমরা ভয়ে ভয়ে থাকব। আজ ওরা আমাদের মুখ চিরতরে গুঁড়িয়ে দেবে।" আরও কিছু অভিব্যক্তি ছিল , যেগুলোও ছিল সমান মার্জিত। তারা জানত যে তাদের সংখ্যা কম এবং সেই অনুযায়ীই আচরণ করছিল।

আমরা কোনোমতে সভাটা শুরু করতে পারলাম , এবং আমি বক্তৃতা দিতে শুরু করলাম। হফব্রাউহাউসে আমি সবসময় প্রবেশপথ থেকে দূরে , একপাশে একটা বিয়ারের টেবিলের ওপর দাঁড়াতাম। ফলে, আমি সবসময় শ্রোতাদের ঠিক মাঝখানেই থাকতাম।

Machine Translated by Google

সম্ভবত এই পরিস্থিতিটি আমার মধ্যে এমন এক উপলব্ধির জন্ম দিয়েছিল , যা আমি অন্য কোথাও কখনো অনুভব করিনি ।

আমার সামনে , এবং বিশেষ করে আমার বাম দিকে, কেবল বিরোধীরাই ছিল, হয় বসে অথবা দাঁড়িয়ে । তারা বেশিরভাগই ছিল মাফেই, কুস্টারম্যান, ইসার কারখানা ইত্যাদি থেকে আসা শক্তিশালী যুবক - যুবতী । তারা হলের ডান দেয়াল বরাবর , আমার টেবিলের বেশ কাছেই জড়ো হয়েছিল। তারা একের পর এক লিটারের মগে বিয়ারের অর্ডার দিতে শুরু করল এবং খালি মগগুলো টেবিলের নিচে ছুঁড়ে মারতে লাগল। এইভাবে তারা পুরো বাহিনী তৈরি করে ফেলেছিল। এই সভা শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হলে আমি অবাকই হতাম ।

এতসব বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও, আমি প্রায় দেড় ঘণ্টা কথা বলতে পেরেছিলাম এবং পরিস্থিতি আমার নিয়ন্ত্রণে আছে বলেই মনে হচ্ছিল। এমনকি মূল হোতারাও যেন রাজি হয়ে গিয়েছিল ; তারা ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠছিল, ঘন ঘন ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, ফিরে আসছিল এবং নিজেদের লোকদের সাথে ঘাবড়ে গিয়ে কথা বলছিল।

বাধাটির প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে আমি একটি ছোট মনস্তাত্ত্বিক ভুল করে ফেলেছিলাম, এবং যে কথাগুলো বলে আমার রাগের বিস্ফোরণ ঘটেছিল, তা বলার পরেই আমি বিষয়টি বুঝতে পারি।

বেশ কয়েকবার রাগের বিস্ফোরণ ঘটল এবং কিছুক্ষণ পর লোকটি চেয়ারের উপর লাফিয়ে উঠল এবং তিনি চিৎকার করে বললেন, "স্বাধীনতা।" এই সংকেতে স্বাধীনতার প্রবক্তারা তাঁদের কাজ শুরু করলেন ।

মুহূর্তের মধ্যেই হলঘরটি চিৎকার -চেঁচামেচিতে মুখরিত হয়ে উঠল । অসংখ্য বিয়ারের মগ হাউইটজারের গোলার মতো মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। সেই হট্টগোলের মধ্যে চেয়ারের পায়া সজোরে আছড়ে পড়ার, মগ ভেঙে যাওয়ার, গোঙানির শব্দ , চেঁচামেচি আর আর্তনাদ শোনা যাচ্ছিল।

সে এক অদ্ভুত দৃশ্য ছিল। আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই দাঁড়িয়ে আমার প্রত্যেক লোককে তাদের নিজ নিজ কাজ সম্পন্ন করতে দেখছিলাম।

বুর্জোয়া বৈঠকগুলো কেমন হতে পারে, তা দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল ।

নাচ সবে শুরু হয়েছিল , আর তখনই আমার অ্যাসল্ট স্কোয়াডগুলো—সেদিন থেকে তাদের এই নামেই ডাকা হতো— তাদের আক্রমণ শুরু করে দিল। নেকড়ের মতো তারা আট-দশ জনের দলে ভাগ হয়ে শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং ধীরে ধীরে তাদের হল থেকে বের করে দিতে লাগল। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তাদের প্রত্যেকের শরীর থেকে রক্ত ঝরছিল।
তখন আমি বুঝতে পারলাম তারা কেমন মানুষ ছিল , সর্বোপরি আমার সাহসী মরিস হেস, যিনি এখন আমার ব্যক্তিগত সচিব, এবং আরও অনেকে যারা গুরুতরভাবে আহত হওয়া সত্ত্বেও উঠে দাঁড়াতে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত আক্রমণ চালিয়ে গিয়েছিল । এই চরম বিশৃঙ্খলা কুড়ি মিনিট ধরে চলেছিল। তারপর আমার পঞ্চাশ জনেরও কম সংখ্যক সৈন্যের হাতে সাত-আটশ শত্রুসেনাকে হল থেকে ঠেলে বের করে দেওয়া হলো বা এক দলা হয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলা হলো । প্রচণ্ড লড়াইয়ে বিশাল জনতার কেবল বাম কোণটাই আমাদের সৈন্যদের প্রতিরোধ করে যাচ্ছিল। তারপর মঞ্চের দিকে প্রবেশপথ থেকে দুটি পিস্তলের গুলির শব্দ শোনা গেল এবং চারদিক থেকে গুলির প্রচণ্ড ঝনঝনানি শুরু হলো। যুদ্ধের স্মৃতি জাগিয়ে তোলা এই দৃশ্য দেখে আমার হৃদয় প্রায় আনন্দে ভরে উঠেছিল।

এই পর্যায়ে কে গুলি চালিয়েছিল তা শনাক্ত করা অসম্ভব ছিল। কিন্তু যাই হোক, আমি দেখলাম আমার সৈন্যরা ক্রমবর্ধমান প্রচণ্ডতার সাথে তাদের আক্রমণ পুনরায় শুরু করল যতক্ষণ না...
সর্বশেষ বিশৃঙ্খলাকারীদের পরাজিত করে সভাকক্ষ থেকে বের করে দেওয়া হলো।

সবকিছু শুরু হওয়ার পর প্রায় পঁচিশ মিনিট কেটে গিয়েছিল । হলঘরটা দেখে মনে হচ্ছিল যেন একটা বোমা ফেটেছে। আমার অনেক কমরেডকে চিকিৎসা দিতে হয়েছিল, অনেককে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রণেই ছিল। সভার সভাপতি হারমান এসেন ঘোষণা করলেন, "সভা চলবে। আপনারা চালিয়ে যান ।" তাই আমি আমার বক্তৃতা চালিয়ে গেলাম।

যখন আমরা নিজেরাই সভা শেষের ঘোষণা দিলাম, একজন উত্তেজিত কর্মকর্তা ঘরে ছুটে ঢুকলেন।
লিকশন হাত নাড়তে নাড়তে বললেন: "সভা শেষ।"

আইনি শৈথিল্যের এই দৃষ্টান্ত দেখে আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও হেসে ফেললাম । এটা ছিল
পুলিশের আসল বাড়াবাড়ি। তারা যত ছোট হয়, তাদের প্রভাব তত বড় হতেই হবে ।

সেদিন সন্ধ্যায় আমরা এক সত্যিকারের শিক্ষা পেয়েছিলাম । আর আমাদের প্রতিপক্ষরাও সেই শিক্ষা কখনো ভোলেনি ।

১৯২৩ সালের শরৎকাল পর্যন্ত মিউনিখের পোস্ট সর্বহারা শ্রেণীর মুষ্টিবদ্ধ হাতের বিষয়ে আর কোনো উল্লেখ করেনি।

Machine Translated by Google

পাদটীকা:

১৭) লাইপজিগের যুদ্ধ (১৮১৩), যেটিতে জার্মানরা নেপোলিয়নকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছিল, সেটিই ছিল সেই নির্ণায়ক ঘটনা যা জার্মানিতে ফরাসি দখলদারিত্বের অবসান ঘটিয়েছিল।
এই দখলদারিত্ব প্রায় বিশ বছর স্থায়ী হয়েছিল। বিশ্বযুদ্ধের পর, যখন জার্মানির কিছু অংশ ফরাসি সৈন্যদের দ্বারা পুনরায় অধিকৃত হয়, তখন জার্মানরা তাদের আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে লাইপজিগের যুদ্ধের বার্ষিকী উদযাপন করত।

১৮) ১৮৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত জার্মান রাইখের পতাকাটি ছিল কালো, সাদা ও লাল রঙের। ১৯১৮ সালে এটি বাতিল করা হয় এবং ১৯১৯ সালে ভাইমারে প্রতিষ্ঠিত জার্মান প্রজাতন্ত্রের জন্য একটি কালো, লাল ও সোনালি রঙের পতাকা বেছে নেওয়া হয়। হিটলারের নকশা করা পতাকাটি—লাল রঙের এবং এর কেন্দ্রে একটি সাদা চাকতির মধ্যে একটি কালো স্বস্তিকা চিহ্ন রয়েছে —এখন জাতীয় পতাকা।

Machine Translated by Google

অষ্টম অধ্যায়

একজন শক্তিশালী মানুষ একা থাকলেই সবচেয়ে শক্তিশালী হয়।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমি জার্মান সমিতিগুলোর একটি সংঘের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছিলাম। দেশপ্রেমিক। এখানে আমি এই বিষয়টি সংক্ষেপে আলোচনা করব ।

এই সংঘ বলতে আমি এমন একদল সমিতিকে বোঝাই , যারা নিজেদের কাজ সহজ করার জন্য পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা শুরু করে, একটি অভিন্ন নেতৃত্ব নিযুক্ত করে এবং এভাবে একটি অভিন্ন কর্মপন্থা অনুসরণ করে । সাধারণ নাগরিকরা এটা শুনে আনন্দিত ও আশ্বস্ত হন যে, এই সমিতিগুলো এমন একটি সংঘ প্রতিষ্ঠা করে অবশেষে একটি অভিন্ন মঞ্চ খুঁজে পেয়েছে , যার ওপর দাঁড়িয়ে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে নিজেদের মধ্যকার সমস্ত মতপার্থক্য দূর করতে পারে । ফলে , একটি সাধারণ বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, এই ধরনের সংঘের ফলে ক্ষমতার ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটে এবং পূর্বে পৃথক থাকা দুর্বল ছোট ছোট গোষ্ঠীগুলো হঠাৎ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তবে, এই বিশ্বাসটি মূলত ভ্রান্ত।

বিষয়টি আকর্ষণীয় , এবং আমি বিশ্বাস করি এই বিষয়টি আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ , যদি আমরা পরিষ্কারভাবে বোঝার চেষ্টা করি যে কীভাবে এই ধরনের সংঘ, সমিতি ইত্যাদি গঠিত হয়, যখন তারা সকলেই একই লক্ষ্য থাকার দাবি করে। এটা আশা করাই যৌক্তিক যে তারা একটি লক্ষ্যের জন্যই লড়াই করবে ।
একটিমাত্র সংগঠন থাকাই বেশি যুক্তিসঙ্গত , এবং একই লক্ষ্যের জন্য অনেকগুলো সংগঠনের লড়াই করার চেয়ে এটাই শ্রেয়। শুরুতে নিঃসন্দেহে একটিমাত্র সংগঠনই ছিল, যার একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল ।
কোথাও কোনো এক ব্যক্তি কোনো এক সত্য প্রচার করেছিলেন এবং একটি নির্দিষ্ট সমস্যার সমাধান খুঁজতে গিয়ে তিনি একটি লক্ষ্য স্থির করে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নের জন্য একটি আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন ।

এইভাবে, এমন একটি সমিতি বা দল তৈরি করা হয় যার কার্যক্রমগত পরিধির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে হয় বিদ্যমান অশুভ শক্তির বিনাশ , অথবা ভবিষ্যতে একটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ।

একবার এই ধরনের একটি আন্দোলন গঠিত হলে, এটি অগ্রাধিকারের কিছু নির্দিষ্ট অধিকারের জন্য বাস্তবসম্মত দাবি করতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই, যারা আন্দোলনের মতো একই লক্ষ্যের জন্য লড়াই করতে ইচ্ছুক, তারা এর সাথে একাত্ম হবে এবং এর মাধ্যমে এর শক্তি বৃদ্ধি করবে, যাতে এটি সাধারণ উদ্দেশ্যকে আরও ভালোভাবে পূরণ করতে পারে। বিশেষ করে অধিক বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের অবশ্যই অনুভব করতে হবে যে, আন্দোলনে যোগদানের মাধ্যমে তারা সাধারণ সংগ্রামে সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি তৈরি করছেন । সেই অনুযায়ী, এটি যুক্তিসঙ্গত, এবং এক অর্থে সৎও বটে – সততা, যেমনটা আমি দেখাব।
পরবর্তীতে, একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো — একটিমাত্র লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটিমাত্র আন্দোলন থাকা উচিত ।

এমনটা যে ঘটে না, তার পেছনে দুটি কারণ রয়েছে। প্রথমটিকে প্রায় একটি মর্মান্তিক ঘটনা বলা যায় । দ্বিতীয়টি করুণ, কারণ এর মূল নিহিত রয়েছে মানব প্রকৃতির দুর্বলতার মধ্যে । কিন্তু উভয়ের গভীরে গেলে আমি কেবল এমন কিছু বিষয়ই দেখতে পাই, যা আমাদের ইচ্ছাশক্তি, উদ্যম এবং সংকল্পের তীব্রতাকে আরও শক্তিশালী করার কারণ জোগায়; যাতে পরিশেষে, মানবীয় সামর্থ্যের উচ্চতর বিকাশের মাধ্যমে, আলোচ্য সমস্যাগুলোর একটি সমাধান সম্ভব হতে পারে ।

এর মর্মান্তিক কারণটি হলো, কেন প্রায়শই একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অন্বেষণ কোনো একক সংগঠনের হাতে থাকে না : সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই পৃথিবীতে জাঁকজমকপূর্ণভাবে সম্পাদিত প্রতিটি কাজই লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে দীর্ঘকাল ধরে বিদ্যমান একটি আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ— একটি লালিত, নীরব আকুতি। এমনও হতে পারে যে , যুগ যুগ ধরে মানুষ একটি নির্দিষ্ট সমস্যার সমাধান চেয়েছে , কারণ তারা দূর দিগন্তে একটি সার্বজনীন আকাঙ্ক্ষার আসন্ন পূর্ণতা না দেখে কোনো একটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থা আর সহ্য করতে পারছিল না । যে জাতিগুলো এমন দুঃখজনক পরিণতি থেকে বীরোচিত মুক্তি খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছে, তাদেরকে ক্ষয়িষ্ণু বলে গণ্য করা যেতে পারে ।

কিন্তু অপরদিকে, একটি জাতির প্রাণশক্তির এবং ফলস্বরূপ তার অস্তিত্বের অধিকারের এর চেয়ে ভালো প্রমাণ আর কিছুই হতে পারে না যে, একদিন ভাগ্যের এক সৌভাগ্যজনক বিধানে এমন একজন মানুষের আবির্ভাব ঘটে যিনি তাঁর জাতিকে চরম নিপীড়ন থেকে মুক্ত করতে, কিংবা কোনো দুর্ভোগের অবসান ঘটাতে , অথবা শক্তিহীনতায় পীড়িত জাতীয় আত্মাকে প্রশান্তি দিতে সক্ষম।

Machine Translated by Google

নিরাপত্তার অনুভূতি, এবং এর মাধ্যমে জাতির দীর্ঘদিনের একটি সাধারণ আকাঙ্ক্ষা পূরণ।

সমসাময়িক বড় সমস্যা বলে যা পরিচিত, তার একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, হাজার হাজার মানুষ সেগুলো সমাধানের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং অনেকেই এই কাজের জন্য নিজেদেরকে আহূত বলে মনে করে: এমনকি স্বয়ং নিয়তিও অনেকগুলো বিকল্প প্রদান করে, যাতে শক্তির অবাধ ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অবশেষে শক্তিশালী ও সাহসীরাই জয়ী হয় এবং সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব তাদের ওপরই ন্যস্ত হয় ।

এমনটা হতে পারে যে, বহু শতাব্দী ধরে অনেকে তাদের ধর্মীয় জীবনের প্রকাশের ধরন নিয়ে অসন্তুষ্ট এবং এর নবায়ন কামনা করছেন ; এবং এমনটাও হতে পারে যে, আত্মার এই তাড়নার কারণে এমন একদল মানুষের উদ্ভব ঘটে, যারা বিশ্বাস করে যে তাদের জ্ঞান ও যুক্তির দ্বারা তারাই
সমসাময়িক ধর্মীয় সংকট নিরসন করতে এবং সেই অনুযায়ী নিজেদের উপস্থাপন করতে আহ্বান জানানো হয়েছিল।
নতুন শিক্ষার প্রবক্তা হিসেবে অথবা অন্তত প্রচলিত বিশ্বাসের ঘোষিত বিরোধী হিসেবে।

এখানেও প্রাকৃতিক নিয়ম প্রযোজ্য, কারণ সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তিই এই মহান দায়িত্ব পালনের জন্য নিয়তি নির্ধারিত। কিন্তু সাধারণত অন্যরা এটা বুঝতে দেরি করে যে, এই কাজের জন্য কেবল একজনকেই ডাকা হয়েছে। বরং তারা বিশ্বাস করে যে, সমস্যা সমাধানে অংশ নেওয়ার সমান অধিকার তাদেরও আছে এবং এই কাজের জন্য তাদের প্রত্যেককেই সমানভাবে ডাকা হয়েছে। তাদের এই আধুনিক জগৎ সাধারণত সিদ্ধান্ত নিতে পারে না যে, তাদের মধ্যে কার ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি এবং সেই কারণে কে সকলের সমর্থন পাওয়ার যোগ্য।

এই কারণেই, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে , এবং প্রায়শই এমনকি একই যুগেও, বিভিন্ন মানুষ একই লক্ষ্যের জন্য বিভিন্ন আন্দোলন গড়ে তোলে। অথবা অন্ততপক্ষে, এই আন্দোলনগুলোর প্রতিষ্ঠাতাদের দ্বারা ঘোষিত লক্ষ্য একই থাকে, বা জনসাধারণ অন্তত তাই মনে করে। মানুষের কেবল অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা থাকে এবং তারা কেবল সাধারণ মতামত পোষণ করে; তাদের নিজেদের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষার কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা থাকে না, কিংবা এই প্রশ্নেরও কোনো উত্তর থাকে না যে, কেন এই আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষাগুলো পূরণ করা যায় না ।

দুঃখজনক ব্যাপারটি হলো এই যে, বহু মানুষ ভিন্ন ভিন্ন পথে একই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংগ্রাম করছে , তাদের প্রত্যেকেই নিজের উদ্দেশ্যকে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে এবং অন্যদের দিকে মনোযোগ না দিয়ে নিজের পথ অনুসরণ করাকেই কর্তব্য বলে মনে করে।

এই আন্দোলন, দল, ধর্মীয় গোষ্ঠী ইত্যাদি একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তৎকালীন সাধারণ প্রয়োজনে উদ্ভূত হয়েছে এবং তারা সকলেই একই লক্ষ্যের জন্য সংগ্রাম করে । অন্তত প্রথম দৃষ্টিতে এই বিষয়টি দুঃখজনক মনে হতে পারে , কারণ মানুষ প্রায়শই ভাবতে অভ্যস্ত যে , একটি সাধারণ প্রচেষ্টায় একত্রিত হওয়ার চেয়ে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে থাকা শক্তিগুলো তাদের লক্ষ্যে অনেক দ্রুত ও নিশ্চিতভাবে পৌঁছাবে । কিন্তু বিষয়টি এমন নয়।

প্রকৃতি তার অমোঘ যুক্তির নিজস্ব নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয় । এটি এই বিভিন্ন গোষ্ঠীকে আধিপত্যের জন্য প্রতিযোগিতা ও বিবাদে লিপ্ত থাকতে দেয় এবং এভাবেই তার চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত, সর্বোত্তম ও নিশ্চিত পথটি বেছে নেয়।

বাইরে থেকে কীভাবে নির্ধারণ করা যেত কোন পথটি সর্বোত্তম, যদি শক্তিগুলোকে অবাধে কাজ করতে না দেওয়া হতো , যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি সেইসব মানুষের মতাদর্শগত বিচারের উপর নির্ভর করত যারা ...
তারা নিজেদের অসীম প্রজ্ঞায় এতটাই মুগ্ধ যে, সাফল্যের অকাট্য প্রমাণ গ্রহণ করার জন্য তাদের মন উন্মুক্ত থাকে না , যা পরিণামে তাদের গৃহীত কর্মপন্থার সঠিকতাকেই সর্বদা নিশ্চিত করে।

সুতরাং , যদিও বিভিন্ন দল একই লক্ষ্যের দিকে ভিন্ন ভিন্ন পথে অগ্রসর হয়, যখন তারা জানতে পারে যে অন্যরাও অনুরূপ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে , তখন তাদের আরও সতর্কতার সাথে বিশ্লেষণ করতে হবে যে তারা সর্বোত্তম পথটি বেছে নিয়েছে কিনা, কোনো সংক্ষিপ্ততর পথ খুঁজে পাওয়া যায় কিনা এবং লক্ষ্যে আরও দ্রুত পৌঁছানোর জন্য তাদের প্রচেষ্টাকে কীভাবে সর্বোত্তমভাবে ব্যবহার করা যায় ।

এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রত্যেক প্রতিযোগী তাদের দক্ষতাকে উচ্চতর পরিপূর্ণতায় বিকশিত করে এবং মানবজাতি প্রায়শই তাদের অগ্রগতির জন্য পূর্ববর্তী ব্যর্থ প্রচেষ্টা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষার কাছে ঋণী থাকে । এইভাবে , আমরা শিখতে পারি

এই উপসংহার যে, আপাতদৃষ্টিতে মর্মান্তিক মনে হওয়া বিষয়ের মধ্য দিয়ে আমরা চূড়ান্ত ফলাফল অর্জনের আরও ভালো উপায় শিখতে পারি ; আর তা হলো ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার প্রাথমিক বিক্ষিপ্ততা, যার জন্য প্রতিটি দলই অচেতনভাবে দায়ী ছিল।

Machine Translated by Google

জার্মান সমস্যার সমাধান খোঁজার উদ্দেশ্যে ইতিহাস অধ্যয়নের সময় , একসময় প্রচলিত ধারণা ছিল যে এর সমাধানের দুটি সম্ভাব্য পথ ছিল এবং এই দুটি পথ শুরু থেকেই সংযুক্ত থাকা উচিত । এই পথগুলোর প্রধান প্রতিনিধি ছিল যথাক্রমে অস্ট্রিয়া ও প্রুশিয়া, অর্থাৎ হ্যাবসবার্গ ও হোহেনজোলার্নরা। এই প্রচলিত ধারণা অনুসারে, অন্য সকলের উচিত ছিল তাদের সম্মিলিত শক্তি কোনো এক পক্ষের হাতে তুলে দেওয়া। কিন্তু সেই সময়ে যদি সবচেয়ে প্রভাবশালী প্রতিনিধি, অর্থাৎ হ্যাবসবার্গদের পথ অবলম্বন করা হতো, তবে অস্ট্রিয়ার নীতি কখনোই একটি ঐক্যবদ্ধ জার্মান রাইখ গঠনে নেতৃত্ব দিত না।

অবশেষে, লক্ষ লক্ষ জার্মান যা তাদের অন্তরে আমাদের ভ্রাতৃহত্যার সংগ্রামের শেষ এবং সবচেয়ে ভয়াবহ প্রকাশ বলে নিন্দা করেছিল, তা থেকেই একটি শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ জার্মান রাইখের উদ্ভব ঘটে। সত্য হলো, জার্মান সাম্রাজ্যের মুকুট পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল কোনিগ্রাৎসের যুদ্ধক্ষেত্রে, প্যারিসের নিকটবর্তী লড়াইয়ে নয়, যেমনটা পরে ব্যাপকভাবে দাবি করা হয়েছিল।

সুতরাং , জার্মান রাইখের ভিত্তি কোনো নির্দিষ্ট দিকে কাজ করার সাধারণ ইচ্ছা থেকে উদ্ভূত হয়নি , বরং তা ছিল আধিপত্যের জন্য একটি পরিকল্পিত সংগ্রামের ফল, যদিও খুব কম লোকই এ বিষয়ে সচেতন ছিল । এবং এই সংগ্রামে প্রুশিয়া শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়েছিল । দলীয় রাজনীতিবিদদের দ্বারা এতটাই অন্ধ নন যে এই সত্যকে অস্বীকার করবেন, এমন যে কেউ অবশ্যই স্বীকার করবেন যে মানুষের তথাকথিত প্রজ্ঞা কখনও জীবনের প্রজ্ঞার মতো এমন বিজ্ঞ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারত না, যা শক্তির অবাধ ক্রিয়ার মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত এর বাস্তবায়ন ঘটিয়েছে। দুশো বছর আগে জার্মান ভূমিতে কেউ কি সত্যিই বিশ্বাস করেছিল যে হ্যাবসবার্গরা নয়, বরং হোহেনজোলার্ন প্রুশিয়া নতুন রাইখের কেন্দ্রবিন্দু ও প্রতিষ্ঠাতা হয়ে উঠবে ? এবং অন্যদিকে, আজ কে অস্বীকার করবে যে নিয়তি মানুষের প্রজ্ঞার চেয়েও বিচক্ষণতার সাথে কাজ করেছে ? এখন কে একটি ক্ষয়িষ্ণু ও অধঃপতিত রাজবংশের উপর ভিত্তি করে একটি জার্মান রাইখের কল্পনা করতে পারে ?

বিষয়সমূহের সাধারণ বিবর্তন, তাতে শত শত বছর সময় লাগলেও, সর্বদা যোগ্যদেরই সর্বোত্তম অবস্থানে স্থাপন করে।

আর এটা সবসময় এভাবেই থাকবে। তাই, ভিন্ন ভিন্ন মানুষ একই লক্ষ্য স্থির করলে দুঃখ করার কোনো প্রয়োজন নেই । এভাবেই সবচেয়ে শক্তিশালী ও মেধাবীরা স্বীকৃতি পাবে এবং বিজয়ী হবে ।

এবার আসা যাক দ্বিতীয় কারণটিতে: প্রায়শই জাতিসমূহের জীবনে, একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বিভিন্ন আন্দোলন আপাতদৃষ্টিতে একই লক্ষ্য অর্জনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পথ অনুসরণ করে। এই দ্বিতীয় কারণটি মর্মান্তিক নয়, তবে এটি দুঃখজনক । এর উৎস হলো ঈর্ষা, হিংসা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং অন্যের জিনিস দখলের আকাঙ্ক্ষার এক দুঃখজনক মিশ্রণ ।

দুর্ভাগ্যবশত, এই ত্রুটিগুলো প্রায়শই মানবজাতির কোনো একজন সদস্যের মধ্যে একসাথে দেখা যায় ।

যখনই এমন একজন মানুষের আবির্ভাব ঘটে যিনি তাঁর জনগণের দুঃখ-কষ্ট গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন, নিখুঁতভাবে অশুভ শক্তিকে চিহ্নিত করেছেন এবং তা নিরাময়ের জন্য পদক্ষেপ নিয়েছেন; যখনই তিনি তাঁর লক্ষ্য স্থির করেছেন এবং তা অর্জনের উপায় বেছে নিয়েছেন — ঠিক তখনই ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ মানুষেরা তৎক্ষণাৎ সেই মানুষটিকে অনুসরণ করতে শুরু করে, যিনি জনসমক্ষে মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছেন । চড়ুই পাখির মতো, যারা আপাতদৃষ্টিতে উদাসীন কিন্তু আদতে তাদের ভাগ্যবান সঙ্গীর গতিবিধির উপর তীব্রভাবে নিবদ্ধ থাকে , যার কাছে এক টুকরো রুটি আছে, এবং তার আঁকড়ে ধরার ক্ষমতা দুর্বল হওয়ার মুহূর্তেই তা ছিনিয়ে নেয় , মানুষের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। একজন মানুষের নতুন পথে যাত্রা শুরু করাই যথেষ্ট , আর হঠাৎ করেই একদল হতভাগ্য কাপুরুষ কান খাড়া করে সেই পথের শেষে কী লুটের মাল লুকিয়ে আছে তা শুঁকতে শুরু করে । যে মুহূর্তে তারা মনে করে যে তারা সেই লুটের মাল কোথায় পাওয়া যাবে তা আবিষ্কার করে ফেলেছে , ঠিক তখনই তারা অন্য একটি পথের সন্ধানে ছুটে যায় যা তাদের লক্ষ্যে আরও দ্রুত পৌঁছে দেবে।

যখনই কোনো নতুন আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচি প্রণয়ন করে, এই ধরনের লোকেরা এসে বলবে যে তারাও একই লক্ষ্যের জন্য লড়ছে । এর মানে এই নয় যে তারা আন্তরিকভাবে সেই আন্দোলনের কাতারে যোগ দিতে এবং এর মাধ্যমে তার অগ্রাধিকারকে স্বীকার করতে প্রস্তুত। বরং এর মানে হলো যে তারা চায় ...
তার কর্মসূচি চুরি করে তার উপর ভিত্তি করে একটি নতুন দল তৈরি করা । এমনটা করতে গিয়ে , তারা অবিবেচক লোকদের এই বলে আশ্বস্ত করার মতো নির্লজ্জতা দেখায় যে, অন্যরা এখন যে পথ অবলম্বন করছে , তারাও দীর্ঘদিন ধরে তা-ই করতে চেয়েছিল , এবং এর মাধ্যমে তারা প্রায়শই নিজেদেরকে একটি অনুকূল অবস্থানে রাখতে সক্ষম হয়, যা তাদের প্রাপ্য সাধারণ অসমর্থন জাগিয়ে তোলার পরিবর্তে একটি ভালো দিক । কারণ এটি একটি বড়

Machine Translated by Google

অন্যের ব্যানারে যা লেখা আছে তা নিয়ে নিজের ব্যানারে লেখা , চুরি করা কারো প্রোগ্রাম এবং একটি আলাদা গ্রুপ তৈরি করুন যেন সবকিছু একেবারে নতুন করে তৈরি করা হয়েছে এই গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা। এই কাজের ঔদ্ধত্য বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন তারাই নতুন গোষ্ঠী তৈরি করে সর্বপ্রথম বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল ।
যারা – অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় – সবচেয়ে জোরালোভাবে প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করেন যখন তারা এই সিদ্ধান্তে আসে যে তারা আর ধরতে পারবে না, তখন সংযোগ এবং ঐক্য। প্রতিপক্ষ।

এই ধরনের আচরণ তথাকথিত 'দেশপ্রেমিক অবক্ষয়'-এ অবদান রাখে। তার।

নিঃসন্দেহে, ১৯১৮-১৯১৯ সালে নিজেদের 'দেশপ্রেমিক' বলে দাবি করা অসংখ্য নতুন গোষ্ঠী, দল ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা ছিল সেই সময়ের একটি স্বাভাবিক ঘটনা, যার জন্য প্রতিষ্ঠাতারা দায়ী ছিলেন না। ১৯২০ সালে, এই সমস্ত দলগুলোর মধ্য থেকে ধীরে ধীরে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক জার্মান শ্রমিক দল রূপ নিতে শুরু করে এবং প্রাধান্য লাভ করে। এটা হতে পারে না

বহু প্রতিষ্ঠাতার অটল সততার এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর নেই যে, তাঁদের অনেকেই এক সত্যিকারের প্রশংসনীয় উপায়ে একটি শক্তিশালী আন্দোলনের স্বার্থে নিজেদের কম কার্যকর আন্দোলনগুলোকে উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন; নিঃশর্তভাবে তাতে যোগ দিয়ে নিজেদের আন্দোলন ভেঙে দিয়েছিলেন ।

এই কথাটি জুলিয়াস স্ট্রাইচারের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সত্য, যিনি সেই সময়ে নুরেমবার্গে জার্মান সোশ্যালিস্ট পার্টির সভাপতি ছিলেন। ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি একই ধরনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে গঠিত হয়েছিল, কিন্তু পূর্ববর্তী দলটির থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে। আমি আগেই বলেছি যে, স্ট্রাইচার, যিনি তখন নুরেমবার্গের একজন শিক্ষক ছিলেন, জার্মান সোশ্যালিস্ট পার্টির সভাপতি ছিলেন। দলটির লক্ষ্য ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কিন্তু, যখন ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট পার্টির শক্তি ও প্রসার বৃদ্ধি পেল...

তার কাছে সিদ্ধান্তটি ছিল স্পষ্ট ও অনস্বীকার্য। তিনি জার্মান সোশ্যালিস্ট পার্টির সঙ্গে তার সম্পৃক্ততার অবসান ঘটান এবং তার সমর্থকদেরকে প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হওয়া ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টিতে যোগ দিতে ও একটি অভিন্ন লক্ষ্যের জন্য দলের অভ্যন্তরে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে আহ্বান জানান। এই সিদ্ধান্তটি ব্যক্তিগতভাবে তার জন্য কঠিন ছিল , কিন্তু এটি তার গভীর সততার পরিচয় বহন করে।

আমাদের আন্দোলনের অস্তিত্বের এই প্রথম পর্ব যখন শেষ হলো , তখন শক্তির আর কোনো বিচ্ছুরণ ঘটেনি: সৎ উদ্দেশ্যই তৎকালীন অন্যান্য ব্যক্তিদের একই সম্মানজনক, সৎ ও ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্তে উপনীত করেছিল। আমরা এখন যাকে ' দেশপ্রেমিক অবক্ষয়' বলি, তার অস্তিত্বের কারণ কেবল আমার উল্লিখিত দুটি কারণের মধ্যে দ্বিতীয়টি।

যেসব উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষের আগে নিজেদের কোনো ধারণা বা অর্জনযোগ্য কোনো লক্ষ্যের ধারণা ছিল না, তারা ঠিক সেই মুহূর্তে নিজেদেরকে এক বিশেষ আহ্বানে সাড়া দিতে দেখলেন , যখন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক জার্মান শ্রমিক দলের সাফল্য প্রশ্নাতীত হয়ে উঠল।

হঠাৎ করেই এমন সব কর্মসূচি হাজির হলো যা ছিল আমাদের কর্মসূচির হুবহু নকল। আমাদের কাছ থেকে ধার করা ধারণাগুলো প্রচার করা হলো। সেগুলো এমন সব লক্ষ্য নির্ধারণ করলো যার জন্য আমরা বেশ কয়েক বছর ধরে লড়াই করে আসছিলাম, এবং এমন সব পথের রূপরেখা দিলো যা জাতীয় সমাজতন্ত্রীরা অনেক আগেই অনুসরণ করেছিল । জনগণকে এটা বোঝানোর জন্য সম্ভাব্য সব উপায় অবলম্বন করা হলো যে, যদিও জাতীয় সমাজতন্ত্রী জার্মান শ্রমিক দল বহুদিন ধরে বিদ্যমান ছিল, তবুও নতুন দল গঠন করা প্রয়োজন। কিন্তু এই সমস্ত কথা যেমন কপট ছিল, তেমনি এর পেছনের উদ্দেশ্যগুলোও ছিল লজ্জাজনক।

প্রকৃতপক্ষে, এই সবকিছু একটিমাত্র প্রধান বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল।
এর পেছনের উদ্দেশ্য ছিল প্রতিষ্ঠাতাদের ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ; তাঁরা এমন একটি ভূমিকা পালন করতে চেয়েছিলেন , যেখানে তাঁদের নিজেদের সাধারণ প্রতিভা কোনো অবদানই রাখতে পারত না; একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল অন্যের ধারণা আত্মসাৎ করার ক্ষেত্রে তাঁদের প্রদর্শিত চরম ঔদ্ধত্য — যা সাধারণ জীবনে চুরি হিসেবে গণ্য হয়।

সেই সময়ে, অন্যের তৈরি এমন কোনো ধারণা বা ধারণা ছিল না যা এই রাজনৈতিক চোরেরা সঙ্গে সঙ্গে দখল করে নিজেদের হীন উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করেনি। যারা এমনটা করেছিল , তারাই পরে চোখে জল নিয়ে 'দেশপ্রেমিক বিভেদ'-এর তীব্র নিন্দা করেছিল এবং ' ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা' নিয়ে অবিরাম কথা বলেছিল । এমনটা করার মাধ্যমে তারা এক গোপন আশা পোষণ করত যে , তারা অন্যদের কণ্ঠরোধ করতে পারবে, যারা এই সবের তোয়াক্কা না করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

Machine Translated by Google

এইসব কুরুচিপূর্ণ অভিযোগ শুনে তারা তাদের কাছ থেকে চুরি হওয়া ধারণাগুলোর ওপর থেকে সমস্ত দাবি ত্যাগ করবে এবং চোরদের ওপর শুধু সেই ধারণাগুলো বাস্তবায়নের দায়িত্বই নয় , বরং সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্বও ছেড়ে দেবে, যার তারাই ছিল মূল প্রতিষ্ঠাতা ।

যখন তারা তা করতে ব্যর্থ হয়, এবং প্রতিষ্ঠাতাদের দুর্বল মানসিকতার কারণে নতুন উদ্যোগগুলো পূর্বে প্রতিশ্রুত ইতিবাচক ফল দিতে পারে না , তখন তারা নিজেদের দাবিতে আরও সংযত হয়ে যায় এবং তথাকথিত 'সমবায় সংঘগুলোর' কোনো একটিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারলেই খুশি হয় ।

এই সময়ে , যা কিছু নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারত না, তারা এই সংঘগুলোর কোনো একটিতে যোগ দিত , এই বিশ্বাসে যে একে অপরকে আঁকড়ে ধরে থাকা আটজন খোঁড়া লোক একজন গ্ল্যাডিয়েটরকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করতে পারে ।

কিন্তু এই সমস্ত পঙ্গুদের মধ্যে যদি এমন কেউ থাকত যে পঙ্গু নয়, তবে তাকে অন্যদের ধরে রাখার জন্য নিজের সমস্ত শক্তি ব্যবহার করতে হতো এবং এর ফলে সে নিজেই কার্যত পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ত ।

এই জোটগুলোতে যোগদানের বিষয়টিকে আমাদের একটি কৌশলগত বিষয় হিসেবে দেখা উচিত , কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আমরা নিম্নলিখিত মৌলিক নীতিটি কখনোই ভুলব না :

জোট গঠনের মাধ্যমে, যেসব সংগঠন নিজেরা দুর্বল, তারা কখনোই টিকে থাকতে পারবে না ।
সংগঠন শক্তিশালী হয়ে ওঠে , কিন্তু প্রায়শই দেখা যায় যে একটি শক্তিশালী সংগঠন দুর্বল সংগঠনগুলোর সাথে জোটবদ্ধ হয়ে তার শক্তি হারায়। এটা বিশ্বাস করা ভুল যে দুর্বল গোষ্ঠীর মিলনের ফলেই শক্তি আসে ; কারণ অভিজ্ঞতা দেখায় যে সব ক্ষেত্রেই সংখ্যাগরিষ্ঠরা নির্বোধ এবং শোচনীয় কাপুরুষদের প্রতিনিধিত্ব করে । সুতরাং, একই সংগঠনগুলো দ্বারা নির্বাচিত বহু প্রধানের নেতৃত্বে থাকা অসংখ্য সংগঠন শোচনীয় কাপুরুষ এবং দুর্বলচিত্তদের দয়ার উপর পরিত্যক্ত হয়। এইভাবে, জোটটি পঙ্গু হয়ে পড়ে, সেরাটি বেছে নেওয়ার সংগ্রাম তার সমস্ত অর্থ হারিয়ে ফেলে।

এবং এর ফলে সবচেয়ে স্বাস্থ্যবান ও শক্তিশালীর অবশ্যম্ভাবী এবং চূড়ান্ত বিজয় বাধাগ্রস্ত হয়। এই ধরনের জোটগুলো স্বাভাবিক বিকাশের এই প্রক্রিয়ার জন্য প্রতিকূল, কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা যে সমস্যার জন্য লড়াই করছে তার সমাধানকে ত্বরান্বিত করার পরিবর্তে বিলম্বিত করে ।

নিছক কৌশলগত দৃষ্টিকোণ থেকে এমনটা হতে পারে যে , কোনো আন্দোলনের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য নির্ধারিত হয়ে গেলে তার সর্বোচ্চ নেতৃত্ব নির্দিষ্ট কিছু সমস্যা সমাধানের জন্য এ ধরনের সংগঠনগুলোর সাথে জোট গঠন করতে পারে এবং তাদের সাথে একটি অভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করতে পারে , কিন্তু তা কেবল একটি স্বল্প ও সীমিত সময়ের জন্য। এই ধরনের জোট স্থায়ী হতে পারে না, যদি আন্দোলনটি তার মুক্তিদায়ক উদ্দেশ্য ত্যাগ করতে অস্বীকার করে । কারণ , যদি এটি এমন একটি জোটে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে পড়ে, তবে এটি স্বাভাবিক বিকাশ অনুসারে তার নিজস্ব শক্তির স্বাধীন কাজকে স্বীকৃতি দেওয়ার, প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজিত করার এবং বিজয়ীরূপে তার লক্ষ্য অর্জনের ক্ষমতা ও অধিকার হারাবে ।

এটা কখনোই ভোলা উচিত নয় যে, এই পৃথিবীতে সত্যিকারের কোনো মহৎ কাজ জোটের মাধ্যমে অর্জিত হয়নি , বরং এই ধরনের সাফল্য সর্বদা ব্যক্তির বিজয়ের ফলেই এসেছে। জোটের মাধ্যমে অর্জিত সাফল্যগুলো , তাদের উৎপত্তির প্রকৃতির কারণেই , একেবারে শুরু থেকেই ভবিষ্যতের পতনের বীজ বহন করে; ফলে তারা অর্জিত সবকিছুই হারিয়ে ফেলে । মানব চিন্তাধারায় যে মহান বিপ্লবগুলো ঘটেছে এবং যা সত্যিই পৃথিবীর চেহারা বদলে দিয়েছে, সেগুলো ব্যক্তিবিশেষের মধ্যকার তুমুল সংগ্রাম ছাড়া অকল্পনীয় ও অসম্ভব হতো , কিন্তু কখনোই জোটবদ্ধ প্রচেষ্টা হিসেবে নয় ।

তবে সর্বোপরি, কোনো দেশপ্রেমিক জোটের অন্তর্নিহিত আপোসের আকাঙ্ক্ষার দ্বারা জাতি-রাষ্ট্র গঠিত হবে না , বরং তা কেবল অন্য সকলের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিজয়ী হয়ে ওঠা একটি আন্দোলনের ইস্পাত-কঠিন ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই গড়ে উঠবে।

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

অধ্যায় ৯

প্রকৃতি সম্পর্কিত মৌলিক ধারণা এবং আক্রমণকারী সৈন্যদের সংগঠন

পুরাতন রাষ্ট্রের ক্ষমতা তিনটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল: রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা , আমলা এবং সেনাবাহিনী। ১৯১৮ সালের বিপ্লব এই শাসনব্যবস্থাকে উৎখাত করে , সেনাবাহিনীকে বিলুপ্ত করে এবং আমলাদেরকে দুর্নীতি ও রাজনৈতিক দলগুলোর হাতে ছেড়ে দেয়। এইভাবে, রাষ্ট্রের তথাকথিত কর্তৃত্বকে সমর্থনকারী সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যায়। এই কর্তৃত্ব প্রায় সবসময়ই তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে, যা সকল কর্তৃত্বের অপরিহার্য ভিত্তি।

ক্ষমতা সৃষ্টির জন্য জনসমর্থনই হলো প্রথম প্রয়োজনীয় উপাদান।
কিন্তু শুধুমাত্র এই ভিত্তির উপর নির্ভরশীল ক্ষমতা প্রায়শই দুর্বল, অনিশ্চিত এবং সিদ্ধান্তহীন হয়। অতএব, শুধুমাত্র জনসমর্থনের উপর ভিত্তি করে ক্ষমতা প্রাপ্ত যে কোনো ব্যক্তিকে অবশ্যই বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সেই ক্ষমতার ভিত্তি শক্তিশালী ও সুসংহত করার পদক্ষেপ নিতে হবে। তদনুসারে, আমাদের বলপ্রয়োগকে, বা বরং বলপ্রয়োগের ক্ষমতাকে , সমস্ত ক্ষমতার দ্বিতীয় ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করতে হবে । এই ভিত্তিটি প্রথমটির চেয়ে বেশি স্থিতিশীল ও নিরাপদ, কিন্তু সবসময় শক্তিশালী নয়। যদি জনসমর্থন এবং বলপ্রয়োগ একত্রিত হয় এবং পারে

একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত টিকে থাকার পর , আরও শক্তিশালী ভিত্তির ওপর ক্ষমতার উদ্ভব হতে পারে , আর তা হলো ঐতিহ্য। পরিশেষে, যদি জনপ্রিয় সমর্থন, শক্তি এবং ঐতিহ্য একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত টিকে থাকে, তবে ক্ষমতার উদ্ভব আরও শক্তিশালী ভিত্তির ওপর হতে পারে, আর তা হলো ঐতিহ্য।
একত্রে ঐক্যবদ্ধ হলে, তাদের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত কর্তৃত্বকে অটল বলে গণ্য করা যেতে পারে ।

জার্মানিতে বিপ্লব এই শেষ ভিত্তিটিকেও উৎখাত করেছিল। ঐতিহ্যের আর কোনো কর্তৃত্ব অবশিষ্ট ছিল না ।
পুরাতন রাইখের পতন, রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রত্যাখ্যান , মহিমা ও সাম্রাজ্যিক প্রতীকের সকল পুরাতন চিহ্নের ধ্বংস এবং ঐতিহ্যের চূর্ণবিচূর্ণ হওয়া। ফলস্বরূপ, রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব তার একেবারে ভিত্তি পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল।

রাষ্ট্রশক্তির দ্বিতীয় স্তম্ভ , অর্থাৎ বলপ্রয়োগেরও অস্তিত্ব বিলুপ্ত হলো। বিপ্লব বাস্তবায়নের জন্য, এতদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রের সংগঠিত শক্তির প্রতীক, অর্থাৎ সেনাবাহিনীকে ভেঙে দেওয়া প্রয়োজন ছিল । বস্তুত, সেনাবাহিনীর কিছু অংশকে...

বিপ্লবী যোদ্ধা হিসেবে ব্যবহৃত। সম্মুখ সমরের সেনাবাহিনীগুলো একই মাত্রার এই বিশৃঙ্খলার শিকার হয়নি; কিন্তু সাড়ে চার বছর ধরে বীরত্বের সাথে লড়াই করা গৌরবের রণক্ষেত্রগুলো যখন তারা ধীরে ধীরে পেছনে ফেলে আসছিল, তখন পিতৃভূমিতে ছড়িয়ে পড়া ক্ষয়কারী অ্যাসিডের দ্বারা তারা আক্রান্ত হয় ; এবং যখন তারা সৈন্যমুক্তি কেন্দ্রে পৌঁছায়, তখন তারা সেই বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়ে, যাকে সৈনিক পরিষদের দিনগুলোতে স্বেচ্ছাধীন আনুগত্য বলা হতো ।

অবশ্যই, এই বিদ্রোহী সৈন্যদের ভিড়ের উপর ভিত্তি করে কোনো ধরনের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার প্রশ্নই উঠত না , যারা সামরিক সেবাকে আট ঘণ্টার কাজ বলে মনে করত । সুতরাং, ক্ষমতার স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকারী দ্বিতীয় উপাদানটিও উৎখাত হয়েছিল, এবং বিপ্লবের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য কেবল প্রাথমিক উপাদান, অর্থাৎ জনগণের সমর্থনই অবশিষ্ট ছিল।

কিন্তু এই ভিত্তিটি ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক। কয়েকটি নির্মম আঘাতে বিপ্লব পুরোনো রাষ্ট্রকাঠামোকে একেবারে গোড়া থেকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিল , কিন্তু তার কারণ ছিল এই যে, যুদ্ধের দ্বারা জাতির সামাজিক কাঠামোর স্বাভাবিক ভারসাম্য আগেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

প্রতিটি জাতি তিনটি প্রধান শ্রেণী নিয়ে গঠিত । এক প্রান্তে রয়েছে শ্রেষ্ঠ শ্রেণী—যাদের বলতে আমরা বুঝি নাগরিক সদ্গুণে উচ্চমাত্রায় সমৃদ্ধ এবং নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দেওয়ার সাহস ও ইচ্ছার জন্য পরিচিত । অপর প্রান্তে রয়েছে মানবজাতির নিকৃষ্টতম অংশ, যাদের মধ্যে পাপ ও স্বার্থপরতাই প্রধান।

এই দুই চরমপন্থার মাঝে তৃতীয় একটি শ্রেণী রয়েছে , যা বৃহত্তর মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে নিয়ে গঠিত , যাদের মধ্যে উজ্জ্বল বীরত্ব বা স্থূল আত্মম্ভরিতা কোনটাই দেখা যায় না।

একটি জাতি কেবল শ্রেষ্ঠ নেতার নেতৃত্বেই সমৃদ্ধি লাভ করে।

Machine Translated by Google

স্থিতিশীল পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক ও প্রতিসম বিকাশের অস্তিত্ব এবং বাহ্যিকভাবে দৃশ্যমান বৈশিষ্ট্যগুলো মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রভাবশালী ভূমিকার ওপর নির্ভরশীল। এই পর্যায়ে, দুটি চরম শ্রেণী পরস্পরকে ভারসাম্য দেয় ; অন্য কথায়, তারা পরস্পরকে বাতিল করে দেয়।

একটি জাতির পতন তখনই ঘটে যখন নিকৃষ্টতম উপাদানগুলো প্রাধান্য পায়।

তবে এখানে জোর দিয়ে বলা উচিত যে , আমি যাকে মধ্যম স্তর বলেছি , সেই বৃহত্তর জনসাধারণ কেবল তখনই তাদের প্রভাব বিস্তার করে যখন দুটি চরমপন্থী স্তর পারস্পরিক সংঘাতে লিপ্ত থাকে। যখন একটি চরমপন্থী স্তর বিজয়ী হয়, তখন মধ্যম স্তর তার আধিপত্য মেনে নেয়। যদি সেরাদের সেরা জয়ী হয়, তবে বৃহত্তর জনসাধারণও তাদের অনুসরণ করে।

যদি নিকৃষ্টতমরা জয়ী হয় , তবে মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাদের প্রতিরোধ করবে না ; কারণ
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত জনসাধারণ কখনো নিজেদের লড়াই নিজেরা লড়ে না।

সাড়ে চার বছরের যুদ্ধকালীন রক্তের স্রোত এই তিনটি স্তরের মধ্যকার অভ্যন্তরীণ ভারসাম্যকে ধ্বংস করে দিয়েছিল , এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আত্মত্যাগকে স্বীকার করে বলা যেতে পারে যে , যুদ্ধের সময় সেরা উপাদান দিয়ে গঠিত স্তরটি প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, কারণ ঐ সাড়ে চার বছরে যে বিপুল পরিমাণ বীর জার্মান রক্ত ঝরেছিল, তার শূন্যস্থান পূরণ করা অসম্ভব ছিল। লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে, এরা সবসময়ই ছিল 'ফ্রন্টের জন্য স্বেচ্ছাসেবক', টহলের জন্য স্বেচ্ছাসেবক, খবর পৌঁছে দেওয়ার জন্য স্বেচ্ছাসেবক, টেলিফোন সংযোগ স্থাপনের জন্য স্বেচ্ছাসেবক, সেতু নির্মাণের জন্য স্বেচ্ছাসেবক, সাবমেরিনের জন্য স্বেচ্ছাসেবক, বিমান বাহিনীর জন্য স্বেচ্ছাসেবক, আক্রমণকারী ব্যাটালিয়নের জন্য স্বেচ্ছাসেবক, ইত্যাদি। সাড়ে চার বছর ধরে, হাজার হাজার ক্ষেত্রে, স্বেচ্ছাসেবকদের সবসময়ই প্রয়োজন ছিল। এবং ফলাফল সবসময় একই ছিল। দাড়িবিহীন যুবক এবং পরিণত পুরুষ, সকলেই দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসায় পূর্ণ , তাদের সাহসী চেতনা বা কর্তব্যের মহৎ অনুভূতি দ্বারা চালিত – এরাই ছিল সেইসব মানুষ যারা সবসময় ডাকে সাড়া দিয়েছিল।

লক্ষ লক্ষ এমন সৈন্য এগিয়ে গিয়েছিল, এবং এই ধরনের মানব সম্পদ ক্রমশ দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ছিল। যারা নিহত হয়নি, তারা হয় যুদ্ধে পঙ্গু হয়েছিল অথবা ক্রমাগত আঘাতের কারণে ধীরে ধীরে অক্ষমদের কাতারে যোগ দিয়েছিল , এবং এ থেকেই এই সৈন্যদের অবিরাম ক্ষতি শুরু হয়েছিল। ১৯১৪ সালে, পুরো সেনাবাহিনীই ছিল স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে গঠিত , যারা আমাদের কিছু অযোগ্য সংসদ সদস্যের অপরাধমূলক বিবেকহীনতার কারণে শান্তিকালীন সময়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ পায়নি এবং শত্রুর বিরুদ্ধে নিক্ষিপ্ত অরক্ষিত কামানের খোরাকে পরিণত হয়েছিল। ফ্ল্যান্ডার্সের যুদ্ধক্ষেত্রে যে চার লক্ষ সৈন্য নিহত বা স্থায়ীভাবে পঙ্গু হয়েছিল, তাদের কোনো কিছু দিয়েই পূরণ করা সম্ভব ছিল না। তাদের ক্ষতি ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি।

কেবলমাত্র সংখ্যাগত। তাদের মৃত্যুর সাথে সাথে , যে ভারসাম্যটি ইতিমধ্যেই সর্বোত্তম মানবিক গুণাবলীর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সামাজিক কাঠামোর দিকে অতিমাত্রায় ঝুঁকে ছিল, তা তীব্রভাবে উপরে উঠে দাঁড়ালো, এবং পরিণত হলো
দুষ্ট ও কাপুরুষদের পক্ষ আরও ভারী হয়েছে — সংক্ষেপে, আমাদের সমাজের নিকৃষ্টতম অংশের উপাদানগুলোর সংখ্যা বেড়েছে
।

এবং আরও একটা ব্যাপার ছিল : সাড়ে চার বছর ধরে যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের সেরা সৈন্যরা ভয়ানকভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছিল, অথচ আমাদের সবচেয়ে খারাপ সৈন্যরা অলৌকিকভাবে পালাতে সক্ষম হয়েছিল। যে প্রত্যেক বীর চূড়ান্ত আত্মত্যাগ করে ভালহালায় প্রবেশ করেছিল, তার বিপরীতে এমন একজন অলস ব্যক্তিও ছিল, যে দেশে ফিরে কমবেশি দরকারি কাজে জড়িত থাকার অজুহাতে চতুরতার সাথে মৃত্যুকে এড়িয়ে গিয়েছিল।

যুদ্ধের শেষে চিত্রটি ছিল নিম্নরূপ : দেশের বৃহৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণি তাদের কর্তব্য পালন করেছিল এবং রক্তের কর প্রদান করেছিল। আমাদের জাতির শ্রেষ্ঠ অংশ বীরত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল এবং প্রায় সম্পূর্ণরূপে নিজেদের উৎসর্গ করেছিল। অপর চরমপন্থী অংশটি, যা ছিল জাতির নিকৃষ্টতম উপাদান দ্বারা গঠিত , তারা উদ্ভট আইন এবং সামরিক বিধির কিছু ধারা প্রয়োগে কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতার সুযোগ নিয়ে প্রায় অক্ষত অবস্থায় টিকে গিয়েছিল।

আমাদের জাতির এই সযত্নে সংরক্ষিত নিকৃষ্টতমরাই বিপ্লবটি সংঘটিত করেছিল। এবং তারা তা করতে সক্ষম হয়েছিল কারণ তাদের বিরোধিতা করার মতো আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠদের নিয়ে গঠিত কোনো স্তর আর অবশিষ্ট ছিল না। তাদের আর অস্তিত্ব ছিল না।

এই কারণেই জার্মান বিপ্লব একেবারে শুরু থেকেই জাতির কেবল একটি স্তরের উপর নির্ভরশীল ছিল। এই কাজটি সমগ্র জার্মান জাতি দ্বারা সংঘটিত হয়নি, বরং দুর্বৃত্ত, পলাতক সৈন্য এবং গুণ্ডাদের দ্বারা করা হয়েছিল।

Machine Translated by Google

রণাঙ্গনের লোকটি এমন এক সংঘাতের অবসানকে স্বাগত জানিয়েছিল , যেখানে এত রক্ত ঝরেছিল। সে বাড়ি ফিরে তার স্ত্রী ও সন্তানদের আবার দেখতে পেয়ে খুশি হয়েছিল। কিন্তু বিপ্লবের সাথে তার কোনো নৈতিক সংযোগ ছিল না। সে বিপ্লবকে পছন্দ করত না, আর যারা এর উস্কানি দিয়েছিল ও আয়োজন করেছিল , তাদেরও না। রণাঙ্গনে এই সাড়ে চার বছরের তিক্ত সংগ্রামের সময় সে বাড়ির দলীয় হায়েনাদের কথা ভুলে গিয়েছিল , এবং তাদের ঝগড়াঝাঁটি তার কাছে অচেনা হয়ে উঠেছিল ।

বিপ্লবটি প্রকৃতপক্ষে জনপ্রিয় ছিল কেবল জার্মান জাতির একটি ক্ষুদ্র অংশের মধ্যেই: অর্থাৎ, সেই শ্রেণী এবং তাদের অনুচরদের মধ্যে, যারা এই নতুন রাষ্ট্রের সকল সম্ভ্রান্ত নাগরিকের পরিচায়ক বৈশিষ্ট্য হিসেবে পিঠের ব্যাগ বা ব্যাকপ্যাককে বেছে নিয়েছিল । তারা বিপ্লবটিকেই অপছন্দ করত, যদিও অনেকে ভুলবশত এর বিপরীতটাই বিশ্বাস করত, কিন্তু মূলত এর পরিণতির কারণেই তারা তা করত না।

কিন্তু এই মার্ক্সবাদী দস্যুদের জনপ্রিয় সমর্থনের ওপর ভিত্তি করে কোনো অটল শক্তি গড়ে তোলা অত্যন্ত কঠিন ছিল । তবুও, নবগঠিত প্রজাতন্ত্রটির যেকোনো মূল্যে কর্তৃত্ব প্রয়োজন ছিল, নইলে স্বল্পকালীন বিশৃঙ্খলার পর জাতির শ্রেষ্ঠ অংশের শেষ অবশিষ্ট উপাদানগুলো নিয়ে গঠিত কোনো শক্তির হাতে তার পতন ঘটুক ।

বিপ্লবের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা সেই সময়ে যে বিপদটিকে সবচেয়ে বেশি ভয় পেতেন, তা হলো — তাদের নিজেদের সৃষ্ট বিশৃঙ্খলার মধ্যে তাদের পায়ের তলার মাটি সরে যাবে এবং হঠাৎ করেই তাদের লৌহমুষ্টিতে আবদ্ধ করে অন্যত্র নির্বাসিত করা হবে , যেমনটা জাতিসমূহের ইতিহাসে এমন মুহূর্তে প্রায়শই ঘটে এসেছে। যেকোনো মূল্যে প্রজাতন্ত্রকে সুসংহত করতে হতো।

সুতরাং, গঠনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, তারা জনপ্রিয়তার কম্পমান স্তম্ভের পাশাপাশি আরেকটি স্তম্ভ গড়ে তুলতে বাধ্য হয়েছিল। তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে, তাদের ক্ষমতার আরও দৃঢ় ভিত্তি স্থাপনের জন্য বাহিনীটিকে পুনর্গঠন করতে হবে ।

১৯১৮ সালের ডিসেম্বর এবং ১৯১৯ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে যারা বিপ্লবের অগ্রদূত ছিলেন, তারা যখন নিজেদের পায়ের তলার মাটি কাঁপতে অনুভব করলেন, তখন তারা এমন লোক খুঁজতে শুরু করলেন যারা সামরিক সহায়তা দিয়ে তাদের শক্তিশালী করতে প্রস্তুত থাকবে ; কারণ তাদের দুর্বল অবস্থান কেবল তাদের প্রাপ্ত সাধারণ সমর্থনের উপরই নির্ভরশীল ছিল । "সামরিকতাবিরোধী" প্রজাতন্ত্রের সৈন্য প্রয়োজন ছিল। কিন্তু রাষ্ট্রের ক্ষমতার প্রথম এবং একমাত্র স্তম্ভ, অর্থাৎ জনপ্রিয়তা, একদল গুণ্ডা, চোর, ডাকাত, পলাতক সৈন্য, ভবঘুরে ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল ছিল । তাই, দেশের এই অংশে এই নতুন আদর্শের নামে জীবন উৎসর্গ করতে ইচ্ছুক লোক খোঁজার কোনো অর্থ ছিল না । যারা বিপ্লবী ধারণা পোষণ করতেন এবং বিপ্লব বাস্তবায়ন করেছিলেন, তারা নিজেদের রক্ষার জন্য সৈন্যদের সাহায্য নিতে সক্ষমও ছিলেন না, ইচ্ছুকও ছিলেন না ।

একটি প্রজাতন্ত্র। তাদের লক্ষ্য একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করা ছিল না , বরং যা আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল তাকে অসংগঠিত করা এবং এর মাধ্যমে নিজেদের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা। তাদের স্লোগান একটি জার্মান প্রজাতন্ত্র গঠন ও নির্মাণ করা ছিল না, বরং তাকে লুণ্ঠন করা ছিল।

সুতরাং, হাজারো আশঙ্কায় জর্জরিত জাতির প্রতিনিধিদের এই সাহায্যের ডাকে জনগণের এই স্তরের মধ্যে কোনো সাড়া মেলেনি , বরং তা তিক্ততা ও প্রত্যাখ্যানের জন্ম দিয়েছিল। তারা এই পদক্ষেপকে বিশ্বাস ও আস্থার পতনের সূচনা হিসেবে দেখেছিল এবং এমন এক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার মধ্যে, যা আর জনসমর্থনের উপর নয়, বরং শক্তির উপরও নির্ভরশীল ছিল, তারা বিপ্লবের মূল অর্থ কী, তার বিরুদ্ধে শত্রুতার সূচনা দেখেছিল। তারা আশঙ্কা করেছিল যে, মুক্ত হয়ে যাওয়া একদল চোর ও লুটেরা —সংক্ষেপে, নিকৃষ্টতম উচ্ছৃঙ্খল জনতা— কর্তৃক লুণ্ঠনের অধিকার এবং নিরঙ্কুশ আধিপত্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে শিকল ছুঁড়ে ফেলল ।

জাতির প্রতিনিধিরা যতই চিৎকার করুক না কেন, এই উন্মত্ত জনতার কাছ থেকে তারা কোনো সাহায্য পাবে না । তাদের সাহায্যের আর্তনাদের জবাবে , শাসনব্যবস্থা যাদের সমর্থনের ওপর নির্ভর করত, তারাই 'বিশ্বাসঘাতক' বলে চিৎকার করে উঠল ।

তখন, প্রথমবারের মতো, অনেক তরুণ জার্মান তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী ‘শান্তি ও শৃঙ্খলা’র সেবায় আবারও উর্দি পরতে, কাঁধে রাইফেল তুলে নিতে এবং পিতৃভূমির ধ্বংসকারীদের বিরুদ্ধে লড়তে ইস্পাতের শিরস্ত্রাণ পরিধান করতে প্রস্তুত ছিল। স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠন করা হয়েছিল, এবং যদিও তারা বিপ্লবকে ঘৃণা করত, তারা এর পক্ষ সমর্থন করতে শুরু করেছিল। তাদের এই কাজের বাস্তব ফল ছিল বিপ্লবকে আরও শক্তিশালী ও স্থিতিশীল করা। এই কাজটি করার সময় তারা সরল বিশ্বাসেই করেছিল।

Machine Translated by Google

বিপ্লবের প্রকৃত সংগঠক এবং নেপথ্যের কারিগর ছিলেন একজন আন্তর্জাতিক ইহুদি, যিনি পরিস্থিতি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করেছিলেন। জার্মান জাতি তখনও বলশেভিজমের সেই রক্তাক্ত জলাভূমিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত ছিল না, যেদিকে রুশ জাতিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল । এর কারণ ছিল জার্মান বুদ্ধিজীবী ও শ্রমিকদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ জাতিগত সম্পর্ক এবং সমাজের বিস্তৃত স্তরে সংস্কৃতিবান মানুষের উপস্থিতি — যা অন্যান্য পশ্চিম ইউরোপীয় দেশেও বিদ্যমান ছিল ; কিন্তু রাশিয়ায় এর সম্পূর্ণ অভাব ছিল। সেই দেশে বুদ্ধিজীবীরা প্রধানত রুশ জাতিগোষ্ঠীর ছিলেন না , অথবা অন্তত তাদের মধ্যে স্লাভীয় জাতিগত বৈশিষ্ট্য ছিল না। সেই সময়ে রাশিয়ায় বিদ্যমান বুদ্ধিজীবীদের এই ক্ষীণ স্তর যেকোনো মুহূর্তে উৎখাত হয়ে যেতে পারত , কারণ জনগণের বিশাল অংশের সাথে একে জৈবিকভাবে সংযুক্ত করার মতো কোনো মধ্যবর্তী স্তর ছিল না । এই জনগণের মানসিক ও নৈতিক স্তর ছিল ভয়াবহভাবে নিম্ন।

যখন রাশিয়ার আন্দোলনকারীরা নিরক্ষর বিশাল জনসাধারণকে উচ্চশিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মহলের বিরুদ্ধে উসকানি দিতে সফল হয়েছিল , যাদের সাথে তাদের কোনো স্থায়ী সম্পর্ক ছিল না , তখন রাশিয়ার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল এবং বিপ্লবের সাফল্য নিশ্চিত হয়েছিল। এরপরে, নিরক্ষর রুশরা ইহুদি স্বৈরশাসকদের দাসে পরিণত হয়েছিল, যারা নিজেদের স্বৈরশাসনকে ' জনগণের স্বৈরশাসন ' বলে অভিহিত করার মতো যথেষ্ট ধূর্ত ছিল।

জার্মানির ক্ষেত্রে একটি অতিরিক্ত বিষয় অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে । এখানে বিপ্লব কেবল তখনই চালানো সম্ভব ছিল , যদি প্রথমে সেনাবাহিনীকে পর্যায়ক্রমে ভেঙে দেওয়া যেত ।
কিন্তু বিপ্লব এবং সেনাবাহিনীর ভাঙনের আসল স্থপতি সম্মুখ সমরে যুদ্ধ করা সৈনিক ছিল না, বরং ছিল সেইসব বদমাশরা যারা প্রচারের আলো থেকে দূরে থাকত এবং হয় দেশের সেনানিবাসে থাকত অথবা দেশের ব্যবসায়িক জগতে 'অপরিহার্য' বলে বিবেচিত হত । এই সেনাবাহিনীকে সমর্থন জুগিয়েছিল হাজার হাজার পলাতক সৈন্য, যারা নিজেদের জীবনের ঝুঁকি না নিয়েই সম্মুখ সমর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল । প্রত্যেক সত্যিকারের হতভাগ্য কাপুরুষ মৃত্যুকে সবচেয়ে বেশি ভয় পায়। কিন্তু সম্মুখ সমরে, মৃত্যু তাকে প্রতিদিন হাজারো রূপে মোকাবিলা করত। দুর্বল ও দোদুল্যমান মানুষদের, এমনকি হতভাগ্য কাপুরুষদেরও, তাদের কর্তব্য দৃঢ়ভাবে পালনে বাধ্য করার জন্য সবসময় কেবল একটিই উপায় ছিল । এর অর্থ হলো , পলাতক সৈন্যকে এটা বোঝাতে হতো যে, পলায়ন তার উপর ঠিক সেই জিনিসটিই ডেকে আনবে যা থেকে সে পালাচ্ছে। সম্মুখ সমরে একজন মানুষ হয়তো মরতে পারে, কিন্তু একজন পলাতক সৈন্যকে মরতেই হবে। যেকোনো পলায়নের চেষ্টার বিরুদ্ধে কেবল এই কঠোর হুমকিই এক ভয়ঙ্কর প্রভাব ফেলতে পারে , শুধু ব্যক্তির উপর নয়, বরং জনসাধারণের উপরও। এখানেই সামরিক দণ্ডবিধির অর্থ ও উদ্দেশ্য নিহিত ।

এই ভাবনাটি সুন্দর ছিল যে, জাতির অস্তিত্ব রক্ষার মহান সংগ্রাম কেবল স্বেচ্ছামূলক আনুগত্যের ভিত্তিতেই পরিচালিত হতে পারে ; এই আনুগত্য জন্ম নেয় এই জ্ঞান থেকে যে , এমন একটি সংগ্রাম অপরিহার্য এবং সেই জ্ঞান দ্বারাই তা টিকে থাকে। স্বেচ্ছায় কর্তব্য পালনই কেবল শ্রেষ্ঠ মানুষদের কার্যকলাপকে পরিচালিত করে, সাধারণ মানুষকে নয়। অতএব, বিশেষ আইনের প্রয়োজন ; যেমন, উদাহরণস্বরূপ, চুরির বিরুদ্ধে আইনটি সৎ মানুষদের জন্য নয়, বরং দুর্বল ও অস্থির প্রকৃতির মানুষদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। এই ধরনের আইনের উদ্দেশ্য হলো এর প্রতিরোধমূলক প্রভাবের মাধ্যমে দুষ্কৃতকারীদের নিবৃত্ত করা এবং এমন পরিস্থিতি প্রতিরোধ করা, যেখানে একজন সৎ মানুষকে বোকা বলে মনে করা হয় এবং খালি হাতে থাকা বা লুণ্ঠিত হওয়ার চেয়ে ডাকাতিতে অংশ নেওয়া শ্রেয় বলে মনে করা হয় ।

এটা বিশ্বাস করা ভুল ছিল যে, এমন একটি যুদ্ধে—যা সমস্ত মানবিক ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে বেশ কয়েক বছর ধরে চলতে পারে — এই উপায়গুলো ছাড়া কাজ চালানো সম্ভব হবে , যেগুলোর কার্যকারিতা শত শত ও হাজার হাজার বছর ধরে দুর্বল ও অস্থির মানুষদের কঠিন সময়ে এবং চরম মানসিক চাপের মুহূর্তে তাদের কর্তব্য পালনে বাধ্য করার ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে ।

সামরিক আইন অনুযায়ী একজন বীর স্বেচ্ছাসেবকের জন্য মৃত্যুদণ্ড অবশ্যই প্রয়োজনীয় নয়, কিন্তু জাতীয় সংকটের মুহূর্তে কাপুরুষ ও স্বার্থপর ব্যক্তিদের জন্য তা প্রয়োজনীয়, যারা নিজেদের সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের চেয়ে নিজেদের জীবনকে বেশি মূল্য দেয়। এমন দুর্বল ও চরিত্রহীন ব্যক্তিদের কাপুরুষতা থেকে বিরত রাখার একমাত্র উপায় হলো কঠোরতম শাস্তি আরোপ করা। যখন সৈন্যদের প্রতিদিন মৃত্যুর সাথে লড়াই করতে হয় এবং সপ্তাহের পর সপ্তাহ কর্দমাক্ত পরিখায় থাকতে হয় , প্রায়শই খুব সামান্য খাবার নিয়ে, তখন যে ব্যক্তি আত্মবিশ্বাসহীন এবং দ্বিধান্বিত হতে শুরু করে, তাকে হুমকি দিয়ে তার পদে আটকে রাখা যায় না ।

Machine Translated by Google

কারাদণ্ড বা এমনকি দণ্ডমূলক শ্রম । এটি কেবল মৃত্যুদণ্ড নির্মমভাবে প্রয়োগের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব । অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, একজন নবীন সৈনিক কারাগারকে হাজার গুণ বেশি ভয় পায়।
যুদ্ধক্ষেত্রের চেয়ে ভালো। কারাগারে অন্তত তার মূল্যবান জীবন বিপদের সম্মুখীন হয় না । যুদ্ধকালীন সময়ে মৃত্যুদণ্ডের কার্যত বিলুপ্তি ছিল একটি ভুল, যার জন্য আমাদের চরম মূল্য দিতে হয়েছে। এই ভুলের মূল অর্থ ছিল যে, সামরিক দণ্ডবিধিকে যথাযথ বলে মনে করা হয়নি । বিশেষ করে ১৯১৮ সালে, পলাতক সৈন্যদের একটি বিশাল বাহিনী পশ্চাৎবর্তী ঘাঁটিগুলোতে দলে দলে যোগ দেয় অথবা গ্রামে ফিরে আসে এবং একটি বৃহৎ অপরাধী সংগঠন গড়ে তুলতে শুরু করে , যার মুখোমুখি আমাদের হঠাৎ করেই হতে হয়েছিল ১৯১৮ সালের ৭ই নভেম্বরের পর , এবং যারা বিপ্লব সংঘটিত করেছিল।

এসবের সাথে রণাঙ্গনের কোনো সম্পর্ক ছিল না। অবশ্যই, রণাঙ্গনের সৈন্যরা শান্তি কামনা করত। কিন্তু এই ব্যাপারটিই বিপ্লবের জন্য এক বিশেষ বিপদ ডেকে এনেছিল।
যুদ্ধবিরতির পর জার্মান সৈন্যরা যখন দেশে ফিরতে শুরু করল, তখন বিপ্লবীরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল এবং একই প্রশ্ন করতে থাকল: সম্মুখসারির সৈন্যরা কী করবে?

এই সপ্তাহগুলোতে, বিপ্লবকে অন্তত বাহ্যিকভাবে সংযমের একটি রূপ ধারণ করতে হতো , নইলে কয়েকটি জার্মান ডিভিশনের হাতে তা সঙ্গে সঙ্গেই চূর্ণ হয়ে যেত । এই সময়ে, যদি মাত্র একটি ডিভিশনের কমান্ডার তার সৈন্যদের—যারা সবসময় তার প্রতি অনুগত ছিল—লাল পতাকাগুলো ছিঁড়ে ফেলতে এবং দেয়ালের সাথে 'পরিষদ'গুলো স্থাপন করতে , অথবা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে মর্টার ও গ্রেনেড দিয়ে সেগুলো ভেঙে ফেলতে আক্রমণে পাঠাতেন, তাহলে সেই ডিভিশনটি চার সপ্তাহেরও কম সময়ে ষাটটি ডিভিশনের একটি সেনাবাহিনীতে পরিণত হতে পারত। নেপথ্যের কলকাঠি নাড়া ইহুদিরা অন্য যেকোনো কিছুর চেয়ে এতেই বেশি আতঙ্কিত ছিল ; এই বিশেষ বিপদ এড়ানোর জন্য, বিপ্লবকে কিছুটা সংযমের রূপ দেওয়াটা তাদের কাছে জরুরি মনে হয়েছিল । তারা একে বলশেভিজমে পরিণত হতে দেওয়ার সাহস করেনি , তাই তাদের এর মোকাবিলা করতে হয়েছিল।

'শৃঙ্খলা ও শান্তির' এক ভণ্ড প্রতিচ্ছবি তৈরি করে বিদ্যমান পরিস্থিতির মোকাবিলা করা । একারণেই বহু গুরুত্বপূর্ণ ছাড় দেওয়া হয়েছিল, পুরনো কর্মকর্তা এবং পুরনো সেনাবাহিনীর প্রধানদের কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল । অন্তত কিছু সময়ের জন্য তাদের প্রয়োজন ছিল, এবং কেবল যখন তাদের উদ্দেশ্য পূরণ হবে, তখনই তারা নির্লজ্জভাবে প্রাপ্য এক লাথি খেতে পারবে। তারপর প্রজাতন্ত্রকে রাষ্ট্রের পুরনো কর্মচারীদের হাত থেকে সম্পূর্ণরূপে ছিনিয়ে নিয়ে বিপ্লবীদের মুঠোয় তুলে দেওয়া হবে।

তারা ভেবেছিল যে, নতুন শাসনব্যবস্থার আপাত নিরীহ ও নির্দোষ প্রকৃতির মাধ্যমে পুরোনো সেনাপতি ও কর্মকর্তাদের বোকা বানানো এবং যেকোনো সম্ভাব্য বিরোধিতাকে নিরস্ত্র করার এটাই একমাত্র উপায় ছিল ।

কার্যক্ষেত্রে দেখা গেছে এই পরিকল্পনাটি কতটা সফল ছিল।

কিন্তু বিপ্লবটি শান্তিপূর্ণ ও ভদ্র মানুষদের দ্বারা পরিচালিত হয়নি , বরং বিদ্রোহী, চোর এবং দস্যুদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। এবং বিপ্লবটি যেভাবে বিকশিত হয়েছিল, তা এই শেষোক্ত পক্ষগুলোর অভিপ্রায়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না ; এবং কৌশলগত কারণে, ঘটনাপ্রবাহ কেন এই দিকে মোড় নিয়েছে তার কারণ তাদের কাছে ব্যাখ্যা করা এবং তাদের সম্মতি আদায় করা অসম্ভব ছিল।

সমাজতন্ত্র ক্রমান্বয়ে ক্ষমতায় আসার সাথে সাথে, এটি একটি কঠোর বিপ্লবী দলের বৈশিষ্ট্যগুলো ক্রমশ হারাতে থাকে। অবশ্যই, সমাজতন্ত্রীরা মনে মনে বিপ্লব চাইত; এবং তাদের নেতাদের অন্য কোনো লক্ষ্য ছিল না। নিশ্চয়ই না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত, কেবল একটি বিপ্লবী কর্মসূচিই ছিল; তা বাস্তবায়নে সক্ষম কোনো জনগণ ছিল না। এক কোটি সদস্যের একটি দল বিপ্লব ঘটাতে পারে না। যদি এমন কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা করা হতো , তবে নেতারা দেখতেন যে , তাদের জনসংখ্যার চরমপন্থী অংশের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে না, বরং মধ্যস্তরের ব্যাপক জনগণের উপর; অর্থাৎ, নিষ্ক্রিয় জনগণের উপর।

এই সবকিছু উপলব্ধি করে , ইহুদিরা যুদ্ধের সময়ই সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিতে সেই বিখ্যাত বিভাজন ঘটিয়েছিল। সোশ্যাল ডেমোক্রেসি যখন তার সমর্থকদের জড়তার কারণে জাতীয় প্রতিরক্ষার গলায় সীসার ওজনের মতো ঝুলে ছিল, তখন সক্রিয় ও আমূল পরিবর্তনকামী গোষ্ঠীগুলো এর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত নতুন আগ্রাসী বাহিনী গঠন করেছিল। ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোশ্যালিস্ট পার্টি এবং স্পার্টাকাস লীগ ছিল বিপ্লবী মার্ক্সবাদের প্রধান আক্রমণকারী বাহিনী। তাদের কাজ ছিল এমন একটি সম্পন্ন পরিস্থিতি তৈরি করা, যার ভিত্তিতে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি সেই অবস্থান নিতে পারে যার জন্য তারা অনেক আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়েছিল। অযোগ্য বুর্জোয়া শ্রেণিকে মার্ক্সবাদীরা তাদের প্রকৃত মূল্য অনুযায়ী বিচার করেছিল এবং বদমাশ হিসেবে গণ্য করেছিল। কেউই তাদের পাত্তা দেয়নি , কারণ তারা ভালো করেই জানত যে তাদের নিজেদের মধ্যেই...

Machine Translated by Google

পুরাতন ও জীর্ণ প্রজন্মের প্রতিনিধিরা কুকুরের দাসত্বের বিরুদ্ধে কোনো গুরুতর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে না।

যখন বিপ্লব সফল হলো এবং এর কারিগররা বিশ্বাস করতে শুরু করল যে পুরাতন রাজ্যের প্রধান স্তম্ভগুলো ভেঙে ফেলা হয়েছে, এবং রণাঙ্গন থেকে ফিরে আসা সেনাবাহিনী অন্ধকার স্ফিংসের আলোয় আবির্ভূত হতে শুরু করল , তখন বিপ্লবের গতি মন্থর করা প্রয়োজন হয়ে পড়ল। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা বিজিত অঞ্চলগুলো দখল করে নিল, এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোশ্যালিস্ট ও স্পার্টাকাস লীগের আক্রমণকারী বাহিনীগুলোকে একপাশে সরিয়ে দেওয়া হলো।

তবে, এই পরিবর্তন বিনা বাধায় ঘটেনি।

যে সক্রিয় আক্রমণকারী দলগুলো বিপ্লব শুরু করেছিল, তারা অসন্তুষ্ট ছিল এবং নিজেদের প্রতারিত মনে করছিল। তারা নিজেরাই লড়াই চালিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের অন্তহীন
এমনকি বিপ্লবের নেপথ্যের কারিগরদের কাছেও জবরদস্তি ঘৃণ্য হয়ে উঠেছিল। যখন দুটি শিবিরের আবির্ভাব ঘটল, তখন বিপ্লব সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না। এক শিবিরে ছিল শান্তি ও শৃঙ্খলার উপাদান , অন্যটিতে রক্তপাত ও সন্ত্রাসের। এটা কি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল না যে বুর্জোয়া শ্রেণি তাদের পতাকা ওড়াতে ওড়াতে শান্তি ও শৃঙ্খলার শিবিরে ছুটে যাবে ? তাদের জীবনে প্রথমবারের মতো , তাদের করুণ রাজনৈতিক সংগঠনগুলো সক্রিয় হতে পেরেছিল, কারণ তাদের জন্য একটি নতুন ভিত্তি খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়েছিল ; এবং তাই, কিছুটা হলেও, তারা এমন একটি শক্তির সাথে জোটবদ্ধ হয়েছিল যাকে তারা ঘৃণা করত এবং ভয় পেত। জার্মান রাজনৈতিক বুর্জোয়া শ্রেণি বলশেভিজমের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য অভিশপ্ত মার্ক্সবাদী নেতাদের সাথে যোগ দিতে পেরে সম্মানিত বোধ করেছিল।

সুতরাং , ১৯১৮ সালের ডিসেম্বর এবং ১৯১৯ সালের জানুয়ারি মাসেই পরিস্থিতি নিম্নরূপ ছিল-
সহ:

সবচেয়ে নিকৃষ্ট উপাদান নিয়ে গঠিত একটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠী বিপ্লব সংঘটিত করে। এই সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর পরপরই সমস্ত মার্ক্সবাদী দলগুলো বিপ্লবে যোগ দেয়। বিপ্লবটির বাহ্যিক রূপ ছিল সংযমের , যা ধর্মান্ধ চরমপন্থীদের শত্রুতা জাগিয়ে তোলে। তারা হামলা শুরু করে।

গ্রেনেড ও মেশিনগান নিয়ে সরকারি ভবনগুলো দখল করে বিপ্লবের সংযত রূপকে ধ্বংস করার হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। এই সন্ত্রাসের আরও বিস্তার রোধ করতে, নতুন শাসনব্যবস্থার প্রতিনিধি এবং পুরাতন ব্যবস্থার সমর্থকদের মধ্যে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যাতে তারা চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে যৌথভাবে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে পারে। ফলস্বরূপ, প্রজাতন্ত্রের শত্রুরা সরাসরি প্রজাতন্ত্রের বিরোধিতা করা বন্ধ করে দেয় এবং যারা সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে হলেও প্রজাতন্ত্রের শত্রু ছিল, তাদের দমন করতে সাহায্য করে। কিন্তু এর আরও একটি ফল ছিল এই যে, পুরাতন রাষ্ট্রের সমর্থকদের দ্বারা নতুন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করার যেকোনো বিপদ অবশেষে এড়ানো গিয়েছিল।

আমাদের অবশ্যই এটি সর্বদা মনে রাখতে হবে। কেবল এটি মনে রাখলেই আমরা বুঝতে পারব, কীভাবে এটা সম্ভব হলো যে, যে জাতির দশ ভাগের নয় ভাগ মানুষ বিপ্লবে যোগ দেয়নি, যেখানে দশ ভাগের সাত ভাগ একে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং দশ ভাগের ছয় ভাগ একে ঘৃণা করত—সেই জাতিটি কীভাবে অবশিষ্ট দশ ভাগের দ্বারা বিপ্লবকে নিজের উপর চাপিয়ে দিতে দিল।

ধীরে ধীরে স্পার্টাকাস লীগ শিবিরের ব্যারিকেডের বীরেরা ভেঙে পড়লেন , যেমনটা পড়ল অপর পক্ষের জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক ও আদর্শবাদীরাও। এই দুটি গোষ্ঠীর ক্রমাগত হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে , মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জনগণ বরাবরের মতোই বিজয়ী হলো। বুর্জোয়া ও মার্ক্সবাদীরা একটি অমোঘ পরিণতির ভিত্তিতে মিলিত হলো এবং প্রজাতন্ত্র শক্তিশালী হতে শুরু করল। তবে , প্রথমদিকে এটি বুর্জোয়া দলগুলোকে তাদের রাজতন্ত্রপন্থী ধারণা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া থেকে কিছু সময়ের জন্য বিরত রাখতে পারেনি , বিশেষ করে নির্বাচনের সময়, যখন তারা তাদের দুর্বল সমর্থকদের সমর্থন জোগাতে মৃত অতীতের প্রেতাত্মাদের আহ্বান করার চেষ্টা করত। এটি কোনো আন্তরিক কাজ ছিল না। মনে মনে তারা অনেক আগেই রাজতন্ত্রের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল ; কিন্তু নতুন শাসনের এই জঘন্য রূপ নৈতিক অবক্ষয় ছড়াতে শুরু করে , যা বুর্জোয়া দলগুলোর মধ্যেও অনুভূত হতে থাকে। গড়পড়তা বুর্জোয়া রাজনীতিবিদ এখন তাঁর স্মৃতিতে বেঁচে থাকা অস্তিত্বহীন রাষ্ট্রের সরল শালীনতার চেয়ে প্রজাতান্ত্রিক দুর্নীতির চোরাবালিতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন।

* * *

Machine Translated by Google

আমি আগেই যেমন ইঙ্গিত দিয়েছি, সেনাবাহিনী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর বিপ্লবী নেতারা একটি নতুন শক্তি তৈরি করে রাষ্ট্রক্ষমতা শক্তিশালী করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে , তারা কেবল তাদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গির সরাসরি বিরোধী একটি বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির সমর্থকদের নিজেদের পক্ষে এনেই এটি করতে পারতেন । শুধুমাত্র এই উপাদানগুলো থেকেই ধীরে ধীরে একটি নতুন সেনাবাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল । শান্তিচুক্তি দ্বারা সংখ্যাগতভাবে সীমিত হওয়ায়, নতুন শাসনের একটি হাতিয়ারে পরিণত হওয়ার জন্য এটিকে আধ্যাত্মিকভাবে রূপান্তরিত করতে হয়েছিল।

পুরাতন রাষ্ট্রের ত্রুটিগুলো, যা বিপ্লবের প্রকৃত কারণ হয়ে উঠেছিল, সেগুলোকে একপাশে রেখে যদি আমরা প্রশ্ন করি যে কীভাবে বিপ্লবটি সফলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছিল, তাহলে আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হব:

আমাদের কর্তব্য ও আনুগত্যের ধারণার পচনশীলতার কারণেই এটি সম্ভব হয়েছিল ।
২. এটি সম্ভব হয়েছিল সেইসব পক্ষের নিষ্ক্রিয় সংকোচের কারণেও , যাদের সামর্থ্য থাকার কথা ছিল। রাষ্ট্রীয় রক্ষীবাহিনী ।

এর সাথে অবশ্যই যোগ করতে হবে: আমাদের কর্তব্য ও আনুগত্যের ধারণাকে যে পচন ধরেছে, তার ভিত্তি ছিল আমাদের সম্পূর্ণ অ-জাতীয় এবং নিছক রাষ্ট্র- ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা। এ থেকেই লক্ষ্য ও উপায়কে গুলিয়ে ফেলার অভ্যাসের জন্ম হয়েছে । কর্তব্যবোধ , কর্তব্য পালন এবং আনুগত্য নিজে কোনো লক্ষ্য নয় , যেমন রাষ্ট্রও নিজে কোনো লক্ষ্য নয়; বরং এগুলোকে এমন এক জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বকে সহজতর ও নিশ্চিত করার উপায় হিসেবে ব্যবহার করা উচিত, যারা শারীরিক ও আধ্যাত্মিকভাবে সম্পর্কিত। যখন একটি জাতি স্পষ্টতই পতনের দিকে ধাবিত হয়, এবং যখন সমস্ত বাহ্যিক লক্ষণ ইঙ্গিত দেয় যে কিছু দুষ্কৃতকারীর কর্মকাণ্ডের কারণে এটি নির্মম নিপীড়নের শিকার হচ্ছে , তখন এই লোকদের প্রতি আনুগত্য এবং তাদের প্রতি একজন ব্যক্তির কর্তব্য পালন করা কেবলই মতবাদগত আনুষ্ঠানিকতা এবং নিছক উন্মাদনা; অপরদিকে, এমন পরিস্থিতিতে আনুগত্য করতে এবং নিজের কর্তব্য পালন করতে অস্বীকার করাই জাতিকে পতন থেকে বাঁচাতে পারে। আমাদের বর্তমান

রাষ্ট্র সম্পর্কে বুর্জোয়া ধারণা অনুসারে, যদি কোনো মেজর জেনারেল ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে গুলি না করার আদেশ পেয়ে তা পালন করেন, তবে তিনি সঠিক কাজই করেছেন; কারণ বুর্জোয়া মানসিকতার কাছে জাতির জীবনের চেয়ে অন্ধ আনুষ্ঠানিক আনুগত্য অধিক মূল্যবান । কিন্তু জাতীয় সমাজতান্ত্রিক ধারণা অনুসারে, এমন মুহূর্তে দুর্বল ঊর্ধ্বতনদের প্রতি আনুগত্য প্রাধান্য পাওয়া উচিত নয় ; তখন সমগ্র জাতির প্রতি ব্যক্তিগত দায়িত্ব গ্রহণের বাধ্যবাধকতা উদ্ভূত হয়।

বিপ্লবটি সফল হয়েছিল, কারণ এই ধারণাটি আমাদের দেশে, বা বলা ভালো আমাদের সরকারে, একটি প্রাণশক্তি হিসেবে তার কার্যকারিতা হারিয়ে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং নিছক আনুষ্ঠানিক ও মতবাদগত বিষয়ে পরিণত হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিষয়টির প্রসঙ্গে বলা যায় যে , বুর্জোয়া দলগুলোর অযোগ্যতার গভীরতর কারণ হলো এই যে, আমাদের জাতির সবচেয়ে সক্রিয় ও সৎ অংশটি যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছিল। অধিকন্তু, বুর্জোয়া দলগুলো—যাদেরকে পুরাতন রাষ্ট্রের পক্ষাবলম্বী একমাত্র রাজনৈতিক দল হিসেবে গণ্য করা যায় —এই বিশ্বাসে অটল ছিল যে, তাদের নীতিগুলোকে কেবল বুদ্ধিবৃত্তিকভাবেই রক্ষা করা উচিত , যেহেতু শারীরিক শক্তির ব্যবহার রাষ্ট্রের জন্যই সংরক্ষিত ছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গিটি ছিল দুর্বলতা ও অবক্ষয়ের একটি লক্ষণ, যা ক্রমশ বিকশিত হচ্ছিল। এটি এমন এক সময়ে অর্থহীনও ছিল, যখন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ অনেক আগেই এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করেছিল এবং এর পরিবর্তে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিল যে, তারা যখনই সম্ভব শক্তি প্রয়োগ করে তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জন করতে চায়। যখন বুর্জোয়া গণতন্ত্রের জগতে গণতন্ত্রেরই একটি পরিণতি হিসেবে মার্কসবাদের আবির্ভাব ঘটে , তখন মার্কসবাদের বিরুদ্ধে কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক অস্ত্র দিয়ে লড়াই করার জন্য বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পাঠানো আহ্বানটি ছিল এক উন্মাদনা, যার জন্য পরবর্তীকালে এক ভয়াবহ মূল্য দিতে হয়েছিল। মার্কসবাদ সর্বদা এই মতবাদ প্রচার করেছে যে, শক্তির ব্যবহারকে অবশ্যই আত্মস্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হবে এবং সাফল্যই শক্তির ব্যবহারকে ন্যায্যতা দেয়।

Machine Translated by Google

এই ধারণাটি ১৯১৮ সালের ৭ থেকে ১০ নভেম্বর পর্যন্ত তার কার্যকারিতা প্রমাণ করেছিল। মার্ক্সবাদীরা সংসদ বা গণতন্ত্রের তোয়াক্কা করত না , কিন্তু তারা তাদের অপরাধীদের দল লেলিয়ে দিয়ে এবং নরক নামিয়ে এনে সেগুলোকে এক মারাত্মক আঘাত হেনেছিল।

বিপ্লব শেষ হলে, বুর্জোয়া দলগুলো তাদের নাম পরিবর্তন করে হঠাৎ করেই পুনরায় আবির্ভূত হলো ; অন্ধকার বেসমেন্ট বা অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল গুদামঘর, যেখানে তারা আশ্রয় নিয়েছিল, সেখান থেকে বীর নেতারা বেরিয়ে এলেন। কিন্তু, সেকেলে প্রতিষ্ঠানের সকল প্রতিনিধিদের মতোই , তারাও তাদের ভুলগুলো ত্যাগ করেনি , কিংবা নতুন কিছু শেখেনি । তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি ছিল অতীতের উপর ভিত্তি করে, যদিও তারা নিজেরা নতুন শাসনের সাথে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছিল । তাদের লক্ষ্য ছিল নতুন প্রতিষ্ঠানে নিজেদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা, এবং তারা তাদের একমাত্র অস্ত্র হিসেবে শব্দ ব্যবহার করতে থাকল।

এই কারণেই বিপ্লবের পর বুর্জোয়া দলগুলো শোচনীয়ভাবে রাজপথে আত্মসমর্পণ করেছিল ।

যখন প্রজাতন্ত্র সুরক্ষা আইনটি প্রবর্তন করা হয়েছিল, তখন প্রাথমিকভাবে বেশিরভাগই এর বিরোধিতা করেছিল । কিন্তু রাস্তায় দুই হাজার মার্ক্সবাদীর বিক্ষোভের সম্মুখীন হয়ে বুর্জোয়া " রাষ্ট্রনায়করা " এতটাই ভীত হয়ে পড়েছিলেন যে, তারা নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আইনটির পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন, এই ভয়ে যে অন্যথায় রাইখস্ট্যাগ থেকে বেরিয়ে আসার সময় ক্ষুব্ধ জনতা তাদের মাথা ফাটিয়ে দিতে পারে।

আর এভাবেই নতুন রাষ্ট্রটি তার নিজস্ব গতিতে গড়ে উঠল, যেন কোনো অস্তিত্বই ছিল না জাতীয় বিরোধিতা।

সেই সময়ে মার্কসবাদ এবং ক্ষুব্ধ জনতার মোকাবেলা করার মতো শক্তি ও সাহস কেবলমাত্র যে সংগঠনগুলোর ছিল , সেগুলো হলো—সর্বপ্রথম স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, তারপর আত্মরক্ষা সংগঠন, বেসামরিক প্রতিরক্ষা এবং সবশেষে পুরাতন সেনাবাহিনীর অব্যাহতিপ্রাপ্ত সৈন্যদের সমিতিগুলো ।

কিন্তু নিম্নলিখিত কারণগুলোর জন্য এই সংগঠনগুলোর অস্তিত্ব জার্মান ইতিহাসের গতিপথে উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি : ঠিক

যেমন তথাকথিত জাতীয় দলগুলোর রাস্তায় কার্যকরভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শনের সক্ষমতা না থাকায় তাদের কোনো প্রভাব ছিল না, তেমনি প্রতিরক্ষা লীগগুলোও কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, কারণ তাদের কোনো রাজনৈতিক ধারণা ছিল না এবং বিশেষত, তাদের কোনো সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্যও ছিল না।

রাজনৈতিক লক্ষ্য ও নির্মম শক্তির নিখুঁত সমন্বয়ের কারণেই মার্ক্সবাদ সফল হয়েছিল । পাশবিক শক্তি এবং বিচক্ষণতার সাথে নির্বাচিত রাজনৈতিক লক্ষ্যের মধ্যে নির্ণায়ক সমন্বয়ের অভাবে জার্মান জাতীয়তাবাদীরা জার্মানির উন্নয়নে প্রভাব ফেলার সকল আশা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল।

'জাতীয়তাবাদী' দলগুলোর আকাঙ্ক্ষা যাই হোক না কেন , লড়াই করার মতো শক্তি তাদের ছিল না। এই আকাঙ্ক্ষাগুলো সম্পর্কে, বিশেষ করে রাস্তায়।

প্রতিরক্ষা লীগগুলোর হাতে প্রয়োজনীয় শক্তি ছিল। তারা রাজপথ ও রাষ্ট্রের অধিপতি ছিল, কিন্তু জার্মান জাতির স্বার্থ এগিয়ে নেওয়ার মতো রাজনৈতিক ধারণা ও লক্ষ্যের অভাব ছিল তাদের। উভয় ক্ষেত্রেই, ধূর্ত ইহুদিটি চতুর প্ররোচনার মাধ্যমে শক্তি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল।
ইতিমধ্যে বিদ্যমান প্রবণতাকে কাজে লাগিয়ে এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতিকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং একই সাথে একে আরও গভীরে প্রোথিত করা । ইহুদি তার গণমাধ্যম ব্যবহার

করে প্রতিরক্ষা সংগঠনগুলোকে "অরাজনৈতিক" হিসেবে বিদেশে ছড়িয়ে দিতে চমৎকার সাফল্য অর্জন করেছে, এবং রাজনীতিতে সে এই সংগ্রামের বিশুদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তিক চরিত্রের প্রশংসা করতে এবং এটিকে সর্বদা সেই স্তরেই রাখার দাবি জানাতে যথেষ্ট বিচক্ষণতা দেখিয়েছে।

লক্ষ লক্ষ জার্মান নির্বোধ বিন্দুমাত্র কারণ ছাড়াই এই উন্মাদনার পুনরাবৃত্তি করেছিল। এই সন্দেহ যে, এমনটা করার মাধ্যমে তারা কার্যত নিজেদের নিরস্ত্র করে ফেলে এবং অসহায়ভাবে ইহুদিদের হাতে ধরা দেয় ।

কিন্তু এখানেও একটি স্বাভাবিক ব্যাখ্যা রয়েছে । এমন কোনো মহৎ ধারণার অনুপস্থিতি, যা সবকিছুকে নতুন করে বদলে দেবে, তা সর্বদাই সংগ্রামের শক্তিকে সীমিত করে দেয়। এমনকি সবচেয়ে নৃশংস অস্ত্র ব্যবহারের অধিকারের প্রতি বিশ্বাস সর্বদাই বিশ্বের এক নতুন ও বৈপ্লবিক রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তার প্রতি এক প্রবল বিশ্বাসের সাথে যুক্ত থাকে।

Machine Translated by Google

যে আন্দোলন এমন মহান লক্ষ্য ও আদর্শের জন্য সংগ্রাম করে না, সে কখনো ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না।

একটি নতুন ও মহৎ ধারণার উদ্ভবই ছিল ফরাসি বিপ্লবের সাফল্যের রহস্য।
রাশিয়ার বিপ্লবের বিজয়ের পেছনে একটি ধারণার অবদান রয়েছে। আর কেবল একটি ধারণাই ফ্যাসিবাদকে একটি গোটা জাতিকে সম্পূর্ণ নবায়নের প্রক্রিয়ার অধীনে বিজয়ীরূপে নিয়ে আসার সুযোগ করে দিয়েছিল।

বুর্জোয়া দলগুলো এমন কৃতিত্ব অর্জনে অক্ষম। আর শুধু বুর্জোয়া দলগুলোই যে অতীতের পুনরুজ্জীবনকে তাদের লক্ষ্য হিসেবে দেখেছিল , তা নয় । প্রতিরক্ষা সংগঠনগুলোও বিষয়টিকে এভাবেই দেখত , যদি আদৌ তাদের কোনো রাজনৈতিক লক্ষ্য থেকে থাকে। পুরোনো যুদ্ধ সৈন্যদলের চেতনা তাদের মধ্যে বেঁচে ছিল, এবং এভাবেই তা জার্মান জাতির সবচেয়ে ধারালো অস্ত্রটিকে রাজনৈতিকভাবে ভোঁতা করে দিয়েছিল ও প্রজাতন্ত্রীদের হাতে সেটিকে মরিচা ধরতে সাহায্য করেছিল। এই সংগঠনগুলো যে সর্বোত্তম উদ্দেশ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল এবং অবশ্যই সরল বিশ্বাসে কাজ করেছিল, সেই সত্যটি তাদের বেছে নেওয়া পথের মূর্খতাকে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করে না।

একীভূত রাইখসভেয়ারে, মার্কসবাদ ধীরে ধীরে তার শাসনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তিগুলোর সমর্থন লাভ করে। এর যৌক্তিক পরিণতিস্বরূপ, এটি বিপজ্জনক বলে বিবেচিত প্রতিরক্ষা সংগঠনগুলোকে বিলুপ্ত করার পদক্ষেপ নেয় এবং সেগুলোকে আর প্রয়োজনীয় নয় বলে ঘোষণা করে । মার্কসবাদী আদেশ অমান্যকারী কিছু বেপরোয়া নেতাকে বিচারের আওতায় এনে কারারুদ্ধ করা হয় । কিন্তু তারা সবাই তাদের প্রাপ্য শাস্তিই পেয়েছিল।

* * *

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক জার্মান শ্রমিক দলই ছিল প্রথম আন্দোলন, যার লক্ষ্য বুর্জোয়া দলগুলোর মতো যান্ত্রিকভাবে অতীতকে পুনরুদ্ধার করা ছিল না , বরং বর্তমানের অযৌক্তিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে একটি জাতি-রাষ্ট্র দ্বারা প্রতিস্থাপন করা ছিল।

প্রতিষ্ঠার প্রথম দিন থেকেই নতুন আন্দোলনটি এই নীতি মেনে চলেছিল যে এর ধারণাগুলি অবশ্যই হতে হবে
বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়ে এর প্রচার করা হয় , কিন্তু যখনই প্রয়োজন হয়, এই প্রচারণাকে সমর্থন করার জন্য শারীরিক শক্তি ব্যবহার করতে হয়। নতুন মতবাদের সর্বোচ্চ গুরুত্বের প্রতি তাদের বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতি রেখে , নতুন আন্দোলনের নেতারা স্বাভাবিকভাবেই মনে করেন যে আন্দোলনের লক্ষ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনো ত্যাগই খুব বেশি নয় ।

আমি জোর দিয়েছিলাম যে, বিশেষ পরিস্থিতিতে , জনগণের মন জয় করতে চায় এমন একটি আন্দোলনকে তার প্রতিপক্ষের সন্ত্রাসী অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে নিজস্ব শক্তি দিয়ে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। বিশ্ব ইতিহাস জুড়ে ধারাবাহিকভাবে এটাই ঘটেছে যে , আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ একটি বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা অনুপ্রাণিত সন্ত্রাসের রাজত্ব ভাঙতে ব্যর্থ হয়েছে । এই সন্ত্রাসকে কেবল একটি নতুন ও ভিন্ন বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি দ্বারাই পরাজিত করা সম্ভব , যার প্রতিনিধিরা সমানভাবে সাহসী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই সত্যটি স্বীকার করা রাষ্ট্রের রক্ষক আমলাদের জন্য সবসময়ই খুব অপ্রীতিকর ছিল , কিন্তু তা সত্ত্বেও সত্যটি রয়েই গেছে। রাষ্ট্রের শাসকেরা কেবল তখনই শান্তি ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে পারেন, যখন রাষ্ট্র সমগ্র জাতির দ্বারা ধারণকৃত বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গিকে মূর্ত করে তোলে; যাতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী শক্তিগুলোকে বিচ্ছিন্ন অপরাধী হিসেবে গণ্য করা যায় , তাদের ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত কোনো ধারণার প্রবক্তা হিসেবে নয় ।

সরকারি দৃষ্টিকোণ থেকে। যদি তাই হয় , তবে রাষ্ট্র তাকে হুমকি দেওয়া সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শতাব্দীর মধ্যে সবচেয়ে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই সমস্ত ব্যবস্থাই বৃথা প্রমাণিত হবে।
সব বৃথা যাবে এবং রাষ্ট্রের পতন ঘটবে ।

জার্মান রাষ্ট্র মার্ক্সবাদের দ্বারা তীব্রভাবে আক্রান্ত হচ্ছে। সত্তর বছর ধরে চলা সংগ্রামে রাষ্ট্র মার্ক্সবাদী ভাবধারার বিজয়কে প্রতিহত করতে পারেনি।
হাজার হাজার বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং রক্তক্ষয়ী দমনপীড়নের মাধ্যমেও , যা অগণিত ক্ষেত্রে মার্ক্সবাদী বিশ্বদৃষ্টির প্রবক্তাদের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল, রাষ্ট্র অবশেষে প্রায় সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছিল। সাধারণ বুর্জোয়া রাজনৈতিক নেতারা এটি অস্বীকার করবেন , কিন্তু তাদের প্রতিবাদ এখনও চলছে ।

বেল্ট।

Machine Translated by Google

যেহেতু রাষ্ট্র ১৯১৮ সালের ৯ই নভেম্বর মার্ক্সবাদের কাছে নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ করেছিল, তাই এটি আগামীকালই হঠাৎ করে মার্ক্সবাদের বিজেতা হিসেবে আবির্ভূত হবে না। বরং ঠিক তার উল্টো। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে বসে থাকা বুর্জোয়া নির্বোধরা শ্রমিকদের ইচ্ছানুযায়ী শাসন করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে অনর্গল বকবক করে , এবং ' শ্রমিক ' শব্দটি দিয়ে তারা মার্ক্সবাদীদেরই বোঝায়।
জার্মান শ্রমিককে মার্কসবাদের সঙ্গে এক করে দেখার মাধ্যমে তারা কেবল সত্যের এক জঘন্য বিকৃতির জন্যই দোষী নয়, বরং এভাবে তারা মার্কসবাদ ও মার্কসবাদী সংগঠনের ধারণা থেকে নিজেদের পতনকেও আড়াল করার চেষ্টা করে।

মার্ক্সবাদীদের কাছে বর্তমান রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ অধীনতার মুখে , জাতীয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন কেবল জনগণের যুক্তির কাছে আবেদন জানিয়ে তার আদর্শের বিজয়ের পথ প্রস্তুত করতেই নয়, বরং আত্মবিজয়ে মত্ত এক আন্তর্জাতিকের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিরক্ষা সংগঠিত করার দায়িত্বও আরও বেশি করে গ্রহণ করতে বাধ্য বোধ করছে ।

আমি আগেই বর্ণনা করেছি, কীভাবে আমাদের নবীন আন্দোলনের বাস্তব অভিজ্ঞতা ধীরে ধীরে আমাদের সভা রক্ষার জন্য একটি ব্যবস্থা সংগঠিত করতে পরিচালিত করেছিল। ক্রমান্বয়ে, এটি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত একটি সামরিক সংস্থার রূপ ধারণ করে এবং যথাযথভাবে সংগঠিত কর্মীসহ একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ার জন্য সচেষ্ট হয় ।

এই নতুন বিন্যাসটি বাহ্যিকভাবে রক্ষণাত্মক সংগঠনের মতো দেখতে লাগলেও , বাস্তবে এদের মধ্যে তুলনা করার কোনো ভিত্তি নেই ।

যেমনটা আমি আগেই বলেছি, জার্মান প্রতিরক্ষা সংগঠনগুলোর নিজস্ব কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ধারণা ছিল না। বাস্তবে, সেগুলো ছিল নিছক পারস্পরিক প্রতিরক্ষা সমিতি, এবং সেই অনুযায়ীই তাদের প্রশিক্ষণ ও সংগঠন করা হয়েছিল, যাতে তারা রাষ্ট্রের বৈধ শক্তির এক অবৈধ পরিপূরক বা সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে । মুক্ত বাহিনী হিসেবে তাদের এই বৈশিষ্ট্যটি তাদের গঠন প্রক্রিয়া এবং তৎকালীন রাষ্ট্রের পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। কিন্তু তারা অবশ্যই এই যুক্তিতে নিজেদের মুক্ত বাহিনী বলে দাবি করতে পারত না যে, তারা ছিল নিজেদের স্বাধীনভাবে গঠিত রাজনৈতিক মতাদর্শের জন্য লড়াই করার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় ও ব্যক্তিগতভাবে গঠিত সমিতি । বিষয়টি এমন ছিল না, যদিও তাদের কিছু নেতা এবং কিছু সমিতি নিজেরাই প্রজাতন্ত্রের কট্টর বিরোধী ছিল। উচ্চতর অর্থে রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে কথা বলার আগে , বিদ্যমান ব্যবস্থাটি ত্রুটিপূর্ণ — শুধু এই বিশ্বাসের চেয়েও বেশি কিছু থাকতে হবে। উচ্চতর অর্থে রাজনৈতিক মতাদর্শ বলতে বোঝায়, নিজের মনে একটি নতুন ব্যবস্থার চিত্র থাকা , এর প্রবর্তনকে অপরিহার্য বলে মনে করা এবং এই লক্ষ্যকে জীবনের সর্বোচ্চ কর্তব্য হিসেবে নির্ধারণ করা, যার জন্য একজন তার জীবন উৎসর্গ করতে পারে।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন দ্বারা গঠিত নিরাপত্তা বাহিনীগুলো ভিন্ন ছিল
অন্যান্য সকল প্রতিরক্ষা সংগঠন থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন, কারণ আমাদের বাহিনীগুলোর লক্ষ্য কোনোভাবেই বিপ্লব দ্বারা সৃষ্ট পরিস্থিতিকে রক্ষা করা ছিল না, বরং তা ছিল একচেটিয়াভাবে একটি নতুন জার্মানি গঠনের জন্য আমাদের সংগ্রামকে সমর্থন করা।

প্রথমদিকে , এই বাহিনীটি আমাদের সভাগুলোতে কেবল শৃঙ্খলা রক্ষাকারী হিসেবে কাজ করত। এর প্রথম কাজ ছিল আমাদের সভা আয়োজনে সক্ষম করে তোলা, যা অন্যথায় আমাদের প্রতিপক্ষরা পুরোপুরিভাবে রুদ্ধ করে দিত। এই লোকগুলোকে তখন কেবল আক্রমণের উদ্দেশ্যেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু নির্বোধ জার্মান দেশপ্রেমিক মহলে যেমনটা দাবি করা হতো, তারা লাঠির পূজা করত না। তারা লাঠি ব্যবহার করত কারণ তারা জানত যে ধর্মপ্রচার নিষিদ্ধ ছিল।

মহৎ আদর্শ, যদি সেই আদর্শ প্রচারকারী মানুষটিকেই লাঠির আঘাতে বিনষ্ট করা যেত । বস্তুত, ইতিহাসে বহুবার এমন ঘটেছে যে, শ্রেষ্ঠ মনীষীরা সবচেয়ে নগণ্য দাসদের আঘাতে বিনষ্ট হয়েছেন । আমাদের দেহরক্ষীরা হিংসাকে চূড়ান্ত লক্ষ্য বলে মনে করত না , বরং আদর্শ ও লক্ষ্যের প্রচারকদের প্রতিকূল হিংসার হাত থেকে রক্ষা করত। তারা এও বুঝত যে, রাষ্ট্র যদি জাতির প্রতিরক্ষা নিশ্চিত না করে, তবে তাকে রক্ষা করার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই ; কিন্তু অন্যদিকে, যারা জাতি ও রাষ্ট্রের ধ্বংসের হুমকি দেয়, তাদের হাত থেকে জাতিকে রক্ষা করা তাদের কর্তব্য ছিল।

মিউনিখ হফব্রাউহাউস সভায় সংঘটিত লড়াইয়ের পর, সেখানে উপস্থিত আমাদের অল্পসংখ্যক প্রহরী যে বীরত্বপূর্ণ উপায়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তার জন্য তারা চিরস্থায়ী খ্যাতি লাভ করে; এই প্রহরীদের 'ঝড়ো বাহিনী' বলা হত। যেমন সে নিজে

Machine Translated by Google

নাম থেকেই বোঝা যায়, তারা আন্দোলনের কেবল একটি শাখার প্রতিনিধিত্ব করে। সংবাদমাধ্যম, প্রচারমাধ্যম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং দলের অন্যান্য অংশের মতোই তারাও এর একটি উপাদান ।

শুধু সেই স্মরণীয় সভার অভিজ্ঞতা থেকেই নয় , বরং মিউনিখের বাইরে জার্মানির অন্যান্য অংশে আমাদের আন্দোলনকে ক্রমান্বয়ে প্রসারিত করার চেষ্টার মধ্য দিয়েও আমরা উপলব্ধি করেছিলাম যে এই ধরনের একটি সংগঠন তৈরি করা কতটা জরুরি ছিল । যেইমাত্র আমরা মার্ক্সবাদের জন্য হুমকিস্বরূপ বলে প্রতীয়মান হতে শুরু করলাম , মার্ক্সবাদীরা একটি জাতীয় সমাজতান্ত্রিক সভার সমস্ত প্রস্তুতি বানচাল করার কোনো সুযোগই ছাড়ল না । যদি তারা ব্যর্থ হতো, তবে তারা সভাটি ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করত । বলাই বাহুল্য, আকার বা মতাদর্শ নির্বিশেষে সমস্ত মার্ক্সবাদী সংগঠন প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের প্রতিনিধিদের নীতি ও কার্যকলাপকে অন্ধভাবে সমর্থন করেছিল । কিন্তু এটা বলতেই হবে যে, বুর্জোয়া দলগুলো—যাদের মার্ক্সবাদীরা চুপ করিয়ে দিয়েছিল এবং অনেক জায়গায় যারা প্রকাশ্যে কথা বলার সাহস করত না —তারা এক নির্বোধ ও অবোধ্য উপায়ে সন্তুষ্ট হতো যখনই মার্ক্সবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম বাধার সম্মুখীন হতো। বুর্জোয়া দলগুলো এটা ভেবেই খুশি ছিল যে , যাদের বিরোধিতা করতে তারা নিজেরা শক্তিহীন, তাদের পরাজিত করতে আমরা অক্ষম । সেইসব সরকারি কর্মকর্তা , পুলিশ প্রধান, এমনকি মন্ত্রীদের কথাও বলতে হবে, যারা নিজেদেরকে জনগণের কাছে 'জাতীয়তাবাদী' হিসেবে উপস্থাপন করে এবং আমাদের, অর্থাৎ জাতীয় সমাজতন্ত্রীদের সাথে তাদের আলোচনায় নির্লজ্জভাবে মার্ক্সবাদী দালাল হিসেবে কাজ করে নীতিহীনতার এক কলঙ্কজনক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। আর সেইসব ব্যক্তিদের সম্পর্কে কী বলা যায় , যারা ইহুদি সংবাদমাধ্যমে সামান্য প্রশংসার বিনিময়ে তাদের ওপর নির্যাতন চালানোর মতো এতটা নীচ কাজ করেছিল , যাদের বীরোচিত সাহস ও হস্তক্ষেপ— ঝুঁকি উপেক্ষা করেই— কয়েক বছর আগে এক লাল উন্মত্ত জনতার হাতে তাদের ছিন্নভিন্ন হওয়া এবং ল্যাম্পপোস্টে ঝুলিয়ে দেওয়া থেকে আংশিকভাবে রক্ষা করেছিল ?

একদিন এই হতভাগা লোকেরা অবিস্মরণীয় প্রিফেক্ট পোহনারকে বরখাস্ত করেছিল – এমন একজন মানুষ যাঁর অনমনীয় সরলতা তাঁকে সমস্ত দুর্বৃত্তকে ঘৃণা করতে এবং একজন সৎ মানুষ যেভাবে ঘৃণা করে ঠিক সেভাবেই ঘৃণা করতে বাধ্য করেছিল – যিনি বলেছিলেন: "সারা জীবন আমি প্রথমে একজন জার্মান এবং তারপরে একজন কর্মকর্তা হতে চেয়েছি , এবং আমি কখনও সেইসব প্রাণীদের সাথে মিশতে চাইনি যারা, নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য..."

কর্মকর্তারা এমন যে কারো সাথে দেহ বিক্রি করত , যে তাদের প্রভু ও মনিব হতে পারত ।

এটা বিশেষভাবে দুঃখজনক ছিল যে , ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্রের হাজার হাজার সৎ ও অনুগত কর্মচারী শুধু এই ধরনের লোকদের ক্ষমতার অধীনেই আসেনি, বরং তাদের বিবেকহীন নৈতিকতার দ্বারা ধীরে ধীরে কলুষিতও হয়েছিল। অধিকন্তু , এই ধরনের লোকেরা সৎ কর্মকর্তাদের উপর প্রচণ্ড ঘৃণার সাথে অত্যাচার করত, তাদের পদাবনতি ঘটাত এবং পদচ্যুত করত , আর একই সাথে তাদের মিথ্যাচারী ভণ্ডামির সাহায্যে নিজেদের 'জাতীয়তাবাদী' হিসেবে জাহির করত ।

এই ধরনের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে আমরা সমর্থন আশা করতে পারতাম না , এবং খুব বিরল ক্ষেত্রেই তা পেতাম । শুধুমাত্র নিজেদের প্রতিরক্ষা গড়ে তোলার মাধ্যমেই আমাদের আন্দোলন টিকে থাকতে পারত।
নিরাপদ বোধ করা এবং জনসাধারণের মনোযোগ ও সাধারণ সম্মান আকর্ষণ করা, যা আক্রান্ত হলে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম ব্যক্তিরা উপভোগ করে থাকেন ।

অ্যাসল্ট ইউনিটের অভ্যন্তরীণ বিকাশে আমরা এই মৌলিক নীতি গ্রহণ করেছিলাম যে, সদস্যদের কেবল শারীরিকভাবেই উৎকৃষ্ট প্রশিক্ষিত হতে হবে না , বরং এমনভাবে নির্দেশিত হতে হবে যাতে তারা জাতীয় সমাজতান্ত্রিক আদর্শের অটল প্রত্যয়ী প্রচারক হয়ে ওঠে এবং পরিশেষে , তাদের কঠোরতম শৃঙ্খলা পালনে প্রশিক্ষিত হতে হবে। এই সংস্থার সাথে বুর্জোয়া প্রতিরক্ষা সংগঠনগুলোর, এবং বিশেষত কোনো গোপন সংগঠনের কোনো সম্পর্ক ছিল না।

একটি প্রতিরক্ষা সংগঠনের আভাস এড়ানোর জন্য আমি সেই সময়ে ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টির স্টর্ম ট্রুপসকে যে কারণে কঠোরভাবে পর্যবেক্ষণ করতাম, তা নিম্নরূপ: নিছক বাস্তব কারণে, রাষ্ট্রের বিপুল অবদান ছাড়া বেসরকারি সংগঠনগুলোর সম্পদ দিয়ে একটি জাতীয়

প্রতিরক্ষা সংগঠন গড়ে তোলা অসম্ভব । যে কেউ এর অন্যথা ভাবে, সে নিজের শক্তিকে অতিমূল্যায়ন করে। তথাকথিত ভিত্তিতে কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে কোনো সামরিক গুরুত্বসম্পন্ন সংগঠন তৈরি করা একেবারেই অসম্ভব ।

Machine Translated by Google

"স্বেচ্ছামূলক শৃঙ্খলা।" আদেশ কার্যকর করার প্রধান অবলম্বনটি এখানে অনুপস্থিত: শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা । ১৯১৯ সালের শরৎকালে, বা বলা ভালো বসন্তকালে, তখনও "স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী" গঠন করা সম্ভব ছিল , শুধু এই কারণে নয় যে সে সময়ে স্বেচ্ছাসেবী হওয়া অধিকাংশ লোকই পুরোনো সেনা বিদ্যালয় থেকে পাশ করে এসেছিল , বরং এই কারণেও যে সেখানে আরোপিত বাধ্যবাধকতাগুলো ব্যক্তিকে , অন্তত কিছু সময়ের জন্য , সম্পূর্ণ আনুগত্যে বাধ্য করত ।

আজকের স্বেচ্ছাসেবী প্রতিরক্ষা সংগঠনগুলোতে এই চেতনার সম্পূর্ণ অভাব রয়েছে।
এই ধরনের সংগঠন যত বড় হতে থাকে , তার শৃঙ্খলা তত দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ব্যক্তিগত সদস্যদের কাছ থেকে তত কম প্রত্যাশা করা যায় । ফলে, সমগ্র সংগঠনটি ক্রমশ যুদ্ধসঙ্গী ও প্রাক্তন সৈনিকদের পুরোনো অরাজনৈতিক সংগঠনগুলোর চরিত্র ধারণ করে ।

ব্যক্তিকে নিরঙ্কুশ নেতৃত্বের কর্তৃত্ব না দেওয়া হলে বিপুল সংখ্যক মানুষের স্বেচ্ছামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা অসম্ভব । খুব কম সংখ্যক মানুষই স্বেচ্ছায় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই ধরনের আনুগত্য মেনে নেবে , যা সেনাবাহিনীতে স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়।

তাছাড়া , যেখানে প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলোর সম্পদ এতই নগণ্য, সেখানে সামরিক প্রশিক্ষণের একটি যথাযথ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব নয় । এই ধরনের একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ হওয়া উচিত সর্বোত্তম ও সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য জ্ঞান প্রদান করা। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আট বছর কেটে গেছে , এবং এই সময়ে সামরিক বাহিনীতে যোগদানের উপযুক্ত বয়সের কোনো তরুণ জার্মান কোনো সুসংবদ্ধ প্রশিক্ষণ পায়নি । প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলোর লক্ষ্য এমন হতে পারে না যে , যারা ইতোমধ্যেই সামরিক প্রশিক্ষণ পেয়েছে তাদের সবাইকে নিয়োগ করা ; সেক্ষেত্রে , গাণিতিকভাবে হিসাব করা সম্ভব যে শেষ সদস্যটি কখন সংস্থাটি ছেড়ে চলে যাবে । এমনকি ১৯১৮ সালের তরুণ সৈন্যরাও বিশ বছর পর সম্মুখ সমরের জন্য শীঘ্রই অযোগ্য হয়ে পড়বে , এবং আমরা এমন গতিতে এই পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি যা উদ্বেগের কারণ। সুতরাং, প্রতিরক্ষা সমিতিগুলোকে অবশ্যই প্রাক্তন সৈন্যদের পূর্ববর্তী সমিতিগুলোর চরিত্র ক্রমবর্ধমানভাবে গ্রহণ করতে হবে । কিন্তু এটি এমন একটি প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য হতে পারে না , যেটি নিজেকে প্রাক্তন সৈন্যদের সমিতি নয় বরং একটি প্রতিরক্ষা সংস্থা বলে পরিচয় দেয়। এর মাধ্যমে এটি ইঙ্গিত দেয় যে, প্রতিষ্ঠানটি তার কাজকে শুধু প্রবীণ সৈন্যদের মধ্যে ঐতিহ্য রক্ষা ও তাদের একত্রিত করা হিসেবেই দেখে না , বরং জাতীয় প্রতিরক্ষার ধারণাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং এই ধারণাকে বাস্তবে রূপ দিতে সক্ষম বলেও মনে করে, যার অর্থ হলো সামরিক প্রতিরক্ষার জন্য সক্ষম ও প্রশিক্ষিত একদল মানুষ তৈরি করা।

কিন্তু এর অর্থ হলো , যাদের আগে সামরিক প্রশিক্ষণ ছিল না, তাদেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে ।
আর প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলোর জন্য এটা কার্যত অসম্ভব। প্রকৃত সৈন্যরা পারে না
সপ্তাহে এক বা দুই ঘণ্টা প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে । ব্যাপক বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে
আধুনিক যুদ্ধ এখন প্রত্যেক সৈনিকের উপর যে চাপ সৃষ্টি করে, তাতে একজন নবীন সৈনিককে প্রশিক্ষিত সৈন্যে পরিণত করতে দুই বছরের সামরিক সেবা যথেষ্ট নয় । যুদ্ধের সময় রণাঙ্গনে আমরা সবাই দেখেছি, যথাযথ সামরিক প্রশিক্ষণের অভাবে আমাদের তরুণ নবীন সৈনিকদের কী ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করতে হয়েছিল । পনেরো বা বিশ সপ্তাহ ধরে কঠোর শৃঙ্খলায় প্রশিক্ষিত এবং অগণিত আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত স্বেচ্ছাসেবী দলগুলো রণাঙ্গনে কামানের খোরাক হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিল । কেবলমাত্র বয়স্ক ও অভিজ্ঞ সৈন্যদের সারিতে ছড়িয়ে থাকা তরুণ নবীন সৈনিকরাই, যারা চার বা ছয় মাস প্রশিক্ষণ পেত, তারাই রেজিমেন্টের কার্যকর সদস্য হয়ে উঠতে পারত । তাদের ঊর্ধ্বতনদের নির্দেশনায়, তারা ধীরে ধীরে নিজেদের কাজের সাথে মানিয়ে নিত।

এই সবকিছুর পরিপ্রেক্ষিতে, কোনো সুনির্দিষ্ট কমান্ড কর্তৃপক্ষ এবং কোনো অর্থবহ সম্পদ ছাড়া সপ্তাহে এক বা দুই ঘণ্টা তথাকথিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুদ্ধ ইউনিট তৈরি করার চেষ্টা করাটা কতটা অর্থহীন হতে পারে ! এটি হয়তো পুরোনো সৈন্যদের সামরিক প্রশিক্ষণকে সতেজ করতে পারে , কিন্তু নবীন সৈন্যদের পেশাদার সৈনিকে রূপান্তরিত করবে না ।

এই ধরনের কর্মকাণ্ড যে সম্পূর্ণ মূল্যহীন ফল বয়ে আনে, তা এই ঘটনা থেকেও স্পষ্ট হয় যে , ঠিক যখন তথাকথিত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিরক্ষা সংগঠনগুলো নানা প্রতিকূলতা ও প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাবে সংগ্রাম করে প্রচণ্ড চেষ্টা চালাচ্ছে,

প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে কয়েক হাজার সদিচ্ছার মানুষকে প্রশিক্ষণ দেওয়া (কারো অন্যের কথা বিবেচনা করা উচিত নয়)।

Machine Translated by Google

জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে রাষ্ট্র আমাদের তরুণদের শান্তিবাদ ও গণতান্ত্রিক ধারণা শেখায় এবং এর দ্বারা লক্ষ লক্ষ মানুষকে তাদের জাতীয় প্রবৃত্তি থেকে বঞ্চিত করে, তাদের দেশপ্রেমকে বিষিয়ে তোলে এবং ধীরে ধীরে তাদের এমন এক ভেড়ার পালে পরিণত করে, যারা উপর থেকে আসা যেকোনো আদেশ ধৈর্য সহকারে পালন করবে।
এইভাবে তারা তরুণ জার্মানদের মনে এই ধারণাগুলো গেঁথে দেওয়ার জন্য প্রতিরক্ষা সংগঠনগুলোর সমস্ত প্রচেষ্টাকে হাস্যকর করে তোলে।

এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো এই বিষয়টি, যার কারণে আমি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ভিত্তিতে তথাকথিত সামরিক প্রশিক্ষণের যেকোনো প্রচেষ্টার সবসময় বিরোধিতা করে এসেছি ।

যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, উল্লিখিত সমস্ত অসুবিধা সত্ত্বেও, প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলো প্রতি বছর নির্দিষ্ট সংখ্যক জার্মানকে সঠিক মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন , শারীরিকভাবে সক্ষম এবং অস্ত্র ব্যবহারে নিখুঁত কার্যকর সৈনিক হিসেবে প্রশিক্ষণ দিতে পারত, তবুও সেই চূড়ান্ত ফলাফল এমন একটি রাষ্ট্রের কাছে নগণ্যই হবে , যে রাষ্ট্র এই ধরনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে কেবল অবাঞ্ছিতই মনে করে না, বরং প্রকৃতপক্ষে ঘৃণা করে; কারণ এই ধরনের সংগঠন সেইসব রাজনৈতিক নেতাদের ব্যক্তিগত লক্ষ্যের সম্পূর্ণ বিরোধী, যারা রাষ্ট্রের এই বিভাজন ঘটাচ্ছে ।

তাছাড়া, এমন একটি সরকারের অধীনে এই ফলাফল মূল্যহীন হবে, যে সরকার তার কার্যকলাপের মাধ্যমে দেখিয়ে দেয় যে সে দেশের সামরিক শক্তিকে বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা করে না এবং নিজের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজন না হলে তার সাহায্য নিতেও আগ্রহী নয় ।

আর আজকের পরিস্থিতি এটাই। কিছু লোককে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা ভাবাটা কি হাস্যকর নয়?
দশ হাজার লোককে অস্ত্র ব্যবহারে প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং এই প্রশিক্ষণ গোপনে পরিচালনা করা, যেখানে মাত্র কয়েক বছর আগেই রাষ্ট্র সাড়ে আট মিলিয়ন উচ্চ প্রশিক্ষিত সৈন্যের জীবন উৎসর্গ করেছিল এবং তাদের সেবার আর প্রয়োজন তো ছিলই না , বরং তাদের আত্মত্যাগের প্রতি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাদেরকে জনঘৃণার পাত্র করে তুলেছিল ? আমরা কি এমন এক শাসনের জন্য সৈন্য প্রশিক্ষণ দেব , যে শাসন তার সবচেয়ে গৌরবময় সৈন্যদের অপবাদ দিয়েছে ও তাদের উপর থুথু ফেলেছে , তাদের বুক থেকে পদক ও প্রতীকচিহ্ন ছিঁড়ে নিয়েছে, তাদের পতাকা পদদলিত করেছে এবং তাদের কৃতিত্ব নিয়ে উপহাস করেছে? বর্তমান শাসন কি পুরনো সেনাবাহিনীর সম্মান পুনরুদ্ধার করতে এবং যারা একে ধ্বংস ও অপমান করেছে তাদের কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে একটিও পদক্ষেপ নিয়েছে ? একটিও না। বরং , আমি যাদের কথা বলছি, তারাই আজ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত । লাইপজিগে যেমন বলা হতো: "শক্তিশালীরাই আইন তৈরি করে।" কিন্তু যেহেতু আমাদের আজকের প্রজাতন্ত্রে ক্ষমতা সেইসব লোকের হাতেই রয়েছে যারা বিপ্লব ঘটিয়েছিল, এবং যেহেতু সেই বিপ্লব জাতির প্রতি সবচেয়ে লজ্জাজনক বিশ্বাসঘাতকতা—জার্মান ইতিহাসের সবচেয়ে জঘন্যতম কাজ—তারপরে একটি নতুন, তরুণ সেনাবাহিনী গঠনের মাধ্যমে এই ক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করার দাবি করার কোনো কারণ নেই। এটা সাধারণ জ্ঞানের পরিপন্থী ।

১৯১৮ সালের বিপ্লবের পর সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করার ব্যাপারে এই রাষ্ট্র যে গুরুত্ব দিয়েছিল , তা তৎকালীন বৃহৎ আত্মরক্ষা সংগঠনগুলোর প্রতি এর মনোভাবের মাধ্যমে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রতিফলিত হয়।

বিপ্লবের দ্বারা সৃষ্ট হতভাগ্য প্রাণীদের রক্ষা করার কাজে ব্যবহার করা গেলেই তাদের স্বাগত জানানো হতো ।

কিন্তু আমাদের জাতির অপমান যতই ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকল , এই প্রাণীগুলোর প্রতি বিপদও যেন অদৃশ্য হয়ে গেল । যখন প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলোর অস্তিত্বের আর কোনো অর্থ রইল না
রাষ্ট্রীয় নীতি শক্তিশালী করার ফলে তারা অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে । তাই, তাদের নিরস্ত্র ও বিলুপ্ত করার জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল ।

ইতিহাসে রাজপুত্রদের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতার উদাহরণ খুব কমই পাওয়া যায় । কিন্তু নব্য বুর্জোয়াদের মধ্যে এমন একজনও দেশপ্রেমিক নেই, যে বিপ্লবী অগ্নিসংযোগকারী ও খুনিদের কৃতজ্ঞতার আশা করতে পারে —যারা সমাজের ধ্বংসস্তূপের ওপর নিজেদের সমৃদ্ধ করেছে এবং জাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এই প্রতিরক্ষা সংগঠনগুলো তৈরির যৌক্তিকতা নিয়ে ভাবার সময় আমি নিজেকে বারবার জিজ্ঞাসা করেছি: “আমি এই তরুণদের কাদের জন্য প্রশিক্ষণ দেব ? ডাক পেলে তারা কোন কাজে নিয়োজিত হবে?” এই প্রশ্নের উত্তরই আমাদের চলার জন্য সর্বোত্তম নীতিও বাতলে দেয়।

Machine Translated by Google

বর্তমান রাষ্ট্র যদি কোনোদিন প্রশিক্ষিত সৈন্যদের তলব করে , তবে তা কখনোই বিদেশিদের বিরুদ্ধে জাতির স্বার্থ রক্ষার জন্য হবে না, বরং দেশের অভ্যন্তরে সেই প্রতারিত ও বিশ্বাসঘাতকতার শিকার জাতির সাধারণ ক্রোধের বিস্ফোরণ থেকে দেশের নিপীড়কদের রক্ষা করার জন্য হবে, যাদের স্বার্থ ঠকানো হয়েছে।

এই কারণে, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক জার্মান শ্রমিক দলের স্টর্ম ট্রুপসকে একটি সামরিক সংগঠন হিসেবে সংগঠিত করা হবে না। এটি হবে
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ও তার কার্যাবলী রক্ষার হাতিয়ার হওয়া উচিত
সামরিক প্রতিরক্ষা আন্দোলনের কার্যাবলী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি ক্ষেত্রে ।

আর অবশ্যই, অ্যাসল্ট ইউনিট কোনো গোপন সংগঠন হতে পারে না । গোপন সংগঠন শুধুমাত্র অবৈধ উদ্দেশ্যেই তৈরি করা হয় । সুতরাং, এই ধরনের সংগঠনের উদ্দেশ্য তার নিজস্ব প্রকৃতির কারণেই সীমিত। জার্মানদের কথা বলার প্রবণতার কারণে , কোনো বড় সংগঠন গড়ে তোলা , তাকে গোপন রাখা এবং তার লক্ষ্য লুকিয়ে রাখা অসম্ভব । এই ধরনের যেকোনো প্রচেষ্টা চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। শুধু তাই নয়, আজ আমাদের পুলিশ কর্মকর্তাদের হাতে এমন একদল আড়িপাতা ও অন্যান্য নিকৃষ্ট লোক রয়েছে, যারা ত্রিশটি রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে জুডাসের মতো বিশ্বাসঘাতকতা করতে প্রস্তুত ।

তারা যে কোনো গোপন তথ্য আবিষ্কার করুক না কেন। এই ধরনের পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য , আপনার অনুসারীদের প্রয়োজনীয় নীরবতায় আবদ্ধ রাখা অসম্ভব । শুধুমাত্র ছোট ছোট দলই সত্যিকারের গোপন সমিতি হয়ে উঠতে পারে , এবং তাও বছরের পর বছর ধরে বাছাইয়ের পরেই। কিন্তু এই ধরনের দলগুলোর ক্ষুদ্র আকার তাদেরকে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য মূল্যহীন করে তোলে। আমাদের তখন প্রয়োজন ছিল, এবং এখনও প্রয়োজন, একশ বা দুইশ সাহসী ষড়যন্ত্রকারী নয় , বরং আমাদের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির লক্ষ লক্ষ একনিষ্ঠ সমর্থক। কাজটি গোপন বৈঠকে করা যাবে না, বরং শক্তিশালী গণ-সমাবেশের মাধ্যমেই করতে হবে । একটি ছোরা, একটি পিস্তল এবং এক শিশি বিষ আন্দোলনের অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করবে না । এটি শুধুমাত্র রাজপথে থাকা জনগণের সমর্থন জয় করার মাধ্যমেই করা সম্ভব । আমাদের অবশ্যই মার্কসবাদের উপর জয়লাভ করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে জাতীয় সমাজতন্ত্রীরা হয়ে ওঠে

রাস্তার অধিপতি, এবং একদিন রাষ্ট্রেরও শাসক ।

গুপ্ত সংগঠনগুলোর সাথে আরও একটি বিপদ জড়িত আছে। সেটি হলো , এর সদস্যরা প্রায়শই তাদের করণীয় কাজের গুরুত্ব পুরোপুরি ভুল বোঝে এবং বিশ্বাস করতে থাকে যে একটিমাত্র হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমেই জাতির জন্য একটি উন্নততর ভবিষ্যৎ অবিলম্বে নিশ্চিত করা যেতে পারে ।
এই ধরনের বিশ্বাসের ঐতিহাসিক ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় এমন সব ঘটনার উদাহরণ দিয়ে, যেখানে একটি জাতি এমন এক অত্যাচারীর স্বৈরাচারে জর্জরিত হয়েছিল, যে ছিল একাধারে একজন প্রতিভাবান, যার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব তার অবস্থানের অভ্যন্তরীণ সংহতি নিশ্চিত করেছিল এবং তাকে এক ভয়াবহ নিপীড়ন বজায় রাখতে সক্ষম করেছিল। এই ধরনের ক্ষেত্রে, জনগণের মধ্যে এমন কেউ থাকতে পারে যে নিজেকে উৎসর্গ করতে এবং সেই ঘৃণিত ব্যক্তির হৃদয়ে প্রাণঘাতী ইস্পাত বিদ্ধ করতে ইচ্ছুক । এই ধরনের কাজকে জঘন্য বলে মনে করতে হলে , একজনের অবশ্যই সেইসব হতভাগ্য বদমাশদের মতো প্রজাতান্ত্রিক মানসিকতা থাকতে হবে, যারা নিজেদের অপরাধ সম্পর্কে সচেতন । কিন্তু জার্মান জাতির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা রক্ষাকর্তা উইলিয়াম টেলের মাধ্যমে এই ধরনের কাজকে মহিমান্বিত করেছেন।

১৯১৯ ও ১৯২০ সালে এই আশঙ্কা ছিল যে, মহান ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রভাবিত এবং জাতির দুর্ভাগ্যের ভয়াবহতায় অভিভূত হয়ে গোপন সংগঠনগুলোর সদস্যরা তাদের দেশের ধ্বংসকারীদের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করতে পারে, এই বিশ্বাসে যে এতেই জাতির দুর্ভোগের অবসান ঘটবে ।
এই ধরনের সমস্ত প্রচেষ্টা ছিল নিছক উন্মাদনা, কারণ মার্ক্সবাদের বিজয় কোনো একক অসাধারণ ব্যক্তির প্রতিভার কারণে ঘটেনি, বরং বুর্জোয়া শ্রেণীর একটি অংশের চরম অযোগ্যতা ও কাপুরুষতার কারণে ঘটেছিল। আমাদের বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে সবচেয়ে কঠোর সমালোচনা হলো এই উপলব্ধি যে, তারা এমন এক বিপ্লবের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল যা একজনও যোগ্য মানুষ তৈরি করতে পারেনি। তারা কেন রোবস্পিয়ার, দান্তন বা মারার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল তা সহজেই বোঝা যায় ; কিন্তু চরম কেলেঙ্কারি ছিল ক্ষয়িষ্ণু শাইডম্যান, স্থূলকায় এরৎসবের্গার, ফ্রিডরিখ এবার্ট এবং বিপ্লবের আরও অগণিত রাজনৈতিক বামনদের সামনে তাদের নতজানু হওয়া । এমন একজনও মানুষ ছিল না যার মধ্যে বিপ্লবী প্রতিভা দেখা যেত। এখানেই জাতির দুর্ভাগ্য ; সেখানে কেবল বিপ্লবী কীটদেরই অস্তিত্ব ছিল। তাদের একজনের বিনাশ কোনো তাৎপর্য বহন করত না। একমাত্র পরিণতি হতো এই যে , তার জায়গায় সমান স্থূলকায় ও তৃষ্ণার্ত আরেকটি পরজীবী এসে বসত ।

Machine Translated by Google

সেই বছরগুলোতে আমাদের এমন একটি ধারণার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিতে হয়েছিল , যার উৎস ও প্রতিষ্ঠাতারা ছিলেন সত্যিই মহান ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে উদ্ভূত, কিন্তু যার সাথে আমাদের এই জঘন্য যুগের কোনো সাদৃশ্যই ছিল না।

দেয়ালের সাথে লাগানোর প্রশ্নের ক্ষেত্রেও একই উত্তর দেওয়া যেতে পারে ।
এমন একজন যে দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে । শত্রুর কাছে একটি হাউইটজারের অবস্থান ফাঁস করে দেওয়া এক হতভাগাকে গুলি করাটা হাস্যকর ও অযৌক্তিক হবে, যখন সরকারের সর্বোচ্চ পদগুলো এমন একদল উচ্ছৃঙ্খল লোক দখল করে আছে যারা একটি গোটা সাম্রাজ্যের ব্যবসা করেছে, যাদের বিবেকের উপর বৃথা বলিদান হওয়া বিশ লক্ষ মানুষের মৃত্যু , যুদ্ধে পঙ্গু হওয়া লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য দায়ী থাকা, এবং যারা প্রজাতান্ত্রিক শাসনকে একটি সমৃদ্ধ ব্যবসায় পরিণত করেছে, নিজেদের আত্মাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত হতে না দেওয়ার জন্য। এমন একটি রাষ্ট্রে ছোটখাটো বিশ্বাসঘাতকদের নির্মূল করাটা অযৌক্তিক হবে, যার সরকার বড় বিশ্বাসঘাতকদের সমস্ত শাস্তি থেকে অব্যাহতি দিয়েছে। এমনটা সহজেই হতে পারে যে, একদিন একজন আন্তরিক আদর্শবাদী, যিনি দেশপ্রেমের কারণে গোপন অস্ত্রের ভান্ডার সম্পর্কে তথ্য পাচারকারী কোনো হতভাগা গুপ্তচরকে সরিয়ে দিয়েছিলেন, তাকেই দেশের প্রধান বিশ্বাসঘাতকদের দ্বারা জবাবদিহি করতে হবে । আর এখানেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি: একজন ছোটখাটো বিশ্বাসঘাতককে কি আরেকজন ছোটখাটো বিশ্বাসঘাতক দ্বারা সরানো উচিত , নাকি একজন আদর্শবাদী দ্বারা? প্রথম ক্ষেত্রে, ফলাফল অনিশ্চিত থাকবে এবং কৃতকর্মটি প্রায় নিশ্চিতভাবেই পরে প্রকাশ পাবে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, সেই হতভাগা বদমাশকে বহিষ্কার করা হবে , এবং যে আদর্শবাদী হতে পারতেন তার জীবন।

অপরিহার্য জিনিস বিপদে পড়বে ।

ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, বড় চোরেরা মুক্ত থাকলেও ছোটখাটো চোরদের ফাঁসি দেওয়া উচিত নয়। একদিন একটি জাতীয় আদালত নভেম্বরের অপরাধমূলক বিশ্বাসঘাতকতা এবং এর ফলে সৃষ্ট সমস্ত পরিণতির জন্য দায়ী হাজার হাজার সংগঠকের বিচার ও শাস্তি দেবে । এই দৃষ্টান্ত সেইসব ছোটখাটো বিশ্বাসঘাতকদের, যারা শত্রুর কাছে অস্ত্রের অবস্থান ফাঁস করে দিয়েছিল, তাদের চিরতরে একটি প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেবে ।

এইসব বিবেচনার ভিত্তিতে, আমি গোপন সংগঠনে অংশগ্রহণ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করছি, এবং আমি নিশ্চিত করব যে স্টর্ম ট্রুপ যেন সেরকম কোনো চরিত্র গ্রহণ না করে। এই বছরগুলোতে, আমি জাতীয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে তরুণ জার্মানদের দ্বারা পরিচালিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে দূরে রেখেছিলাম; যাদের অধিকাংশই মহৎ আদর্শবাদে অনুপ্রাণিত ছিল, কিন্তু নিজেদের কর্মের শিকার হয়েছিল, কারণ তারা তাদের মাতৃভূমির ভাগ্য বিন্দুমাত্র উন্নত করতে পারেনি ।

* * *

সুতরাং , যদি অ্যাসল্ট ইউনিটটি কোনো সামরিক প্রতিরক্ষা সংস্থা বা গোপন সংস্থা হতে না পারে, তাহলে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলো উদ্ভূত হয় :

এর প্রশিক্ষণ সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং দলের লক্ষ্যের সঙ্গে সবচেয়ে উপযুক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে সংগঠিত করতে হবে । যদি এর সদস্যদের শারীরিক প্রশিক্ষণ নিতেই হয়, তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কুচকাওয়াজ নয় , বরং খেলাধুলার অনুশীলন হওয়া উচিত ।
আমি সবসময়ই বক্সিং এবং জুজুৎসুকে সাধারণ মানের শুটিং প্রশিক্ষণের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছি।
যদি জার্মান জাতির কাছে খেলাধুলায় উচ্চ প্রশিক্ষিত, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ এবং যুদ্ধে উদ্যোগ নিতে প্রস্তুত একদল যুবক থাকত , তবে সেই রাষ্ট্র প্রয়োজনে দুই বছরেরও কম সময়ে একটি সেনাবাহিনী গঠন করতে পারত, যদি সেই ক্যাডার আগে থেকেই বিদ্যমান থাকত। বর্তমান পরিস্থিতিতে, কেবল রাইখসভেয়ারই ক্যাডার সরবরাহ করতে পারে , এমন কোনো প্রতিরক্ষা সংস্থা নয় যারা এর কোনোটিই নয়। কার্যকারিতা

শারীরিক শক্তি ব্যক্তির মধ্যে তার শ্রেষ্ঠত্বের বিশ্বাস ও আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলে, যা সর্বদা কেবল তার নিজের শক্তির সচেতনতার উপরই নির্ভরশীল। ক্রীড়াসুলভ ক্ষিপ্রতা অর্জন করাও প্রয়োজন , যা চলাচলের সুবিধার্থে একটি প্রতিরক্ষামূলক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে ।

২. আক্রমণকারী ইউনিটকে যেকোনো গোপনীয়তার প্রচেষ্টা থেকে রক্ষা করার জন্য , তাদের ইউনিফর্ম শুধু সকলের কাছে তাৎক্ষণিকভাবে শনাক্তযোগ্য হলেই চলবে না, বরং তা তাদের অভিমুখও নির্দেশ করবে এবং এই দিকটি সকলের কাছে সাধারণভাবে জ্ঞাত থাকতে হবে।

Machine Translated by Google

পরিচিত। অ্যাসল্ট স্কোয়াডের সদস্যরা গোপন বৈঠক করতে পারে না, কিন্তু তাদের অবশ্যই প্রকাশ্যে মিছিল করে এবং এইভাবে, তাদের কার্যকলাপের মাধ্যমে, একটি গোপন সংগঠন সম্পর্কিত সমস্ত কিংবদন্তির অবসান ঘটায়। ষড়যন্ত্রকারীদের ছোট ছোট দলে কাজ করার সমস্ত প্রলোভন থেকে তাদের দূরে রাখতে, একেবারে শুরু থেকেই আমাদের তাদের মনে আন্দোলনের মহান আদর্শটি গেঁথে দিতে হয়েছিল এবং তাদের এমনভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে শিক্ষিত করতে হয়েছিল যাতে এই আদর্শকে রক্ষা করার কাজটি তাদের দিগন্তকে প্রসারিত করে এবং ব্যক্তিরা আর কোনো ছোট বা বড় দুষ্কৃতকারীকে সমাজ থেকে নির্মূল করাকে তাদের কাজ বলে মনে না করে , বরং একটি নতুন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের কাজে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করে । এইভাবে, বিদ্যমান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াইকে একটি উচ্চতর স্তরে উন্নীত করা হয়েছিল ।

তুচ্ছ প্রতিশোধ ও ক্ষুদ্র ষড়যন্ত্রকে আধ্যাত্মিক যুদ্ধের পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছে।
সকল রূপে মার্ক্সবাদের ধ্বংসের জন্য একটি বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি ।

৩. আক্রমণকারী দলের জন্য গৃহীত সাংগঠনিক কাঠামো , সেইসাথে এর পোশাক ও সরঞ্জাম, পুরাতন সেনাবাহিনীর থেকে ভিন্ন হতে হবে । এগুলো আক্রমণকারী দলকে অর্পিত কাজের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে বিশেষভাবে তৈরি হতে হবে।

১৯২০ এবং ১৯২১ সালে এই ধারণাগুলোই আমাকে পথ দেখিয়েছিল। আমি নবীন সংগঠনটির সদস্যদের মধ্যে ধীরে ধীরে সেগুলো গেঁথে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম । ফলস্বরূপ, ১৯২২ সালের গ্রীষ্মের মধ্যে আমাদের বিপুল সংখ্যক সদস্য ছিল। একশ জন করে সৈন্য নিয়ে গঠিত দল । সেই বছরের হেমন্তের শেষের দিকে, এই দলগুলো স্বতন্ত্র পোশাক পেয়েছিল। তিনটি ঘটনা ঘটেছিল যা অ্যাসল্ট ইউনিটের পরবর্তী বিকাশের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

১. 'প্রজাতন্ত্র সুরক্ষা আইন'-এর বিরুদ্ধে একটি বিশাল গণ-সমাবেশ। এই সমাবেশটি ১৯২২ সালের গ্রীষ্মের শেষভাগে মিউনিখের কোনিগসপ্লাৎসে সমস্ত দেশপ্রেমিক সংগঠন দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনও এতে অংশগ্রহণ করেছিল। আমাদের দলের শোভাযাত্রাটি সুশৃঙ্খলভাবে এগিয়ে গিয়েছিল, যার নেতৃত্বে ছিল মিউনিখের একশ জন সদস্যের ছয়টি কোম্পানি এবং তাদের পিছনে ছিল দলের রাজনৈতিক শাখাগুলো। দুটি দল আমাদের সাথে হেঁটেছিল এবং প্রায় পনেরোটি পতাকা বহন করছিল। জাতীয় সমাজতন্ত্রীরা যখন বিশাল চত্বরটিতে পৌঁছায়, তখন সেটি ইতিমধ্যেই অর্ধেক পূর্ণ ছিল, কিন্তু কোনো পতাকা উড়ছিল না। আমাদের আগমনে সীমাহীন উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছিল। আমি ব্যক্তিগতভাবে সেই বক্তাদের একজন হিসেবে ভাষণ দেওয়ার সম্মান লাভ করেছিলাম।

প্রায় ষাট হাজার মানুষের কাছে।

এই বিক্ষোভটি এক অভাবনীয় সাফল্য ছিল; বিশেষ করে এই কারণে যে, এটি প্রথমবারের মতো প্রমাণ করেছিল যে রেডদের সমস্ত হুমকি সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদী মিউনিখ রাস্তায় মিছিল করতে পারে । রেড রিপাবলিকের পক্ষাবলম্বনকারী সংগঠনগুলোর সদস্যরা তাদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের মাধ্যমে মিছিলের মিছিলগুলোকে থামানোর চেষ্টা করেছিল , কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই স্টর্ম ট্রুপের কোম্পানিগুলো তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয় এবং তাদের মাথার খুলি রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে। এরপর জাতীয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন প্রথমবারের মতো দেখিয়ে দেয় যে, তারা ভবিষ্যতে রাস্তায় মিছিল করার অধিকার প্রয়োগ করতে এবং এর মাধ্যমে দেশের আন্তর্জাতিক বিশ্বাসঘাতক ও শত্রুদের কাছ থেকে এই একচেটিয়া অধিকার ছিনিয়ে নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

সেদিনের ফলাফলই অকাট্য প্রমাণ করেছিল যে, একটি অ্যাসল্ট ইউনিট গঠনের বিষয়ে আমাদের ধারণাটি মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এবং এর সাংগঠনিক কাঠামো—উভয় দিক থেকেই সঠিক ছিল।

এই সাফল্যের ভিত্তিতে কর্মী নিয়োগ এত দ্রুতগতিতে এগিয়েছিল যে, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই মিউনিখে একশ জন কর্মীবিশিষ্ট কোম্পানির সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল ।

২. ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে কোবার্গ অভিযান ।

কয়েকটি জাতীয় সংগঠন কোবার্গে একটি 'জার্মান দিবস ' আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেয়। আমাকে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এবং তারা চেয়েছিল আমি যেন আমার সমর্থকদেরও সঙ্গে নিয়ে আসি। এই আমন্ত্রণপত্রটি, যা আমি সকাল এগারোটায় পেয়েছিলাম, একেবারে সময়মতো এসে পৌঁছায়। এক ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের অংশগ্রহণের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়ে যায়। আমার সঙ্গে যাওয়ার জন্য আমি অ্যাসল্ট ডিটাচমেন্ট থেকে আটশো জন লোক জড়ো করি। তাদেরকে প্রায় চৌদ্দটি কোম্পানিতে ভাগ করা হয়েছিল এবং মিউনিখ থেকে বিশেষ ট্রেনে করে কোবার্গে নিয়ে আসতে হয়েছিল ।

Machine Translated by Google

যেটি সবেমাত্র একটি গণভোটে বাভারিয়ার সাথে যোগদানের পক্ষে ভোট দিয়েছিল । ইতিমধ্যে অন্যান্য বিভিন্ন স্থানে গঠিত হওয়া ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট স্টর্ম ট্রুপের অন্যান্য দলগুলোকে যথাযথ আদেশ জারি করা হয়েছিল ।

জার্মানিতে এই ধরনের বিশেষ ট্রেন এই প্রথমবার চলেছিল। অ্যাসল্ট ইউনিটের নতুন সদস্যরা যেখানেই আমাদের সাথে যোগ দিত , আমাদের ট্রেনটি সেখানে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করত। অনেকেই এর আগে আমাদের পতাকাটি কখনও দেখেনি। তবুও এটি তাদের মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল।

যখন আমরা কোবার্গ স্টেশনে পৌঁছালাম, তখন জার্মান দিবস আয়োজক কমিটির একটি প্রতিনিধিদল আমাদের স্বাগত জানাল । তারা ঘোষণা করল যে স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলোর—অর্থাৎ, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ও কমিউনিস্ট পার্টির — সাথে এই 'সম্মত' হয়েছে যে, আমরা পতাকা উড়িয়ে ও বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে শহরে প্রবেশ করতে পারব না (আমাদের সাথে বিয়াল্লিশ জন বাদকের একটি দল ছিল) এবং আমরা যেন ঘন সারিতে মিছিল না করি।

আমি সঙ্গে সঙ্গে এই শর্তগুলো প্রত্যাখ্যান করলাম এবং এই 'দিনটি'র আয়োজক ভদ্রলোকদের বললাম যে, এই ধরনের লোকদের সাথে আলোচনা করে তাদের সাথে একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর ধারণাটি আমাকে কতটা অবাক করেছে। এরপর আমি ঘোষণা করলাম যে আমাদের স্টর্মট্রুপাররা অবিলম্বে মার্চ করে প্রবেশ করবে।
দলবদ্ধভাবে, পতাকা নেড়ে এবং অর্কেস্ট্রার বাজনা সহকারে শহরে গমন।

আর তাই ঘটল।

স্টেশন থেকে বের হতেই আমরা কয়েক হাজার মানুষের গর্জনরত ও হুঙ্কাররত এক জনতার মুখোমুখি হলাম , যারা আমাদের দিকে চিৎকার করে বলছিল: "খুনি," "দস্যু," "চোর," "অপরাধী।" প্রজাতন্ত্রের এই অনুকরণীয় প্রতিষ্ঠাতারা আমাদের উপর এই ধরনের আরও অনেক বিশেষণ বর্ষণ করেছিলেন। তরুণ অ্যাসল্ট ইউনিটটি শৃঙ্খলার এক আদর্শ উদাহরণ স্থাপন করেছিল। কোম্পানিগুলো স্টেশনের সামনের চত্বরে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াল এবং প্রথমে জনতার ছুঁড়ে দেওয়া অপমান উপেক্ষা করল। পুলিশ শঙ্কিত হয়ে পড়ল। তারা আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত শহর কোবার্গের উপকণ্ঠে আমাদের নির্ধারিত কোয়ার্টারে না নিয়ে, শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হফব্রাউহাউস কেলারে নিয়ে গেল। আমাদের যাত্রার ডান ও বাম দিকে, সাথে থাকা জনতার সৃষ্ট হট্টগোল ক্রমাগত বাড়তে থাকল। শেষ কোম্পানিটি সবেমাত্র হফব্রাউহাউসের আঙিনায় প্রবেশ করেছে, এমন সময় এক বিশাল জনতা প্রচণ্ড চিৎকার করতে করতে তাদের পিছনে ছুটে এল । এটি প্রতিরোধ করার জন্য পুলিশ ফটকগুলো বন্ধ করে দিল। পরিস্থিতি যে অস্থিতিশীল, তা দেখে আমি অ্যাসল্ট স্কোয়াডকে নির্দেশ দিলাম এবং পুলিশকে অবিলম্বে ফটকগুলো খুলে দেওয়ার দাবি জানালাম । অনেক দ্বিধার পর তারা রাজি হলো ।

আমরা সেই একই রাস্তা ধরে আমাদের ছাউনির দিকে ফিরে যাচ্ছিলাম, এবং সেখানে আমাদের জনতার মুখোমুখি হতে হলো। পথে তাদের চিৎকার-চেঁচামেচি আমাদের কমরেডদের উস্কে দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, প্রকৃত সমাজতন্ত্র, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের প্রচারকরা পাথর ছুঁড়তে শুরু করল । এতে আমাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। দশ মিনিট ধরে এক বিধ্বংসী শিলাবৃষ্টির মতো চারিদিকে আঘাত আসতে থাকল । পনেরো মিনিট পর, রাস্তায় আর কোনো লালপন্থী ছিল না ।

রাতে যে সংঘর্ষগুলো হয়েছিল তা ছিল আরও গুরুতর। অ্যাসল্ট ডিটাচমেন্টের টহল দলগুলো ন্যাশনাল সোশ্যালিস্টদের খুঁজে পায়, যাদের ওপর একের পর এক আক্রমণ করা হয়েছিল এবং তারা ভয়ানক অবস্থায় ছিল। আমরা দ্রুত আমাদের প্রতিপক্ষদের মোকাবিলা করি। পরের সকালের মধ্যে , রেড টেরর, যার অধীনে কোবার্গ বছরের পর বছর ধরে ভুগছিল, অবশেষে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়।

মিথ্যা ছড়ানোর চিরাচরিত মার্ক্সবাদী ও ইহুদি পদ্ধতি অবলম্বন করে , রাস্তায় " আন্তর্জাতিক সর্বহারার কমরেডগণ" শিরোনামে প্রচারপত্র বিলি করা হয়েছিল। এই প্রচারপত্রগুলোর উদ্দেশ্য ছিল জনগণের মধ্যে ক্রোধ জাগিয়ে তোলা। ঘটনাকে সম্পূর্ণ বিকৃত করে তারা দাবি করেছিল যে, আমাদের "খুনিদের দল" " কোবার্গের শান্তিপূর্ণ শ্রমিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ" ঘোষণা করেছে এবং "তাদের নির্মূল করতে চায়"। সেদিন দুপুর দেড়টায় একটি "বৃহৎ সমাবেশ" অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল এবং তারা আশা করেছিল যে জেলার সব জায়গা থেকে শ্রমিকরা এতে যোগ দেবে । আমি অবশেষে এই লাল সন্ত্রাসকে চূর্ণ করার সিদ্ধান্ত নিলাম এবং দুপুরে স্টর্ম ট্রুপের একটি সভা ডাকলাম। এর সদস্য সংখ্যা বেড়ে ১৫০০ জনে দাঁড়াল। আমি এই লোকদের সাথে সেই বিশাল চত্বরের মধ্য দিয়ে মিছিল করার সিদ্ধান্ত নিলাম, যেখানে লাল সমাবেশটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।

আমি দেখতে চেয়েছিলাম ওরা আবার আমাদের আক্রমণ করার চেষ্টা করে কি না । চত্বরে প্রবেশ করে আমরা দেখলাম , ঘোষিত দশ হাজার লোকের পরিবর্তে সেখানে মাত্র কয়েকশ লোক উপস্থিত ছিল। আমরা কাছে যেতেই তাদের বেশিরভাগই চুপ ছিল , কেউ কেউ পালিয়ে গেল। মাত্র কয়েকজন...

Machine Translated by Google

কিছু কিছু জায়গায় , শহরের বাইরে থেকে আসা রেডদের কয়েকটি দল, যারা তখনও আমাদের চিনতে পারেনি, মারামারি শুরু করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কয়েকটি হাতাহাতির পর তারা পালাতে বাধ্য হয়। আর এখন দেখা যাচ্ছিল , এতদিন ধরে ভীতসন্ত্রস্ত থাকা জনগণ ধীরে ধীরে জেগে উঠছে এবং তাদের সাহস ফিরে পাচ্ছে। তারা আমাদের সাদরে গ্রহণ করল, এবং সন্ধ্যায় আমরা যখন ফিরে আসছিলাম, পথের বিভিন্ন স্থানে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের উচ্ছ্বাস দেখা গেল।

স্টেশনে রেলকর্মীরা হঠাৎ আমাদের জানালেন যে আমাদের ট্রেনটি চলবে না। তখন আমাকে দলের কয়েকজন প্রধান নেতাকে বলতে হলো যে, যদি তাই হয়, তবে আমরা হাতের নাগালে পাওয়া সমস্ত রেড হিরোদের গ্রেপ্তার করব , ট্রেনটি নিজেরাই চালাব, কিন্তু লোকোমোটিভ, টেন্ডার এবং কয়েকটি বগিতে এই আন্তর্জাতিক সংহতির ভ্রাতৃত্বের কয়েক ডজন সদস্যকে সঙ্গে নেব । আমি তাদের বলতে দ্বিধা করিনি যে , যদি আমাদের এমনটা করতেই হয়, তবে তা নিঃসন্দেহে এক অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অভিযান হবে এবং এতে আমাদের সকলের কোমর ভেঙে যেতে পারে । তবে এটা জেনে সান্ত্বনা মিলবে যে , আমরা অনন্তলোকে একা প্রবেশ করব না , বরং রেড অভিজাতদের সঙ্গে সমতা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েই প্রবেশ করব।

তারপর আমাদের ট্রেন সময়মতো ছেড়ে গেল এবং আমরা মো-তে পৌঁছলাম।
নাচিয়াম নিরাপদে ও সুস্থ আছে।

এইভাবে , ১৯১৪ সালের পর প্রথমবারের মতো কোবার্গে সকল নাগরিকের জন্য আইনের চোখে সমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যদিও পূর্বে কোনো উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা আশ্বাস দিয়েছিলেন যে রাষ্ট্র তার নাগরিকদের জীবন রক্ষা করে, অন্তত সেই দিনগুলিতে পরিস্থিতি তেমন ছিল না।
এখন পর্যন্ত নাগরিকদেরকে বর্তমান রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে নিজেদের রক্ষা করতে হয়েছে ।

প্রথমে , সেই দিনের পরিণতির পূর্ণ তাৎপর্য পুরোপুরি মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়নি । বিজয়ী আক্রমণকারী দলটি তাদের আত্মবিশ্বাস এবং নেতাদের বিচক্ষণতার ওপর আস্থা ব্যাপকভাবে দৃঢ় করেছিল। আমাদের সমসাময়িকরা আমাদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে শুরু করে এবং প্রথমবারের মতো অনেকেই জাতীয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে এমন একটি সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি দেয়, যা মার্ক্সবাদী উন্মাদনাকে তার প্রাপ্য পরিণতিতে পৌঁছে দিতে সক্ষম।

কেবল গণতন্ত্রীরাই আক্ষেপ করেছিল যে, আমরা নিজেদের মাথা থেঁতলে যেতে দেওয়ার মতো যথেষ্ট ভদ্রতা দেখাইনি এবং একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে আমরা শান্তিবাদী গানের পরিবর্তে মুষ্টি, লাঠি ও নৃশংস আক্রমণের মাধ্যমে পাল্টা আঘাত হানার সাহস দেখিয়েছিলাম ।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যম বরাবরের মতোই কিছুটা উদ্বিগ্ন এবং কিছুটা অমার্জিত ছিল । কেবল কয়েকটি সম্মানজনক সংবাদপত্রই এই ভেবে সন্তোষ প্রকাশ করেছিল যে, অন্তত একটি জায়গায় মার্ক্সবাদী রাস্তার গুণ্ডাদের কার্যকরভাবে দমন করা হয়েছে।

কোবার্গে অন্তত কিছু মার্ক্সবাদী শ্রমিক—যাদেরকে প্রতারিত বলেই ধরে নিতে হবে — জাতীয় সমাজতন্ত্রীদের মুষ্টির আঘাতে শিখেছিল যে এই শ্রমিকরাও আদর্শের জন্য লড়াই করে , কারণ অভিজ্ঞতা শেখায় যে মানুষ কেবল তারই জন্য লড়াই করে, যা সে বিশ্বাস করে এবং ভালোবাসে।

কোবার্গের ঘটনাপ্রবাহ থেকে অ্যাসল্ট ইউনিট সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছিল । এর সদস্য সংখ্যা এত দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, ১৯২৩ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত পার্টি কংগ্রেসে ছয় হাজার সৈন্য ব্যানার -আশীর্বাদ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিল এবং প্রথম কোম্পানিগুলো নতুন ইউনিফর্মে সম্পূর্ণরূপে সজ্জিত হয়েছিল।

কোবার্গে আমাদের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে, অ্যাসল্ট ইউনিটের জন্য একটি স্বতন্ত্র ইউনিফর্ম চালু করা কতটা জরুরি ছিল; শুধু কোরের মনোবল শক্তিশালী করার জন্যই নয়, বরং বিভ্রান্তি রোধ করতে এবং লড়াইয়ে শত্রুকে চিনতে না পারার বিপদ এড়ানোর জন্যও। এখন পর্যন্ত তারা কেবল একটি আর্মব্যান্ড পরত, কিন্তু এখন একটি ইউনিফর্ম ব্লাউজ এবং সুপরিচিত

একটি টুপি।

কিন্তু কোবার্গের অভিজ্ঞতার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল। আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম যে, যেখানেই বহু বছর ধরে রেড টেরর ভিন্নমতের মানুষদের সভা করতে বাধা দিয়ে আসছিল, সেখানেই আমরা তা ভেঙে দেব। আমরা সমাবেশের স্বাধীনতার অধিকার পুনরুদ্ধার করতে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ ছিলাম । তখন থেকেই আমরা সেইসব জায়গায় আমাদের ব্যাটালিয়ন পাঠাতে শুরু করি এবং ধীরে ধীরে, একের পর এক, বাভারিয়ার রেড ঘাঁটিগুলো ন্যাশনাল সোশ্যালিস্টদের প্রচারণার কাছে পতন হতে থাকে।

Machine Translated by Google

সমাজতন্ত্রীরা। স্টর্মট্রুপাররা তাদের কাজে ক্রমশ অভিজ্ঞ হয়ে উঠল। তারা একটি উদ্দেশ্যহীন ও আত্মাহীন প্রতিরক্ষা সমিতির সমস্ত সাদৃশ্য ক্রমশ হারিয়ে ফেলল এবং একটি নতুন জার্মানি প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াইরত এক সক্রিয় যুদ্ধ সংগঠনে পরিণত হলো।

এই যৌক্তিক অগ্রগতি ১৯২৩ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এরপর এমন কিছু ঘটল যা আমাকে আন্দোলনের এযাবৎকালের গতিপথ পরিবর্তন করতে এবং এর বাহ্যিক রূপে কিছু পরিবর্তন আনতে বাধ্য করল।

৩. ১৯২৩ সালের শুরুতে ফ্রান্স রুহর অঞ্চল দখল করতে শুরু করে । এর পরিণতি ছিল...
অ্যাসল্ট ইউনিটের বিকাশের জন্য এই বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।
এই বিষয়ে খোলাখুলি ও স্বাধীনভাবে লেখা বা কথা বলা এখনও সম্ভব নয় , এবং তা জাতির স্বার্থেও হবে না । তাই, আমি কেবল ততটুকুই বলব, যতটুকু বিষয়টি জনসমক্ষে আলোচিত হয়েছে এবং এর ফলে সকলের কাছে পরিচিত হয়েছে।

রুহর অঞ্চল দখল , যা আমাদের কাছে কোনো বিস্ময় ছিল না, এই আশা জাগিয়েছিল যে জার্মানরা অবশেষে তাদের অধীনতার কাপুরুষোচিত নীতি পরিত্যাগ করবে এবং এর ফলে প্রতিরক্ষা সংগঠনগুলোকে পালনের জন্য একটি নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেবে। স্টর্ম ট্রুপ, যার সদস্য সংখ্যা এখন কয়েক হাজার সুস্থ ও উদ্যমী যুবক , তাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।

জাতির প্রতি এই সেবা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল । ১৯২৩ সালের বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে, এটিকে একটি যুদ্ধরত সামরিক সংগঠনে রূপান্তরিত করা হয়েছিল । এই পুনর্গঠনের ফলেই মূলত এর উদ্ভব হয়েছিল ।
১৯২৩ সালে সংঘটিত ঘটনাসমূহ যা আমাদের আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল।
আমি ১৯২৩ সালের ঘটনাগুলো অন্যত্র বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। এখানে আমি শুধু এটুকু বলতে চাই যে, সেই সময়ে অ্যাসল্ট ইউনিটের রূপান্তরটি আন্দোলনের স্বার্থের জন্য অবশ্যই ক্ষতিকর হতো, যদি এই পরিবর্তনের পেছনের শর্তগুলো , অর্থাৎ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধের নীতি গ্রহণ, বাস্তবায়িত না হতো ।

১৯২৩ সালের শেষের দিকে যে ঘটনাগুলো ঘটেছিল, প্রথম দৃষ্টিতে তা ভয়াবহ মনে হলেও, এক বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে তা প্রায় অপরিহার্যই ছিল ; কারণ জার্মান রাইখ সরকারের গৃহীত মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে অ্যাসল্ট ডিটাচমেন্টকে একটি সামরিক বাহিনীতে রূপান্তরিত করাটা অর্থহীন হতো , এবং এর ফলে আন্দোলনের জন্য ক্ষতিকর একটি রূপান্তর এক ধাক্কায় সম্পন্ন হয়ে গেল। একই সাথে, এটি আমাদেরকে সেই বিন্দু থেকে নিজেদের পুনর্গঠন করতে সক্ষম করেছিল, যেখান থেকে আমরা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছিলাম ।

১৯২৫ সালে, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক জার্মান শ্রমিক দল পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং নির্ধারিত নীতি অনুসারে স্টর্ম ট্রুপকে পুনর্গঠিত ও পুনঃপ্রশিক্ষণ দিতে হয়েছিল। দলটিকে তার মূল ধারণায় ফিরে যেতে হয়েছিল এবং আন্দোলনের আদর্শ বাস্তবায়নের আধ্যাত্মিক সংগ্রামে প্রতিরক্ষা ও সমর্থনের একটি মাধ্যম হিসেবে ভূমিকা পালন করাকেই তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে পুনরায় স্বীকৃতি দিতে হয়েছিল ।

অ্যাসল্ট স্কোয়াডকে কোনো ধরনের প্রতিরক্ষা সংস্থা বা গোপন সমিতির পর্যায়ে নেমে যেতে দেওয়া যাবে না । এটিকে উন্নত করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে।
জাতিরাষ্ট্রের গভীর নীতির উপর ভিত্তি করে জাতীয় সমাজতন্ত্রীদের আদর্শের সংগ্রামে এক লক্ষ মানুষের এক অগ্রবাহিনী ।

পাদটীকা:

২০) শিলার, যিনি বিখ্যাত নাটক 'উইলিয়াম টেল' লিখেছিলেন।

২১) যারা মিত্র কমিশনকে লুকানো অস্ত্রের ভান্ডার সম্পর্কে অবহিত করেছিল তাদের উল্লেখ
জার্মানি।

Machine Translated by Google

দশম অধ্যায়

যুক্তরাষ্ট্রীয়তার মুখোশ

১৯১৯ সালের শীতে , এবং তার চেয়েও বেশি করে ১৯২০ সালের বসন্ত ও গ্রীষ্মে, নবগঠিত দলটি অনুভব করেছিল এমন একটি বিষয়ে চূড়ান্ত অবস্থান নেওয়ার অঙ্গীকার, যা যুদ্ধের সময়ই বেশ গুরুতর হয়ে উঠেছিল। এই বইয়ের প্রথম খণ্ডে , আমি নিজে প্রত্যক্ষ করা কিছু ঘটনা সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি , যা জার্মানির পতনের পূর্বাভাস দিয়েছিল। এই ঘটনাগুলো বর্ণনা করতে গিয়ে, আমি এক বিশেষ ধরনের প্রচারণার কথা উল্লেখ করেছি, যা ইংরেজ এবং ফরাসি উভয়ই উত্তর ও দক্ষিণ জার্মানির মধ্যে বিভেদ পুনরায় জাগিয়ে তুলতে ব্যবহার করেছিল । ১৯১৫ সালের বসন্তে , প্রথম দফা প্রচারপত্র প্রকাশিত হয় , যার লক্ষ্য ছিল যুদ্ধের জন্য একমাত্র দায়ী হিসেবে প্রুশিয়ার বিরুদ্ধে অনুভূতিকে পদ্ধতিগতভাবে শক্তিশালী করা । ১৯১৬ সাল নাগাদ, এই পদ্ধতিটি একটি ধূর্ত ও নির্লজ্জ উপায়ে বিকশিত ও পরিমার্জিত হয়েছিল । মানুষের নিকৃষ্টতম প্রবৃত্তিকে উস্কে দিয়ে , এই প্রচারণাটি জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিল ...

উত্তর জার্মানদের প্রতি দক্ষিণ জার্মানদের ক্রোধ শীঘ্রই ফলপ্রসূ হলো। সেই সময়ে সরকার ও সেনাবাহিনীর উচ্চ পদে থাকা ব্যক্তিরা, বিশেষ করে বাভারিয়ান সেনা সদর দপ্তরের কর্মকর্তারা, তাদের কর্তব্যের প্রতি অন্ধ অবহেলা এবং এই প্রচারণার মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে না পারার জন্য তিরস্কারের যোগ্য ছিলেন। কিন্তু কিছুই করা হয়নি। বরং , কিছু মহলে এটি অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল না , এবং সম্ভবত তারা এতটাই দূরদৃষ্টিহীন ছিল যে তারা ভেবেছিল এই প্রচারণা জার্মান একীকরণে সাহায্য করতে পারে , অথবা এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় বাহিনীকে শক্তিশালী করে তুলতে পারে । ইতিহাসে এমন লজ্জাজনক অবহেলা এত ভয়াবহভাবে সংঘটিত খুব কমই হয়েছে।

প্রতিশোধ নিল। এই প্রচারণার ফল হিসেবে প্রুশিয়ার যে দুর্বলতা দেখানো হয়েছিল, তা সমগ্র জার্মানিকে প্রভাবিত করল। এটি সেই পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল যা কেবল সমগ্র জার্মানিকেই নয়, তার চেয়েও বেশি করে স্বতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজ্যগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছিল।

যে শহরে প্রুশিয়ার বিরুদ্ধে কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট ঘৃণা সবচেয়ে তীব্রভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল,
তার কাছে, শাসক পরিবারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহটিই বিপ্লবের সূচনা হয়ে উঠেছিল।

এটা ভাবা ভুল হবে যে, প্রুশিয়া-বিরোধী মনোভাব সৃষ্টির জন্য কেবল বিদ্বেষপূর্ণ প্রচারণাই দায়ী ছিল এবং যারা এই প্রচারণা শুনেছিল তাদের সমর্থন করার মতো কোনো কারণ ছিল না । যুদ্ধের সময় জাতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থ সংগঠিত করার অবিশ্বাস্য পদ্ধতি, কেন্দ্রীকরণের সম্পূর্ণ উন্মাদ ব্যবস্থা যা সমগ্রকে শোষণ করেছিল।

রাইখই সেই ভিত্তি স্থাপন করেছিল যার উপর প্রুশিয়া-বিরোধী মনোভাব গড়ে উঠেছিল। সাধারণ নাগরিকরা যুদ্ধ সরঞ্জাম সংগ্রহের সাথে জড়িত কোম্পানিগুলোকে —যেগুলোর সবগুলোই বার্লিনে অবস্থিত ছিল— বার্লিনের সমার্থক হিসেবে দেখত এবং বার্লিন শহরকেই প্রুশিয়ার সমার্থক হিসেবে ভাবত। সাধারণ নাগরিকরা জানত না যে, যুদ্ধ কোম্পানি নামে পরিচিত এই চোর কোম্পানিগুলো বার্লিন বা প্রুশিয়ার মালিকানাধীন ছিল না , এমনকি সেগুলো আদৌ জার্মানও ছিল না। লোকেরা রাইখের রাজধানীতে কেবল চরম অনিয়ম এবং ক্রমাগত লঙ্ঘনগুলোই দেখত এবং তাদের ক্ষোভ বার্লিন ও প্রুশিয়ার দিকেই পরিচালিত করত, বিশেষ করে যেহেতু কিছু নির্দিষ্ট মহলে (বাভারিয়ান সরকারে) এই মনোভাব পরিবর্তনের জন্য কিছুই করা হয়নি , এবং এমনকি নীরবে উল্লাস করে একে স্বাগত জানানো হয়েছিল। ইহুদি লোকটি এতটাই ধূর্ত ছিল যে সে বুঝতে পেরেছিল যে , যুদ্ধ কোম্পানিগুলোর আড়ালে জার্মান জাতিকে লুণ্ঠন করার জন্য সে যে লজ্জাজনক অভিযান সংগঠিত করেছে, তা বিরোধিতার জন্ম দিতে

বাধ্য । যতক্ষণ না এই বিরোধিতা তার গলায় ঝাঁপিয়ে পড়ছে, ততক্ষণ তার ভয় পাওয়ার কিছু ছিল না। তাই, সে সিদ্ধান্ত নিল যে ক্রুদ্ধ ও হতাশ জনগণের ক্ষোভ ঠেকানোর সর্বোত্তম উপায় হলো তাদের ক্রোধকে উস্কে দেওয়া এবং এর জন্য অন্য কোনো পথ খুঁজে বের করা।

বাভারিয়া যত খুশি প্রুশিয়ার সাথে ঝগড়া করুক , আর প্রুশিয়াও বাভারিয়ার সাথে। যত বেশি, তত ভালো।
দুই রাষ্ট্রের মধ্যকার এই তিক্ত সংগ্রাম ইহুদিদের জন্য শান্তি নিশ্চিত করেছিল । ফলে, জাতির দেহে থাকা এই আন্তর্জাতিক পরজীবীটির দিক থেকে জনদৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে সরে গিয়েছিল ; মনে হচ্ছিল সবাই তাকে ভুলে গেছে। যদি কোনো বিপদ থাকত, তবে বিচক্ষণ লোকেরা — যাদের সংখ্যা বাভারিয়ায় অনেক ছিল — আরেকটু সংযম ও আরও বেশি সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিত ।

Machine Translated by Google

পরিস্থিতির যুক্তিসঙ্গত মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রুশিয়ার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রশমিত করে, বার্লিনের ইহুদিটিকে কেবল একটি নতুন উস্কানি দিয়ে তার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করতে হতো। প্রতিবারই এমনটা ঘটত।
ক্যানন, যে উত্তর ও দক্ষিণের সংঘাতের সুযোগ নিয়েছিল, সে একটি গভীর শ্বাস নিয়ে ক্ষোভের আগুনে ঘি ঢেলে দিল যতক্ষণ না তা দাবানলে পরিণত হয় ।

জার্মান জাতির বিভিন্ন গোষ্ঠীকে একে অপরের বিরুদ্ধে উস্কে দেওয়াটা ছিল ইহুদিটির একটি ধূর্ত ও বিশেষজ্ঞসুলভ কৌশল , যাতে তাদের মনোযোগ তার থেকে সরে যায় এবং সে তাদের আরও ভালোভাবে লুট করতে পারে।

তারপর বিপ্লব এলো।

১৯১৮ সাল পর্যন্ত, বা বলা ভালো, সেই বছরের নভেম্বর মাস পর্যন্ত, সাধারণ জার্মান নাগরিক, বিশেষ করে স্বল্পশিক্ষিত নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং শ্রমিকেরা, কী ঘটছে তা বুঝতে পারছিল না এবং জার্মান জাতির বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে এই ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতের ফলে বিশেষত বাভারিয়ার জন্য যে অবশ্যম্ভাবী পরিণতি অপেক্ষা করছিল, সে সম্পর্কেও তারা অবগত ছিল না ; কিন্তু অন্তত যারা নিজেদের "জাতীয়তাবাদী" বলত, বিপ্লব শুরু হওয়ার দিনেই তাদের বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বোঝা উচিত ছিল। অভ্যুত্থান সফল হওয়ার মুহূর্তেই, বাভারিয়ান বিপ্লবের নেতা ও সংগঠক নিজেকে বাভারিয়ার স্বার্থের রক্ষক হিসেবে ঘোষণা করেন। আন্তর্জাতিক ইহুদি কার্ট আইসনার প্রুশিয়ার বিরুদ্ধে বাভারিয়াকে জয় করতে শুরু করেন। এই পৃথিবীতে তিনিই ছিলেন শেষ ব্যক্তি যাকে বাভারিয়ার স্বার্থের রক্ষক হিসেবে বর্ণনা করা যায়। একজন সংবাদপত্র প্রতিবেদক হিসেবে কাজ করে তিনি জার্মানি জুড়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন, বাভারিয়া বা ঈশ্বরের এই বিশাল পৃথিবীর অন্য কোনো নির্দিষ্ট অংশের অস্তিত্ব আদৌ আছে কি না, সে বিষয়ে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন ।

বাভারিয়ায় বেড়ে ওঠা বিপ্লবকে প্রুশিয়ার বিরুদ্ধে একটি আক্রমণ হিসেবে ইচ্ছাকৃতভাবে চিত্রিত করে কার্ট আইজনার বিন্দুমাত্র বাভারিয়ার স্বার্থের কথা মাথায় রেখে কাজ করেননি, বরং তিনি কেবল ইহুদি জাতির বৈধ প্রতিনিধি হিসেবেই কাজ করেছিলেন। জার্মানিকে আরও বিভক্ত করার উপায় হিসেবে তিনি বাভারিয়ার বিদ্যমান প্রবৃত্তি ও বিদ্বেষকে কাজে লাগিয়েছিলেন। একটি বিভক্ত রাইখ বলশেভিজমের সহজ শিকারে পরিণত হতো ।

তার মৃত্যুর পরেও তার কৌশল অব্যাহত ছিল । মার্ক্সবাদীরা, যারা বরাবরই জার্মানির স্বতন্ত্র রাজ্য ও তাদের শাসকদের উপহাস ও শোষণ করত , তারাই হঠাৎ করে 'স্বাধীনতাবাদী দল' হিসেবে শাসক রাজপুত্র ও স্বতন্ত্র রাজ্যগুলোর পরিবারগুলোর মধ্যে প্রোথিত অনুভূতি ও প্রবৃত্তির কাছে আবেদন জানাতে শুরু করল।

তাদের কবল থেকে বাভারিয়াকে মুক্ত করার জন্য প্রেরিত সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে বাভারিয়ান সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের সংগ্রামকে মার্ক্সবাদী প্রচারকরা প্রধানত "প্রুশীয় সামরিকবাদের বিরুদ্ধে বাভারীয় শ্রমিকের সংগ্রাম" হিসেবে চিত্রিত করেছিল। এ কারণেই মিউনিখে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের পতন জার্মানির অন্যান্য অংশের মতো একই প্রভাব ফেলেনি । জনগণকে বোধোদয় ঘটানোর পরিবর্তে , এটি প্রুশিয়ার বিরুদ্ধে তিক্ততা ও ক্রোধ আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল।

বলশেভিক আন্দোলনকারীদের কৌশল, যা বাভারিয়ান সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের ধ্বংসকে "সামরিকবাদ-বিরোধী" ও "প্রুশীয়-বিরোধী" বাভারিয়ান জাতির উপর "প্রুশীয় সামরিকবাদের" বিজয় হিসেবে চিত্রিত করেছিল, তা প্রচুর ফল দিয়েছিল। যেখানে বাভারিয়ান আইনসভার নির্বাচনে মিউনিখে কার্ট আইসনারের সমর্থক সংখ্যা ছিল দশ হাজারেরও কম এবং কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক সংখ্যা ছিল তিন হাজারেরও কম, সেখানে বাভারিয়ান প্রজাতন্ত্রের পতনের পর এই দুটি দল সম্মিলিতভাবে প্রায় এক লক্ষ ভোট পেয়েছিল।

তারপর আমি জার্মান জাতির এক অংশের অন্য অংশের বিরুদ্ধে এই উন্মত্ত উস্কানির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে লড়াই শুরু করলাম।

আমার মনে হয় না, প্রুশিয়া-বিরোধী উস্কানির বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার চেয়ে বেশি অজনপ্রিয় কোনো কাজ আমি জীবনে আর করেছি । সোভিয়েত শাসনকালে মিউনিখে বড় বড় জনসভা অনুষ্ঠিত হতো , যেখানে জার্মানির বাকি অংশের, বিশেষ করে প্রুশিয়ার বিরুদ্ধে ঘৃণা এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হতো যে, একজন উত্তর জার্মানও সেখানে যোগ দেওয়ার জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করত । এই সভাগুলো প্রায়শই "প্রুশিয়া দূর হও," "প্রুশিয়ানদের পতন হোক," "প্রুশিয়ার সাথে যুদ্ধ হোক," ইত্যাদি উন্মত্ত স্লোগানে শেষ হতো । বাভারিয়ার সার্বভৌমত্বের এক অত্যন্ত মেধাবী রক্ষক রাইখস্ট্যাগে প্রকাশ্যে এই মনোভাব প্রকাশ করে বলেছিলেন, "আমি প্রুশিয়ান হয়ে পচে মরার চেয়ে বাভারিয়ান হয়ে মরে যাওয়াই শ্রেয় মনে করি ।"

Machine Translated by Google

কী ঘটছিল তা বোঝার জন্য তখনকার সভাগুলোতে উপস্থিত থাকতে হতো।
ঘটনাটি ঘটেছিল যখন, হাতে গোনা কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে, মিউনিখের লোয়েনব্রাউ কেলারে অনুষ্ঠিত একটি সভায় আমি প্রথমবারের মতো এই উন্মাদনার বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলাম। আমার কয়েকজন যুদ্ধসঙ্গী আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল। আপনারা সহজেই কল্পনা করতে পারেন, নিয়ন্ত্রণহীন সেই ক্রুদ্ধ জনতা যখন আমাদের দিকে গর্জন করে উঠছিল এবং আমাদের মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছিল , তখন আমাদের কেমন লাগছিল। আমরা যখন দেশের জন্য যুদ্ধ করছিলাম , তখন সেই একই ভিড়ের বেশিরভাগই হয় নিরাপদে শত্রুসেনার পেছনে লুকিয়ে ছিল, অথবা পলাতক ও কর্মবিমুখ সৈন্য হিসেবে শান্তিপূর্ণভাবে দেশজুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। স্বীকার করতেই হবে, এই ঘটনাটি আমার জন্য সুবিধাজনকই প্রমাণিত হয়েছিল। আমার কমরেডদের ছোট দলটি প্রথমবারের মতো আমার সাথে সম্পূর্ণ একাত্মতা অনুভব করেছিল এবং আমৃত্যু আমার পাশে থাকার শপথ নিয়েছিল।

এই সংঘাতগুলো, যা ১৯১৯ সাল জুড়ে ক্রমাগত ঘটছিল , ১৯২০ সালের শুরুতেই আরও নৃশংস হয়ে উঠল বলে মনে হলো। এমন কিছু সভা হতো— আমার বিশেষ করে মিউনিখের সোনেনস্ট্রাসের ভাগনার হলের সভাগুলোর কথা মনে আছে—যেখানে আমার দল, যা তখন অনেক বড় হয়ে গিয়েছিল , সবচেয়ে নৃশংস ব্যক্তিদের আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজেদের রক্ষা করতে বাধ্য হতো। একাধিকবার আমার প্রায় বারোজন অনুসারী আক্রমণকারীদের হাতে নিহত হতো এবং আমরা প্রায় মৃতপ্রায় অবস্থায় হল থেকে ছিটকে পড়তাম।

যে লড়াইটা আমি শুরু করেছিলাম, প্রথমে একা, এবং পরে আমার যুদ্ধসঙ্গীদের সাহায্যে-
তরুণ আন্দোলনটি এটিকে প্রায় এক পবিত্র ব্রত হিসেবেই চালিয়ে গিয়েছিল।

আজ আমি গর্বের সাথে বলতে পারি যে, আমরা— প্রায় সম্পূর্ণভাবে বাভারিয়ায় আমাদের সমর্থকদের ওপর নির্ভর করে —ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে উন্মাদনা ও বিশ্বাসঘাতকতার জোটের অবসান ঘটাতে সক্ষম হয়েছি। আমি উন্মাদনা ও বিশ্বাসঘাতকতা বলছি কারণ...
যদিও আমি নিশ্চিত যে, যে জনতা তার সাথে যোগ দিয়েছিল তাদের উদ্দেশ্য ভালো থাকলেও তারা ছিল নির্বোধ, তবুও আমি সংগঠক ও সহযোগীদের ক্ষেত্রে এই ধরনের সরলতাকে কোনো লঘুকারী পরিস্থিতি হিসেবে গণ্য করতে পারি না। আমি তাদের ফ্রান্সের বেতনভুক্ত বিশ্বাসঘাতক হিসেবেই দেখতাম, এবং আজও দেখি। একটি ক্ষেত্রে, দোর্তেনার ঘটনায়, ইতিহাস ইতিমধ্যেই তার রায় ঘোষণা করেছে।

পরিস্থিতি তখন বিপজ্জনক হয়ে উঠল, বিশেষ করে কারণ তারা অত্যন্ত ধূর্ত ছিল এবং তাদের প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা গোপন করতে সক্ষম ছিল ; তারা প্রধানত যুক্তরাষ্ট্রীয় মতাদর্শের উপর জোর দিত এবং দাবি করত যে তাদের এই আন্দোলনের একমাত্র কারণ ছিল এগুলোই। এটা অবশ্যই বেশ স্পষ্ট যে প্রুশিয়ার বিরুদ্ধে এই আন্দোলনের সাথে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কোনো সম্পর্ক ছিল না। নিঃসন্দেহে, অন্য একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রকে ভেঙে ফেলার ও বিভক্ত করার প্রচেষ্টার জন্য "যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা" সঠিক পরিভাষা নয়। একজন আন্তরিক যুক্তরাষ্ট্রীয়বাদী, যার কাছে বিসমার্কের 'রাইখ' ধারণাকে সংজ্ঞায়িত করার জন্য ব্যবহৃত সূত্রটি কোনো ভ্রান্ত শব্দগুচ্ছ নয়, তিনি প্রুশিয়ার সেই অংশগুলোকে বিচ্ছিন্ন করার ইচ্ছা তৎক্ষণাৎ প্রকাশ করতে পারতেন না , যা বিসমার্ক দ্বারা সৃষ্ট বা অন্তত সম্পূর্ণ হয়েছিল। কিংবা তিনি প্রকাশ্যে এই ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদী উদ্দেশ্যকে সমর্থনও করতে পারতেন না।

মিউনিখে কী তুমুল হৈচৈই না হয়ে যেত, যদি কোনো প্রুশীয় রক্ষণশীল দল বাভারিয়া থেকে ফ্রাঙ্কোনিয়ার বিচ্ছিন্নতার প্রতি সমর্থন ঘোষণা করত, অথবা এই ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদী নীতির দাবি ও প্রচারের জন্য প্রকাশ্যে কোনো পদক্ষেপ নিত। তথাপি, সেইসব প্রকৃত ও আন্তরিক ফেডারেলিস্টদের প্রতি কেবল সহানুভূতিই জাগে , যারা এই লজ্জাজনক প্রতারণাটি দেখতে পাননি, কারণ তারাই ছিলেন এর প্রধান শিকার। এভাবে ধারণাটিকে বিকৃত করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সমর্থকরা নিজেরাই নিজেদের কবর খুঁড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পক্ষে অপপ্রচার চালানো যায় না। রাইখের রাজনৈতিক কাঠামোর মূল উপাদান, অর্থাৎ প্রুশিয়াকে অপমান, লাঞ্ছনা এবং উপহাস করার মাধ্যমে , একটি কনফেডারেশন গঠনকে অসম্ভব করে তোলা হয়েছিল, যদি তা কখনও সম্ভব হয়েও থাকে। এটি আরও অবিশ্বাস্য কারণ এই তথাকথিত ফেডারেলিস্টদের দ্বারা পরিচালিত লড়াইটি প্রুশীয় জাতির সেই অংশের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল, যাদের সাথে নভেম্বর গণতন্ত্রের সাদৃশ্য ছিল সবচেয়ে কম। তথাকথিত ফেডারেলিস্টদের অপমান ও আক্রমণ ভাইমার সংবিধানের জনকদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়নি— যাদের অধিকাংশই ছিলেন দক্ষিণ জার্মান বা ইহুদি—বরং তাদের বিরুদ্ধে ছিল যারা ভাইমার সংবিধানের বিরোধী, পুরোনো রক্ষণশীল প্রুশিয়ার প্রতিনিধিত্ব করত। এই অভিযানের নেতারা যে ইহুদিদের স্পর্শ না করার ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন, তা আশ্চর্যজনক নয় এবং সম্ভবত এটি একটি চাবিকাঠি প্রদান করে।

সম্পূর্ণ ধাঁধাটা।

Machine Translated by Google

বিপ্লবের আগে , ইহুদিটি জনগণকে, বিশেষ করে বাভারিয়ানদের, প্রুশিয়ানদের বিরুদ্ধে উসকানি দিয়ে নিজের এবং তার যুদ্ধ কোম্পানিগুলোর ওপর থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিল। সে একইভাবে অনুভব করত
বিপ্লবের পর তিনি তার নতুন লুণ্ঠন অভিযান গোপন করার জন্য কোনো উপায় খুঁজে বের করতে বাধ্য হয়েছিলেন , যা ছিল আগের চেয়ে নয় বা দশ গুণ বড়। এবং এবারও তিনি সফল হয়েছিলেন , তথাকথিত "জাতীয়তাবাদী" শক্তিগুলোকে একে অপরের বিরুদ্ধে উস্কে দিয়ে : রক্ষণশীল বাভারিয়ানদেরকে সমানভাবে রক্ষণশীল প্রুশিয়ানদের বিরুদ্ধে। তিনি আরও একবার অসাধারণভাবে কাজ করেছিলেন।
ধূর্ত সেই ব্যক্তি, যার হাতে প্রুশিয়ার ভাগ্য ছিল, বারবার এমন অমার্জিত ও কাণ্ডজ্ঞানহীন আক্রমণ উস্কে দিচ্ছিল যে, যারা ক্রমাগত প্রতারিত হচ্ছিল তাদের রক্ত টগবগ করে ফুটছিল ।
তবে কখনোই ইহুদিদের বিরুদ্ধে নয় , বরং সর্বদা তাদের জার্মান ভাইদের বিরুদ্ধে। বাভারিয়ান লোকটি বার্লিনে চল্লিশ লক্ষ পরিশ্রমী ও দক্ষ মানুষ দেখেনি, বরং দেখেছিল কেবল এক অলস ও অধঃপতিত বার্লিনকে, যা সবচেয়ে নিকৃষ্ট জায়গাগুলোতে পাওয়া যায় । আর তার এই বিদ্বেষ সেইসব জায়গার বিরুদ্ধে নয়, বরং "প্রুশীয়" শহরটির বিরুদ্ধেই ছিল।

অনেক ক্ষেত্রে এটি হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়াত।

নিজের থেকে জনদৃষ্টি অন্য দিকে সরিয়ে নেওয়ার ইহুদির ক্ষমতা আজকের ঘটনাপ্রবাহ থেকেও অধ্যয়ন করা যেতে পারে । ১৯১৮ সালে সংগঠিত ইহুদি-বিদ্বেষ বলে কিছু ছিল না। আমার এখনও মনে আছে , যখনই আমরা ইহুদিদের কথা বলতাম , তখন কী কী সমস্যার সম্মুখীন হতাম । আমরা হয় হতবাক মুখের সম্মুখীন হতাম , নয়তো তীব্র ও জোরালো বিরোধিতার মুখোমুখি হতাম। মানুষকে তাদের আসল শত্রুর দিকে নির্দেশ করার জন্য তখন আমাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য বলে মনে হয়েছিল । কিন্তু পরিস্থিতি ভালোর দিকে বদলাতে শুরু করল , যদিও খুব ধীরে ধীরে। 'প্রতিরক্ষা ও আক্রমণের লীগ' দুর্বলভাবে সংগঠিত ছিল, কিন্তু অন্তত ইহুদি প্রশ্নটি পুনরায় উত্থাপন করার ক্ষেত্রে এর একটি বড় অবদান ছিল । ১৯১৮-১৯ সালের শীতে, এক ধরনের ইহুদি-বিদ্বেষ ধীরে ধীরে শিকড় গাড়তে শুরু করে । পরবর্তীতে, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ইহুদি সমস্যাটিকে একটি নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে...

আমরা বিষয়টিকে উচ্চবিত্ত ও ক্ষুদ্র বুর্জোয়াদের সীমিত গণ্ডির বাইরে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি।
একটি বিশাল গণ-আন্দোলনের চালিকাশক্তিতে পরিণত । কিন্তু যেইমাত্র আমরা উপস্থাপন করতে সক্ষম হলাম
যখন জার্মান জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার একটি ধারণার আলোকে এই সমস্যার মুখোমুখি হতে হলো, তখন ইহুদিটি প্রতিক্রিয়া দেখাল। সে পুরোনো কৌশলের আশ্রয় নিল। আশ্চর্যজনক তৎপরতার সাথে, সে দেশপ্রেমিক আন্দোলনগুলোর মধ্যে বিভেদের মশাল ছুঁড়ে দিল এবং সেখানে একটি ফাটল তৈরি করল। আলট্রামন্টানিজমের বিষয়টি এবং ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে শুরু হওয়া পারস্পরিক বিবাদ উত্থাপন করে , সে অন্য সমস্যা দিয়ে জনগণের মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে নেওয়ার এবং এভাবে ইহুদি জাতির উপর কেন্দ্রীভূত আক্রমণ থামানোর জন্য সেই পরিস্থিতিতে একমাত্র সুযোগটি গ্রহণ করল । যারা আমাদের জাতিকে এই বিবাদে টেনে এনেছে , তারা জাতির বিরুদ্ধে করা তাদের অপরাধের কোনোদিনও প্রায়শ্চিত্ত করতে পারবে না । যাই হোক, ইহুদিটি তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছেছিল । ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্টরা একে অপরের সাথে লড়াই করছে, আর আর্য মানবতা ও খ্রিস্টধর্মের শত্রু তার কুলাকের মুখে হাসছে ।

একসময় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও জাতীয়তাবাদের মধ্যকার সংগ্রামের প্রতি বছরের পর বছর ধরে জনদৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং পারস্পরিক বিবাদে তাদের শক্তি ব্যয় করানো সম্ভব ছিল, যখন ইহুদিরা জাতির স্বাধীনতাকে সঁপে দিয়ে আমাদের দেশকে আন্তর্জাতিক অর্থজগতের প্রভুদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল। আর এখন সে আবারও সফল হয়েছে, এবার দুটি জার্মান ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ উস্কে দিয়ে , যার ফলে উভয়ের ভিত্তিই ধ্বংস হয়ে যাবে।

আন্তর্জাতিক ও বিশ্বজনীন ইহুদির দ্বারা প্রবেশ করানো বিষে দুর্বল ও ধ্বংসপ্রাপ্ত ।

ইহুদি রক্তের দূষণে আমাদের জাতি প্রতিদিন যে ধ্বংসলীলা ভোগ করছে, তা দেখুন । মনে রাখবেন , এই বিষাক্ত দূষণ জাতির দেহ থেকে নির্মূল করতে শত শত বছর লেগে যেতে পারে, যদি আদৌ তা সম্ভব হয় । ভাবুন, কীভাবে এই জাতিগত ধ্বংসের প্রক্রিয়া জার্মান জাতির মৌলিক আর্য বৈশিষ্ট্যগুলোকে অবমাননা করছে এবং কিছু ক্ষেত্রে ধ্বংসও করে দিচ্ছে , যার ফলে একটি জাতি হিসেবে আমাদের সাংস্কৃতিক সৃজনশীলতা ক্রমশ শক্তিহীন হয়ে পড়ছে এবং আমরা, অন্তত বড় শহরগুলোতে, আজকের দক্ষিণ ইতালির স্তরে নেমে যাওয়ার বিপদের সম্মুখীন হচ্ছি । আমাদের রক্তের এই দূষণ , যা সম্পর্কে আমাদের লক্ষ লক্ষ মানুষ অবগত নয় , তা আজ ইহুদিদের দ্বারা পদ্ধতিগতভাবে চর্চা করা হচ্ছে। আমাদের জাতীয় সত্তার মধ্যে এই নিগ্রোয়েড পরজীবীরা পদ্ধতিগতভাবে এই কাজ করছে।

Machine Translated by Google

তারা আমাদের নিষ্পাপ মেয়েদের কলুষিত করে এবং এর মাধ্যমে এমন কিছু ধ্বংস করে যা কোনো কিছু দিয়েই প্রতিস্থাপন করা যায় না ।

দুটি খ্রিস্টান সম্প্রদায় ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপহার হিসেবে পৃথিবীতে প্রদত্ত এক মহৎ ও অনন্য সত্তার অবমাননা ও ধ্বংসকে উদাসীনতার সাথে দেখে । কিন্তু বিশ্বের ভবিষ্যৎ ক্যাথলিক বা প্রোটেস্ট্যান্টদের বিজয়ের উপর নির্ভর করে না । গুরুত্বপূর্ণ হলো আর্য মানবতা টিকে থাকবে নাকি ধ্বংস হবে। এবং দুটি খ্রিস্টান সম্প্রদায় আর্য মানবতার ধ্বংসকারীর বিরুদ্ধে লড়াই করে না , বরং একে অপরকে ধ্বংস করতে চায়। যার নিজের দেশের প্রতি সঠিক অনুভূতি আছে , তিনি নিজ সম্প্রদায়ের গণ্ডির মধ্যে থেকে এই মর্মে এক পবিত্র দায়বদ্ধতার অধীন যে, তিনি কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছার কথাই ক্রমাগত বলবেন না, বরং ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করবেন এবং তাঁর সৃষ্টিকে অপমানিত হতে দেবেন না। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই মানুষের একটি নির্দিষ্ট শারীরিক গঠন রয়েছে, তাকে একটি নির্দিষ্ট প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়েছে । যে কেউ তাঁর সৃষ্টিকে ধ্বংস করে, সে ঈশ্বরের সৃষ্টি ও ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে । অতএব , প্রত্যেকেরই উচিত , অবশ্যই নিজ নিজ ধর্মীয় বিশ্বাসের কাঠামোর মধ্যে থেকে, কথা বা কাজের মাধ্যমে অন্য কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সাথে বিবাদ শুরু করতে চায় এমন যে কাউকে থামানোর জন্য সচেষ্ট হওয়া এবং এটিকে তাদের সর্বাগ্রে কর্তব্য বলে মনে করা । জার্মানিতে বিদ্যমান ধর্মীয় বিভেদের পরিপ্রেক্ষিতে, কোনো একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের উপর আক্রমণ দুটি খ্রিস্টীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি বিধ্বংসী যুদ্ধের দিকে নিয়ে যাবে । এক্ষেত্রে, আমাদের পরিস্থিতি ফ্রান্স, স্পেন বা ইতালির সাথে তুলনীয় নয়। উদাহরণস্বরূপ, এই তিনটি দেশে কেউ ফরাসি, স্পেনীয় বা ইতালীয় জাতির মধ্যে বিভেদের বিপদ সৃষ্টি না করেই আলট্রামন্টানিজমের বিরুদ্ধে লড়াইরত পক্ষের জন্য প্রচারণা চালাতে পারে । কিন্তু জার্মানিতে এমনটা হতে পারে না , কারণ এখানে প্রোটেস্ট্যান্টরাও অংশ নেবে।

এই ধরনের প্রচারণায় অংশগ্রহণ। এবং এর ফলে, রাজনৈতিক বিষয়ে যাজকীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে অন্যত্র কেবল ক্যাথলিকদের দ্বারা সংগঠিত প্রতিরোধ ব্যবস্থাটি প্রোটেস্ট্যান্টদের দ্বারা ক্যাথলিকদের উপর আক্রমণের রূপ নেবে। এক সম্প্রদায়ের অনুসারীরা যা সহ্য করতে পারে, এমনকি যদি তা তাদের কাছে অন্যায় মনে হয়, তবে অন্য সম্প্রদায়ের সংগ্রামী নেতাদের কাছ থেকে এলে তারা তা অবিলম্বে ক্ষোভ ও বিরোধিতার সাথে প্রত্যাখ্যান করবে । অতএব, এমনকি যারা তাদের সম্প্রদায়ের সুস্পষ্ট সমস্যাগুলো দূর করার জন্য লড়াই করতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক , তারাও তাদের সংগ্রাম ত্যাগ করবে এবং বহিরাগতদের বিরুদ্ধে কাজ শুরু করবে, যতক্ষণ না একই ধর্মের লোকেরা এই সমস্যাগুলো দূর করার দাবি জানাতে শুরু করে। তারা বহিরাগতদের এমন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করাকে অযৌক্তিক , অগ্রহণযোগ্য এবং অনুপযুক্ত বলে মনে করবে , যেগুলোর সাথে তাদের কোনো সম্পর্কই নেই । এই ধরনের প্রচেষ্টাগুলো অযৌক্তিক, এমনকি যখন তা জাতীয় সম্প্রদায়ের বৃহত্তর স্বার্থ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় ; কারণ আমাদের সময়েও, ধর্মীয় অনুভূতির শিকড় যেকোনো রাজনৈতিক বা জাতীয় অনুভূতির চেয়ে গভীরে প্রোথিত। ধর্মগুলোর মধ্যে তিক্ত সংঘাত উস্কে দিয়ে এটি পরিবর্তন করা যাবে না । এর পরিবর্তন কেবল তখনই সম্ভব , যদি পারস্পরিক সহনশীলতার চেতনায় জাতি এমন এক ভবিষ্যতের আশ্বাস পেতে পারে যার মহত্ত্ব

ধর্মীয় ক্ষেত্রেও ক্রমান্বয়ে একটি মীমাংসাকারী শক্তি হিসেবে কাজ করবে । আমি দ্বিধা করি না।
আমাকে বলতেই হবে যে , যারা আজ দেশপ্রেমিক আন্দোলনগুলোকে ধর্মীয় বিবাদে জড়ানোর চেষ্টা করছে, তাদের মধ্যে আমি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্টদের চেয়েও আমার দেশের নিকৃষ্টতর শত্রু দেখতে পাই। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন এই কমিউনিস্টদের ধর্মান্তরিত করার দায়িত্ব নিয়েছে। কিন্তু যে কেউ নিজের আন্দোলনের সারি থেকে বেরিয়ে এসে একে তার লক্ষ্য পূরণে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করে, সে এমন এক কাজ করছে যা কঠোরতম নিন্দার যোগ্য। তারা ইহুদি স্বার্থের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করছে , তা সচেতনভাবে হোক বা অচেতনভাবে – তাতে কিছু যায় আসে না। কারণ দেশপ্রেমিক আন্দোলনগুলোর শক্তি ধর্মীয় সংঘাতে নষ্ট হওয়াটাই ইহুদিদের স্বার্থে , কারণ

ইহুদিদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠছে । আমি বিশেষভাবে এই আন্দোলনের শক্তির অপচয়ের কথা বলছি, কারণ কেবল তারাই কল্পনা করতে পারে যারা ইতিহাস সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, যে এই আন্দোলন এমন একটি সমস্যার সমাধান করতে পারে যা সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়করা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সমাধান করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন।

যাই হোক, ঘটনাগুলোই সব বলে দেয়। যে মানুষগুলো ১৯২৪ সালে হঠাৎ করে আবিষ্কার করেছিল যে দেশপ্রেমিক আন্দোলনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য হলো আল্ট্রামন্টানিজমের বিরুদ্ধে লড়াই করা, তারা ব্যর্থ হয়েছিল।
আল্ট্রামন্টানিজমকে দমন করতে পারলেও , দেশপ্রেমিক আন্দোলনকে বিভক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল । আমাকে আন্দোলনটিকে এমন কোনো অপরিণত মনের সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করতে হয়েছিল, যে ভেবেছিল সে পারবে

Machine Translated by Google

যা করতে বিসমার্কও ব্যর্থ হয়েছিলেন, তা-ই করা। এই ধরনের কোনো সংঘাতে আন্দোলনকে টেনে আনার যেকোনো প্রচেষ্টার নিঃশর্ত বিরোধিতা করা সর্বদাই জাতীয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতাদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হবে। এবং যে কেউ এই উদ্দেশ্যে অপপ্রচার চালাবে, তাকে অবিলম্বে এর সারি থেকে বহিষ্কার করতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে, আমরা ১৯২৩ সালের শরৎকাল পর্যন্ত আমাদের আন্দোলনকে এই ধরনের বিবাদ থেকে দূরে রাখতে সক্ষম হয়েছিলাম। আমাদের সারিতে সবচেয়ে ধর্মপ্রাণ প্রোটেস্ট্যান্টও সবচেয়ে একনিষ্ঠ ক্যাথলিকের পাশে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতে পারতেন, তাতে তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাসে বিন্দুমাত্র আঘাত লাগত না। আর্য মানবতার বিনাশকারীর বিরুদ্ধে তাঁরা একসাথে যে তিক্ত সংগ্রাম করেছিলেন, তা তাঁদের শ্রদ্ধাবোধ শিখিয়েছিল। আর এই বছরগুলোতেই আমাদের আন্দোলনকে তিক্ত সংঘাতে জড়াতে হয়েছিল।
মধ্যপন্থী দলের সাথে লড়াইটা ধর্মীয় বিষয় নিয়ে নয়, বরং জাতীয়, জাতিগত, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে। আমাদের সাফল্য প্রমাণ করেছিল যে আমরা সঠিক ছিলাম, কিন্তু আজকের দিনে তা খাটে না।
যারা নিজেদেরকে বেশি জ্ঞানী মনে করত, তাদের পক্ষে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ধর্মীয় সংঘাতে অন্ধ হয়ে দেশপ্রেমিক মহল তাদের কর্মকাণ্ডের মূর্খতা দেখতে পাচ্ছে না, যদিও নাস্তিক মার্ক্সবাদী সংবাদপত্রগুলো মার্ক্সবাদী স্বার্থ অনুযায়ী কোনো না কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পক্ষ নিচ্ছে এবং প্রায়শই অপরিমেয় নির্বোধ স্লোগান ও ঘোষণার মাধ্যমে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে, যা কখনো এক পক্ষকে, কখনো অন্য পক্ষকে বিব্রত করছে, আর এভাবেই আগুনকে যথাসম্ভব উজ্জ্বলভাবে জ্বালিয়ে রাখার জন্য তাতে ঘি ঢালছে।

কিন্তু জার্মানদের মতো মানুষদের ক্ষেত্রে, যাদের ইতিহাস প্রায়শই তাদের
ছায়ার নামে চূড়ান্ত ক্লান্তি পর্যন্ত লড়াই করতে সক্ষম, প্রতিটি রণহুঙ্কারই এক মারাত্মক বিপদ। এই স্লোগানগুলো প্রায়শই আমাদের জাতিকে তার অস্তিত্বের আসল সমস্যাগুলো থেকে বিভ্রান্ত করে। যখন আমরা ধর্মীয় যুদ্ধে শক্তি অপচয় করছি, তখন অন্যরা বিশ্বের নিজ নিজ অংশ জয় করছে। আর যখন দেশপ্রেমিক আন্দোলনগুলো নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করছে যে, ইহুদিদের চেয়ে আলট্রামন্টানিস্টদের থেকে বিপদ বেশি, নাকি এর বিপরীতে, ইহুদিরাই আমাদের অস্তিত্বের জাতিগত ভিত্তি ধ্বংস করছে এবং এর মাধ্যমে আমাদের জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে। এই ধরনের "দেশপ্রেমিক" যোদ্ধাদের বিষয়ে, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষ থেকে এবং সেই সূত্রে জার্মান জনগণের পক্ষ থেকে, আমি আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে প্রার্থনা করি : "প্রভু, আমাদের এমন বন্ধুদের থেকে রক্ষা করুন, যাতে আমরা সহজেই আমাদের শত্রুদের মোকাবিলা করতে পারি।"

* * *

ফেডারেশন ও একীকরণ নিয়ে বিতর্ক, যা ১৯১৯-এর দশকে ইহুদিরা অত্যন্ত চতুরতার সাথে প্রচার করেছিল
১৯২০ সাল এবং তার পরবর্তীকালে, এই বিবাদ প্রত্যাখ্যানকারী জাতীয় সমাজতন্ত্রীদেরকে তাদের বিবেচিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একটি দৃঢ় অবস্থান নিতে বাধ্য করা হয়েছিল।
জার্মানি কি একটি কনফেডারেশন হবে, নাকি একটি সামরিক রাষ্ট্র? এই পরিভাষাগুলোর প্রায়োগিক অর্থ কী? আমি মনে করি, প্রথমটির চেয়ে দ্বিতীয় প্রশ্নটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ...
সমগ্র সমস্যাটি বোঝার জন্য এটি অপরিহার্য, কারণ এর উত্তর বিভ্রান্তি দূর করতে এবং ফলস্বরূপ একতাবদ্ধকারী প্রভাব ফেলতে সাহায্য করতে পারে।

কনফেডারেশন বলতে কী বোঝায়? [২২)]

কনফেডারেশন বলতে আমরা সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের এমন একটি সংঘকে বুঝি, যারা নিজ স্বাধীন ইচ্ছায় এবং নিজেদের সার্বভৌমত্বের জোরে একত্রিত হয়ে একটি সম্প্রদায় গঠন করেছে এবং এই সংঘকে সম্ভবপর করতে ও এর অস্তিত্ব নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সার্বভৌম অধিকার সেই সম্প্রদায়কে প্রদান করেছে।

কিন্তু এই তাত্ত্বিক সূত্রটি বর্তমানে বিদ্যমান কোনো কনফেডারেশন দ্বারা বাস্তবে সম্পূর্ণরূপে পূরণ হয় না। অন্তত আমেরিকান ইউনিয়নের ক্ষেত্রে তো নয়ই, যেখানে অধিকাংশ রাজ্যের সার্বভৌমত্বের কথা বলাই অসম্ভব। এর প্রতিষ্ঠার অনেক পরে এদের অনেকগুলোকে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। আমেরিকান ইউনিয়ন গঠনকারী রাজ্যসমূহ

এগুলো মূলত ভূখণ্ডভিত্তিক, প্রযুক্তিগত প্রশাসনিক কারণে তৈরি করা হয়েছিল এবং অনেক ক্ষেত্রে মানচিত্রাঙ্কন দপ্তর দ্বারা এদের সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে, এই রাজ্যগুলো সার্বভৌম ছিল না এবং হতেও পারত না। যেহেতু ইউনিয়নই এদের বেশিরভাগ তৈরি করেছিল,

Machine Translated by Google

তথাকথিত রাষ্ট্রসমূহ। সুতরাং, বিভিন্ন ভূখণ্ডকে প্রায়শই অত্যন্ত ব্যাপক সার্বভৌম অধিকার প্রদান করা হয়েছিল, যা কেবল একটি কনফেডারেশনের প্রকৃতির সঙ্গেই নয়, বরং একটি মহাদেশের আকারের সমান বিশাল এলাকাকেও নির্দেশ করে। ফলস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলতে গেলে, তাদেরকে সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচনা করা যায় না , বরং সংবিধান দ্বারা প্রদত্ত ও নিশ্চিতকৃত অধিকার, অথবা সম্ভবত আরও ভালোভাবে বললে, স্বনির্ভর ক্ষমতা প্রয়োগকারী হিসেবে গণ্য করতে হয় ।

আমাদের সংজ্ঞাটিও জার্মানির পরিস্থিতিকে যথাযথভাবে প্রকাশ করে না। এটা সত্য যে জার্মানিতে রাইখ সৃষ্টির আগেও স্বতন্ত্র রাজ্যগুলো রাষ্ট্র হিসেবে বিদ্যমান ছিল এবং তাদের থেকেই রাইখের সৃষ্টি হয়েছিল। তবে, রাইখ স্বতন্ত্র রাজ্যগুলোর স্বেচ্ছামূলক ও সমান সহযোগিতার ফলে অস্তিত্বে আসেনি , বরং প্রুশীয় রাষ্ট্র ধীরে ধীরে অন্যদের উপর আধিপত্য অর্জন করার ফলেই এর সৃষ্টি হয়েছিল । জার্মান রাজ্যগুলোর মধ্যে ভূখণ্ডের আকারের বিশাল পার্থক্য আমেরিকান ইউনিয়নের সাথে যেকোনো তুলনার পথ বন্ধ করে দেয় । বিদ্যমান অতি ক্ষুদ্র জার্মান রাজ্যগুলো এবং বৃহত্তর রাজ্যগুলোর মধ্যেকার বিশাল ভূখণ্ডগত পার্থক্য তাদের নিজ নিজ রাজ্যের অসম অর্জনকে তুলে ধরে এবং দেখায় যে তারা যুক্তরাষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যের সৃষ্টি ও গঠনে সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে পারত না । এক্ষেত্রে, এই রাজ্যগুলোর বেশিরভাগই প্রকৃত সার্বভৌমত্ব ভোগ করলেও নিজেদের টিকিয়ে রাখতে পারত না ; এবং "রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব" শব্দটি অন্তর্নিহিত অর্থবিহীন একটি প্রশাসনিক সূত্র ছাড়া আর কিছুই হতো না । বাস্তবে, শুধু অতীতের ঘটনাই নয় , আমাদের নিজেদের সময়েও এই তথাকথিত "সার্বভৌম " রাষ্ট্রগুলোর কয়েকটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এবং এর মাধ্যমে সবচেয়ে ভালোভাবে প্রমাণ করেছে যে এই "সার্বভৌম" রাষ্ট্রব্যবস্থাগুলো কতটা দুর্বল ছিল।

কীভাবে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগুলো গঠিত হয়েছিল, সেই ঐতিহাসিক বিষয়গুলো আমি এখানে আলোচনা করতে পারব না , কিন্তু আমাকে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের সীমানাগুলো অধিবাসীদের জাতিগত সীমানার সাথে মিলে গিয়েছিল। এগুলো ছিল নিখাদ রাজনৈতিক ঘটনা, যার বেশিরভাগই সেই দুঃখজনক যুগে উদ্ভূত হয়েছিল যখন জার্মান সাম্রাজ্য নিঃশেষিত ও খণ্ডিত হয়ে পড়েছিল। এগুলো আমাদের মাতৃভূমির নিঃশেষ ও বিভাজন প্রক্রিয়ার কারণ এবং ফলাফল উভয়কেই প্রতিনিধিত্ব করে ।

পুরাতন রাইখের সংবিধানে এই সমস্ত বিষয় অন্তত কিছুটা হলেও বিবেচনা করা হয়েছিল, কারণ রাইখস্ট্যাগে স্বতন্ত্র রাজ্যগুলোর সমান প্রতিনিধিত্ব ছিল না, বরং তাদের প্রতিনিধিত্ব ছিল তাদের আকার, গুরুত্ব এবং রাইখ গঠনে তাদের ভূমিকার সমানুপাতিক।

রাইখ গঠনের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগুলো যে সার্বভৌম অধিকারগুলো ত্যাগ করেছিল, তা খুব সামান্য পরিমাণেই স্বেচ্ছায় হস্তান্তর করা হয়েছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে , সেগুলো কার্যত অস্তিত্বহীন ছিল অথবা প্রভাবশালী শক্তি প্রুশিয়ার চাপে সেগুলো কেড়ে নেওয়া হয়েছিল । বিসমার্কের নীতি ছিল , রাইখকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগুলো থেকে যা কিছু নেওয়া সম্ভব তা না দেওয়া , বরং স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে কেবল ততটুকুই দাবি করা যা রাইখের জন্য একান্ত অপরিহার্য। এটি ছিল একটি সংযত ও বিচক্ষণ নীতি। একদিকে, বিসমার্ক প্রথা ও ঐতিহ্যের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন ; অন্যদিকে, তাঁর নীতিগুলো একেবারে শুরু থেকেই নতুন রাইখের জন্য বিপুল পরিমাণ স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতা নিশ্চিত করেছিল। কিন্তু বিসমার্কের এই সিদ্ধান্তকে এই বিশ্বাসের ফল হিসেবে ধরে নেওয়া একটি মৌলিক ভুল হবে যে, এর মাধ্যমে রাইখ সার্বভৌমত্বের এমন সমস্ত অধিকার অর্জন করেছিল যা চিরকাল স্থায়ী হবে। এটি বিসমার্কের আদর্শ থেকে অনেক দূরে ছিল।

বরং তিনি ভবিষ্যতের জন্য এমন কিছু রেখে যেতে চেয়েছিলেন যা সেই সময়ে বাস্তবায়ন করা কঠিন হতো এবং যা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগুলোর পক্ষে মেনে নেওয়াও হয়তো কষ্টকর হতো। তিনি সময়ের সমতাবিধানকারী প্রভাব এবং বিবর্তন প্রক্রিয়ার চাপে বিশ্বাস করতেন, যার চলমান কার্যকলাপকে কোনো নির্দিষ্ট মুহূর্তে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগুলোর প্রতিরোধ ভাঙার চেষ্টার চেয়ে বেশি কার্যকর বলে মনে হতো না। এই নীতির মাধ্যমে তিনি একজন রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন । এবং প্রকৃতপক্ষে , স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌমত্বের বিনিময়ে রাইখের সার্বভৌমত্ব ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছিল । সময়ের প্রবাহ বিসমার্কের আশাকেই পূর্ণতা দিয়েছিল।

জার্মানির পতন এবং রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার উৎখাত নিশ্চয়ই এই বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছিল । জার্মানির যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজ্যগুলো, যেগুলো জাতিগত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না বরং রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত হয়েছিল, রাজতন্ত্রের উৎখাতের পর নিশ্চয়ই তাদের বৈধতা হারিয়েছিল।

Machine Translated by Google

স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা এবং এর সাথে যুক্ত রাজবংশগুলো , কারণ এই চেতনার কাছেই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক ভিত্তি ও বিকাশ ঋণী ছিল । এটি তাদের অস্তিত্বের অভ্যন্তরীণ কারণ থেকে বঞ্চিত করেছিল, তারা টিকে থাকার যেকোনো অধিকার ত্যাগ করেছিল এবং নিছক বাস্তব কারণে নিজেদের ইচ্ছায় প্রতিবেশী বা আরও শক্তিশালী রাষ্ট্রের সাথে একীভূত হতে বাধ্য হয়েছিল। এটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখিয়েছিল যে এই ক্ষুদ্র ছায়া রাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌমত্ব কতটা অবিশ্বাস্যভাবে দুর্বল ছিল এবং তাদের নাগরিকরা তাদের কতটা তুচ্ছ চোখে দেখত।

যদিও রাজতন্ত্র ও তার প্রতিনিধিদের উৎখাত রাইখের যুক্তরাষ্ট্রীয় চরিত্রের উপর একটি গুরুতর আঘাত হেনেছিল, যুক্তরাষ্ট্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আরও বেশি ধ্বংসাত্মক ছিল "শান্তি" চুক্তি থেকে উদ্ভূত বাধ্যবাধকতাগুলির স্বীকৃতি।

এটা স্বাভাবিক ও যৌক্তিক ছিল যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজ্যগুলো তাদের অর্থের ওপর সমস্ত সার্বভৌম নিয়ন্ত্রণ হারাবে, যখন রাইখ যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার ফলে এমন আর্থিক বাধ্যবাধকতার মধ্যে পড়তে বাধ্য হয়েছিল যা পৃথক রাজ্যগুলোর সাথে আলাদা চুক্তির মাধ্যমে কখনোই নিশ্চিত করা যেত না। পরবর্তী পদক্ষেপগুলো, যার ফলে রাইখ ডাকঘর ও রেলপথ দখল করে নেয়, তা ছিল আমাদের জনগণকে দাসত্বে আবদ্ধ করার প্রক্রিয়ার একটি জোরপূর্বক অগ্রগতি —এমন একটি প্রক্রিয়া যা শান্তিচুক্তিগুলোর মাধ্যমে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছিল। রাইখ কাঁচামালের দখল নিশ্চিত করতে বাধ্য হয়েছিল, যা আরও জবরদস্তির ফলে সৃষ্ট চাহিদা মেটাতে ক্রমাগত বাড়াতে হতো।

ফেডারেল রাজ্যগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য রাইখের ক্ষমতা যেভাবে প্রসারিত করা হয়েছিল , তা প্রায়শই হাস্যকরভাবে নির্বোধের মতো ছিল, কিন্তু প্রক্রিয়াটি নিজে থেকেই যৌক্তিক এবং স্বাভাবিক ছিল। দোষটা সেইসব ব্যক্তি ও দলের, যারা প্রয়োজনের মুহূর্তে ব্যর্থ হয়েছিল এবং সামরিক বিজয় অর্জনের জন্য তাদের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করতে পারেনি । দোষটা সেইসব দলের, বিশেষ করে বাভারিয়ার, যারা যুদ্ধের সময় নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করেছিল এবং রাইখকে তা থেকে বঞ্চিত করেছিল, যা যুদ্ধ হেরে যাওয়ার পর রাইখ তাদের কাছ থেকে দশগুণ বেশি নিতে বাধ্য হয়েছিল।

ইতিহাসের শাস্তি! কোনো অপরাধের পর স্বর্গীয় প্রতিশোধ যেভাবে এত দ্রুত নেমে এসেছে , তেমনটা খুব কমই দেখা গেছে। যে পক্ষগুলো কয়েক বছর আগেও নিজেদের রাজ্যগুলোর—বিশেষ করে বাভারিয়ার—স্বার্থকে রাইখের স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছিল, এখন তাদেরই নিষ্ক্রিয়ভাবে দেখতে হলো কীভাবে ঘটনার চাপে রাইখ নিজেদের স্বার্থেই স্বতন্ত্র রাজ্যগুলোর অস্তিত্ব বিলোপ করতে বাধ্য হচ্ছে । তারা ছিল তাদের নিজেদের কৃতকর্মের শিকার।

যুক্তরাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌম অধিকার হরণ নিয়ে বিলাপ করা ছিল ভণ্ডামির এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত । এই বিলাপগুলো নির্বাচকমণ্ডলীর সামনেই করা হতো, কারণ আমাদের সমসাময়িক দলগুলো কেবল নির্বাচকমণ্ডলীর কাছেই আবেদন জানায় । কিন্তু এই দলগুলো, ব্যতিক্রমহীনভাবে , এমন এক বাধ্যবাধকতা পূরণের নীতি গ্রহণে একে অপরকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল, যা কেবল পরিস্থিতির চাপ এবং তার চূড়ান্ত পরিণতির মাধ্যমেই রাইখের অভ্যন্তরীণ কাঠামোতে গভীর পরিবর্তন আনতে পারত। বিসমার্কের রাইখ ছিল মুক্ত এবং বহির্বিশ্বের প্রতি যেকোনো দায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত ।

বিসমার্কের রাইখকে কখনো ডাওয়েস পরিকল্পনার অধীনে জার্মানির উপর চাপানো এমন ভারী এবং সম্পূর্ণ নিষ্ফল বাধ্যবাধকতা বহন করতে হয়নি। এমনকি অভ্যন্তরীণ বিষয়েও , রাইখ তার অস্তিত্বের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় কয়েকটি বিষয়ে তার কর্তৃত্ব সীমাবদ্ধ রাখতে পারত। তাই, এটি এই রাজ্যগুলির উপর আর্থিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা থেকে অব্যাহতি পেতে পারত এবং তাদের অবদানের উপর নির্ভর করে চলতে পারত । অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজ্যগুলিকে রাইখকে যে তুলনামূলকভাবে কম আর্থিক কর দিতে হতো, তা তাদের সন্তুষ্টির সাথে এর অস্তিত্ব মেনে নিতে পরিচালিত করেছিল। এখন কিছু প্রচারক যেমনটা বলে থাকেন, তেমনটা বলা অসত্য ও অন্যায্য যে , যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজ্যগুলি শুধুমাত্র তাদের আর্থিক অধীনতার কারণেই রাইখের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল । না, ব্যাপারটা তেমন ছিল না। রাইখের দ্বারা মূর্ত রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি সহানুভূতির অভাব কোনো একক রাজ্যের সার্বভৌম অধিকার হারানোর কারণে উদ্ভূত হয়নি । এটি বরং বর্তমান শাসনব্যবস্থা যে শোচনীয় পদ্ধতিতে জার্মান জাতির স্বার্থ রক্ষা করছে, তা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। জাতীয় পতাকা ও সংবিধানের সম্মানে সমস্ত উদযাপন সত্ত্বেও , জার্মান জনগণের প্রতিটি অংশ অনুভব করে যে বর্তমান রাইখ তাদের আকাঙ্ক্ষার সাথে একমত নয় । এবং 'প্রজাতন্ত্র সুরক্ষা আইন' প্রজাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে সংঘটিত অত্যাচার প্রতিরোধ করতে পারে ।

Machine Translated by Google

কিন্তু এটি একজন জার্মানও এর ভালোবাসা অর্জন করতে পারবে না। আইন ও কারাদণ্ডের মাধ্যমে নিজ নাগরিকদের থেকে নিজেকে রক্ষা করার অবিরাম আকাঙ্ক্ষার কারণে , প্রজাতন্ত্রটি সামগ্রিকভাবে সকল প্রজাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে তীব্র ও অবমাননাকর সমালোচনার জন্ম দিয়েছে।

অন্য একটি কারণে, আজ কিছু দল যেমন দাবি করে, এটাও অসত্য যে, স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগুলোর পূর্বে ভোগ করা কিছু সার্বভৌম অধিকারের বিষয়ে কর্তৃত্বপরায়ণ আচরণের কারণে রাইখ তার জনপ্রিয়তা হারিয়েছে। যদি রাইখ স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগুলোর উপর তার ক্ষমতা প্রসারিত না করত, তবে এটা বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই যে, সামগ্রিক বাধ্যবাধকতাগুলো এখনকার মতোই ভারী থাকলে ঐ রাষ্ট্রগুলো তাকে আরও বেশি পছন্দ করত। বরং , ভার্সাই চুক্তি পূরণের জন্য রাইখকে এখন যে উল্লেখযোগ্যভাবে বর্ধিত কর দিতে হয়, তার নিজ নিজ অংশ যদি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগুলোকেও পরিশোধ করতে হতো , তবে রাইখের প্রতি শত্রুতা অসীমভাবে বেড়ে যেত। সেক্ষেত্রে শুধু যুক্তরাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রগুলো থেকে যথাযথ অংশ আদায় করাই আরও কঠিন হতো না, বরং জবরদস্তিমূলক পদ্ধতিরও প্রয়োজন পড়ত। শান্তি চুক্তির উপর ভিত্তি করে গঠিত একটি প্রজাতন্ত্রের সেই চুক্তি লঙ্ঘন করার সাহস বা উদ্দেশ্য কোনটাই থাকে না। আর যেহেতু তা-ই, তাই শান্তি চুক্তি দ্বারা আরোপিত বাধ্যবাধকতাগুলো তাকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে। এই পরিস্থিতির জন্য একমাত্র সেই দলগুলোকেই দায়ী করতে হবে , যারা ধৈর্যশীল নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজ্যগুলোর স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার কথা ক্রমাগত প্রচার করে , অথচ একই সাথে তারা রাষ্ট্রের কাছে এমন একটি নীতির প্রচার ও দাবি করে , যা অনিবার্যভাবে তাদের তথাকথিত "সার্বভৌম" অধিকারের শেষ চিহ্নটুকুও হরণের দিকে নিয়ে যাবে।

আমি প্রয়োজনের কথা বলছি, কারণ বর্তমান রাইখের তার উন্মাদসুলভ অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির দ্বারা চাপানো বোঝা বহন করার আর কোনো উপায় নেই। আরেকটি ফাটল আগেরটির মধ্যে ঢুকে সেটিকে আরও গভীরে ঠেলে দেয়। বিদেশি রাষ্ট্রগুলোর কাছে জার্মানির স্বার্থকে যে অপরাধমূলকভাবে উপস্থাপন করা হয়, তার ফলে রাইখের উপর যে প্রতিটি নতুন ঋণ চাপানো হয় , তা একটি নতুন ও আরও শক্তিশালী আঘাতের প্রয়োজনীয়তা তৈরি করে , যা ফাটলটিকে আরও গভীরে ঠেলে দেয়। এই আঘাতের জন্য প্রয়োজন হয় প্রতিটি রাষ্ট্রের সার্বভৌম অধিকার ক্রমান্বয়ে কেড়ে নেওয়ার প্রক্রিয়ায় আরও একটি পদক্ষেপ , যাতে বিরোধিতার বীজ অঙ্কুরিত হতে বা এমনকি অস্তিত্ব লাভ করতেও না পারে।

বর্তমান রাইখের নীতিগুলোকে পুরোনো রাইখের নীতিগুলো থেকে আলাদা করার প্রধান বৈশিষ্ট্যটি হলো এই : পুরোনো রাইখ তার জনগণকে দেশের অভ্যন্তরে স্বাধীনতা দিয়েছিল এবং বহির্বিশ্বের কাছে শক্তি প্রদর্শন করেছিল, অপরদিকে এই প্রজাতন্ত্র বিদেশিদের কাছে দুর্বলতা প্রদর্শন করে এবং দেশের অভ্যন্তরে তার নাগরিকদের ওপর নিপীড়ন চালায়। উভয় ক্ষেত্রেই, একটি মনোভাব অন্যটিকে ডেকে আনে। একটি জীবন্ত জাতি-রাষ্ট্রের তার নাগরিকদের সহানুভূতি ও আনুগত্যের কারণে অনেক অভ্যন্তরীণ আইনের প্রয়োজন হয় না। একটি আন্তর্জাতিক , অধীন রাষ্ট্র কেবল তার নাগরিকদেরকে তার দাবি মানতে বাধ্য করার মাধ্যমেই টিকে থাকতে পারে। আর "মুক্ত নাগরিক" নিয়ে কথা বলাটা বর্তমান সরকারের একটি নির্লজ্জ মিথ্যা। কেবল পুরোনো জার্মানিই এভাবে কথা বলতে পারত। বর্তমান প্রজাতন্ত্র বিদেশিদের সেবায় নিয়োজিত একটি দাস উপনিবেশ। বড়জোর এর প্রজা আছে, কিন্তু নাগরিক নেই। এর কোনো জাতীয় পতাকা নেই, আছে একটি ট্রেডমার্ক, যা সরকারি আদেশ এবং আইন প্রণয়নের মাধ্যমে প্রবর্তন ও সুরক্ষিত করা হয়েছে। জার্মান গণতন্ত্রের প্রতীক গেসলারের টুপি আমাদের জাতির চেতনার কাছে চিরকালই পরকীয় হয়ে থাকবে। ঐতিহ্যবোধ ও অতীতের মহত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধার অভাবযুক্ত একটি প্রজাতন্ত্র অতীতের এক প্রতীককে কলঙ্কিত করেছে , কিন্তু একদিন এটি অবাক হয়ে আবিষ্কার করবে যে তার নিজের প্রতীকের প্রতি নাগরিকদের ভক্তি কতটা অগভীর। প্রজাতন্ত্রটি জার্মান ইতিহাসে নিজেকে একটি অন্তর্বর্তীকালীন চরিত্র দিয়েছে। এই রাষ্ট্রটি কেবল সাধারণ আর্থিক কারণেই নয়, নীতিগত কারণেও স্বতন্ত্র রাজ্যগুলোর সার্বভৌম অধিকার ক্রমাগত সীমিত করতে বাধ্য। আর্থিক ব্ল্যাকমেলের নীতি প্রয়োগ করে, জনগণের রক্তের শেষ বিন্দু পর্যন্ত নিংড়ে নিয়ে, এটি তাদের শেষ অধিকারগুলো থেকেও বঞ্চিত করতে বাধ্য, কারণ অন্যথায়, সাধারণ অসন্তোষ একদিন প্রকাশ্য বিদ্রোহে রূপ নিতে পারে।

আমরা, জাতীয় সমাজতন্ত্রীরা, এই সূত্রটিকে উল্টে দিই এবং নিম্নলিখিত স্বতঃসিদ্ধটি গ্রহণ করি: একটি শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্র, যা তার সীমানার ভিতরে ও বাইরে উভয় স্থানেই নাগরিকদের অধিকারকে সর্বোচ্চ সম্ভাব্য পরিমাণে স্বীকৃতি দেয় ও রক্ষা করে, কেবল একটি দেশেই স্বাধীনতা দিতে পারে যা

Machine Translated by Google

রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য কম্পমান । অন্যদিকে, একটি শক্তিশালী জাতীয় সরকার হস্তক্ষেপ করতে পারে । রাইখের আদর্শকে দুর্বল না করেই ব্যক্তিবিশেষের স্বাধীনতা এবং অঙ্গরাজ্যগুলোর স্বাধীনতায় যুক্তিসঙ্গত মাত্রায় হস্তক্ষেপ করা; এবং রাইখের আদর্শের প্রতি নিজের দায়িত্ব স্বীকার করেই এটি করতে পারে , কারণ এই ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ড ও পদক্ষেপগুলোর মধ্যে প্রত্যেক নাগরিক সমগ্র জাতির মর্যাদা বৃদ্ধির উপায় দেখতে পায়।

অবশ্যই, এই বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রকে তার অভ্যন্তরীণ সংগঠনকে একীভূত করার সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় । এবং জার্মানিও এর ব্যতিক্রম নয়। আজ, রাইখ গঠনকারী রাষ্ট্রগুলোর জন্য 'রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব' নিয়ে কথা বলাটা অযৌক্তিক , কারণ এই রাষ্ট্রগুলোর অনেকগুলোর হাস্যকরভাবে ছোট আকারের কারণে তা অসম্ভব । বাণিজ্য এবং প্রশাসনের ক্ষেত্রে, স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগুলোর গুরুত্ব ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ক্রমাগত দূরত্ব ও পরিসর কমিয়ে আনছে। যা একসময় একটি রাষ্ট্র ছিল , তা এখন কেবল একটি প্রদেশ, এবং আধুনিক রাষ্ট্র দ্বারা পরিবেষ্টিত ভূখণ্ডে একসময় ছিল বিশাল এলাকা।

একটি মহাদেশের গুরুত্ব। জার্মানির মতো একটি রাষ্ট্র পরিচালনার নিছক প্রযুক্তিগত অসুবিধাগুলো একশ বছর আগে ব্র্যান্ডেনবার্গের মতো একটি প্রদেশ শাসন করার চেয়ে বেশি নয় । এবং আজ, মিউনিখ থেকে বার্লিনে ভ্রমণ করা একশ বছর আগের মিউনিখ থেকে স্টার্নবার্গে ভ্রমণের চেয়েও সহজ। আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থার আলোকে , আজকের রাইখের সমগ্র ভূখণ্ড নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের সময়কার কিছু জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজ্যের চেয়েও ছোট। এই বাস্তবতার পরিণতির প্রতি চোখ বন্ধ করে থাকা মানে অতীতে বাস করা। এমন মানুষ আগেও ছিল, আছে এবং থাকবে যারা এমনটা করে। তারা ঐতিহাসিক বিপ্লবকে বিলম্বিত করতে পারে, কিন্তু থামাতে পারে না।

আমরা জাতীয় সমাজতন্ত্রীরা এই সত্যের পরিণতিকে অলক্ষিত থাকতে দিতে পারি না । এইসব বিষয়ে, আমরা আমাদের তথাকথিত জাতীয় বুর্জোয়া দলগুলোর মামুলি কথায় বিভ্রান্ত হতেও পারি না। আমি "মামুলি কথা" বলছি কারণ এই একই প্রহসনগুলো তাদের প্রস্তাব বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতায় আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে না, এবং কারণ বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দায়ী প্রধান অপরাধী ও সহযোগী তারাই। বিশেষ করে বাভারিয়ায়, কেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া বন্ধ করার দাবিগুলো কোনো গুরুতর অন্তর্নিহিত ধারণা ছাড়াই কেবল দলীয় কৌশল হতে পারে । এই দলগুলো যদি কখনো কথার কথা থেকে বাস্তব পদক্ষেপে আসে , তবে তা হবে এক করুণ দৃশ্য। রাইখ কর্তৃক "বাভারিয়ার সার্বভৌম অধিকারের যেকোনো তথাকথিত লুণ্ঠন" নির্বোধ প্রতিবাদের গর্জন ছাড়া কোনো বাস্তব প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় না ।

অথচ যখন কেউ এই কেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের মূর্খতার বিরুদ্ধে জোরালো আপত্তি জানায় , তখন এই একই দলগুলো তাদের বলে যে , আধুনিক রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও চাহিদা সম্পর্কে তারা কিছুই বোঝে না । তারা তাদের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়, অভিশাপ দেয় এবং তাদের ওপর নির্যাতন চালায়, যতক্ষণ না তাদের কারারুদ্ধ করা হয় বা অবৈধভাবে জনস্বার্থ থেকে বঞ্চিত করা হয়।

এইসব তথ্যের আলোকে, আমাদের সমর্থকদের এই তথাকথিত ফেডারেলিস্ট মহলের গভীর ভণ্ডামি সম্পর্কে আরও বেশি নিশ্চিত হওয়া উচিত । অনেকাংশে , তারা ধর্মের মতোই ফেডারেলিস্ট মতবাদকে ব্যবহার করে , শুধুমাত্র তাদের হীন দলীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার একটি উপায় হিসেবে।

* * *

বিশেষ করে পরিবহন ক্ষেত্রে এক ধরনের একীকরণ যৌক্তিক বলে মনে হয়। কিন্তু আমরা, জাতীয় সমাজতন্ত্রীরা, আধুনিক রাষ্ট্রে এই ধরনের অগ্রগতির সর্বশক্তি দিয়ে বিরোধিতা করতে বাধ্য বোধ করি , বিশেষ করে যখন প্রস্তাবিত পদক্ষেপগুলো শুধুমাত্র একটি বিপর্যয়কর বৈদেশিক নীতিকে আড়াল ও সহজতর করার উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়েছে । এবং যেহেতু বর্তমান রাষ্ট্র উচ্চ জাতীয় রাজনৈতিক কারণে নয়, বরং দায়বদ্ধতা পূরণের এক অবাধ নীতির উপায় হিসেবে রেলপথ, ডাকঘর, অর্থব্যবস্থা ইত্যাদি দখল করার হুমকি দিচ্ছে — এই কারণে, আমরা, জাতীয় সমাজতন্ত্রীরা, এমন সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করব যা এই ধরনের নীতিকে বাধা দিতে পারে এবং সম্ভব হলে সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ করতে পারে। আমাদের জাতির অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে একত্রিত করার বর্তমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমাদের অবশ্যই লড়াই করতে হবে, কারণ এই ব্যবস্থাটি শুধুমাত্র শত শত কোটি টাকার লেনদেন ও হস্তান্তর সহজ করার জন্য গ্রহণ করা হয়েছিল ।

Machine Translated by Google

আমাদের রাজনীতিবিদদের দ্বারা গৃহীত যুদ্ধ-পরবর্তী প্রস্তাবনার নামে বিদেশীদের কাছে প্রতিশ্রুতি দেওয়া ।

এইসব কারণে, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে অবশ্যই এই প্রবণতাগুলোর বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করতে হবে।

অধিকন্তু , আমাদের অবশ্যই এই কেন্দ্রীকরণের বিরোধিতা করতে হবে, কারণ অভ্যন্তরীণ বিষয়ে এটি এমন একটি শাসনব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে যা তার সকল রূপে জার্মান জনগণের জন্য সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য বয়ে আনে । বর্তমান ইহুদি-গণতান্ত্রিক রাইখ, যা জার্মান জাতির জন্য এক সত্যিকারের অভিশাপ হয়ে উঠেছে , সেইসব যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজ্যগুলোর কাছ থেকে সমালোচনা খুঁজে বেড়ায় যারা এখনও সময়ের চেতনাকে গ্রহণ করেনি এবং তাদেরকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গিয়ে নিজের নীতি বাস্তবায়নের চেষ্টা করে । এর পরিপ্রেক্ষিতে, আমাদের, জাতীয় সমাজতন্ত্রীদের, অবশ্যই প্রতিটি রাজ্যের বিরোধিতাকে এমন একটি ভিত্তির উপর স্থাপন করার চেষ্টা করতে হবে যা সাফল্যের প্রতিশ্রুতি দেয় । আমাদের এটি করতে হবে কেন্দ্রীকরণের বিরুদ্ধে লড়াইকে এমন কিছুতে রূপান্তরিত করার মাধ্যমে যা সমগ্র জার্মান জনগণের বৃহত্তর স্বার্থকে প্রকাশ করে । অতএব, যেখানে বাভারিয়ান পপুলিস্ট পার্টি বাভারিয়ান রাজ্যের জন্য "বিশেষ অধিকার"-এর দাবিতে লড়াই করে তার সংকীর্ণ ও ব্যক্তিগত স্বার্থ অনুসরণ করে , সেখানে আমাদের অবশ্যই সেই একই অধিকারের জন্য লড়াই করার সময় সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থানে দাঁড়াতে হবে । আমাদের ভিত্তি হওয়া উচিত নভেম্বর গণতন্ত্রের বিরোধিতায় বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ।

কেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করার আরও একটি কারণ এই বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত হয় যে, অনেকাংশেই এই তথাকথিত জাতীয়করণের লক্ষ্য একীকরণ নয়, সরলীকরণ তো দূরের কথা। অনেক ক্ষেত্রে, এটি কেবল স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌম নিয়ন্ত্রণ থেকে নির্দিষ্ট কিছু প্রতিষ্ঠানকে সরিয়ে নেওয়ার একটি উপায়, যেগুলোকে তারা বিপ্লবী দলগুলোর হাতে তুলে দিতে চায় । জার্মান ইতিহাসে, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মতো স্বজনপ্রীতি এত জঘন্য আর কখনও ছিল না। এই আধুনিক কেন্দ্রীকরণের বেশিরভাগই সেইসব দল দ্বারা পরিচালিত হয়, যারা একসময় প্রতিভার বিকাশের পথ খুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ; এর মাধ্যমে তারা বোঝাতে চেয়েছিল যে, তারা এই পদগুলো শুধুমাত্র নিজেদের সমর্থকদের দিয়েই পূরণ করবে । প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে, বিশেষ করে ইহুদিদের রাইখ কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে এবং জাতীয় প্রশাসনে পদ দেওয়া হয়েছে , যার ফলে উভয়ই ইহুদিদের একচেটিয়া অধিকারে পরিণত হয়েছে ।

কৌশলগত কারণে, এই শেষ পরিস্থিতিটি আমাদের নজর রাখতে বাধ্য করে ।
কেন্দ্রীকরণের যেকোনো পরবর্তী প্রচেষ্টার বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং প্রতিটি পদক্ষেপে এর প্রতিরোধ করতে হবে । তবে , তা করার সময় আমাদের সর্বদা মহৎ জাতীয় নীতির কথা মনে রাখতে হবে, কখনোই ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের কথা নয়।

আমাদের সমর্থকদের মধ্যে এই ধারণা জন্মানো রোধ করার জন্য এই শেষ পর্যবেক্ষণটি প্রয়োজনীয় যে, আমরা রাইখকে তার অঙ্গরাজ্যগুলোর চেয়ে উচ্চতর সার্বভৌমত্ব ধারণ করার অধিকার দিই না। এই অধিকারের বিষয়ে, আমরা বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করতে পারি না এবং করবও না। আমাদের কাছে, রাষ্ট্র কেবল একটি রূপ। এর বিষয়বস্তুই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । আর তা হলো জাতি, জনগণ নয়। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, অন্য সকল স্বার্থকে জাতির সর্বোচ্চ স্বার্থের অধীন করতে হবে। বিশেষ করে, আমরা অন্য কোনো রাষ্ট্রকে জাতি এবং রাইখের মধ্যে সার্বভৌম ক্ষমতা ও অধিকার দিতে পারি না , যা জাতির প্রতিনিধিত্ব করে। কিছু যুক্তরাষ্ট্রীয় রাষ্ট্র বিদেশে "প্রতিনিধি কার্যালয়" এবং দেশে অনুরূপ বিদেশী "প্রতিনিধি কার্যালয়" বজায় রেখে যে অযৌক্তিকতা করে, তার অবসান ঘটাতে হবে।

এবং এর অবসান ঘটবে । যতক্ষণ না তা ঘটছে, ততক্ষণ কিছু বিদেশী রাষ্ট্র যে রাইখের রাজনৈতিক ঐক্য নিয়ে সন্দেহ পোষণ করে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করে, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এই ' প্রতিনিধিত্বগুলোর ' অযৌক্তিকতা আরও বেশি, কারণ এগুলো কেবল ক্ষতিই করে , বিন্দুমাত্র উপকারও বয়ে আনে না । যদি রাইখ রাষ্ট্রদূতের দ্বারা বিদেশে জার্মানির স্বার্থ রক্ষা করা না যায় , তবে তা তো আরও কঠিন ।
কোনো এক ক্ষুদ্র যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজ্যের একজন মন্ত্রীর দ্বারা সুরক্ষিত, যা বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার কাঠামোতে হাস্যকর বলে মনে হয় । সত্যিটা হলো , এই ক্ষুদ্র যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজ্যগুলোকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রচেষ্টায় আক্রমণের সম্ভাব্য লক্ষ্যবস্তু হিসেবে বিবেচনা করা হয় , এবং এই ধরনের সম্ভাবনা একটি বিদেশী রাষ্ট্রের জন্য সর্বদা সুখকর । আমরা জাতীয় সমাজতন্ত্রীরা বয়সের ভারে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়া কোনো অভিজাত গোষ্ঠীকে বিদেশে রাষ্ট্রদূতের পদে অধিষ্ঠিত হতে দিতে পারি না , এই ভেবে যে নতুন মাটিতে রোপণ করা একটি শুকনো শিকড় থেকে নতুন সবুজ অঙ্কুর গজাবে ।

Machine Translated by Google

তালিকা। পুরাতন রাইখের আমলেই বিদেশে আমাদের কূটনৈতিক প্রতিনিধিত্ব এতটাই শোচনীয় ছিল যে, এ ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার আরও কোনো প্রচেষ্টা বিবেচনা করা যায় না ।

এটা নিশ্চিত যে ভবিষ্যতে স্বতন্ত্র রাজ্যগুলোর গুরুত্ব আমাদের সাংস্কৃতিক নীতির ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হবে । বাভারিয়াকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য যিনি সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছিলেন, তিনি কোনো উগ্র স্বাতন্ত্র্যবাদী বা জার্মানি-বিরোধী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন প্রথম লুডভিগ, যিনি শিল্পের প্রতি যেমন নিবেদিত ছিলেন, তেমনি জার্মান মহত্ত্বের আদর্শের প্রতিও ছিলেন । তিনি বাভারিয়ার রাজনৈতিক ক্ষমতা নয়, বরং এর সাংস্কৃতিক অবস্থান বিকাশের জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করেছিলেন। এবং এর মাধ্যমে, তিনি অন্য কোনো পথ অনুসরণের চেয়ে আরও ভালো ও দীর্ঘস্থায়ী ফলাফল অর্জন করেছিলেন । ততদিন পর্যন্ত মিউনিখ ছিল একটি স্বল্প গুরুত্বপূর্ণ প্রাদেশিক শহর, কিন্তু তিনি এটিকে জার্মান শিল্পের এক মহানগরীতে রূপান্তরিত করেন এবং এভাবেই একটি কেন্দ্র তৈরি করেন।

বুদ্ধিবৃত্তিক, যার মধ্যে আজও ফ্রাঙ্কোনিয়া এবং বাভারিয়া অন্তর্ভুক্ত , যদিও ফ্রাঙ্কোনিয়ানদের
সম্পূর্ণ ভিন্ন এক মেজাজ। মিউনিখ যদি আগের মতোই থাকত , তাহলে স্যাক্সনিতে যা ঘটেছিল, বাভারিয়াতেও তারই পুনরাবৃত্তি ঘটত ; পার্থক্য শুধু এই যে, লাইপজিগ এবং বাভারিয়ার শহর নুরেমবার্গ বাভারিয়ান না হয়ে ফ্রাঙ্কোনিয়ান শহরে পরিণত হতো। "প্রুশিয়ার পতন হোক" স্লোগান মিউনিখকে মহান করে তোলেনি। এই শহরের গুরুত্বের কারণ হলো, এখানে এমন একজন রাজা ছিলেন যিনি জার্মান জাতিকে এমন একটি শৈল্পিক রত্ন উপহার দিতে চেয়েছিলেন যা দেখা ও সমাদৃত হবে, এবং তা হয়েছিলও। ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষাটা এখানেই নিহিত । ভবিষ্যতে স্বতন্ত্র রাজ্যগুলোর গুরুত্ব তাদের রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মধ্যে থাকবে না। আমি বরং তাদের গুরুত্বপূর্ণ জাতিগত ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে দেখি । কিন্তু এই ক্ষেত্রেও , সময় তার সমতাকরণের কাজটি করবে । আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থা মানুষকে এমনভাবে মিশিয়ে দেবে যে গোষ্ঠীগত সীমানা বিলুপ্ত হয়ে যাবে , এবং এমনকি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলও ধীরে ধীরে একীভূত হয়ে যাবে ।

সেনাবাহিনীকে অবশ্যই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগুলোর প্রভাবের বাইরে দৃঢ়ভাবে থাকতে হবে । আসন্ন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে অবশ্যই অতীতের ভুলের পুনরাবৃত্তি করা উচিত নয় , সেনাবাহিনীর উপর এমন সব কাজ চাপিয়ে দিয়ে যা তার কর্মক্ষেত্রের বাইরে এবং যা তাকে কখনোই দেওয়া উচিত ছিল না। জার্মান সেনাবাহিনী এমন কোনো বিদ্যালয় নয় যেখানে গোষ্ঠীগত বিশেষত্বকে লালন ও সংরক্ষণ করা হয় , বরং এর কাজ হলো সকল জার্মানকে একে অপরের রীতিনীতি বুঝতে ও তার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে শেখানো। জাতির জীবনে যা কিছু বিভেদ সৃষ্টি করে, সেনাবাহিনীর উপর তার একটি ঐক্যবদ্ধকারী প্রভাব থাকা উচিত। সেনাবাহিনীকে অবশ্যই জার্মান যুবককে তার ছোট প্রদেশের সংকীর্ণ দিগন্তের ঊর্ধ্বে তুলে জাতির বৃহত্তর চিত্র দেখাতে হবে। একজন যুবককে তার নিজের জাতির সীমানা নয়, বরং তার স্বদেশের সীমানা শিখতে হবে, কারণ

পরেরটি তাকে একদিন রক্ষা করতে হবে। তাই, তরুণ জার্মানদের নিজ অঞ্চলে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করাটা অযৌক্তিক। এই সময়ে তার জার্মান ভাষা শেখা উচিত । আজকের দিনে এটি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তরুণ জার্মানরা আগের মতো আর স্বেচ্ছায় ভ্রমণ করে না এবং এভাবে তাদের দিগন্ত প্রসারিত করে না। এই প্রেক্ষাপটে, বাভারিয়ার একজন তরুণ সৈন্যকে মিউনিখে, বাডেন-বাডেনের একজন সৈন্যকে বাড়িতে, ইত্যাদি রেখে আসাটা কি অযৌক্তিক নয়? একজন বাভারিয়ানকে রাইন ও উত্তর সাগর, একজন হামবুর্গবাসীকে আল্পস এবং পূর্ব প্রুশিয়ার এক বালককে মধ্য জার্মানির পর্বতমালা দেখানো কি আরও বেশি যুক্তিসঙ্গত হবে না? সৈন্যদের মধ্যে প্রতিটি অঞ্চলের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা উচিত , কিন্তু প্রশিক্ষণ শিবিরে নয়। আমরা প্রত্যাখ্যান করতে পারি

একীকরণের যেকোনো প্রকাশ গ্রহণযোগ্য, কিন্তু সেনাবাহিনীর একীকরণ নয়। বরং , আমরা অন্য কোনো ধরনের একীকরণ না চাইলেও , একে স্বাগত জানানো উচিত । বর্তমান রাইখ সেনাবাহিনীর আকারের পরিপ্রেক্ষিতে , সৈন্যদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিভাজন বজায় রাখা অযৌক্তিক হবে । অধিকন্তু , জার্মান সেনাবাহিনীর যে একীকরণ সম্পন্ন হয়েছে, তাতে আমরা এমন একটি বাস্তবতা দেখতে পাই যা আমরা প্রত্যাখ্যান করতে পারি না, বরং ভবিষ্যতের জাতীয় সেনাবাহিনীতে তা অবশ্যই বজায় রাখতে হবে।

অবশেষে, একটি নতুন বিজয়ী ধারণা পঙ্গু করে দিতে চাওয়া সমস্ত শৃঙ্খল ভেঙে দেবে।
এর অগ্রগতির প্রচেষ্টা । যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজ্যগুলোর বিদ্যমান সীমানা নির্বিশেষে, জাতীয় সমাজতন্ত্রকে অবশ্যই সমগ্র জার্মান জাতির উপর তার নীতি চাপিয়ে দেওয়ার অধিকার দাবি করতে হবে । আমাদের জার্মান জনগণকে আমাদের ধারণা ও নীতি শেখাতে হবে। ঠিক যেমন গির্জাগুলো রাজনৈতিক সীমানা দ্বারা সীমাবদ্ধ বা আবদ্ধ বোধ করে না, তেমনি জাতীয় সমাজতন্ত্রের ধারণাও করে না।

Machine Translated by Google

সমাজতন্ত্রকে আমাদের মাতৃভূমির অন্তর্গত স্বতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজ্যগুলোর ভূখণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না।

জাতীয় সমাজতন্ত্রের মতবাদ কোনো একক যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজ্যের রাজনৈতিক স্বার্থের সেবক নয় । একদিন একে সমগ্র জার্মান জাতির শিক্ষক হতে হবে।
এটি অবশ্যই সমগ্র জাতির জীবনকে প্রভাবিত ও পুনর্গঠন করবে। এই কারণে , আমাদের প্রত্যাখ্যাত রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ দ্বারা নির্ধারিত সীমানা অতিক্রম করার অধিকার আমাদের নিঃশর্তভাবে দাবি করতে হবে।

আমাদের আদর্শের বিজয় যত পূর্ণাঙ্গ হবে , আমাদের স্বাধীনতাও তত বাড়বে।
দেশের অভ্যন্তরে আমাদের নাগরিকদেরকে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে মঞ্জুর করা যেতে পারে ।

পাদটীকা:

২২) ১৯১৮ সালের আগে জার্মানি পঁচিশটি ফেডারেল রাজ্য নিয়ে গঠিত একটি ফেডারেল সাম্রাজ্য ছিল ।

Machine Translated by Google

একাদশ অধ্যায়

প্রচার ও সংগঠন

নানা দিক থেকে ১৯২১ সালটি আমার জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

যখন আমি জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টিতে যোগ দিই, তখন আমি প্রচারণার দায়িত্ব নিই , এই বিশ্বাসে যে সেই মুহূর্তে এই শাখাটিই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সেই সময়ে সাংগঠনিক সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো জরুরি প্রয়োজন ছিল না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন ছিল আমাদের ধারণাগুলোকে যতটা সম্ভব বেশি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া । প্রচারণার কাজ হলো সংগঠনের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে থাকা এবং এমন মানবিক উপাদান সংগ্রহ করা যা দিয়ে সংগঠনটি কাজ করবে। আমি কখনোই সংগঠনের তাড়াহুড়োপূর্ণ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ পদ্ধতির সমর্থক ছিলাম না, কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এর ফল হয় একটি মৃত যন্ত্র, কোনো জীবন্ত সংগঠন নয়। একটি সংগঠন হলো এমন এক সত্তা যা তার অস্তিত্ব লাভ করে জৈব জীবন, জৈব বিবর্তন থেকে। যখন একই ধরনের ধারণা একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মানুষের মনে স্থান করে নেয়, তখন তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই মানুষদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট শৃঙ্খলা তৈরি করার চেষ্টা করে এবং এই অভ্যন্তরীণ গঠন থেকেই কিছু একটার উদ্ভব ঘটে।

অবশ্যই , এখানেও, অন্য সব জায়গার মতোই, মানুষের সেই দুর্বলতাগুলোকে অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে , যার কারণে মানুষ , বিশেষ করে শুরুতে, কোনো উচ্চতর সত্তার নিয়ন্ত্রণে আসতে দ্বিধা বোধ করে। যদি যান্ত্রিকভাবে উপর থেকে সংগঠন চাপিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে এই আশঙ্কা থেকেই যায় যে, কোনো ব্যক্তি হয়তো নিজের প্রার্থিতা জোর করে প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং ঈর্ষার বশে আরও যোগ্য ব্যক্তিদের আন্দোলনের অগ্রভাগে তাদের স্থান নিতে বাধা দিতে পারে । এই ধরনের ঘটনা থেকে সৃষ্ট ক্ষতির পরিণতি ভয়াবহ হতে পারে, বিশেষ করে একটি নতুন আন্দোলনের জন্য।

এই কারণে, আন্দোলনটি যে ধারণাগুলোর ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, সেগুলোকে প্রথমে প্রচার করা এবং জনসমক্ষে ব্যাখ্যা করা বাঞ্ছনীয় । এই প্রচারকার্য সময়ের সাথে সাথে চালিয়ে যাওয়া উচিত এবং এটি একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে পরিচালিত হওয়া উচিত। যখন ধারণাগুলো ধীরে ধীরে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক অনুসারী লাভ করবে, তখন নেতৃত্ব গ্রহণে সক্ষম ব্যক্তিদের বাছাই করতে এবং তাদের সক্ষমতা পরীক্ষা করার জন্য এই মানব উপাদানগুলো থেকে সতর্কতার সাথে বাছাই করা উচিত। প্রায়শই , আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ ব্যক্তিরাই জন্মগত নেতা হিসেবে প্রমাণিত হন ।

অবশ্যই, এটা ধরে নেওয়া ভুল যে, যারা অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন এবং কোনো আন্দোলনের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম , তারা দায়িত্বপূর্ণ নেতৃত্বের পদের জন্য উপযুক্ত। প্রায়শই এর বিপরীতটাই সত্য।

তত্ত্বের মহান গুরুরা খুব কমই মহান সংগঠক হন । এর কারণ হলো, তাত্ত্বিক ও ব্যবস্থা-নির্মাতার মহত্ত্ব নিহিত থাকে বিমূর্তভাবে সত্য এমন সব সূত্র আবিষ্কার ও বিকাশের সামর্থ্যের মধ্যে, যেখানে একজন সংগঠকের সর্বোপরি মনস্তাত্ত্বিক প্রজ্ঞা থাকা আবশ্যক । তাঁকে মানুষকে তারা যেমন, ঠিক তেমনভাবেই গ্রহণ করতে হবে এবং একারণে তাঁকে তাদের জানতে হবে; মানব প্রকৃতিকে অতিমূল্যায়ন বা অবমূল্যায়ন কোনোটিই করা যাবে না । তাদের দুর্বলতা, তাদের দুষ্টতা এবং অন্যান্য বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে , যাতে তাদের থেকে এমন কিছু সৃষ্টি করা যায় যা হবে একটি জীবন্ত সত্তা— প্রতিরোধের প্রবল ক্ষমতায় সমৃদ্ধ, একটি ধারণার বাহক এবং তার বিজয় নিশ্চিত করার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী ।

কিন্তু এমন একজন মহান তাত্ত্বিক খুঁজে পাওয়া আরও কঠিন যিনি একজন মহান নেতাও। শেষোক্ত ব্যক্তিকে মূলত একজন আন্দোলনকারী হতে হয়, এবং এই সত্যটি অনেকেই সহজে মেনে নেন না যারা কেবল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যা নিয়ে কাজ করেন । আর এটা খুবই স্বাভাবিক। একজন আন্দোলনকারী যিনি বিশাল জনতার কাছে ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারেন , তিনি কেবল একজন জননেতা হলেও তাকে অবশ্যই একজন মনোবিজ্ঞানী হতে হবে । অতএব, তিনি সর্বদাই একজন চিন্তাশীল তাত্ত্বিকের চেয়ে অনেক বেশি যোগ্য নেতা হবেন, যিনি জনতা ও জগৎ থেকে দূরে থেকে নিজের ধারণা নিয়ে ধ্যান করেন। নেতা হতে হলে , মানুষকে চালিত করতে সক্ষম হতে হবে।

জনসাধারণ। ধারণা গঠনের ক্ষমতার সাথে নেতৃত্বের দক্ষতার কোনো সম্পর্ক নেই। কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ— আদর্শ ও মানবিক লক্ষ্য বোঝার ক্ষমতা , নাকি সেগুলোকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার ক্ষমতা—তা নিয়ে তর্ক করা সম্পূর্ণ অর্থহীন । এখানে, যেমনটা প্রায়শই ঘটে থাকে

Machine Translated by Google

জীবনে, এই ক্ষমতাগুলোর একটি ছাড়া অন্যটি সম্পূর্ণ অর্থহীন। মানব যুক্তির মহত্তম ধারণাগুলোও অর্থহীন ও উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়ে, যদি নেতা জনসাধারণকে নিজের পেছনে একত্রিত করতে না পারেন। বিপরীতক্রমে, নেতার সমস্ত প্রতিভার কী লাভ হবে, যদি সেই বুদ্ধিজীবী তাত্ত্বিক মানবজাতির জন্য অপরিহার্য লক্ষ্যগুলো নির্ধারণ করতে ব্যর্থ হন? কিন্তু যখন তাত্ত্বিক, সংগঠক এবং নেতার ক্ষমতা একজন ব্যক্তির মধ্যে একত্রিত হয় , তখন আমরা পৃথিবীতে এক বিরলতম ঘটনার দেখা পাই। আর এই মিলনই একজন মহান মানুষ তৈরি করে।

যেমনটা আমি আগেই বলেছি, দলে আমার প্রথম মেয়াদে আমি প্রচারণার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলাম । আমি ক্রমান্বয়ে এমন একটি ছোট দল জড়ো করতে সক্ষম হয়েছিলাম , যারা নতুন মতবাদ গ্রহণ করতে ও তা অনুসরণ করতে ইচ্ছুক ছিল । এইভাবে, আমাদের সেই মানব উপাদান সরবরাহ করা উচিত, যা পরবর্তীতে সংগঠনের ভিত্তিপ্রস্তর গঠন করবে। সুতরাং , একজন প্রচারকের লক্ষ্য প্রায় সবসময়ই একজন সংগঠকের লক্ষ্যের চেয়ে অনেক বেশি দূরদর্শী হয়।

যদি কোনো আন্দোলন প্রচলিত ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করে তার জায়গায় নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব করে, তাহলে নিম্নলিখিত নীতিগুলি অবশ্যই স্পষ্টভাবে বোঝা এবং প্রাধান্য পেতে হবে ।

এর নেতাদের সারিতে: যে কোনো আন্দোলন যা মানব

সম্পদ অর্জন করেছে, তাকে অবশ্যই দুটি দলে বিভক্ত করতে হবে: যথা, সমর্থক এবং সদস্য।

একজন প্রচারকের কাজ হলো সমর্থক জোগাড় করা, এবং একজন সংগঠকের কাজ হলো
সদস্য নির্বাচন। কোনো আন্দোলনের সমর্থক তার লক্ষ্যগুলো বোঝেন ও মেনে নেন; একজন সদস্য সেগুলোর জন্য লড়াই করেন।

অনুসারী হলেন এমন ব্যক্তি যিনি প্রচারণার দ্বারা কোনো আন্দোলনের মতবাদে দীক্ষিত হয়েছেন ।
সদস্য হলেন এমন একজন ব্যক্তি, যাঁকে সংগঠনটি নতুন সমর্থক জোগাড় করার কাজে সহযোগিতা করার দায়িত্ব অর্পণ করে, যেখান থেকে নতুন সদস্য গঠন করা যায় ।

অনুসারী হওয়ার জন্য কেবল কোনো ধারণাকে নিষ্ক্রিয়ভাবে মেনে নেওয়াই যথেষ্ট। সদস্য হওয়ার অর্থ হলো সেই ধারণার প্রতিনিধিত্ব করা এবং তার জন্য লড়াই করা। দশজন অনুসারীর মধ্যে মাত্র দুজন সদস্য থাকতে পারে । অনুসারী হওয়ার অর্থ হলো একজন ব্যক্তি আন্দোলনের মতবাদ গ্রহণ করেছে ; অপরদিকে সদস্য হওয়ার অর্থ হলো , যে মতবাদে সে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তা প্রচারে সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়ার সাহস তার আছে ।

তাদের নিষ্ক্রিয় স্বভাবের কারণে, অধিকাংশ মানুষের জন্য শুধু একটি রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাস করাই যথেষ্ট , কেননা মানবজাতির বেশিরভাগই মানসিকভাবে অলস ও ভীরু ।
সদস্য হিসেবে ব্যক্তিকে অবশ্যই বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সক্রিয় হতে হবে, এবং এটি শুধুমাত্র সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

সুতরাং, প্রচারককে অবশ্যই আন্দোলনের জন্য ক্রমাগত নতুন সমর্থক জোগাড় করতে হবে, অপরদিকে সংগঠককে অবশ্যই এই সমর্থকদের মধ্য থেকে সেরা ব্যক্তিদের সচেতনভাবে বাছাই করে তাদেরকে সদস্যে রূপান্তরিত করতে হবে। প্রচারককে তার দ্বারা আন্দোলনের জন্য ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত মূল্য নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। তাদের যোগ্যতা , বুদ্ধিমত্তা বা চরিত্র যাচাই করারও তার প্রয়োজন নেই। তবে, এই ধর্মান্তরিতদের মধ্য থেকে সংগঠককে অবশ্যই সেইসব ব্যক্তিদের বাছাই করতে হবে, যারা আন্দোলনের বিজয় অর্জনে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ।

* * *

প্রচারকের লক্ষ্য হলো মানুষকে তার মতবাদ গ্রহণে রাজি করানো। সংগঠক তার সদস্যদের মধ্য থেকে কেবল তাদেরকেই বেছে নেন, যারা মনস্তাত্ত্বিক কারণে আন্দোলনের মতবাদের আরও প্রসারে বাধা দেবে না।

* * *

প্রচারক জনগণের মনে তার মতবাদ গেঁথে দেন, এই উদ্দেশ্যে যে , সংগ্রামকে বিজয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও ইচ্ছাশক্তি প্রমাণকারী অনুসারীদের মধ্য থেকে তিনি যে সংগ্রামী সদস্যদের গড়ে তুলেছেন , তাদের মাধ্যমে সেই মতবাদের বিজয়ের সময়ের জন্য তাদের প্রস্তুত করা ।

* * *

Machine Translated by Google

মতবাদটির চূড়ান্ত বিজয় আরও সহজ হবে, যদি প্রচারক সফলভাবে বিপুল সংখ্যক মানুষকে এই মতবাদে বিশ্বাসী করে তুলতে পারেন এবং যদি এই লড়াইয়ের সক্রিয় নেতৃত্বদানকারী সংগঠনটি হয় নির্বাচিত, উদ্যমী ও শক্তিশালী।

* * *

একবার প্রচারণার মাধ্যমে যখন একটি গোটা জাতি কোনো মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে, তখন একটি সংগঠন মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের কাজের মাধ্যমে তার প্রভাবকে বাস্তবে রূপ দিতে পারে। প্রচারণা ও সংগঠন, এবং সেই সূত্রে অনুসারী ও সদস্য—এরা পারস্পরিক নির্ভরশীলতায় পাশাপাশি অবস্থান করে। প্রচারণা যত ভালো কাজ করবে, সংগঠন তত ছোট হবে। অনুসারীর সংখ্যা যত বেশি হবে, সদস্য সংখ্যা তত কম হতে পারে। এবং এর বিপরীতটাও সত্য। প্রচারণা যদি খারাপ হয়, তবে সংগঠনকে অবশ্যই বড় হতে হবে। যদি অনুসারী কম থাকে, তবে সদস্য সংখ্যা অবশ্যই বেশি হতে হবে— যদি আন্দোলনটি সত্যিই সাফল্য আশা করে।

* * *

প্রচারকের প্রধান কর্তব্য হলো এমন লোকদের মন জয় করা, যাদেরকে পরবর্তীতে সংগঠনে গ্রহণ করা যায়। সংগঠনের প্রধান কর্তব্য হলো এমন লোকদের বাছাই ও প্রশিক্ষণ দেওয়া, যারা প্রচারকার্য পরিচালনায় সক্ষম হবে। সংগঠনের দ্বিতীয় কর্তব্য হলো বিদ্যমান ব্যবস্থাকে ভেঙে দেওয়া এবং এর মাধ্যমে তার উপস্থাপিত নতুন মতবাদের প্রসারের জন্য জায়গা তৈরি করা ; অপরদিকে সংগঠকের কর্তব্য হলো ক্ষমতা সুরক্ষিত করার জন্য সংগ্রাম করা , যাতে মতবাদটি শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হতে পারে।

* * *

বিশ্ব ও মানব অস্তিত্বের বৈপ্লবিক ধারণাটি চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করবে, যখন এই নতুন বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে, অথবা প্রয়োজনে তাদের উপর তা চাপিয়ে দেওয়া হবে , এবং যখন, অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় সংগঠনটি, অর্থাৎ স্বয়ং আন্দোলনটি, সেই মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তির হাতে থাকবে, যারা আসন্ন রাষ্ট্রের স্নায়ুকেন্দ্রগুলো গড়ে তোলার জন্য একেবারেই অপরিহার্য।

অন্য কথায় , এর অর্থ হলো , বিশ্বগুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি মহান বিপ্লবী আন্দোলনে , সেই আন্দোলনের আদর্শগুলো অবশ্যই প্রচারণার মাধ্যমে ছড়িয়ে দিতে হবে। প্রচারককে অবশ্যই অক্লান্তভাবে নতুন ধারণাগুলোকে সুস্পষ্টভাবে বোঝানোর জন্য, সেগুলোকে অন্যদের মধ্যে গেঁথে দেওয়ার জন্য, অথবা অন্তত নিজেকে অন্যের অবস্থানে রেখে তাদের পূর্ববর্তী বিশ্বাসের দৃঢ়তাকে নাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এই ধরনের প্রচারণাকে কার্যকর হতে হলে, এর ভিত্তি হতে হবে সংগঠন। সংগঠনটি তার সদস্যদের নির্বাচন করে সেইসব সমর্থকদের মধ্য থেকে , যাদেরকে প্রচারণা অর্জন করেছে। প্রচারণার কাজ যত নিবিড়ভাবে চালানো হবে, সংগঠনটি তত বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবে। এবং প্রচারণা কাজ করবে।

এর পেছনের সংগঠনটি যত শক্তিশালী ও উদ্যমী হবে , ততই ভালো।

সুতরাং, সংগঠকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো এটা নিশ্চিত করা যে, আন্দোলনের সদস্যদের মধ্যে উদ্ভূত কোনো মতবিরোধ বা ভিন্নমত যেন বিভাজনের দিকে পরিচালিত না করে এবং এর ফলে আন্দোলনের কাজ যেন বাধাগ্রস্ত না হয়। অধিকন্তু , সংগঠনের কাজ হলো এটা নিশ্চিত করা যে, আন্দোলনের সংগ্রামী চেতনা যেন দুর্বল হয়ে বিলুপ্ত না হয়ে যায়, বরং তা যেন ক্রমাগত শক্তিশালী ও উজ্জীবিত থাকে। অনির্দিষ্টকালের জন্য সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর কোনো প্রয়োজন নেই। বরং এর বিপরীত পরিস্থিতিই কাম্য। এই বাস্তবতার আলোকে যে, মানবজাতির একটি ক্ষুদ্র অংশেরই কেবল শক্তি ও সাহস রয়েছে, তাই যে আন্দোলন অনির্দিষ্টকালের জন্য তার সংগঠনকে প্রসারিত করে, তা একদিন অতিরিক্ত ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়তে বাধ্য। সংগঠন, ধরা যাক সদস্যদের দল, যখন একটি নির্দিষ্ট সীমার বাইরে তাদের আকার বৃদ্ধি করে , তখন তারা ধীরে ধীরে তাদের সংগ্রামী শক্তি হারিয়ে ফেলে এবং আক্রমণাত্মক শক্তি ও দৃঢ়তার সাথে মতবাদের প্রচারকে সমর্থন করতে আর সক্ষম থাকে না।

Machine Translated by Google

মতবাদটি যত বৃহত্তর ও বৈপ্লবিক হবে, আন্দোলনের সদস্যদের অনুপ্রাণিত করার চেতনাও তত বেশি সক্রিয় হবে , কারণ এই ধরনের মতবাদের বিধ্বংসী শক্তি কাপুরুষ ও ক্ষুদ্র বুর্জোয়াদের বিতাড়িত করবে। তারা হয়তো মনে মনে মতবাদটিতে বিশ্বাস করে , কিন্তু এই বিশ্বাস প্রকাশ্যে স্বীকার করতে ভয় পায় । ঠিক এই কারণেই, একটি সত্যিকারের বৈপ্লবিক ধারণা দ্বারা অনুপ্রাণিত সংগঠন কেবল তাদেরই সদস্য হিসেবে আকর্ষণ করবে, যারা এর প্রচারণার মাধ্যমে মতবাদটিতে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে এবং সবচেয়ে বেশি সক্রিয় । সদস্যদের এই সক্রিয়তার মধ্যেই , যা প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়া দ্বারা নিশ্চিত, আমরা সক্রিয় ও সাহসী প্রচারণা চালিয়ে যাওয়ার পূর্বশর্ত দেখতে পাই , সেইসাথে যে ধারণার উপর আন্দোলনটি প্রতিষ্ঠিত, তার সাফল্যের জন্য সফলভাবে লড়াই করার পূর্বশর্তও দেখতে পাই।

একটি আন্দোলনের জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ হলো খুব দ্রুত সাফল্যের কারণে এর সদস্য সংখ্যায় অত্যধিক বৃদ্ধি । যতক্ষণ আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিতে হবে
কঠিন ও তিক্ত লড়াই, দুর্বল ও স্বার্থপর লোকেরা তার থেকে দূরে থাকবে ; কিন্তু তারা থাকবে
দলটি তার বিকাশের পথে সুস্পষ্ট সাফল্য অর্জন করলে তারা সদস্য হিসেবে গৃহীত হওয়ার চেষ্টা করে।

এর ভিত্তিতে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি কেন প্রাথমিকভাবে সফল হওয়া বহু আন্দোলন তাদের লক্ষ্যে পৌঁছানোর আগেই মন্থর হয়ে পড়েছিল , এবং অন্য কোনোভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না এমন এক অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার কারণে সংগ্রাম ছেড়ে দিয়ে অবশেষে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। প্রাথমিক সাফল্যের ফলে বহু অবাঞ্ছিত, অযোগ্য এবং ভীরু ব্যক্তি আন্দোলনের সদস্য হয়ে ওঠে, যার ফলে তারাই অবশেষে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ায় এবং অন্যদের সংগ্রামের স্পৃহাকে দমন করে ফেলে।

এই নিকৃষ্ট গোষ্ঠীগুলো তখন আন্দোলনটিকে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করল এবং একে নিজেদের হীন বীরত্বের পর্যায়ে নামিয়ে এনে তারা আর মূল আদর্শের বিজয়ের জন্য লড়াই করল না । প্রাথমিক উদ্দীপনার আগুন নিভে গেল , সংগ্রামের স্পিরিট দুর্বল হয়ে পড়ল, এবং বুর্জোয়া জগৎ যেমনটা বলে থাকে —এবং যা এই ক্ষেত্রে খুবই সত্য—পার্টি মদের সাথে জল মিশিয়ে ফেলল।

এই কারণে, নিছক আত্মরক্ষার স্বার্থেই আন্দোলনটির সাফল্য অর্জনের মুহূর্তেই সদস্য তালিকা বন্ধ করে দেওয়া অপরিহার্য। এর সংগঠনের যেকোনো পরবর্তী সম্প্রসারণের অনুমতি কেবল সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে এবং সদস্যপদ প্রত্যাশীদের পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাই-বাছাইয়ের পরেই দেওয়া উচিত । কেবল এইভাবেই আন্দোলনের মূল ভিত্তি অটুট, সতেজ এবং সুস্থ রাখা সম্ভব । এ ব্যাপারে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেন আন্দোলনের নেতৃত্ব শুধুমাত্র এর প্রাথমিক মূল অংশের হাতেই থাকে । এর অর্থ হলো , এই মূল অংশকেই প্রচারণার নির্দেশনা দিতে হবে , যার লক্ষ্য হবে আন্দোলনের সাধারণ স্বীকৃতি নিশ্চিত করা। এবং আন্দোলনটি নিজে, একবার ক্ষমতা গ্রহণ করলে , তার আদর্শগুলোকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত উপায় অবলম্বন করবে এবং সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

সংগঠনটির উচিত আন্দোলনটির প্রাথমিক প্রতিষ্ঠাতাদের দিয়ে অর্জিত সকল গুরুত্বপূর্ণ পদ পূরণ করা এবং তাদের মধ্য থেকেই আন্দোলনের সমগ্র নেতৃত্ব গঠন করা । এই প্রক্রিয়া ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকবে , যতক্ষণ না দলীয় মতবাদ নতুন রাষ্ট্রের নীতির ভিত্তি হয়ে ওঠে । কেবল তখনই আন্দোলনের চেতনায় সৃষ্ট রাষ্ট্রের সংবিধানের হাতে ক্রমান্বয়ে রাজদণ্ড হস্তান্তর করা সম্ভব হবে । কিন্তু এটি সাধারণত পারস্পরিক প্রতিযোগিতার একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ঘটে থাকে , কারণ এটি মানবিক বুদ্ধিমত্তার চেয়ে বিভিন্ন শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়ার বিষয়, যার বিকাশ শুরু থেকেই অনুমান করা গেলেও চিরকাল নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয় ।

রাজনৈতিক বা ধর্মীয়, সকল মহান আন্দোলনের চিত্তাকর্ষক সাফল্য এই নীতিগুলোর স্বীকৃতি ও গ্রহণের কারণেই সম্ভব হয়েছে । এবং এই বিধানগুলো সম্মানিত না হলে কোনো স্থায়ী সাফল্য কল্পনা করা যায় না ।

* * *

দলীয় প্রচার বিভাগের প্রধান হিসেবে আমি শুধু পরবর্তী পর্যায়ে আন্দোলনের জাঁকজমকের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুতই করিনি, বরং সেরা ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত না করার জন্য সবচেয়ে কঠোর পদক্ষেপও গ্রহণ করেছিলাম । আমার প্রচারণা যত বেশি কঠোর ছিল, ততই তা দুর্বল ও দোদুল্যমানদের নিরুৎসাহিত করত, ফলে তাদের আমাদের সংগঠনের মূল কেন্দ্রে প্রবেশে বাধা দিত। তারা হয়তো সমর্থক হিসেবে থেকে যেত, কিন্তু আমাদের মূল নেতা নয়।

Machine Translated by Google

তারা সোচ্চার হয়েছিলেন। বরং , এ বিষয়ে তারা বিচক্ষণ নীরবতা বজায় রেখেছিলেন। হাজার হাজার মানুষ আমাকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে, তারা আমাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তারা আমাদের দলের সদস্য হতে পারবেন না। তারা বলেছিলেন , আন্দোলনটি এতটাই উগ্রপন্থী যে এর সদস্যপদ তাদের কঠোর নিন্দা ও গুরুতর বিপদের মুখে ফেলবে , তাই আমাদের আদর্শের প্রতি আন্তরিকভাবে নিবেদিত হওয়া সত্ত্বেও , তারা অন্তত কিছু সময়ের জন্য সৎ ও শান্তিকামী নাগরিক হিসেবে দূরে থাকাই শ্রেয় মনে করেছেন ।

আর এই সবকিছুই আমাদের জন্য মঙ্গলজনক প্রমাণিত হলো। যেসব মানুষ মনে মনে বিপ্লবী ধারণাকে সমর্থন করতেন না, তারা যদি সেই সময়ে আমাদের আন্দোলনের সদস্য হতেন, তাহলে আজ আমরা সংগ্রামের চেতনায় উদ্বুদ্ধ একটি নবীন আন্দোলন না হয়ে, একটি ধর্মপ্রাণ ভ্রাতৃসংঘ হতাম। আমাদের সমস্ত প্রচারণায় আমি যে প্রাণবন্ত ও সংগ্রামী রূপ দিয়েছিলাম , তা আমাদের আন্দোলনের

আমূল পরিবর্তনকামী প্রবণতাগুলোকে শক্তিশালী ও সুনিশ্চিত করেছিল। এর ফলস্বরূপ, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া , কেবল আমূল পরিবর্তনকামী দৃষ্টিভঙ্গির লোকেরাই এর সদস্য হতে ইচ্ছুক ছিলেন ।

আমাদের প্রচারণার এই প্রভাবে অল্প সময়ের মধ্যেই লক্ষ লক্ষ নাগরিক মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল যে আমরাই সঠিক এবং আমাদের বিজয় কামনা করেছিল, যদিও ব্যক্তিগতভাবে তারা আমাদের আদর্শের জন্য আত্মত্যাগ করতে বা এমনকি এতে অংশ নিতেও অত্যন্ত লাজুক ছিল।

১৯২১ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত, সমর্থক জোগাড় করার এই সাধারণ কার্যকলাপই আন্দোলনের জন্য যথেষ্ট ও মূল্যবান ছিল । কিন্তু সেই বছরের গ্রীষ্মে এমন কিছু ঘটনা ঘটে, যা আমাদের প্রচারণার আপাত সাফল্যের সাথে আমাদের সংগঠনকে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম করে।

একদল দেশপ্রেমী দূরদর্শী ব্যক্তি তৎকালীন দলীয় সভাপতির সমর্থনে , এই ক্ষুদ্র চক্রান্তের কারণে বিভক্ত দলটির নেতৃত্ব দখলের চেষ্টা করেন এবং সাধারণ সভায় সর্বসম্মত ভোটে দলের সম্পূর্ণ নেতৃত্ব আমার উপর অর্পণ করেন । একই সাথে, একটি নতুন বিধি গৃহীত হয়, যা একক দায়িত্ব আরোপ করে।

আন্দোলনের সভাপতি হিসেবে তিনি কমিটিভিত্তিক প্রস্তাব প্রণয়নের ব্যবস্থা বিলুপ্ত করেন এবং এর পরিবর্তে শ্রম বিভাজনের নীতি প্রবর্তন করেন , যা তখন থেকে অত্যন্ত কার্যকরভাবে কাজ করে আসছে ।

১৯২১ সালের ১লা আগস্ট থেকে আমি দলের এই অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনের কাজ হাতে নিই, যেটিতে আমি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমর্থন পেয়েছিলাম। আমি পরে তাঁদের এবং তাঁদের কাজের কথা উল্লেখ করব।

প্রচারণার মাধ্যমে অর্জিত সুফলকে সংগঠনের সুবিধার্থে কাজে লাগিয়ে একে স্থিতিশীল করার প্রচেষ্টায় , আমাকে বহু পুরোনো প্রথা সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করতে হয়েছিল এবং এমন সব বিধিমালা প্রবর্তন করতে হয়েছিল যা অন্য কোনো দলের ছিল না বা তারা গ্রহণ করেনি ।

১৯২০-২১ সালে, আন্দোলনটি একটি সাধারণ সভায় সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত একটি কমিটি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। কমিটিতে ছিলেন প্রথম ও দ্বিতীয় কোষাধ্যক্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় সচিব, সভাপতি এবং তাঁর সহকারী । এছাড়াও, একজন সদস্য প্রতিনিধি, একজন প্রচার প্রধান এবং বিভিন্ন উপদেষ্টা ছিলেন।

পরিহাসের বিষয় ছিল এই যে, কমিটিটি সেই নীতিটিরই মূর্ত প্রতীক ছিল, যার বিরুদ্ধে আন্দোলনটি সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করতে চেয়েছিল : সংসদীয় ব্যবস্থা। এটি এমন একটি নীতি ছিল যা ক্ষুদ্রতম স্থানীয় গোষ্ঠী থেকে শুরু করে জেলা ও আঞ্চলিক স্তর, একেবারে জাতীয় স্তর এবং স্বয়ং জাতীয় নেতৃত্ব পর্যন্ত—আন্দোলনের বিরোধিতাকৃত সবকিছুকেই ধারণ করত । এই ছিল সেই ব্যবস্থা যার অধীনে আমরা সবাই কষ্ট পেয়েছি এবং এখনও পাচ্ছি।

এই অবস্থার অবিলম্বে পরিবর্তন করা প্রয়োজন ছিল, যাতে অভ্যন্তরীণ সংগঠনের এই দুর্বল ভিত্তি আন্দোলনের নিরাপত্তাকে বিপন্ন না করে এবং এর মহান লক্ষ্য পূরণে বাধা সৃষ্টি না করে।

প্রোটোকল দ্বারা পরিচালিত এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়া কমিটির বৈঠকগুলো একটি ক্ষুদ্র সংসদের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরত। এখানেও ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ বলে কিছু ছিল না । এবং এখানেও, রাষ্ট্রের আমাদের বৃহৎ প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থাগুলোতে যে একই ধরনের অযৌক্তিকতা ও যুক্তিহীনতার ব্যাপক বিস্তার, সেগুলোই প্রবলভাবে বিরাজ করত।

এই কমিটির সামনে সচিব, কোষাধ্যক্ষ, সদস্য প্রতিনিধি, প্রচার প্রতিনিধি এবং আরও কত কী পদের প্রার্থীদের নাম পেশ করা হয়েছিল। এরপর তাঁরা সবাই মিলে প্রতিটি নির্দিষ্ট বিষয়ে কাজ করে ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সেই অনুযায়ী, প্রচার প্রধান আর্থিক বিষয়ে ভোট দিয়েছিলেন , লোকটি...

Machine Translated by Google

অর্থ কর্মকর্তা শুধুমাত্র সংস্থা- সম্পর্কিত একটি বিষয়ে ভোট দিয়েছেন, সংগঠক সচিবালয়- সম্পর্কিত একটি বিষয়ে ভোট দিয়েছেন , ইত্যাদি।

যদি কোষাধ্যক্ষ, কমিশনার এবং এই জাতীয় ব্যক্তিরাই তাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রায় দেন , তাহলে বিশেষ লোক নির্বাচন করার প্রয়োজন কী ? একজন সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের কাছে এই ধরনের ব্যবস্থা দুর্বোধ্য হবে ; ঠিক যেমনটা হতো যদি একটি বড় কারখানায় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ উৎপাদনের কারিগরি খুঁটিনাটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিত, এবং এর বিপরীতক্রমে, যদি প্রকৌশলীরা প্রশাসনিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতেন ।

আমি এই উন্মাদনাকে সমর্থন করতে অস্বীকার করেছিলাম এবং অল্প সময়ের মধ্যেই কমিটির বৈঠকে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলাম । আমি আমার প্রচার বিভাগ ছাড়া আর কোনো কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম না এবং অন্য কাউকে আমার ব্যাপারে নাক গলাতে দিতাম না । এর বিপরীতে, আমিও অন্যদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতাম না ।

যখন নতুন আইনটি গৃহীত হলো এবং আমাকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হলো, তখন এই সমস্ত অযৌক্তিক বিষয় দ্রুত প্রত্যাখ্যান করার প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও যথাযথ অধিকার আমার হাতে ছিল ।
কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিবর্তে আমি নিরঙ্কুশ দায়িত্বের নীতি প্রবর্তন করেছি।

আন্দোলনের সকল কর্তৃত্ব সভাপতির দায়িত্বে থাকে। তিনি তাঁর অধীনস্থ কমিটির সদস্যদের মধ্যে কাজ বন্টন করেন এবং নির্দিষ্ট কাজের জন্য অন্যান্য ইউনিট নির্বাচন করেন। এই ভদ্রলোকদের প্রত্যেককে তাঁর উপর অর্পিত কাজের জন্য এককভাবে দায়িত্ব বহন করতে হয়। তিনি শুধুমাত্র সভাপতির কাছেই জবাবদিহি করেন, যাঁর কাজ হলো সাধারণ সহযোগিতা তদারকি করা, কর্মী নির্বাচন করা এবং যৌথ কাজ সমন্বয়ের জন্য সাধারণ নির্দেশনা প্রদান করা।

পরম দায়িত্বের এই নীতিটি আন্দোলন জুড়ে ধীরে ধীরে গৃহীত হচ্ছে । ছোট স্থানীয় গোষ্ঠীগুলিতে, এবং সম্ভবত জেলা ও আঞ্চলিক গোষ্ঠীগুলিতেও , এই ধরনের নীতি সম্পূর্ণরূপে কার্যকর করতে যথেষ্ট সময় লাগবে , কারণ

ভীরু ও দ্বিধাগ্রস্ত চরিত্রের মানুষরা স্বাভাবিকভাবেই এর বিরোধিতা করে। তাদের কাছে কোনো কিছুর চূড়ান্ত দায়িত্ব নেওয়ার ধারণাটি অপ্রীতিকর সম্ভাবনার জন্ম দেয়। তারা তথাকথিত কমিটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পছন্দ করে এবং এভাবে নেওয়া সিদ্ধান্তের আড়ালে নিজেদের কার্যকলাপ গোপন রাখে। কিন্তু আমি এই দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে একটি দৃঢ় অবস্থান নেওয়াকে অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করেছি এবং দায়িত্বের এই ভয়ের কাছে কোনো ছাড় দিইনি; যদিও কর্তব্য ও নেতৃত্বের এই ধারণাটি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করতে কিছুটা সময় লাগতে পারে , যার ফলস্বরূপ অবশেষে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন নেতারা গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হবেন ।

যাইহোক , যে আন্দোলনকে সংসদীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর অযৌক্তিকতার বিরুদ্ধে লড়তে হবে, তাকে অবশ্যই এই ধরনের বিষয়গুলোর প্রতিরোধ করতে হবে। কেবল তখনই তার প্রয়োজনীয় শক্তি জন্মাবে।
লড়াইয়ের জন্য।

এমন এক সময়ে যখন অন্য সবখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের আধিপত্য , তখন একক নেতার নীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা একটি আন্দোলন, যেখানে নেতা আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম পরিচালনার ব্যক্তিগত দায়িত্ব বহন করবেন , একদিন অবশ্যই বিদ্যমান পরিস্থিতিকে উৎখাত করে বর্তমান শাসনের ওপর বিজয় লাভ করবে । এটি একটি গাণিতিক নিশ্চিত বিষয়।

এই ধারণাটি আমাদের আন্দোলনের একটি অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা তৈরি করেছিল। এই পুনর্গঠনের যৌক্তিক পরিণতিস্বরূপ অর্থনৈতিক বিভাগের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য তৈরি হয়।
আন্দোলন এবং সামগ্রিক রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা। ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধের নীতি দলীয় প্রশাসনের সকল শাখায় প্রসারিত করা হয়েছিল এবং তা নবায়ন এনেছিল, সেগুলোকে রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত করে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক নীতির ভিত্তিতে কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছিল।

১৯১৯ সালের শরৎকালে, যখন দলটি গঠিত হয়েছিল, তখন এর সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ছয়জন ।
পার্টির কোনো সদর দপ্তর, কর্মকর্তা, ফর্ম, স্ট্যাম্প বা কোনো ধরনের ছাপা সামগ্রী ছিল না। কমিটি প্রথমে হেরেনগাসে-র একটি রেস্তোরাঁয় এবং পরে গ্যাস্টেইগ-এর একটি ক্যাফেতে তাদের সভা করত। এই অবস্থা বেশিদিন চলতে পারত না। তাই আমি ব্যবস্থা নিলাম । পার্টির ব্যবহারের জন্য কোনো একটিতে ঘর ভাড়া করার আশায় আমি মিউনিখের বিভিন্ন রেস্তোরাঁ ও হোটেলে গেলাম । পুরনো স্টারনেকারব্রাউ ইম টাল-এ একটি ছোট

Machine Translated by Google

খিলানযুক্ত ছাদওয়ালা একটি ঘর, যা একসময় এক ধরনের আনুষ্ঠানিক সরাইখানা হিসেবে ব্যবহৃত হতো , যেখানে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের বাভারিয়ান পরিষদের সদস্যরা সমবেত হতেন। ঘরটি ছিল অন্ধকার ও বিষণ্ন, এবং সেই অনুযায়ী এর পূর্ববর্তী ব্যবহারের জন্য বেশ উপযুক্ত ছিল, কিন্তু এখন যে নতুন উদ্দেশ্যে এটি ব্যবহৃত হবে, তার জন্য ততটা উপযুক্ত ছিল না। জানালাগুলোর একটির দিকে মুখ করা ছোট রাস্তাটি এতটাই সরু ছিল যে, গ্রীষ্মের সবচেয়ে উজ্জ্বল দিনগুলোতেও ঘরটি অন্ধকার ও বিষণ্নই থাকত। এখানেই আমরা আমাদের প্রথম স্থায়ী বাসস্থান গড়ে তুলি । ভাড়া ছিল মাসে পঞ্চাশ মার্ক, যা সেই সময়ে আমাদের জন্য এক বিশাল অঙ্ক। কিন্তু আমাদের দাবিগুলো খুব পরিমিত হতে হয়েছিল । আমরা সাহস করিনি...

আমরা দায়িত্ব নেওয়ার কয়েকদিন পরেই যখন তারা কাঠের প্যানেলিংগুলো সরিয়ে ফেলল, তখনও আমরা অভিযোগ করেছিলাম । এই প্যানেলিংগুলো বিশেষভাবে রাজকীয় পরিষদ সদস্যদের জন্য লাগানো হয়েছিল। ঘরটা অফিসের চেয়ে গুহার মতো বেশি লাগতে শুরু করেছিল ।

তবুও, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ছিল। ধীরে ধীরে আমরা বৈদ্যুতিক বাতি লাগালাম, তারপর একটি টেলিফোন। একটি টেবিল ও কয়েকটি ধার করা চেয়ার আনা হলো, সাথে একটি খোলা ফাইলিং ক্যাবিনেট, এবং তারপর একটি আলমারি। মালিকের দুটি সাইডবোর্ড আমাদের প্রচারপত্র, পোস্টার ইত্যাদি রাখার জন্য ব্যবহার করা হতো ।

সময় গড়ানোর সাথে সাথে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক কমিটি সভা করে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ল। একজন বেতনভুক্ত কর্মকর্তা না থাকলে যান চলাচলের দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজ নিয়মিতভাবে চালানো যেত না।

কিন্তু সেই সময়ে আমাদের জন্য ব্যাপারটা খুব কঠিন ছিল। আন্দোলনে তখনও সদস্য সংখ্যা এত কম ছিল যে, এই কাজের জন্য এমন একজন উপযুক্ত ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া কঠিন ছিল , যার দাবি-দাওয়া কম থাকবে এবং যিনি আন্দোলনের পক্ষ থেকে তাঁর সময় ও শক্তির উপর আসা বিভিন্ন চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবেন ।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর আমরা একজন সৈনিককে খুঁজে পেলাম যিনি আমাদের প্রথম প্রশাসক হতে রাজি হলেন । তাঁর নাম ছিল শুসলার, আমার এক পুরনো যুদ্ধসঙ্গী। প্রথমদিকে তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যা ছয়টা থেকে আটটার মধ্যে আমাদের অফিসে কাজ করতেন ।
পরে, তিনি বিকেল পাঁচটা থেকে আটটা পর্যন্ত এবং তারপর পুরো বিকেল কাজ করতেন। অবশেষে, এটি একটি পূর্ণকালীন চাকরিতে পরিণত হলো এবং তিনি সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত অফিসে কাজ করতেন। তিনি ছিলেন একজন পরিশ্রমী, সৎ এবং অত্যন্ত নিষ্ঠাবান মানুষ, যিনি আন্দোলনের প্রতি অনুগত ও নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। তিনি তাঁর নিজের ছোট অ্যাডলার টাইপরাইটারটি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। এটিই ছিল দলের ব্যবহৃত প্রথম টাইপরাইটার । পরে, দলটি কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করে এটি কিনে নেয়। আমাদের নথি এবং সদস্য তালিকা চুরির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য একটি ছোট সিন্দুকের প্রয়োজন ছিল —আমাদের তহবিল রক্ষা করার কোনো প্রয়োজন ছিল না , কারণ সেই সময়ে আমাদের কোনো তহবিলই ছিল না। বরং , আমাদের আর্থিক অবস্থা এতটাই শোচনীয় ছিল যে আমাকে প্রায়শই নিজের সঞ্চয় থেকে টাকা খরচ করতে হতো ।

আঠারো মাস পর আমাদের অফিসটা খুব ছোট হয়ে গেল, তাই আমরা চলে গেলাম।
কর্নেলিয়াস স্ট্রাস-এ একটি নতুন জায়গায়। আমাদের অফিসটি আবারও রেস্তোরাঁটিতেই ছিল, কিন্তু একটি ঘরের পরিবর্তে এখন আমাদের তিনটি ছোট ঘর এবং বড় জানালাসহ একটি বড় ঘর ছিল।
সেই সময়ে তাঁদেরকে আমাদের কাছে চমৎকার মনে হয়েছিল। আমরা ১৯২৩ সালের নভেম্বর মাসের শেষ পর্যন্ত সেখানে ছিলাম।

১৯২০ সালের ডিসেম্বরে আমরা 'ভল্কিশার বেওবাখটার' পত্রিকাটি কিনেছিলাম। এই সংবাদপত্রটি, যা তার নামের প্রতি সুবিচার করে জনগণের দাবির পক্ষে কথা বলত , সেটিই পরবর্তীতে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক জার্মান শ্রমিক দলের মুখপত্র হয়ে ওঠে । প্রথমদিকে এটি সপ্তাহে দু'বার প্রকাশিত হতো; কিন্তু ১৯২৩ সালের শুরুর দিকে এটি দৈনিকে পরিণত হয় এবং সেই বছরের আগস্ট মাসের শেষে এটি বর্তমানে সুপরিচিত বড় আকারে প্রকাশিত হতে শুরু করে।

সাংবাদিকতায় সম্পূর্ণ নতুন হিসেবে আমি অনেক কিছু শিখেছি যা আমাকে অবশ্যই শিখতে হবে
আমাকে এর জন্য চরম মূল্য দিতে হয়েছিল।

ইহুদিদের হাতে থাকা বিপুল সংখ্যক সংবাদপত্রের বিপরীতে , সেই সময়ে কেবল একটিই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্র ছিল , যা দেশের বিষয়াদির পক্ষে কথা বলত। এটি একটি অত্যন্ত গুরুতর বিষয় ছিল। বাস্তবে যেমনটা প্রায়শই দেখা গেছে , এই অবস্থার কারণ হিসেবে তথাকথিত জনপ্রিয় পত্রিকাগুলোর ব্যবস্থাপনার অদক্ষতাকেই দায়ী করতে হয়। তারা এই নীতিকে খুব শক্তভাবে আঁকড়ে ধরেছিল যে, কাজের চেয়ে মতামতের প্রাধান্য থাকা উচিত , এবং কাজ থেকেই ফলাফল আসে। এটি একটি সম্পূর্ণ ভুল দৃষ্টিভঙ্গি, কারণ মতামত আদতে একটি অভ্যন্তরীণ বিষয়।

Machine Translated by Google

এবং উৎপাদনশীল কাজের মাধ্যমেই এর সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটে। যে ব্যক্তি তাঁর জাতির জন্য মূল্যবান কাজ করেন, তিনি এইভাবেই তাঁর মহৎ অনুভূতি প্রকাশ করেন, অপরপক্ষে অন্য একজন, যিনি কেবল নিজের মতামত প্রকাশ করেন এবং প্রকৃত মূল্যবান কিছুই করেন না।
অথবা জাতির জন্য উপকারী হলেও, সে এমন একজন ব্যক্তি যে সকল সৎ চিন্তাকে বিকৃত করে। এবং তার এই ধরনের মনোভাব সমাজের জন্যও ক্ষতিকর।

ভলকিশার বেওবাখটার ছিল একটি তথাকথিত "জনপ্রিয়" সংবাদপত্র, যেমনটা এর নাম থেকেই বোঝা যেত। এর বিভিন্ন ভালো গুণ থাকলেও, সব "জনপ্রিয়" প্রতিষ্ঠানের সহজাত ত্রুটি ও দুর্বলতা ছিল তার চেয়েও বেশি । যদিও এর বিষয়বস্তু ছিল চমৎকার, কিন্তু একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর ব্যবস্থাপনা ছিল একেবারেই হতাশাজনক। এমন ধারণা প্রচলিত ছিল যে একটি "জনপ্রিয়" সংবাদপত্রকে অনুদানের মাধ্যমে চলতে হয় , কিন্তু এটা উপলব্ধি করা হয়নি যে একে অন্যদের সাথে প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে পথ করে নিতে হবে এবং ভালো দেশপ্রেমিকদের কাছ থেকে চাঁদা আশা করাটাও অনুচিত ।

কর্পোরেট অব্যবস্থাপনা ঢাকার জন্য সংবাদপত্র ।

আমি অবিলম্বে এই পরিস্থিতি পরিবর্তনের পদক্ষেপ নিলাম, কারণ আমি ভেতরে লুকিয়ে থাকা বিপদ দেখতে পাচ্ছিলাম । ভাগ্য আমার সহায় ছিল, কারণ এটি আমাকে এমন একজন মানুষের সন্ধান দিয়েছিল যিনি পরবর্তীকালে শুধু সংবাদপত্রের আর্থিক পরিচালক হিসেবেই নয়, দলের আর্থিক পরিচালক হিসেবেও এই আন্দোলনে অগণিত সেবা প্রদান করেছেন। ১৯১৪ সালে, যুদ্ধের সময়, আমার ম্যাক্স আমানের সাথে দেখা হয়, যিনি তখন আমার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন এবং এখন দলের সাধারণ আর্থিক পরিচালক। যুদ্ধের চার বছর ধরে, আমি আমার ভবিষ্যৎ সহকর্মীর অসাধারণ ক্ষমতা, অধ্যবসায় এবং তীক্ষ্ণ মন প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়েছিলাম।

১৯২১ সালের বসন্তে , একদিন হঠাৎ দেখা হওয়া আমার এক পুরোনো রেজিমেন্টাল কমরেডের কাছে আমি আন্দোলনের আর্থিক পরিচালক হওয়ার জন্য অনুরোধ করি। সেই সময় আন্দোলনটি এক গুরুতর সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল, এবং আমাদের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তার ওপর আমার অসন্তুষ্ট হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল , যাদের মধ্যে একজনের সাথে আমার অত্যন্ত তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল।
আমান তখন একটি ভালো চাকরিতে ছিলেন এবং তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ছিল ।

অনেক দ্বিধার পর তিনি আমার অনুরোধে রাজি হলেন, তবে এই শর্তে যে তিনি অযোগ্য কমিটির দয়ার পাত্র হবেন না। তাঁকে অবশ্যই একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে জবাবদিহি করতে হবে, এবং তিনি কেবল একজনই।

এই প্রথম দলীয় আর্থিক পরিচালকের অমূল্য সেবার বদৌলতে , যাঁর বাণিজ্যিক জ্ঞান ছিল ব্যাপক ও গভীর, তিনি দলের বিভিন্ন দপ্তরে শৃঙ্খলা ও সততা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তখন থেকে এই দপ্তরগুলো আন্দোলনের অন্য কোনো শাখার চেয়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অতুলনীয় হয়ে অনুকরণীয় হয়ে রয়েছে। কিন্তু, জীবনে যেমন প্রায়শই ঘটে , মহান যোগ্যতা ঈর্ষা ও বিদ্বেষের জন্ম দেয় । এই ক্ষেত্রেও তেমনটাই প্রত্যাশিত ছিল ।

১৯২২ সাল থেকে শুধু আন্দোলনের বাণিজ্যিক কাঠামোতেই নয়, এর সংগঠনের ক্ষেত্রেও কঠোর নিয়মকানুন চালু করা হয়েছিল । একটি কেন্দ্রীয় নথি-সংরক্ষণ ব্যবস্থা স্থাপন করা হয় , যেখানে সকল সদস্যের নাম ও বিস্তারিত তথ্য লিপিবদ্ধ থাকত। দলের অর্থব্যবস্থা বিচক্ষণতার সাথে সংগঠিত করা হয়েছিল । চলতি খরচ চলতি আয় থেকেই মেটাতে হতো , আর বিশেষ আয় কেবল বিশেষ খরচের জন্যই ব্যবহার করা যেত । এইভাবে , নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও , কয়েকটি ছোট চলতি হিসাব ছাড়া আন্দোলনটি কার্যত ঋণমুক্ত ছিল। বস্তুত, তহবিলের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছিল ।

ব্যক্তিগত কোম্পানির মতোই বিষয়াদি পরিচালিত হতো। নিযুক্ত কর্মীরা বাস্তব দক্ষতার মাধ্যমে নিজেদের পদ বজায় রাখতেন এবং দলের প্রতি তাদের ঘোষিত আনুগত্যের আড়ালে কোনোভাবেই নিজেদের লুকাতে পারতেন না। একজন ভালো জাতীয় সমাজতন্ত্রী জাতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিটি পরিস্থিতিতে তাকে অর্পিত সমস্ত দায়িত্ব যে সদিচ্ছা, অধ্যবসায় এবং দক্ষতার সাথে পালন করেন , তার মাধ্যমেই নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেন। যে ব্যক্তি তার কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়, সে আনুগত্যের বড়াই করতে পারে না , যার বিরুদ্ধে সে প্রকৃত অর্থেই পাপ করে।

যেকোনো বিদেশি প্রভাবের কঠোর বিরোধিতা করে দলের নতুন আর্থিক পরিচালক এই দৃঢ় মত পোষণ করেন যে , দলের প্রশাসনে সেইসব সমর্থক ও আন্দোলন সদস্যদের জন্য কোনো আরামদায়ক পদ নেই , যারা নিজেদের কাজ উপভোগ করেন না। যে আন্দোলন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দ্বারা আমাদের সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রবর্তিত দুর্নীতির বিরুদ্ধে এত জোরালোভাবে লড়াই করে, সেই আন্দোলনকে অবশ্যই তার নিজের প্রশাসনের এই দুর্বলতা থেকে মুক্ত থাকতে হবে।

Machine Translated by Google

দেখা গেল যে, সংবাদপত্রের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত কিছু লোক পূর্বে বাভারিয়ান পিপলস পার্টির সমর্থক ছিলেন, কিন্তু তাদের কাজ প্রমাণ করে দিয়েছিল যে তারা এই কাজের জন্য পুরোপুরি উপযুক্ত। এই পরীক্ষার সামগ্রিক ফলাফল ছিল চমৎকার। ব্যক্তিগত কার্যকারিতার এই আন্তরিক ও সৎ স্বীকৃতির ফলে , আন্দোলনটি তার কর্মীদের মন আগের চেয়ে দ্রুত এবং আরও ভালোভাবে জয় করে নিয়েছিল । তারা ভালো জাতীয় সমাজতন্ত্রী হয়ে উঠেছিল এবং থেকে গিয়েছিল। শুধু কথায় নয়, নতুন আন্দোলনের সেবায় তাদের করা দৃঢ়, সৎ এবং বিবেকবান কাজের মাধ্যমেও তারা এটি প্রমাণ করেছিল। স্বাভাবিকভাবেই, সমান যোগ্যতাসম্পন্ন কিন্তু দলের সদস্য নয় এমন অন্য কারো চেয়ে একজন সু-যোগ্য দলীয় সদস্যকে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হতো । আমাদের নতুন আর্থিক পরিচালক সমস্ত মতবিরোধ সত্ত্বেও যে কঠোর সংকল্পের সাথে এই নীতিগুলি প্রয়োগ করেছিলেন এবং ধীরে ধীরে সেগুলিকে বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন, তা আন্দোলনের জন্য অত্যন্ত সুবিধাজনক প্রমাণিত হয়েছিল । মুদ্রাস্ফীতির সেই কঠিন সময়ে, যখন হাজার হাজার কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল এবং হাজার হাজার সংবাদপত্রকে প্রকাশনা বন্ধ করতে হয়েছিল, তখন আমরা কেবল আন্দোলনের বাণিজ্য বিভাগকে চালু রাখতে এবং সমস্ত দায় মেটাতে সক্ষম হয়েছিলাম তাই নয়, বরং তা বজায়ও রাখতে পেরেছিলাম—তারই অবদান ।

ভলকিশার বেওবাখটার অবিচলিতভাবে উন্নতি করছিল । এই সময়ে, আমরা বৃহত্তম সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে নিজেদের স্থান করে নিয়েছিলাম।

১৯২১ সালটি আমার জন্য এই কারণেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, আন্দোলনের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমে আমি ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে দলীয় প্রশাসনের খুঁটিনাটি কার্যকলাপের বিষয়ে কমিটির কিছু সদস্যের সমালোচনা ও হস্তক্ষেপের অবসান ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলাম। এটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ এমন সব বোকাদের হস্তক্ষেপ ক্রমাগত চলতে দিলে যেকোনো পদের জন্য একজন যোগ্য ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া অসম্ভব ছিল, যারা সবকিছু ভালো জানে বলে ভান করত , অথচ বাস্তবে তারা কেবল বিশৃঙ্খলাই রেখে যেত। তারপর এই চালাক লোকগুলো সরে গেল , তাদের বেশিরভাগই বেশ বিনয়ের সাথে, অন্য কোনো কর্মক্ষেত্রের সন্ধানে যেখানে তারা কোনো কিছুর তত্ত্বাবধান করতে এবং কাজগুলো কীভাবে করা উচিত তা বলে দিতে পারবে । কারও কারও মধ্যে যেন এক ধরনের উন্মাদনা ছিল ।

তারা সর্বত্র নাক গলাচ্ছিল এবং অনবরত চমৎকার সব পরিকল্পনা, ধারণা, প্রকল্প ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করছিল। অবশ্যই, তাদের এই মহৎ উদ্দেশ্যই ছিল এমন একটি কমিটি গঠনের ভিত্তি, যা নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে দাবি করতে পারত, যাতে তারা বিশেষজ্ঞ সেজে অন্যদের কাজে নাক গলাতে পারে। অযোগ্য লোকেরা যখন প্রতিভাবানদের কাজে ক্রমাগত হস্তক্ষেপ করত, তখন তা জাতীয় সমাজতন্ত্রের চেতনার পরিপন্থী ছিল । কিন্তু এই কমিটি নির্মাতারা বিষয়টি বিবেচনায় আনেননি।

এই বছরগুলোতে আমি এটাকে আমার কর্তব্য বলে মনে করতাম যে, দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত সকলকে এই ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করা , কেউ যেন তাদের কাজের উপর নজরদারি করতে না পারে তা নিশ্চিত করা এবং তাদের দৈনন্দিন কাজে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া ।

যেসব কমিটি কিছুই করত না বা অসম্ভব সিদ্ধান্ত নিত, তাদের নিষ্ক্রিয় করার সেরা উপায় ছিল তাদের কিছু সত্যিকারের কাজ দেওয়া । সদস্যদের নিঃশব্দে আড়ালে চলে যেতে এবং দ্রুতই অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখাটা বেশ মজার ছিল । আমার একই ধরনের একটি বড় প্রতিষ্ঠান, রাইখস্ট্যাগের কথা মনে পড়তে লাগল।

কথা বলার পরিবর্তে যদি তাদের কোনো আসল কাজ করতে হতো , তাহলে তারা কত দ্রুত উধাও হয়ে যেত , বিশেষ করে যদি তাদের প্রত্যেককে তার উপর অর্পিত কাজের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করা হতো ।

আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনে এবং আন্দোলনে, উভয় ক্ষেত্রেই সর্বদা এই বিষয়ে জোর দিয়েছি যে, আন্দোলনের সকল বিভাগে নেতৃত্ব বা প্রশাসনিক পদের জন্য সেরা, সবচেয়ে সৎ এবং সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তিদের খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত আমরা যেন ক্রমাগত অনুসন্ধান চালিয়ে যাই । যখন এই ব্যক্তিদের পদে অধিষ্ঠিত করা হয়, তখন তাঁদেরকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়।

অধস্তনদের প্রতি আচরণ এবং ঊর্ধ্বতনদের প্রতি পূর্ণ দায়িত্ব । অর্পিত কাজে দক্ষ না হলে কেউ এমন পদে অধিষ্ঠিত হতে পারত না । দুই বছর ধরে আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গিগুলোকে ক্রমশ আরও বেশি করে বাস্তবে প্রয়োগ করেছি; যার ফলে আজ, অন্তত আন্দোলনের উচ্চ নেতৃত্বের ক্ষেত্রে , সেগুলো স্বাভাবিক হিসেবেই গৃহীত হয়েছে।

এই মতাদর্শের আপাত সাফল্য ১৯২৩ সালের ৯ই নভেম্বর প্রদর্শিত হয়েছিল। চার বছর আগে, যখন আমি আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলাম, তখন এর কোনো আনুষ্ঠানিক অনুমোদনও ছিল না। ১৯২৩ সালের ৯ই নভেম্বর দলটি বিলুপ্ত করা হয় এবং এর সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। সমস্ত মূল্যবান সামগ্রীর মোট মূল্য ১ লক্ষ ৭০ হাজার স্বর্ণমুদ্রারও বেশি ছিল।

Machine Translated by Google

অধ্যায় ১২

ট্রেড ইউনিয়নের সমস্যা

আন্দোলনের দ্রুত প্রসারের ফলে , ১৯২২ সালে আমরা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলাম ।
এমন একটি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট অবস্থান যা সেই সময়ে পুরোপুরি সমাধান হয়নি।

ব্যাপক জনগণের হৃদয়ে আন্দোলনকে পৌঁছে দেওয়ার দ্রুততম ও সহজতম উপায় আবিষ্কারের আমাদের প্রচেষ্টাগুলো সর্বদাই এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে যে, শ্রমিক কখনোই সম্পূর্ণরূপে আমাদের হবে না, অথচ নিছক পেশাগত ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তার স্বার্থ দেখাশোনা করত এমন এক রাজনৈতিক সংগঠন, যার নেতৃত্বে ছিলেন এমন সব ব্যক্তি যাদের নীতি আমাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল।

এটি বেশ গুরুতর একটি সমস্যা ছিল। সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হতো যে, কোনো পেশায় নিযুক্ত একজন শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য না হলে তার কোনো অস্তিত্বই থাকতে পারে না । এতে শুধু যে তার পেশাগত স্বার্থই সুরক্ষিত থাকত তাই নয়, ইউনিয়নের সদস্যপদ ছাড়া স্থায়ী চাকরির নিশ্চয়তাও ছিল অকল্পনীয় । বেশিরভাগ শ্রমিকই ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য ছিলেন । সাধারণভাবে বলতে গেলে, ইউনিয়নগুলো কার্যকরভাবে লড়াই করত।

একটি নির্দিষ্ট মজুরি কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল এবং শ্রমিকদের স্থিতিশীল আয়ের নিশ্চয়তা দিয়ে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। নিঃসন্দেহে, বিভিন্ন পেশার শ্রমিকরা এই অভিযানের ফলাফল থেকে উপকৃত হয়েছিলেন, এবং এটি অবশ্যই একটি বিবেকের দ্বন্দ্ব ছিল , বিশেষ করে সৎ মানুষদের জন্য , যখন তাঁরা এই ট্রেড ইউনিয়ন সংগ্রামের দ্বারা নিশ্চিত মজুরি লাভ করার পাশাপাশি নিজেরাই সেই সংগ্রাম থেকে সরে এসেছিলেন।

গড়পড়তা বুর্জোয়া মালিকদের সাথে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা কঠিন ছিল । তিনি সমস্যাটির বস্তুগত বা নৈতিক কোনো দিকই বুঝতেন না (কিংবা বুঝতে চাইতেন না) । পরিশেষে , তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন যে , তাঁর উপর নির্ভরশীল শ্রমিকদের একত্রিত করে এমন যেকোনো সংগঠনের সঙ্গে তাঁর নিজের অর্থনৈতিক স্বার্থ মৌলিকভাবেই সাংঘর্ষিক । তাই, এই বুর্জোয়া মালিকদের দিয়ে পরিস্থিতিটির একটি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করানো প্রায় অসম্ভব ছিল । এখানে, অন্যান্য বহু ক্ষেত্রের মতোই, এমন নিরপেক্ষ বহিরাগতদের শরণাপন্ন হওয়া প্রয়োজন ছিল , যাঁরা খুঁটিনাটি বিষয়ের উপর মনোযোগ দেওয়ার প্রলোভনে পড়ে সামগ্রিক চিত্রটি দেখতে ব্যর্থ হবেন না। তাঁদের পক্ষ থেকে সামান্য সদিচ্ছা থাকলে, এমন একটি পরিস্থিতি বোঝা অনেক সহজ হয়ে যেত, যা আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অস্তিত্বের জন্য বিপুল তাৎপর্যপূর্ণ।

এই বইয়ের প্রথম খণ্ডে আমি ট্রেড ইউনিয়নের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমার মতামত ইতিমধ্যেই প্রকাশ করেছি। সেখানে আমি এই মত প্রকাশ করেছি যে, যদি না রাষ্ট্র কোনো পদক্ষেপ নেয় (যা সাধারণত এই ধরনের ক্ষেত্রে নিষ্ফল) অথবা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এমন কোনো নতুন ধারণা প্রবর্তন করে যা শ্রমিকের প্রতি নিয়োগকর্তার মনোভাব পরিবর্তন করবে, তাহলে শ্রমিকের কাছে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী হিসেবে তার সমান অধিকারের দোহাই দিয়ে নিজের স্বার্থ রক্ষা করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। আমি আরও যুক্তি দিয়েছিলাম যে, সামাজিক অবিচারগুলো সংশোধন করা জাতীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থেই হবে, যা অন্যথায় সমগ্র সামাজিক কাঠামোর গুরুতর ক্ষতি করবে । অধিকন্তু, আমি বলেছিলাম যে, যতক্ষণ পর্যন্ত নিয়োগকর্তাদের মধ্যে এমন লোক থাকবে যাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা বা এমনকি সবচেয়ে মৌলিক মানবাধিকার সম্পর্কেও কোনো ধারণা নেই , ততক্ষণ শ্রমিক এই প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করাকে সর্বদা প্রয়োজনীয় বলে মনে করবে। আমি এই বলে উপসংহার টেনেছিলাম যে, যদি এই ধরনের আত্মরক্ষা প্রয়োজনীয় হয়, তবে তা ট্রেড ইউনিয়নের ভিত্তিতে শ্রমিকদের নিজেদের দ্বারা গঠিত একটি সমিতির আকারে থাকা উচিত।

এটাই ছিল আমার মূল ধারণা, এবং ১৯২২ সালেও তা একই ছিল। কিন্তু তখনও একটি স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট সূত্র খুঁজে বের করা প্রয়োজন ছিল। শুধু সমস্যাটি বুঝেই আমরা সন্তুষ্ট থাকতে পারতাম না। এমন কিছু নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া প্রয়োজন ছিল যা...
বাস্তবে প্রয়োগ করা হয়েছে। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে হয়েছিল :

Machine Translated by Google

(1) ট্রেড ইউনিয়ন কি প্রয়োজনীয়?

(2) জাতীয় সমাজতান্ত্রিক জার্মান শ্রমিক দল কি ট্রেড ইউনিয়নের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে , নাকি এর সদস্যরা কোনো না কোনোভাবে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করবে ?

(3) জাতীয় সমাজতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়নের রূপ কী হওয়া উচিত ? আমাদের সামনে কী কী কাজ রয়েছে এবং আমাদের কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য চেষ্টা করতে হবে ?

(4) এই কাজ ও উদ্দেশ্যগুলোর জন্য আমরা কীভাবে ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করতে পারি?

আমার মনে হয়, আমি প্রথম প্রশ্নটির যথেষ্ট উত্তর দিয়েছি। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি নিশ্চিত যে, ট্রেড ইউনিয়ন ছাড়া সম্ভবত আমাদের চলবে না। বরং , এগুলো দেশের অর্থনৈতিক জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান । এগুলো শুধু সামাজিক নীতির ক্ষেত্রেই নয়, বরং জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ , এবং সম্ভবত তার চেয়েও বেশি। যদি দেশের সাধারণ মানুষ দেখে যে তাদের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ হচ্ছে ,

এইরূপ একটি শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের দ্বারা সন্তুষ্ট হলে , অস্তিত্বের সংগ্রামে সমগ্র জাতির সহনশীলতা এর দ্বারা বিরাটভাবে সুদৃঢ় হবে।

প্রথমত, বিভিন্ন পেশাজীবী গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকারী কক্ষ নিয়ে গঠিত একটি ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক সংসদ নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে ট্রেড ইউনিয়নগুলো অপরিহার্য ।

দ্বিতীয় প্রশ্নটিরও উত্তর দেওয়া সহজ। যদি ট্রেড ইউনিয়ন অপরিহার্য হয় , তবে এটা স্পষ্ট যে জাতীয় সমাজতন্ত্রেরও এই বিষয়ে শুধু তাত্ত্বিকভাবেই নয়, কার্যতও একটি দৃঢ় অবস্থান নেওয়া উচিত । কিন্তু কীভাবে? এটা পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা আরও কঠিন।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন, যার লক্ষ্য একটি জাতি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা, তাকে অবশ্যই এই নীতির প্রতি সর্বদা বিশ্বস্ত থাকতে হবে যে, সেই রাষ্ট্রের প্রতিটি ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠানের শিকড় অবশ্যই এই আন্দোলন থেকেই প্রোথিত হতে হবে । এটা বিশ্বাস করা এক গুরুতর ভুল যে, সর্বোচ্চ রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করে আমরা একটি সম্পূর্ণ পুনর্গঠন ঘটাতে পারি , হঠাৎ করে একেবারে শূন্য থেকে শুরু করে, অথচ আমাদের কাছে এমন কোনো লোকবল নেই যারা আগে থেকেই , বিশেষ করে আন্দোলনের চেতনায়, প্রশিক্ষিত। এখানেও এই নীতিটি সত্য যে, চেতনা তার বাহ্যিক রূপের চেয়ে সর্বদা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ; কারণ এই রূপ যান্ত্রিকভাবে এবং দ্রুত তৈরি করা যায় । উদাহরণস্বরূপ, নেতৃত্বের নীতি একটি সংগঠিত রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের উপর একনায়কসুলভভাবে চাপিয়ে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এই নীতিটি একটি জীবন্ত বাস্তবতায় পরিণত হতে পারে শুধুমাত্র তার বিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় পর্যায়গুলো অতিক্রম করার মাধ্যমেই। এই পর্যায়গুলো ক্ষুদ্রতম কোষ থেকে রাষ্ট্রের জীবন্ত সত্তা পর্যন্ত নিয়ে যায়। নেতৃত্বের নীতির ধারক ও প্রতিনিধি হিসেবে এমন একদল লোক থাকা আবশ্যক, যারা বহু বছরব্যাপী বাছাই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গিয়েছে, জীবনের কঠোর বাস্তবতায় পোক্ত হয়েছে এবং এইভাবে এই নীতিকে বাস্তবে প্রয়োগ করার জন্য প্রস্তুত।

এটা ভাবা অযৌক্তিক যে, কোনো রাজ্যের খসড়া সংবিধান হঠাৎ করে একটি ফোল্ডার থেকে বের করে এনে উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া কোনো আদেশের মাধ্যমে 'প্রবর্তন' করা যেতে পারে। চেষ্টা করা যেতে পারে , কিন্তু তার ফল সবসময়ই এমন কিছু হবে যার টিকে থাকার মতো যথেষ্ট প্রাণশক্তি থাকবে না । এটি হবে একটি মৃতপ্রসব হওয়া শিশুর মতো। এই ধারণাটি ভাইমার সংবিধানের উৎপত্তি এবং জার্মান জাতির উপর একটি নতুন সংবিধান ও নতুন পতাকা চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টাকে স্মরণ করিয়ে দেয় , যেগুলোর কোনোটির সাথেই গত অর্ধশতাব্দীতে আমাদের জাতির ইতিহাসে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে অবশ্যই এই ধরনের সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিহার করতে হবে। একে এমন একটি সংগঠন থেকে গড়ে উঠতে হবে যার দীর্ঘদিনের অস্তিত্ব রয়েছে। এই সংগঠনের মধ্যে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক প্রাণসত্তা থাকতে হবে, যাতে এটি পরিশেষে এমন একটি জাতীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় যা হবে এক জীবন্ত বাস্তবতা।

Machine Translated by Google

যেমনটি আমি আগেই বলেছি , এই রাষ্ট্রের বীজ অবশ্যই বিভিন্ন পেশা ও বৃত্তিমূলক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকারী প্রশাসনিক কক্ষগুলোতে এবং সর্বোপরি ট্রেড ইউনিয়নগুলোর মধ্যে খুঁজে পেতে হবে । যদি এই ট্রেড ইউনিয়নগুলো এবং কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক সংসদকে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হতে হয়, তবে এই গুরুত্বপূর্ণ বীজগুলোকেই জাতীয় সমাজতান্ত্রিক জীবনদর্শনের বাহক হতে হবে । আন্দোলনের প্রতিষ্ঠানগুলোকে রাষ্ট্রের মধ্যে প্রবর্তন করতে হবে; কারণ রাষ্ট্র তার নিজের অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে হঠাৎ করে, যেন জাদুর মতো, অস্তিত্বে আনতে পারে না , যদি না সে চায় যে এই প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পূর্ণ প্রাণহীন থাকুক ।

এই বিষয়টিকে সর্বোচ্চ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে , জাতীয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ট্রেড ইউনিয়ন বিষয়ে নিজস্ব নীতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে ।

একে আরও একটি কারণেও এটি করতে হবে , আর তা হলো, জাতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার চেতনায় মালিক ও শ্রমিক উভয়েরই প্রকৃত জাতীয় সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ, আবেদন ও উপদেশের মাধ্যমে নয়, বরং দৈনন্দিন জীবনের সংগ্রামের মাধ্যমেই অর্জন করতে হয় । এই চেতনায় এবং এই চেতনার মাধ্যমেই আন্দোলনকে বিভিন্ন বৃহৎ অর্থনৈতিক গোষ্ঠীকে শিক্ষিত করতে হবে এবং তাদের আরও কাছাকাছি আনতে হবে। এই প্রাথমিক কাজ ছাড়া একটি সত্যিকারের জাতীয় সম্প্রদায় গড়ে তোলার আশা নিছকই এক অলীক কল্পনা। জীবনদর্শন দ্বারা উপস্থাপিত মহান আদর্শ , যা

সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই আন্দোলন ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে একটি সাধারণ চিন্তাধারা তৈরি করতে পারে । এবং এই চিন্তাধারা প্রমাণ করবে যে, নতুন ব্যবস্থাটি অভ্যন্তরীণভাবে মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত , এবং এটি কেবল একটি বাহ্যিক আবরণ নয়।

সুতরাং, আন্দোলনকে অবশ্যই ট্রেড ইউনিয়নের ধারণার প্রতি একটি ইতিবাচক মনোভাব গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু একে আরও এগিয়ে যেতে হবে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিপুল সংখ্যক সদস্য ও সমর্থকদের জন্য এমন এক ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, যা আসন্ন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চাহিদা পূরণ করবে ।

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকেই তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরটি পাওয়া যায় ।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়ন শ্রেণি সংগ্রামের হাতিয়ার নয়, বরং বিভিন্ন পেশার একটি প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কোনো 'শ্রেণি'কে স্বীকৃতি দেয় না। রাজনৈতিকভাবে, এটি কেবল এমন নাগরিকদের স্বীকৃতি দেয় যাদের সম্পূর্ণ সমান অধিকার ও সমান কর্তব্য রয়েছে । এছাড়াও, এটি রাষ্ট্রের এমন প্রজাদেরও স্বীকৃতি দেয় যাদের কোনো রাজনৈতিক অধিকার নেই।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক ধারণা অনুসারে , ট্রেড ইউনিয়নের কাজ কোনো জাতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু মানুষকে একত্রিত করা এবং ধীরে ধীরে তাদেরকে একটি শ্রেণীতে রূপান্তরিত করে সেই সম্প্রদায়ের মধ্যেই একইভাবে সংগঠিত অন্যান্য গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে ব্যবহার করা নয় । আমরা অবশ্যই ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে সরাসরি এই কাজটি অর্পণ করতে পারি না । এই কাজটি তাদের উপর তখনই চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যখন তারা মার্ক্সবাদীদের হাতে অস্ত্রে পরিণত হয়। ট্রেড ইউনিয়ন স্বভাবতই শ্রেণী সংগ্রামের হাতিয়ার নয়; কিন্তু মার্ক্সবাদীরা এটিকে তাদের নিজেদের শ্রেণী সংগ্রামের জন্য উপযোগী একটি উপকরণে রূপান্তরিত করেছে । তারা এমন একটি অর্থনৈতিক অস্ত্র তৈরি করেছে , যা আন্তর্জাতিক ইহুদিরা ব্যবহার করে স্বাধীন ও সার্বভৌম জাতি-রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক ভিত্তি ধ্বংস করতে , তাদের শিল্প ও বাণিজ্য নষ্ট করতে এবং এর মাধ্যমে মুক্ত দেশগুলোকে ইহুদি বিশ্ব অর্থদাতাদের সেবায় দাসত্বে আবদ্ধ করতে , যারা সকল জাতীয় সীমানা অতিক্রম করে।

এর বিপরীতে , জাতীয় সমাজতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়নকে অবশ্যই দেশের অর্থনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণকারী নির্দিষ্ট কিছু গোষ্ঠীকে সংগঠিত করতে হবে এবং এর মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নিরাপত্তা বৃদ্ধি করতে হবে ; সেই সাথে এমন সমস্ত অসঙ্গতি দূর করে একে শক্তিশালী করতে হবে, যা পরিণামে জাতির সামাজিক কাঠামোর উপর ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলে , জাতির প্রাণশক্তি ও রাষ্ট্রের সমৃদ্ধির ক্ষতি করে এবং খোদ অর্থনৈতিক জীবনেই অমঙ্গল ও ধ্বংস ডেকে আনে।

সুতরাং, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়নের হাতে ধর্মঘট জাতীয় উৎপাদনকে বাধাগ্রস্ত ও ব্যাহত করার হাতিয়ার নয় , বরং সকল বাধার বিরুদ্ধে লড়াই করে তা বৃদ্ধি করার এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার একটি মাধ্যম।

Machine Translated by Google

তাদের সমাজবিরোধী স্বভাবের কারণে, তারা প্রতিষ্ঠানের কর্মদক্ষতা হ্রাস করে এবং ফলস্বরূপ সমগ্র জাতির অস্তিত্বকে ব্যাহত করে। ব্যক্তিগত কর্মদক্ষতা অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় ব্যক্তির সামগ্রিক সামাজিক ও আইনগত অবস্থানের সাথে সর্বদা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকে। এই বিশ্বাসেরও একমাত্র উৎস হলো ব্যক্তিগত কর্মদক্ষতা যে, জাতির অর্থনৈতিক কল্যাণ অবশ্যই প্রত্যেক নাগরিককে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে হবে।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক শ্রমিককে অবশ্যই এই সত্যটি স্বীকার করতে হবে যে জাতির অর্থনৈতিক কল্যাণ দু তার নিজের পার্থিব সুখ সঙ্গে নিয়ে আসে।
সমাজতান্ত্রিক নিয়োগকর্তাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, তাঁর কর্মচারীদের সুখ ও সন্তুষ্টি তাঁর নিজের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অস্তিত্ব ও বিকাশের জন্য অপরিহার্য পূর্বশর্ত।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ও মালিকপক্ষ একত্রে সমগ্র জাতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ও দূত। তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য যে বিপুল পরিমাণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, তার কারণ হলো অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, উপর থেকে চাপ প্রয়োগের চেয়ে উদারভাবে স্বাধীনতা প্রদানের মাধ্যমে ব্যক্তিগত উৎপাদনশীলতা বেশি বৃদ্ধি পায়। অধিকন্তু, এই স্বাধীনতার মাধ্যমে আমরা একটি প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে সক্ষম করি, যেখানে সবচেয়ে যোগ্য ও পরিশ্রমী মানুষেরা সামনে চলে আসে। অতএব, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়নের জন্য ধর্মঘট এমন একটি উপায় যা ব্যবহার করা যেতে পারে, এমনকি আবশ্যক, যতক্ষণ পর্যন্ত জাতীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব না থাকে। কিন্তু একবার এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে, এটি শ্রমিক ও মালিকপক্ষ নিয়ে গঠিত দুটি বৃহৎ গোষ্ঠীর মধ্যকার সংগ্রামের অবসান ঘটাবে, কারণ এই সংগ্রাম সর্বদা জাতীয় উৎপাদন হ্রাস এবং জাতীয় সম্প্রদায়ের দুর্বলতার দিকে পরিচালিত করে। এই সংগ্রামের পরিবর্তে, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সকল পক্ষের অধিকারের যত্ন নেওয়া ও রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। চেম্বার অফ কমার্স জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনা বজায় রাখা এবং এটিকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে এমন যেকোনো সমস্যা বা ত্রুটি দূর করার জন্য দায়ী থাকবে।

লক্ষ লক্ষ মানুষকে জড়িত করে তৈরি হওয়া এই বিবাদে বর্তমানে যে বিষয়গুলো জড়িত, সেগুলোর সমাধান হবে বাণিজ্য বিষয়ক প্রতিনিধি সভা এবং কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক সংসদে। এর ফলে, মালিক ও কর্মচারীরা আর মজুরি ও কাজের সময় নিয়ে পারস্পরিক সংঘাতে জড়াবে না, যা সবসময়ই তাদের উভয়ের স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর। তারা এই বিষয়গুলো আরও উচ্চতর পর্যায়ে সমাধান করবে, যেখানে জাতীয় সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণই হবে সেই উজ্জ্বল আদর্শ যা তাদের সমস্ত আলোচনাকে আলোকিত করবে।

এখানেও, অন্য সব জায়গার মতোই, এই নীতিটি অবিচলভাবে পালন করতে হবে যে গোষ্ঠীগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে দেশের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়নের কাজ হবে এর সদস্যদের এই আদর্শকে ধারণ করার জন্য শিক্ষিত ও প্রস্তুত করা। এই কাজটি নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা যায়: আমাদের জাতি ও জাতি-রাষ্ট্রকে রক্ষা ও সুরক্ষিত করার জন্য সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে; প্রত্যেকে তার প্রকৃতি প্রদত্ত এবং জাতীয় সমাজ কর্তৃক বিকশিত ও প্রশিক্ষিত সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করবে।

আমাদের চতুর্থ প্রশ্নটি ছিল: এই কাজ ও উদ্দেশ্যগুলোর জন্য আমরা কীভাবে ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করতে পারি? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অনেক বেশি কঠিন।
সাধারণভাবে বলতে গেলে, পুরোনো কোনো এলাকার চেয়ে নতুন কোনো জায়গায় কিছু প্রতিষ্ঠা করা সহজ, যেখানে আগে থেকেই প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যে জেলায় কোনো বিশেষায়িত ব্যবসা নেই, সেখানে এই ধরনের একটি নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করা সহজ। কিন্তু যখন এই ধরনের ব্যবসা আগে থেকেই বিদ্যমান থাকে, তখন তা অনেক বেশি কঠিন হয়ে পড়ে, এবং পরিস্থিতি যখন এমন হয় যে এই ধরনের কেবল একটি ব্যবসাই চালু থাকতে পারে, তখন তা সবচেয়ে বেশি কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে, একটি নতুন ব্যবসার প্রতিষ্ঠাতাদের কেবল নিজেদের ব্যবসা শুরু করার সমস্যারই সম্মুখীন হতে হয় না, বরং তাদের নতুন ব্যবসার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য অন্য একটি বিদ্যমান ব্যবসাকে ধ্বংস করার সমস্যারও মুখোমুখি হতে হয়।

অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নের পাশাপাশি একটি জাতীয় সমাজতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করা অর্থহীন হবে। এই ট্রেড ইউনিয়নকে অবশ্যই তার কাজের আদর্শগত প্রকৃতি এবং ফলস্বরূপ অন্যান্য অনুরূপ বা প্রতিকূল প্রতিষ্ঠানকে সহ্য না করার বাধ্যবাধকতার বোধে সম্পূর্ণরূপে পরিব্যাপ্ত হতে হবে। একে অবশ্যই জোর দিতে হবে যে একমাত্র এটিই...

Machine Translated by Google

অন্য সকলের থেকে ভিন্ন, তিনি অপরিহার্য। তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজনের সাথে কোনো চুক্তি বা আপোসে আবদ্ধ হতে পারেন না, বরং তাঁকে নিরঙ্কুশ ও একচেটিয়া অধিকার দাবি করতে হবে।

এটা দুইভাবে ঘটতে পারে :

(1) আমরা আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করতে পারি এবং ধীরে ধীরে এর বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করতে পারি মার্ক্সবাদী ট্রেড ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ,

(2) আমরা মার্ক্সবাদী ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে প্রবেশ করতে পারি এবং তাদের মধ্যে একটি নতুন চেতনা সঞ্চার করতে পারি, যাতে তাদেরকে নতুন আদর্শের সেবায় নিয়োজিত যন্ত্রে রূপান্তরিত করা যায়।

প্রথম পথটি সমীচীন ছিল না, কারণ সেই সময়ে আমাদের আর্থিক অবস্থা তখনও গভীর উদ্বেগের কারণ ছিল এবং আমাদের সম্পদও ছিল বেশ সীমিত। মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়ছিল এবং আমাদের পরিস্থিতিকে আরও কঠিন করে তুলেছিল, কারণ সেই বছরগুলোতে ট্রেড ইউনিয়নগুলো তাদের সদস্যদের যে কোনো ধরনের বস্তুগত সহায়তা দিতে পারত , সে বিষয়ে কথা বলাই কঠিন ছিল। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, একজন সাধারণ শ্রমিকের ইউনিয়ন চাঁদা দেওয়ার কোনো কারণ ছিল না। এমনকি তখনও, বিদ্যমান মার্ক্সবাদী ইউনিয়নগুলো পতনের দ্বারপ্রান্তে ছিল , যতক্ষণ না হের কুনোর বিচক্ষণ রুহর নীতির ফলে হঠাৎ করেই তাদের কোষাগারে লক্ষ লক্ষ টাকা এসে জমা হয়। এই তথাকথিত "জাতীয়" রাইখ চ্যান্সেলর মার্ক্সবাদী ট্রেড ইউনিয়নগুলোর ত্রাণকর্তা হিসেবে ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন।

আমরা অনুরূপ আর্থিক সুবিধার উপর নির্ভর করতে পারতাম না। এবং রাজি করানো অসম্ভব ছিল। যে কেউ এমন একটি নতুন ট্রেড ইউনিয়নে যোগ দেবে , যা তার আর্থিক দুর্বলতার কারণে তাকে সামান্যতম বস্তুগত সুবিধাও দিতে পারবে না। অন্যদিকে, আমি এমন একটি সংগঠন তৈরি হওয়া ঠেকানোর জন্য নিজেকে দায়বদ্ধ মনে করতাম , যা কমবেশি বুদ্ধিমান ধরনের ফাঁকিবাজদের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠবে।

সেই সময়ে কর্মী নিয়োগের প্রশ্নটিই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পন্ন করার জন্য আমি এককভাবে কাউকে ডাকতে পারতাম না। কেউই মার্ক্সবাদী ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে পরাজিত করে পথ প্রস্তুত করতে পারত না।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিক ধারণার বিজয়ের জন্য, যা ধ্বংসাত্মক শ্রেণী সংগ্রামের স্থান নেবে — এমন একজন মানুষ আমাদের জাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ হবেন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রশংসার জন্য রেগেনসবার্গের ভালহালায় তাঁর আবক্ষ মূর্তি স্থাপন করা উচিত।

কিন্তু আমি এমন কোনো মানুষকে চিনতাম না, যিনি ওই উচ্চ আসনের যোগ্য হবেন।

এই প্রসঙ্গে , আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়নগুলো মাঝারি মানের ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হয় — এই তথ্য দ্বারা আমাদের বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয় , কারণ এই ইউনিয়নগুলো এমন এক সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যখন এই ধরনের কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। আজ, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে একটি দানবীয় সংগঠনের মোকাবিলা করতে হচ্ছে , যা বহু পুরোনো , বিশাল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ক্ষুদ্রতম খুঁটিনাটি পর্যন্ত যত্নসহকারে নির্মিত। আক্রমণকারীকে যদি রক্ষাকারীকে পরাজিত করতে হয়, তবে তাকে অবশ্যই রক্ষাকারীর চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান হতে হবে। মার্ক্সবাদী ট্রেড ইউনিয়নের দুর্গ আজ হয়তো মাঝারি মানের নেতাদের দ্বারা শাসিত হচ্ছে , কিন্তু অপর পক্ষের কোনো নেতার নির্ভীক শক্তি ও প্রতিভা ছাড়া একে জয় করা সম্ভব নয়। যদি এমন নেতাকে খুঁজে না পাওয়া যায় , তবে ভাগ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করা বৃথা, এবং তার চেয়েও বড় মূর্খতা হলো বিদ্যমান ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার জন্য লড়াই করা , যদি না তার জায়গায় আরও ভালো কোনো ব্যবস্থা তৈরির সম্ভাবনা থাকে।

এখানেও এই নীতিটি প্রয়োগ করা উচিত যে, জীবনে উপযুক্ত উপায়ের অভাবে কোনো কাজ অর্ধেক করার বা খারাপভাবে করার চেষ্টার চেয়ে , তা একেবারেই স্পর্শ না করাই সাধারণত শ্রেয়।

এখানে আমাদের আরও কিছু পরিস্থিতি যোগ করতে হবে , যেগুলো মোটেও জনতুষ্টিমূলক প্রকৃতির নয়। সেই সময়ে আমার একটি দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবং এখনও আছে যে , রাজনৈতিক অঙ্গনে কোনো বড় আদর্শগত সংগ্রামে লিপ্ত হলে , তার প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থনৈতিক বিষয়াদিকে জড়িয়ে ফেলা একটি গুরুতর ভুল হবে।

এটি বিশেষ করে আমাদের জার্মান জাতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এমনটা হলে অর্থনৈতিক সংগ্রাম

Machine Translated by Google

অর্থনৈতিক সংকট রাজনৈতিক সংগ্রামের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তিকে তাৎক্ষণিকভাবে হ্রাস করবে । মানুষ যখন একবার নিশ্চিত হয়ে যাবে যে তারা তাদের সঞ্চয় দিয়ে একটি ছোট বাড়ি কিনতে পারবে, তখন তারা সঞ্চয় বাড়ানোর কাজে মনোনিবেশ করবে এবং রাজনৈতিক সংগ্রামের জন্য তাদের আর কোনো অবসর সময় থাকবে না ।
তাদের বিরুদ্ধে, যারা কোনো না কোনো উপায়ে একদিন এই সমস্ত সঞ্চয়ের দখল নিশ্চিত করবে। নিজেদের গৃহীত মতামত ও বিশ্বাসের নামে রাজনৈতিক সংঘাতে অংশ নেওয়ার পরিবর্তে , তারা তাদের 'মীমাংসা'র ধারণা নিয়ে এগিয়ে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের বেশিরভাগই গাছের গুঁড়ির মধ্যে মাটিতে বসে থাকতে দেখবে ।

আজ থেকে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন তার সংগ্রাম শুরু করছে। সর্বোপরি, একে অবশ্যই তার আদর্শগুলোকে বিকশিত ও প্রসারিত করতে হবে। এই মহান আদর্শগুলোর স্বীকৃতি আদায়ের সংগ্রামে একে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে, এবং আন্দোলনের সম্মিলিত শক্তি যদি সম্পূর্ণরূপে এই সংগ্রামের সেবায় নিয়োজিত না থাকে , তবে এই প্রচেষ্টায় সাফল্য অকল্পনীয়।

আজ আমাদের সামনে একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ রয়েছে যে কীভাবে একটি জাতির শক্তি পঙ্গু হয়ে যায় যখন মানুষকে সম্পূর্ণরূপে অর্থনৈতিক সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়।

১৯১৮ সালের নভেম্বরে যে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল, তা ট্রেড ইউনিয়নগুলোর দ্বারা নয় , বরং তাদের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও সংঘটিত হয়েছিল। এবং জার্মান জনগণ তাদের দেশের ভবিষ্যতের জন্য কোনো রাজনৈতিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়নি, কারণ তারা মনে করত যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গঠনমূলক কাজের মাধ্যমেই ভবিষ্যৎ যথেষ্টভাবে সুরক্ষিত হতে পারে ।

এই অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের অবশ্যই শিক্ষা নিতে হবে, কারণ একই পরিস্থিতিতে আমাদের সাথেও একই ঘটনা ঘটবে । আমাদের আন্দোলনের সম্মিলিত শক্তি রাজনৈতিক সংগ্রামে যত বেশি কেন্দ্রীভূত হবে, আমরা সমগ্র রণাঙ্গনে সাফল্যের ব্যাপারে তত বেশি আত্মবিশ্বাসী হতে পারব। কিন্তু যদি আমরা অকালে ট্রেড ইউনিয়ন, মীমাংসা ইত্যাদির সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করি, তবে তা সামগ্রিকভাবে আমাদের উদ্দেশ্যের জন্য ক্ষতিকর হবে । এই সমস্যাগুলো যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, যতক্ষণ না আমাদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকবে এবং আমরা তা এই আদর্শের সেবায় ব্যবহার করতে পারব , ততক্ষণ এগুলোর যথাযথ সমাধান সম্ভব নয় । সেই দিন না আসা পর্যন্ত, এই সমস্যাগুলো অমীমাংসিতই থেকে যেতে পারে।

এগুলো আন্দোলনের ওপর কেবল পঙ্গুকারী প্রভাব ফেলবে । আর যদি আমরা খুব তাড়াতাড়ি এগুলোর সমাধান করতে যাই , তবে তা আমাদের আদর্শগত লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টাকে কেবল বাধাগ্রস্ত করবে । তখন সহজেই এমনটা হতে পারে যে , আন্দোলনের রাজনৈতিক লক্ষ্য দ্বারা ট্রেড ইউনিয়নগুলো পরিচালিত হওয়ার পরিবর্তে, ট্রেড ইউনিয়নের উদ্বেগগুলোই আন্দোলনের রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা দখল করে নেবে।

আন্দোলন এবং জাতি কেবল তখনই জাতীয় সমাজতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়ন থেকে উপকৃত হতে পারে, যদি তা জাতীয় সমাজতন্ত্রের আদর্শ দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয় এবং মার্ক্সবাদী আন্দোলনের পদাঙ্ক অনুসরণ করার কোনো আশঙ্কা না থাকে। একটি জাতীয় সমাজতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়ন যদি নিজেকে কেবল মার্ক্সবাদী ইউনিয়নের প্রতিযোগী মনে করে , তবে তার অস্তিত্ব না থাকার চেয়েও খারাপ হবে । একে অবশ্যই মার্ক্সবাদী ট্রেড ইউনিয়নগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে , শুধু একটি সংগঠন হিসেবে নয়, সর্বোপরি একটি আদর্শ হিসেবে। একে অবশ্যই শ্রেণি ও শ্রেণি সংগ্রামের ধারণার প্রতি শত্রুতা ঘোষণা করতে হবে এবং এর পরিবর্তে নিজেকে জার্মান জনগণের বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন স্বার্থের রক্ষক হিসেবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে ।

এই সমস্ত দৃষ্টিকোণ বিবেচনা করে , আমাদের নিজস্ব ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের কথা ভাবা তখনও সমীচীন ছিল না, এবং এখনও সমীচীন নয়। এই বিষয়টি আমার কাছে স্পষ্ট, অন্তত যতক্ষণ না এমন কেউ আসেন যাঁকে নিয়তি এই বিশেষ সমস্যাটির সমাধান করার জন্য ডেকে পাঠিয়েছে ।

সুতরাং, করণীয় মাত্র দুটি পথ রয়েছে । হয় দলীয় সদস্যদেরকে তাদের নিজ নিজ ট্রেড ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া, অথবা যথাসম্ভব বেশি ক্ষতি সাধনের লক্ষ্যে আপাতত সেখানেই থাকার পরামর্শ দেওয়া ।

সাধারণত, আমি দ্বিতীয় বিকল্পটির পরামর্শ দিয়েছিলাম ।

বিশেষ করে ১৯২২-১৯২৩ সালে আমরা এটা সহজেই করতে পারতাম। মুদ্রাস্ফীতির সেই সময়ে, যখন ট্রেড ইউনিয়ন থেকে প্রাপ্ত আর্থিক সুবিধা ছিল নগণ্য, কারণ আমাদের আন্দোলনের দুর্বলতার কারণে আমরা খুব কম সদস্য পাওয়ারই আশা করতে পারতাম । এই ধরনের নীতির ফলে যে ক্ষতি হতে পারত, তা আরও গুরুতর ছিল এর কারণে ।

Machine Translated by Google

সবচেয়ে বড় সমালোচক ও বিরোধীদের পাওয়া যেত জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সমর্থকদের মধ্যেই।

আমি শুরু থেকেই ব্যর্থ হতে বাধ্য এমন কোনো পরীক্ষাকে সমর্থন করতে পুরোপুরি অস্বীকার করেছিলাম । আমার অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস অনুযায়ী, যে সংস্থা তার সদস্যদের কোনো প্রকৃত উপকারের প্রতিশ্রুতি দিতে পারে না , সেই সংস্থাকে সমর্থন করার জন্য শ্রমিকদের তাদের সামান্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করাকে আমি একটি অপরাধ বলে মনে করতাম।

যখন একদিন একটি নতুন রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত হয়ে যাবে, তখন কারও কোনো ক্ষতি হবে না, কেউ কেউ লাভবানও হবে, কিন্তু অভিযোগ করার অধিকার কারও থাকবে না । একটি রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রত্যেকের অবদান এমন একটি ধারণার সঙ্গে যুক্ত, যা শেষ পর্যন্ত নিষ্ফলও হয়ে যেতে পারে ।
কিন্তু যে ব্যক্তি ইউনিয়নের চাঁদা দেন, তার বিনিময়ে কিছু নির্দিষ্ট নিশ্চয়তা পাওয়ার অধিকার রয়েছে । যদি এই নিশ্চয়তাগুলো না থাকে, তবে ইউনিয়ন নেতারা প্রতারক , অথবা অন্তত পক্ষে দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তি, যাদের জবাবদিহিতার আওতায় আনা উচিত ।

১৯২২ সালে আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আমরা এই সমস্ত দিক বিবেচনা করেছিলাম। অন্যরা ভিন্নভাবে চিন্তা করে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করেছিল । তারা আমাদের দূরদৃষ্টির অভাব এবং ভবিষ্যৎ দেখতে না পারার জন্য আমাদের সমালোচনা করেছিল। কিন্তু তাদের সংগঠনগুলো দ্রুত বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, এবং আমাদের ক্ষেত্রেও তাই ঘটত । কিন্তু পার্থক্যটা ছিল এই যে, আমরা নিজেদেরকে বা যারা আমাদের ওপর বিশ্বাস রেখেছিল, তাদেরকে প্রতারিত করিনি ।

Machine Translated by Google

অধ্যায় XIII

জার্মানির যুদ্ধোত্তর জোট নীতি

বাস্তবসম্মত ও কার্যকর মৈত্রী গঠনের জন্য সুদৃঢ় নীতির অভাব থেকেই রাইখের বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনায় অদক্ষতার জন্ম হয়েছিল । বিপ্লবের পরেও এই অবস্থা শুধু অব্যাহতই থাকেনি, বরং আরও খারাপ হয়েছিল।

যুদ্ধের পূর্বে আমাদের রাজনৈতিক ভাবনার সামগ্রিক বিভ্রান্ত অবস্থাকেই রাষ্ট্রের অব্যবস্থাপনার প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে ; কিন্তু যুদ্ধোত্তরকালে এই কারণের জন্য সৎ উদ্দেশ্যের অভাবকেই দায়ী করতে হবে। এটা স্পষ্ট ছিল যে, যে দলগুলো বিপ্লবের মাধ্যমে তাদের ধ্বংসাত্মক লক্ষ্য অর্জন করেছিল, তারা এমন কোনো জোটনীতি গ্রহণ করাকে নিজেদের স্বার্থের পরিপন্থী বলে মনে করবে , যা শেষ পর্যন্ত একটি স্বাধীন জার্মানির পুনর্জন্ম ঘটাবে। এই ধরনের কোনো অগ্রগতি নভেম্বরের অপরাধীদের লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতো না ।

এটি জার্মান জাতীয় অর্থনীতির আন্তর্জাতিকীকরণকে ব্যাহত করবে এবং প্রকৃতপক্ষে এর অবসান ঘটাবে ।
কিন্তু সর্বোপরি, তারা ভয় পেত যে অন্যান্য দেশ থেকে রাইখের কার্যকর স্বাধীনতা অভ্যন্তরীণ রাজনীতির উপর এমন প্রভাব ফেলতে পারে যা একদিন রাইখ সরকারের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিদের জন্য বিপর্যয়কর প্রমাণিত হবে। এটা কল্পনা করা অসম্ভব।

জাতীয় পুনর্জন্ম ঘটে যদি তার আগে জাতীয়করণের প্রক্রিয়া না থাকে। বিপরীতক্রমে, পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য দেশে একটি অনুকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে স্বাধীনতার জন্য প্রতিটি সংগ্রাম জাতীয় অনুভূতি ও জাতীয় চেতনাকে শক্তিশালী করে এবং এর ফলে দেশবিরোধী উপাদান ও প্রবণতার বিরুদ্ধে তীব্র অনুভূতি বৃদ্ধি পায় । শান্তিকালীন সময়ে যে পরিস্থিতি বা ব্যক্তিরা সহনীয় বা এমনকি অলক্ষিত থাকতে পারে, জাতীয় উদ্দীপনা বাড়লে তারা কেবল ঘৃণার পাত্রই হয় না , বরং সক্রিয় বিরোধিতাও উস্কে দেয় , যা প্রায়শই তাদের জন্য বিপর্যয়কর প্রমাণিত হয় । এই প্রসঙ্গে , আমরা যুদ্ধ শুরু হলে গুপ্তচরদের ভয়ের কথা স্মরণ করতে পারি, যখন মানবিক অনুভূতিগুলো হঠাৎ এমন তীব্র মাত্রায় প্রকাশিত হয় যে তা সবচেয়ে নৃশংস নিপীড়নের দিকে নিয়ে যায়, প্রায়শই কোনো কারণ ছাড়াই , যদিও সবাই জানে যে দীর্ঘ শান্তিকালীন সময়ে গুপ্তচরদের থেকে বিপদ বেশি থাকে; কিন্তু সুস্পষ্ট কারণে, সেই সময়ে তারা অনুরূপ জনদৃষ্টি আকর্ষণ করে না । সুতরাং, নভেম্বরের ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে জাতীয় সত্তা থেকে উদ্ভূত রাষ্ট্রীয় পরজীবীদের সহজাত প্রবৃত্তি তাদেরকে অবিলম্বে এই উপলব্ধি করতে বাধ্য করেছিল যে, এমন একটি জোট নীতি যা আমাদের জাতির স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করবে এবং জাতীয়তাবাদী অনুভূতি জাগিয়ে তুলবে, তা তাদের অপরাধমূলক অস্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিতে পারে ।

এইভাবে আমরা এই ঘটনাটি ব্যাখ্যা করতে পারি যে, ১৯১৮ সাল থেকে সরকারের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা বৈদেশিক বিষয়ে সম্পূর্ণ নেতিবাচক মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন এবং রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি প্রায় নিরন্তর ও পদ্ধতিগতভাবে জার্মান জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী উপায়ে পরিচালিত হয়েছিল । যা প্রথম দৃষ্টিতে আকস্মিক বলে মনে হয়েছিল, তা নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, এটি ছিল ১৯১৮ সালের নভেম্বর বিপ্লবের সময় তাদের প্রথম শুরু করা পথেরই একটি যৌক্তিক অগ্রগতি।

নিঃসন্দেহে নিম্নলিখিতদের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে: (১) আমাদের রাষ্ট্রীয় বিষয়ের দায়িত্বশীল প্রশাসক , অথবা বরং যারা দায়িত্বশীল হওয়া উচিত; (২) আমাদের সাধারণ সংসদীয় রাজনীতিবিদ; এবং (৩) আমাদের জাতির জনসাধারণ, যাদের ভেড়ার পালের মতো বশ্যতা তাদের বুদ্ধিমত্তার অভাবের পরিচায়ক।

প্রথমোক্তরা জানে তারা কী চায়। শেষোক্তরা তাদের অনুসরণ করে , হয় কারণ তাদের সেভাবেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে , অথবা কারণ যেসব কাজকে তারা ধ্বংসাত্মক বলে জানে ও অনুভব করে, সেগুলোর বিরুদ্ধে আপোষহীন অবস্থান নেওয়ার সাহস তাদের নেই । শেষোক্তরা মেনে চলে কারণ তারা বোঝার মতো যথেষ্ট বুদ্ধিহীন ।

Machine Translated by Google

যখন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক জার্মান শ্রমিক দল একটি ক্ষুদ্র এবং কার্যত অপরিচিত সংগঠন ছিল, তখন এর অনেক সদস্যের চোখে বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত বিষয়গুলো গৌণ গুরুত্বের বিষয় ছিল। এটি বিশেষভাবে সত্য ছিল কারণ আমাদের আন্দোলন সর্বদা এই নীতি ঘোষণা করেছে এবং এখনও করে চলেছে যে , বৈদেশিক সম্পর্কে আমাদের দেশের স্বাধীনতা স্বর্গ বা কোনো পার্থিব শক্তির প্রদত্ত উপহার নয় , বরং তা কেবল আমাদের অভ্যন্তরীণ শক্তির বিকাশের ফল হতে পারে । আমাদের পতনের কারণগুলো প্রথমে নির্মূল করতে হবে এবং এই পতন থেকে যারা লাভবান হয়েছে, তাদের সকলকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে। কেবল তখনই আমরা বৈদেশিক সম্পর্কে আমাদের স্বাধীনতার পুনর্জন্মের সংগ্রাম শুরু করতে পারব।

সুতরাং এটা সহজেই বোঝা যায় যে, কেন আমরা আমাদের নবীন আন্দোলনের বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে বৈদেশিক বিষয়ে তেমন মনোযোগ না দিয়ে অভ্যন্তরীণ সংস্কারের সমস্যার ওপর মনোনিবেশ করতে পছন্দ করেছিলাম।

কিন্তু যখন সেই ক্ষুদ্র ও নগণ্য সংগঠনটি বৃদ্ধি পেয়ে অবশেষে তার প্রাথমিক কাঠামোর জন্য বড্ড বড় হয়ে উঠল , তখন নবীন সংগঠনটি একটি বৃহৎ সংঘে পরিণত হলো, এবং আমরা অনুভব করলাম যে পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনার সমস্যাগুলোর বিষয়ে আমাদের একটি নির্দিষ্ট অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। এমন প্রধান কর্মপন্থা নির্ধারণ করা প্রয়োজন ছিল যা কেবল আমাদের বিশ্বদৃষ্টির মৌলিক ধারণাগুলোর সঙ্গেই সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না, বরং সেগুলোকে পররাষ্ট্রবিষয়ক বাস্তব জগতেও প্রসারিত করবে । যেহেতু পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে আমাদের জাতির কোনো রাজনৈতিক শিক্ষা ছিল না, তাই আমাদের আন্দোলনের বিভিন্ন অংশের নেতাদের, সেইসাথে জাতির জনসাধারণকে, সেই প্রধান নীতিগুলো শেখানো প্রয়োজন

ছিল যা আমাদের বৈদেশিক সম্পর্কের উন্নয়নে পথনির্দেশক হওয়া উচিত । এটি ছিল প্রথম কাজগুলোর মধ্যে একটি যা এমন একটি পররাষ্ট্রনীতির বাস্তব পরিচালনার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সম্পন্ন করতে হয়েছিল, যা জাতিকে তার বৈদেশিক বিষয়ে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করতে এবং এর মাধ্যমে রাইখের প্রকৃত সার্বভৌমত্ব ফিরিয়ে আনতে সক্ষম করবে।

এই বিষয়টি অধ্যয়ন করার সময় আমাদের যে মৌলিক নীতিটি সর্বদা মনে রাখতে হবে তা হলো : পররাষ্ট্রনীতি কেবল একটি লক্ষ্য অর্জনের উপায় মাত্র, এবং অনুসৃত একমাত্র লক্ষ্য হলো আমাদের জাতির কল্যাণ। প্রতিটি পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক বিষয় অবশ্যই হতে হবে
এই দৃষ্টিকোণ থেকে এবং শুধুমাত্র এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বিবেচনা করলে , এই ও ঐ সমাধানগুলো কি ভবিষ্যতে আমাদের জাতির জন্য কল্যাণকর প্রমাণিত হবে, নাকি এর স্বার্থের ক্ষতি করবে?
সেটাই প্রশ্ন।

এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করার সময় শুধু এই একটি চিন্তাই আমাদের মনে রাখতে হবে ।
দলীয় রাজনীতি, ধর্মীয় বিবেচনা, মানবিক আদর্শ – এই সবকিছু এবং অন্য সকল বিষয়কে অবশ্যই এর কাছে নতি স্বীকার করতে হবে।

* * *

যুদ্ধের আগে , জার্মানির পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল আমাদের জনগণ ও তাদের সন্তানদের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় রসদ নিশ্চিত করা। এবং এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথ প্রস্তুত করা উচিত ছিল। এমন জোট গঠন করা উচিত ছিল যা এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের জন্য লাভজনক হবে এবং আমাদের প্রয়োজনীয় সমর্থন জোগাবে । আজও আমরা সেই একই কাজের মুখোমুখি, তবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সামনে রেখে।

পার্থক্য: যুদ্ধ-পূর্ববর্তী সময়ে বিষয়টি ছিল তৎকালীন শক্তিশালী ও স্বাধীন রাষ্ট্রের শক্তিতে সমর্থিত জার্মান জাতির যত্ন নেওয়া , কিন্তু আজ আমাদের কাজ হলো একটি শক্তিশালী ও স্বাধীন রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমাদের জাতিকে পুনরায় শক্তিশালী করে তোলা । এই ধরনের একটি রাষ্ট্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত যা অবশ্যই পূরণ করতে হবে , যাতে আমরা পরবর্তীতে এমন একটি পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়ন করতে পারি যা আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব নিশ্চিত করতে, তাদের চাহিদা পূরণ করতে এবং জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করতে সহায়ক হবে। অন্য কথায়, জার্মানির আজকের পররাষ্ট্রনীতিতে যে লক্ষ্য অনুসরণ করা উচিত তা হলো পথ প্রস্তুত করা।

Machine Translated by Google

আগামীকাল স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার । এর সাথে একটি মৌলিক নীতি জড়িত যা আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে। সেটি হলো: একটি জাতির স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা ভূখণ্ডগত পুনঃএকত্রীকরণের বিষয়ের সাথে একেবারেই সম্পর্কহীন , বরং জাতির একটি ক্ষুদ্র অংশ , তা যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন , টিকে থাকলেই যথেষ্ট এবং রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকবে, যদি তার সেই প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা থাকে যা দিয়ে সে কেবল সমগ্র জাতির অভিন্ন চেতনার বাহকই হবে না , বরং জাতির স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য সামরিক সংগ্রামের পথও প্রস্তুত করবে ।

যদি এক কোটি মানুষের একটি জাতি তাদের রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের বিভাজন ও বিচ্ছিন্নতা রোধ করার জন্য সাধারণ দাসত্বের বোঝা সহ্য করে , তবে তা এমন একটি রাষ্ট্র ও জাতির চেয়েও খারাপ, যা বিভক্ত হয়ে গেছে এবং যার একটি খণ্ডাংশ তখনও তার পূর্ণ স্বাধীনতা ধরে রেখেছে। অবশ্যই, এখানে স্বাভাবিক শর্ত হলো এই যে, এই খণ্ডাংশটিকে তার উপর অর্পিত গুরুতর কর্তব্যের চেতনায় অনুপ্রাণিত হতে হবে; শুধু জাতির বিচ্ছিন্ন সদস্যদের সাথে আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অটল ঐক্য ক্রমাগত ঘোষণা করাই নয় , বরং এমন একটি সামরিক সংঘাতের জন্য প্রয়োজনীয় উপায়ও প্রস্তুত করতে হবে যা নিপীড়িত খণ্ডাংশগুলোর মুক্তি ও পুনর্মিলনের দিকে নিয়ে যাবে ।

এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, একসময়ের হারানো অঞ্চলগুলো পুনরুদ্ধার করা...
রাষ্ট্রের অংশ ছিল জাতিগত ও রাজনৈতিকভাবে, যা প্রথমে একটি বিষয় হতে হবে
স্বদেশভূমির জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতা ও স্বাধীনতা অর্জন করা , এবং সেক্ষেত্রে মূল কাজ—যা হলো মূল ভূখণ্ডের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করা—এর আলোকে হারানো অঞ্চলগুলোর বিশেষ স্বার্থকে অবশ্যই আপসহীনভাবে গৌণ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। জাতির বিচ্ছিন্ন ও নিপীড়িত অংশ বা সাম্রাজ্যিক প্রদেশগুলো নিপীড়িত ও পরিত্যক্তদের আকাঙ্ক্ষা ও প্রতিবাদের প্রকাশের মাধ্যমে মুক্তি অর্জন করতে পারে না, বরং কেবল তখনই তা সম্ভব, যখন কমবেশি সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা ধরে রাখা অংশটি একসময় অভিন্ন স্বদেশভূমির অন্তর্ভুক্ত থাকা অঞ্চলগুলো পুনর্দখল করার জন্য বলপ্রয়োগের আশ্রয় নিতে পারে ।

অতএব, হারানো অঞ্চলগুলো পুনরুদ্ধার করার জন্য প্রথম শর্ত হলো, বিভাজনের পর অবশিষ্ট থাকা রাষ্ট্রের সেই অংশে সমৃদ্ধি বৃদ্ধি ও জাতীয় শক্তি সুদৃঢ় করার জন্য উদ্যমের সাথে কাজ করা । এইভাবে, ভেতরে ভেতরে ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা...
জাতির অন্তরে নতুন শক্তির দ্বারা একে জাগিয়ে তুলতে ও শক্তিশালী করতে হবে, যাতে সময় এলে প্রত্যেকে সমগ্র জাতিকে মুক্ত ও ঐক্যবদ্ধ করার একমাত্র লক্ষ্যে নিজেদের উৎসর্গ করে ।
অতএব, বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলোর স্বার্থকে একটিমাত্র লক্ষ্যের অধীন করতে হবে। এই একমাত্র লক্ষ্যটি হলো অবশিষ্ট মূল অংশের জন্য যথেষ্ট শক্তি ও ক্ষমতা অর্জন করা, যাতে তারা বিজয়ীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজেদের ইচ্ছা চাপিয়ে দিতে এবং এর মাধ্যমে অন্যায়ের প্রতিকার করতে সক্ষম হয় । সহিংস প্রতিবাদ নিপীড়িত অঞ্চলগুলোকে সাধারণ রাইখের কোলে ফিরিয়ে আনবে না। এটি কেবল তরবারির জোরেই সম্পন্ন করা সম্ভব ।

এই তরবারি নির্মাণ করা এমন একটি কাজ যা জাতীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত অভ্যন্তরীণ নীতির মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে । এই অস্ত্র নির্মাণের কাজটি নিশ্চিত করা এবং যারা এটি বহন করবে সেই লোক নিয়োগ করা হলো পররাষ্ট্র নীতির দায়িত্ব।

* * *

এই বইয়ের প্রথম খণ্ডে আমি যুদ্ধের আগে আমাদের জোট নীতির অপর্যাপ্ততা নিয়ে আলোচনা করেছি । আমাদের জাতিকে খাওয়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার চারটি সম্ভাব্য পথ ছিল । এগুলোর মধ্যে চতুর্থ, সবচেয়ে প্রতিকূল পথটিই বেছে নেওয়া হয়েছিল। ইউরোপে ভূখণ্ড সম্প্রসারণের একটি বিচক্ষণ নীতির পরিবর্তে , আমাদের শাসকেরা ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক সম্প্রসারণের নীতি গ্রহণ করেছিল । এই নীতিটি আরও বেশি অনুপযুক্ত ছিল , কারণ তারা ধরে নিয়েছিল যে এটি সশস্ত্র সংঘাতের বিপদ এড়াতে পারবে । একবারে একাধিক আসন দখলের এই প্রচেষ্টার ফলাফল সহজেই অনুমান করা গিয়েছিল। আমরা সেগুলোর মাঝে মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম। আর বিশ্বযুদ্ধ ছিল রাইখের ভ্রান্ত পররাষ্ট্রনীতির জন্য তাদের কাছে উপস্থাপিত চূড়ান্ত বিল মাত্র ।

Machine Translated by Google

সেই সময়ে বেছে নেওয়ার জন্য সঠিক পথটি ছিল আমার প্রস্তাবিত তৃতীয় পথটি : অর্থাৎ, ইউরোপে নতুন ভূখণ্ড অধিগ্রহণের মাধ্যমে একটি মহাদেশীয় শক্তি হিসেবে রাইখের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। একই সাথে, পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক ভূখণ্ড অধিগ্রহণের মাধ্যমে আরও সম্প্রসারণ বাস্তবসম্মত নীতির আওতায় আসতে পারত । অবশ্যই, ইংল্যান্ডের সাথে মৈত্রী ছাড়া, অথবা সামরিক শক্তি ও অস্ত্রশস্ত্র বৃদ্ধির জন্য এমন অসাধারণ প্রচেষ্টা ছাড়া এই নীতি বাস্তবায়ন করা যেত না, যার ফলে চল্লিশ বা পঞ্চাশ বছরের জন্য সমস্ত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণরূপে নেপথ্যে চলে যেত । এই দায়িত্ব গ্রহণ করা যেত । একটি জাতির সাংস্কৃতিক তাৎপর্য প্রায় সবসময়ই তার রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও স্বনির্ভরতার উপর নির্ভর করে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা হলো বৃহৎ উদ্যোগের অস্তিত্ব, বা বলা ভালো, সৃষ্টির একটি পূর্বশর্ত।

সাংস্কৃতিক। তদনুসারে, একটি জাতির রাজনৈতিক স্বাধীনতা সুরক্ষিত করার ক্ষেত্রে কোনো ত্যাগই খুব বড় নয় । রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির বিপুল চাহিদা মেটাতে বাজেটের সাংস্কৃতিক ব্যয় থেকে যা বাদ দিতে হতো, তা পরবর্তীতে তার চেয়েও বেশি পরিশোধিত হতো । বলা যেতে পারে যে, রাষ্ট্র যখন রাজনৈতিক স্বাধীনতা সুরক্ষিত করার একক প্রচেষ্টায় তার সমস্ত সম্পদ কেন্দ্রীভূত করত, তখন একটি নতুন ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হতো । এবং যেমনটা প্রায়শই ঘটে, একটি জাতির পূর্বে অবদমিত সাংস্কৃতিক চেতনা হঠাৎ বিকশিত হতো। এভাবেই, পারস্য যুদ্ধের দুর্ভাগ্য ভোগ করার পর গ্রিস পেরিক্লিসের মহান যুগের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল । এবং পুণিক যুদ্ধের উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হওয়ার পর রোমান প্রজাতন্ত্র একটি উন্নততর সভ্যতা বিকাশে তার শক্তিকে নিয়োজিত করেছিল।

অবশ্যই, এটা আশা করা উচিত নয় যে দায়িত্বজ্ঞানহীন ও নির্বোধ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা এমন একটি বিচক্ষণ নীতি গ্রহণ করতে সক্ষম হবে, যেখানে রাষ্ট্রকে চূড়ান্তভাবে সুরক্ষিত করবে এমন একটি ভবিষ্যৎ সশস্ত্র সংঘাতের প্রস্তুতির একমাত্র কাজের জন্য অন্য সকল জাতীয় স্বার্থকে সম্পূর্ণরূপে গৌণ করে রাখা হবে । ফ্রেডরিক দ্য গ্রেটের পিতা এই ধরনের সংঘাতের জন্য প্রস্তুত হতে সবকিছু উৎসর্গ করেছিলেন ; কিন্তু ইহুদি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন আমাদের এই উদ্ভট সংসদীয় গণতন্ত্রের জনকেরা তা করতে পারেননি।

সুতরাং, যুদ্ধ-পূর্ববর্তী সময়ে ইউরোপে নতুন ভূখণ্ড অধিগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সামরিক প্রস্তুতি খুবই দুর্বল ছিল, ফলে তা অর্জন করা কঠিন ছিল।
প্রকৃত সহায়ক মিত্রদের কাছ থেকে সমর্থন।

যারা আমাদের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করতেন , তারা পরিকল্পিতভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার ধারণাটি বিবেচনাও করেননি । তারা ইউরোপে নতুন ভূখণ্ড অধিগ্রহণের প্রতিটি পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণের নীতিকে প্রাধান্য দিয়ে তারা ইংল্যান্ডের সাথে একটি সম্ভাব্য মৈত্রী নষ্ট করেছিলেন। একই সাথে, তারা রাশিয়ার সমর্থন চাইতে অবহেলা করেছিলেন, যা করাটাই ছিল যৌক্তিক পদক্ষেপ। পরিশেষে, দুর্ভাগ্যজনক হ্যাবসবার্গরা ছাড়া বাকি সকলের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে তারা বিশ্বযুদ্ধে প্রবেশ করেন ।

* * *

আমাদের বর্তমান পররাষ্ট্রনীতির একটি বৈশিষ্ট্য হলো, এটি কোনো সুস্পষ্ট বা বোধগম্য কর্মপন্থা অনুসরণ করে পরিচালিত হচ্ছে না । যেখানে যুদ্ধের আগে আমার উল্লিখিত চতুর্থ পথটি অনুসরণ করার ভুলটি করা হয়েছিল , এবং তাও কেবল দায়সারাভাবে, সেখানে বিপ্লবের পর থেকে এমনকি তীক্ষ্ণতম দৃষ্টিও কোনো পথ খুঁজে পেতে অক্ষম হয়েছে । যুদ্ধের আগের চেয়েও এখন জাতীয় পুনরুজ্জীবনের শেষ সম্ভাবনাটুকু ধ্বংস করার পরিকল্পিত প্রচেষ্টা ছাড়া আর কোনো সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা একেবারেই নেই ।

বিভিন্ন শক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে আজকের ইউরোপের পরিস্থিতি যদি আমরা নিরপেক্ষভাবে পরীক্ষা করি, তাহলে আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হব: তিনশত বছর ধরে আমাদের

মহাদেশের ইতিহাস নির্ণায়কভাবে নির্ধারিত হয়েছে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোকে ক্ষমতার পারস্পরিক ভারসাম্যে বজায় রাখার জন্য ইংল্যান্ডের প্রচেষ্টার দ্বারা , যা ব্রিটিশ বিশ্বনীতির মহান লক্ষ্যগুলো অনুসরণের পাশাপাশি তাকে তার পশ্চাৎভাগের প্রয়োজনীয় সুরক্ষা প্রদান করেছে ।

Machine Translated by Google

রানী এলিজাবেথের রাজত্বকাল থেকে ব্রিটিশ কূটনীতির ঐতিহ্যগত প্রবণতা ছিল, কোনো রাষ্ট্রকে অন্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর ওপর প্রভাবশালী অবস্থান অর্জন থেকে বিরত রাখতে এবং প্রয়োজনে সশস্ত্র হস্তক্ষেপের মাধ্যমে সেই আধিপত্য ভেঙে দিতে সমস্ত উপলব্ধ উপায় পদ্ধতিগতভাবে ব্যবহার করা। প্রুশীয় সামরিক ঐতিহ্যও একই রকম ছিল। ইংল্যান্ড তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন উপায় ব্যবহার করত , যা তারা বর্তমান পরিস্থিতি বা হাতে থাকা কাজের ওপর নির্ভর করে বেছে নিত ; কিন্তু সেগুলো ব্যবহারের ইচ্ছা ও সংকল্প সবসময় একই ছিল। ইতিহাস জুড়ে ইংল্যান্ডের অবস্থান যত কঠিন হয়েছে , ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকার ততই বিভিন্ন ইউরোপীয় রাষ্ট্রের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক অচলাবস্থা বজায় রাখাকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছে । যখন উত্তর আমেরিকার উপনিবেশগুলো রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করে, তখন ইউরোপে নিজেদের পার্শ্বভাগের প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখার জন্য ইংল্যান্ডের পক্ষে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো আরও বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে । এই নীতি অনুসারে , এটি স্পেন এবং নেদারল্যান্ডসকে ক্ষুদ্র নৌশক্তির পর্যায়ে নামিয়ে আনে। এটি অর্জন করার পর , ইংল্যান্ড ফ্রান্সের ক্রমবর্ধমান শক্তির বিরুদ্ধে তার সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করে, যতক্ষণ না সে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের পতন ঘটায় এবং এর মাধ্যমে ফ্রান্সের সামরিক আধিপত্য ধ্বংস করে , যা ছিল ইংল্যান্ডের সবচেয়ে বিপজ্জনক প্রতিদ্বন্দ্বী।

জার্মানির প্রতি ব্রিটিশ রাষ্ট্রনায়কদের মনোভাবের পরিবর্তন ছিল অত্যন্ত ধীর, শুধু এই কারণে নয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত জার্মান জাতির কোনো জাতীয় একক ছিল না, ততক্ষণ তারা ইংল্যান্ডের জন্য কোনো সুস্পষ্ট বিপদ সৃষ্টি করেনি ; বরং এই কারণেও যে , ইংল্যান্ডের জনমত, যা একটি দীর্ঘ-প্রতিষ্ঠিত প্রচার ব্যবস্থার দ্বারা অন্যান্য দিকে প্রভাবিত হয়েছিল, তাকে নতুন কোনো দিকে সামান্যই প্রভাবিত করা যেত । উদ্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য, একজন স্থিরমনা রাজনীতিবিদকে অবশ্যই জনঅনুভূতির কাছে আবেদন করতে হয়, যা হলো সর্বশ্রেষ্ঠ চালিকাশক্তি এবং একই সাথে দীর্ঘস্থায়ী শক্তি । যখন একজন রাজনীতিবিদ তার একটি লক্ষ্য অর্জন করেন, তখন তাকে অবিলম্বে আরেকটি লক্ষ্য নিয়ে ভাবতে শুরু করতে হয় ; কিন্তু কেবল ধীরে ধীরে, প্রচারণার ধীর প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই, নেতাদের দ্বারা নির্ধারিত নতুন লক্ষ্য অর্জনের হাতিয়ারে জনগণের অনুভূতিকে রূপ দেওয়া সম্ভব ।

১৮৭০-৭১ সালের গোড়ার দিকেই ইংল্যান্ড তার নতুন অবস্থান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। বিশ্ব বাণিজ্য বাজারে আমেরিকার ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব এবং রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক শক্তির কারণে মাঝে মাঝে এই নীতিতে সামান্য পরিবর্তন এসেছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত জার্মানি তা থেকে কোনো সুবিধা লাভ করতে পারেনি, এবং এর ফলে ব্রিটিশ কূটনীতির মূল প্রবণতাগুলোই কেবল আরও শক্তিশালী হয়েছিল।

ইংল্যান্ড জার্মানিকে একটি বৈশ্বিক বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে দেখত, যা আংশিকভাবে তার বিপুল শিল্পোন্নয়নের কারণে এমন অপ্রতিরোধ্য আকার ধারণ করেছিল যে, উভয় দেশ একই পরিমণ্ডলে সমান শক্তিতে একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। বাণিজ্যিক উদ্যোগের মাধ্যমে তথাকথিত শান্তিপূর্ণ বিশ্বজয়ের ধারণা, যা তৎকালীন জনবিষয়াদি পরিচালনাকারীদের দৃষ্টিতে ইংরেজ রাজনীতিবিদদের প্রতিরোধের নীতি গ্রহণে পরিচালিত করেছিল। এই প্রতিরোধ যে বৃহৎ আকারের , সংগঠিত আগ্রাসনের রূপ নিয়েছিল, তা এমন এক নীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ ছিল, যার লক্ষ্য ছিল এক ভঙ্গুর বিশ্বশান্তি বজায় রাখা নয় , বরং বিশ্বে ব্রিটিশ আধিপত্যকে সুসংহত করা । এই নীতি অনুসরণে , ইংল্যান্ড যথেষ্ট সামরিক গুরুত্বসম্পন্ন দেশগুলোর সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেছিল। এটি তার প্রতিপক্ষের শক্তি এবং সাময়িক দুর্বলতা মূল্যায়নে তার চিরাচরিত সতর্কতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। এই ধরনের আচরণকে নীতিহীন বলা যায় না; কারণ যুদ্ধের উদ্দেশ্যে গঠিত এমন একটি জটিল সংগঠনকে বীরত্বপূর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং বাস্তবসম্মত দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হয়। কূটনৈতিক নীতির কাজ কোনো জাতিকে বীরত্বপূর্ণ পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়া নয় , বরং তার বাস্তবসম্মত অস্তিত্ব নিশ্চিত করা। সুতরাং, এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর যেকোনো পথই সঠিক, এবং তা অনুসরণ করতে অস্বীকার করাকে কর্তব্যের এক নিন্দনীয় অবহেলা হিসেবে গণ্য করতে হবে ।

যখন জার্মান বিপ্লব সংঘটিত হলো , তখন জার্মানির বিশ্ব আধিপত্য নিয়ে ইংল্যান্ডের ভয় সন্তোষজনকভাবে শেষ হয়েছিল ।

Machine Translated by Google

সেই সময় থেকে ইউরোপের ভৌগোলিক মানচিত্র থেকে জার্মানিকে সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলা আর ইংল্যান্ডের স্বার্থের অনুকূল ছিল না। বরং , ১৯১৮ সালের নভেম্বরে সংঘটিত বিস্ময়কর পতন ব্রিটিশ কূটনীতিকে এমন এক পরিস্থিতির মুখোমুখি করেছিল যা প্রথমে অগ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছিল ।

সাড়ে চার বছর ধরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য মহাদেশীয় শক্তির আরোপিত আধিপত্য ভাঙার জন্য সংগ্রাম করেছিল। এর আকস্মিক পতন একে ইউরোপীয় ঘটনাবলীর অগ্রভাগ থেকে সরিয়ে দেয়। এই পতন শেষ পর্যন্ত আত্মরক্ষার আদিম প্রবৃত্তির অনুপস্থিতিতে প্রকাশ পায়, যার ফলে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে ইউরোপের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় । জার্মানি ধ্বংস হয়ে যায় এবং ফ্রান্স ইউরোপ মহাদেশের প্রধান রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়।

এই যুদ্ধ চলাকালীন ব্রিটিশ জনমতকে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে উৎসাহিত করার জন্য পরিচালিত ব্যাপক প্রচার অভিযানটি জনগণের সমস্ত আদিম প্রবৃত্তি ও অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলেছিল এবং শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ রাজনীতিবিদদের সিদ্ধান্তের উপর একটি ভারী বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিল । জার্মানির ঔপনিবেশিক, অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক ধ্বংসের মাধ্যমে ইংল্যান্ডের যুদ্ধকালীন লক্ষ্যগুলো অর্জিত হয়েছিল । এই লক্ষ্যগুলোর বাইরের যেকোনো কিছুই ব্রিটিশ স্বার্থের প্রসারের পথে বাধা ছিল । কেবল ইংল্যান্ডের শত্রুরাই লাভবান হতে পারত।

ইউরোপে একটি বৃহৎ মহাদেশীয় শক্তি হিসেবে জার্মানির বিলুপ্তি । তবে, ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে এবং ১৯১৯ সালের গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত ইংল্যান্ড তার কূটনৈতিক মনোভাব পরিবর্তন করতে পারেনি, কারণ দীর্ঘ যুদ্ধটি আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি জনগণের অনুভূতিকে নাড়া দিয়েছিল। জনগণের মধ্যে বিরাজমান অনুভূতির পরিপ্রেক্ষিতে ইংল্যান্ড তার পররাষ্ট্রনীতি পরিবর্তন করতে পারেনি ; এর আরেকটি কারণ ছিল অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তিগুলোর তৎকালীন সামরিক শক্তি । ফ্রান্স শান্তি আলোচনা নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল এবং অন্যদের উপর তার অধিকার চাপিয়ে দিতে পারত। আলোচনা ও দর কষাকষির এই মাসগুলোতে , একমাত্র জার্মানিই ছিল ঘটনাপ্রবাহের গতিপথ পরিবর্তন করতে সক্ষম ; কিন্তু জার্মানি গৃহযুদ্ধে জর্জরিত ছিল এবং তথাকথিত রাষ্ট্রনায়করা তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া যেকোনো নির্দেশ মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন ।

এখন, জাতিসমূহের সৌজন্যে , যখন কোনো জাতি আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি হারিয়ে ফেলে এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ থেকে বিরত হয়, তখন তা একটি পরাধীন জাতির পর্যায়ে নেমে আসে এবং তার ভূখণ্ডকে একটি উপনিবেশের ভাগ্য বরণ করতে হয়।

ফ্রান্সকে অতিরিক্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠা থেকে বিরত রাখতে , ইংরেজদের আলোচনার একমাত্র উপায় ছিল ফ্রান্সের জাঁকজমক অর্জনের আকাঙ্ক্ষায় অংশগ্রহণ করা ।
রু।

মূলত, ইংল্যান্ড যে লক্ষ্য নিয়ে যুদ্ধে গিয়েছিল তা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছিল। ইউরোপে একটি মহাদেশীয় দেশের আধিপত্যকে প্রতিহত করা যে কেবল অসম্ভবই প্রমাণিত হয়েছিল তাই নয়, বরং উল্লেখযোগ্য মাত্রার আধিপত্য অর্জিত ও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

১৯১৪ সালে, সামরিক শক্তি হিসেবে বিবেচিত জার্মানি দুটি দেশের মাঝে আটকা পড়েছিল —একটি দেশের হাতে ছিল সমান সামরিক শক্তি এবং অন্যটির ছিল আরও বেশি সামরিক সম্পদ। সমুদ্রে ব্রিটিশদেরও ছিল অপ্রতিরোধ্য আধিপত্য। ফ্রান্স ও রাশিয়া জার্মান সম্প্রসারণকে সংযত ও প্রতিহত করেছিল। সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে রাইখের প্রতিকূল ভৌগোলিক অবস্থানকেও জার্মানির অত্যধিক বৃদ্ধি রোধকারী আরেকটি কারণ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে । নৌ-দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, ইংল্যান্ডের সাথে সংঘাতের ক্ষেত্রে উপকূলরেখার গঠন ছিল প্রতিকূল। আর সামুদ্রিক সীমান্তটি ছিল সংক্ষিপ্ত ও সীমিত, কিন্তু স্থল সীমান্তটি ছিল প্রশস্ত ও উন্মুক্ত।

আজ ফ্রান্সের অবস্থান ভিন্ন। এটিই মহাদেশে প্রথম সামরিক শক্তি যার কোনো গুরুতর প্রতিদ্বন্দ্বী নেই । এর দক্ষিণ সীমান্ত স্পেন ও ইতালি থেকে প্রায় সম্পূর্ণ সুরক্ষিত। আমাদের দেশের সংকটময় পরিস্থিতি একে জার্মানি থেকে রক্ষা করে । এর উপকূলরেখার একটি দীর্ঘ অংশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ স্নায়ুতন্ত্রের বিপরীতে অবস্থিত । ফরাসি বিমান ও দূরপাল্লার কামান শুধু যে ব্রিটিশ ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে আক্রমণ করতে পারে তাই নয়, ডুবোজাহাজগুলোও ব্রিটেনের প্রধান বাণিজ্য পথগুলোর জন্য হুমকি হতে পারে।

ফ্রান্সের দীর্ঘ আটলান্টিক উপকূল এবং ইউরোপীয় অঞ্চলে অবস্থিত একটি সাবমেরিন অভিযান।

Machine Translated by Google

এবং ভূমধ্যসাগরের উত্তর আফ্রিকান উপকূল ইংল্যান্ডের জন্য ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনত।

সুতরাং, শক্তিশালী জার্মানির উত্থান প্রতিহত করার যুদ্ধের রাজনৈতিক পরিণতি ছিল মহাদেশে ফরাসি আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা। এর সামরিক পরিণতি ছিল মহাদেশীয় প্রধান শক্তি হিসেবে ফ্রান্সের শক্তিশালীকরণ এবং সমুদ্রে আমেরিকার সমতার স্বীকৃতি।
এর অর্থনৈতিক ফল ছিল এই যে, ব্রিটিশ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিশাল এলাকা প্রাক্তন মিত্র ও কমরেডদের হাতে তুলে দিতে হয়েছিল ।

ঐতিহ্যগত প্রেক্ষাপটে ইউরোপের বলকানীকরণ কিছুটা কাম্য ও প্রয়োজনীয় ছিল।
গ্রেট ব্রিটেনের জাতীয় নীতি, ঠিক যেমন ফ্রান্স জার্মানির বলকানাইজেশন চেয়েছিল।
ইংল্যান্ড সর্বদাই ইউরোপের কোনো মহাদেশীয় শক্তিকে বৈশ্বিক গুরুত্বের অবস্থানে পৌঁছানো থেকে বিরত রাখতে চেয়েছে এবং ভবিষ্যতেও চাইবে । তাই, ইংল্যান্ড ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ক্ষমতার একটি নির্দিষ্ট ভারসাম্য বজায় রাখতে চায় —কারণ এই ভারসাম্যই ইংরেজদের বৈশ্বিক আধিপত্যের জন্য একটি অপরিহার্য শর্ত বলে মনে হয়।

ফ্রান্স বরাবরই জার্মানির একটি সমসত্ত্ব শক্তিতে রূপান্তরকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে । একারণে, ফ্রান্স ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জার্মান রাজ্যগুলোর এমন একটি ব্যবস্থা বজায় রাখতে চায়, যাদের শক্তিগুলো একে অপরের ভারসাম্য রক্ষা করবে এবং যেখানে কোনো কেন্দ্রীয় সরকার থাকবে না । রাইন নদীর বাম তীরে বিজয় অর্জনের মাধ্যমে, এটি ইউরোপে তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষিত করার পূর্বশর্তগুলো পূরণ করেছে।

সুতরাং ফরাসি কূটনীতির চূড়ান্ত লক্ষ্য অবশ্যই ব্রিটিশ নীতির চূড়ান্ত প্রবণতাগুলোর অবিরাম বিরোধিতায় থাকতে হবে।

* * *

এই বিষয়গুলোকে ভিত্তি করে , জার্মানির জন্য মিত্র খোঁজার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখলে যে কেউই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন যে, জোট গঠনের আর কোনো উপায় নেই
ইংল্যান্ডের সাথে সৌহার্দ্য । ইংল্যান্ডের যুদ্ধ নীতির পরিণতি জার্মানির জন্য ভয়াবহ ছিল এবং এখনও আছে । তবে, আমরা এই সত্যটি উপেক্ষা করতে পারি না যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে, ইংল্যান্ডের অপরিহার্য স্বার্থের জন্য জার্মানিকে ধ্বংস করার আর প্রয়োজন নেই। বরং , ব্রিটিশ কূটনীতিকে অবশ্যই বছর বছর ফ্রান্সের আধিপত্য বিস্তারের উদ্দাম প্রচেষ্টাকে দমন করার দিকে আরও বেশি করে ঝুঁকে পড়তে হবে । জোট নীতি পুরোনো ক্ষোভের উপর ভিত্তি করে হতে পারে না , বরং পুরোনো অভিজ্ঞতাকে বিবেচনায় নিয়ে তা ফলপ্রসূ হতে পারে । অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের শেখা উচিত যে, নেতিবাচক কারণে গঠিত জোটগুলো অভ্যন্তরীণ দুর্বলতায় ভোগে। জাতিসমূহের ভাগ্য কেবল তখনই সংযুক্ত হতে পারে , যদি যৌথ সাফল্য, লাভ এবং অর্জনের একটি সম্ভাবনা থাকে—সংক্ষেপে, উভয় মিত্রের জন্য ক্ষমতার যৌথ সম্প্রসারণ।

দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলো থেকে আমাদের জাতির পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক অজ্ঞতা স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে, যেখানে অমুক বা তমুক বিদেশী রাজনীতিবিদের পক্ষ থেকে "জার্মানির প্রতি বন্ধুত্বের" কথা বলা হয়। এর ফলে এই ঘোষিত বন্ধুত্বকে একটি বিশেষ নিশ্চয়তা হিসেবে গণ্য করা হয় যে, এই ব্যক্তিরা আমাদের জাতির জন্য উপকারী নীতির পক্ষে কথা বলবেন । এই ধরনের কথাবার্তা অবিশ্বাস্যভাবে অযৌক্তিক। এটি রাজনীতির ক্ষেত্রে সাধারণ জার্মান অশিক্ষিত ব্যক্তির অতুলনীয় সরলতাকেই তুলে ধরে। এমন কোনো ব্রিটিশ, আমেরিকান বা ইতালীয় রাজনীতিবিদ নেই যাকে কখনো বলা হবে ...

"জার্মানপন্থী।" প্রত্যেক ইংরেজকে অবশ্যই সর্বাগ্রে ব্রিটিশ হতে হবে। একই কথা প্রত্যেক আমেরিকানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । এবং এমন কোনো ইতালীয় রাজনীতিবিদ নেই যিনি ইতালিপন্থী নয় এমন কোনো নীতি গ্রহণ করতে প্রস্তুত। অতএব , যে কেউ অন্য দেশের রাজনীতিবিদদের মধ্যে থাকা জার্মানপন্থী মনোভাবের ভিত্তিতে বিদেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে জোট গঠনের আশা করে, সে হয় একজন নির্বোধ অথবা একজন প্রতারক। জাতিসমূহের ভাগ্যকে সংযুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত পারস্পরিক শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি নয়, বরং জোটে প্রবেশকারী পক্ষগুলোর সুবিধা লাভের সম্ভাবনা। এটা সত্য যে একজন ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ সর্বদা একটি ব্রিটিশপন্থী নীতি দ্বারা পরিচালিত হবেন , জার্মানপন্থী নীতি দ্বারা নয়; কিন্তু এটাও সত্য যে এই ব্রিটিশপন্থী নীতির কিছু স্বার্থ রয়েছে।

Machine Translated by Google

বিভিন্ন ক্ষেত্রে তা জার্মানির স্বার্থের সঙ্গে মিলে যেতে পারে। অবশ্যই, এটি কেবল একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্তই সত্যি হতে পারে , এবং একদিন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্নও হয়ে যেতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার কলাকৌশল তখনই প্রদর্শিত হয় , যখন নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জিত হয় এবং এমন মিত্র খুঁজে পাওয়া যায়, যারা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য একই পথ অনুসরণ করতে বাধ্য থাকে।

বর্তমান সময়ে এই নীতিগুলির বাস্তব প্রয়োগ অবশ্যই নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তরের উপর নির্ভর করবে : কোন রাষ্ট্রগুলি এই ঘটনায় গভীরভাবে আগ্রহী নয় যে, জার্মান মধ্য ইউরোপের সম্পূর্ণ পতনের মাধ্যমে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি পূর্ণ আধিপত্যের অবস্থানে পৌঁছেছে ? কোন রাষ্ট্রগুলি, তাদের নিজেদের অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী বিবেচনা করে এবং তাদের পূর্ববর্তী পররাষ্ট্রনীতির ঐতিহ্যের আলোকে, এই ধরনের ঘটনাকে তাদের নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য হুমকি হিসেবে বিবেচনা করে ?

পরিশেষে , আমাদের নিম্নলিখিত বিষয়টি সম্পূর্ণ স্পষ্ট করে দিতে হবে : ফ্রান্স জার্মানির একচ্ছত্র শত্রু এবং তা-ই থাকবে। ফ্রান্সে যে শক্তিই শাসন করুক বা করবে —বুরবঁ বা জ্যাকোবিন, নেপোলিয়ন বা বুর্জোয়া গণতন্ত্র, যাজকতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী বা লাল বলশেভিক—তাদের পররাষ্ট্রনীতি সর্বদা রাইন নদীর তীরে একটি সীমান্ত দখল করা এবং জার্মানিকে বারবার বিভক্ত করার মাধ্যমে সেই নদীর তীরে ফ্রান্সের অবস্থানকে শক্তিশালী করার দিকেই পরিচালিত হবে।

ইংল্যান্ড চায়নি জার্মানি একটি বিশ্বশক্তি হয়ে উঠুক। ফ্রান্স চেয়েছিল জার্মানি নামে কোনো শক্তিরই যেন অস্তিত্ব না থাকে। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য। আজ আমরা বিশ্বশক্তি হিসেবে আমাদের অবস্থানের জন্য লড়ছি না , বরং লড়ছি আমাদের দেশের অস্তিত্বের জন্য, জাতীয় ঐক্যের জন্য এবং আমাদের সন্তানদের নিত্যনৈমিত্তিক খাদ্যের জন্য। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, ইউরোপে আমাদের জন্য কেবল দুটি সম্ভাব্য মিত্র অবশিষ্ট থাকে – ইংল্যান্ড এবং ইতালি।

ফ্রান্সকে দেখে ইংল্যান্ড খুশি হতে পারে না, যার সামরিক শক্তি ইউরোপে ভারসাম্যহীন, যার ফলে সে একদিন এমন নীতি সমর্থন করতে শুরু করতে পারে যা কোনো না কোনোভাবে ব্রিটিশ স্বার্থের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে। পশ্চিম ইউরোপে ফ্রান্সের এত বিশাল কয়লা ও লোহার খনি রয়েছে যে সে একদিন বিশ্ব বাণিজ্যে এমন ভূমিকা পালন করতে শুরু করতে পারে যা ব্রিটিশ স্বার্থের জন্য হুমকিস্বরূপ , এটা দেখেও ইংল্যান্ড খুশি হতে পারে না। অধিকন্তু, ফ্রান্সকে দেখে ইংল্যান্ড কখনোই খুশি হতে পারে না , যার মহাদেশীয় রাজনৈতিক অবস্থান, ইউরোপের বাকি অংশের বিভাজনের ফলে , এতটাই সুনিশ্চিত বলে মনে হয় যে তা ফ্রান্সকে কেবল বৃহৎ পরিসরে একটি বিশ্বনীতি গ্রহণ করতে সক্ষমই করে না , বরং তা করতে বাধ্যও করে।

এই পর্যন্ত। যে বোমাগুলো একসময় জেপেলিন থেকে ফেলা হতো, তা প্রতি রাতে হাজার গুণ বাড়ানো যেতে পারে। ফ্রান্সের সামরিক আধিপত্য গ্রেট ব্রিটেন শাসিত সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে এক গভীর চাপ সৃষ্টি করে।

ইতালিও ইউরোপে ফ্রান্সের শক্তির আরও বৃদ্ধি চায় না এবং চাইবেও না। ভূমধ্যসাগরের ঘটনাবলি এবং এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের রাজনৈতিক পরিস্থিতিই ইতালির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। যুদ্ধে ইতালির প্রবেশের কারণ ফ্রান্সের সম্প্রসারণে অংশ নেওয়া ছিল না, বরং তার ঘৃণিত অ্যাড্রিয়াটিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে মারাত্মক আঘাত হানা ছিল। মহাদেশে ফরাসি শক্তির যেকোনো বৃদ্ধি ইতালির ভবিষ্যৎ উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করবে , এবং ইতালি এই ভেবে নিজেকে প্রতারিত করছে না যে জাতিগুলোর মধ্যে জাতিগত আত্মীয়তা কোনোভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দূর করে দেবে।

গভীর ও নিরপেক্ষ বিবেচনায় প্রমাণিত হয় যে , গ্রেট ব্রিটেন এবং ইতালি—এমন দুটি রাষ্ট্র রয়েছে , যাদের স্বাভাবিক স্বার্থ শুধু জার্মান জাতির অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী থেকে ভিন্নই নয় , বরং একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত সেগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কিন্তু যখন আমরা একটি জোটের সম্ভাবনা বিবেচনা করব, তখন আমাদের তিনটি বিষয় ভুলে গেলে চলবে না। প্রথম বিষয়টি আমাদের নিজেদের সাথে সম্পর্কিত; অন্য দুটি বিষয় আমার উল্লিখিত দুটি রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত।

* * *

Machine Translated by Google

আজকের জার্মানির সাথে জোট গঠন করা কি আদৌ সম্ভব? যে শক্তি তার নিজস্ব আক্রমণাত্মক লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টায় সহায়তা লাভের জন্য জোটে প্রবেশ করবে —সেই শক্তি কি এমন একটি রাষ্ট্রের সাথে জোটে প্রবেশ করবে, যার শাসকেরা বছরের পর বছর ধরে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করেছে?
শোচনীয় অযোগ্যতা ও শান্তিবাদী কাপুরুষতা, এবং যেখানে গণতান্ত্রিক ও মার্ক্সবাদী মতবাদে অন্ধ হয়ে জাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নিজেদের জাতি ও দেশের স্বার্থের সাথে এমনভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে যা স্বর্গের কাছে প্রতিশোধের জন্য আর্তনাদ করে ? আজকের এই পরিস্থিতিতে, কোনো শক্তি কি পারে ...
এমন একটি রাষ্ট্রের সাথে কার্যকরী সম্পর্ক স্থাপন এবং অভিন্ন স্বার্থ সম্প্রসারণের জন্য যৌথভাবে লড়াই করার আশা , যে রাষ্ট্রের নিজের অস্তিত্ব রক্ষায় একটি আঙুলও নাড়ানোর স্পষ্ট ইচ্ছা বা সাহস কোনটাই নেই ? আসুন এমন একটি শক্তির উদাহরণ নেওয়া যাক যার জন্য একটি জোটকে অবশ্যই এর চেয়েও বেশি কিছু হতে হবে।
এমন একটি চুক্তি যা ধীর পচনশীলতার এক পরিস্থিতি নিশ্চিত করে, যেমনটা ঘটেছিল পুরোনো ও বিপর্যয়কর ত্রিপক্ষীয় জোটের ক্ষেত্রে। এমন একটি শক্তি কি জীবন - মরণের জন্য এমন একটি রাষ্ট্রের সাথে নিজেকে আবদ্ধ করতে পারে , যার কার্যকলাপের সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চিহ্ন হলো বৈদেশিক সম্পর্কে উন্মত্ত দাসত্ব এবং দেশে জাতীয় চেতনার কলঙ্কজনক দমন? এমন একটি শক্তি কি এমন একটি রাষ্ট্রের সাথে নিজেকে আবদ্ধ করতে পারে , যেখানে কোনো মহত্ত্ব নেই , কারণ তার সমগ্র নীতিই এর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে?

এটা কি এর যোগ্য নয়? এমন সরকারগুলোর সাথে কি জোট গঠন করা সম্ভব , যেগুলো এমন ব্যক্তিদের হাতে রয়েছে যাদেরকে তাদের সহনাগরিকরা ঘৃণা করে এবং সেই কারণে বিদেশেও যারা সম্মানিত নয় ?
না। একটি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন শক্তি , যারা লোভী সংসদ সদস্যদের জন্য কমিশন পাওয়ার চেয়ে জোট থেকে আরও বেশি কিছু প্রত্যাশা করে , তারা বর্তমান জার্মানির সাথে জোটে প্রবেশ করতে চাইবে না এবং পারবেও না । জোট গঠনে আমাদের বর্তমান অক্ষমতাই সবচেয়ে দৃঢ় ভিত্তি প্রদান করে।
এটাই আমাদের শত্রুদের সম্মিলিত কর্মকাণ্ডের ভিত্তি, যারা আমাদের লুণ্ঠন করছে। যেহেতু জার্মানি আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সোচ্চার প্রতিবাদ ছাড়া অন্য কোনোভাবে আত্মরক্ষা করে না , তাই বাকি বিশ্বের আমাদের প্রতিরক্ষায় যুদ্ধ করার কোনো কারণ নেই ।

আমাদের 'দেশপ্রেমিক' সংগঠনগুলোর সমস্ত তাৎপর্য সত্ত্বেও, ঈশ্বর কাপুরুষ জাতিদের স্বাধীনতা দেন না । অতএব, যেসব রাষ্ট্রের আমাদের ধ্বংসের প্রতি কোনো প্রত্যক্ষ স্বার্থ নেই , তাদের জন্য ফরাসিদের লুণ্ঠন অভিযানে অংশগ্রহণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না; অন্তত পক্ষে ফ্রান্সকে সবকিছু একচেটিয়াভাবে দখল করা থেকে বিরত রাখাই এর উদ্দেশ্য ।

দ্বিতীয়ত, আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, যেসব জাতি আমাদের শত্রু ছিল, তাদের মধ্যে গণ-প্রচারণা জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশের মতামত ও অনুভূতিকে একটি নির্দিষ্ট দিকে প্রভাবিত করেছে । যখন বছরের পর বছর ধরে একটি বিদেশী জাতিকে জনগণের কাছে "হুন," "বদমাশ," "ডাকাত" ইত্যাদির একটি দল হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে, তখন তাদেরকে হঠাৎ করে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে চিত্রিত করা যায় না , এবং গতকালের শত্রুকে আগামীকালের মিত্র হিসেবে সুপারিশ করা যায় না।

কিন্তু তৃতীয় কারণটি আরও মনোযোগের দাবি রাখে কারণ এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
ইউরোপে ভবিষ্যৎ জোট গঠনের জন্য।
রাজনৈতিকভাবে, জার্মানিকে ধ্বংস করা চালিয়ে যাওয়া গ্রেট ব্রিটেনের স্বার্থের অনুকূল নয়, কিন্তু এই ধরনের পদক্ষেপ ইহুদিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আন্তর্জাতিক আর্থিক বাজারের জন্য অত্যন্ত অনুকূল । আনুষ্ঠানিক , বা বরং ঐতিহ্যগত মধ্যে পার্থক্য হলো ...

ব্রিটিশ নীতি এবং আর্থিক বাজার নিয়ন্ত্রণকারী ইহুদিদের প্রভাবের মধ্যকার সংঘাত ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মনোভাবের চেয়ে আর কোথাও এত স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় না। ব্রিটিশ রাষ্ট্রের স্বার্থ ও সমৃদ্ধির বিরুদ্ধে গিয়ে ইহুদি অর্থায়ন শুধু জার্মানির সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ধ্বংসই নয়, বরং এর পূর্ণ রাজনৈতিক দাসত্বও দাবি করে। আমাদের জার্মান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আন্তর্জাতিকীকরণ, অর্থাৎ আমাদের উৎপাদন শক্তিকে ইহুদি আন্তর্জাতিক অর্থায়নের নিয়ন্ত্রণে হস্তান্তর, কেবল রাজনৈতিকভাবে বলশেভিকীকৃত একটি রাষ্ট্রেই সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব । কিন্তু আন্তর্জাতিক ইহুদি শেয়ারবাজারের পুঁজি দ্বারা পরিচালিত মার্ক্সবাদী মিলিশিয়ারা বন্ধুত্বপূর্ণ বাহ্যিক সহায়তা ছাড়া জার্মানিতে জাতীয় প্রতিরোধকে চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করতে পারে না। এই লক্ষ্যে, ফরাসি সেনাবাহিনীকে প্রথমে জার্মান রাইখের ভূখণ্ড আক্রমণ ও দখল করতে হবে যতক্ষণ না একটি আন্তর্জাতিক বিশৃঙ্খলার পরিস্থিতি তৈরি হয় , যার পরে দেশটি আন্তর্জাতিক ইহুদি অর্থায়নের সেবায় নিয়োজিত বলশেভিক স্টর্মট্রুপারদের হাতে পতন হবে।

এই কারণেই আমাদের সময়ে জার্মানির সম্পূর্ণ ধ্বংসের প্রধান উস্কানিদাতা হলো ইহুদিরা। যখনই আমরা বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে জার্মানির ওপর আক্রমণের খবর পড়ি,

Machine Translated by Google

ইহুদিরাই সর্বদা উস্কানিদাতা। শান্তিকালীন ও যুদ্ধকালীন উভয় সময়েই, ইহুদি-মার্ক্সবাদী স্টক এক্সচেঞ্জের গণমাধ্যম পরিকল্পিতভাবে জার্মানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা উস্কে দিয়েছে , যতক্ষণ না পর্যন্ত
একটার পর একটা দেশ নিরপেক্ষতা ত্যাগ করে নিজেদের জাতির প্রকৃত স্বার্থের বিরুদ্ধে গিয়েও বিশ্ব জোটের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করেছে ।

এর ফলে ইহুদিদের চিন্তাধারা বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জার্মানির বলশেভিকীকরণ, অর্থাৎ দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী জার্মান বুদ্ধিজীবীদের নির্মূল, জার্মান শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক ইহুদি অর্থের জোয়াল বহন করতে বাধ্য করা সম্ভব করে তুলবে – এটি বৃহত্তর পরিসরে ইহুদি শক্তির বিস্তার এবং চূড়ান্তভাবে বিশ্বকে তাদের শাসনের অধীন করার দিকে প্রথম পদক্ষেপ মাত্র । ইতিহাসে যেমন প্রায়শই ঘটেছে , জার্মানি হলো

এই বিশাল সংগ্রামের মূল কেন্দ্রবিন্দু । যদি আমাদের জাতি ও রাষ্ট্র রক্ত ও অর্থের লোভে থাকা এই জাতিসমূহের নিপীড়কদের শিকারে পরিণত হয়, তবে সমগ্র বিশ্ব এই বহুরূপী দানবের শিকারে পরিণত হবে । যদি জার্মানি এর কবল থেকে মুক্ত হয়, তবে বিশ্বের জাতিসমূহের প্রতি এই বিরাট হুমকি নির্মূল হয়ে যাবে।
না।

এটা স্পষ্ট যে ইহুদিরা জার্মানির বিরুদ্ধে পুরোনো জাতীয় শত্রুতা শুধু টিকিয়ে রাখার জন্যই নয় , বরং যেখানেই সম্ভব সেগুলোকে আরও ছড়াতে ও তীব্রতর করতে সম্ভাব্য সব ধরনের গোপন পদ্ধতি ব্যবহার করছে । এটাও সমানভাবে স্পষ্ট যে, এই কর্মকাণ্ডগুলো সেইসব জাতির প্রকৃত স্বার্থের সঙ্গে কেবল আংশিকভাবেই সামঞ্জস্যপূর্ণ , যাদের মধ্যে এই বিষ ছড়ানো হচ্ছে । সাধারণভাবে বলতে গেলে, ইহুদিরা বিভিন্ন দেশে এমন সব যুক্তি ব্যবহার করে তাদের প্রচারণা চালাচ্ছে , যা সংশ্লিষ্ট জাতিগুলোর মানসিকতাকে সবচেয়ে ভালোভাবে প্রভাবিত করতে এবং কাঙ্ক্ষিত ফলাফল আনতে সক্ষম ; ইহুদিরা প্রতিটি দেশের মানুষের অনুভূতি সম্পর্কে অবগত। আমাদের জাতি বিদেশি উপাদানের মিশ্রণে এতটাই কলুষিত হয়েছে যে, ক্ষমতার লড়াইয়ে ইহুদিরা আমাদের মধ্যে বিদ্যমান শান্তিবাদী ও আন্তর্জাতিকতাবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত কমবেশি 'বিশ্বজনীন' পরিমণ্ডলগুলোকে ব্যবহার করতে পারে।

ফ্রান্সে, তারা সুপরিচিত ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষিত উগ্র জাতীয়তাবাদী মনোভাবকে কাজে লাগায়। ইংল্যান্ডে, তারা বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণকে কাজে লাগায়। সংক্ষেপে, এগুলো সবসময়ই কাজ করে।
প্রতিটি জাতির মানসিকতার অন্তর্নিহিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে । একবার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চূড়ান্ত গুরুত্ব অর্জন করার পর, তারা তাদের পূর্ববর্তী রণকৌশলের সীমাবদ্ধতাগুলো ঝেড়ে ফেলতে পারে এবং যে প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের জন্য তারা যুদ্ধ করছে, তা প্রকাশ করে দেয়। তাদের ধ্বংসযজ্ঞ আরও দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে , একের পর এক রাষ্ট্রকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে, যার উপর তারা একটি চিরস্থায়ী ও সার্বভৌম ইহুদি সাম্রাজ্য গড়ে তুলবে।

ইংল্যান্ডে, ইতালিতে, রাষ্ট্রনায়কদের সুদৃঢ় নীতি এবং নীতির মধ্যে বৈসাদৃশ্য
ইহুদি স্টক এক্সচেঞ্জ ব্যবসায়ীদের বিষয়টি প্রায়শই অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কেবলমাত্র ফ্রান্সে এখন, আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে , ইহুদি -নিয়ন্ত্রিত স্টক এক্সচেঞ্জের দৃষ্টিভঙ্গি এবং ফরাসি রাষ্ট্রনায়কদের উগ্র জাতীয়তাবাদী নীতির মধ্যে এক গভীর ঐকমত্য বিরাজ করছে । এই ঐক্য জার্মানির জন্য এক বিরাট বিপদ ডেকে আনছে ।

আর ঠিক এই কারণেই ফ্রান্স আমাদের সবচেয়ে বিপজ্জনক শত্রু এবং থাকবে । নিগ্রো-ভাবনায় ক্রমশ আচ্ছন্ন ফরাসি জাতি ইউরোপে শ্বেতাঙ্গ জাতির অস্তিত্বের জন্য এক গুরুতর হুমকি , কারণ এটি বিশ্ব আধিপত্যের জন্য ইহুদিদের প্রচারণার সাথে যুক্ত । ইউরোপের একেবারে কেন্দ্রস্থলে, রাইন নদীর তীরে নিগ্রো রক্তের প্রবাহের কারণে সৃষ্ট এই দূষণ, আমাদের জাতির বংশগত শত্রুদের পাশবিক ও বিকৃত প্রতিশোধস্পৃহার সাথে মিলে যায় ; ঠিক যেমন এটি সেই ঠান্ডা মাথার হিসেবি ইহুদির উদ্দেশ্য সাধন করে , যে এই উপায় ব্যবহার করে ইউরোপ মহাদেশের একেবারে কেন্দ্রস্থলে এক বিকৃতির প্রক্রিয়া চালু করবে এবং এক নিকৃষ্ট প্রজাতির রক্ত দিয়ে শ্বেতাঙ্গ জাতিকে সংক্রমিত করে তাদের স্বাধীন অস্তিত্বের ভিত্তি ধ্বংস করে দেবে ।

ফরাসিদের প্রতিশোধের তৃষ্ণায় চালিত এবং ইহুদিদের দ্বারা সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালিত ইউরোপে ফ্রান্সের বর্তমান কার্যকলাপ শ্বেতাঙ্গ জাতির জীবনের উপর একটি অপরাধমূলক আক্রমণ এবং এটি একদিন এমন এক প্রজন্মের মধ্যে ফরাসি জাতির বিরুদ্ধে প্রতিশোধের স্পৃহা জাগিয়ে তুলবে, যারা এই জাতিগত দূষণের মধ্যেই মানবতার আদি পাপ দেখতে পাবে ।

Machine Translated by Google

জার্মানির ক্ষেত্রে , ফ্রান্সের দিক থেকে আসা বিপদ দাবি করে যে আমরা সমস্ত আবেগ একপাশে সরিয়ে রেখে তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই , যারা সমানভাবে হুমকির সম্মুখীন এবং যারা ফরাসি আধিপত্যের এই প্রচেষ্টাকে সহ্য বা মেনে নিতে নারাজ ।

আগামী দীর্ঘ সময় ধরে ইউরোপে মাত্র দুটি শক্তি থাকবে যাদের সাথে জার্মানি জোট গঠন করতে পারবে । এই শক্তি দুটি হলো গ্রেট ব্রিটেন এবং ইতালি।

* * *

বিপ্লবের পর থেকে জার্মান পররাষ্ট্রনীতি যেভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে, তা যদি আমরা একটু খতিয়ে দেখি, তবে আমাদের সরকারের অবিরাম ও অবোধ্য অধীনতার কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের হয় হতাশ হতে হবে , অথবা ক্রোধে জ্বলে উঠে এমন শাসনের বিরুদ্ধে লাঠি তুলে ধরতে হবে। তাদের এই কার্যকলাপকে বোধশক্তির অভাব বলে আখ্যা দেওয়া যায় না, কারণ যা কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তির কাছে অকল্পনীয় ছিল, তা-ই নভেম্বর দলগুলোর নেতারা তাদের দৈত্যাকৃতির বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সম্পন্ন করেছিলেন। তারা ফ্রান্সের সামনে মাথা নত করে তার অনুগ্রহ ভিক্ষা করেছিল। হ্যাঁ, বিগত এতগুলো বছর ধরে, অদম্য স্বপ্নদ্রষ্টাদের হৃদয়স্পর্শী সরলতায় , তারা ফ্রান্সের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে তার সামনে লেজ নেড়েছে । আর ফরাসি জল্লাদ তার দড়ি দিয়ে যতবারই চালাকি করেছে, ততবারই তারা হৃদয়ের এক দৃশ্যমান পরিবর্তন দেখেছে। যারা আমাদের রাজনীতির আসল কলকাঠি নাড়েন , তারা এই অযৌক্তিক নির্বুদ্ধিতায় কখনও অংশ নেননি। তাদের কাছে ফ্রান্সের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের ধারণাটি ছিল জার্মানির যেকোনো বাস্তবসম্মত জোট নীতি গ্রহণের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার একটি উপায় মাত্র। ফ্রান্সের লক্ষ্য কিংবা ফ্রান্সের নেপথ্যের কুশীলবদের সম্পর্কে তাদের কোনো ভ্রান্ত ধারণা ছিল না । তারা এই মনোভাব গ্রহণ করেছিল এবং এমনভাবে কাজ করেছিল যেন তারা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করত যে, এক ঠান্ডা মাথার হিসাবনিকাশের ফলেই জার্মানির ভাগ্য এভাবে বদলে যেতে পারে ; আর তা না হলে , আমাদের জাতি হয়তো ক্ষমতার লাগাম নিজেদের হাতে তুলে নেবে এবং ভিন্ন কোনো পথ বেছে নেবে ।

অবশ্যই, ইংল্যান্ডকে আমাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য মিত্র হিসেবে প্রস্তাব করা আমাদের জন্য কঠিন । আমাদের ইহুদি গণমাধ্যম বরাবরই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘৃণার ওপর বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেছে । আর আমাদের অনেক ভালো জার্মান বোকা সেই ডালে বসে আছে, যা ইহুদিরা তাদের ফাঁদে ফেলার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছে । তারা জার্মান নৌ- শক্তি পুনরুদ্ধারের কথা বলে এবং আমাদের উপনিবেশগুলো লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। এইভাবে, তারা এমন উপাদান সরবরাহ করে যা চতুর ইহুদিরা ইংল্যান্ডে তাদের স্বদেশীদের কাছে পৌঁছে দেয়, যেখানে তা বাস্তব প্রচারণার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে । আমাদের সরলমনা বুর্জোয়া শ্রেণি, যারা রাজনীতিতে হাত পাকায়, তারা কেবল ধীরে ধীরে বুঝতে পারছে যে আজ আমাদের " সমুদ্র শক্তি " এবং এই জাতীয় কিছুর জন্য লড়াই করার প্রয়োজন নেই । এমনকি যুদ্ধের আগেও, ইউরোপে আমাদের অবস্থান সুরক্ষিত না করে জার্মানির জাতীয় শক্তিকে এই লক্ষ্যের দিকে চালিত করাটা ছিল অযৌক্তিক । এখন এই ধরনের আশা অযৌক্তিকতার এমন এক চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে , যাকে রাজনীতির পরিভাষায় অপরাধ বলা যেতে পারে ।

এটা সত্যিই হতাশাজনক যে ইহুদি চক্রান্তকারীরা কীভাবে মানুষের মনোযোগ এমন সব বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় , যেগুলো এখন গৌণ গুরুত্বের বিষয়। তারা মানুষকে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের জন্য উসকানি দেয়, অথচ একই সময়ে ফ্রান্স আমাদের জাতিকে তিলে তিলে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে এবং পরিকল্পিতভাবে আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার ভিত্তিগুলো উপড়ে ফেলছে ।

এই প্রসঙ্গে , আমাকে সেই কাঠের ঘোড়াটির কথা ভাবতেই হচ্ছে, যেটিতে চড়ে ইহুদিরা বছরের পর বছর ধরে অসাধারণ দক্ষতা প্রদর্শন করেছিল । আমি দক্ষিণ টাইরলের কথা বলছি।

হ্যাঁ, দক্ষিণ টাইরল। আমি এখানে এই বিষয়টি উত্থাপন করেছি কারণ আমি সেই লজ্জাজনক বদমাশটির কাছে ব্যাখ্যা চাই, যে আমাদের জনগণের একটি বড় অংশের অজ্ঞতা ও স্বল্পস্মৃতির সুযোগ নিয়ে এমন এক জাতীয় ক্ষোভ উস্কে দিয়েছে , যা আমাদের সংসদীয় প্রতারণার প্রকৃত চরিত্রের থেকে ততটাই ভিন্ন, যতটা ভিন্ন একটি দোয়েল পাখির কাছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতি শ্রদ্ধার ধারণা ।

এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই যে, যখন দক্ষিণ টাইরলের ভাগ্য নির্ধারিত হচ্ছিল – অর্থাৎ, আগস্ট ১৯১৪ থেকে নভেম্বর ১৯১৮ পর্যন্ত – তখন আমি সেইসব ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ছিলাম, যারা এমন একটি অবস্থানে ছিলাম যেখান থেকে এই দেশকে কার্যকরভাবে রক্ষা করা যেত , আর তা হলো সেনাবাহিনীতে।

Machine Translated by Google

সেই দিনগুলিতে লড়াইয়ে তাদের ভূমিকা ছিল শুধু দক্ষিণ টাইরলকে বিচ্ছিন্নতার হাত থেকে রক্ষা করাই নয়, বরং পিতৃভূমির জন্য অন্য প্রতিটি জার্মান প্রদেশকেও রক্ষা করা ।

সংসদের দুর্নীতিবাজরা এই লড়াইয়ে অংশ নেয়নি। এই বদমাশগুলো রাজনীতি করছিল।
অন্যদিকে , আমরা এই বিশ্বাসে যুদ্ধ করেছিলাম যে যুদ্ধে বিজয় জার্মান জনগণকে দক্ষিণ টাইরলও ধরে রাখার সুযোগ দেবে ; কিন্তু এক সোচ্চার বিশ্বাসঘাতক বিজয়ের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতমূলক আন্দোলন চালিয়েছিল , যতক্ষণ না পর্যন্ত যুদ্ধরত সিগফ্রিড পিঠে ছুরির আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এটা স্পষ্ট ছিল যে ভিয়েনার রাথাউস প্লাৎসে বা মিউনিখের ফেল্ডহেরেনহালের সামনে মার্জিত পোশাক পরা সংসদ সদস্যদের উস্কানিমূলক ও ভণ্ডামিপূর্ণ বক্তৃতা জার্মানির জন্য দক্ষিণ টাইরলকে রক্ষা করতে পারবে না। কেবল সম্মুখ সমরে যুদ্ধরত ব্যাটালিয়নগুলোই তা করতে পারত। যারা এই যুদ্ধক্ষেত্র ভেঙে দিয়েছিল, তারা দক্ষিণ টাইরলের পাশাপাশি জার্মানির অন্যান্য অংশের সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।

যে কেউ যদি বিশ্বাস করে যে বিভিন্ন সংগঠনের আয়োজিত প্রতিবাদ, বিক্ষোভ ও মিছিলের মাধ্যমে এখন দক্ষিণ টাইরোল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব , তবে সে হয় একজন ভণ্ড অথবা নিছক একজন জার্মান অমার্জিত ব্যক্তি।

এই প্রসঙ্গে আমাদের স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে যে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে গম্ভীর অভিশাপের উপর কিংবা জাতিপুঞ্জের পুণ্যময় ইচ্ছার উপর নির্ভর করে আমরা হারানো অঞ্চলগুলো পুনরুদ্ধার করতে পারব না , বরং তা কেবল সশস্ত্র উপায়েই সম্ভব ।
শক্তি।

সুতরাং, একমাত্র প্রশ্নটি হলো: হারানো অঞ্চলগুলো পুনরুদ্ধার করতে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে কে প্রস্তুত ?

ব্যক্তিগতভাবে আমি স্বচ্ছ বিবেকে বলতে পারি যে , সংসদীয় দাম্ভিক ও দলীয় নেতা এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় উপদেষ্টাদের নিয়ে গঠিত সংসদীয় আক্রমণকারী বাহিনীর নেতৃত্বে দক্ষিণ টাইরল পুনরুদ্ধারের অভিযানে অংশ নেওয়ার সাহস আমার থাকত। একমাত্র ঈশ্বরই জানেন , এই "উত্তপ্ত" বিক্ষোভের উপর হঠাৎ কয়েকটি গোলা বিস্ফোরিত হতে দেখার সৌভাগ্য আমার হতো কি না । আমার মনে হয় , যদি শিয়াল মুরগির খোঁয়াড়ে ঢুকে পড়ত, তাহলেও "বিক্ষোভকারীদের" মধ্যে আমরা যে বিশৃঙ্খল পলায়ন দেখেছি, তা ঘটত না ।

সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হলো , এই বাচালগুলো নিজেরাই বিশ্বাস করে না যে এভাবে কোনো কিছু অর্জন করা সম্ভব । তাদের প্রত্যেকেই খুব ভালো করে জানে যে তাদের পুরো অস্তিত্বটাই কতটা নিরীহ ও অকার্যকর। তারা এটা করে কারণ দক্ষিণ টাইরলকে রক্ষা করার জন্য লড়াই করার চেয়ে এখন তা পুনরুদ্ধারের কথা বলে বকবক করা অনেক সহজ ।

জীবনে প্রত্যেকেই নিজের ভূমিকা পালন করে , যেটা সে সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারে। সেই দিনগুলোতে আমরা রক্ত দিয়েছিলাম । আজ এই লোকগুলো অহংকারী ।

বিশেষভাবে আকর্ষণীয় বিষয় হলো, ভিয়েনার বৈধতাবাদী মহলগুলো আজ যেভাবে নিজেদের জাহির করে।
দক্ষিণ টাইরল পুনরুদ্ধারের কাজে তারা গর্বিত ছিল । সাত বছর আগে, তাদের শ্রদ্ধেয় ও মহিমান্বিত রাজবংশ শপথভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে বিজয়ী জোটকে দক্ষিণ টাইরল থেকে বিচ্ছিন্ন হতে সাহায্য করেছিল । সেই সময়ে, এই গোষ্ঠীগুলো তাদের রাজবংশের গৃহীত কপট নীতিগুলোকে সমর্থন করেছিল এবং দক্ষিণ টাইরল বা অন্য কোনো প্রদেশের ভাগ্য নিয়ে তারা মোটেও চিন্তিত ছিল না । অবশ্যই, আজ এই অঞ্চলের জন্য লড়াই করা সহজ, কারণ বর্তমান সংগ্রামটি "মানসিক অস্ত্র" দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। যাই হোক, উদাহরণস্বরূপ, রুহর দখলের সময় একটি সেতু উড়িয়ে দেওয়ার চেয়ে, একটি "প্রতিবাদ সভায়" যোগ দিয়ে গলা ভেঙে যাওয়া পর্যন্ত কথা বলা এবং বুকভর্তি মহৎ ক্ষোভ উগরে দেওয়া , অথবা সংবাদপত্রের জন্য প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে হাত নোংরা করা অনেক সহজ ।

বিগত কয়েক বছর ধরে কিছু মহল কেন দক্ষিণ টাইরল ইস্যুটিকে জার্মান-ইতালীয় সম্পর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছে, তার কারণ সুস্পষ্ট। ইহুদি এবং হ্যাবসবার্গ বৈধতাবাদীদের এই ব্যাপারে জোরালো স্বার্থ রয়েছে যে, জার্মানি যেন এমন কোনো জোটনীতি গ্রহণ না করে যা একদিন একটি স্বাধীন জার্মান মাতৃভূমির পুনর্জন্ম ঘটাতে পারে । তারা আজ এই ভূমিকা পালন করছে দক্ষিণ টাইরলের প্রতি ভালোবাসা থেকে নয় – তাদের নীতিগুলো উপকারী হওয়ার চেয়ে বরং ক্ষতিকরই ছিল।

এই প্রদেশের জন্য সহায়ক - কিন্তু কারণ তারা জার্মানি ও ইতালির মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিটি নিয়ে ভীত ।

Machine Translated by Google

মিথ্যা ও অপবাদের প্রতি ঝুঁকে পড়াটা এই ধরনের লোকদের স্বভাব , এবং এ কারণেই তারা শান্তভাবে ও নির্লজ্জভাবে পরিস্থিতি ঘুরিয়ে দিয়ে এমনটা দেখানোর চেষ্টা করতে পেরেছিল যে আমরাই দক্ষিণ টাইরলের সাথে "বিশ্বাসঘাতকতা" করেছি।

এই ভদ্রলোকদের একটি সুস্পষ্ট উত্তর দিতেই হবে । আর তা হলো: টাইরলের সাথে সর্বোপরি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল সেই সব সুস্থ মস্তিষ্কের জার্মানরা, যারা ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সালের মধ্যে সম্মুখ সমরে অংশ নেয়নি এবং দেশের প্রতি নিজেদের কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, যারা এই বছরগুলোতে জাতীয় চেতনা ও জাতীয় প্রতিরোধ শক্তিকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করেনি , যার ফলে দেশটি যুদ্ধ থেকে উত্তরণ ঘটাতে এবং একেবারে শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে পারেনি , তারা সবাই টাইরলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল ।

তৃতীয়ত, নভেম্বর বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকেই, প্রত্যক্ষভাবে অথবা কাপুরুষের মতো তা সহ্য করার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে , দক্ষিণ টাইরলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং এর ফলে দক্ষিণ টাইরলকে রক্ষা করতে পারত এমন একমাত্র অস্ত্রটি ধ্বংস করে দিয়েছে।

চতুর্থত, যারা ভার্সাই ও সেন্ট জার্মেইনের লজ্জাজনক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল, সেই দলগুলো ও তাদের সমর্থকেরা দক্ষিণ টাইরলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।

আর পরিস্থিতিটা এইরকমই , আমার সাহসী ভদ্রমহোদয়গণ, যারা কেবল কথার মাধ্যমেই প্রতিবাদ করেন।

আজ আমি এই শান্ত ও স্থির উপলব্ধি দ্বারা পরিচালিত যে, হারানো অঞ্চলগুলো সংসদীয় বক্তাদের কড়া কথার দ্বারা পুনরুদ্ধার করা যায় না , বরং তা কেবল ধারালো তরবারির দ্বারাই সম্ভব; অন্য কথায়, এমন এক লড়াইয়ের মাধ্যমে যেখানে রক্তপাত ঘটাতে হবে ।

আজ আমি দ্বিধাহীনভাবে বলতে পারি যে, যুদ্ধের মাধ্যমে দক্ষিণ টাইরল পুনরুদ্ধার করা কেবল অসম্ভবই নয় , বরং আমি এই ধরনের পদক্ষেপের বিরুদ্ধেও দৃঢ়ভাবে অবস্থান নিচ্ছি । কারণ আমি নিশ্চিত যে, এই যুদ্ধকে বিজয়ীরূপে পরিসমাপ্তি দেওয়ার জন্য যেভাবে জার্মান জনগণের জাতীয় উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলা এবং তা টিকিয়ে রাখা প্রয়োজন, তা করা অসম্ভব হবে । এর বিপরীতে, আমি বিশ্বাস করি যে, যদি আমরা আমাদের সর্বস্ব ঢেলে দিতে চাই...

জার্মান রক্ত, দুই লক্ষ জার্মানকে মুক্ত করার নামে এমনটা করা একটা অপরাধ হবে , যখন সত্তর লক্ষেরও বেশি জার্মান বিদেশি শাসনের অধীনে ভুগছে এবং জার্মান জাতির জীবনরেখা আফ্রিকান নিগ্রোদের খেলার মাঠে পরিণত হয়েছে ।

যদি জার্মান জাতিকে এমন এক পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে হয় যা তাকে ইউরোপের মানচিত্র থেকে মুছে ফেলার হুমকি দিচ্ছে, তবে সে যুদ্ধ-পূর্ববর্তী সময়ের ভুলের পুনরাবৃত্তি করে সমগ্র বিশ্বকে তার শত্রু বানাতে পারে না। বরং তাকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তার সবচেয়ে বিপজ্জনক শত্রু কে , যাতে সে তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিজের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করতে পারে। আর এই লড়াইয়ে বিজয় আনতে যদি অন্য ক্ষেত্রে ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন হয় , তবুও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের নিন্দা করবে না । তারা সেই দুর্ভোগ ও ভয়ের কথা বিবেচনা করবে যা আমাদের এমন একটি তিক্ত সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছিল, এবং এই বিবেচনার আলোকেই তারা আমাদের বিজয়ের মহিমা আরও স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে ।

আমি আবারও বলতে চাই যে, আমাদের সর্বদা এই মৌলিক নীতি দ্বারা পরিচালিত হতে হবে যে, হারানো প্রদেশগুলো পুনরুদ্ধারের পূর্বশর্ত হলো পিতৃভূমির রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও শক্তি পুনরুদ্ধার ।

সর্বপ্রথম যে কাজটি অবশ্যই সম্পন্ন করতে হবে তা হলো এই স্বাধীনতাকে সম্ভব করে তোলা এবং জোট গঠনের এক বিচক্ষণ নীতির মাধ্যমে তা সুরক্ষিত করা , যার জন্য আমাদের জনবিষয়াদির বলিষ্ঠ ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য ।

কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের, অর্থাৎ জাতীয় সমাজতন্ত্রীদের, অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে যেন আমরা আমাদের সেইসব গর্জনকারী বুর্জোয়া দেশপ্রেমিকদের দ্বারা প্রতারিত না হই, যারা ইহুদিদের কাছ থেকে নির্দেশনা গ্রহণ করে।
আসন্ন সংগ্রামের প্রস্তুতি নেওয়ার পরিবর্তে আমাদের আন্দোলন যদি কেবল মৌখিক প্রতিবাদে লিপ্ত থাকে, তবে তা একটি বিপর্যয় হবে ।

নিবেলুঙ্গেন এবং হ্যাবসবার্গ সাম্রাজ্যের ক্ষয়িষ্ণু কাঠামোর মধ্যে মৈত্রী স্থাপনের উদ্ভট ধারণা জার্মানির সর্বনাশ ডেকে এনেছিল । আজকের পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত বিষয়গুলো মোকাবেলায় এক উদ্ভট ভাবপ্রবণতাই হবে আমাদের পুনর্জন্মকে অগণিত বছরের জন্য বিলম্বিত করার সর্বোত্তম উপায়।

* * *

Machine Translated by Google

আমার উত্থাপিত তিনটি প্রশ্ন প্রসঙ্গে যে আপত্তিগুলো উঠতে পারে , তার সংক্ষেপে জবাব আমাকে এখানে দিতে হবে ।

১. বর্তমান জার্মানির সাথে কি আদৌ কোনো জোট গঠন করা সম্ভব , যার দুর্বলতা হলো সবকিছু কি পুরোপুরি দৃশ্যমান?
২. আমাদের প্রাক্তন শত্রুরা কি জার্মানির প্রতি তাদের মনোভাব পরিবর্তন করতে পারে?
৩. অন্যান্য জাতির উপর ইহুদিদের প্রভাব কি তাদের নিজেদের স্বার্থ সম্পর্কে জ্ঞানের চেয়ে বেশি নয়, এবং এই প্রভাব কি সকল সৎ উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দেবে না?

আমার মনে হয় , আমি প্রথম বিষয়ের দুটি দিকের মধ্যে প্রথমটি নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা করেছি। অবশ্যই, কেউই বর্তমান জার্মানির সাথে জোটবদ্ধ হবে না। বিশ্বের কোনো শক্তিই এমন একটি রাষ্ট্রের সাথে তার ভাগ্যকে যুক্ত করবে না, যার সরকার আস্থার সামান্যতম কারণও জোগান দেয় না। জনমতের হতাশাজনক অবস্থার কথা উল্লেখ করে সরকারের আচরণকে ব্যাখ্যা করার এবং এর মাধ্যমে তাকে ন্যায্য প্রমাণ করার জন্য আমাদের অনেক স্বদেশীর প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে , আমি এই বিষয়গুলোকে দেখার এই পদ্ধতির তীব্র বিরোধিতা করছি ।

বিগত ছয় বছরে আমাদের জাতি যে চারিত্রিক দুর্বলতা দেখিয়েছে তা অত্যন্ত হতাশাজনক। আমাদের জাতির সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজনগুলোর প্রতি এটি যে উদাসীনতা দেখিয়েছে, তা সত্যিই হতাশার কারণ হতে পারে । এর কাপুরুষতা প্রায়শই প্রতিশোধের জন্য আর্তনাদ করে । কিন্তু আমাদের কখনোই ভোলা উচিত নয় যে, আমরা এমন মানুষদের কথা বলছি, যারা কয়েক বছর আগে বিশ্বকে সর্বোত্তম মানবিক গুণাবলীর এক প্রশংসনীয় উদাহরণ দিয়েছিল। ১৯১৪ সালের আগস্টের প্রথম দিনগুলো থেকে শুরু করে জাতিসমূহের মধ্যকার বিশাল সংগ্রামের শেষ পর্যন্ত, বিশ্বের কোনো জাতিই আজকের এই মানুষদের চেয়ে মানবিক সাহস, দৃঢ়তা এবং ধৈর্যশীলতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ স্থাপন করতে পারেনি ।

এতটাই হতাশ ও ভগ্নহৃদয়। আমাদের জাতির মধ্যে চরিত্রের যে বর্তমান অভাব, তা যে এর সাধারণ চিত্র, এ নিয়ে তর্ক করার সাহস কারও হবে না। আজ আমাদের নিজেদের মধ্যে ও চারপাশে আমরা যা অনুভব করছি, তা কেবল ১৯১৮ সালের ৯ই নভেম্বর সংঘটিত সেই চরম রাষ্ট্রদ্রোহিতার দুঃখজনক ও হতাশাজনক পরিণতির প্রভাব থেকেই উদ্ভূত। আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে আজ কবির কথা আরও বেশি সত্য: মন্দ কেবল মন্দেরই জন্ম দিতে পারে । কিন্তু এই সময়েও, আমাদের জাতির মধ্যে যে গুণগুলো মৌলিকভাবে সুস্থ, সেগুলো পুরোপুরি বিলীন হয়ে যায়নি। সেগুলো জাতীয় বিবেকের গভীরে ঘুমিয়ে আছে, এবং কখনও কখনও সেই মেঘাচ্ছন্ন আকাশে আমরা কিছু গুণকে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো দেখতে পাই, যেগুলোকে জার্মানি একদিন পুনর্জন্মের প্রথম চিহ্ন হিসেবে স্মরণ করবে। প্রায়শই আমরা দেখি তরুণ জার্মানরা একত্রিত হয়ে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করছে , যেমনটা তারা করেছিল ১৯১৪ সালে, যখন তারা স্বেচ্ছায় তাদের প্রিয় পিতৃভূমির বেদিতে নিজেদের উৎসর্গ করেছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের কাজে পুনরায় নিযুক্ত হয়েছে, উদ্যম ও আবেগের সাথে, যেন বিপ্লব তাদের কখনও প্রভাবিতই করেনি। কামার তার নেহাই আবার ফিরে পেয়েছে। কৃষক তার লাঙল অনুসরণ করছে। বিজ্ঞানী তাঁর গবেষণাগারে আছেন।

এবং প্রত্যেকে আবারও আগের মতোই একই নিষ্ঠার সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে।

শত্রুদের হাতে ভোগান্তি এখন আর আগের মতো উপহাসের বিষয় নয় , বরং তা তিক্ততা ও ক্রোধের সাথে গৃহীত হয়েছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে মানুষের মনোভাবের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে ।

এই বিবর্তন এখনও আমাদের জাতির রাজনৈতিক শক্তি ও স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য একটি সচেতন অভিপ্রায় ও আন্দোলনের রূপ নেয়নি ; কিন্তু এর জন্য দায়ী সেইসব চরম অযোগ্য ব্যক্তিরা, যাদের শাসনকার্যের কোনো সহজাত প্রতিভা ছিল না, অথচ যারা ১৯১৮ সাল থেকে আমাদের জাতিকে শাসন করে একে ধ্বংসের পথে নিয়ে গেছে।

হ্যাঁ। আজ যদি কেউ আমাদের জাতিকে অভিযুক্ত করে, তবে তাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত: কী করা হচ্ছে? একে সাহায্য করতে? সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলোর প্রতি জনগণের দুর্বল সমর্থন সম্পর্কে আমরা কী বলব ? এটা কি সত্যি নয় যে সরকারের অস্তিত্ব প্রায় নেই বললেই চলে? এর প্রাপ্ত এই দুর্বল সমর্থনকে কি আমাদের জাতির প্রাণশক্তির অভাবের লক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে, নাকি এটি বরং এই মূল্যবান সম্পদটি পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলোর চরম অপর্যাপ্ততার প্রমাণ? জাতির মধ্যে আত্মবিশ্বাসের গর্বিত চেতনা, মহৎ পৌরুষ এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গত অসহযোগের চেতনা জাগিয়ে তুলতে আমাদের সরকার কী করেছে?

Machine Translated by Google

১৯১৯ সালে, যখন জার্মান জনগণের উপর শান্তিচুক্তি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তখন এই আশা করার কারণ ছিল যে, লাগামহীন নিপীড়নের এই দলিলটি জার্মানির স্বাধীনতার আর্তনাদকে আরও জোরালো করতে সাহায্য করবে। শান্তিচুক্তিগুলো, যা একটি জাতির উপর চাবুকের আঘাতের মতো এসে পড়া নানা দাবি নির্ধারণ করে দেয়, প্রায়শই ভবিষ্যতের পুনর্জন্মের সংকেত হয়ে ওঠে।

ভার্সাই চুক্তিটি কী কী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারতো ?

একটি ইচ্ছুক সরকারের হাতে , অন্তহীন ব্ল্যাকমেল ও লজ্জাজনক অপমানের এই হাতিয়ারটি কীভাবে জাতীয় অনুভূতিকে তার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে দিতে ব্যবহৃত হতে পারে ? কীভাবে একটি সুপরিচালিত প্রচার ব্যবস্থা এই চুক্তির পাশবিক নিষ্ঠুরতাকে কাজে লাগিয়ে জনগণের উদাসীনতাকে ক্ষোভে এবং সেই ক্ষোভকে নির্ভীক প্রতিরোধের চেতনায় রূপান্তরিত করতে পারে ?

এই চুক্তির প্রতিটি ধারা জার্মান জনগণের হৃদয়ে ও মনে খোদাই হয়ে যেতে পারত এবং সেখানে তা জ্বলতে থাকত, যতক্ষণ না ষাট মিলিয়ন নারী-পুরুষের আত্মা ক্রোধ ও লজ্জায় জ্বলে উঠত; চুল্লি থেকে আগুনের স্রোত বেরিয়ে আসত, এবং তা থেকে ইস্পাতের তরবারির মতো একটি সম্মিলিত সংকল্প গড়ে উঠত। তখন জনগণ একযোগে চিৎকার করে উঠত : "আবার অস্ত্র ধরো!"

হ্যাঁ। এই ধরনের একটি চুক্তি এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারত। এর লাগামহীন দমনপীড়ন এবং দুঃসাহসিক দাবিগুলো ছিল জাতির নিস্তেজ মনোবলকে জাগিয়ে তুলতে ও প্রাণশক্তি ফিরিয়ে আনতে এক নিখুঁত প্রচার অস্ত্র।

শিশুদের বই থেকে শুরু করে দেশের শেষ সংবাদপত্র পর্যন্ত, প্রতিটি থিয়েটার ও সিনেমায়, প্রতিটি পোস্টারের খুঁটিতে এবং বেড়ার প্রতিটি খালি জায়গা এই মহান লক্ষ্যের সেবায় ব্যবহৃত হওয়া উচিত, যতক্ষণ না আমাদের দেশপ্রেমিক সংগঠনগুলোর আজ স্বর্গের দিকে উদ্যত সেই ভীরু 'হে ঈশ্বর, আমাদের রক্ষা করো' ধ্বনিটি একটি আকুল প্রার্থনায় রূপান্তরিত হয় : "হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর , সময় এলে আমাদের অস্ত্রকে আশীর্বাদ করো। ন্যায়বিচার করো , কারণ তুমি সর্বদাই ন্যায়বিচারক। এখনই বিচার করো আমরা স্বাধীনতার যোগ্য কি না। হে ঈশ্বর, আমাদের সংগ্রামকে আশীর্বাদ করো।"

সমস্ত সম্ভাবনা উপেক্ষা করা হয়েছিল এবং কিছুই করা হয়নি।

আমাদের দেশ যেমনটা হওয়া উচিত ছিল বা যেমনটা হতে পারত, তেমনটা না হওয়ায় এখন আর কে অবাক হবে ? বাকি বিশ্ব আমাদেরকে চাকর অথবা এমন একটি ভালো কুকুর হিসেবে দেখে, যে শুধু চাটবে।
মার খাওয়ার পর তার প্রভুর হাত।

অবশ্যই, অন্যান্য জাতির সাথে জোট গঠনের সম্ভাবনা আমাদের নিজেদের জনগণের উদাসীনতার কারণে ব্যাহত হয় , কিন্তু তার চেয়েও বেশি ব্যাহত হয় আমাদের সরকারগুলোর কারণে। তারা এতটাই দুর্নীতিগ্রস্ত ছিল এবং এখনও আছে যে, আট বছরের অবর্ণনীয় নিপীড়নের পর এখন স্বাধীনতার জন্য কেবল এক ক্ষীণ আকাঙ্ক্ষাই অবশিষ্ট রয়েছে।

জোট রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে হলে আমাদের জাতিকে তার মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে হবে।
অন্যান্য জাতিসমূহের মধ্যে, এবং অবশ্যই একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সরকার থাকতে হবে যা অন্য রাষ্ট্রের সেবায় নিয়োজিত কর্মী এবং নিজ জাতির প্রতি স্বৈরাচারী নয় , বরং জাতির ইচ্ছার ঘোষক।

যদি আমাদের দেশে এমন একটি সরকার থাকতো যারা এটিকে তাদের ব্রত বলে মনে করতো, তাহলে ছয় বছর পার হওয়ার আগেই রাইখের একটি সাহসী পররাষ্ট্রনীতি জনগণের সমর্থন পেত, যার ফলে তাদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আরও শক্তিশালী ও টেকসই হতো।

* * *

তৃতীয় আপত্তিটি হলো প্রাক্তন শত্রুদের মিত্রতে পরিণত করার অসুবিধা। এই আপত্তির উত্তর নিম্নরূপভাবে দেওয়া যেতে পারে : যুদ্ধকালীন প্রচারণার কারণে অন্যান্য দেশে যে সাধারণ জার্মান-

বিরোধী মানসিকতা তৈরি হয়েছে, তা ততক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে যতক্ষণ না জার্মানদের মধ্যে জাতীয় চেতনার পুনরুজ্জীবন ঘটে , যাতে জার্মান রাইখ আবারও এমন একটি রাষ্ট্রে পরিণত হয় যা ইউরোপীয় রাজনীতির দাবা খেলায় তার ভূমিকা পালনে সক্ষম এবং যার সাথে অন্যরাও খেলতে পারে। কেবল তখনই সরকার ও জনগণ জোটবদ্ধ রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সম্ভাবনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে পারবে, এবং আমাদের স্বার্থের সাথে মিলে যায় এমন কোনো শক্তি তাদের নিজ দেশে জনমত পরিবর্তনের জন্য একটি প্রচার ব্যবস্থা চালু করার কথা ভাবতে পারবে। অবশ্যই, এর জন্য সময় লাগবে।

Machine Translated by Google

কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনের জন্য বেশ কয়েক বছরের অধ্যবসায়ী এবং দক্ষতার সাথে পরিচালিত কাজের প্রয়োজন। যেহেতু একটি দেশের জনমত পরিবর্তন করতে দীর্ঘ সময় লাগে, তাই এই ধরনের কোনো উদ্যোগে হাত দেওয়ার আগে শান্তভাবে বিচার-বিবেচনা করা অপরিহার্য। এর অর্থ হলো , এই ধরনের কাজ ততক্ষণ শুরু করা উচিত নয়, যতক্ষণ না কেউ পুরোপুরি নিশ্চিত হন যে বিষয়টি সার্থক এবং এটি এমন ফলাফল দেবে যা ভবিষ্যতে মূল্যবান হবে। একজন কমবেশি মেধাবী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর অন্তঃসারশূন্য তোষামোদকে ভিত্তি করে জাতির মতামত ও অনুভূতি পরিবর্তনের চেষ্টা করা যায় না , বরং কেবল তখনই তা করা সম্ভব , যখন এই নতুন দিকনির্দেশনা সত্যিই কার্যকর হবে তার একটি সুনির্দিষ্ট নিশ্চয়তা থাকে। অন্যথায়, একটি নির্দিষ্ট দেশের জনমত সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিতে পড়ে যাবে। পরবর্তীতে কোনো নির্দিষ্ট দেশের সাথে জোটবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনার জন্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য নিশ্চয়তা কোনো একক সরকার সদস্যের বাকপটু বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ নয় , বরং সমগ্র সরকারের পক্ষ থেকে একটি সিদ্ধান্তমূলক ও বাস্তবসম্মত নীতির দৃশ্যমান স্থিতিশীলতা এবং সেই দেশের জনমতের দ্বারা এই নীতির প্রতি প্রদত্ত সমর্থন। সরকার তার প্রচেষ্টাগুলো ব্যাখ্যা করতে এবং সেগুলোর জন্য জনসমর্থন নিশ্চিত করতে যত বেশি সক্রিয় প্রচার অভিযান চালাবে এবং জনমত সরকারের নীতিগুলোর প্রতি যত বেশি অনুকূলভাবে সাড়া দেবে , এই নীতির প্রতি জনগণের আস্থা তত দৃঢ় হবে।

সুতরাং, আমাদের মতো পরিস্থিতিতে থাকা একটি দেশকে সম্ভাব্য মিত্র হিসেবে বিবেচনা করা হবে, যদি জনমত সরকারের নীতিকে সমর্থন করে এবং তারা দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করার একই রকম উৎসাহী সংকল্পে ঐক্যবদ্ধ থাকে। এই পরিস্থিতি অবশ্যই হতে হবে

অন্যান্য দেশে জনমত পরিবর্তনের কোনো প্রচেষ্টা চালানোর আগেই তা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে , যে দেশগুলো তাদের সবচেয়ে মৌলিক স্বার্থ রক্ষার নামে এমন কারো সাথে হাতে হাত মেলাতে ইচ্ছুক , যিনি সেই স্বার্থ রক্ষায় নিজেদের ভূমিকা পালন করতে পারেন।

অন্য কথায়, এর মানে হলো তারা জোট গঠনের জন্য প্রস্তুত থাকবে।

তবে, এটি ঘটার জন্য একটি বিষয় অপরিহার্য। যেহেতু একটি দেশের জনমতে আমূল পরিবর্তন আনার কাজে কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়, এবং এর অর্থ কী তা অনেকেই হয়তো সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারেন না , তাই এমন ভুল করাটা বোকামি ও অপরাধমূলক কাজ হবে, যা এই ধরনের পরিবর্তনের বিরোধীদের হাতে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

আপনাকে বুঝতে হবে যে মানুষের পুরোপুরি বুঝতে অনেক সময় লাগে।

সরকারের অনুসৃত অভ্যন্তরীণ লক্ষ্যসমূহ , কারণ কোনো একটি নির্দিষ্ট নীতি বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত প্রস্তুতির চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা যায় না। এমন ক্ষেত্রে, সরকারকে জনগণের অন্ধ বিশ্বাস অথবা অধিকতর বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে উন্নত শাসক শ্রেণীর স্বজ্ঞাত প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু যেহেতু অনেকের মধ্যে এই স্বজ্ঞা, রাজনৈতিক বিচক্ষণতা এবং ঘটনাপ্রবাহের গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করার ক্ষমতার অভাব রয়েছে, এবং যেহেতু রাজনৈতিক বিবেচনার কারণে অমুক অমুক দিক কেন বেছে নেওয়া হয়েছে তা প্রকাশ্যে ব্যাখ্যা করা যায় না , তাই বুদ্ধিজীবী মহলের একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক নেতা সর্বদা সেইসব নতুন প্রবণতার বিরোধিতা করবেন, যেগুলোকে সহজে বোঝা না যাওয়ার কারণে পরীক্ষামূলক বলে গণ্য করা যেতে পারে। এই মনোভাবই রক্ষণশীল মহলে উল্লিখিত পদক্ষেপগুলোর বিরুদ্ধে বিরোধিতাকে উস্কে দেয়।

এই কারণে, যারা অন্যান্য জাতির সাথে পারস্পরিক বোঝাপড়ায় বাধা সৃষ্টি করে , তাদের হাতে যেন কোনো অস্ত্র না পড়ে , তা নিশ্চিত করা প্রত্যেকেরই একটি কঠোর কর্তব্য। আমাদের ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে সত্য, যেখানে আমাদের দেশপ্রেমিক সংগঠনগুলোর ভণ্ডামি ও অলীক কল্পনার মোকাবিলা করতে হয়, যারা আড্ডার রাজনীতির কথা বলে। একটি নতুন নৌবাহিনীর দাবি , আমাদের উপনিবেশ পুনরুদ্ধার, ইত্যাদি যে বাস্তবে বাস্তবায়িত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, তা যে কেউ শান্তভাবে ও গুরুত্বের সাথে চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে। প্রতিবাদের এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নিরীহ ও অর্ধ-উন্মাদ ব্যক্তিরা আমাদের ঘোর শত্রুর স্বার্থ রক্ষা করছে, এবং ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে যেভাবে তাদের কল্পনাগুলোকে কাজে লাগানো হচ্ছে, তা জার্মানির জন্য সুবিধাজনক বলে গণ্য করা যায় না।

তারা সমগ্র বিশ্বের বিরুদ্ধে নিষ্ফল বিক্ষোভে তাদের শক্তি অপচয় করে। এই বিক্ষোভগুলো আমাদের স্বার্থের ক্ষতি করে, এবং যারা এতে অংশগ্রহণ করে তারা সেই মৌলিক নীতিটি ভুলে যায় যা সকল সাফল্যের মূল শর্ত। যা-ই করো না কেন, তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে করো। কারণ আমরা ক্রমাগত পাঁচ-দশটি দেশের বিরুদ্ধে গর্জন করছি ,

Machine Translated by Google

আমরা আমাদের সবচেয়ে ভয়ংকর শত্রুর কেন্দ্রস্থলে আঘাত হানার জন্য আমাদের সমস্ত জাতীয় মনোবল ও শারীরিক শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করতে পারি না । আর এর ফলে আমরা এমন একটি জোট গঠনের সুযোগ হারাই, যা এই নির্ণায়ক সংঘাতে আমাদের শক্তিকে আরও বাড়িয়ে তুলত ।

এটিও জাতীয় সমাজতন্ত্রীদের পালন করার একটি কাজ। আমাদের শিখতে হবে।
আমাদের জাতি যেন ছোটখাটো বিষয়ে নয়, বরং মহৎ বিষয়ে মনোনিবেশ করে; গৌণ বিষয়ে যেন নিজেদের শক্তি নিঃশেষ না করে; এবং যেন ভুলে না যায় যে একদিন আমাদের জাতির অস্তিত্বের জন্য লড়াই করতে হবে এবং আমাদের একমাত্র শত্রু হলো সেই শক্তি, যা আমাদের এই অস্তিত্ব কেড়ে নেয়।

আমাদের হয়তো এক গুরুভার বহন করতে হতে পারে । কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আমাদের সবচেয়ে মারাত্মক শত্রুর বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত না করে , যুক্তির কথা না শুনে বাকি বিশ্বকে আজেবাজে কথা বলা যেতে পারে।

তাছাড়া , বাকি বিশ্ব তাদের সাথে কেমন আচরণ করছে, তা নিয়ে জার্মান জনগণের অভিযোগ করার কোনো নৈতিক অধিকার নেই, যতক্ষণ না তারা নিজেরা সেইসব অপরাধীদের জবাবদিহিতার আওতায় আনছে , যারা তাদের নিজেদের দেশকে বিক্রি করে দিয়েছে ও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমরা যদি ইংল্যান্ড ও ইতালির বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী অপমান ও প্রতিবাদে অংশ নিই এবং তারপর আমাদের দেশে সেইসব বদমাশদের অবাধ বিচরণের সুযোগ করে দিই , যারা শত্রুপক্ষের যুদ্ধ প্রচারণায় ইন্ধন জুগিয়েছে, আমাদের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়েছে , আমাদের প্রতিরোধের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে এবং ত্রিশটি রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে রাইখকে বিক্রি করে দিয়েছে, তাহলে আমাদের গুরুত্ব পাওয়ার কোনো আশা আমরা করতে পারি না।

শত্রু তাই করেছে যা প্রত্যাশিত ছিল । এবং তার গৃহীত অবস্থান ও কার্যকলাপ থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত।

যিনি এই দৃষ্টিভঙ্গিতে উপনীত হতে অক্ষম, তাঁকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে যে, ভবিষ্যতে যেকোনো জোট নীতি গ্রহণের ধারণাটি প্রত্যাখ্যান করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই । কারণ, যদি আমরা ইংল্যান্ডের সাথে জোট করতে না পারি , কারণ সে আমাদের উপনিবেশগুলো কেড়ে নিয়েছে; ইতালির সাথে, কারণ সে দক্ষিণ টাইরল দখল করেছে; অথবা পোল্যান্ড বা চেকোস্লোভাকিয়ার সাথেও জোট করতে না পারি, তবে ইউরোপে ফ্রান্সের সাথে জোট করা ছাড়া আর কোনো সম্ভাবনা অবশিষ্ট থাকে না , যে দেশটি অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি আমাদের কাছ থেকে আলসেস-লোরেনও কেড়ে নিয়েছে।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এই শেষ বিকল্পটি জার্মান জাতির স্বার্থের জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে। কিন্তু যদি কেউ এর পক্ষ সমর্থন করে, তবে প্রশ্ন জাগতে পারে যে সেই ব্যক্তি নিছক একজন বোকা, নাকি একজন ধূর্ত গুণ্ডা।

এই কার্যক্রমগুলোর নেতাদের ক্ষেত্রে, আমি মনে করি দ্বিতীয় অনুমানটিই সত্য।
এখন পর্যন্ত আমাদের শত্রু থাকা এবং ভবিষ্যতে যাদের প্রকৃত স্বার্থ আমাদের স্বার্থের সাথে মিলে যাবে, এমন দেশগুলোতে জনমত পরিবর্তন করা কেবল তখনই সম্ভব , যদি আমাদের রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শক্তি এবং আমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সুস্পষ্ট সংকল্প এটা স্পষ্ট করে দেয় যে আমরা একটি মূল্যবান মিত্র হতে পারি। অধিকন্তু, এটা অপরিহার্য যে কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ে আমাদের অযোগ্যতা এবং অপরাধমূলক আচরণ যেন আমাদের প্রাক্তন শত্রুদের সাথে জোট গঠনের পরিকল্পনার বিরোধীদের দ্বারা অপপ্রচারের ভিত্তি না হয়ে ওঠে ।

* * *

তৃতীয় প্রশ্নটির উত্তর আরও অনেক বেশি কঠিন: এটা কি কল্পনা করা যায় যে, যেসব জাতির সাথে আমরা মৈত্রী স্থাপন করতে পারি, তাদের প্রকৃত স্বার্থের প্রতিনিধিরা সেই ইহুদির ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়ন করতে সক্ষম , যে কিনা জাতীয় ও স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর ঘোর শত্রু ?

উদাহরণস্বরূপ, গ্রেট ব্রিটেনের প্রচলিত নীতিগুলো কি ইহুদিদের বিধ্বংসী প্রভাবকে দমন করতে পারবে, নাকি পারবে না?
যেমনটা আমি বলেছি, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুবই কঠিন। এর উত্তর এতগুলো বিষয়ের উপর নির্ভর করে যে, একটি নির্দিষ্ট উত্তর দেওয়া অসম্ভব । তবে, একটি বিষয় নিশ্চিত।

Machine Translated by Google

নিশ্চিত: কোনো নির্দিষ্ট রাষ্ট্রে এবং কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সরকারের ক্ষমতা জনমতে এতটাই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং দেশের স্বার্থে এতটাই সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত থাকতে পারে যে, আন্তর্জাতিক ইহুদি শক্তিগুলো রাজনৈতিকভাবে প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত পদক্ষেপগুলোর বিরুদ্ধে একটি বাস্তব ও কার্যকর বাধা সংগঠিত করতে অক্ষম হবে ।

ইহুদিদের তিনটি প্রধান অস্ত্রের বিরুদ্ধে ফ্যাসিবাদী ইতালি যে সংগ্রাম চালিয়েছে— যার পেছনে এমন গভীর কারণ রয়েছে যা হয়তো সচেতনভাবে বোঝা যায় না (যদিও আমি ব্যক্তিগতভাবে তা বিশ্বাস করি না)—তা- ই সর্বোত্তম প্রমাণ দেয় যে, সকল জাতীয় সীমানা অতিক্রমকারী এই শক্তির বিষদাঁত উন্মোচিত হচ্ছে , যদিও তা পরোক্ষভাবে । ফ্রিম্যাসনরি ও গুপ্ত সংগঠনগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞা, আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের ওপর নিষেধাজ্ঞা , এবং মার্কসবাদের সম্পূর্ণ উৎখাত, এর সাথে রাষ্ট্রের ফ্যাসিবাদী ধারণার ক্রমাগত শক্তিশালীকরণ —এই সবকিছুই ইতালীয় সরকারকে আগামী বহু বছর ধরে ইহুদি হাইড্রার হিসহিসানিকে উপেক্ষা করে ইতালীয় জাতির স্বার্থ অনুসরণ করার সুযোগ দেবে।

ইংল্যান্ডের পরিস্থিতি ততটা অনুকূল নয়। 'সবচেয়ে মুক্ত গণতন্ত্র' হিসেবে পরিচিত এই দেশে ইহুদিরা প্রায় অবাধে তাদের ইচ্ছাকে চাপিয়ে দেয় , তবে পরোক্ষভাবে, জনমতকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে। ইংল্যান্ডে, এর প্রতিরক্ষার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে একটি নিরন্তর সংগ্রাম চলে।
রাষ্ট্রীয় স্বার্থ এবং ইহুদি বিশ্ব আধিপত্যের প্রবক্তারা ।

যুদ্ধের পর এই বৈপরীত্যের তীব্রতা প্রথমবারের মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে , যখন ব্রিটিশ রাজনীতিবিদরা জাপান সমস্যা নিয়ে এক অবস্থান নেন এবং সংবাদমাধ্যম অন্য অবস্থান গ্রহণ করে।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরপরই আমেরিকা ও জাপানের মধ্যে পুরনো পারস্পরিক শত্রুতা
পুনরুজ্জীবিত হতে শুরু করল । অবশ্যই, ইউরোপের বৃহৎ শক্তিগুলো এই নতুন যুদ্ধের হুমকির প্রতি উদাসীন থাকতে পারেনি । ইংল্যান্ডে, আত্মীয়তার বন্ধন থাকা সত্ত্বেও, আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ও রাজনীতির সকল ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব নিয়ে প্রচুর ঈর্ষা ও উদ্বেগ ছিল । যা পূর্বে একটি উপনিবেশ ছিল, তা এখন এক কন্যাতে পরিণত হলো ।

মহামাতা যেন বিশ্বের নতুন কর্ত্রী হয়ে উঠছিলেন । এটা সহজেই বোঝা যায় যে আজ ইংল্যান্ডের উচিত তার অতীতের মিত্রতাগুলো পুনর্বিবেচনা করা এবং ব্রিটিশ রাজনীতিবিদরা আসন্ন সেই মুহূর্তের বিপদের দিকে উদ্বেগের সাথে তাকিয়ে আছেন , যখন ' সমুদ্র শাসন করবে ব্রিটেন'—এর পরিবর্তে দেখা যাবে যে 'সমুদ্রগুলো যুক্তরাষ্ট্রের' হয়ে গেছে।

বিশাল উত্তর আমেরিকান রাষ্ট্রটি, তার বিপুল সম্পদ নিয়ে, চারিদিক থেকে ঘেরাও করা জার্মান রাইখের চেয়ে অনেক বেশি অভেদ্য । যেদিন অবশেষে জাতিসমূহের ভাগ্য নির্ধারিত হবে, সেদিন একা দাঁড়ালে ইংল্যান্ডের পতন ঘটবে । তাই, সে স্বেচ্ছায় হলুদ জাতির একজন প্রতিনিধির দিকে হাত বাড়ায় এবং এমন একটি জোটে প্রবেশ করে যা, জাতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে, হয়তো ক্ষমার অযোগ্য; কিন্তু রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে, আমেরিকান মহাদেশে ঘটে চলা বাধ্যবাধকতামূলক ঘটনাবলীর মুখে ব্রিটেনের বিশ্ব অবস্থানকে শক্তিশালী করার এটাই একমাত্র উপায় ।

ইউরোপীয় যুদ্ধক্ষেত্রে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করা সত্ত্বেও, ব্রিটিশ সরকার তার এশীয় অংশীদারের সাথে কোনো জোটে প্রবেশ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং সমগ্র ইহুদি গণমাধ্যম জাপানের সাথে জোটের ধারণার বিরোধিতা করেছিল।

আমরা কীভাবে এই ঘটনাটি ব্যাখ্যা করতে পারি যে, ১৯১৮ সাল পর্যন্ত ইহুদি সংবাদমাধ্যম জার্মান রাইখের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারের নীতি প্রচার করে আসছিল , এবং হঠাৎ করেই তারা নিজেদের পথে চলতে শুরু করে ও সরকারের প্রতি আনুগত্যহীনতা প্রদর্শন করে?

জার্মানিকে ধ্বংস করা ব্রিটেনের স্বার্থে ছিল না , বরং প্রধানত ইহুদিদের স্বার্থে ছিল । এবং আজ জাপানের ধ্বংস ব্রিটেনের রাজনৈতিক স্বার্থ ততটা পূরণ করবে না যতটা...
একটি ইহুদি বিশ্ব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের নেতাদের সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য। ইংল্যান্ড যখন বিশ্বে তার অবস্থান বজায় রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে , তখন ইহুদিরা তা বিজয়ের জন্য আগ্রাসী পরিকল্পনা সংগঠিত করে।

তিনি বর্তমান ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোকে তার হাতের নমনীয় হাতিয়ার হিসেবে দেখেন , হয় পরোক্ষভাবে তথাকথিত পশ্চিমা গণতন্ত্রের শক্তির মাধ্যমে , অথবা রুশ বলশেভিজমের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ আধিপত্যের আকারে। কিন্তু তিনি কেবল পুরোনো বিশ্বকেই তার ফাঁদে আটকে রাখেননি; একই পরিণতি নতুন বিশ্বের জন্যও হুমকিস্বরূপ। ইহুদিরা শেয়ার বাজারে আমেরিকার অর্থব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। এক বছর পর

Machine Translated by Google

ইহুদিরা ১২ কোটি মানুষের একটি জাতির উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ বাড়াচ্ছে। কিন্তু এর একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ এখনও সম্পূর্ণ স্বাধীন রয়েছে , এবং এটাই ইহুদিদের তিক্ততার কারণ ।

ইহুদিরা জনমতকে প্রভাবিত করতে এবং তা ব্যবহার করতে চমৎকার দক্ষতা প্রদর্শন করে। নিজের ভবিষ্যতের জন্য লড়াই করার একটি হাতিয়ার হিসেবে।

ইহুদিদের মহান নেতারা নিশ্চিত যে সেই দিন আসন্ন যখন প্রদত্ত আদেশ পুরাতন নিয়ম পূর্ণ হবে এবং ইহুদিরা পৃথিবীর অন্যান্য জাতিকে গ্রাস করবে।

রাষ্ট্রহীন দেশগুলোর এই বিশাল জনসমুদ্রের মাঝে, যা ইহুদি উপনিবেশে পরিণত হবে , একটিমাত্র স্বাধীন রাষ্ট্র শেষ মুহূর্তে সমগ্র কাঠামোটিকে ধ্বংস করে দিতে পারে । এর কারণ হলো, একটি বিশ্বব্যবস্থা হিসেবে বলশেভিজমের অস্তিত্ব থাকতে পারে না, যদি না তা সমগ্র পৃথিবীকে অন্তর্ভুক্ত করে। যদি একটিমাত্র রাষ্ট্র তার জাতীয় শক্তি ও মহিমা ধরে রাখতে পারে, তবে ইহুদি সাম্রাজ্য, অন্য যেকোনো স্বৈরাচারের মতোই , জাতীয় আদর্শের শক্তির কাছে পতন হতে বাধ্য হবে ।

পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার হাজার বছরের অভিজ্ঞতার ফলে ইহুদিরা খুব ভালো করেই জানে যে , জাতিগত বিকৃতির প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তারা ইউরোপীয় দেশগুলোর অস্তিত্বকে দুর্বল করে দিতে পারে, কিন্তু জাপানের মতো একটি এশীয় জাতি-রাষ্ট্রে একই কাজ করা তাদের পক্ষে কঠিন হবে। আজ তারা জার্মান ও ইংরেজ, আমেরিকান ও ফরাসিদের অনুকরণ করতে পারে, কিন্তু হলুদ এশীয়দের কাছাকাছি যাওয়ার কোনো উপায় তাদের নেই। তাই, তারা অন্যান্য রাষ্ট্রকে তাদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে জাপানি জাতি-রাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে চায় , যাতে তাদের থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়।

এক বিপজ্জনক শত্রু, যা শেষ জাতি-রাষ্ট্রটির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সেই নিয়ন্ত্রণকে এমন এক স্বৈরাচারে রূপান্তরিত করে যা অসহায়দের ওপর নিপীড়ন চালায়।

ভবিষ্যতে নিজের সহস্র বছরের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার সময় তিনি বর্তমান জাপানি জাতি- রাষ্ট্রকে দেখতে চান না , এবং তাই নিজের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আগে এটিকে ধ্বংস করতে চান ।

এই কারণেই তিনি আজ অন্যান্য জাতির মধ্যে জাপানের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়াতে ঠিক ততটাই ব্যস্ত , যতটা তিনি জার্মানির বিরুদ্ধে ছিলেন। সুতরাং এমনটা হতে পারে যে, ব্রিটিশ রাজনীতিবিদরা যখন জাপানের সঙ্গে মৈত্রীর ওপর ভিত্তি করে তাদের নীতি প্রণয়নের চেষ্টা চালিয়ে যাবেন, ঠিক সেই সময়েই গ্রেট ব্রিটেনের ইহুদি সংবাদমাধ্যম সেই মিত্রের বিরুদ্ধে একটি বিদ্বেষী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবে এবং তাকে ধ্বংস করার জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি নেবে; আর এটাকে গণতন্ত্রের বিজয় বলে ভান করে চিৎকার করতে থাকবে, " জাপানি সামরিকবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক !"

এই কারণেই আজ ইংল্যান্ডে ইহুদিরা রাষ্ট্রের নীতির বিরোধিতা করে। এবং এই কারণেই একদিন এই দেশেও ইহুদি বিশ্ব হুমকির বিরুদ্ধে লড়াই শুরু হবে।

এখানেও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সামনে এক বিশাল কাজ রয়েছে ।

এটি অবশ্যই আমাদের জাতির চোখ বিদেশী রাষ্ট্রগুলোর কাছে খুলে দেবে এবং প্রতিনিয়ত আমাদের মনে করিয়ে দেবে যে, আজ বিশ্বকে হুমকি দিচ্ছে এমন প্রকৃত শত্রু কে । আর্যদের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রচারের পরিবর্তে— যারা প্রায় সর্বতোভাবে আমাদের থেকে ভিন্ন , কিন্তু যাদের সাথে আমরা রক্তের বন্ধন এবং এক অভিন্ন সভ্যতার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য দ্বারা সংযুক্ত — আমাদের অবশ্যই মানবতার সেই মারাত্মক শত্রুর বিরুদ্ধে সাধারণ ক্ষোভ জাগিয়ে তোলার কাজে নিজেদের উৎসর্গ করতে হবে, যে আমাদের সকল দুঃখকষ্টের প্রকৃত হোতা ।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে, অন্তত আমাদের দেশে এই মারাত্মক শত্রুকে যেন স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম যেন অন্যান্য জাতির জন্য এক নতুন ও উন্নততর যুগের পথপ্রদর্শক আলোকবর্তিকা হয়ে ওঠে, আর অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে আর্য মানবতার মুক্তির পথ দেখায়।

যুক্তি হোক আমাদের পথপ্রদর্শক, এবং ইচ্ছাশক্তি আমাদের শক্তি। আমাদের কর্ম সম্পাদনের পবিত্র কর্তব্য আমাদের অধ্যবসায় ও দৃঢ়তা দিক ; এবং আমাদের বিশ্বাসই হোক আমাদের পরম রক্ষাকবচ।

Machine Translated by Google

অধ্যায় ১৪

পূর্ব ইউরোপে জার্মান নীতি

দুটি বিষয় আমাকে রাশিয়ার সাপেক্ষে জার্মানির অবস্থান নিয়ে একটি বিশেষ বিশ্লেষণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। সেগুলো হলো:

(1) নীতির দিক নির্ধারণের ক্ষেত্রে এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে প্রমাণিত হতে পারে।
জার্মানির সীমান্ত,
(2) এই প্রসঙ্গে যে সমস্যার সমাধান করতে হবে তা তরুণ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের স্বচ্ছ চিন্তাভাবনা এবং সঠিক পথে কাজ করার রাজনৈতিক দক্ষতা পরীক্ষার একটি কষ্টিপাথরও বটে।

আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, এই দ্বিতীয় কারণটি প্রায়শই আমার জন্য প্রচণ্ড উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের আন্দোলনের সদস্যদের এমন কোনো মহল থেকে নেওয়া হয় না যারা জনবিষয়াদিতে স্বভাবতই উদাসীন থাকে, বরং প্রধানত এমন মানুষদের মধ্য থেকে নেওয়া হয় যারা কমবেশি চরমপন্থী মতাদর্শ পোষণ করেন। যেহেতু বিষয়টি এমনই, তাই এটা স্বাভাবিক যে পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ে তাদের বোঝাপড়া সেইসব মহলের কুসংস্কার এবং অপর্যাপ্ত জ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত হবে, যেগুলোর সঙ্গে তারা পূর্বে রাজনৈতিক ও আদর্শগতভাবে যুক্ত ছিলেন। আর এটা শুধু বামপন্থী মহল থেকে আমাদের কাছে আসা মানুষদের ক্ষেত্রেই সত্য নয়। বরং , এই বিষয়গুলোতে তারা যতই বিধ্বংসী প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকুক না কেন, বহু ক্ষেত্রেই তা তাদের মধ্যে তখনও বিদ্যমান সুস্থ ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অবশিষ্টাংশ দ্বারা অন্তত আংশিকভাবে ভারসাম্যপূর্ণ ছিল। এই ধরনের ক্ষেত্রে, পূর্ববর্তী প্রভাবগুলোকে আরও ভালো শিক্ষা দিয়ে প্রতিস্থাপন করা , আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি এবং অন্যান্য সুস্থ প্রবৃত্তিকে মূল্যবান সদ্গুণে রূপান্তরিত করাই ছিল কেবল প্রয়োজন।

অন্যদিকে, এমন মানুষদের মনে নির্দিষ্ট কিছু রাজনৈতিক ধারণা গেঁথে দেওয়া অনেক বেশি কঠিন, যাদের পূর্ববর্তী রাজনৈতিক শিক্ষাও তাদের প্রাপ্ত শিক্ষার মতোই অর্থহীন ও অযৌক্তিক ছিল।
বামপন্থার সমর্থকরা পায়। এই লোকেরা একটি বিমূর্ত এবং সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠ তত্ত্বের সেবায় তাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির শেষ চিহ্নটুকুও উৎসর্গ করেছে। আমাদের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর এই প্রতিনিধিদের মধ্যে তাদের নিজেদের স্বার্থ এবং অন্যান্য দেশের সাপেক্ষে তাদের জাতির স্বার্থ সম্পর্কে একটি বাস্তবসম্মত ও যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি জাগিয়ে তোলা বিশেষভাবে কঠিন। তাদের মন কুসংস্কার এবং অযৌক্তিক ধারণার এক ভারী বোঝায় ভারাক্রান্ত ; তারা আত্মরক্ষার সমস্ত প্রবৃত্তি হারিয়ে ফেলেছে বা প্রত্যাখ্যান করেছে। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে এই লোকদের সাথে একটি কঠিন লড়াই করতে হবে। এবং এই লড়াই আরও কঠিন , কারণ যদিও তারা প্রায়শই

তারা চূড়ান্ত অযোগ্য, এতটাই অহংকারী যে সামান্যতম কারণ ছাড়াই সাধারণ, সঠিক চিন্তার মানুষদের তুচ্ছ- তাচ্ছিল্য করে। এই দাম্ভিক অহংকারীরা, যারা অন্যদের চেয়ে বেশি জানার ভান করে , তারা শান্ত ও স্থিরভাবে কোনো সমস্যা বিশ্লেষণ করতে এবং তার ভালো-মন্দ বিচার করতে সম্পূর্ণ অক্ষম, যা পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত।

এই চক্রগুলোই আজ আমাদের পররাষ্ট্রনীতিকে সবচেয়ে ভয়াবহ দিকে চালিত করতে এবং জাতির প্রকৃত স্বার্থ রক্ষার কাজ থেকে বিচ্যুত করতে শুরু করেছে। যেহেতু তারা তাদের উদ্ভট মতাদর্শ চরিতার্থ করার জন্যই এসব করে, আমার মনে হলো ...

আমাদের পররাষ্ট্রনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, অর্থাৎ রাশিয়ার প্রতি আমাদের অবস্থান, আমার সহকর্মীদের কাছে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করার সর্বোচ্চ দায়িত্ব আমার উপর বর্তায়। একটি সাধারণ উপলব্ধির জন্য যতটুকু গভীরতার প্রয়োজন এবং এই বইয়ের পরিধি যতটুকু অনুমতি দেয়, আমি ততটুকুই এই বিষয়টি আলোচনা করব। আমি নিম্নলিখিত অনুমানটি ধরে নিয়ে শুরু করব :

যখন আমরা পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে কথা বলি, তখন আমরা সরকারের সেই ক্ষেত্রকে বোঝাই যার লক্ষ্য হলো বাকি বিশ্বের সাথে একটি জাতির সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার বিষয়াদি পরিচালনা করা। মৌলিক নীতিসমূহ,

Machine Translated by Google

এই বিষয়গুলির ব্যবস্থাপনায় যা অবশ্যই পালনীয় , তা সুনির্দিষ্ট তথ্যের উপর ভিত্তি করে হতে হবে। অধিকন্তু , জাতীয় সমাজতন্ত্রী হিসেবে, একটি জাতি-রাষ্ট্র কর্তৃক বৈদেশিক নীতি পরিচালনার বিষয়ে আমাদের নিম্নলিখিত স্বতঃসিদ্ধটি অবশ্যই মেনে নিতে হবে:

একটি জাতি-রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিতে সর্বাগ্রে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে
এই রাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্ত জাতির অস্তিত্ব নিশ্চিত করার বাধ্যবাধকতা । এবং এটি অবশ্যই হতে হবে
একদিকে জনসংখ্যা ও তার বৃদ্ধির হার এবং অন্যদিকে তাদের বসবাসকারী ভূখণ্ডের আয়তন ও সম্পদের মধ্যে একটি স্বাস্থ্যকর ও স্বাভাবিক অনুপাত স্থাপনের মাধ্যমে এটি অর্জিত হয়। এই ভারসাম্য অবশ্যই জাতির গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

যখন আমি স্বাস্থ্যকর অনুপাতের কথা বলি, তখন আমি এমন একটি পরিস্থিতির কথা বোঝাই যেখানে একটি জাতির অস্তিত্ব তার নিজস্ব ভূখণ্ড এবং ভূগর্ভস্থ সম্পদের দ্বারা নিশ্চিত হয়। যে কোনো পরিস্থিতি যা এই শর্ত পূরণে ব্যর্থ হয়, তা অস্বাস্থ্যকর, যদিও তা শত শত বছর, এমনকি হাজার বছর ধরেও টিকে থাকতে পারে । শীঘ্রই হোক বা বিলম্বে, এই অসামঞ্জস্য অনিবার্যভাবে উক্ত জাতিটির পতন, এমনকি ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে ।

শুধুমাত্র যথেষ্ট বড় একটি বাসস্থানই একটি জাতির স্বাধীন অস্তিত্ব নিশ্চিত করতে পারে ।

একটি জাতীয় জনসংখ্যাকে বসতি স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ভূখণ্ড সম্প্রসারণের মাত্রা বর্তমান জরুরি প্রয়োজন, এমনকি জনসংখ্যার অনুপাতে কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ দিয়েও বিচার করা যায় না। এই বইয়ের প্রথম খণ্ডে , নীতি বিবেচনা করে

যুদ্ধের আগে জার্মানির মিত্রতা প্রসঙ্গে আমি আগেই ব্যাখ্যা করেছি যে, একটি রাষ্ট্রের জ্যামিতিক আকার কেবল খাদ্য ও কাঁচামালের উৎস হিসেবেই নয় , বরং রাজনৈতিক ও সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকেও গুরুত্বপূর্ণ । একটি জাতি যখন তার জাতীয় ভূখণ্ডের সম্পদ ব্যবহার করে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে, তখন তাকে অবশ্যই ভাবতে হয় কীভাবে সেই ভূখণ্ডকে রক্ষা করা যায় । একটি জাতির নিরাপত্তা নির্ভর করে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক শক্তির ওপর , এবং এই শক্তি আবার নির্ভর করে তার ভৌগোলিক অবস্থানে নিহিত সামরিক সক্ষমতার ওপর ।

সুতরাং, জার্মান জাতি কেবল তখনই তার ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে পারে , যদি সে একটি বিশ্বশক্তিতে পরিণত হয় । প্রায় দুই হাজার বছর ধরে, আমাদের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করা একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।
বিশ্ব ইতিহাস , যা পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আমাদের কমবেশি কার্যকর কর্মকাণ্ডে দেখা যায় । আমরা নিজেরাই এর সাক্ষী , এই বিবেচনায় যে ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত পরিচালিত বিশাল সংগ্রামটি ছিল কেবল জার্মান জাতির অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম, এবং এটি এমনভাবে পরিচালিত হয়েছিল যে ইতিহাসে তা বিশ্বযুদ্ধ নামে পরিচিতি লাভ করে।

যখন জার্মানি এই সংগ্রাম শুরু করেছিল, তখন এটিকে একটি বিশ্বশক্তি বলে মনে করা হতো । আমি 'মনে করা হতো' বলছি , কারণ বাস্তবে তা ছিল না। ১৯১৪ সালে, যদি জার্মানির জনসংখ্যা ও ভূখণ্ডের অনুপাত ভিন্ন হতো, তবে জার্মানি একটি প্রকৃত শক্তি হতো ।

বিশ্বের জন্য এবং যদি আমরা অন্যান্য কারণ উপেক্ষা করি, তাহলে যুদ্ধটি একটি অনুকূল উপায়ে শেষ হতো ।
এর মধ্যে।

নির্দিষ্ট কিছু শর্ত পূরণ হলে কী ঘটবে, তা এখানে আলোচনা করা আমার কাজও নয়, উদ্দেশ্যও নয়। তবে, বর্তমান পরিস্থিতি যেমন আছে ঠিক তেমনভাবেই তা তুলে ধরার এবং এর অন্তর্নিহিত দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করার সম্পূর্ণ অধিকার আমার আছে বলে আমি মনে করি , যাতে অন্তত জাতীয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকেই তা বুঝতে পারেন ।

আজকের জার্মানি মোটেই কোনো বিশ্বশক্তি নয় । এমনকি যদি এটি কাটিয়ে উঠতে সক্ষমও হতো
আমাদের বর্তমান সামরিক দুর্বলতার কারণেও , আমাদেরকে বিশ্বশক্তি বলার কোনো ভিত্তি থাকবে না ।
বর্তমান জার্মান রাইখের মতো জনসংখ্যা ও ভূখণ্ডের অনুপাত যদি এতটাই শোচনীয় হয়, তবে একটি রাষ্ট্রের আর কী তাৎপর্য থাকতে পারে ? এমন এক যুগে যখন বিশ্ব ক্রমশ বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ছে , যাদের মধ্যে অনেক রাষ্ট্রই প্রায় গোটা মহাদেশ জুড়ে বিস্তৃত, তখন মাত্র পাঁচ লক্ষ বর্গকিলোমিটার ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ একটি রাষ্ট্রকে বিশ্বশক্তি বলা যায় না ।

নিছক ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে , তথাকথিত বিশ্বশক্তিধর অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোর তুলনায় জার্মান রাইখের আয়তন নগণ্য। এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে যুক্তি হিসেবে ইংল্যান্ডের উদাহরণ দেওয়া উচিত নয় ;

Machine Translated by Google

ইংল্যান্ড প্রকৃতপক্ষে বৈশ্বিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিশাল মহানগরী, যা পৃথিবীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ জুড়ে রয়েছে। এছাড়াও, আমাদের অবশ্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অন্যতম বৃহৎ রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচনা করতে হবে , সেইসাথে রাশিয়া এবং চীনকেও । এগুলো বিশাল ভূখণ্ড , যার কোনো কোনোটি বর্তমান জার্মান রাইখের ভূখণ্ডের আয়তনের চেয়ে দশ গুণেরও বেশি বড় । এই বিশাল রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ফ্রান্সকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে । শুধু এই কারণে নয় যে, এটি তার সুবিশাল সাম্রাজ্যের জনসংখ্যার মধ্য থেকে অশ্বেতাঙ্গ সৈন্য নিয়োগ করে ক্রমাগত তার সেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করছে , বরং এই কারণেও যে ফ্রান্স জাতিগতভাবে ক্রমশ নিগ্রোয়েড হয়ে উঠছে , তাই বলা যায় ইউরোপীয় ভূমিতে একটি আফ্রিকান রাষ্ট্র সৃষ্টি হচ্ছে । সমসাময়িক ফরাসি ঔপনিবেশিক নীতির সাথে পূর্ববর্তী জার্মান নীতির তুলনা করা যায় না। যদি ফ্রান্স বর্তমানে গৃহীত পথেই বিকশিত হতে থাকে , এবং যদি এই বিকাশ আগামী তিনশ বছর ধরে চলতে থাকে , তবে ফরাসি রক্তের সমস্ত চিহ্ন অবশেষে সৃষ্ট ইউরো-আফ্রিকান মিশ্র-রাষ্ট্রে বিলীন হয়ে যাবে । এটি হবে রাইন থেকে কঙ্গো পর্যন্ত বিস্তৃত একটি শক্তিশালী ও সুসংহত ঔপনিবেশিক ভূখণ্ড , যেখানে বাস করবে এক নিকৃষ্ট জাতি , যারা ধীর কিন্তু অবিরাম রক্তমিশ্রণের প্রক্রিয়ায় বিকশিত হয়েছে ।

এই প্রক্রিয়াটি ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক নীতিকে পুরাতন জার্মানির নীতি থেকে পৃথক করে ।

পূর্ববর্তী জার্মান ঔপনিবেশিক নীতিও তৎকালীন প্রায় সবকিছুর মতোই দায়সারাভাবে পরিচালিত হয়েছিল । তারা জার্মান বসতির জন্য ভূখণ্ডের সম্প্রসারণ অর্জন করতে পারেনি, কিংবা কৃষ্ণাঙ্গ সৈন্যদের বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করে রাইখের শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টাও করেনি, যা একটি অপরাধমূলক কাজ হতো । জার্মান পূর্ব আফ্রিকার আসকারিরা ছিল এই পথে একটি ছোট ও দ্বিধাগ্রস্ত পদক্ষেপ; কিন্তু বাস্তবে তারা কেবল উপনিবেশটিকেই রক্ষা করার কাজে নিয়োজিত ছিল । ইউরোপীয় যুদ্ধক্ষেত্রে কৃষ্ণাঙ্গ সৈন্যদের নিয়ে আসার ধারণাটি — একটি বিশ্বযুদ্ধের সময় তা করার বাস্তব অসম্ভবতা তো বাদই দিলাম —কখনোই অনুকূল পরিস্থিতিতে বাস্তবায়নের জন্য একটি প্রস্তাব হিসেবে গৃহীত হয়নি ; পক্ষান্তরে ফরাসিরা এটিকে তাদের ঔপনিবেশিক কার্যক্রমের জন্য সর্বদা মৌলিক বলে মনে করত ।

এই কারণেই আজকের বিশ্বে এমন অনেক রাষ্ট্র রয়েছে, যারা নিছক জনসংখ্যার দিক থেকে জার্মানির চেয়ে শুধু অনেক বড়ই নয় , বরং তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতি সমর্থনও অনেক বেশি। দুই হাজার বছর আগে আমাদের ইতিহাসের শুরুতে এবং আজও, বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় জার্মান রাইখের ভূখণ্ডগত আয়তন এবং তার জনসংখ্যার সংখ্যার অনুপাত এতটা প্রতিকূল আর কখনও ছিল না । পূর্ববর্তী প্রসঙ্গে , আমরা ছিলাম এক নবীন জাতি, যারা পতনের দ্বারপ্রান্তে থাকা বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহ দ্বারা গঠিত এক বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করছিলাম , যার শেষ পরাক্রমশালী রাষ্ট্রটি ছিল রোম।

যার পতনে আমরাও ভূমিকা রেখেছি । আজ আমরা বৃহৎ ও শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহের এক বিশ্বে বাস করছি , যার মধ্যে আমাদের রাইখের গুরুত্ব ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে।

আমাদের অবশ্যই সর্বদা স্বচ্ছ ও শান্ত মনে এই তিক্ত সত্যের মুখোমুখি হতে হবে। আমাদের অবশ্যই অন্যান্য রাষ্ট্রের সাপেক্ষে জার্মান রাইখের আয়তন ও জনসংখ্যা অধ্যয়ন করতে হবে এবং প্রতিটি শতাব্দীতে সেগুলোর তুলনা করতে হবে। তাহলেই আমরা সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হব, যা আমরা ইতোমধ্যেই উল্লেখ করেছি।

আমি বলেছিলাম যে, জার্মানির সামরিক শক্তি যতই হোক না কেন , দেশটি কোনো বিশ্বশক্তি নয় ।

বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোর অবস্থানের সাথে আমাদের অবস্থানের কোনো সামঞ্জস্য নেই । আর এই অসামঞ্জস্যের কারণ হিসেবে অবশ্যই এই বিষয়টিকে দায়ী করতে হবে যে, আমাদের পররাষ্ট্রনীতির কখনোই কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল না এবং আমরা আত্মরক্ষার সমস্ত সুস্থ প্রবৃত্তি হারিয়ে ফেলেছি ।

যে ঐতিহাসিকরা একদিন আমাদের জাতির ইতিহাস লিখবেন, তাঁরা যদি জাতির সেবায় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পবিত্র কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠার মর্ম উপলব্ধি করতে চান , তবে এই আন্দোলনকে অবশ্যই বাকি বিশ্বের সাপেক্ষে আমাদের পরিস্থিতি সম্পর্কিত সত্যটি স্বীকার করতে হবে । এই সত্য যতই বেদনাদায়ক হোক না কেন , আমাদের জাতি পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনায় এ পর্যন্ত যে অসারতা ও অযোগ্যতা প্রদর্শন করেছে, তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে এই আন্দোলনকে অবশ্যই তা থেকে সাহস এবং বাস্তবতাবোধ আহরণ করতে হবে। "ঐতিহ্যের" প্রতি কোনো শ্রদ্ধা না রেখে, কোনো পূর্বধারণা ছাড়াই , এই আন্দোলনকে অবশ্যই আমাদের শক্তি সংগঠিত করার সাহস খুঁজে বের করতে হবে ।

Machine Translated by Google

জাতীয় পর্যায়ে এবং তাদেরকে এমন একটি পথে চালিত করা যা তাদেরকে আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতা থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করবে। যেগুলো বর্তমানে আমাদের জাতীয় জীবনের অভিশাপস্বরূপ , সেগুলোর জন্য নতুন ভূখণ্ড দখল করা হবে। এইভাবে, এই আন্দোলন জার্মান জাতিকে ধ্বংসের হুমকি অথবা অন্য কোনো জাতির সেবায় দাসত্ব বরণের হাত থেকে রক্ষা করবে।

আমাদের আন্দোলনকে অবশ্যই আমাদের মধ্যকার বর্তমান ভয়াবহ পরিস্থিতিকে পাল্টে দেওয়ার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। জনসংখ্যা এবং আমাদের জাতীয় ভূখণ্ডের আয়তন, এই জাতীয় ভূখণ্ডকে আমাদের জীবিকার উৎস এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে । অতীত ইতিহাস এবং আজকের এই আশাহীন অসহায় পরিস্থিতির মধ্যকার বৈপরীত্য দূর করার জন্যও তার সংগ্রাম করা উচিত । এর জন্য সংগ্রাম করার সময় তাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে , আমরা পৃথিবীতে মানবজাতির সর্বোচ্চ প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত , আমাদের একটি তদনুসারে মহান কর্তব্য রয়েছে, এবং আমরা এই কর্তব্য কেবল তখনই পালন করতে পারব যদি আমরা জার্মান জনগণকে একটি জাতিগত ধারণা দিয়ে অনুপ্রাণিত করতে পারি— শুধু ভালো কুকুর, ঘোড়া এবং বিড়াল পালনেই নয় , বরং তাদের নিজেদের রক্তের বিশুদ্ধতার যত্ন নেওয়ার ক্ষেত্রেও ।

* * *

আজ পর্যন্ত জার্মানির পররাষ্ট্রনীতির নিষ্ফলতা ও অকার্যকারিতার কথা যখন আমি বলি , তখন আমার এই বক্তব্যের প্রমাণ নিহিত রয়েছে সেই নীতির প্রকৃত ব্যর্থতার মধ্যেই। আমাদের জাতি যদি বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে অনগ্রসর হতো, অথবা যদি এর সাহসের অভাব থাকতো, তবে এর প্রচেষ্টার চূড়ান্ত ফলাফল আজ আমরা যা দেখছি তার চেয়ে খারাপ হতে পারতো না। যুদ্ধের আগের দশকগুলোতে যা ঘটেছে, তা এই বিষয়ে কোনো বিভ্রমের অবকাশ রাখে না ; কারণ আমরা কোনো রাষ্ট্রের শক্তিকে তার নিজস্ব সত্তায় পরিমাপ করতে পারি না , বরং কেবল অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে তুলনা করেই তা করতে পারি । এখন এই তুলনা থেকে দেখা যায় যে, অন্যান্য রাষ্ট্রগুলো তাদের শক্তি এমন এক পর্যায়ে বৃদ্ধি করেছে যা কেবল জার্মানির সমানই হয়নি, বরং তার চেয়েও বেশি প্রমাণিত হয়েছে; সুতরাং , বাহ্যিক দৃষ্টির বিপরীতে , অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় জার্মানির শক্তি ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে , এবং অবশেষে জার্মানির প্রতিকূলে এই পার্থক্যটি বিশাল আকার ধারণ করেছে । হ্যাঁ, এমনকি জনসংখ্যার দিক থেকেও আমরা অনেক পিছিয়ে পড়েছি , এবং আমরা এখনও পিছিয়ে যাচ্ছি। যদিও এটা সত্য যে আমাদের জাতির সাহস বিশ্বের অন্য যেকোনো জাতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় অন্য যেকোনো জাতির চেয়ে বেশি রক্তপাত ঘটিয়েছে , কিন্তু বাস্তব উদ্দেশ্যে সেই সাহসের ভ্রান্ত ব্যবহারের ফলেই এর ব্যর্থতা ঘটেছে।

সুতরাং , যদি আমরা সহস্রাধিক বছরেরও বেশি সময় ধরে আমাদের জাতি যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের ধারার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে তা পরীক্ষা করি, অগণিত সংগ্রাম ও যুদ্ধ স্মরণ করি এবং আজ আমরা যে প্রভাবগুলো দেখতে পাচ্ছি তার আলোকে সে সব বিশ্লেষণ করি, তবে আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে রক্তের সাগর থেকে কেবল তিনটি ঘটনার উদ্ভব হয়েছে, যেগুলোকে আমাদের পররাষ্ট্রনীতি দ্বারা নির্ণায়কভাবে নির্ধারিত রাজনৈতিক ঘটনাবলীর স্থায়ী ফল হিসেবে বিবেচনা করতে হবে:

(1) পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্তে উপনিবেশ স্থাপন, যা মূলত বাভারিয়ানদের কাজ ছিল।
(2) এলবে নদীর পূর্ব দিকের ভূখণ্ড বিজয় ও বসতি স্থাপন।
(3) ব্র্যান্ডেনবার্গ-প্রুশিয়ান রাজ্যের সংগঠন , যা হোহেনজোলার্নদের কাজ ছিল এবং নতুন রাইখের রূপায়ণের জন্য একটি আদর্শ হয়ে উঠল ।

ভবিষ্যতের জন্য একটি শিক্ষণীয় পাঠ।

আমাদের পররাষ্ট্রনীতির প্রথম দুটি বড় সাফল্যই সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী বলে প্রমাণিত হয়েছিল। সেগুলো ছাড়া আধুনিক বিশ্বে আমাদের জাতির কোনো ভূমিকাই থাকত না। এই অর্জনগুলো ছিল আমাদের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং যে ভূখণ্ড থেকে তারা জীবিকা নির্বাহ করত, তার মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের প্রথম এবং দুর্ভাগ্যবশত একমাত্র কার্যকর প্রচেষ্টা । এবং আমাদের অবশ্যই এটিকে একটি সত্যিকারের বিপর্যয়কর অভ্যাস হিসেবে বিবেচনা করতে হবে যে, আমাদের জার্মান ঐতিহাসিকরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বিশাল ঘটনাগুলোকে কখনোই যথাযথভাবে মূল্যায়ন করেননি। এর পরিবর্তে , তারা অন্যান্য অনেক বিষয়— কাল্পনিক বীরত্ব, অগণিত অভিযান ও যুদ্ধ—নিয়ে স্তুতিমূলক রচনা লিখেছেন, এটা না বুঝেই যে আমাদের জাতীয় উন্নয়নের মূল ধারার জন্য এগুলোর কোনো তাৎপর্য ছিল না ।

Machine Translated by Google

আমাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের তৃতীয় বৃহৎ সাফল্য ছিল প্রুশীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এবং তা থেকে উদ্ভূত রাষ্ট্র সম্পর্কিত একটি বিশেষ ধারণার বিকাশ।
জার্মান সেনাবাহিনীতে আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিরক্ষার প্রবৃত্তির সংগঠনের কৃতিত্বও আমাদের সেই একই উৎসকে দিতে হবে , যা ছিল আধুনিক বিশ্বের উপযোগী একটি অর্জন। ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার ধারণাকে জাতি রক্ষার কর্তব্যে রূপান্তরিত করার ধারণাটির উৎপত্তি হয়েছিল প্রুশিয়া এবং তাদের প্রবর্তিত রাষ্ট্রের নতুন ধারণা থেকে। এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার গুরুত্বকে কোনোভাবেই অবমূল্যায়ন করা যায় না। অতিরিক্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের কারণে খণ্ডিত জার্মান জাতি প্রুশীয় সেনাবাহিনীর সংগঠনের মাধ্যমে শৃঙ্খলিত হয়েছিল এবং এর ফলে জাতীয় সম্প্রদায়ের সেই সক্ষমতার অন্তত কিছুটা পুনরুদ্ধার করেছিল , যা অন্যান্য জাতির ক্ষেত্রে পশুপালের প্রবৃত্তির গঠনমূলক চালিকাশক্তি থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। ফলস্বরূপ, বাধ্যতামূলক সামরিক পরিষেবার বিলোপ — যা হয়তো অন্য কয়েক ডজন জাতির জন্য অপ্রাসঙ্গিক —আমাদের জন্য ভয়াবহ পরিণতি ডেকে এনেছিল। সামরিক প্রশিক্ষণের সংশোধনমূলক ও শিক্ষামূলক প্রভাব থেকে বঞ্চিত এবং সংঘাত ও বিভাজনের কুপ্রভাবের শিকার হওয়া দশ প্রজন্ম জার্মান —যার শিকড় তাদের রক্তে প্রোথিত এবং যা বিশ্বদৃষ্টির ঐক্যের অভাবেও তার শক্তি প্রদর্শন করে —এই দশ প্রজন্মই আমাদের জাতির জন্য এই পৃথিবীতে এক স্বাধীন অস্তিত্বের শেষ চিহ্নটুকুও হারিয়ে ফেলার জন্য যথেষ্ট ছিল।

জার্মান চেতনা সভ্যতায় অবদান রাখতে পেরেছিল কেবল অন্য জাতির শাসনাধীনে বসবাসকারী ব্যক্তিদের মাধ্যমেই , এবং এই ব্যক্তিদের উৎস আজও অজানা। নর্ডিক-আর্য রক্তের শেষ চিহ্নটুকু বিকৃত বা নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত তারাই সভ্যতার সার হয়ে থাকবে।

এটি একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় যে, হাজার বছরের সংগ্রামে আমাদের জাতি যে প্রকৃত রাজনৈতিক সাফল্য অর্জন করেছে , তা আমাদের প্রতিপক্ষের চেয়ে আমাদের নিজেদের দ্বারাই ভালোভাবে সমাদৃত ও অনুধাবন করা হয়।
আমরা নিজেরাই। আজও আমরা সেই বীরত্বের কথা সগৌরবে উল্লেখ করি, যা আমাদের জাতিকে তার লক্ষ লক্ষ শ্রেষ্ঠ জাতিগত উপাদান থেকে বঞ্চিত করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিষ্ফল প্রমাণিত হয়েছিল।

আমাদের জাতির দীর্ঘ ইতিহাসে অর্জিত প্রকৃত রাজনৈতিক সাফল্য এবং যে তুচ্ছ লক্ষ্যগুলোর জন্য আমাদের জনগণের রক্ত ঝরেছে, সেই দুইয়ের মধ্যেকার পার্থক্যই বর্তমান ও ভবিষ্যতে আমাদের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্ব বহন করে।

আমরা জাতীয় সমাজতন্ত্রীরা আমাদের সমসাময়িক বুর্জোয়া মহলের দেশপ্রেমের উল্লাসে শামিল হওয়ার সামর্থ্য রাখি না। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বের ঘটনাবলীকে এমন একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা আমাদের জন্য মারাত্মক বিপদ ডেকে আনবে, যা আমাদের নিজেদের পথ বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে সামান্যতম পরিমাণেও বিবেচনায় রাখা উচিত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর কোনো অংশে যার ঐতিহাসিক শিকড় প্রোথিত, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা আমরা গ্রহণ করতে পারি না। সেই সময়ের প্রতিনিধিত্বকারীদের নীতির বিপরীতে , আমাদের অবশ্যই উপস্থাপিত নীতিগুলোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একটি পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করতে হবে: অর্থাৎ, আমাদের ভূখণ্ড এবং জনসংখ্যার মধ্যে আনুপাতিকতা আনার প্রয়োজনীয়তা। আমরা অতীত থেকে শিক্ষা নিতে পারি।

শিক্ষা একটাই। এবং আমাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যে লক্ষ্যের জন্য আমাদের সচেষ্ট হতে হবে তা হলো
দ্বিবিধ: যথা (১) আমাদের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য হিসেবে ভূখণ্ড অধিগ্রহণ এবং (২) আমাদের জাতীয় মতবাদ অনুসারে আমাদের অভ্যন্তরীণ নীতির লক্ষ্য হিসেবে একটি নতুন ও সমতাভিত্তিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা।

* * *

নৈতিক ও নীতিগত আদর্শ অনুসারে আমাদের ভূখণ্ডগত লক্ষ্যগুলো কতটা যুক্তিযুক্ত, সেই প্রশ্নটি আমি সংক্ষেপে আলোচনা করব। এটি আরও বেশি প্রয়োজনীয় , কারণ আমাদের তথাকথিত জাতীয়তাবাদী মহলে নানা ধরনের তোষামোদকারী বাচাল লোক রয়েছে, যারা জার্মান জনগণকে এটা বোঝানোর চেষ্টা করছে যে তাদের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত ১৯১৮ সালের অন্যায়ের প্রতিকার করা, অথচ একই সাথে তারা এটিকে তাদের নিজেদের কর্তব্য বলেও মনে করে।

Machine Translated by Google

সমগ্র বিশ্বকে তাদের ভ্রাতৃত্ববোধ এবং অন্যান্য সকল জাতির প্রতি জার্মান জাতির সহানুভূতির বিষয়ে আশ্বস্ত করার কর্তব্য।

এই প্রসঙ্গে , আমি নিম্নলিখিত বিবৃতিটি দিতে চাই : ১৯১৪ সালের সীমান্ত পুনরুদ্ধারের দাবি একটি নির্লজ্জ রাজনৈতিক অযৌক্তিকতা , যার পরিণতি এতটাই গুরুতর যে এই ধরনের বিবৃতিকে অপরাধমূলক বলে মনে হয়। ১৯১৪ সালে বিদ্যমান রাইখ সীমান্তগুলো সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ছিল, কারণ জার্মান জাতির সকল সদস্যকে ধারণ করার অর্থে সেগুলো প্রকৃত অর্থে পূর্ণাঙ্গ ছিল না । সামরিক প্রতিরক্ষার ভৌগোলিক প্রয়োজনের দৃষ্টিকোণ থেকেও সেগুলো যুক্তিসঙ্গত ছিল না। সেগুলো কোনো সুচিন্তিত ও বাস্তবায়িত রাজনৈতিক পরিকল্পনার ফল ছিল না। সেগুলো ছিল একটি অসমাপ্ত রাজনৈতিক সংগ্রামের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত অস্থায়ী সীমান্ত; সেগুলো আংশিকভাবে আকস্মিক পরিস্থিতির ফল ছিল। ১৯১৪ সালের চেয়ে সমান ভালো, এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আরও ভালো, অন্য একটি বছর বেছে নিয়ে দাবি করা যেতে পারে যে, আমাদের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য হবে তখনকার বিদ্যমান পরিস্থিতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা । আমি যে দাবিগুলোর কথা উল্লেখ করেছি, সেগুলো বেশ

আমাদের বুর্জোয়া স্বদেশীদের এটাই বৈশিষ্ট্য , যারা এসব বিষয়ে রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করে না । তারা কেবল ভবিষ্যতে এবং প্রকৃতপক্ষে , কেবল নিকট অতীতেই বাস করে ; কারণ তাদের স্মৃতি আমাদের সময়ের বাইরে প্রসারিত হয় না । জড়তার নিয়ম তাদের বর্তমান ব্যবস্থার সাথে বেঁধে রাখে , যা তাদের পরিবর্তনের প্রতিটি প্রচেষ্টার বিরোধিতা করতে পরিচালিত করে। তবে, তাদের এই বিরোধিতা কখনোই কোনো সক্রিয় প্রতিরক্ষায় রূপান্তরিত হয় না। এটি কেবলই এক নিষ্ক্রিয় একগুঁয়েমি। অতএব , আমাদের এটা খুবই স্বাভাবিক বলে ধরে নিতে হবে যে এই মানুষদের রাজনৈতিক দিগন্ত ১৯১৪ সালের বাইরে প্রসারিত হয় না । তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য তৎকালীন সীমান্ত পুনরুদ্ধার করা—এই ঘোষণার মাধ্যমে তারা আমাদের বিরুদ্ধে শত্রুদের দ্বারা গঠিত জোটে দৃশ্যমান ফাটলগুলো বন্ধ করতে সাহায্য করে। কেবল এই ভিত্তিতেই আমরা এই ঘটনাটি ব্যাখ্যা করতে পারি যে , সেই মহাযুদ্ধের আট বছর পরেও , যেখানে যুদ্ধরত অনেক মিত্রশক্তির আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্য আংশিকভাবে পরস্পরবিরোধী ছিল, বিজয়ী জোটটি কমবেশি স্থিতিশীল রয়েছে।

এই দেশগুলোর প্রত্যেকটিই নিজ নিজ দিক থেকে জার্মানির পতনে লাভবান হয়েছিল। আমাদের শক্তি প্রদর্শনে সকলের মনে যে ভয় জন্মেছিল , তার বশে পরাশক্তিগুলো পারস্পরিক নীরবতা বজায় রেখেছিল ।
পরস্পরের প্রতি তাদের ব্যক্তিগত ঈর্ষা ও শত্রুতার অনুভূতি সম্পর্কে। তারা অনুভব করেছিল যে ভবিষ্যতে আমাদের শক্তির পুনরুত্থান রোধ করার সর্বোত্তম উপায় হবে আমাদের রাইখকে যথাসম্ভব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ধ্বংস ও বিভক্ত করা । ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং আমাদের জাতির শক্তির ভয় এই মুহূর্তেও এই লীগের সদস্যদেরকে দৃঢ়ভাবে একত্রিত করে রেখেছে।

এবং আমাদের কার্যকলাপের লক্ষ্য এই অবস্থার পরিবর্তন করা নয় । যেহেতু আমাদের বুর্জোয়া শ্রেণি ১৯১৪ সালের সীমানা পুনরুদ্ধারকেই জার্মানির রাজনৈতিক কর্মসূচির লক্ষ্য বানিয়েছে, তাই শত্রু জোটের প্রত্যেক সদস্য, যারা অন্যথায় এই জোট থেকে বেরিয়ে যেতে চাইত, তারাও একে আঁকড়ে ধরে থাকে। তাদের ভয় হয় যে, যদি তারা নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলে এবং এর ফলে তাদের মিত্রদের সমর্থন পেতে ব্যর্থ হয়, তবে আমরা তাদের আক্রমণ করতে পারি । প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই এই কর্মসূচির কারণে শঙ্কিত । এবং এই কর্মসূচিটি দুটি কারণে অযৌক্তিক :

(1) রাজনৈতিক সন্ধ্যার অন্ধকার পরিবেশ থেকে একে ছিঁড়ে বের করে এনে বাস্তবে রূপ দেওয়ার কোনো উপায় নেই ।

(2) এমনকি যদি বাস্তবে এটি কার্যকর করা যেত , তবে এর ফলাফল এতটাই করুণ হতো যে, ঈশ্বরের দোহাই, এমন উদ্দেশ্যে আমাদের জাতির রক্ত দিয়ে পুনরায় ঝুঁকি নেওয়া সমীচীন হবে না ।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, কেবল রক্তপাতের মাধ্যমেই আমরা ১৯১৪ সালের সীমান্ত পুনরুদ্ধার করতে পারতাম। বিজয়ীদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে পরোক্ষভাবে ভার্সাই চুক্তির সংশোধন করা সম্ভব—এই কথা বিশ্বাস করার জন্য একজনকে শিশুর মতো নির্বোধ হতে হবে ; এই বিষয়টি বিবেচনায় না নিয়েই যে , এর জন্য আমাদের ট্যালিরাঁর মতো চরিত্রবান কাউকে প্রয়োজন , আর আমাদের মধ্যে কোনো ট্যালিরাঁ নেই। আমাদের অর্ধেক রাজনীতিবিদই দক্ষ প্রতারক, যাদের কোনো চরিত্র নেই এবং যারা আমাদের জনগণের অনুভূতির প্রতি বিদ্বেষী ; অপর অর্ধেক হলেন সদিচ্ছাসম্পন্ন, নিরীহ এবং

Machine Translated by Google

পক্ষপাতদুষ্ট ভদ্র অযোগ্য ব্যক্তিরা। ভিয়েনা কংগ্রেসের পর থেকে পৃথিবী বদলে গেছে । এখন আর রাজপুত্র আর তাদের রক্ষিতারা জাতীয় সীমানা নিয়ে লড়াই ও দর কষাকষি করে না , বরং জাতিসমূহের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য লড়ে সেই অদম্য আন্তর্জাতিক ইহুদিরা। একমাত্র তরবারি ব্যবহার করেই একটি জাতি তার গলা থেকে এই থাবাগুলো বিচ্ছিন্ন করতে পারে । একমাত্র যখন জাতীয় অনুভূতিগুলো সংগঠিত ও কেন্দ্রীভূত হয়ে একটি কার্যকর শক্তিতে পরিণত হয় , তখনই তারা জাতিসমূহকে দাসত্বে আবদ্ধ করতে চাওয়া এই আন্তর্জাতিক অভিশাপের প্রতিরোধ করতে পারে । কিন্তু এই পথ রক্তপাত দ্বারা চিহ্নিত, এবং সর্বদা তাই থাকবে।

যদি আমরা এই মর্মে নিশ্চিত হই যে জার্মানির ভবিষ্যতের জন্য কোনো না কোনো ধরনের ত্যাগ স্বীকার করতে হবে , তবে আমাদের অবশ্যই রাজনৈতিক বিচক্ষণতার বিবেচনাকে একপাশে সরিয়ে রেখে এমন একটি ভবিষ্যতের জন্য লড়াইয়ে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করতে হবে যা আমাদের দেশের জন্য সার্থক হবে ।

জার্মান জাতির ভবিষ্যতের জন্য ১৯১৪ সালের সীমান্তগুলো অপ্রাসঙ্গিক । অতীতে এগুলো আমাদের প্রতিরক্ষায় কাজে আসেনি , এবং ভবিষ্যতের প্রতিরক্ষারও কোনো নিশ্চয়তা দেয় না । এই সীমান্তের মধ্যে জার্মান জাতি একটি সংহত ঐক্য হিসেবে নিজেদের ধরে রাখতে পারে না , কিংবা এর রক্ষণাবেক্ষণও নিশ্চিত করতে পারে না । সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে , এগুলো প্রতিকূল এবং এমনকি উদ্বেগের কারণ। যতদিন আমরা এই ধরনের সীমান্তে আবদ্ধ থাকব, ততদিন আমরা অন্যান্য বিশ্বশক্তির, বা বলা ভালো, প্রকৃত বিশ্বশক্তিগুলোর তুলনায় আমাদের অবস্থানের উন্নতি করতে পারব না । আমরা নিজেদের এবং গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যকার ভূখণ্ডগত পার্থক্য কমাতে পারব না, কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো গুরুত্বও অর্জন করতে পারব না। আমরা বিশ্ব রাজনীতিতে ফ্রান্সের গুরুত্বকে মৌলিকভাবে হ্রাস করতে সক্ষম হব না ।

একটি বিষয় নিশ্চিত: ১৯১৪ সালের সীমানা পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা সফল হলেও , তার জন্য আমাদের জনগণের পক্ষ থেকে এত রক্তপাতের প্রয়োজন হবে যে , জাতির ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় উপায় সাধনে ভবিষ্যতে আর কোনো আত্মত্যাগ করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। বরং , এই ধরনের বাহ্যিক সাফল্যে মত্ত হয়ে আমরা পরবর্তী লক্ষ্যগুলো পরিত্যাগ করব , বিশেষ করে যখন আমাদের তথাকথিত 'জাতীয় সম্মান' পুনরুদ্ধার হয়েছে বলে মনে হবে এবং আমাদের বাণিজ্যিক উন্নয়নের জন্য, অন্তত কিছু সময়ের জন্য , নতুন সুযোগ উন্মুক্ত হবে ।

এই সবকিছুর বিরুদ্ধে, আমাদের, জাতীয় সমাজতন্ত্রীদের, অবশ্যই দৃঢ় থাকতে হবে।
আমাদের পররাষ্ট্রনীতির জন্য আমরা যে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি ; তা হলো, এই পৃথিবীতে জার্মান জাতির অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় ভূখণ্ড সুরক্ষিত করা। আমাদের জাতির রক্তপাত পুনরায় ঈশ্বরের এবং আমাদের জার্মান বংশধরদের চোখে কেবল তখনই ন্যায়সঙ্গত হতে পারে , যদি তা এই লক্ষ্য পূরণে সহায়ক হয় । ঈশ্বরের চোখে, কারণ...

আমাদেরকে এই পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে আমাদের দৈনন্দিন আহারের জন্য লড়াই করতে ; এমন এক সত্তা হিসেবে, যাদেরকে কিছুই দেওয়া হয় না এবং যাদেরকে শুধুমাত্র নিজেদের বুদ্ধি ও সাহসের মাধ্যমেই পৃথিবীর অধিপতি হিসেবে নিজেদের অবস্থান অর্জন ও বজায় রাখতে হয়। এই যুক্তি আমাদের জার্মান বংশধরদের জন্যও দিতে হবে, কারণ যে ব্যক্তি তার রক্ত ঝরায়, সে ভবিষ্যতে হাজার হাজার মানুষের জীবন নিশ্চিত করে। যে ভূখণ্ডে আমাদের জার্মান কৃষকেরা একদিন তাদের শক্তিশালী পুত্রদের লালন - পালন করতে পারবে , তা-ই আজ কৃষকের সন্তানদের রক্ত ঝরানোকে ন্যায্য প্রমাণ করে। আর যে রাষ্ট্রনায়কেরা এই আত্মত্যাগের দাবি করেন , তাঁরা হয়তো তাঁদের সমসাময়িকদের দ্বারা নির্যাতিত হতে পারেন , কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জাতির কাছে এই আত্মত্যাগের দাবি করার জন্য তাঁদেরকে যেকোনো দোষ থেকে মুক্তি দেবে ।

এখানে, তাদের অবশ্যই সেইসব জাতীয় কলমবাজদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে তীব্রভাবে প্রতিবাদ করতে হবে, যারা দাবি করে যে এই ধরনের ভূখণ্ডগত সম্প্রসারণ হবে " পবিত্র মানবাধিকারের লঙ্ঘন " এবং সেই অনুযায়ী এর বিরুদ্ধে তাদের সাহিত্যিক লেখা ঢেলে দেয়। এই লোকদের কার্যকলাপের পিছনে কী গোপন শক্তি লুকিয়ে আছে তা কেউ জানে না । কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, তারা যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে তা আমাদের জাতির বিরুদ্ধে আমাদের শত্রুদের খেলায় সাহায্য করে এবং তাদের ইচ্ছার সাথে মিলে যায়। এই মনোভাব গ্রহণ করে , এই লোকেরা অপরাধমূলকভাবে আমাদের জাতির ইচ্ছাশক্তির অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায় , যে ইচ্ছাশক্তি তার নিজের গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থের জন্য একমাত্র কার্যকর উপায়ের মাধ্যমে কাজ করে । পৃথিবীর কোনো জাতিই কোনো উচ্চতর ইচ্ছার নির্দেশে বা কোনো উচ্চতর আইনের কৃপায় এক বর্গমিটার জমির মালিক হয় না ।

জার্মানির সীমানাগুলো আকস্মিকতার ফল এবং এগুলো কেবলই অস্থায়ী সীমানা, যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে-

Machine Translated by Google

বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত রাজনৈতিক সংগ্রামের ফলস্বরূপ । একই কথা প্রযোজ্য।
সেইসব সীমানা পর্যন্ত, যা অন্যান্য জাতির বসবাসের ভূখণ্ডকে চিহ্নিত করে । আর ঠিক যেমন কেবল একজন নির্বোধই পৃথিবীর ভৌত ভূগোলকে স্থির ও অপরিবর্তনীয় বলে মনে করতে পারে —যখন বাস্তবে এটি প্রকৃতির বিশাল শক্তির কারণে একটি নির্দিষ্ট বিবর্তনীয় যুগের একটি বিশেষ পর্যায়কে প্রতিনিধিত্ব করে এবং আগামীকাল আরও শক্তিশালী ধ্বংস ও পরিবর্তনের শক্তির দ্বারা পরিবর্তিত হতে পারে — তেমনি জাতিসমূহের জীবনেও তাদের টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সীমানাগুলো পরিবর্তিত হবে ।

জাতীয় সীমানা মানুষের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং মানুষের দ্বারাই পরিবর্তনযোগ্য ।
মানুষ।

কোনো জাতি একটি বিশাল ভূখণ্ড জয় করেছে বলেই যে সেই ভূখণ্ড তার দখলে রাখতে হবে , এমন কোনো কারণ নেই । বড়জোর, এই ধরনের ভূখণ্ডের দখল বিজয়ীর শক্তি এবং আত্মসমর্পণকারীদের দুর্বলতার প্রমাণ । আর কেবল এই শক্তিই দখলের অধিকার প্রদান করে।
যদি জার্মান জাতি এক অসহনীয় ভূখণ্ডে আটকা পড়ে এবং ফলস্বরূপ এক শোচনীয় ভবিষ্যতের সম্মুখীন হয়, তবে এটি ভাগ্যের বিধান নয়, এবং এই পরিস্থিতি মেনে নিতে অস্বীকার করা কোনোভাবেই ভাগ্যের আইনের লঙ্ঘন নয়। এমন কোনো উচ্চতর শক্তি নেই যা জার্মানি ছাড়া অন্য কোনো জাতিকে বৃহত্তর ভূখণ্ড দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে , এবং তাই ভূমির এই অন্যায্য বণ্টনের জন্য তাকে দায়ী করা যায় না । আমরা এখন যে ভূমিতে বাস করি, তা আমাদের পূর্বপুরুষদের জন্য স্বর্গের কোনো উপহার ছিল না। তাঁদেরকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তা জয় করতে হয়েছিল । একইভাবে , ভবিষ্যতেও আমাদের জাতি অন্য কোনো জাতির কাছ থেকে ভূখণ্ড এবং তার ফলস্বরূপ জীবনধারণের উপায় উপহার হিসেবে পাবে না, বরং বিজয়ী তরবারির শক্তিতে তা জয় করতে হবে ।

আজ আমরা সকলেই ফ্রান্সের সাথে আমাদের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিশ্চিত , কিন্তু আমাদের পররাষ্ট্রনীতির সামগ্রিক উদ্দেশ্য যদি সেখানেই থেমে যায়, তবে বৃহত্তর অর্থে আমাদের সাফল্য নিষ্ফল হবে । এটি আমাদের জন্য কেবল তখনই অর্থবহ হতে পারে , যদি তা ভূখণ্ড সম্প্রসারণের সংগ্রামে আমাদের পার্শ্বভাগকে রক্ষা করতে সাহায্য করে , যা ইউরোপে আমাদের জাতির অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য। ঔপনিবেশিক অধিগ্রহণ এই সমস্যার সমাধান করবে না। এর সমাধান কেবল আমাদের জাতির জন্য এমন ভূখণ্ড অধিগ্রহণের মাধ্যমেই সম্ভব , যা আমাদের মাতৃভূমির আয়তন প্রসারিত করবে এবং এর ফলে নতুন বসতি স্থাপনকারীদের কেবল তাদের দেশের সাথে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সংযোগেই রাখবে না , বরং এই ভূখণ্ডগত ঐক্যকে সেই সুবিধাগুলোও নিশ্চিত করবে যা একটি বৃহত্তর ভূখণ্ডে বিস্তৃত জাতি রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ থাকার ফলে লাভ করে।

জাতীয় আন্দোলন অন্য জাতির উকিল হতে পারে না , বরং তা হবে নিজ জাতির মুখপাত্র। অন্যথায়, এটি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে এবং সর্বোপরি, অতীতের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার কোনো অধিকার তার থাকবে না ; কারণ এটি অতীতের কর্মকাণ্ডেরই পুনরাবৃত্তি করবে। পুরোনো জার্মানির নীতিগুলো রাজবংশীয় বিবেচনার প্রতি এক ভ্রান্ত অধীনতার শিকার হয়েছিল । নতুন জার্মান নীতি ভাবাবেগ দ্বারা পরিচালিত হতে পারে না।

বিশ্বজনীন দেশপ্রেম। সর্বোপরি, আমরা সেই বিখ্যাত 'দরিদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলোর' জন্য কোনো পুলিশ বাহিনী তৈরি করতে পারি না, বরং আমাদের অবশ্যই জার্মান জাতির সৈনিক হতে হবে।

আমাদের, জাতীয় সমাজতন্ত্রীদের, আরও এগিয়ে যেতে হবে । ভূখণ্ডের অধিকার হয়ে উঠতে পারে
যখন কোনো মহান জাতির ভূখণ্ড সম্প্রসারণ না করা হলে তার পতন আসন্ন হয়, তখন এটি একটি কর্তব্য । আর এই কথাটি বিশেষভাবে সত্য, যখন সেই জাতিটি কোনো ক্ষুদ্র কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠী নয় , বরং সকল প্রাণের জার্মান জননী, যা আধুনিক বিশ্বকে সাংস্কৃতিক রূপ দিয়েছে । জার্মানি হয় একটি বিশ্বশক্তি হয়ে উঠবে, নয়তো তার অস্তিত্ব পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যাবে । কিন্তু বিশ্বশক্তি হতে হলে প্রয়োজন একটি যথেষ্ট বড় ভূখণ্ড , যা আমাদের প্রয়োজনীয় তাৎপর্য দেবে এবং আমাদের নাগরিকদের অস্তিত্ব নিশ্চিত করবে ।

* * *

এই কারণেই আমরা, নাৎসিরা, যুদ্ধ-পূর্ববর্তী জার্মান পররাষ্ট্রনীতি এবং জার্মানির মধ্যে সচেতনভাবে একটি সীমারেখা টেনেছিলাম । আমরা ইউরোপের দক্ষিণ ও পশ্চিমে জার্মানির অবিরাম অগ্রযাত্রার অবসান ঘটিয়ে পূর্বাঞ্চলীয় ভূখণ্ডগুলোর দিকে আমাদের মনোযোগ ঘুরিয়েছিলাম।

Machine Translated by Google

অর্থাৎ, আমরা যুদ্ধ-পূর্ববর্তী সময়ের ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্য নীতি ত্যাগ করে ভবিষ্যতের ভূখণ্ডগত নীতির দিকে অগ্রসর হয়েছি।

কিন্তু আজ যখন আমরা ইউরোপের নতুন অঞ্চলগুলো নিয়ে কথা বলি, তখন আমাদের ভাবতে হবে সর্বপ্রথমে রাশিয়া এবং তার অধীনস্থ সীমান্তবর্তী রাষ্ট্রসমূহ সম্পর্কে ।

মনে হচ্ছে, নিয়তিই আমাদের পথ দেখাচ্ছে । বলশেভিজমের কাছে রাশিয়াকে সমর্পণ করে নিয়তি রুশ জাতিকে সেই বুদ্ধিজীবী শ্রেণি থেকে বঞ্চিত করেছে, যারা একসময় রাশিয়াকে গড়ে তুলেছিল এবং ছিল তার নিশ্চয়তা।
এর অস্তিত্ব। রুশ রাষ্ট্রটি রাশিয়ার স্লাভিক জনগোষ্ঠীর গঠনমূলক রাজনৈতিক প্রতিভা দ্বারা সংগঠিত হয়নি , বরং এটি ছিল নিকৃষ্ট মানের একটি জাতির মধ্যে থাকা জার্মানিক জনগোষ্ঠীর রাষ্ট্র -গঠন ক্ষমতার এক চমৎকার উদাহরণ। এভাবেই বিশ্বজুড়ে অনেক শক্তিশালী সাম্রাজ্য তৈরি হয়েছিল । প্রায়শই, জার্মানিক সংগঠক ও নেতাদের দ্বারা পরিচালিত নিকৃষ্ট জাতিগুলো বিশাল রাষ্ট্রে পরিণত হতো এবং ততদিন টিকে থাকত, যতদিন সেই জাতিগত কেন্দ্রবিন্দুটি বিদ্যমান থাকত যা মূলত এই রাষ্ট্রগুলোকে তৈরি করেছিল । শত শত বছর ধরে, একটি রাষ্ট্র হিসেবে রাশিয়ার অস্তিত্ব তার শাসক শ্রেণীর জার্মানিক কেন্দ্রবিন্দুর কাছে ঋণী ছিল। কিন্তু এই কেন্দ্রবিন্দুটি এখন প্রায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে। ইহুদিরা এর স্থান দখল করেছে। ঠিক যেমন রুশরা নিজেদের চেষ্টায় ইহুদি জোয়াল থেকে মুক্ত হতে পারে না, তেমনি ইহুদিরাও এই বিশাল রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বেশিদিন টিকিয়ে রাখতে পারবে না । সে নিজে কোনোভাবেই সংগঠক উপাদান নয়, বরং একটি বিভেদ সৃষ্টিকারী উপাদান। এই বিশাল প্রাচ্য সাম্রাজ্য পতনের জন্য প্রস্তুত। রাশিয়ায় ইহুদি আধিপত্যের অবসান মানেই একটি রাষ্ট্র হিসেবে রাশিয়ারও অবসান । ভাগ্য আমাদের এমন এক মহাবিপর্যয়ের সাক্ষী হতে বেছে নিয়েছে, যা জাতীয়তাবাদী জাতিতত্ত্বের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ হবে।

কিন্তু জাতীয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আমাদের কর্তব্য ও লক্ষ্য হলো আমাদের জনগণের মধ্যে এমন এক রাজনৈতিক মানসিকতা গড়ে তোলা , যা তাদেরকে এটা বুঝতে সক্ষম করবে যে, ভবিষ্যতে আমাদের নিজেদের জন্য যে লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে তা আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের পদাঙ্ক অন্ধভাবে অনুসরণ করা হতে পারে না , বরং জার্মান লাঙলে কঠোর পরিশ্রম করা, যার জন্য জার্মান তরবারি মাটিকে সুরক্ষিত করবে।

* * *

এমন একটি নীতির বিরুদ্ধে একজন ইহুদির তীব্র বিরোধিতা প্রকাশ করা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ তাদের ভবিষ্যতের জন্য কী অর্থ বহন করে , তা ইহুদিরা অন্য সবার চেয়ে ভালো জানে। শুধুমাত্র এই একটি তথ্যই সকল প্রকৃত জাতীয়তাবাদীকে এটা বোঝানোর জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত যে, এই নতুন দিকনির্দেশনা সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, বাস্তবতা ঠিক তার উল্টো।
শুধু জার্মান জাতীয়তাবাদী দলের সদস্যদের মধ্যেই নয়, বরং খাঁটি জাতীয়তাবাদী মহলেও এই পূর্বাঞ্চলীয় নীতির বিরুদ্ধে তীব্র বিরোধিতা বাড়ছে । আর এই বিরোধিতার সূত্র ধরে , এই ধরনের ক্ষেত্রে যেমনটা হয়ে থাকে, বড় বড় ব্যক্তিত্বদের কর্তৃত্বের দোহাই দেওয়া হচ্ছে । এমন একটি নীতির সমর্থনে বিসমার্কের আদর্শকে স্মরণ করা হচ্ছে, যা যেমন নির্বোধের মতো, তেমনই অবাস্তব এবং জার্মান জাতির স্বার্থের জন্য চূড়ান্তভাবে ক্ষতিকর।

বলা হয়, বিসমার্ক রাশিয়ার সঙ্গে সুসম্পর্ককে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন । এক অর্থে, তা সত্যি। কিন্তু তারা এটা বলতে পুরোপুরি ভুলে যায় যে, তিনি উদাহরণস্বরূপ ইতালির সঙ্গে সুসম্পর্ককেও সমান গুরুত্ব দিতেন । হের ফন বিসমার্ক একবার ইতালির সঙ্গে একটি মৈত্রী চুক্তি করেছিলেন, যাতে তিনি আরও সহজে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে হিসাব চুকিয়ে নিতে পারেন। আজ এই নীতিকে কেন সমর্থন করা হয় না? তারা উত্তর দেবে যে আজকের ইতালি আর তখনকার ইতালি এক নয়। বেশ। কিন্তু যদি তাই হয়, ভদ্রমহোদয়গণ, আমাকে আপনাদের মনে করিয়ে দিতে দিন যে আজকের রাশিয়া আর তখনকার রাশিয়া এক নয় । বিসমার্ক কখনোই এমন কোনো নীতি অনুসরণ করেননি যা তাকে সব পরিস্থিতিতে আবদ্ধ রাখবে এবং যা নীতিগতভাবে মেনে চলতে হবে । তিনি সুযোগ বুঝে কাজ করতে এতটাই পারদর্শী ছিলেন যে , এই ধরনের বাধ্যবাধকতার বোঝা নিজের কাঁধে নিতে চাননি। সুতরাং, প্রশ্নটা এমন হওয়া উচিত নয় যে বিসমার্ক তখন কী করেছিলেন, বরং তিনি আজ কী করতেন। আর এর উত্তর খুবই সহজ । তার রাজনৈতিক বিচক্ষণতা তাকে এমন একটি রাষ্ট্রের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে দিত না, যার বিলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী।

Machine Translated by Google

তাছাড়া , বিসমার্ক তৎকালীন ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্য নীতিগুলোকে মিশ্র অনুভূতির চোখে দেখতেন, কারণ তিনি তাঁর সৃষ্ট রাষ্ট্রব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ শক্তি যথাসম্ভব বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী ছিলেন । এই কারণেই তিনি পশ্চাৎভাগে রুশ প্রতিরক্ষা মেনে নিয়েছিলেন, যাতে পশ্চিমে কাজ করার ক্ষেত্রে তাঁর অবাধ স্বাধীনতা থাকে । কিন্তু যা তখন জার্মানির জন্য উপকারী ছিল, তা এখন ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াবে।

১৯২০-২১ সালেই , যখন রাজনৈতিক দিগন্তে একটি নবীন আন্দোলন ধীরে ধীরে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল এবং জার্মান জাতির মুক্তির জন্য এখানে-সেখানে আন্দোলন গড়ে উঠছিল, তখন অন্যান্য দেশের মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য বিভিন্ন দিক থেকে প্রস্তাব আসতে শুরু করে । এটি ছিল 'বন্দী জাতিসমূহের সংঘ'-এর পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, যার বিজ্ঞাপন বহু জায়গায় দেওয়া হয়েছিল এবং যা মূলত বলকান রাষ্ট্রসমূহের পাশাপাশি মিশর ও ভারতের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত ছিল । আমার কাছে তাদের সবসময়ই ভণ্ড ও দাম্ভিক বলে মনে হয়েছে, যাদের কোনো প্রকৃত সমর্থন ছিল না। তবে, অনেক জার্মান, বিশেষ করে জাতীয়তাবাদী শিবিরের লোকেরা, এই দাম্ভিক মিথ্যাবাদীদের দ্বারা প্রতারিত হয়েছিল এবং বিশ্বাস করেছিল যে তারা কোনো যাযাবর ভারতীয় বা মিশরীয় ছাত্রের মধ্যে একজন 'প্রতিনিধি' খুঁজে পেয়েছে ।

ভারত বা মিশর। তারা বুঝতে পারেনি যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা এমন লোকদের সাথে কথা বলছিল যাদের কোনো সমর্থনই ছিল না , কোনো চুক্তিতে পৌঁছানোর কর্তৃত্বও কেউ তাদের দেয়নি ; তাই এই ধরনের ব্যক্তিদের সাথে যেকোনো আলোচনার বাস্তব ফলাফল নেতিবাচকই হতো, কারণ তাদের পেছনে ব্যয় করা সময় পুরোপুরি নষ্ট হতো। শুধু এই কারণে নয় যে, এই ধরনের নিষ্ফল 'আলোচনায়' সপ্তাহ নষ্ট করার চেয়ে আমার আরও ভালো কাজ ছিল , বরং এই কারণেও যে আমি বিশ্বাস করতাম , তারা যদি সত্যিকারের প্রতিনিধিদের সাথেও কথা বলত, তাহলেও পুরো ব্যাপারটি ক্ষতিকর না হলেও অনিবার্যভাবে নিষ্ফল প্রমাণিত হতো ।

শান্তিকালীন সময়ে এটা যথেষ্টই করুণ ছিল যে, জোট নীতির কোনো সক্রিয় ও আগ্রাসী উদ্দেশ্য না থাকায় তা বিশ্ব ইতিহাস থেকে বিচ্যুত হওয়া সেকেলে রাষ্ট্রগুলোর একটি আত্মরক্ষামূলক সংঘে পরিণত হয়েছিল । অস্ট্রিয়ার পাশাপাশি তুরস্কের সঙ্গে জোটও আনন্দের কোনো কারণ ছিল না । যখন বিশ্বের বৃহৎ সামরিক ও শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলো সক্রিয় আগ্রাসনের উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়েছিল , তখন কয়েকটি পুরোনো ও ক্ষয়িষ্ণু রাষ্ট্র জোটবদ্ধ হয়েছিল , এবং পুরোনো বিষয়গুলোর এই সমাবেশ সক্রিয় আগ্রাসনের মোকাবিলা করার চেষ্টা করেছিল।

বিশ্ব জোট । এই ধরনের ভুল পররাষ্ট্রনীতির জন্য জার্মানিকে চড়া মূল্য দিতে হয়েছিল , কিন্তু আমাদের অদম্য স্বপ্নদর্শীদের একই ভুল পুনরায় করা থেকে বিরত রাখার জন্য তা যথেষ্ট চড়া ছিল না। ' বন্দী রাষ্ট্রসমূহের সংঘ'-এর মাধ্যমে সর্বশক্তিমান বিজয়ী রাষ্ট্রগুলোর নিরস্ত্রীকরণ সহজ করার প্রচেষ্টা কেবল হাস্যকরই নয় , বরং বিপর্যয়কর। এটি বিপর্যয়কর, কারণ এর মাধ্যমে জার্মান জনগণ আবারও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে।

বাস্তব সম্ভাবনা থেকে দূরে সরে যায় এবং নিষ্ফল আশা ও বিভ্রমের নামে সেগুলোকে পরিত্যাগ করে । প্রকৃতপক্ষে , আজকের জার্মানরা এমন এক ডুবন্ত মানুষের মতো, যে ভেসে আসা যেকোনো খড়কুটো আঁকড়ে ধরে। এমনকি উচ্চশিক্ষিত মানুষও এমনটা করে থাকেন ।
যেখানেই অলীক আশার এক ঝলক দেখা যায় , এই লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে তার পিছনে ছুটতে শুরু করে। সেটা বন্দী জাতিদের সংঘই হোক , জাতিসমূহের সংঘই হোক, বা অন্য কোনো অলীক আবিষ্কারই হোক, হাজার হাজার সরলমনা মানুষ সবসময়ই থাকবে যারা তা বিশ্বাস করবে ।

আমার স্পষ্ট মনে আছে, ১৯২০-২১ সালে জাতীয় মহলে হঠাৎ করেই এক শিশুসুলভ ও অবোধ্য আশা জেগে উঠেছিল যে ভারতে ইংল্যান্ডের পতন আসন্ন। কিছু এশীয় ভণ্ড, যারা নিজেদেরকে "ভারতীয় স্বাধীনতার রক্ষক" হিসেবে জাহির করত , তারা সমগ্র ইউরোপ জুড়ে ভ্রমণ করতে শুরু করে এবং বেশ যুক্তিবাদী মানুষদের মনে এই ধারণা গেঁথে দিতে সফল হয় যে , ব্রিটিশ সাম্রাজ্য , যার কেন্দ্র ছিল ভারতে, সেখানেই তার পতন আসন্ন। তারা কখনোই বোঝেনি যে এই সমস্ত ধারণার জনক ছিল তাদের নিজেদের ইচ্ছাই। এই ইচ্ছাগুলো যে কতটা অযৌক্তিক ছিল, তা ভেবে দেখার জন্য তারা এক মুহূর্তও থামেনি । যেহেতু তারা ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আধিপত্যের পতনের পর ইংল্যান্ডের উত্থান ও সমাপ্তি প্রত্যাশা করেছিল, তাই তারা নিজেরাই স্বীকার করে নিয়েছিল যে ইংল্যান্ডের কাছে ভারত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

সম্ভবত এই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার গভীর রহস্যগুলো ছিল
শুধু জার্মান জাতীয় নবীদের কাছেই নয়, বরং যাদের হাতে ছিল তাদের কাছেও পরিচিত।

Machine Translated by Google

ব্রিটিশ ইতিহাসের হাল। এটা ভাবা একেবারেই ছেলেমানুষি যে, ইংল্যান্ড নিজে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জন্য ভারতের গুরুত্ব সঠিকভাবে উপলব্ধি করেনি। এবং এটা প্রমাণ করে যে, তারা বিশ্বযুদ্ধ থেকে কিছুই শেখেনি, এবং তারা অ্যাংলো-স্যাক্সনদের দৃঢ়সংকল্পকে হয় পুরোপুরি ভুল বুঝেছিল অথবা সে সম্পর্কে কিছুই জানত না, যখন তারা ভেবেছিল যে, ভারতকে ধরে রাখার সংগ্রামে সর্বশক্তি প্রয়োগ না করেই ইংল্যান্ড ভারতকে হারাতে পারে। অধিকন্তু , এটি দেখায় যে , ইংল্যান্ডের চেতনা যেভাবে তার সাম্রাজ্যকে পরিব্যাপ্ত করে ও শাসন করে , সে বিষয়ে জার্মানির অজ্ঞতা কতটা চরম । ইংল্যান্ড কখনোই ভারতকে হারাবে না, যদি না সে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় জাতিগত বিশৃঙ্খলা মেনে নেয় (যা এখন ভারতে সম্পূর্ণ প্রশ্নাতীত) অথবা যদি না সে কোনো শক্তিশালী শত্রুর তরবারির কাছে পরাজিত হয় । কিন্তু হিন্দু বিদ্রোহ কখনোই তা ঘটাতে পারবে না। ইংল্যান্ডকে কোনো কিছু করতে বাধ্য করা যে কতটা কঠিন , তা জানার মতো যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আমাদের জার্মানদের আছে । আর এই সবকিছুর বাইরে, একজন জার্মান হিসেবে, আমি অন্য যেকোনো দেশের চেয়ে ভারতকে ব্রিটিশ শাসনাধীনে দেখতেই বেশি পছন্দ করি।

মিশরে একটি বড় অভ্যুত্থানের আশাও ছিল একইভাবে অলীক। এই "পবিত্র যুদ্ধ" হয়তো আমাদের জার্মান বোকাদের এই মনোরম বিভ্রম দিতে পারে যে, অন্যরাও ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত ।
তাদের জন্য রক্ত। বস্তুত, এই কাপুরুষোচিত জল্পনা-কল্পনাই প্রায় সবসময় এমন আশার উৎস হয়ে থাকে । কিন্তু বাস্তবে, ব্রিটিশ মেশিনগানের কয়েকটি কোম্পানির বোমা ও গুলির বর্ষণে এই বিভ্রম দ্রুতই শেষ হয়ে যাবে ।

পঙ্গুদের একটি জোট এমন একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রকে আক্রমণ করতে পারে না , যে রাষ্ট্র তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে প্রয়োজনে শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত লড়াই করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমি, একজন জাতীয়তাবাদী হিসেবে যিনি মানবতার জাতিগত ভিত্তির মূল্য বোঝেন, তথাকথিত "বন্দী জাতিগুলোর" জাতিগত হীনতাকে অবশ্যই স্বীকার করতে বাধ্য, এবং শুধুমাত্র এই একটি কারণই আমার জাতির ভাগ্যকে এই নিকৃষ্ট জাতিগুলোর ভাগ্যের সাথে যুক্ত করা থেকে আমাকে বিরত রাখার জন্য যথেষ্ট।

আজকেও রাশিয়ার প্রতি আমাদের একই মনোভাব গ্রহণ করতে হবে । জার্মান শাসকশ্রেণীবিহীন আজকের রাশিয়া স্বাধীনতার সংগ্রামে কোনো কার্যকর মিত্র নয় ।
জার্মানি, তার নতুন শাসকদের অভ্যন্তরীণ পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণভাবে একপাশে সরিয়ে রেখে। নিছক সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে, পশ্চিম ইউরোপ এবং সম্ভবত সমগ্র বিশ্বের বিরুদ্ধে একটি রুশ-জার্মান জোটের যুদ্ধ ঘোষণা আমাদের জন্য একটি বিপর্যয় হবে। এই যুদ্ধ রাশিয়ার ভূখণ্ডে নয়, বরং জার্মানির ভূখণ্ডে লড়তে হবে এবং জার্মানি রাশিয়া থেকে সামান্যতম কার্যকর সমর্থনও পাবে না । যুদ্ধ পরিচালনার জন্য বর্তমান জার্মান রাইখের হাতে থাকা উপায়গুলো এতটাই শোচনীয় ও অপর্যাপ্ত যে, ইংল্যান্ডসহ পশ্চিম ইউরোপের বিরুদ্ধে আমাদের সীমান্ত রক্ষা করা অসম্ভব হবে। আমাদের শত্রুদের একটি কেন্দ্রীভূত আক্রমণের মুখে জার্মানির শিল্পাঞ্চলগুলোকে অরক্ষিত অবস্থায় পরিত্যাগ করতে হবে।

এ কথাও যোগ করা প্রয়োজন যে, জার্মানি ও রাশিয়ার মাঝে রয়েছে পোল্যান্ড, যা সম্পূর্ণরূপে ফ্রান্সের নিয়ন্ত্রণে।
যদি জার্মানি ও রাশিয়া যৌথভাবে পশ্চিম ইউরোপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তবে প্রথম রুশ সৈন্য জার্মান ফ্রন্টে পৌঁছানোর আগেই রাশিয়াকে পোল্যান্ডকে পরাজিত করতে হবে । কিন্তু এটি সৈন্যসংখ্যার চেয়ে প্রযুক্তিগত সরঞ্জামের সমস্যাই বেশি । এই দিক থেকে পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি ঘটবে।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি , কিন্তু আরও ভয়াবহ রূপে। তখন, জার্মান শিল্পকে আমাদের চমৎকার মিত্রদের সাহায্য করতে হয়েছিল, এবং প্রযুক্তিগত দিক থেকে জার্মানিকে প্রায় সম্পূর্ণ একাই যুদ্ধ লড়তে হয়েছিল । এই নতুন কাল্পনিক যুদ্ধে, প্রযুক্তিগত শক্তি হিসেবে রাশিয়ার কোনো গুরুত্বই থাকবে না । প্রতিরোধ করার মতো আমাদের কার্যত কিছুই থাকবে না।

বিশ্বের সার্বিক মোটরায়ন, যা পরবর্তী যুদ্ধে এক অপ্রতিরোধ্য ও চূড়ান্ত রূপ ধারণ করবে । এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে জার্মানি শুধু লজ্জাজনকভাবে পিছিয়েই নেই , বরং রাশিয়াকে শক্তিশালী করার জন্য তাদের সীমিত সম্পদ ব্যবহার করতে হবে , যে দেশের বর্তমানে মোটরচালিত যুদ্ধযান উৎপাদনে সক্ষম একটিও কারখানা নেই। এমন পরিস্থিতিতে, প্রত্যাশিত আসন্ন সংঘাতটি একটি নিখাদ কসাইখানায় পরিণত হবে । তরুণ জার্মানদের ত্যাগ করতে হবে

এমনকি একটি বিশ্বযুদ্ধের চেয়েও বেশি রক্তপাত ; বরাবরের মতোই, যুদ্ধ করার সম্মান কেবল আমাদেরই থাকবে, এবং এর ফল হবে এক অনিবার্য মহাবিপর্যয়। কিন্তু যদি কোনো অলৌকিক ঘটনা ঘটে এবং এই যুদ্ধ জার্মানির সম্পূর্ণ ধ্বংসের মাধ্যমে শেষ না-ও হয় , চূড়ান্ত ফল হবে এই যে জাতি

Machine Translated by Google

জার্মান সেনাবাহিনী রক্তক্ষরণে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং বৃহৎ সামরিক শক্তিগুলো দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় তাদের পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হবে না।

এখানে এই যুক্তি দেওয়া নিরর্থক যে, রাশিয়ার সাথে জোট হলে আমাদের অবিলম্বে যুদ্ধের কথা ভাবা উচিত নয় অথবা যুদ্ধের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রস্তুতি নেওয়ার মতো সামর্থ্য আমাদের থাকা উচিত । না। যে জোটের লক্ষ্য যুদ্ধ করা নয়, তার কোনো তাৎপর্য বা মূল্য নেই। জোট গঠনের সময় যুদ্ধের সম্ভাবনা দূরবর্তী হলেও , যুদ্ধের দিকে পরিস্থিতির অগ্রগতিই জোট গঠনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ। এটা ভাবা নিরর্থক যে, এই ধরনের জোটের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অন্যান্য শক্তিগুলো প্রতারিত হবে । একটি রুশ-জার্মান জোট হয় কাগজে - কলমেই থেকে যাবে—সেক্ষেত্রে এর কোনো অর্থ আমাদের জন্য থাকবে না—অথবা চুক্তির প্রতিটি শর্ত প্রকাশ্যে বাস্তবে প্রয়োগ করা হবে, সেক্ষেত্রে বাকি বিশ্ব সতর্ক হয়ে যাবে। এটা ভাবা ছেলেমানুষি হবে যে, এমন পরিস্থিতিতে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স রুশ-জার্মান জোটকে তার কারিগরি প্রস্তুতি সম্পন্ন করার জন্য দশ বছর সময় দেবে । না। জার্মানির উপর ঝড় অবিলম্বে শুরু হবে।

রাশিয়ার সাথে জোট গঠিত হওয়ার ঘটনাটি একটি নতুন যুদ্ধের ইঙ্গিত দেবে। এর পরিণাম হবে জার্মানির পতন।

এই বিবেচনার সাথে নিম্নলিখিতগুলি যোগ করা উচিত : (1) যারা
বর্তমানে রাশিয়ায় ক্ষমতায় আছেন তাদের একটি সম্মানজনক জোট গঠন করার বা এর প্রতি অনুগত থাকার কোনও ইচ্ছা নেই।

আমাদের কখনোই ভোলা উচিত নয় যে , রাশিয়ার বর্তমান শাসকেরা রক্তপিপাসু অপরাধী, মানবতার নিকৃষ্টতম অংশ, যারা অনুকূল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে একটি বিশাল রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করেছে , নিছক রক্তপাতের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত মানুষকে অপমানিত ও নিশ্চিহ্ন করেছে এবং প্রায় দশ বছর ধরে তারা নজিরবিহীনভাবে ভয়াবহ স্বৈরাচারী শাসনে রাজত্ব করেছে । আমাদের কখনোই ভোলা উচিত নয় যে, এই শাসকেরা এমন এক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, যাদের মধ্যে সবচেয়ে পাশবিক নিষ্ঠুরতার সাথে ধূর্ততার সাথে মিথ্যা বলার ক্ষমতা এবং এই বিশ্বাস মিশে আছে যে, আজ আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি , তাদের এই রক্তাক্ত স্বৈরাচার চাপিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

বাকি বিশ্ব। এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, আন্তর্জাতিক ইহুদি, যিনি আজ রাশিয়ার নিরঙ্কুশ শাসক , তিনি জার্মানিকে মিত্র হিসেবে বিবেচনা করেন না, বরং একই ধ্বংসের দিকে ধাবমান একটি রাষ্ট্র হিসেবে দেখেন ।
রাশিয়ার মতো। আপনি এমন কোনো অংশীদারের সাথে জোট বাঁধেন না, যার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো আপনার অংশীদারকে ধ্বংস করা। সর্বোপরি, আপনি এমন লোকদের সাথে জোট বাঁধেন না , যাদের কাছে কোনো চুক্তিই পবিত্র নয়; কারণ তারা এই পৃথিবীতে সম্মানীয় ও সৎ মানুষ হিসেবে বিচরণ করে না , বরং মিথ্যা ও প্রতারণা, চুরি ও ডাকাতির প্রতিনিধি হিসেবে। যে ব্যক্তি মনে করে সে এমন পরজীবীদের সাথে জোট বাঁধতে পারে , সে এমন একটি গাছের মতো, যে বিশ্বাস করে সে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারে ।

এর চারপাশে থাকা আইভি লতার সাথে একটি অনুকূল বিন্যাস ।

(2) যে হুমকির কাছে রাশিয়া নতি স্বীকার করেছিল, তা এখনও জার্মানির উপর ঝুলছে। কেবল একজন বুর্জোয়া বোকাই কল্পনা করতে পারে যে বলশেভিজমকে বশ করা সম্ভব । তার অগভীর চিন্তাভাবনায় , সে সন্দেহ করতে ব্যর্থ হয় যে সে এমন একটি ঘটনার সম্মুখীন হচ্ছে যা একটি রক্তপিপাসা থেকে উদ্ভূত : অর্থাৎ, বিশ্ব আধিপত্যের জন্য ইহুদিদের আকাঙ্ক্ষা । এই আকাঙ্ক্ষা ততটাই স্বাভাবিক, যতটা স্বাভাবিক বিশ্বজুড়ে সিংহাসন দখলের জন্য অ্যাংলো-স্যাক্সনদের প্রচেষ্টা । এবং ঠিক যেমন অ্যাংলো-স্যাক্সনরা এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাদের নিজস্ব পথ বেছে নেয় এবং তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র অস্ত্র দিয়ে লড়াই করে, তেমনি ইহুদিরাও করে। ইহুদিরা জাতির মাংসের গভীরে প্রবেশ করে এবং ভেতর থেকে তাকে ক্ষতবিক্ষত করে। সে মিথ্যা ও অপবাদ, বিষাক্ত সংক্রমণ ও বিভাজন দিয়ে লড়াই করে, যতক্ষণ না সে তার ঘৃণিত প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করে দেয়। রাশিয়ান বলশেভিজমে, আমাদের বিংশ শতাব্দীতে বিশ্ব আধিপত্য নিশ্চিত করার জন্য ইহুদিদের প্রচেষ্টা দেখা উচিত । অন্যান্য যুগেও সে একই উদ্দেশ্যে কাজ করেছিল, কিন্তু ভিন্ন, যদিও মূলত একই, উপায়ে। একজন ইহুদি যে ধরনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করে তা তার প্রকৃতির গভীরতম মূল থেকে উৎসারিত হয় । লোকেরা ত্যাগ করে না

তারা নিজেরাই পুঁজি ও ক্ষমতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রাখে । একমাত্র বাহ্যিক কারণ বা বার্ধক্যের অক্ষমতাই তাদের এই আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে বাধ্য করতে পারে । একইভাবে, ইহুদিরা কখনও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিশ্ব একনায়কতন্ত্রের দিকে যাত্রা থামাবে না বা তাদের আকাঙ্ক্ষা দমন করবে না। একমাত্র তার বাইরের শক্তিই তাকে এই পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে , কারণ বিশ্ব আধিপত্যের জন্য তার প্রবৃত্তি কেবল তার সাথেই বিলীন হবে। জাতিসমূহের অক্ষমতা এবং তাদের

Machine Translated by Google

বার্ধক্যজনিত বিলুপ্তি তখনই ঘটে, যখন তাদের রক্ত আর বিশুদ্ধ থাকে না। আর ইহুদিরা পৃথিবীর অন্য যেকোনো জাতির চেয়ে ভালোভাবে তাদের রক্তের বিশুদ্ধতা বজায় রাখে। তাই, ইহুদিরা তাদের নির্ধারিত পথ অনুসরণ করতে থাকে, যতক্ষণ না তাদের চেয়ে উচ্চতর কোনো শক্তি তাদের বিরোধিতা করে। এরপর , যে স্বর্গকে আক্রমণ করতে চায়, তাকে লুসিফারের কাছে ফেরত পাঠানোর জন্য এক মরিয়া সংগ্রাম শুরু হয় ।

আজকের জার্মানি হলো রুশ বলশেভিজমের পরবর্তী যুদ্ধক্ষেত্র। আমাদের জাতিকে পুনরায় জাগিয়ে তুলতে, আন্তর্জাতিক সর্পের কুণ্ডলী থেকে একে উদ্ধার করতে এবং আমাদের রক্তের অন্তঃস্তরে সংঘটিত দূষণের প্রক্রিয়াকে থামাতে একটি নতুন ধারণার পূর্ণ শক্তি প্রয়োজন; যাতে আমাদের জাতির শক্তি একবার উন্মোচিত হলে তা আমাদের জাতীয়তাকে রক্ষা করতে এবং এমনকি সুদূর ভবিষ্যতেও সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের পুনরাবৃত্তি রোধ করতে ব্যবহৃত হতে পারে। যদি আমরা নিজেদের জন্য এমন একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করি, তবে এমন একটি দেশের সাথে মিত্রতা স্থাপন করা বোকামি হবে , যার শাসকেরা আমাদের ভবিষ্যতের ঘোর শত্রু। আমরা যদি নিজেরাই এই গ্রাস মেনে নিই, তবে কীভাবে আমাদের জাতিকে এই বিষাক্ত গ্রাস থেকে মুক্ত করব ? আমরা যদি এই নরকীয় দানবের সাথে মিত্রতা স্থাপন করি এবং এর অস্তিত্বকে বৈধ বলে স্বীকার করে নিই, তবে কীভাবে জার্মান শ্রমিককে শেখাব যে বলশেভিজম মানবতার বিরুদ্ধে একটি লজ্জাজনক অপরাধ ? আমাদের দেশের শাসকেরা যদি একটি নির্দিষ্ট বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিদেরই তাদের মিত্র হিসেবে বেছে নেয়, তবে আমরা কীভাবে সেই বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সহানুভূতিশীল সাধারণ জনগণকে নিন্দা করতে সক্ষম হব ? বিশ্বের ইহুদি বলশেভিকীকরণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি আমাদের অবস্থান নির্ধারণ করা প্রয়োজন । আমরা শয়তানের সাথে বেলজেববকে দিয়ে লড়াই করতে পারি না । আজ যদি জাতীয়তাবাদী মহল বলশেভিজমের সাথে জোটের ধারণার পক্ষে কথা বলে , তবে তারা জার্মানির দিকে তাকিয়ে দেখুক কোন পক্ষ থেকে তারা সমর্থন পাচ্ছে। এই জাতীয়তাবাদীরা কি বিশ্বাস করে যে মার্ক্সবাদী আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম দ্বারা প্রস্তাবিত ও প্রশংসিত নীতিগুলো জার্মান জাতির জন্য উপকারী হতে পারে ? কবে থেকে একজন ইহুদি একজন বীর জাতীয়তাবাদীর ঢালবাহক হিসেবে কাজ করছে?

পুরাতন জার্মান রাইখের জোট নীতির বিরুদ্ধে একটি বিশেষ অভিযোগ আনা যেতে পারে যে, এটি নানা বিষয়ে ক্রমাগত হিংসাত্মক পরিবর্তনের মাধ্যমে অন্য সকলের সাথে সম্পর্ক নষ্ট করেছিল ।
এবং এর দুর্বলতা ছিল যেকোনো মূল্যে বিশ্ব শান্তি বজায় রাখার আকাঙ্ক্ষা । কিন্তু রাশিয়ার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় না রাখার অভিযোগ একে করা যায় না ।

আমি অকপটে স্বীকার করছি যে যুদ্ধের আগে আমি ভেবেছিলাম, জার্মানি যদি তার অর্থহীন ঔপনিবেশিক ও নৌ-নীতি পরিত্যাগ করে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের সাথে জোটে যোগ দিত , তবে তা আরও ভালো হতো। এর মাধ্যমে তারা একটি দুর্বল বিশ্বনীতি ত্যাগ করে ইউরোপে একটি সিদ্ধান্তমূলক নীতি গ্রহণ করত, যার লক্ষ্য ছিল মহাদেশটিতে নতুন ভূখণ্ড দখল করা। জার্মানির বিরুদ্ধে সর্ব-স্লাভিক রাশিয়ার অবিরাম, নির্লজ্জ হুমকির কথা আমি ভুলিনি । আমি সেই অবিরাম পরীক্ষামূলক সৈন্য সমাবেশের কথাও ভুলিনি , যার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল জার্মানিকে উত্যক্ত করা। আমি পারি না

যুদ্ধের আগে রাশিয়ার জনমত যেভাবে আমাদের জাতি ও রাইখের বিরুদ্ধে তাদের ঘৃণার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল , তা আমি ভুলতে পারি না । আমি সেই মহান রুশ সংবাদমাধ্যমকেও ভুলতে পারি না, যা সবসময় আমাদের চেয়ে ফ্রান্সের প্রতি বেশি সহানুভূতিশীল ছিল।

কিন্তু এত কিছুর পরেও, যুদ্ধের আগে আমাদের সামনে দ্বিতীয় একটি পথ খোলা ছিল। আমরা রাশিয়ার সমর্থন নিয়ে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যেতে পারতাম । আজ পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন । যুদ্ধের আগে আমরা সব আবেগ বিসর্জন দিয়ে রাশিয়ার পাশে দাঁড়াতে পারতাম ; আজ তা একেবারেই অসম্ভব। তারপর থেকে বিশ্বের সময়চক্র এগিয়ে গেছে । সেই মুহূর্ত এসে গেছে, এবং তা বেশ জোরালোভাবেই, যখন আমাদের জাতির ভাগ্য কোনো না কোনোভাবে নির্ধারিত হতেই হবে।

বিশ্বের বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহের বর্তমান একত্রীকরণ আমাদের জন্য শেষ সতর্ক সংকেত—আমাদের নিজেদের দিকে তাকাতে হবে , আমাদের জনগণকে তাদের কল্পনার জগৎ থেকে কঠিন বাস্তবতায় ফিরিয়ে আনতে হবে এবং ভবিষ্যতের সেই পথ দেখাতে হবে, যে পথে পুরোনো রাইখ আবারও বিজয়ীর বেশে এগিয়ে যেতে পারে।

যদি এই মহান ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যকে সামনে রেখে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন সকল মোহ ত্যাগ করে এবং যুক্তিকেই একমাত্র কার্যকর পথপ্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করে, তবে ১৯১৮ সালের বিপর্যয় আমাদের জাতির ভবিষ্যতের জন্য এক বিরাট আশীর্বাদ হিসেবে প্রমাণিত হতে পারে । এই পতনের শিক্ষা থেকে এক সম্পূর্ণ নতুন দিকনির্দেশনার উদ্ভব হতে পারে ।

Machine Translated by Google

বৈদেশিক নীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে। একটি নতুন বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা অভ্যন্তরীণভাবে শক্তিশালী হয়ে জার্মান জাতি বাকি বিশ্বের প্রতি তার নীতির চূড়ান্ত স্থিতিশীলতা অর্জন করতে পারে । আমরা তা অর্জন করতে পারি যা ইংল্যান্ডের আছে, যা রাশিয়ার সবসময় ছিল, এবং যা ফ্রান্স তার নিজের স্বার্থে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করে চলেছে : অর্থাৎ, একটি রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তি। জার্মান জাতির রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তিতে নিম্নলিখিত নীতিগুলি থাকা উচিত, যা বহির্বিশ্বের প্রতি নীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে সর্বদা উপযুক্ত হবে :

ইউরোপে দুটি মহাদেশীয় শক্তির উত্থান কখনোই হতে দেওয়া যাবে না । যদি জার্মানিকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে একটি সামরিক শক্তিতে পরিণত হতে পারে এমন রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে জার্মানির সীমান্তে দ্বিতীয় কোনো সামরিক শক্তি তৈরির চেষ্টা করা হয় , তবে এই ধরনের পদক্ষেপ জার্মানির উপর কেবল অধিকারই নয়, বরং সামরিক উপায়সহ সকল উপায়ে সেই রাষ্ট্রের সৃষ্টির বিরোধিতা করার এবং তার উত্থান ঘটলে তাকে ধ্বংস করার কর্তব্যও আরোপ করে। এটা নিশ্চিত করতে হবে যে আমাদের জাতির শক্তি যেন ঔপনিবেশিক ভিত্তির উপর নয়, বরং ইউরোপে তার নিজস্ব ভূখণ্ডের উপর নির্ভর করে। রাইখকে ততক্ষণ পর্যন্ত নিরাপদ বলে গণ্য করা যাবে না , যতক্ষণ না শত শত বছর পর এটি আমাদের জাতির প্রত্যেক বংশধরকে নিজস্ব বলে দাবি করার মতো এক টুকরো জমি দিতে সক্ষম হয়। এটা কখনোই ভোলা যাবে না যে, এই পৃথিবীতে সবচেয়ে পবিত্র মানবাধিকার হলো নিজের জন্য চাষ করতে ইচ্ছুক জমির অধিকার এবং সবচেয়ে পবিত্র আত্মত্যাগ হলো এর জন্য ঝরে পড়া রক্ত ।

* * *

এই মুহূর্তে ইউরোপে আমাদের জন্য বিদ্যমান একমাত্র সম্ভাব্য জোটটির কথা পুনরায় উল্লেখ না করে এই অধ্যায়টি শেষ করা উচিত নয় । এই অধ্যায়ে জার্মানির জোটগত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমি উল্লেখ করেছিলাম যে, ইংল্যান্ড এবং ইতালিই একমাত্র দেশ যাদের সাথে একটি ঘনিষ্ঠ জোট গঠন করা লাভজনক হবে এবং এই ধরনের জোট উপকারী হবে। আমি এখানে এই ধরনের জোটের সামরিক গুরুত্বের উপর আবারও জোর দিতে চাই ।

এই ধরনের জোট গঠনের সামরিক পরিণতি হবে ঠিক এর বিপরীত।
রাশিয়ার সাথে জোটের প্রভাব। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো , ইংল্যান্ড ও ইতালির সাথে সমঝোতা কোনোভাবেই যুদ্ধের হুমকি সৃষ্টি করে না। একমাত্র ফ্রান্সই এই ধরনের চুক্তির বিরোধিতা করতে পারে ; এবং ফ্রান্সের যুদ্ধ শুরু করার কোনো ক্ষমতা নেই। এই জোট জার্মানিকে শান্তভাবে প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ দেবে, যা এই ধরনের জোটের কাঠামোর মধ্যে ফ্রান্সের সাথে হিসাব চুকিয়ে নেওয়ার জন্য কোনো না কোনোভাবে প্রয়োজনীয় হবে । এই ধরনের জোটের পূর্ণ তাৎপর্য এই যে , এটি সম্পন্ন হওয়ার পর জার্মানি আর থাকবে না

আকস্মিক আক্রমণের হুমকিতে । আমাদের বিরুদ্ধে জোট, এনটেন্ট, যা আমাদের উপর এমন এক বিপর্যয় ডেকে এনেছে, তা আপনাআপনি বিলীন হয়ে যাবে। ফলে, আমাদের জাতির ঘোর শত্রু ফ্রান্স বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। আর যদিও শুরুতে এই সাফল্য কেবল নৈতিক হয়, তা জার্মানিকে এমন এক কর্মস্বাধীনতা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে যা আমরা এখন কল্পনাও করতে পারি না । রাজনৈতিক উদ্যোগ নেবে নতুন অ্যাংলো-জার্মান-ইতালীয় জোট, ফ্রান্স নয়।

এর আরেকটি সাফল্য হবে যে, জার্মানি এক ধাক্কায় একটি প্রতিকূল কৌশলগত পরিস্থিতি থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারবে । একদিকে, আমাদের পশ্চাৎভাগ সুরক্ষিত থাকবে ; অন্যদিকে, খাদ্য ও কাঁচামাল আমদানির সুযোগ নিশ্চিত করা এই নতুন রাষ্ট্র-সংঘের একটি উপকারী ফল হবে । কিন্তু এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হবে এই বিষয়টি যে, এই নতুন জোটে এমন সব রাষ্ট্র অন্তর্ভুক্ত থাকবে যাদের প্রযুক্তিগত সক্ষমতা একে অপরের পরিপূরক । প্রথমবারের মতো, জার্মানির মিত্ররা তার অর্থনৈতিক দেহের রক্তচোষা হবে না , বরং অবদান রাখবে।

আমাদের প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত । এবং আমাদের শেষ সত্যটি ভুলে গেলে চলবে না : অর্থাৎ, এই ক্ষেত্রে বর্তমানে তুরস্ক ও রাশিয়ার মতো মিত্র আমাদের থাকা উচিত নয়। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি এবং নবীন জাতি-রাষ্ট্রটি নিশ্চিতভাবেই সেইসব ক্ষয়িষ্ণু রাষ্ট্রগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন উপাদান সরবরাহ করবে, যাদের সাথে জার্মানি গত যুদ্ধে মিত্রতা করেছিল ।

Machine Translated by Google

আমি আগেই যেমন বলেছি, এই ধরনের একটি জোট গঠন ঠেকাতে অবশ্যই ব্যাপক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হবে। কিন্তু এনটেন্ট জোটের গঠন কি আরও বেশি কঠিন ছিল না? যেখানে রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড আংশিকভাবে নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধে গিয়েও সাফল্য অর্জন করেছিলেন, সেখানে আমাদেরও সফল হতেই হবে, এবং আমরা তা করবই, যদি এই ধরনের একটি অগ্রগতির প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করার মাধ্যমে আমরা এই নীতি অনুসরণে দক্ষতার সাথে কাজ করতে এবং নিজেদের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। এটা তখনই সম্ভব হবে যখন, আমাদের পরিস্থিতির দুর্দশা থেকে প্রেরণা পেয়ে , আমরা একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য গ্রহণ করব এবং তা পদ্ধতিগতভাবে অনুসরণ করব ; সাম্প্রতিক দশকগুলোর সেই ত্রুটিপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতির মতো নয়, যার কখনোই কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল না।

আমাদের পররাষ্ট্রনীতির ভবিষ্যৎ লক্ষ্য পূর্ব বা পশ্চিমমুখী কোনো অভিমুখ দ্বারা নির্ধারিত হওয়া উচিত নয়, বরং এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত একটি পূর্বাঞ্চলীয় নীতি , যার লক্ষ্য হবে জার্মান জাতির জন্য প্রয়োজনীয় ভূখণ্ডগুলো অধিগ্রহণ করা। এই নীতি বাস্তবায়নের জন্য আমাদের সেই শক্তির প্রয়োজন, যা আমাদের জাতির ঘোর শত্রু ফ্রান্স বর্তমানে আমাদেরকে তার মুঠোয় আটকে রেখে এবং নির্মমভাবে কেড়ে নিয়ে আমাদের থেকে কেড়ে নিচ্ছে। অতএব, ইউরোপে ফ্রান্সের আধিপত্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষাকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টায় আমরা কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে পিছপা হতে পারি না। আজ, মহাদেশের সেই সমস্ত শক্তিই আমাদের স্বাভাবিক মিত্র হবে , যারা ফ্রান্সের আধিপত্যের আকাঙ্ক্ষাকে অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করে। এই শক্তিগুলোর কাছাকাছি যাওয়ার কোনো চেষ্টাই আমাদের জন্য খুব কঠিন হওয়া উচিত নয়, এবং কোনো ত্যাগকেই খুব বড় বলে মনে করা উচিত নয় , যদি শেষ পর্যন্ত আমাদের সবচেয়ে তিক্ত শত্রুকে পরাজিত করা সম্ভব হয়। যখন সবচেয়ে বড় ক্ষতগুলো পুড়িয়ে বন্ধ করে দেওয়া হবে, তখন সময়ের অনুকূল প্রবাহে ছোটখাটো ক্ষতগুলো সেরে যাবে।

অবশ্যই, আমাদের জাতির অভ্যন্তরীণ শত্রুরা ক্রোধে গর্জন করবে। কিন্তু যা আমরা গভীরভাবে প্রয়োজনীয় বলে বিশ্বাস করি, তা ঘোষণা করা থেকে আমাদের, অর্থাৎ জাতীয় সমাজতন্ত্রীদের, থামাতে তারা সফল হবে না। আমাদের জার্মান পরিচয়কে কাজে লাগিয়ে ইহুদিদের চাতুরীর দ্বারা উন্মত্ত হয়ে ওঠা জনমতের স্রোতের অবশ্যই বিরোধিতা করতে হবে।

অবিবেচনা। জনমতের ঢেউ প্রায়শই আমাদের বিরুদ্ধে গর্জন করে ওঠে ; কিন্তু যে স্রোতের সাথে চলে, সে তার বিরোধিতাকারীর চেয়ে কম মনোযোগ আকর্ষণ করে। আজ আমরা নদীর বুকে একটি নুড়ি মাত্র। কয়েক বছরের মধ্যেই, নিয়তি হয়তো এমন এক বাঁধে পরিণত করবে যেখানে সাধারণ স্রোত ভেঙে গিয়ে এক নতুন পথে প্রবাহিত হবে। অতএব, বাকি বিশ্বের চোখে আমাদের আন্দোলনকে একটি সুনির্দিষ্ট ও চূড়ান্ত রাজনৈতিক কর্মসূচির প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া আবশ্যক। আমাদের শিরস্ত্রাণে সেই বিশেষ প্রতীকটি ধারণ করা উচিত, যা স্বর্গ আমাদের কাছ থেকে পালন করার প্রত্যাশা করে।

যখন আমরা নিজেরা আমাদের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণকারী অনিবার্য আবশ্যকতা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে সচেতন হব , তখন এই জ্ঞানই আমাদের রুখে দাঁড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় ইচ্ছাশক্তিতে পূর্ণ করবে।
শত্রুর গোলাবর্ষণের মুখেও শান্তভাবে চাপ বজায় রাখো এবং দৃঢ় থাকো, যখন কোনো কণ্ঠস্বর ফিসফিস করে বলে যে আমাদের এখানে বা সেখানে সরে যাওয়া উচিত , যাতে সবাই আমাদের বিরুদ্ধে না থাকে এবং মাঝে মাঝে আমরা নেকড়েদের সাথে গর্জন করতে পারি।

Machine Translated by Google

অধ্যায় ১৫

আত্মরক্ষার অধিকার

১৯১৮ সালের নভেম্বরে আমাদের অস্ত্র ত্যাগের পর এমন একটি নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল , যা সম্ভবত ক্রমান্বয়ে আমাদের পূর্ণ পরাধীনতার দিকে নিয়ে যেত । ইতিহাসের অনুরূপ উদাহরণ দেখায় যে, যেসব জাতি অস্ত্র ত্যাগ করে ...

একেবারে বাধ্য না হলে , তারা তখন পুনরায় অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা করার চেয়ে চরম অপমান ও জবরদস্তি সহ্য করাকেই শ্রেয় মনে করে ।

নিছক মানবিক কারণেই এটি বোধগম্য। একজন ধূর্ত বিজেতা সর্বদা বিজিতদের উপর তার শোষণ ধীরে ধীরে, যতটা সম্ভব ধীরে ধীরে চাপিয়ে দেবে । তখন সে আশা করতে পারে যে, যে জাতি তার সমস্ত চারিত্রিক দৃঢ়তা হারিয়ে ফেলেছে — যেমনটা সবসময় সেই জাতির ক্ষেত্রে ঘটে যারা স্বেচ্ছায় তাদের প্রতিপক্ষের হুমকির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে—তারা এই নিপীড়নের কোনোটিকেই , যদি আলাদাভাবে প্রয়োগ করা হয় , পুনরায় অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট কারণ বলে মনে করবে না । এভাবে যত বেশি শোষণ নিষ্ক্রিয়ভাবে মেনে নেওয়া হবে , পরাজিত জাতিটি যদি অবশেষে পরবর্তী নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে , তবে অন্যান্য জাতির চোখে সেই প্রতিরোধ তত কম ন্যায়সঙ্গত বলে বিবেচিত হবে । এটি বিশেষভাবে সত্য হবে যদি জাতিটি এ পর্যন্ত আরও অনেক বেশি কঠোর নিপীড়ন নীরবে ও শান্তভাবে মেনে নিয়ে থাকে ।

কার্থেজের পতন হলো একটি জাতির ধীর ও ধ্বংসাত্মক যন্ত্রণার এক ভয়াবহ দৃষ্টান্ত , যার জন্য দায়ী ছিল স্বয়ং সেই জাতি।

তাঁর 'বিশ্বাসের তিনটি মূলনীতি' গ্রন্থে ক্লজউইৎজ এই ধারণাটি চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছেন এবং একে একটি নির্দিষ্ট রূপ দিয়েছেন যখন তিনি বলেন: " কাপুরুষোচিত আত্মসমর্পণের ফলে সৃষ্ট লজ্জার কলঙ্ক কখনও মুছে ফেলা যায় না । এভাবে একটি জাতির রক্তে যে বিষের ফোঁটা প্রবেশ করে , তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত হবে। এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শক্তিকে দুর্বল ও পঙ্গু করে দেবে।" কিন্তু, অন্যদিকে, তিনি আরও যোগ করেন: " একটি রক্তাক্ত ও সম্মানজনক সংগ্রামের পর স্বাধীনতার ক্ষতিও জাতি এবং তার প্রাণকেন্দ্রের পুনর্জন্ম নিশ্চিত করে , যেখান থেকে একদিন একটি নতুন বৃক্ষের শক্তিশালী শিকড় গজিয়ে উঠবে ।"

অবশ্যই, যে জাতি সমস্ত সম্মানবোধ ও চারিত্রিক দৃঢ়তা হারিয়ে ফেলেছে , তারা এই ধরনের মতবাদের শক্তি অনুভব করবে না। কিন্তু যে জাতি একে হৃদয়ে ধারণ করে , তার পতন কখনো হবে না। কেবল তারাই পতিত হবে, যারা তা ভুলে যায় অথবা স্বীকার করতে অস্বীকার করে। অতএব
এটা আশা করা অবাস্তব যে, এই কাপুরুষোচিত আত্মসমর্পণের জন্য দায়ী ব্যক্তিরা তাদের কর্মপন্থা পুনর্বিবেচনা করে মানবিক যুক্তি ও অভিজ্ঞতা দ্বারা পরিচালিত পথে ফিরে আসবে । বরং , তারা এই মতবাদকে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান করবে , যতক্ষণ না জাতি হয় দাসত্বের জোয়ালে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, অথবা জাতির উন্নততর অংশ সামনে এসে এই লজ্জাজনক ও দুর্নীতিগ্রস্ত শাসনের হাত থেকে বলপূর্বক ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয় । প্রথম ক্ষেত্রে, ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিরা বর্তমান পরিস্থিতিতে সন্তুষ্ট থাকবে , কারণ বিজয়ীরা প্রায়শই তাদের ওপর দাসদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পণ করে। আর এই চরম চরিত্রহীন ব্যক্তিরা এই শক্তিকে তাদের নিজেদের জনগণের ক্ষতির জন্য ব্যবহার করবে , শত্রুপক্ষের পাঠানো সবচেয়ে নিষ্ঠুর বহিরাগতের চেয়েও বেশি নিষ্ঠুরভাবে।

১৯১৮ সালের পর জার্মানিতে যে ঘটনাগুলো ঘটেছিল, তা দেখিয়ে দিয়েছে যে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণের মাধ্যমে বিজয়ীদের আনুকূল্য লাভের আশা কীভাবে সাধারণ জনগণের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের উপর সবচেয়ে ভয়াবহ প্রভাব ফেলেছিল । আমি খোলাখুলিভাবে সাধারণ জনগণের কথা বলছি, কারণ আমি নিজেকে এটা বোঝাতে পারি না যে দেশের নেতাদের দ্বারা যা কিছু করা হয়েছিল বা যা কিছু করা হয়নি, তার কারণও একইভাবে একটি ভয়াবহ বিভ্রম ছিল। যেহেতু যুদ্ধের পর আমাদের ঐতিহাসিক ভাগ্যের গতিপথ এখন প্রকাশ্যে ইহুদিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল, তাই এটা স্বীকার করা অসম্ভব যে পরিস্থিতি সম্পর্কে ভুল ধারণাই আমাদের দুর্ভাগ্যের একমাত্র কারণ ছিল। বরং , এই ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতেই হবে।

এই ঘটনা থেকে প্রাপ্ত উপসংহার যে, আমাদের জাতিকে ইচ্ছাকৃতভাবে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। যদি আমরা এটিকে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি

Machine Translated by Google

এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা দেখব যে, পররাষ্ট্রনীতির গতিপথ যতটা নির্বোধের মতো মনে হয়, ততটা ছিল না।
মনে হলো; যদি আমরা বিষয়টি আরও নিবিড়ভাবে খতিয়ে দেখি, তাহলে পরিষ্কারভাবে দেখতে পাব যে, এটি ইহুদি আদর্শ এবং বিশ্বশক্তি অর্জনের আকাঙ্ক্ষার সেবায় শান্তভাবে পরিকল্পিত, চতুরভাবে সংজ্ঞায়িত এবং যৌক্তিকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল ।

১৮০৬ থেকে ১৮১৩ সাল পর্যন্ত প্রুশিয়া পতনের মুখে ছিল। কিন্তু এই সময়কালই দেশটির প্রাণশক্তি পুনরুজ্জীবিত করতে এবং লড়াই করার জন্য এক অদম্য সংকল্পে পুনরায় অনুপ্রাণিত করতে যথেষ্ট ছিল।
১৯১৮ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত একই সময় অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু আমরা তা থেকে কোনো সুফল লাভ করিনি। বরং আমাদের দেশের প্রাণশক্তি ক্রমাগত দুর্বল হয়ে পড়েছে।

১৯১৮ সালের নভেম্বরের সাত বছর পর লোকার্নো চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল।
এভাবেই ঘটেছিল যা আমি উপরে বলেছি । যখন সেই লজ্জাজনক যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, আমাদের জাতি প্রতিপক্ষের অগ্রযাত্রা থামানোর সাহস করতে পারেনি , কারণ নিপীড়নের উপায়গুলো ক্রমাগত নবায়ন করা হচ্ছিল । শত্রু এতটাই ধূর্ত ছিল যে সে একবারে সবকিছু দাবি করতে পারেনি। সে সর্বদা তার বলপ্রয়োগকে সেইসব বোঝার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখত যা তার এবং জার্মান সরকারের মতে , সেই সময়ে চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল : এইভাবে তারা মানবিক অনুভূতির বিস্ফোরণ ঘটানোর ঝুঁকি নিত না। কিন্তু যখন ব্যক্তিগত বোঝাগুলোকে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছিল এবং সহ্য করা হচ্ছিল, তখন বলপ্রয়োগ বা চাপের একটিমাত্র কাজের ক্ষেত্রে, যা আগে বহুবার করা হয়নি, অর্থাৎ এর বিরোধিতা করা, তা করা ক্রমশ কম যুক্তিযুক্ত বলে মনে হতে লাগল । এটাই সেই "বিষের ফোঁটা" যার কথা ক্লজউইৎজ বলেছেন। একবার এই চারিত্রিক দুর্বলতা প্রকাশ পেলে , তার ফলস্বরূপ পরিস্থিতি ক্রমাগত খারাপ হতে থাকে এবং ভবিষ্যতের সমস্ত সিদ্ধান্তের উপর শয়তানের ফোঁটার মতো চেপে বসে । এটি জাতির গলায় এমন এক সীসার ওজন হয়ে উঠতে পারে যা ভাঙা যায় না এবং যা তাকে একটি দাসসুলভ জীবনযাপন করতে বাধ্য করে।

এইভাবে , জার্মানিতে একের পর এক নিরস্ত্রীকরণ, নিপীড়ন এবং অর্থনৈতিক লুণ্ঠনের আদেশ আসতে থাকে, যা আমাদেরকে রাজনৈতিকভাবে অসহায় করে তোলে। এই সবকিছুর প্রভাবে এমন এক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল যে অনেকেই ডাওয়েস পরিকল্পনাকে একটি আশীর্বাদ এবং লোকার্নো চুক্তিকে একটি সাফল্য হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করে। এক উচ্চতর দৃষ্টিকোণ থেকে, এই সমস্ত দুর্দশার মাঝে আমরা একটিমাত্র আশীর্বাদের কথা বলতে পারি । সেই আশীর্বাদটি হলো এই যে, যদিও মানুষকে ধোঁকা দেওয়া যায় , স্বর্গকে ঘুষ দেওয়া যায় না । স্বর্গ আমাদেরকে তার আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত করেছে। সেই সময় থেকে , দুর্দশা এবং উদ্বেগ আমাদের জাতির নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠেছে , এবং কষ্টই একমাত্র মিত্র যে আমাদের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছে। এক্ষেত্রেও, ভাগ্য কোনো ব্যতিক্রম করে না । সে আমাদের প্রাপ্য শাস্তি দিয়েছে। যেহেতু আমরা সম্মানের মূল্য দিতে জানতাম না, তাই সে আমাদের রুটি খোঁজার স্বাধীনতার মূল্য দিতে শিখিয়েছে । এখন জাতি রুটির জন্য কাঁদতে শিখেছে , হয়তো একদিন সে স্বাধীনতার জন্য প্রার্থনা করতেও শিখবে ।

১৯১৮ সালের পর আমাদের জাতির পতন ছিল তিক্ত ও সুস্পষ্ট। সে সময় আমাদের শত্রুরা যত জঘন্য উপায় বের করতে পারত, তার সব দিয়েই আমাদের ওপর অত্যাচার করা হয়েছিল , তাই এরপর যা ঘটেছিল তা তৎকালীন যে কেউই আগে থেকে অনুমান করতে পারত । আমাদের জাতি যে সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল , তা ছিল অহংকারী হওয়ার পাশাপাশি চরম অযোগ্যও, এবং যারা উদ্বেগজনক ও অপ্রীতিকর সতর্কবার্তা দিত, তাদের প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে এটি বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। আমরা তখন—এবং এখনও— দেখি , সংসদের সবচেয়ে বড় বোকারা, যারা ছিল নিছক জিন ও দস্তানা প্রস্তুতকারক—শুধু পেশাগতভাবেই নয়, কারণ পেশাগত পরিচয়ের আসলে কোনো অর্থই নেই—হঠাৎ করেই রাষ্ট্রনায়কের পদে উন্নীত হয়েছে এবং সেই উচ্চাসন থেকে সাধারণ মানুষদের কাছে ধর্মোপদেশ দিচ্ছে ।

এটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, এবং এখনও গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, এমন একজন ' রাষ্ট্রনায়ক' প্রায় ছয় মাস ধরে একজন সাধারণ বক্তা হিসেবে নিজের প্রতিভা দেখানোর পর, তিনি আসলে কে ছিলেন এবং কী হয়ে উঠেছিলেন তা প্রকাশ করেছিলেন।
জনসাধারণের উপহাস ও বিদ্রূপের পাত্র। তিনি যে চরম অযোগ্যতার সেরা প্রমাণ দিয়েছিলেন, তাতে কিছু যায় আসত না। না। তাতে আদৌ কিছু যায় আসত না। বরং , এই প্রজাতন্ত্রের এমন একজন সংসদীয় রাষ্ট্রনায়ক দেশের জন্য যত কম প্রকৃত সেবা করতেন, সংসদ সদস্যদের কাছ থেকে কোনো ইতিবাচক ফল আশা করা সমস্ত লোককে তারা তত বেশি নির্মমভাবে নির্যাতন করত । আর যে-ই সাহস দেখাত , তাকেই তারা নির্যাতন করত।

এই কাজগুলোর ব্যর্থতা তুলে ধরুন এবং ভবিষ্যতে অনুরূপ ব্যর্থতার পূর্বাভাস দিন। যদি কেউ

Machine Translated by Google

অবশেষে, এই সংসদ সদস্যদের মধ্যে একজনকে অকাট্য তথ্যের মুখে এমনভাবে চেপে ধরা হলো যে, এই রাজনৈতিক ভাঁড়টি তার সমস্ত কর্মকাণ্ড ও তার ফলাফলের প্রকৃত ব্যর্থতা আর অস্বীকার করতে পারলেন না। তখন তিনি হাজারো অজুহাত খুঁজলেন , কিন্তু কোনোভাবেই স্বীকার করলেন না যে, এই অশুভের মূল কারণ তিনিই ছিলেন।

* * *

বড়জোর ১৯২২-২৩ সালের শীতকালের মধ্যেই এটা সাধারণভাবে স্পষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত ছিল যে, শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরেও ফ্রান্স লৌহ- দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সেই লক্ষ্যগুলো অনুসরণ করে চলেছিল , যেগুলোকে তারা আদতে যুদ্ধের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য বলে মনে করেছিল। এটা বিশ্বাস করা অসম্ভব যে , শুধুমাত্র নিজেদের ভোগ করা ক্ষতির ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য ফ্রান্স সাড়ে চার বছর ধরে তার সমগ্র ইতিহাসের সবচেয়ে নির্ণায়ক যুদ্ধে নিজের জনগণের রক্ত ঝরিয়েছে। এমনকি শুধু আলসাস-লোরেনকেও ফ্রান্সের যুদ্ধ পরিচালনার শক্তির ব্যাখ্যা হিসেবে ধরা যেত না , যদি না আলসাস-লোরেনকে ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ এক বিশাল বৈদেশিক নীতি কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। এই কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল জার্মানিকে ভেঙে কয়েকটি ছোট ছোট রাষ্ট্রে পরিণত করা। এই কারণেই উগ্র জাতীয়তাবাদী ফ্রান্স আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে; এবং এর মাধ্যমে , এটি কার্যকরভাবে তার জাতিকে আন্তর্জাতিক ইহুদির কাছে পরাধীনতার জন্য বিক্রি করে দেয়।

বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্সের যুদ্ধাভিযান সফল হতো, যদি প্যারিসের আশানুরূপ যুদ্ধটি জার্মানির মাটিতে সংঘটিত হতো। আসুন আমরা কল্পনা করি যে, বিশ্বযুদ্ধের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধগুলো সোম, ফ্ল্যান্ডার্স, আরতোয়া, ওয়ারশ-র নিকটবর্তী এলাকা, নিজনি নোভগোরোদ, কাউনাস এবং রিগায় সংঘটিত না হয়ে, জার্মানিতে, রুহর অঞ্চলে , অথবা মাইন, এলবে, হ্যানোভারের নিকটবর্তী এলাকা, লাইপজিগ, নুরেমবার্গ ইত্যাদিতে সংঘটিত হয়েছিল। যদি এমনটা ঘটত, তবে আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে জার্মানির ধ্বংসসাধন সাধিত হতো । এটি একটি অত্যন্ত খোলা প্রশ্ন যে, আমাদের নবীন যুক্তরাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রটি সাড়ে চার বছর ধরে সেই কঠিন লড়াই চালিয়ে যেতে পারত কি না, যেভাবে কেন্দ্রীভূত ফ্রান্স শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তার সমস্ত জাতীয় কল্পনাকে প্যারিসে নিবদ্ধ রেখে লড়েছিল । যদি জাতিসমূহের মধ্যে এই মহাযুদ্ধ আমাদের মাতৃভূমির সীমানার বাইরে সংঘটিত হয়ে থাকে, তবে তা কেবল আমাদের পুরোনো সেনাবাহিনীর অমর সেবার কারণেই নয় , বরং জার্মানির ভবিষ্যতের জন্যও অত্যন্ত সৌভাগ্যজনক ছিল । আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, যদি পরিস্থিতি ভিন্ন দিকে মোড় নিত , তাহলে আজ আর কোনো জার্মান রাইখ থাকত না, বরং থাকত শুধু "জার্মান রাষ্ট্রসমূহ"। আর শুধুমাত্র এই কারণেই যুদ্ধে আমাদের বন্ধু ও ভাইদের ঝরে পড়া রক্ত অন্তত বৃথা যায়নি।

পরিস্থিতি ভিন্ন দিকে মোড় নিল। ১৯১৮ সালের নভেম্বরে, জার্মানি বজ্রপাতের মতো আকস্মিকভাবে ভেঙে পড়ল। দ্রুত। কিন্তু যখন দেশে বিপর্যয় ঘটল, তখনও হাই কমান্ডের সেনাবাহিনী শত্রুর ভূখণ্ডের গভীরে ছিল। এই সময়ে ফ্রান্সের প্রথম চিন্তা জার্মানিকে ভেঙে দেওয়া ছিল না, বরং যত দ্রুত সম্ভব জার্মান সেনাবাহিনীকে ফ্রান্স ও বেলজিয়াম থেকে বের করে আনার সমস্যা ছিল। যুদ্ধ শেষ করার জন্য , প্যারিসের সরকারকে প্রথম যে কাজটি করতে হতো তা হলো জার্মান সেনাবাহিনীকে নিরস্ত্র করে জার্মানিতে ফেরত পাঠানো। যতক্ষণ না এটি করা হচ্ছিল, ফ্রান্স তার নিজস্ব নির্দিষ্ট যুদ্ধ লক্ষ্য অর্জনে মনোযোগ দিতে পারছিল না। ইংল্যান্ডের ক্ষেত্রে , তার জন্য যুদ্ধ জয় তখনই হয়েছিল যখন জার্মানি একটি ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক শক্তি হিসেবে ধ্বংস হয়ে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। জার্মান রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করা ইংল্যান্ডের স্বার্থে ছিল না । অধিকন্তু, অনেক দিক থেকে, ইউরোপে ফ্রান্সের একটি ভবিষ্যৎ প্রতিদ্বন্দ্বী থাকা তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল । এইভাবে, ফ্রান্স শান্তিপূর্ণভাবে সেই নীতি অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছিল যার পথ যুদ্ধ খুলে দিয়েছিল; এবং ক্লেমেন্সোর এই উক্তি যে তার জন্য শান্তি ছিল কেবল যুদ্ধেরই একটি ধারাবাহিকতা।

এর ফলে যুদ্ধ এক প্রসারিত অর্থ লাভ করল।

ক্রমাগত এবং প্রতিটি সুযোগে রাইখের কাঠামোকে অস্থিতিশীল করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। একদিকে নিরস্ত্রীকরণের দাবিতে ক্রমাগত নতুন চিঠি পাঠিয়ে এবং অন্যদিকে নিরস্ত্রীকরণ প্রক্রিয়া অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে অর্থনৈতিক বোঝা চাপিয়ে দিয়ে , প্যারিসের তারা আশা করেছিল যে রাইখের কাঠামো ধীরে ধীরে ভেঙে পড়বে । জার্মানরা যত তাদের জাতীয় সম্মানবোধ হারাতে লাগল, ততই

Machine Translated by Google

রাজনৈতিক ধ্বংসের উপাদান হিসেবে অর্থনৈতিক চাপ এবং অবিরাম দুর্দশা আরও বেশি কার্যকর হতে পারত। দশ বা বিশ বছর ধরে পরিচালিত এই ধরনের রাজনৈতিক নিপীড়ন ও অর্থনৈতিক শোষণের নীতি দীর্ঘমেয়াদে এমনকি সবচেয়ে সংহত জাতিকেও ধ্বংস করতে বাধ্য এবং নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে তাকে ভেঙেও দিতে পারে। তখন ফ্রান্সের যুদ্ধকালীন লক্ষ্যগুলো চূড়ান্তভাবে অর্জিত হতো।

১৯২২-২৩ সালের শীতকাল নাগাদ ফ্রান্সের অভিপ্রায় নিশ্চয়ই অনেক আগেই জানা হয়ে গিয়েছিল। পরিস্থিতি মোকাবেলার দুটি সম্ভাব্য উপায় ছিল। জার্মান জাতি যদি যথেষ্ট বেহায়া প্রমাণিত হতো, তবে তারা ধীরে ধীরে ফ্রান্সের মনোবল দুর্বল করে দিতে পারত, অথবা তারা—একবারে—সেই কাজটি করতে পারত যা একদিন অবশ্যম্ভাবী ছিল: কোনো বিশেষ নৃশংস দমনমূলক কর্মকাণ্ডে উস্কানি পেয়ে, তারা একটি জার্মান রাষ্ট্রীয় জাহাজের ব্রিজকে যুদ্ধ-সতর্কতায় এনে শত্রুকে ধাক্কা দিতে পারত। এর অর্থ অবশ্যই হতো এক মরণপণ লড়াই। আর এই লড়াই থেকে জীবিত বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা নির্ভর করত এই দ্বিতীয় লড়াইয়ে ফ্রান্সকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে কি না তার উপর, যাতে জার্মানিকে আবার সমগ্র বিশ্বের বিরুদ্ধে লড়াই করতে না হয়, বরং ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জার্মানির প্রতিরক্ষায় লড়াই করতে হয়, যে ফ্রান্স ক্রমাগত বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত করছিল।

আমি এখানে জোর দিয়ে বলছি, এবং এ ব্যাপারে আমি গভীরভাবে নিশ্চিত যে, এই দ্বিতীয় বিকল্পটি একদিন বেছে নেওয়া হবে এবং তা বেছে নিতেই হবে ও কোনো না কোনোভাবে কার্যকর করতে হবে। আমি কখনোই বিশ্বাস করব না যে ফ্রান্স স্বেচ্ছায় আমাদের প্রতি তার উদ্দেশ্য পরিবর্তন করবে, কারণ শেষ পর্যন্ত সেগুলো ফরাসিদের আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তিরই একটি প্রকাশ মাত্র। আমি যদি ফরাসি হতাম, এবং ফ্রান্সের মহত্ত্ব যদি আমার কাছে জার্মানির মহত্ত্বের মতোই প্রিয় হতো, তাহলে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে আমি ক্লেমেন্সোর থেকে ভিন্ন কিছু চাইতাম না এবং ভিন্ন কোনো কাজও করতাম না। ফরাসি জাতি, যা ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পথে—জনসংখ্যা হ্রাসের কারণে ততটা নয়, যতটা জাতির শ্রেষ্ঠ উপাদানগুলোর বিলুপ্তির কারণে— বিশ্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যেতে পারে কেবল যদি জার্মানি ধ্বংস হয়। এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথে ফরাসি নীতি হাজারো বাঁক নিতে পারে, কিন্তু জার্মানির ধ্বংসই হলো সেই লক্ষ্য যা ফ্রান্সের গভীরতম আকাঙ্ক্ষা ও চূড়ান্ত অভিপ্রায়ের পরিপূর্ণতা হিসেবে সর্বদা তার মনে ছিল। এটা বিশ্বাস করা ভুল যে, যদি এক পক্ষের ইচ্ছা নিষ্ক্রিয় থাকে এবং কেবল নিজের অস্তিত্ব রক্ষায় মনোনিবেশ করে, তবে তা নিজেকে রক্ষা করতে পারবে।

অন্য এক ইচ্ছার বিরুদ্ধে, যা কোনো অংশে কম শক্তিশালী নয়, বরং সক্রিয়। যতদিন ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যকার চিরন্তন সংঘাত কেবল ফরাসি আক্রমণের বিরুদ্ধে জার্মান প্রতিরক্ষার রূপেই বিদ্যমান থাকবে, ততদিন এর কোনো সমাধান হবে না; এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জার্মানি একটি হারাবে।
অপরপক্ষে অবস্থান। যদি আমরা দ্বাদশ শতাব্দী থেকে আমাদের বর্তমান সময় পর্যন্ত, জার্মান-ভাষী অঞ্চলের মধ্যে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনগুলো পর্যালোচনা করি, তবে এমন একটি আচরণবিধির গ্রহণযোগ্যতা ও বিকাশ যে আমাদের জন্য ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে, সে বিষয়ে আশা করা কঠিন, যা এ পর্যন্ত আমাদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে।

কেবলমাত্র যখন জার্মানি এই সবকিছু বিবেচনায় নেবে, তখনই সে নিষ্ক্রিয় প্রতিরক্ষায় তার টিকে থাকার জাতীয় ইচ্ছাকে নিঃশেষ হতে দেবে না, বরং ফ্রান্সের বিরুদ্ধে এক শেষ ও নির্ণায়ক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবে। এবং এই যুদ্ধটি লড়া হবে জার্মান জাতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যের জন্য।
কেবল তখনই যুগ যুগ ধরে চলে আসা ফরাসি-জার্মান সংঘাতের অবসান ঘটানো সম্ভব হবে, যা এ পর্যন্ত অত্যন্ত নিষ্ফল প্রমাণিত হয়েছে। অবশ্যই, এর জন্য ধরে নিতে হবে যে জার্মানরা ফ্রান্সকে প্রতিহত করাকে শুধুমাত্র একটি উপায় হিসেবে দেখবে, যার মাধ্যমে অবশেষে আমাদের জাতি ভিন্ন দিকে প্রসারিত হতে পারবে। আজ ইউরোপে আশি মিলিয়ন জার্মান বাস করে। এবং আমাদের পররাষ্ট্রনীতিকে তখনই যথাযথভাবে পরিচালিত বলে গণ্য করা যাবে, যখন মাত্র একশ বছর পর এই মহাদেশে ২৫ কোটি জার্মান বাস করবে — অন্য কোনো মহাদেশের কারখানায় কুলিদের মতো গাদাগাদি করে নয়, বরং মাটির চাষী এবং এমন কর্মী হিসেবে, যাদের কাজ পারস্পরিকভাবে তাদের অস্তিত্ব নিশ্চিত করবে।

১৯২২ সালের ডিসেম্বরে, জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যকার পরিস্থিতি এক বিশেষভাবে হুমকিপূর্ণ রূপ ধারণ করে। ফ্রান্স নতুন, অত্যন্ত কঠোর পদক্ষেপের কথা বিবেচনা করছিল এবং তাদের এই কাজের জন্য অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল। অর্থনৈতিক লুণ্ঠনের আগে রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগ করা অপরিহার্য ছিল, এবং ফরাসিরা বিশ্বাস করত যে শুধুমাত্র জার্মান জীবনের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের উপর একটি নৃশংস আক্রমণের মাধ্যমেই তারা আমাদের "অবাধ্য" জাতিকে তাদের বিরক্তিকর শাসনের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য করতে পারবে। রুহর অঞ্চল দখল করে ফ্রান্স কেবল চূড়ান্ত দুর্বলতাই নয়, বরং আরও অনেক কিছুর আশা করেছিল।

Machine Translated by Google

জার্মানির নৈতিক মেরুদণ্ড ধ্বংস করা , কিন্তু আমাদের দেশে এমন এক গুরুতর অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি করা যে আমরা সবচেয়ে কঠিন দায়ভার গ্রহণ করতে বাধ্য হব ।

লক্ষ্য ছিল জার্মানিকে ভেঙে চুরমার করে দেওয়া। জার্মানি প্রথমে ভেঙেছিল , এবং তারপর পুরোপুরি ধসে পড়েছিল ।

রুহর অঞ্চল দখলের মাধ্যমে ভাগ্য আবারও জার্মান জনগণের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তাদের জেগে উঠতে সাহায্য করেছিল। যা প্রথমে এক ভয়াবহ দুর্ভাগ্য বলে মনে হয়েছিল , তা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের পর তাদের দুর্ভোগের অবসান ঘটানোর জন্য অবিশ্বাস্যভাবে আশাব্যঞ্জক সম্ভাবনা ধারণ করেছিল বলে প্রমাণিত হয় ।
জার্মান।

পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে, রুহর অঞ্চলে ফরাসি দখলদারিত্ব প্রথমবারের মতো ইংল্যান্ডকে গভীরভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এটি কেবল সেইসব ব্রিটিশ কূটনীতিকদেরই বিচ্ছিন্ন করেনি, যারা শান্ত ও বস্তুনিষ্ঠ হিসাবনিকাশের ভিত্তিতে ফ্রান্সের সাথে একটি মৈত্রী স্থাপন ও বজায় রেখেছিলেন , বরং দেশের একটি বড় অংশকেও বিচ্ছিন্ন করে।
ইংরেজ জাতির একটি অংশ । বিশেষ করে ইংরেজ ব্যবসায়িক জগৎ, মহাদেশে ফ্রান্সের শক্তি বৃদ্ধিতে এই অবিশ্বাস্য অগ্রগতির প্রতি তাদের অসন্তোষ প্রায় গোপনই করতে পারেনি। সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে, ফ্রান্স মহাদেশে এমন একটি অবস্থান অর্জন করেছিল যা জার্মানি কখনওই অধিকার করতে পারেনি। অধিকন্তু , ফ্রান্স এর মাধ্যমে এমন অর্থনৈতিক সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করে যা তাকে কার্যত একচেটিয়া আধিপত্য এনে দেয় এবং সমস্ত প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে তার রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক শক্তিকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। ইউরোপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লোহা ও কয়লার খনিগুলো এখন এমন একটি দেশের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল, যে দেশটি জার্মানির মতো নয় , বরং ততদিন পর্যন্ত সক্রিয়ভাবে ও বিচক্ষণতার সাথে তার গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ রক্ষা করে এসেছিল এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যার সামরিক কার্যকারিতা তখনও বিশ্বের স্মৃতিতে তাজা ছিল । রুহর কয়লাক্ষেত্রে ফরাসি দখলদারিত্ব ইংল্যান্ডকে যুদ্ধে তার সমস্ত সাফল্য থেকে বঞ্চিত করেছিল ।

বিজয়ী ছিলেন মার্শাল ফক এবং তাঁর প্রতিনিধিত্বকারী ফ্রান্স —সেই অস্থির ও নীতিবান ব্রিটিশ রাষ্ট্রনায়কেরা।

ইতালিতে ফ্রান্সের প্রতি মনোভাব, যা যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকেই প্রতিকূল ছিল, তা বৈরী হয়ে উঠল। এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক মুহূর্ত এসে গিয়েছিল, যখন গতকালের মিত্ররা আগামীকালের শত্রুতে পরিণত হতে পারত। যদি এর পরিণতি ভিন্ন হতো, এবং মিত্রশক্তিগুলো যদি দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধের মতো হঠাৎ একে অপরের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে না পড়ত , তার কারণ ছিল রাইখ চ্যান্সেলর এনভার পাশা নন, বরং কুনো ছিলেন।

তথাপি, রুহরে ফরাসি আক্রমণ কেবল জার্মান পররাষ্ট্রনীতিরই নয়, বরং অভ্যন্তরীণ নীতির ভবিষ্যতের জন্যও ব্যাপক সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছিল । এর একটি বড় অংশ
আমাদের জাতি, যারা এক মিথ্যাবাদী সংবাদপত্রের অবিরাম প্রভাবে ফ্রান্সকে প্রগতি ও স্বাধীনতার রক্ষাকর্তা হিসেবে দেখত , হঠাৎ করেই এই বিভ্রম থেকে মুক্ত হলো । ১৯১৪ সালে, আমাদের জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর মন থেকে আন্তর্জাতিক সংহতির স্বপ্ন হঠাৎ উবে গেল। তারা ফিরে গেল এক অন্তহীন সংগ্রামের জগতে , যেখানে এক জীব আরেক জীবকে ভক্ষণ করে , এবং যেখানে সবলের জীবনের জন্য দুর্বলের মৃত্যু অপরিহার্য । ১৯২৩ সালের বসন্তেও একই ঘটনা ঘটেছিল ।

যখন ফ্রান্স তার হুমকি বাস্তবায়ন করে প্রথমে দ্বিধাগ্রস্ত ও সতর্কতার সাথে জার্মান কয়লাক্ষেত্রে প্রবেশ করল , তখনই জার্মানির জন্য সেই ক্ষণটি এসে গিয়েছিল। এটি ছিল এক মহান ও নির্ণায়ক মুহূর্ত। যদি সেই মুহূর্তে আমাদের জাতি শুধু তার চিন্তাভাবনাই নয়, তার আচরণও পরিবর্তন করত, তবে জার্মানির রুহর অঞ্চলটি ফ্রান্সের জন্য তাই হয়ে উঠতে পারত, যা নেপোলিয়নের জন্য মস্কো ছিল । মাত্র দুটি পথ খোলা ছিল : কিছুই না করে পরিস্থিতিকে তার নিজের ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দেওয়া , অথবা এই অঞ্চলটিকে শ্বাসরুদ্ধকর কামারশালা ও জ্বলন্ত চুল্লির এক অঞ্চলে রূপান্তরিত করা। এই চলমান কলঙ্কের অবসান ঘটাতে এবং এর কাছে আত্মসমর্পণ না করে ক্ষণিকের এই আতঙ্কের মোকাবিলা করার জন্য জাতির ইচ্ছাশক্তি ও সংকল্পকে প্রজ্বলিত করার একটি প্রচেষ্টা চালানো যেত ।

অন্তহীন আতঙ্ক ।

কুনো, যিনি তখন রাইখের চ্যান্সেলর ছিলেন, একটি তৃতীয় পথ খুঁজে বের করে অমর পুণ্য অর্জন করেন; এবং আমাদের জার্মান বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলো তাঁর প্রশংসা ও সহযোগিতা করে আরও বেশি খ্যাতি লাভ করে ।

আমি এখানে এই দ্বিতীয় পথটি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

Machine Translated by Google

রুহর দখল করে ফ্রান্স ভার্সাই চুক্তির বিধানগুলো নির্লজ্জভাবে লঙ্ঘন করেছিল। তার এই কর্মকাণ্ড চুক্তির বেশ কয়েকটি জামিনদার, বিশেষ করে ইংল্যান্ড ও ইতালির কাছ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল । তার এই স্বার্থপর দস্যুবৃত্তিতে সমর্থনের জন্য সে আর এই রাষ্ট্রগুলোর ওপর নির্ভর করতে পারছিল না । এই অভিযান থেকে কোনো ইতিবাচক ফল লাভের জন্য সে কেবল নিজের ওপরই নির্ভর করতে পারত । জার্মান জাতীয় সরকারের জন্য কেবল একটিই সম্ভাব্য পথ ছিল । এবং এই পথটি ছিল সম্মান দ্বারা নির্ধারিত। অবশ্যই, প্রথমে আমরা সক্রিয়ভাবে শক্তি প্রয়োগ করে ফ্রান্সের বিরোধিতা করতে পারতাম না । কিন্তু এটা পরিষ্কারভাবে বোঝা প্রয়োজন ছিল যে , শক্তির যুক্তি ছাড়া যেকোনো আলোচনা নিষ্ফল ও হাস্যকর। যদি সক্রিয় প্রতিরোধ সংগঠিত করা না যায় , তবে এই অবস্থান গ্রহণ করাটা অযৌক্তিক: "আমরা কোনো আলোচনায় প্রবেশ করব না ।" কিন্তু এর চেয়েও বেশি অযৌক্তিক ছিল আলোচনাকে সমর্থন করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সংগঠিত না করেই চূড়ান্তভাবে আলোচনায় প্রবেশ করা ।

সামরিক উপায়ে আমরা রুহর অঞ্চলের দখল ঠেকাতে পারিনি । কেবল একজন উন্মাদই এমন সিদ্ধান্তের পরামর্শ দিতে পারত। কিন্তু, সেই সময়ে ফ্রান্সের গৃহীত পদক্ষেপে প্রভাবিত হয়ে , ভার্সাই চুক্তির প্রতি কোনো তোয়াক্কা না করেই —যে চুক্তি ফ্রান্স নিজেই লঙ্ঘন করেছিল—এমন সামরিক শক্তি জোগাড় করা সম্ভব ও প্রয়োজনীয় ছিল, যা পরবর্তীকালে আলোচনার সমর্থনে একটি যুক্তি হিসেবে কাজ করবে। কারণ শুরু থেকেই এটা স্পষ্ট ছিল যে, এই ফরাসি-অধিকৃত অঞ্চলের ভাগ্য একদিন কোনো এক আলোচনা টেবিলেই নির্ধারিত হবে। কিন্তু এটাও সকলের কাছে স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন ছিল যে, সেরা আলোচকরাও খুব বেশি সাফল্য অর্জন করতে পারবে না, যদি না তাদের দাঁড়ানোর ভূমি এবং বসার চেয়ার তাদের নিজ জাতির সশস্ত্র সুরক্ষার অধীনে থাকে । একজন দুর্বল বামন যেমন একজন ক্রীড়াবিদের বিরোধিতা করতে পারে না , তেমনি সশস্ত্র সমর্থনহীন একজন আলোচককে অবশ্যই আত্মসমর্পণ করতে হবে যখন ব্রেনাস শত্রুপক্ষের দাঁড়িপাল্লায় তার তলোয়ার ছুঁড়ে মারেন , যতক্ষণ না সমান শক্তিশালী আরেকটি তলোয়ার দাঁড়িপাল্লায় ছুঁড়ে দিয়ে ভারসাম্য বজায় রাখা যায় । ১৯১৮ সাল থেকে শত্রুপক্ষের চাপিয়ে দেওয়া প্রতিটি স্বেচ্ছাচারী নির্দেশের আগে যে আলোচনার প্রহসন চলে আসছিল, তা প্রত্যক্ষ করাও ছিল সমান হতাশাজনক । আমরা বিশ্বের সামনে এক করুণ দৃশ্যের অবতারণা করেছিলাম, যখন উপহাসের ছলে আমাদের আলোচনার টেবিলে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এমন সব সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচীর সামনে, যা অনেক আগেই তৈরি করা হয়েছিল এবং আলোচনার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু যা শুরু থেকেই অপরিবর্তনীয় বলে ধরে নিতে হতো । এটা সত্যি যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের আলোচকরা ছিলেন মাঝারি মানের যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ । অধিকাংশ ক্ষেত্রে , তারা লয়েড জর্জের করা সেই নির্লজ্জ পর্যবেক্ষণকেই কেবল সমর্থন করেছিলেন , যখন তিনি পূর্ববর্তী রাইখ চ্যান্সেলর, হের সাইমনের উপস্থিতিতে বিদ্রূপ করে মন্তব্য করেছিলেন যে, জার্মানরা তাদের নেতা ও প্রতিনিধি হিসেবে বুদ্ধিমান লোক নির্বাচিত করতে অক্ষম । কিন্তু একদিকে শত্রুপক্ষের হাতে থাকা যুক্তিসঙ্গত সংকল্প ও শক্তি এবং অন্যদিকে জার্মানির করুণ অসহায়ত্বের মুখে , এমনকি প্রতিভাধর ব্যক্তিরাও জার্মানির জন্য খুব বেশি কিছু অর্জন করতে পারতেন না ।

তবে ১৯২৩ সালের বসন্তে, রুহর অঞ্চলে ফরাসি আক্রমণকে জার্মানির সামরিক শক্তি পুনর্গঠনের সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করার কথা যারা ভাবতেন , তাদের প্রথমে জাতির নৈতিক অস্ত্রশস্ত্র পুনরুদ্ধার করতে, এর ইচ্ছাশক্তিকে শক্তিশালী করতে এবং জাতীয় শক্তির এই সবচেয়ে মূল্যবান উপাদানটি যারা ধ্বংস করেছিল, তাদের অপসারণ করতে হতো।

ঠিক যেমন ১৯১৪ ও ১৯১৫ সালে মার্ক্সবাদী সর্পকে চিরতরে বিনাশ করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য ১৯১৮ সালে আমাদের রক্ত দিয়ে মূল্য দিতে হয়েছিল, তেমনি এখন আমাদের হতে হলো
১৯২৩ সালের বসন্তে দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা এবং আমাদের জনগণের হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী মার্ক্সবাদীদের কর্মকাণ্ড চিরতরে মুছে ফেলার যে সুযোগ আমাদের দেওয়া হয়েছিল, তা কাজে না লাগানোর জন্য আমাদের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল ।

ফরাসি আগ্রাসনকে কার্যকর প্রতিরোধের মাধ্যমে মোকাবিলা করার যেকোনো ধারণাই ছিল নিতান্তই উন্মাদনা, যতক্ষণ না সেই শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করা হলো , যারা পাঁচ বছর আগে দেশের অভ্যন্তরে নিজেদের প্রভাব খাটিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে জার্মান প্রতিরোধ ভেঙে দিয়েছিল। কেবল বুর্জোয়া মনই এই অবিশ্বাস্য ধারণাটি কল্পনা করতে পারত যে মার্ক্সবাদ সম্ভবত এখন অন্য কিছুতে পরিণত হয়েছে , এবং ১৯১৮ সালের সেই মূল হোতা ও দুষ্কৃতকারীরা, যারা নির্দয়ভাবে ক্ষমতায় উঠেছিল...

সরকারের বিভিন্ন পদে থাকা বিশ লক্ষ মৃত মানুষের লাশের পর , এখন, ১৯২৩ সালে, তারা হঠাৎ করেই জাতীয় চেতনার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে প্রস্তুত ছিল । এটা সত্যিই অবিশ্বাস্য ছিল।

Machine Translated by Google

এই বিশ্বাসঘাতকরা হঠাৎ করে জার্মান স্বাধীনতার রক্ষক হয়ে উঠবে, এমনটা আশা করাটা পাগলামি। তাদের তেমন কোনো ইচ্ছা ছিল না। ঠিক যেমন একটি হায়েনা তার মৃতদেহ পরিত্যাগ করে না, তেমনি একজন মার্ক্সবাদীও পরিত্যাগ করতে পারে না। দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতায় অংশ নেওয়া। এই মূর্খতাপূর্ণ পাল্টা যুক্তি দেওয়ার কোনো মানে হয় না যে বহু শ্রমিক জার্মানির জন্য তাদের রক্ত দিয়েছে। জার্মান শ্রমিকেরা, হ্যাঁ, কিন্তু আন্তর্জাতিক মার্ক্সবাদীরা নয়। ১৯১৪ সালে জার্মান শ্রমিক শ্রেণি যদি সত্যিকারের মার্ক্সবাদীদের নিয়ে গঠিত হতো, তাহলে যুদ্ধ তিন সপ্তাহের মধ্যেই শেষ হয়ে যেত। প্রথম সৈন্য সীমান্ত পার হওয়ার আগেই জার্মানির পতন ঘটত। না। জার্মান জাতি যে যুদ্ধ করেছিল, তা প্রমাণ করে যে মার্ক্সবাদী উন্মাদনা গভীরভাবে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধ যত দীর্ঘায়িত হতে থাকল, জার্মান সৈন্য ও শ্রমিকেরা ধীরে ধীরে মার্ক্সবাদী নেতাদের হাতে ফিরে যেতে লাগল , এবং তাদের অনেকেই দেশের জন্য প্রাণ হারাল। যদি যুদ্ধের শুরুতে , বা এমনকি যুদ্ধ চলাকালীনও, দেশকে বিষাক্ত করে তোলা বারো বা পনেরো হাজার ইহুদিকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করা হতো, তবে তা একটি লজ্জাজনক ঘটনা হতো।

বিষাক্ত গ্যাসের হাত থেকে বাঁচতে, যেমনটা যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বশ্রেণী ও পেশার লক্ষ লক্ষ সেরা জার্মান কর্মীকে বাঁচানো হয়েছিল, তাহলে রণাঙ্গনে উৎসর্গিত লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন বৃথা যেত না। বরং এর বিপরীত: যদি এই খলনায়কদের মধ্যে বারো হাজার জনকে যথাসময়ে নির্মূল করা যেত , তাহলে সম্ভবত দশ লক্ষ সৎ মানুষের জীবন রক্ষা পেত, যারা ভবিষ্যতে জার্মানির জন্য মূল্যবান হয়ে উঠত।

কিন্তু বুর্জোয়াদের ক্ষমতা প্রয়োগের রীতি অনুসারে , তারা বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে লক্ষ লক্ষ মানুষকে যুদ্ধক্ষেত্রে জবাই করার জন্য তুলে দিয়েছে, অথচ দশ -বারো হাজার বিশ্বাসঘাতক, ফটকাবাজ, মহাজন এবং প্রতারককে সবচেয়ে মূল্যবান ও পবিত্র জাতীয় সম্পদ বলে গণ্য করে তাদের অলঙ্ঘনীয় ঘোষণা করেছে। এই বুর্জোয়া মহলের সবচেয়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য কোনটি — মানসিক নির্বুদ্ধিতা, নাকি নৈতিক দুর্বলতা— তা বলা সত্যিই কঠিন।

এবং কাপুরুষতা, অথবা স্রেফ এক শোচনীয় মানসিকতা। এই শ্রেণিটির ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী , কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এটি পুরো জাতিকে নিজের সাথে অতল গহ্বরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

১৯২৩ সালের পরিস্থিতি ১৯১৮ সালের পরিস্থিতির মতোই ছিল। প্রতিরোধের যে রূপই বেছে নেওয়া হোক না কেন , পদক্ষেপ গ্রহণের প্রথম পূর্বশর্ত ছিল জাতির দেহ থেকে মার্ক্সবাদী বিষ নির্মূল করা। এবং আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, একটি সত্যিকারের জাতীয় সরকারের প্রথম কাজ হলো মার্ক্সবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শক্তি খুঁজে বের করা এবং সেই শক্তিগুলোকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া। এমন এক মুহূর্তে যখন এক বহিরাগত শত্রু পিতৃভূমির উপর মারাত্মক আঘাত হানছে এবং দেশের প্রতিটি রাস্তার মোড়ে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ওঁত পেতে আছে, তখন 'শৃঙ্খলা ও শান্তির' মূর্তির কাছে মাথা নত করা তার কর্তব্য ছিল না। না। একটি সত্যিকারের জাতীয় সরকারের দাঙ্গা ও বিশৃঙ্খলায় আনন্দিত হওয়া উচিত , যদি এর মাধ্যমে সে অবশেষে মার্ক্সবাদীদের মোকাবিলা করতে পারে, যারা আমাদের জাতির ঘোর শত্রু। যদি তা না করা হয়, তবে প্রতিরোধের কথা ভাবাও চরম উন্মাদনা , তা যে রূপেই হোক না কেন।

অবশ্যই, মার্ক্সবাদীদের সাথে এই ধরনের হিসাব-নিকাশের নিষ্পত্তি একটি প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা হবে এবং তা কোনো গোপন পরিষদ দ্বারা বা কোনো মন্ত্রীর শীর্ণ মস্তিষ্কে উদ্ভাবিত পরিকল্পনা অনুসারে সম্পন্ন করা যাবে না। এটি পৃথিবীতে জীবনের শাশ্বত নিয়ম অনুসারেই সম্পন্ন করতে হবে, যা এক অন্তহীন প্রক্রিয়া এবং তা-ই থাকবে।

এটি অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম। সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, অনেক ক্ষেত্রে সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের যন্ত্রণা থেকে একটি শক্তিশালী ও সুস্থ জাতির উদ্ভব ঘটেছে, অপরদিকে কৃত্রিমভাবে বাধাগ্রস্ত শান্তি প্রায়শই এমন জাতীয় অবক্ষয়ের কারণ হয়েছে যার দুর্গন্ধ আকাশ ছুঁয়েছে। দড়ি দিয়ে কোনো জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করা যায় না। ১৯২৩ সালে, জাতির দেহকে ধ্বংসকারী বিষধর সাপগুলোকে নির্মমভাবে নির্মূল করা অপরিহার্য ছিল। যদি তা করা হতো, তবে সক্রিয় প্রতিরোধের প্রথম প্রয়োজনীয় শর্তটি পূরণ হয়ে যেত।

এই সময়ে, আমি প্রায়ই ভাঙা গলায় কথা বলতাম, অন্তত তথাকথিত জাতীয়তাবাদী মহলকে বোঝানোর চেষ্টা করতাম যে কী ঝুঁকির মুখে ছিল এবং ১৯১৪ ও তার পরবর্তী বছরগুলোতে করা ভুলগুলোর পুনরাবৃত্তি করলে আমরা ১৯১৮ সালের মতোই একই বিপর্যয়ে পড়তে বাধ্য। আমি প্রায়ই তাদের কাছে মিনতি করতাম যেন তারা ভাগ্যকে তার নিজের মতো চলতে দেয় এবং আমাদের আন্দোলনকে মার্ক্সবাদীদের মোকাবিলা করার সুযোগ দেয়। কিন্তু আমার কথায় কেউ কান দিচ্ছিল না। সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়কসহ প্রত্যেকেই ভাবত যে তারাই বেশি জানে , যতক্ষণ না অবশেষে তারা ইতিহাসে পরিচিত সবচেয়ে জঘন্য আত্মসমর্পণপত্রে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হলো।

Machine Translated by Google

আমি গভীরভাবে উপলব্ধি করলাম যে জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণি তাদের লক্ষ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে এবং এর বাইরে আর কোনো ভূমিকা পালনে অক্ষম । আমি এও বুঝতে পারলাম যে, সমস্ত বুর্জোয়া দল মার্ক্সবাদকে ধ্বংস করার কোনো আন্তরিক ইচ্ছা ছাড়াই, কেবল প্রতিযোগিতার খাতিরেই এর বিরুদ্ধে লড়েছিল । তারা অনেক আগেই নিজেদের দেশের ধ্বংসযজ্ঞে অংশ নিতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের সবচেয়ে বড় চিন্তা ছিল সেই দেশের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ভালো আসন নিশ্চিত করা। কেবল এই কারণেই তারা 'লড়াই' চালিয়ে যাচ্ছিল।

সেই সময়ে—আমি খোলাখুলিভাবেই স্বীকার করছি— আল্পস পর্বতমালার ওপার থেকে আসা সেই মহান মানুষটির প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা জন্মেছিল, যাঁর দেশের প্রতি তীব্র ভালোবাসা তাঁকে ইতালির অভ্যন্তরীণ শত্রুদের সাথে আপোস না করে, বরং তাদের থেকে মুক্তি পেতে সমস্ত সম্ভাব্য উপায় অবলম্বন করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। মার্ক্সবাদীদের সাথে ইতালিকে বিভক্ত না করে, বরং একে মুক্ত করার মুসোলিনির সিদ্ধান্ত ।
মার্কসবাদ থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিকতাবাদের ধ্বংস পর্যন্ত তার দেশের এই উত্তরণ তাকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের কাতারে স্থান দিয়েছে ।

জার্মানিতে আমাদের কাল্পনিক 'রাষ্ট্রনায়করা' তুলনামূলকভাবে নিকৃষ্ট বলে মনে হয় ।
হতভাগা বামনগুলো। নিজেদের চেয়ে হাজার গুণ বড় একজন মানুষের সমালোচনা করা এই সাধারণ মানের লোকগুলোর ঔদ্ধত্য ও ধৃষ্টতা দেখে আমার গা গুলিয়ে ওঠে। এটা ভেবে কী যে কষ্ট হয় যে, এই সবকিছু এমন একটা দেশে ঘটছে, যার নেতা ছিলেন মাত্র পঞ্চাশ বছর আগেও বিসমার্ক ।

১৯২৩ সালে বুর্জোয়াদের গৃহীত মনোভাব এবং মার্ক্সবাদীদের সাথে তাদের নম্রভাবে আলোচনার পদ্ধতিই রুহর অঞ্চলে যেকোনো সক্রিয় প্রতিরোধের প্রচেষ্টার ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত করে দিয়েছিল ।
আমাদের নিজেদের শিবিরে এমন এক মারাত্মক শত্রু থাকা সত্ত্বেও ফ্রান্সের সাথে যুদ্ধ করার কথা ভাবাটাও ছিল চরম বোকামি । বড়জোর, তারা জার্মান জাতীয়তাবাদী সত্তাকে কিছুটা সন্তুষ্ট করতে , 'উত্তপ্ত জনমতকে ' শান্ত করতে বা উত্তেজিত করতে একটি লোকদেখানো যুদ্ধ শুরু করতে পারত, যা ছিল তাদের আসল লক্ষ্য। তারা যা করছিল তাতে যদি সত্যিই বিশ্বাস করত, তবে তাদের বুঝতে হতো যে একটি জাতির শক্তি প্রধানত তার অস্ত্রে নয়, বরং তার ইচ্ছাশক্তিতে নিহিত , এবং বাহ্যিক শত্রুকে পরাজিত করার আগে অভ্যন্তরীণ শত্রুকে নির্মূল করতে হবে । তা করতে ব্যর্থ হলে , প্রথম দিনেই বিজয় অর্জিত না হলে এক মহাবিপর্যয় ঘটবে । অভ্যন্তরীণ শত্রুদের থেকে মুক্ত না হওয়া একটি জাতির প্রতিরোধ ভেঙে দিতে এবং শত্রুকে একটি চূড়ান্ত বিজয় এনে দিতে একটিমাত্র পরাজয়ের ছায়াই যথেষ্ট ছিল।

১৯২৩ সালের বসন্তে এই সবকিছুই আগে থেকে অনুমান করা যেত । সেই সময়ে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সামরিক সাফল্য আশা করা যেত কি না, তা জিজ্ঞাসা করা নিরর্থক । যদি রুহর অঞ্চলে ফরাসি আক্রমণের ফলে দেশে মার্ক্সবাদ ধ্বংস হয়ে যেত , তবে সাফল্য আমাদের পক্ষেই থাকত। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অস্তিত্বের মারাত্মক শত্রুদের থেকে মুক্ত হয়ে জার্মানি এমন এক শক্তির অধিকারী হতো, যা বিশ্বের অন্য কোনো শক্তি আর কখনো দমন করতে পারত না। যেদিন জার্মানিতে মার্ক্সবাদের পতন ঘটবে, সেদিন জার্মানিকে বেঁধে রাখা শৃঙ্খল চিরতরে ভেঙে যাবে । আমাদের ইতিহাসে আমরা কখনো বাহ্যিক শত্রুদের শক্তির কাছে পরাজিত হইনি , বরং কেবল নিজেদের ভুল এবং নিজেদের শিবিরের ভেতরের শত্রুদের কাছেই পরাজিত হয়েছি।

যেহেতু সরকার সেই সময়ে এমন বীরত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে সক্ষম ছিল না , তাই এটি বেছে নিতে পারত
প্রথম উপায়টি হলো: অর্থাৎ, পরিস্থিতিকে তার নিজের গতিতে চলতে দেওয়া এবং কিছুই না করা।

কিন্তু এই মহান মুহূর্তে, ঈশ্বর জার্মানিকে একজন মহান ব্যক্তি দান করলেন। তিনি ছিলেন হের কুনো। তিনি পেশাগতভাবে রাষ্ট্রনায়ক বা রাজনীতিবিদ ছিলেন না, জন্মসূত্রে রাজনীতিবিদ তো নয়ই। তিনি ছিলেন সেই ধরনের রাজনীতিবিদ, যাঁরা কোনো নির্দিষ্ট বিষয় নিষ্পত্তি করতে অভ্যস্ত । তাছাড়া, ব্যবসায়ী হিসেবেও তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল । জার্মানির জন্য এটি এক অভিশাপ ছিল যে, তিনি রাজনীতিকে একটি বাণিজ্যিক উদ্যোগ হিসেবে দেখতেন এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতেন।

ফ্রান্স রুহর দখল করে আছে । রুহরে কী আছে ? কয়লা। সুতরাং, ফ্রান্স কয়লা পাওয়ার জন্যই রুহর দখল করছে । ফ্রান্সকে কয়লা পাওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য ধর্মঘটের ধারণার চেয়ে হের কুনোর কাছে আর কী বেশি স্বাভাবিক হতে পারত ? হের কুনো বিশ্বাস করতেন যে, দখলদারিত্ব যদি আর লাভজনক না থাকে , তবে একদিন ফ্রান্স রুহর থেকে সরে আসবে । এই বিশিষ্ট রাষ্ট্রনায়কের যুক্তি কমবেশি এমনই ছিল । স্টুটগার্টে এবং অন্যান্য স্থানে তিনি জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন এবং জাতি তাঁর দ্বারা মুগ্ধ হয়েছিল। অবশ্যই , ধর্মঘটের জন্য তাদের মার্ক্সবাদীদের প্রয়োজন ছিল, কারণ শ্রমিকদের প্রথমে ধর্মঘট করতে হতো। বুর্জোয়াদের জন্য—

Machine Translated by Google

কুনোর মতো একজন এশীয় রাষ্ট্রনায়কের কাছে মার্ক্সবাদী ও শ্রমিক ছিল অভিন্ন। তাই , শ্রমিকদেরকে অন্য সকল জার্মানদের সাথে একটি সাধারণ ফ্রন্টে ঐক্যবদ্ধ করা প্রয়োজন ছিল ।
যখন সেই মহান প্রতিভা তাদের কাছে তাঁর বাণী প্রকাশ করলেন, তখন এই দলীয় রাজনীতিবিদদের মুখগুলো আপনার দেখা উচিত ছিল , যা এক জীর্ণ- শীর্ণ বুর্জোয়া সংস্কৃতির আনন্দে ঝলমল করছিল। তিনি ছিলেন একজন জাতীয়তাবাদী এবং একজন প্রতিভা। তারা এতদিন ধরে যা খুঁজছিল, অবশেষে তিনি তা আবিষ্কার করেছিলেন। মার্ক্সবাদীদের এবং তাদের মধ্যেকার ব্যবধানের উপর একটি সেতু নির্মাণ করা সম্ভব ছিল। এইভাবে, ছদ্ম - জাতীয়তাবাদীদের পক্ষে জার্মান আচরণ অনুকরণ করা এবং জাতীয়তাবাদী শব্দচয়ন গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছিল, যখন তারা সরলভাবে নিজেদের দেশের আন্তর্জাতিক বিশ্বাসঘাতকদের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছিল । বিশ্বাসঘাতক দ্রুত সেই হাতটি আঁকড়ে ধরেছিল, কারণ ঠিক যেমন হের কুনোর তাঁর "সংযুক্ত ফ্রন্টের" জন্য মার্ক্সবাদী মালিকদের প্রয়োজন ছিল, তেমনি মার্ক্সবাদী মালিকদেরও হের কুনোর টাকার প্রয়োজন ছিল। এইভাবে , এই লেনদেন থেকে উভয় পক্ষই লাভবান হয়েছিল। এবং এখন, রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত অর্থের সাহায্যে , এই লোকেরা তাদের গৌরবময় অভিযান চালিয়ে যেতে পারত: জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ধ্বংস। এটি একটি অমর ধারণা ছিল যে একটি সাধারণ ধর্মঘটের মাধ্যমে জাতিকে বাঁচানো যেতে পারে , যেখানে ধর্মঘটকারীদের বেতন দেবে রাষ্ট্র। এটা এমন একটা আদেশ ছিল যা সবচেয়ে উদাসীন ও অলস ব্যক্তিরাও সানন্দে পালন করতে পারত ।

সকলেই জানে যে প্রার্থনা কোনো জাতিকে মুক্ত করতে পারে না। কিন্তু কাজ বন্ধ করার মাধ্যমে যে একটি জাতিকে মুক্ত করা যায়, তা ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণ করতে হবে। প্রচারের পরিবর্তে
তারপর একটি বেতনভুক্ত সাধারণ ধর্মঘট এবং তার উপর ভিত্তি করে তাদের 'ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট' গঠন। যদি হের কুনো প্রত্যেক জার্মান নাগরিকের কাছ থেকে আরও দুই ঘণ্টা কাজ দাবি করতেন , তাহলে তিন দিনের মধ্যেই 'ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট'-এর ভণ্ডামি ফাঁস হয়ে যেত । জাতিরা কাজ করতে অস্বীকার করে স্বাধীনতা অর্জন করে না , বরং আত্মত্যাগের মাধ্যমে করে।

যাই হোক, তথাকথিত এই অহিংস প্রতিরোধ বেশিদিন টিকতে পারত না । যুদ্ধ সম্পর্কে যার কোনো ধারণাই নেই, কেবল সেই কল্পনা করতে পারে যে এমন হাস্যকর উপায়ে দখলদার সেনাবাহিনীকে ভয় দেখিয়ে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব । আর এমন একটি পদক্ষেপের উদ্দেশ্য কেবল এটাই হতে পারত, যে পদক্ষেপের জন্য দেশের শত শত কোটি টাকা খরচ হয়েছে এবং যা জাতীয় মুদ্রার অবমূল্যায়নে গুরুতর ভূমিকা রেখেছে ।

অবশ্যই, রুহর অঞ্চলে ফ্রান্স প্রায় নিজেদের ঘরের মতোই অনুভব করছিল , যখন তারা দেখল তাদের বিরুদ্ধে হাস্যকর সব ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে । দখলদার সেনাবাহিনীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য যদি বেসামরিক জনগণের কার্যকলাপ গুরুতর বিপদ হয়ে দাঁড়াতে পারত, তবে তাদের হুঁশ ফেরানোর সেরা উপায়টি তারা আমাদের কাছ থেকেই পেয়েছিল। নয় বছর আগে, আমরা দ্রুত বেলজিয়ান দস্যুদলগুলোকে নির্মূল করেছিলাম এবং বেসামরিক জনগণকে পরিস্থিতির ভয়াবহতা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম, যখন তাদের কার্যকলাপ জার্মান সেনাবাহিনীর জন্য গুরুতর হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একইভাবে, রুহর অঞ্চলে যদি অহিংস প্রতিরোধ ফ্রান্সের জন্য সত্যিই বিপজ্জনক হয়ে উঠত , তবে এই ছেলেমানুষি কাণ্ডকে এক ভয়াবহ পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে দখলদার সেনাবাহিনীর আট দিনের বেশি সময় লাগত না । আমাদের নিজেদেরকে সর্বদা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি করতে হবে: অহিংস প্রতিরোধ যদি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায় যেখানে তা আমাদের প্রতিপক্ষকে সত্যিই বিরক্ত করে এবং তারা শক্তি ও রক্তপাতের মাধ্যমে একে দমন করতে শুরু করে, তাহলে আমাদের কী করা উচিত ? আমরা কি প্রতিরোধ চালিয়ে যাব? যদি তাই হয়, তবে আমাদের কঠোর ও রক্তাক্ত নিপীড়নের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে । আর সেক্ষেত্রে আমরা নিজেদেরকে এমন এক পরিস্থিতিতে খুঁজে পাব যেখানে

সক্রিয় প্রতিরোধের মতোই একই পরিস্থিতিতে। অন্য কথায়, আমাদের লড়াই করা উচিত । সুতরাং , তথাকথিত নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ কেবল তখনই যৌক্তিক হবে, যদি প্রয়োজনে প্রকাশ্য যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া বা গেরিলা যুদ্ধ শুরু করার সংকল্প দ্বারা তা সমর্থিত হয় । সাধারণত, যখনই সম্ভব হয় , এই ধরনের লড়াই চালিয়ে যাওয়া হয়।

সাফল্য। যখন কোনো অবরুদ্ধ দুর্গে আক্রমণ করা হয় , তখন রক্ষাকারীদের কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া কার্যত আর কোনো বিকল্প থাকে না, যদি তাদের সম্ভাব্য মৃত্যুর পরিবর্তে জীবন রক্ষার আশ্বাস দেওয়া হয় । যদি শত্রু দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টিত কোনো দুর্গের সৈন্যদল সাহায্যের সমস্ত আশা হারিয়ে ফেলে , তবে প্রতিরক্ষার শক্তি সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়ে।

সুতরাং, রুহরে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের কোনো বাস্তব তাৎপর্য থাকত না, যদি না একে সমর্থন করার জন্য একটি সক্রিয় ফ্রন্ট সংগঠিত করা হতো ; যদি না এর চূড়ান্ত পরিণতি বিবেচনা করা হয় , যা সত্যিই কার্যকর হলে হতে পারত এবং অবশ্যম্ভাবী ছিল । তখন আমাদের জনগণের কাছ থেকে বিপুল প্রচেষ্টা দাবি করা যেত । যদি প্রত্যেক ওয়েস্টফালিয়ান

Machine Translated by Google

রুহরের জার্মানরা যদি এই আশ্বাস পেত যে তাদের সমর্থনে দেশটি আশি বা একশটি ডিভিশনের একটি সেনাবাহিনী প্রস্তুত করছে, তবে ফরাসিদের জন্য পরিস্থিতি এতটা সহজ থাকত না। নিঃসন্দেহে, একটি সুস্পষ্টভাবে নিষ্ফল প্রচেষ্টার চেয়ে একটি সফল উদ্যোগের জন্য আত্মত্যাগ করতে ইচ্ছুক অনেক বেশি সাহসী মানুষ খুঁজে পাওয়া যেত।

এই কারণেই আমরা, জাতীয় সমাজতন্ত্রীরা, তথাকথিত জাতীয় স্লোগানগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিতে বাধ্য হয়েছিলাম। এবং আমরা তাই করেছিলাম। সেই মাসগুলোতে , আমি এমন সব লোকের আক্রমণের শিকার হয়েছিলাম যাদের দেশপ্রেম ছিল নির্বুদ্ধিতা আর অর্থহীনতার এক মিশ্রণ , এবং যারা কোনো বিপদ ছাড়াই হঠাৎ নিজেদের জাতীয়তাবাদী হিসেবে জাহির করতে পারার সুখকর অনুভূতির কারণে এই সাধারণ হট্টগোলে অংশ নিয়েছিল। আমার মতে, এই জঘন্য 'সংযুক্ত ফ্রন্ট' ছিল কল্পনাতীত সবচেয়ে হাস্যকর বিষয়গুলোর মধ্যে একটি। এবং ঘটনাপ্রবাহ আমাকে সঠিক প্রমাণ করেছিল।

যেইমাত্র ট্রেড ইউনিয়নগুলো রাষ্ট্রীয় অর্থে তাদের কোষাগার প্রায় পূর্ণ করে ফেলেছিল এবং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকে নিষ্ফল প্রতিরক্ষা থেকে সক্রিয় আগ্রাসনে রূপান্তরিত করার মুহূর্তটি এসে গিয়েছিল , ঠিক তখনই লাল হায়েনারা হঠাৎ করে জাতীয় বলয় ছেড়ে পালিয়ে গেল এবং তাদের চিরচেনা জায়গায় ফিরে গেল। ঢাক- তূর্যের শব্দ ছাড়াই হের কুনো তার জাহাজে ফিরে গেলেন। জার্মানি একটি অভিজ্ঞতার জন্য সমৃদ্ধ হলো, কিন্তু একটি বিরাট ক্ষতির জন্য দরিদ্রতর হলো।

আশা।

সেই বছরের গ্রীষ্মের মাঝামাঝি পর্যন্ত, বেশ কয়েকজন অফিসার—যাঁরা মোটেই কাপুরুষ বা অসম্মানজনক ছিলেন না— সত্যিই বিশ্বাস করেননি যে পরিস্থিতি এমন একটি অপমানজনক মোড় নিতে পারে। তাঁরা আশা করেছিলেন — প্রকাশ্যে না হলেও , অন্তত গোপনে — যে এই দুঃসাহসিক ফরাসি আক্রমণকে জার্মান ইতিহাসের একটি মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমাদের বাহিনীর অনেকেই রাইখসভেয়ারের হস্তক্ষেপের আশা করেছিলেন। এই বিশ্বাস এতটাই প্রবল ছিল যে তা অগণিত তরুণদের আচরণ এবং বিশেষ করে তাদের প্রশিক্ষণের ওপর চূড়ান্তভাবে প্রভাব ফেলেছিল।

কিন্তু যখন সেই লজ্জাজনক পতন এবং চরম অপমানজনক আত্মসমর্পণ ঘটল , আমাদের এই হতভাগ্য দেশের প্রতি এমন বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ দাবানলের মতো জ্বলে উঠল। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনহানি ঘটল, এবং হাজার হাজার তরুণ জার্মানকে বলিদান করা হলো , যারা রাইখের শাসকদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করার মতো বোকামি করেছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, জার্মানিকে কেবল তখনই বাঁচানো সম্ভব যখন বিদ্যমান সমগ্র ব্যবস্থাটিকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেওয়া হবে।

এই ধরনের সমাধানের জন্য এর চেয়ে অনুকূল মুহূর্ত আর আসেনি। একদিকে, দেশের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ও নির্লজ্জভাবে এক গুরুতর রাষ্ট্রদ্রোহিতা সংঘটিত হয়েছিল। অন্যদিকে, অনাহারে জাতিটি এক ধীর মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছিল। যেহেতু রাষ্ট্র নিজেই বিশ্বাস ও আনুগত্যের সমস্ত নীতিকে পদদলিত করেছিল, নিজ নাগরিকদের অধিকার নিয়ে উপহাস করেছিল, তার লক্ষ লক্ষ অনুগত সন্তানের আত্মত্যাগকে নিষ্ফল করে দিয়েছিল এবং আরও লক্ষ লক্ষ মানুষের শেষ সম্বলটুকুও কেড়ে নিয়েছিল, তাই এমন একটি রাষ্ট্র তার প্রজাদের কাছ থেকে ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই আশা করতে পারত না। যারা জাতি ও দেশকে ধ্বংস করেছিল, তাদের প্রতি এই ঘৃণার কোনো না কোনো রূপে বহিঃপ্রকাশের পথ খুঁজে নিতেই হতো। এই প্রসঙ্গে , আমি বসন্তে অনুষ্ঠিত সেই মহান বিচারে আমার দেওয়া একটি বক্তৃতার শেষ বাক্যটি উদ্ধৃত করব।

১৯২৪।

এই রাষ্ট্রের বিচারকেরা হয়তো এই মুহূর্তে আমাদের কৃতকর্মের জন্য শান্তভাবে আমাদের দণ্ডাজ্ঞা দিতে পারেন , কিন্তু ইতিহাস, যা উচ্চতর সত্য ও উচ্চতর ন্যায়বিচারের দেবী , হাসিমুখে এই রায় ছিঁড়ে ফেলবে এবং সেই সমস্ত অপরাধ থেকে আমাদের মুক্তি দেবে , যেগুলোর জন্য এই রায় শাস্তি দাবি করে।

কিন্তু ইতিহাস তার নিজস্ব বিচারসভায় তাদেরও ডাকবে , যারা আজ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে আইন ও ন্যায়বিচারকে পদদলিত করে আমাদের জাতিকে দুর্দশা ও ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে , এবং তাদেরও, যারা জাতীয় দুর্দিনে সমাজের জীবনের চেয়ে নিজেদের নিয়েই বেশি চিন্তিত ছিল।

১৯২৩ সালের ৮ই নভেম্বরের পূর্ববর্তী ও সমাপ্ত ঘটনাক্রম আমি এখানে বর্ণনা করব না। আমি তা করব না , কারণ আমি বুঝতে পারছি না এতে ভবিষ্যতের কী লাভ হবে এবং কারণ সবেমাত্র সেরে ওঠা পুরোনো ক্ষত পুনরায় জাগিয়ে তুললে কোনো ভালো হয় না। অধিকন্তু, যারা—

Machine Translated by Google

তাদের অন্তরের গভীরে হয়তো তারাও আমার মতোই তাদের দেশকে ভালোবাসত, কিন্তু তারা একই পথ অনুসরণ করেনি। আমি যে পথটি বেছে নিয়েছিলাম, অথবা তারা সেটিকে সঠিক পথ বলে মনে করেনি।

আমাদের মাতৃভূমির উপর নেমে আসা এবং আমাদের সকলকে প্রভাবিত করা এই মহাদুর্ভাগ্যের মুখে , আমাকে অবশ্যই সেইসব মানুষদের আঘাত করা এবং সম্ভবত বিভক্ত করা থেকে বিরত থাকতে হবে, যারা একদিন সত্যিকারের ও অনুগত জার্মানদের নিয়ে একটি মহান ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠন করবে এবং যাদেরকে আমাদের জাতির শত্রুদের নিয়ে গঠিত একটি সাধারণ ফ্রন্টের বিরোধিতা করতে হবে। আমি জানি যে এমন এক সময় আসবে যখন যারা আমাদের শত্রু হিসেবে গণ্য করেছিল, তারাই সেইসব মানুষদের সম্মান জানাবে যারা জাতির নামে মৃত্যুর তিক্ত পথ হেঁটেছিল।

এই বইয়ের প্রথম খণ্ডটি আমি আমাদের আঠারোজন শহীদ বীরের স্মরণে উৎসর্গ করেছি। এই দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে, আমি আবারও আমাদের আদর্শের সমর্থক ও প্রচারকদের সেই বীর হিসেবে স্মরণ করতে চাই, যাঁরা নিজেদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থেকে আমাদের সকলের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। কর্তব্যের ডাকে সাড়া দিয়ে আমাদের মাঝের দুর্বল ও দ্বিধাগ্রস্তদের উৎসাহিত করার জন্য এই নামগুলো আমাদের কখনোই ভোলা উচিত নয় ; যে কর্তব্য তাঁরা পরম বিশ্বাসে, এমনকি চূড়ান্ত পরিণতি পর্যন্তও পালন করেছেন। তাঁদের সাথে একত্রে,

আমি এমন একজন মহান ব্যক্তির কথা উল্লেখ করতে চাই, যিনি তাঁর লেখা, তাঁর ভাবনা এবং সর্বোপরি তাঁর কর্মের মাধ্যমে নিজের ও আমাদের জাতিকে জাগিয়ে তোলার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এই ব্যক্তি হলেন ডিট্রিচ একার্ট।

Machine Translated by Google

শেষ

১৯২৩ সালের ৯ই নভেম্বর, প্রতিষ্ঠার সাড়ে চার বছর পর , জাতীয় সমাজতান্ত্রিক জার্মান শ্রমিক দলটিকে সমগ্র রাইখ জুড়ে বিলুপ্ত ও নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এখন, ১৯২৬ সালের নভেম্বরে, এটি সমগ্র রাইখ জুড়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করছে ; আগের চেয়েও শক্তিশালী ও অধিক সংহত অবস্থায় ।

আন্দোলন ও এর নেতাদের বিরুদ্ধে সমস্ত নিপীড়ন, সমস্ত অভিযোগ ও অপবাদ একে পরাজিত করতে পারেনি। এর আদর্শের সঠিকতা , উদ্দেশ্যের সততা এবং এর সদস্যদের অনুপ্রাণিত করা আত্মত্যাগের চেতনার কল্যাণে , এটি সমস্ত দমন-পীড়ন জয় করেছে এবং এই নিপীড়নের মধ্যেই নিজের শক্তি বৃদ্ধি করেছে। সংসদীয় দুর্নীতির এই সমসাময়িক বিশ্বে, যদি আমাদের আন্দোলন তার সংগ্রামের গভীর প্রকৃতি সম্পর্কে সর্বদা সচেতন থাকে এবং অনুভব করে যে এটি ব্যক্তিসত্তা ও জাতির মূল্যবোধকে ধারণ করে ও সেই অনুযায়ী কাজ করে, তবে এটি গাণিতিক নিশ্চয়তার সাথে ভবিষ্যতে একদিন বিজয় অর্জনের উপর নির্ভর করতে পারে । জার্মানিকে পৃথিবীতে তার ন্যায্য স্থান অর্জন করতেই হবে, যদি তাকে এই নীতি অনুসারে পরিচালিত ও সংগঠিত করা হয়।

এমন একটি রাষ্ট্র যা জাতিগত দূষণের যুগে সংরক্ষণের কর্তব্যে নিজেকে উৎসর্গ করে তার জাতির শ্রেষ্ঠ অংশ একদিন পৃথিবীর শাসক হবে ।

আমাদের আন্দোলনের সমর্থকদের এই কথাটি সর্বদা মনে রাখতে হবে , যখনই তারা ভয় হয় যে, সাফল্যের সম্ভাবনার নিরিখে তাদের কাছ থেকে যে পরিমাণ ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন , তা যুক্তিযুক্ত নয় ।

Machine Translated by Google

উপসংহার

এই কাজটি অ্যাডলফ হিটলারের ' মাইন কাম্ফ' -এর প্রথম সম্পূর্ণ পোলিশ অনুবাদ । আমি পুরোপুরি সচেতন যে এটি নিখুঁত নয়। আমি পুরোপুরি সচেতন যে আমি অবশ্যই ভুল করেছি । যেহেতু আমি জার্মান সংস্করণটি অনুবাদ করতে পারিনি , তাই আমি www.stormfront.org-এ উপলব্ধ ইংরেজি সংস্করণটির উপর নির্ভর করেছি এবং www.hitler.org-এ উপলব্ধ আরেকটি ইংরেজি সংস্করণের সাথেও এটি তুলনা করেছি । তবে, যেহেতু প্রথম সংস্করণটি আরও বিস্তৃত এবং সম্পূর্ণ ছিল, তাই আমি সেটির উপরই নির্ভর করেছি। নিঃসন্দেহে, কিছু কিছু জায়গায় , এই ধরনের দ্বৈত অনুবাদ অনেকটা টেলিফোন খেলার মতো। তবে, পুরোনো প্রবাদ অনুযায়ী, যারা কিছুই করে না, কেবল তারাই কোনো ভুল করে না।

আমি কোনো নব্য-ফ্যাসিস্ট বা নাৎসি নই। আমি এই বইটি অনুবাদ করা শুরু করেছিলাম কারণ আমি বহু বছর ধরে এটি পড়তে চেয়েছিলাম , এবং অবশেষে যখন আমি এর 'পোলিশ সংস্করণ'টি হাতে পেলাম , আমি খুব হতাশ হয়েছিলাম। মাইন কাম্ফ -এর যে 'পোলিশ সংস্করণ'টি পাওয়া যায় , তা শুধু বইটির আসল বিষয়বস্তুর প্রতিফলনই করে না , বরং এটি এমন এক অর্থহীন প্রলাপের মতো যা মাঝে মাঝে একেবারেই অপাঠ্য । প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন বাক্য, চিন্তার খণ্ডাংশ—সবকিছু এলোমেলোভাবে জট পাকিয়ে আছে।

"পোলিশ সংস্করণ"-এর ভূমিকায় আমরা পড়তে পারি: "হিটলার লিখিত শব্দের মাধ্যমে নয়, বরং একজন বক্তা হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন । তিনি তাঁর সাফল্যের জন্য সমাবেশ ও সভাগুলোর কাছে ঋণী। তাই, তাঁর বইটি গঠনগতভাবে একটি বিশৃঙ্খল রচনা, যা এক অমার্জিত, প্রায়শই কুরুচিপূর্ণ শৈলীতে লেখা।" এবং আরও: "পাঠকের সামনে উপস্থাপিত নির্বাচিত অংশটির প্রধান উদ্দেশ্য হলো পাঠকে সহজতর করা । এই নির্বাচন থেকে সবচেয়ে পুনরাবৃত্তিমূলক এবং বিভ্রান্তিকর অংশগুলো বাদ দেওয়া হয়েছে । সাহিত্যিক মানের কোনো রচনার ক্ষেত্রে যেমনটা করা হয়, তেমন শৈলীর প্রতি বিশ্বস্ততাও বজায় রাখা হয়নি । এক্ষেত্রে, উদ্দেশ্য কেবল হিটলারের লেখার অযোগ্যতা প্রদর্শন করাই হতে পারে। অপরদিকে, এই অনুবাদটির (যদি প্রথমটি না-ও হয়) প্রধান লক্ষ্য হলো লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিগুলোকে যথাসম্ভব সহজবোধ্য উপায়ে পৌঁছে দেওয়া। হিটলারের বইটিকে সম্পূর্ণরূপে 'অন্বেষণ' করার জন্য কতজনই বা এর জটিল শৈলীগত এবং উচ্ছল বাক্যগঠনের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে ইচ্ছুক হবে ?"

এখন , পুরো লেখাটি বিশ্লেষণ করার পর আমি সম্পূর্ণ সচেতনভাবে বলতে পারি যে এটি পুরোপুরি অর্থহীন। এই 'নির্বাচন'-এর উদ্দেশ্য পাঠককে পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে একঘেয়েমি থেকে বাঁচানো ছিল না। আমি স্বীকার করি যে এই ধরনের অংশ সত্যিই আছে , কিন্তু আরও অনেক খণ্ডাংশ ছেঁটে ফেলা হয়েছে যা মোটেও একঘেয়ে বা অপ্রয়োজনীয় ছিল না। উদাহরণস্বরূপ, দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের সাথে তুলনা করা যাক , যেখান থেকে সিংহভাগই বাদ দেওয়া হয়েছিল।

সংসদীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে সমালোচনামূলক মন্তব্য। এই ধরনের 'সংক্ষিপ্ত পথ' পুরো বিষয়টি বোঝা সহজ করে না ; বরং তা বিষয়টিকে উল্লেখযোগ্যভাবে জটিল করে তোলে ।

মাইন কাম্ফ যেভাবে লেখা হয়েছে, তাতে অবাক হওয়ার মতো কিছু নেই । কিন্তু আমরা আসলে যা দেখছি তা হলো নির্ভেজাল সেন্সরশিপ, যা "অমার্জিত শৈলী," "অস্বস্তিকরতা," এবং "বিভ্রান্তিকর অংশ" -এর আড়ালে চালানো হয়েছে ।

তবে, আসুন আমরা বিবেচনা করি , এই ধরনের সেন্সরশিপ আসলেই প্রয়োজনীয় কিনা । আসুন আমরা সৎ এবং খোলামেলা হই: কেউ কিছু করছে কি না, তার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই।
কেউ মাইন কাম্ফ পড়ুক বা না পড়ুক, তার দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যকলাপের ওপর এর প্রভাব পড়ে। এই দাবি যে, মাইন কাম্ফ পড়লেই কেউ সঙ্গে সঙ্গে নাৎসি হয়ে যায় , তা একটি ভিত্তিহীন কথা। অন্যদিকে, "ইহুদিদের গ্যাস চেম্বারে পাঠাও" বলে চিৎকার করতে , মাথা ন্যাড়া করতে এবং হিটলার স্যালুট দিতে মাইন কাম্ফ পড়ার কোনো প্রয়োজনই নেই । এই বইটি অত্যন্ত বিতর্কিত, কিন্তু এটি পড়ার যোগ্য ।

এর সম্পূর্ণতা উপলব্ধি করা কঠিন যে সেগুলো অযৌক্তিক। এটি যে ঐতিহাসিক সময়ে লেখা হয়েছিল, তার সাথে এটি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, এবং এই বিষয়টি এর লেখক নিজেও বারবার জোর দিয়ে বলেছেন । এমন কোনো আশঙ্কা নেই যে, এটি পড়ার পর কেউ এনএসডিএপি-র আদলে একটি দল গঠন করে অ্যাডলফ হিটলারের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে । এটি একেবারেই অসম্ভব। সেই সময় এবং আজকের মধ্যে পার্থক্য অনেক বেশি।

Machine Translated by Google

তবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে, লেখক এই বইটিতে অনেক আকর্ষণীয় ও সত্য চিন্তাভাবনা অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অ্যাডলফ হিটলার প্রচারণার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন এবং অত্যন্ত সাফল্যের সাথে তাঁর আন্দোলনকে বিকশিত করতে এটি ব্যবহার করেছিলেন। প্রচারণা, মানুষের উপর এর প্রভাব এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সংসদীয় ব্যবস্থার উপর তাঁর সমালোচনা সম্পর্কিত তাঁর পর্যবেক্ষণগুলো কেবল বৈধই নয় , বরং আজও প্রাসঙ্গিক। উদাহরণস্বরূপ, লেখক কি এটা লিখে ভুল করছেন যে, সংসদীয় ব্যবস্থায় এমন লোকেরা শাসন করে যাদের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোর প্রকৃতি সম্পর্কে কোনো ধারণাই থাকে না এবং সমস্ত দায়বদ্ধতা অস্পষ্ট হয়ে যায় ?
চলো চারিদিকে তাকাই, তাহলেই এই প্রশ্নের উত্তর সহজেই পেয়ে যাব।

আমি বিশ্বাস করি, নাৎসিবাদ ও থার্ড রাইখের ইতিহাসে আগ্রহী যে কোনো ব্যক্তির জন্য এই বইটি একটি মূল্যবান উৎস , কারণ এটি সেই ব্যবস্থার স্রষ্টার দ্বারা রচিত। এতে অ্যাডলফ হিটলার একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা উপস্থাপন করেন, যা তিনি পরবর্তীতে বাস্তবায়ন করেছিলেন। সুতরাং, এটি এই বিষয়ের উপর প্রথম এবং মৌলিক দলিল, যা সম্পর্কে আগ্রহী প্রত্যেকেরই পরিচিত হওয়া উচিত। তবে, আদর্শগত কারণে তারা তা করতে পারেন না এবং হয় সেন্সর করা সংস্করণ পড়তে, কমবেশি একই বিষয়বস্তু সম্বলিত অন্য বই পড়তে, অথবা বিদেশি ভাষার সংস্করণ ঘেঁটে দেখতে বাধ্য হন।

যদিও আমার অনুবাদটি অবশ্যই ত্রুটিহীন নয় , তবুও আমি বিশ্বাস করি যে এটি বর্তমানে উপলব্ধ সংস্করণটির চেয়ে ভালো , কারণ এটি আরও পূর্ণাঙ্গ। হয়তো একদিন 'মাইন কাম্ফ'-এর একটি পেশাদারভাবে অনূদিত পোলিশ সংস্করণ প্রকাশিত হবে , এবং তখন আমি সানন্দে এর একটি কপি কিনব। তবে আপাতত, আমার নিজের কাজ নিয়েই আমাকে থাকতে হচ্ছে।

পরিশেষে , আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে, এই বইটি অনুবাদ করার সময় আমার কোনো আর্থিক মুনাফা করার উদ্দেশ্য ছিল না এবং এখনও নেই ; আমি এটি শুধুমাত্র আমার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য করেছি। অনুবাদটি করতে আমার ছয় মাসেরও বেশি সময় লেগেছে , কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে এই সময়টা কোনোভাবেই বৃথা যায়নি।